Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/ 129	Place(s) of Publication:	CALCUTTA.
		Year of Publication	1356 B.S. (1949).
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	AMAL GHOSH.
Editor(s)	AMAL GHOSH	Size:	25 x 37 cm.
		Condition:	Good.
Title:	মশাল	Volumes in record:	Archive has: V.1. Nos. 1-16 (17th July 1949 - 2nd Oct. 1949) Weekly.

পশ্চিম বাংলায় পুলিস-রাষ্ট্র কায়েম করায় প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্থ প্রয়াস

ডিক্টেটর নেহরুর কলিকাতা অভিযান শেষ হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার রাজপথে নাগরিকের রক্তের দাগ এখনো শুকায় নাই; হাসপাতালে আহত নওজোয়ানের আর্ত্তনাদ এখনো থামে নাই; ঘরে ঘরে গ্রেপ্তার ও তল্লাসীর হিড়িক এখনো শেষ হয় নাই।

কলিকাতাবাসীর নিকট কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর ইহাই একমাত্র উপহার!

দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে নাগরিকদের হাতে মার খাইয়া আতংকিত কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন; প্রধানমন্ত্রী তাঁহার রক্তাক্ত অভিযানের মধ্য দিয়া ইহাই জানাইয়া দিয়াছেন যে, একমাত্র অস্ত্র ও পুলিস-পল্টনের শক্তিতেই তাঁহারা কংগ্রেসী শাসন কায়েম রাখিতে কৃতসংকল্প।

ডিক্টেটর নেহরুর আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় যে ব্যাপক 'প্রস্তুতি' চলে তাহার দিকে একবার লক্ষ্য করুন। নাগরিকদের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা কমিটি নয়, অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয় রাইটার্স বিল্ডিং-এ পশ্চিম বাংলার পুলিস-প্রধানদের লইয়া। সরকারী তহবিল হইতে ১৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। তিন চারদিনের জন্যে সমস্ত জেলা হইতে কিছু কিছু পুলিস কলিকাতায় আমদানী করা হয়। কলিকাতাকে তাহারা একটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত করে।

কংগ্রেসী কীর্ত্তনীয়াদের ধুয়া

সমস্ত নাগরিকদের সামনে কংগ্রেসী গণতন্ত্রের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে উপযুক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরী করার চেষ্টাও কম হয় না। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী সরকারের হঠাৎ খেয়াল হয়, কলিকাতার নাগরিকদের রেশন বড় কম; তাঁহারা নাগরিকদের কষ্টে বিগলিত হইয়া সপ্তাহে দুই ছটাঁক আটা (!) বাড়াইয়া দেন [হিন্দুস্থানী নাগরিকদের খুশী করার জন্যে!]; দক্ষিণ কলিকাতার নির্ব্বাচনে পরাজিত কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রীসুরেস দাস হঠাৎ বুঝিতে পারেন যে, কংগ্রেসী সরকার ধনিকদের সেবা করার ফলে জাতীয় টি-ইউ-সির পক্ষে শ্রমিকদের মধ্যে মুখ দেখানো কঠিন হইয়াছে! সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি পট্টভী সীতারামিয়ার এতদিন পরে খেয়াল হয় যে, কংগ্রেসী পুলিসের গুলি চালনার পর কংগ্রেসীদের উচিত সে সম্পর্কে তদন্ত করা। গুলি চালনা বন্ধ করা নয়! পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হঠাৎ টের পান যে, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতির ব্যাপারে বড় বেশী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। ['ডাঃ ঘোষের কাকড় ব্যবসায়ীদের কি হইল!] অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার বিহারের নির্য্যাতিত বাঙ্গালীদের জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করেন; আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে ৫ কোটি টাকা খরচ করা হইল তাহাও উল্লেখ করিতে ভোলেন না। গবর্ণর কাটজু বাংলার অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হন এবং শিক্ষিত-দের বেকার সমস্যায় বড়ই উদ্বেগ প্রকাশ করেন! [স্যার বীরেন মুখার্জ্জী এবং রাণু মুখার্জ্জীকে ভোজে আপ্যায়িত করতে ভোলেন না!]

এইভাবে রক্ষিতা সংবাদপত্র ও রেডিওর মধ্য দিয়া কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর গণতন্ত্র বোধ রাতারাতি ফাটিয়া পড়ে।

গুণ্ডাদের 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' দান

গণতন্ত্রের এই মুখোস যাহাদের আকর্ষণ করে না—কংগ্রেসী শাসকরা সেই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের জন্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা মঞ্জুর করেন; [ইহা আকস্মিক ঘটনা নয়]; আর-এস্-এস দলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হয়; সংবাদপত্র মারফৎ পাঞ্জাবের একজন মন্ত্রী ঘোষণা করেন: মাস্টার তারা সিংকেও শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হইবে।

এইভাবে কলিকাতা অভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করিবার জন্য পুলিস-পল্টন হইতে সুরু করিয়া গান্ধী হত্যাকারী সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের পর্য্যন্ত সমবেত করা হইয়াছে।

শুধু সমবেত করা সম্ভব হয় নাই কলিকাতার গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকদের। এমন কি তথাকথিত 'বামপন্থী' দলগুলি পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর অভ্যর্থনা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। তাঁহাদের নেতারা "খোলা চিঠি" ও বিবৃতিতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ (নেশন) ও বক্তৃতায় নেহরুজীর গুণগান এবং কমিউনিস্টদের বিরোধী সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি দিলেও বামপন্থী সাধারণ ছাত্ররা লালঝাণ্ডা ছাত্রদের নেতৃত্বে পণ্ডিতজীকে 'অভিনন্দন' জানাইয়াছেন; স্কুল-কলেজে ধর্ম্মঘট করিয়াছেন, পথে পথে সভা শোভাযাত্রার আওয়াজ তুলিয়াছেন: ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর নেহরু ফিরিয়া যাও! শ্যামবাজারের মোড়ে কলিকাতার নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ প্রধানমন্ত্রীর সশস্ত্র অভিযানকে 'চ্যালেঞ্জ' করে।

পাবলিকের বিড়ম্বনা:

একমাত্র শ্যামবাজারে যাহা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যদিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর মুখে গণতন্ত্রের বুলি কতখানি নির্লজ্জ। ৮১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে ডাঃ জি দাস কংগ্রেসী পুলিসের বর্ব্বরতা বর্ণনা করিতে যাইয়া 'নেশন' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন:

"পুলিস আমার কম্পাউণ্ডারকে পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করিয়াছে। একজন টি-বি রোগীকে এ-পি ইন্‌জেকশন্ দিয়াছি তাহার দাগ দেখাইবার পর রেহাই দেওয়া হয়। রোগীর সঙ্গে একজন লোক আসিয়াছিল পুলিস তাহাকে গুরুতরভাবে জখম করে।

৬বি, ভূপেন্দ্রনাথ বসু লেনের বাড়ীর লোকেরা বলেন: পুলিস ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সকলকে নির্ম্মমভাবে মারিয়াছে, কাটারাণী সাহাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে।

এইভাবে কলিকাতাকে ১৪৪ ধারায় শৃঙ্খলিত করিয়া কংগ্রেসী শাসকরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; দমদম হইতে লাটপ্রাসাদ পর্য্যন্ত হাজার হাজার পুলিস-পল্টনের জাঙ্গাল তৈরী করিয়া তাহাদিগকে বে-পরোয়াভাবে "শান্তি ও আইন রক্ষা" করার অধিকার দিয়া তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীকে রাজধানীর বিক্ষুব্ধ বুকের উপর স্থান করিয়া দিয়াছেন।

বক্তৃতামঞ্চ নয়, কাঠগড়া

তারপর ডিক্টেটর নেহরু ১৮ ফুট উচু হিটলারী মঞ্চ হইতে নাগরিকদের উপর তাঁহার উপদেশ বর্ষণ করেন। ১৪৪ ধারা তুলিয়া দেওয়া হয়; সরকারী কর্ম্মচারীদের রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ; কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতিতে যোগদান করিবার জন্যে ছুটি দেওয়া হয়; ময়দানে যাইতে বাধ্য করা হয়। আমন্ত্রিত ভদ্রলোকের নাম করিয়া শহরের বাছাই করা গুণ্ডাদের কার্ড দিয়া সমাবেশের প্রথম সারিতে একত্রিত করা হয়। ময়দানকে যুদ্ধক্ষেত্রের সাজে সজ্জিত করা হয়।

কিন্তু এত বড় সাজসজ্জা সমাবেশের মধ্যেও কংগ্রেসী ডিক্টেটর বুঝিতে পারেন, ইহা সম্বর্দ্ধনা সভা নয়, ইহা বিচার সভা। তাই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তিনি কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর পক্ষ হইতে জবানবন্দী পেশ করেন, তাহাদের দেড়-দুই বছরের কুকীর্ত্তির 'কৈফিয়ৎ' দিবার চেষ্টা করেন।

* পশ্চিম বাংলার জনগণ কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীকে দুর্নীতিপরায়ণ ও চোরা-কারবারী বলিয়া ঘৃণা করে। তাহার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন: "দেশের সবলোকের নৈতিক চরিত্রই খারাপ হইয়া গিয়াছে;"

* পশ্চিম বাংলার জনগণ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে নারীহন্তা-শিশুহন্তা বলিয়া ঘৃণা করে। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন: গুলি করা হইবে না এমন কথা আমি বলিতে পারি না। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেই হইবে।

* মানভূমে বাঙ্গালীদের উপর নির্য্যাতনকে কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী সমর্থন করেন বলিয়াই পশ্চিম বাংলার জনগণ তাঁহাদের ঘৃণা করে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন: এখন ঐ প্রশ্ন তুলিয়া দরকার নাই, আরো তিনচার বছর পরে দেখা যাইবে।

* আশ্রয়প্রার্থীদের মাথা গুজিবার ঠাঁই, কাজ ও অন্ন কোনটার ব্যবস্থা নাই বলিয়া পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভা এত ঘৃণিত। প্রধানমন্ত্রী উপদেশ দিয়াছেন: তোমরা গবর্ণমেণ্টের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া চলো; আত্মনির্ভর হইতে চেষ্টা করো।

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

কংগ্রেসী জেলে আরও দুই জনের মৃত্যু

খড়্গপুর সরকারী হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় মেদিনীপুরের কমিউনিস্ট নেতা হরেন মিত্র এবং বীরভূমের কমিউনিস্ট নেতা দ্বারিকা ব্যানার্জ্জির মৃত্যু ঘটিয়াছে।

শহীদ হরেন এবং দ্বারিকার স্মরণে আমরা রক্তপতাকা অবনমিত করিতেছি।

২৭শে জুন মেদিনীপুর জেলে অনশনব্রতী রাজবন্দীদের উপর পুলিস লাঠি চালনা করে। ফলে কমরেড হরেন এবং দ্বারিকা গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁহাদের অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায় তাঁহাদের ১লা জুলাই খড়্গপুর সরকারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়—অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে তাঁহারা মারা যান।

মাঙ্গল

প্রথম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] ১৭ই জুলাই '৪৯ : ১লা শ্রাবণ '৫৬ [তিন আনা

মতামত

"স্বাধীন, নিরপেক্ষ, এসিয়া ব্লক" গঠনের উদ্দেশ্যে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্রী দল গঠনের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন যে, কমিউনিস্টদের ঐ "ঐক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্রী দলে" স্থান দেওয়া হইবে না। এই সঙ্কল্পকে কার্য্যকরী করার জন্যে ইতিমধ্যেই তিনি নাকি কোন কোন সমাজতন্ত্রী নেতার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন।

এই "স্বাধীন নিরপেক্ষ এসিয়া ব্লকে"র নেতা হইবে ভারত। খুবই ভাল কথা। কিন্তু বাকী সভ্য হইবেন কাহারা? নিশ্চয়ই মুক্ত চীন নয়, কারণ উহাকে তিনি "রুশ কমিউনিজম" নাম দিয়াছেন, "রুশিয়ার তাঁবেদার" বলিয়া মনে করেন। তাঁহার 'স্বাধীন' এসিয়া ব্লকে বর্ম্মা, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতাদেরও নিশ্চয়ই স্থান হইবে না। কারণ, তাঁহারা সকলেই কমিউনিস্ট। বসু মহাশয় ইতিপূর্ব্বে যখনই "স্বাধীন নিরপেক্ষ এসিয়া ব্লকে"র আওয়াজ তুলিয়াছেন, তখনই তাহাতে থাকিন-ন্যু, সেনানায়কের মত ঘৃণ্য বৃটিশ দালাল এবং সুবর্ণ-হাতার মত বিশ্বাসঘাতক মার্কিন দালালদের নিকট সেই ব্লকে যোগদানের আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন।

কমিউনিজম-এর বিরুদ্ধে প্রাচ্যে এসিয়া ব্লক গঠন করার আওয়াজ শরৎ বসু ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের নিকট হইতেই ধার করিয়াছেন। তাঁহারাও এই কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্লকে ভারতকেই নেতৃত্ব দিতে উৎসুক। এই 'ধর্ম্মযুদ্ধে' সমাজতন্ত্রী নেতারা শরৎবাবুর সহিত 'ঐক্যবদ্ধ' হইলে তাহাতেও কেহ বিস্মিত হইবে না। শুধু এদেশের জনগণের নিকট একথাই স্পষ্ট হইবে যে, 'নিরপেক্ষতা' সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইবার একটা কৌশলমাত্র। এসিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব খতম করার সংগ্রামে আজ আর নিরপেক্ষতার স্থান নাই—চীন, বর্ম্মা, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, কোরিয়া—সর্ব্বত্র সংগ্রামী জনগণ সেই শিক্ষাই উপস্থিত করিতেছে।

* * *

সমাজতন্ত্রীনেতাদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া শরৎ বসু এসিয়ায় যে ব্লক গঠন করিবেন, অষ্ট্রেলিয়ার "সমাজতন্ত্রী" শাসকরা নিশ্চয়ই তাহাতে স্থানলাভ করিবেন। ভারতের সমাজতন্ত্রী দলের মুখপত্র 'জনতায়' সমাজতন্ত্রী অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের গুণগান নিত্যই কীর্ত্তন করা হইতেছে। এই সমাজতন্ত্রী নেতাদের হাতে গণতন্ত্র কতখানি নিরাপদ তাহা কয়লার খনির শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারেই দেখা গিয়াছে। সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্যে তাহারা নেতাদের গ্রেপ্তার করিতেছে; ভারত হইতে কয়লা আমদানী করিতেছে; অন্য কোন ইউনিয়ন যাহাতে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করিতে না পারে তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে; সাহায্য করার অপরাধে জাহাজী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের জেল দেওয়া হইয়াছে; শ্রমিকদের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তর চড়াও করা হইয়াছে।

যে সরকারের হাতে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করার আইনসঙ্গত অধিকার পর্য্যন্ত বিপন্ন, তাঁহারা যে জয়প্রকাশ-মার্কা সমাজতন্ত্রী তাহা অনুমান করা শক্ত কি?

"গণতান্ত্রিক সমাজবাদের" ইহা অপেক্ষাও বড় পরীক্ষা চলিয়াছে সমাজতন্ত্রী নেতা এট্‌লী-বেভিনের রাজত্বে। সেখানে ডক শ্রমিকরা অধিকাংশে ভোট দিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কেনাডার ভাইদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্যে তাহারা 'দালাল' হিসাবে কাজ করিবে না। কিন্তু এটলী গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক রায় মানিবেন ইহা কে বিশ্বাস করিবে? তিনি বিলাতে "জরুরী অবস্থা" ঘোষণা করিয়াছেন; ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার কাজে সৈন্য নিয়োগ করিয়াছেন। 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' বিলাতে ১৯২৬ সালের কথাই আজ স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

* * *

এই 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'কেই কংগ্রেস নেতারা নাম দিয়াছেন—"শ্রেণী-হীন গণতন্ত্র"। ভারতে ইহা কিভাবে চলিয়াছে তাহা দেখা যায় বোম্বাই-এর ধাঙ্গর ধর্ম্মঘটে। কর্পোরেশনের দশ হাজার ধাঙ্গর আজ দুই মাস যাবৎ ধর্ম্মঘট করিয়া আছে। বোম্বাই হাইকোর্ট তাহাদের ধর্ম্মঘটকে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শত শত ধর্ম্মঘটী শ্রমিককে জেলে আটক রাখা হইয়াছে। ৮০০০ শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইয়াছে। সমাজতন্ত্রী নেতারা কর্পোরেশনে একটা বড় দল। কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মঘটীদের দাবী সমর্থন করার পরিবর্ত্তে বিনাশর্ত্তে কাজে যোগদানের পরামর্শ দিতেছে।

ভারতের 'শ্রেণী-হীন গণতন্ত্রে' শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করার প্রয়োজন কোথায়? গত ৬ই জুলাই দিল্লীর লাট প্রাসাদ হইতে বড়লাট রাজাজী বেতারে ঘোষণা করিয়াছেন: ভারতের শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান অনেক উন্নত হইয়াছে; কৃষক, এমন কি ক্ষেতমজুররা পর্য্যন্ত এখন ভাত খাইতে সুরু করিয়াছে। [স্টেটসম্যান, ৭-৭-৪৯]

কাপড়ের কল, চটকল, চিনি কল প্রভৃতি বন্ধ হইতেছে, সরকারী অর্ডনান্স কারখানায় ১০ হাজার শ্রমিকের উপর ছাঁটাই-এর নোটিস পড়িয়াছে—কিন্তু তাহাতেও চিন্তিত হইবার কারণ নাই; "শ্রেণী-হীন গণতন্ত্রে" তাহাদের জন্যেও কাজের ব্যবস্থা হইতেছে। পশ্চিম বাংলার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নলিনী সরকার বেতারে ঘোষণা করিয়াছেন: "গবর্ণমেণ্টের গঠনমূলক পরিকল্পনার মধ্য দিয়া অনেক লোকের চাকুরী হইবে এবং হইতেছে। দেশের শিক্ষিত যুবকদের সামনে সৈন্য বিভাগ, নৌ-বিভাগ, বিমান-বিভাগের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।" [স্টেটসম্যান, ৮-৭-৪৯]

* * *

কিন্তু শুধু সৈন্য-বিভাগ, নৌ-বিভাগ এবং বিমান-বিভাগের সাহায্যে "শ্রেণী-হীন গণতন্ত্র" কায়েম রাখা কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা এখন আর সম্ভব হইতেছে না। পশ্চিম বাংলায় 'সৈন্য-বিভাগ আর পুলিস-বিভাগ গত দেড় বছরে কম কর্ম্মতৎপরতা দেখায় নাই, কিন্তু তাহাতেও দক্ষিণ-কলিকাতার নির্ব্বাচনে এক চতুর্থাংশ ভোট পাওয়া যায় নাই। শুধু পশ্চিম বাংলা নয় সারা ভারতে কংগ্রেসী রাজত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতেছে।

শ্রমিকরা জোর করিয়া কারখানা দখল করিতেছে; কৃষকরা ফসল ও জমি দখল করিতেছে; বোম্বাইয়ে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী ফি বাড়ানোর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছে; দিল্লীতে ১২১ জন আশ্রয়-প্রার্থীর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে শত শত আশ্রয়প্রার্থী আদালত ঘেরাও করিয়াছে; শুধু পশ্চিম বাংলার নয়, আসামের গ্রামাঞ্চল "উপদ্রুত এলাকা" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলে পাইকারী জরিমানা বসানো হইয়াছে; বিহারের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন: বিহারের বাংলা-সীমান্তের উপর নজর রাখো।

সরকারী পুলিস-পল্টন ক্রমশঃ ব্যর্থ হইতেছে বলিয়াই এই গণ-বিক্ষোভ দমনে এখন দিল্লীর কর্ত্তারা রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করিতেছেন। ইহার জন্যেই একদিকে জয়প্রকাশনারায়ণদের সহিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের কথা উঠিয়াছে; অপরদিকে বৃটিশ আমলের শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া কংগ্রেসনেতারা 'জনপ্রিয়' হইবার কথা ভাবিতেছেন। 'ক্যাপিটাল' পত্রিকা খবর দিতেছেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে আগামী শীতকালেই প্রাদেশিক আইনসভার নির্ব্বাচন হইবে; প্রাদেশিক আইন সভার প্রতিনিধিদের লইয়া নূতন রাষ্ট্র গঠন পরিষদ তৈরী হইবে এবং তাহাই কেন্দ্রীয় আইন সভা হিসাবে কাজ করিবেন।

[৭-৭-৪৯]

জনগণের আস্থা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইবার পূর্ব্বে কংগ্রেসী শাসনকে আরও বছর পাঁচেকের জন্যে পাকা করিয়া রাখার ইহা অপেক্ষা ভাল ফন্দি আর কি হইতে পারে? বৃটিশ আমলের আইনে শতকরা ১৩ জনের মাত্র ভোট আছে; শ্রমিক শ্রেণীর ভোট নাই বলিলেই চলে। নির্ব্বাচক মণ্ডলীর অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর লোক—ধনী চাষী, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি।

সৈন্য বিভাগ-পুলিস বিভাগকে আরো শক্তিশালী করিয়া মুসলিম, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের উপর কোথাও চোখ রাঙ্গানী, কোথাও সাম্প্রদায়িক নেতাদের সাহায্যে হাত করিয়া কংগ্রেসী শাসন কায়েম রাখার স্বপ্ন দেখা মোটেই অসম্ভব নয়। সাধারণ নির্ব্বাচনের হুজুগ তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রী নেতারা ব্যালট বাক্সের মহিমা কীর্ত্তন করিতে সুরু করিবেন; ছাঁটাই প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যেখানে সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের সেই সংগ্রাম স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিবেন; এইভাবে ভারতবর্ষকে বিড়লা-ডালমিয়ার "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" এবং মার্কিন ডলারের শ্রেণী-হীন-গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করিবেন!

পাকিস্তানেও অবস্থা তদ্রূপ— জনসাধারণকে শায়েস্তা রাখার জন্য এরোপ্লেন, পল্টন, পুলিস আনসার সবই পুরাদমে ব্যবহার করা হইতেছে। বেশ কয়েক ব্যাটেলিয়ন বেলুচী পুলিস আসিয়া বসিয়াছে খুলনা জেলায়। সেখানে গ্রামে গ্রামে পিটুনী ট্যাক্স বসিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জায়গাতেই ১৪৪ ধারা কায়েম হইয়া রহিয়াছে। গুলি-গোলা, মারপিট কামাই নাই।

কিন্তু কিছুতেই হালে পানি মিলিতেছে না। সারা সীমান্ত প্রদেশে পাঠানিস্তানের দাবীতে গণ-বিক্ষোভ চলিয়াছে। কায়ুম মন্ত্রিসভা সেখানে টলমল করিতেছে! রেলমজুর লিয়াকৎ আলি-দলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া মারমুর্ত্তি হইয়াছে। ডাক-তার বিভাগের কর্ম্মচারীরাও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সারা পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক খাদ্যের জন্য, জমির জন্য, মজুরির জন্য, দমননীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতেছে, বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে। গণ-বিক্ষোভ লিয়াকত আলি-নুরুল আমিনদের তো বটেই টুম্যান-এটলিরও চোখের ঘুম কাড়িয়া নিয়াছে।

মার ও জবাই করার দাওয়াইতে কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া লিয়াকত আলি ইসলামি সমাজতন্ত্রবাদের বুলি ধরিয়াছেন; আর তাহার খালাতো ভাই (!) পাকিস্তান লীগের সভাপতি সাহেব ইসলামিস্তানের বুলি আওড়াইতেছেন। রাজনৈতিক প্রচারের ফল হইতে একটু দেরী হয়; কিন্তু এদিকে শাসকশ্রেণীর বেশামাল অবস্থা।

পশ্চিম পাঞ্জাবে ধনিকদের শিবিরেই গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছে। সেখানকার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, জনাব লিয়াকতের ভাই বেলায়েত আলি খাঁ। কিন্তু এখন লীগ তাহার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। সেখানকার কুখ্যাত লাট সাহেব ছিলেন ফ্রান্সিক মুডী। প্রাদেশিক লীগ তাহার পদত্যাগ দাবী করিয়া বসিল। লিয়াকত একটা ফরমুলা বাহির করিলেন—মুডীও থাকে, প্রাদেশিক লীগের কর্ত্তারাও পোষ মানে। কিন্তু তাহাতে কোন ফায়দা হইল না। মুডী পদত্যাগ করিয়াছেন, পদত্যাগপত্র গৃহীতও হইয়াছে। লিয়াকত আলি পশ্চিম পাঞ্জাবে চূড়ান্ত সংকটে পড়িয়াছেন।

সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাও সঙ্গীন। মানকী শরীফের পীর কায়ুম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। বৃটিশ লাট চলিবে না আওয়াজ উঠিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া সেখানকার লাট সাহেব ডাঙাস ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন, আর ফিরিবেন না।

বেলুচিস্তানে তো আগে হইতেই লীগ-বিরাধী লড়াই তীব্র হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশে লীগ লিয়াকত বিরোধী। পূর্ব্ববঙ্গেও লীগ কাউন্সিলের সভায় লীগের কর্ত্তারা নাজেহাল হইয়াছেন। মাদারিপুর শহরে এক সভা করিতে যাইয়া প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক ও অন্য নেতারা মার খাইয়া ফিরিয়াছেন।

অবস্থা এত চরমে দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গে টাঙ্গাইলের উপনির্ব্বাচনে লীগ প্রার্থী বিষম হারিয়া গিয়াছেন। লীগ পক্ষে ছয় জন মন্ত্রী নির্ব্বাচন প্রচারে

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

মঞ্জিল

শোষণ ব্যবস্থার সংকটের মুখে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট মিতালী

"আভ্যন্তরীণ সংকটের সময়ে, অথবা রাষ্ট্রের বিপদের সময়ে কংগ্রেসের সহিত কোয়ালিশন মোটেই অসম্ভব নয়; কারণ, সোস্যালিস্ট পার্টি যদিও বর্ত্তমান গবর্নমেণ্টকে পরিবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প, তবু কমিউনিজম এবং সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস করিবার কাজে তাঁহারা কংগ্রেস গবর্নমেণ্টকে পুরাপুরি সমর্থন করিবেন" (স্টেটসম্যান ১৯৭-৪৯)।

যুক্তপ্রদেশের সোস্যালিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ দামোদর স্বরূপের এই মন্তব্য হঠাৎ আসে নাই। গত কয়েকদিন যাবৎ নেহরু সরকার এবং সোস্যালিস্ট নেতাদের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, এই মন্তব্য তাহার উপরে সামান্য আলোকপাত করিতেছে।

কাহার সংকট?

সোস্যালিস্ট নেতা দামোদর স্বরূপ যে "আভ্যন্তরীণ সংকট এবং রাষ্ট্রের বিপদে"র কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। তবে, সেই সংকট হইল শাসকশ্রেণী এবং তাঁহাদের ধনিক রাষ্ট্রের। এই সংকট যে কত তীব্র হইয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, দক্ষিণ কলিকাতার উপ-নির্ব্বাচন উপলক্ষে। কংগ্রেস সম্পর্কে জনসাধারণের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটিতেছে; এই জন্যেই এখন সোস্যালিস্ট নেতাদের সহিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের কথাবার্তা চলিয়াছে। দামোদর স্বরূপ মনে করিতেছেন, এই রকমের কোয়ালিশন মোটেই অসম্ভব নয়।

এই কোয়ালিশনের প্রস্তুতি হিসাবে দিল্লীর কংগ্রেসী বড় কর্ত্তারা সোস্যালিস্ট নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে মুক্তি দিয়াছেন; কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী ডাঃ মাথাই সোস্যালিস্ট শ্রমিক নেতা মিঃ অশোক মেহতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন: এমন সমঝদার লোক আর হয় না!

সংকটের মুখে বিড়লা-সোস্যালিষ্ট ঐক্য

সোস্যালিস্ট নেতাদের পক্ষ হইতেও কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের প্রতি কম শুভেচ্ছা দেখানো হয় নাই। পাটনায় সোস্যালিস্ট নেতাদের বৈঠকে কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, আইন অমান্যের উদ্দেশ্য সরকারকে বিপন্ন করা হয়। কলিকাতায় কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী জনগণের আক্রমণে বিপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সোস্যালিস্ট নেতাদের বৈঠক হইতে ঘোষণা করা হয় যে, তাঁহারা কংগ্রেসী শাসকদের উপর আক্রমণ সহ্য করিবেন না; উহা বন্ধ করার জন্যে সর্ব্বত্র ভলান্টিয়ার দল গঠন করিবেন।

সাম্রাজ্যবাদ বা ধনতন্ত্র নয়—কমিউনিজমই সোস্যালিস্ট নেতাদের "সংগ্রামের" প্রধান লক্ষ্য। এবং, এই বিষয়ে টাটা-বিড়লার সহিত তাঁহাদের মতৈক্য অতি চমৎকার। প্রায় এক বছর আগে বিড়লাজীরা তাঁহাদের 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' লিখিয়াছিলেন: পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, কমিউনিজ-এর বিপদের বিরুদ্ধে আমাদের সকলের একত্রে দাঁড়াইতে হইবে।

কিন্তু বিড়লাজীরাও হয়ত জানেন না, সোস্যালিস্ট নেতাদের সহিত তাঁহাদের মতের পার্থক্য কত সামান্য এবং কমিউনিজম-এর জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাহা দিন দিন আরও কত ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এখানে তাহার মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বেভিন-ন্যু-হাতা তাহাদের মিত্র

প্রথমে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেই দেখা যাক। বিড়লাজীরা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব্ব ইয়োরোপের নয়াগণতন্ত্রের বিরোধী। সোস্যালিস্ট নেতারা **সোভিয়েট বিরোধিতায়** বিড়লাজীদেরও ছাড়াইয়া যান, যুগোস্লাভিয়ার বিশ্বাসঘাতক টিটোর গুণগান করিয়া দিনের পর দিন প্রবন্ধ লিখেন (কারণ, টিটো সমাজতন্ত্রের শিবির ত্যাগ করিয়া মার্কিন ডলারের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে)।

ভারত সাম্রাজ্যবাদী কমনওয়েলথ-এ যোগদান করিয়াছে বলিয়া সোস্যালিস্ট নেতারা যে নিন্দা প্রস্তাব পাস করিয়াছেন, তাহার মূল্য কতটুকু? সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনতা' লিখিতেছেন: থাকিন-ন্যু এবং হাতার গবর্নমেণ্টের মত প্রগতিশীল গবর্নমেণ্টকে কমিউনিস্টরা উচ্ছেদ করার চেষ্টা করিতেছে (৩-৭-৪৯)!

সোস্যালিস্ট নেতাদের চোখে থাকিন-ন্যু সরকার "প্রগতিশীল"

কারণ, তাহারা বৃটিশ অস্ত্র লইয়া শ্রমিক-কৃষকের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। বৃটিশ মূলধন এবং ভারতীয় চেট্টিয়ারদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট সেদিনও বর্ম্মায় নূতন করিয়া বৃটিশ মূলধনের ঘাঁটি তৈরী করার জন্যে ১০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করিয়াছে। ষ্ট্রীল ব্রাদার্স এখনো বর্ম্মায় চাউলের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাইতেছে।

হাতা গবর্নমেণ্টও "প্রগতিশীল"

কারণ, তাহারা প্রায় সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আপোষ করিতে রাজী হইয়াছে, মার্কিন ডলারের নিকট সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য বিক্রয় করিয়া দিতে রাজী হইয়াছে।

মালয়ে যে ডাকাতরা গণপতিকে ফাঁসী দিয়াছে, সোস্যালিস্ট 'জনতা' সেই বৃটিশ লেবার পার্টির গুণগানে পঞ্চমুখ। **বৃটিশ লেবার পার্টির নেতারা ভারতীয় সোস্যালিস্ট সম্মেলনে শুভেচ্ছাবাণী পাঠাইতেছেন।** সুতরাং, ইহার পরও যদি কেহ মনে করেন, সোস্যালিস্ট নেতারা সাম্রাজ্যবাদী কমনওয়েলথ-এর বিরোধী, তবে তিনি হয় অন্ধ, নতুবা আত্মপ্রতারণা করিতেছেন।

নেপালে "সংগ্রামে"র স্বরূপ

সাম্রাজ্যবাদের "বিরুদ্ধে" যেমন, সামন্ত তন্ত্রের "বিরুদ্ধে"ও তেমনি। নেপালের রাণাদের "বিরুদ্ধে" পরিচালিত সাম্প্রতিক "সত্যাগ্রহ" তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত। সোস্যালিস্ট নেতা কৈরালার নেতৃত্বে "সত্যাগ্রহ" সুরু হয়; কৈরালা জেলখানায় অনশন সুরু করেন। তাঁহার সমর্থনে ভারতীয় সোস্যালিস্ট নেতারা সর্ব্বত্র সভা করেন। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, কৈরালা রাণার সহিত হাত মিলাইয়াছেন; নেপালী জনগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া "সত্যাগ্রহ" স্থগিত রাখা হইয়াছে।

সোস্যালিস্ট নেতারা দ্বারভাঙ্গায় যখন নেপালী কংগ্রেসে সমবেত হন, তখন মার্কিন দূত লয় হেণ্ডারসন সেই সম্মেলনে শুভেচ্ছা বাণী পাঠান, কংগ্রেস নেতারা যোগদান করেন, সোস্যালিস্ট নেতাদের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, নেপালে "গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা নেহরু গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে আরো বেশী গুর্খা সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন ('নেপাল টু-ডে' দ্রষ্টব্য)।

হায়দরাবাদে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও সোস্যালিস্টদের প্রধান অভিযোগ: নেহরু গবর্নমেণ্টের পুলিস এখনো তেলেঙ্গানাকে দমন করায় যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখাইতে পারিতেছে না। সোস্যালিস্ট নেতাদের এই "সমাজবাদ" এবং বিড়লাজীদের "গণতন্ত্রে"র মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শ্রমিকবিরোধিতায় পঞ্চায়েত—জাতীয় টি-ইউ ঐক্য

অনেকে হয়ত এখনো মনে করিবেন, শ্রমিক-কৃষকের দাবীদাওয়ার ব্যাপারে বিড়লাজী এবং জয়প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। শ্রমিকদের প্রশ্নই ধরা যাক। বিড়লাজীরা লালঝাণ্ডার প্রভাব হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্যে আই-এন-টি-ইউ-সি তৈরী করিয়াছেন; জয়প্রকাশরা তৈরী করিয়াছেন, মজদুর পঞ্চায়েত। উভয়ে দিল্লী দরবারে "শিল্প-শান্তি" রক্ষা করার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; 'উৎপাদন বাড়াও, নতুবা মর'—এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। **ট্রামে, রেলে, বোম্বাই-এর সুতাকলে** যখনই শ্রমিকরা ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে, বোনাস বা মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন—তাহারা উভয়ে একযোগে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রমিকবিরোধী ঐক্য বাড়িবার ফলে জয়প্রকাশনারায়ণ আশা করিতেছেন যে, রেলে আই-এন-টি-ইউ-সি এবং পঞ্চায়েতের পক্ষে এক ইউনিয়নে কাজ করা সম্ভব হইবে। নূতন কমিউনিস্টবিরোধী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘে তাঁহারা উভয়ে একযোগে মার্কিন নেতৃত্ব বরণ করিয়া লইয়াছেন; ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টির কাজে মার্কিন ডলারকে রাজপথ তৈরী করিয়া দিয়াছেন।

মালিক-সোস্যালিস্ট ভাই-ভাই

শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যেকটি সংগ্রামে সোস্যালিস্ট পরিচালিত পঞ্চায়েত এবং বিড়লা পরিচালিত আই-এন-টি-ইউ-সি'র ঐক্য রহিয়াছে। যেখানে ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করেন, বিড়লাজী এবং জয়প্রকাশ একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠেন: উহা রুশ এজেণ্টদের কাজ! এইভাবে কোয়েম্বাটুরে ১০ হাজার সুতাকল শ্রমিক ছাঁটাই-এর ব্যাপারে, নাগপুরে সুতাকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্ম্মঘটে, কলিকাতার ট্রামের ধর্ম্মঘটে, চটকলে এবং লোহাকারখানার ছাঁটাই-এ তাঁহারা একযোগে লালঝাণ্ডার বিরোধিতার নামে শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এবার বোম্বাইয়ে বোনাসের সংগ্রামেও তাঁহার জাতীয় টি-ই-উসির সহিত একযোগে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে শ্রমিকরা নগদ বোনাস না লইয়া ১২ বছরের মেয়াদে কোম্পানীর কাগজ গ্রহণ করে।

ভারতীয় ধনিকদের প্রতিনিধিদের সহিত একমত হইয়া সোস্যালিস্ট নেতা অশোক মেহতা "ন্যায্য মজুরি" কমিটি হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, চটকল প্রভৃতিতে শ্রমিকরা এখন যে মজুরি ও ভাতা পায় তাহাকেই "ন্যায্য" বলিয়া মনে করা যাইতে পারে!

শ্রমিকের বিরুদ্ধে সোস্যালিস্ট কুৎসা

শ্রমিকরা "ন্যায্য" মজুরি পাইতেছে, তবু ভালভাবে কাজ করিতেছে না—ইহা শুধু বিড়লাজীর অভিযোগ নয়, রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নিজে এই অভিযোগ আনিয়াছেন। 'জনতা'য় এক প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, জামসেদপুর লোহা কারখানায় শ্রমিকরা অবসর পাইলেই কাজে ফাঁকি দেয় এবং গল্প করিয়া সময় কাটায়। ইহার পরও কি সন্দেহ করিতে হইবে যে, বিড়লা-জয়প্রকাশ কোয়ালিশন সম্ভবপর নয়?

জমিদারের বন্ধু সোস্যালিস্ট কৃষকদের সংগ্রামের ব্যাপারে

সোস্যালিস্ট-নেতাদের মনোভাব কি তাহা বুঝিবার জন্যে বেশী দূরে যাইতে হইবে না। সম্প্রতি 'জনতা'য় পশ্চিম বংলার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া একজন সোস্যালিস্ট নেতা লিখিয়াছেন—এখানে জোর করিয়া জমি বণ্টনের চেষ্টা হইতেছে। উহা যে "সমাজবিরোধী" কাজ তাহা বুঝাইবার জন্যে ভদ্রলোক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের সোস্যালিস্ট

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধিতে সোস্যালিষ্ট পার্টির মুখোস ছিন্নভিন্ন

নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের প্রস্তাব

দমননীতি ব্যর্থ করিয়া শ্রমিকদের অগ্রগতি

[নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মূল-দাবী-সম্বলিত প্রস্তাবটি গত সংখ্যার অর্দ্ধেক ছাপা হইয়াছিল। উহার শেষাংশ ও 'বেকারদের দাবী' সম্বলিত আর একটি প্রস্তাব এই সংখ্যায় দেওয়া হইল। মঃ সঃ]

রেল এনকোয়ারী কমিটি ঘোষণা করিয়াছে, ওয়ার্কশপে ও লোকোশেডে **বাড়তি শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ৫০ হাজার।** যে সব শ্রমিক অস্থায়ী বলিয়া গণ্য তাহাদের এবং এই বাড়তি শ্রমিকদের ছাঁটাই করার জন্য জাতীয় সরকার প্ল্যান তৈরী করিতেছে।

সমস্ত কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা গত ৩ বছরে ৩ লাখ ৬০ হাজার কমিয়া গিয়াছে। বেকারের সংখ্যা হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে গত ৩ বছরে ২০ লাখ শ্রমিক চাকুরীর জন্য নাম লিখাইয়াছে। কিন্তু চাকুরী পাইয়াছে মাত্র ৫ লাখ শ্রমিক। সুতরাং একমাত্র এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের হিসাবেই বেকারের সংখ্যা ১৫ লাখ।

বিভেদ ও দমননীতি

বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ও তাহাদের জাতীয় সরকার শ্রমিকদের উপর যে হামলা সুরু করিয়াছে, ইহা তাহার একটি দিক মাত্র। আর একটি দিক হইতেছে, শ্রমিকদের বিক্ষোভ দমনের জন্য নানা রকমের কঠোর ব্যবস্থা। রেশনালিজেশন, ছাঁটাই ও মজুরি কাটার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম দমনের জন্য কংগ্রেসী সরকারের হাতিয়ার হইতেছে বাধ্যতামূলক আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল কনসিলিয়েশন বোর্ড, লেবার কোর্ট প্রভৃতি। ইহার উপর ধর্ম্মঘট বে-আইনী করার জবরদস্ত আইন হামেশাই ব্যবহার করা হইতেছে।

শ্রমিকদের সাচ্চা এবং জঙ্গী ইউনিয়ন যাহারা শ্রমিকদের সংগ্রাম পরিচালনা করে; মালিকেরা সেই সব ইউনিয়নকে আর মানিয়া নিতেছে না। শুধু তাই নয়, যে সব ইউনিয়ন শ্রমিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, লড়াই বানচাল করিয়া দিয়াছে, সেই সব বেইমান ইউনিয়নের সাহায্যে মালিকরা শ্রমিকদের একতা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সব কারসাজি করিয়াও শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও সংগ্রাম দমন করিতে না পারিয়া কংগ্রেসী সরকার শ্রমিকদের উপর চরম দমননীতি ও ফ্যাসিস্ট নিপীড়ন চালাইতেছে। শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের, হাজার হাজার সংগ্রামী-শ্রমিকদের বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হইয়াছে। শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য হামেশাই গুলি চালানো হইতেছে।

এমনভাবেই জাতীয় বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ও তাহাদের কংগ্রেসী সরকার শ্রমিকশ্রেণীর উপর বহুমুখী ও পুরা মাত্রায় হামলা চালাইতেছে। আর ধনিকের গদীতে মুনাফার পাহাড় জমিতেছে।

বোম্বাইর সুতাকল মালিকরা গত বৎসর শ্রমিক ও জনসাধারণকে লুট করিয়া ২০ কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের চেয়ে ১৯৪৮-৪৯ সালে এক সুতাকল মালিকরাই শতকরা ৪৪০ ভাগ বেশী মুনাফা করিয়াছে।

এমনিভাবে দেশী-বিদেশী ধনিকরা বুর্জ্জোয়া সরকারের প্রকাশ্য সমর্থনে মেহনতী জনতাকে লুটিয়া অজস্র মুনাফা জমাইয়াছে।

ধর্ম্মঘট-সংগ্রাম

কিন্তু মালিকের এই হামলা শ্রমিকরা মুখ বুজিয়া মানিয়া নেয় নাই। দেশের সর্ব্বত্র শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট সংগ্রাম চালাইয়া এই হামলা রুখিতেছে। দেশে এমন কল-কারখানা খুব কমই আছে যেখানে শ্রমিকরা সংগ্রাম করে নাই।

এই সব ধর্ম্মঘট সংগ্রামের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মূল দাবী, যেমন বাঁচার মত মজুরি, মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি, চাকুরীর স্থায়িত্ব, বিনাশর্ত্তে ও অবিলম্বে নেতাদের মুক্তি প্রভৃতির উপরই সমগ্র ধর্ম্মঘট হইয়াছে। সুতাকলের শ্রমিকই হউক আর ইঞ্জিনিয়ারিং কারাখানার শ্রমিকই হউক, রেলের বা যে কোন কারখানার শ্রমিক হউক, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী বা স্কুল শিক্ষক হউক, সকলেরই লড়াইয়ের ছিল একই দাবী।

ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, গোটা ভারতেই মালিক ও সরকারের হামলা একই ধরনের, এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের শ্রমিকদের সংগ্রাম ও জীবন ধারণের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, ট্রেড-ইউনিয়নের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য, ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্ম্মঘটের রূপ নিতেছে।

এই সব ধর্ম্মঘট সংগ্রামে শ্রমিকরা অপূর্ব্ব বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছে। ৪০ হাজার কোয়েম্বাটুর শ্রমিকদের ৩ মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট, বিহার কয়লা খনি শ্রমিকদের সুদীর্ঘ ধর্ম্মঘট, ৩০ হাজার নাগপুর সুতাকল শ্রমিকদের ২ মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট, ওয়ার্কশপ ও লোকো শেডে রেল শ্রমিকদের গত বছরকার ধর্ম্মঘট, এস, আই, রেল শ্রমিকদের বিরাট সাধারণ ধর্ম্মঘট, ডক শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী, ট্রাম ও বাস শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট, বোম্বের বিভিন্ন সুতাকলের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট, বোম্বের ফায়ারস্টোনে রবার শ্রমিকদের ৩ মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট—এই সমস্ত ধর্ম্মঘট সংগ্রাম শ্রমিকদের অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। ফিরোজপুরের শ্রমিকরা কারখানা দখল করিয়া মালিকদের কারখানা লক-আউটের কারসাজি বানচাল করিয়া দেয়। ধর্ম্মঘট সংগ্রামে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা।

এই সব দাবীর ভিত্তিতেই রেল শ্রমিকরা ৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘট করিতে চাহিয়াছিলেন। ফ্যাসিস্ট নিপীড়নের ফলে রেল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট সাময়িকভাবে দমন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সকল শিল্পের শ্রমিকদেরই মূল দাবী হইতেছে: বাঁচিবার মত মজুরি, মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি, চাকুরীর স্থায়িত্ব ইত্যাদি। এই সব দাবীর ভিত্তিতে দেশব্যাপী সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়াই আজিকার দিনের প্রধান কাজ।

নিঃ-ভাঃ-ট্রে-ই কংগ্রেসের এই ২৩শ অধিবেশনে আমরা ঘোষণা করিতেছি যে: মালিক, সোস্যালিস্ট ও আই, এন, টি, ইউ, সির বিভেদকারীদের সাহায্যে সরকার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের সংগ্রাম সাময়িকভাবে দমন করিয়াছে বটে, কিন্তু শ্রমিকরা এইসব মূল দাবী আদায়ের জন্য অবিলম্বে দেশব্যাপী সংগ্রামের আয়োজন করিবে।

নিম্নতম মূল দাবী

নিঃ-ভাঃ-ট্রে-ই কংগ্রেসের এই ২৩শ অধিবেশন আরও দাবী করিতেছে যে, লাখ লাখ শ্রমিকের মাথার উপর যে বেকারীর খড়্গ ঝুলিতেছে তাহা দূর করিবার জন্য, শ্রমিক যাহাতে তাহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ নিয়া মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারে তাহার জন্য, শ্রমিকদের নিম্নলিখিত দাবী পূরণে মালিকদের বাধ্য করিতে হইবে:

(১) দক্ষ শ্রমিকদের ৮০৲ ও কেরানীদের ১২৫৲ নিম্নতম মজুরি।
(২) মাগ্‌গী ভাতা শতকরা ১০০৲ বৃদ্ধি।
(৩) চাকুরীর স্থায়িত্ব।
(৪) দিন ৭ ঘণ্টা ও সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা শ্রম সময়।
(৫) মজুরি সমেত ১ মাস ২০ দিনের ছুটি এবং বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন।
(৬) সমস্ত অস্থায়ী ও বদলী শ্রমিকদের স্থায়িত্ব।
(৭) বেকারীর বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টি।
(৮) প্রত্যেক শিল্পের শ্রমিকদের ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য মাগ্‌গী ভাতাসহ ৪৷৷০ মাসের বোনাস।
(৯) কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করিবার অধিকার।
(১০) সমগ্র শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মহিলা বন্দী; কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বহুজন সমাজবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদানকারী অন্যান্য দলের বন্দী নেতাদের অবিলম্বে ও বিনাশর্ত্তে মুক্তি।
(১১) ধর্ম্মঘট বে-আইনী করিয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আক্রমণ করিয়া যে সব দমনমূলক আইন করা হইয়াছে তাহার প্রত্যাহার।

এই সব নিম্নতম মূল দাবীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ সংগ্রাম চালাইবে।

ধনিকশ্রেণীর হামলা রুখিতে হইলে এবং এই সব দাবী আদায় করিতে হইলে সমস্ত শিল্পের শ্রমিকদের কর্ত্তব্য হইতেছে, ধনিক ও সরকারের হামলার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক ব্যাপক যুক্ত শ্রমিক ফ্রন্ট গড়িয়া তোলা। নিঃ, ভাঃ, ট্রে, ই, কংগ্রেস ইহার সংগ্রামী ঝাণ্ডার নীচে সমস্ত শিল্পের শ্রমিকদের একজোট করিবে এবং মূল দাবীর ভিত্তিতে দেশব্যাপী সংগ্রামে সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদের শ্রমিকদের একত্র করিয়া এই যুক্ত শ্রমিক ফ্রন্ট গঠনে অগ্রণী হইবে।

সাফল্যের ইহাই একমাত্র গ্যারাণ্টি। নিঃ, ভাঃ, ট্রে, ই, কংগ্রেসের এই অধিবেশন দেশের সমগ্র শিল্পের সমস্ত শ্রমিকদের নিঃ, ভাঃ, ট্রে, ই, কংগ্রেসের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য আবেদন করিতেছে।'

এই সব দাবী আদায়ের জন্য মজবুত ও সংগ্রামী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইউনিয়নের ভিতর সমস্ত শ্রমিককে টানিয়া আনিতে হইবে, প্রত্যেকটি কারখানা ও ওয়ার্কশপের জঙ্গী শ্রমিকদের নিয়া ধর্ম্মঘট ও সংগ্রাম কমিটি গঠন করিতে হইবে, বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের সম্মেলন ডাকিতে হইবে এবং এই দাবীর জন্য তাহাদের সংগ্রামে ডাক দিতে হইবে।

ভারতে এক কোটি শ্রমিক বেকার

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে বেকার সমস্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:

ধনিক ও তাহাদের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার নিল্লজ্জভাবে লাখ লাখ শ্রমিককে বেকারে পরিণত করিতেছে; লাখ লাখ শ্রমিকের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে অনাহার ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ইহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

১৯৪৫ হইতে ১৯৪৭ সালে ভারতের বিভিন্ন কারখানায় ২ লাখেরও উপর শ্রমিককে সরাসরিভাবে ছাঁটাই করা হইয়াছে। গোটা ভারতে কয়েক শত কারখানার কাজ বন্ধ ছিল। যেমন বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে ১৯৪৭-৪৮ সালে মোট ৬,২৮৫টি কারখানার ভিতর ৬১৫টি কারখানা বন্ধ ছিল। ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া যায়।

এই তিন বছরে নেহরু-প্যাটেল কেন্দ্রীয় সরকার অস্ত্রের কারখানার ২৫ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করে; ডকে ৩ হাজার, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় ৫ হাজার ও পোষাকের কারখানায় ৩ হাজার শ্রমিককে চাকুরী হারাইতে হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিল

জাতীয়তা ও শ্রমিক আন্তর্জ্জাতিকতা

['কমিনফর্ম' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অনুবাদ]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যখন দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য রাজ্য বিস্তারের অভিযান প্রকাশ্যেই সুরু করিল, তখন জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম আবার সামনে আসিল। এবার আসিল আরও তীব্রভাবে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে ও ধনবাদের সাধারণ সংকটের যুগে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা ইহাই দেখায় যে, জাতীয়তাবাদের প্রতিটি প্রকাশের মুখোস খুলিয়া ধরিয়া তাহার উচ্ছেদ করিলে এবং শ্রমিক আন্তর্জ্জাতিকতাবাদ দৃঢ় করিলেই এই সংগ্রাম সফল হইবে।

কমরেড স্টালিন বারবার বলিয়াছেন, সমস্ত জাতির মেহনতী জনতার পরস্পরের মিলন ও বিশ্বাসের উপরই শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্য আসিতে পারে; সোস্যালিজম বিভিন্ন দেশের মেহনতী জনতার পরস্পরের মিলন ও ভ্রাতৃত্ব বাড়াইয়া দেয়। সোস্যালিজমের আমলে জাতি মরা তো দূরের কথা, জাতির বিকাশও উন্নত হয়।

বিভিন্ন দেশের মেহনতী জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য বুর্জ্জোয়াশ্রেণী জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়াইয়া মেহনতী জনতাকে দাস বানাইতে চাহিয়াছে। জনতাকে ভাগ করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে, লুণ্ঠনকারী যুদ্ধের উস্কানি দিয়াছে। আজিকার দিনে মার্কিন মনোপলি বুর্জ্জোয়ারা উগ্র জাতীয়তাবাদের পাণ্ডা। এ্যাংলো-স্যাকসন জাতির মহত্ত্ব ও "মার্কিন ধরনের জীবন যাত্রার" মহত্ত্ব প্রচার, এটম বোমার ভয় দেখাইয়া বিশ্ব-প্রভুত্বের দাবী, নিগ্রোদের উপর এবং "কালো আদমী" ও "হীন মার্কিন"দের উপর জুলুম, এই সমস্তই প্রমাণ করে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জার্ম্মান ফ্যাসিস্টদেরই উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

বিশ্ব-প্রভুত্বের পথে যে সব জাতীয় বাধা আছে তাহা ভাঙ্গিবার জন্য মার্কিন মনোপলির দল বুর্জ্জোয়া জাতীয়তারই অপর দিক, বিশ্বমানবতার আদর্শের বুলি কপচাইতেছে।

সোস্যালিজমের সাফল্যের ভয়ে ভীত সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বমানবতার বুলির সাহায্যে দেশভক্তির পবিত্র আগুন নিভাইতে চায়। জনতার জাতীয় চেতনা বিষাক্ত করিতে চায়, স্বাধীনতার সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বল করিতে চায়। সাম্রাজ্যবাদের এই জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতা ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে, সোস্যালিজমের শিবিরকে দুর্ব্বল করা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া দালাল দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট ব্লুম, বেভিন, সারাগাত, সুমাচের, স্পাক প্রভৃতির দল খুব জোরের সাথে এই আদর্শ প্রচার করিতেছে। দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট বিশ্বমানবতাবাদীরা বলে, "জাতীয় স্বাধীনতার কথা আজ একেবারেই অচল।" এই কথা বলিয়া তাহারা মার্কিন কোটিপতিদের কাছে নিজেদের দেশ বেচিয়া দিতেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে "মার্শাল প্ল্যান", সামরিক ক্ষেত্রে "আটলান্টিক চুক্তি", বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে "পশ্চিমী ইউনিয়ন", এই সবই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের জাতীয় স্বাধীনতা হরণ করিয়া মার্কিন তাঁবেদারে পরিণত করিতে সাহায্য করিতেছে।

জনতার গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সুদূর প্রসারী সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন হইতেছে। সেখানে ক্ষমতার গদি হইতে বুর্জ্জোয়াদের হটান হইয়াছে। এই সব দেশে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালরা জনতার গণতান্ত্রিকপ্রথার বিরুদ্ধে, জনতার বর্দ্ধমান মিতালীর বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েটের সাথে মৈত্রীর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতেছে।

জনতার-গণতন্ত্রের শক্তির উৎস কোথায়? সোস্যালিস্ট সম্বন্ধ শক্তিশালী করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার সাথে জনতার গণতান্ত্রিক দেশগুলির সমান অধিকার ও মৈত্রীর ভিত্তিতে নিঃস্বার্থভাবে পারস্পরিক সাহায্য ব্যবস্থা করার ফলে সাফল্যের সাথে সোস্যালিজম গঠন করা সম্ভব। শোষকশ্রেণীকে হটাইয়া একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভব হইতেছে। মরণোন্মুখ শোষকশ্রেণীর অবশিষ্ট প্রতিনিধিরা নয়াগণতন্ত্র ও সোভিয়েটের ভিতর অবিশ্বাস ও শত্রুতার সৃষ্টি করিয়া জনতার গণতান্ত্রিকপ্রথা, শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বুর্জ্জোয়ারা মনে করেন, গণতান্ত্রিক সোস্যালিস্ট শিবির হইতে এদেশ বা সে দেশকে বাহির করিয়া আনিতে পারিলেই তাহারা ধনবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতে পারে। সোস্যালিস্ট গঠন কার্য্যের সাধারণ অগ্রগতি হইতে দূরে সরিয়া থাকা, জাতীয়তার কোটরে আশ্রয় নেওয়া, দেশের ভিতরকার শ্রেণী বিরোধ অস্বীকার করা, দুনিয়ার সব দেশের মেহনতী জনতাকে কাহারা ঐক্যবদ্ধ করিতেছে তাহা দেখিতে অস্বীকার করা, এবং বিভেদকেই জীয়াইয়া রাখা—এই সবই বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ও তাহাদের দালালেরা নিজেদের হৃত শ্রেণী প্রভুত্ব ফিরাইয়া পাইবার উদ্দেশ্যে অধ্যবসায়ের সাথে চালাইয়া যাইতেছে।

যদিও জনতার গণতন্ত্রে বুর্জ্জোয়ারা পরাজিত হইয়াছে, তবু সাফল্যের সাথে নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনে এবং সোস্যালিজমের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে জাতীয়তাবাদই হইতেছে প্রধান বিপদ। সাম্রাজ্যবাদী অনুচরেরা শুধু পেটি বুর্জ্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের এক অংশের ভিতরই নয় পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের ভিতরও জাতীয়তাবাদ উস্কাইবার চেষ্টা করিতেছে। জনতার গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির ভিতরও 'জাতীয়তাবাদের প্রভাব ঢুকিতেছে। এই সব দেশে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বাড়িবার সাথে জাতীয়তাবাদী ঝোঁকেরও প্রকাশ দেখা যাইতেছে। এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জ্জাতিক নীতিকে বুর্জ্জোয়াদের জাতীয় নীতির সাথে একটা বোঝাপড়া করিবার ভাব দেখা যাইতেছে।

যুগোস্লাভিয়াতে টিটো কুচক্রীদের দৃষ্টান্তই পরিষ্কার দেখাইয়া দিয়াছে, জাতীয়তাবাদের পরিণতি কোথায়। এই কুচক্রীরা জাতীয়তাবাদ বরণ করিয়া সমস্ত মূল প্রশ্নে বিপ্লববিরোধী ট্রটস্কীপন্থী নীতি অনুসরণ করিতেছে। ইহা লুকাইবার জন্য তাহারা প্রচার করিতেছে যে, শ্রেণী বিরোধের 'উচ্ছেদ' হইয়াছে। আসলে তাহারাও ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে কুলাকদের (ধনী কৃষক) উপরই নির্ভর করিতেছে।

যুগোস্লাভিয়াকে বুর্জ্জোয়া রিপাব্লিকে পরিণত করিয়া, টিটোপন্থীরা খাঁটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের উপর এবং যাহারা সোভিয়েটের সাথে মিত্রতা চায় তাহাদের উপর নিপীড়ন চালাইতেছে। "যুগোস্লাভিয়ার জাতীয় কাঠামোর" ভিতর সোস্যালিস্ট সংগঠনের কথা চীৎকার করিয়া, বিশ্বাসঘাতক টিটো ও তাহার জল্লাদের দল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ও জনতার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব উস্কাইবার চেষ্টা করিতেছে। জাতীয়তাবাদী টিটো ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হইয়াছে। তাহারা টিটোকে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করিতেছে।

টিটো কুচক্রের বিশ্বাসঘাতকতা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি নিজেদের সভ্যদের ভিতর জাতীয়তাবাদের ঝোঁক সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হইয়াছে। কমিনফর্ম্মের বিখ্যাত প্রস্তাব এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের যুক্ত শ্রমিক পার্টি ও বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের সভ্যদের ভিতরকার দক্ষিণপন্থা সুবিধাবাদী ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি কঠোরভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের গোমুলক ও বুলগেরিয়াতে কস্টোভের ভিতর এই বিচ্যুতি প্রকাশ পায়। ইহারা সোস্যালিস্টবিরোধী জাতীয়তাবাদী ভাব গ্রহণ করিয়া সাংঘাতিক বিপদজনক পথে পা দিয়াছিল।

জাতীয়তাবাদ বুর্জ্জোয়া প্রভাবেরই এক সাংঘাতিক প্রকাশ হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পার্টি মেম্বরদের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করিতেছে।

জাতীয়তাবাদ শ্রমিকের শ্রেণীস্বার্থের বদলে "সাধারণ স্বার্থের" কথা বলে; পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও জনতার ভিতরকার সীমারেখা তুলিয়া দেয়; পার্টি মেম্বরদের চেতনা ভোঁতা করিয়া দেয়। এমনিভাবে জাতীয়তাবাদ পার্টির শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী মুছিয়া ফেলিতে চায়। বুর্জ্জোয়াদের পথে পার্টিকে টানিতে চায়। অর্থাৎ সোস্যালিজমের আদর্শের প্রতি এবং নিজ দেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথে নিতে চায়।

যে সোভিয়েট ইউনিয়ন নয়াগণতন্ত্রের দেশগুলির সোস্যালিজমের সাফল্যের গ্যারাণ্টি, তাহাদের জাতীয় অস্তিত্বের গ্যারাণ্টি, নয়াগণতন্ত্রের দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ সেই সোভিয়েটেরই বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে।

প্রত্যেক কমিউনিস্টের, প্রত্যেক খাঁটি দেশভক্তের প্রকৃত শ্রমিক আন্তর্জ্জাতিকতার মাপকাঠি হইতেছে সোভিয়েট সম্বন্ধে তাহার মনোভাব।

জাতীয়তাবাদের যে কোন প্রকাশের চেহারা কমিউনিস্টরা সর্ব্বত্র নির্ম্মমভাবে প্রকাশ করিয়া দেয় এবং ইহার মূলোৎপাটনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালায়। আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষার উপর কমিউনিস্টরা বিশেষ জোর দেয়। এই জন্য তাহারা শ্রমিক আন্তর্জ্জাতিকতার অগ্রদূত গৌরবময় বলশেভিক পার্টির মূল্যবান অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা নেয়।

সোস্যালিস্টপ্রথা গঠন ও রক্ষার জন্য বিভিন্ন জাতির ভিতর মিত্রতার তাৎপর্য্য যে কত বেশী সে কথা সোভিয়েটের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছে। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক ঐক্য জনতার সমগ্র বিপুল সংগ্রামের সাফল্য নিশ্চিত করিতে পারে। সোভিয়েটের কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা দেখাইয়া দিয়াছে, জাতীয়তাবাদের সমস্ত রকম প্রকাশের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বিভিন্ন জাতির ভিতর মিত্রতা নিশ্চিত করিতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উপর ইতিহাস রায় দিয়াছেন। শান্তি, জনতার মৈত্রী, গণতন্ত্র ও সোস্যালিজমের শিবির কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে জয়লাভ করিতেছে এবং ইহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক আন্তর্জ্জাতিকতার পক্ষে প্রবল সংগ্রাম চালানো এই বিজয় লাভের জন্য অন্যতম প্রধান কাজ।

৭ই জুলাই

সারা-কোরিয়ায় যুক্ত সংগ্রাম

গত মে মাসে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার ১৩টি পার্টি ও ৩৮টি গণ-সংগঠন মিলিত সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, 'সংযুক্ত গণতন্ত্রী ফ্রন্ট' গঠন করা হইবে।

'৫৬ সালে মস্কোতে তিন-শক্তি বৈদেশিক মন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্যই এই ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছে।

মিলিত ফ্রন্ট গত ৮ই জুলাই ঘোষণা করিয়াছে যে, দক্ষিণ কোরিয়া হইতে মার্কিন সামরিক মিশন ও মার্কিন দালালি "জাতিসংঘ কমিশনকে" তাড়াইবার জন্য উভয় কোরিয়ার জনগণকে সমবেত করা হইতেছে।

কোরিয়ার জনগণের গণতন্ত্রী রিপাবলিকের উত্তর অংশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে।

সারা কোরিয়ার গণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠার সময় ১৯৪৬ সালেই ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৫০ সালের ভিতর ইহা করা হইবে।

যে দেশে সঙ্কট নাই, বেকার নাই, উৎপাদন প্রাচুর্য্যে জনতার মান উন্নত

"যুদ্ধের পরের পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে যাহা উৎপাদন করার প্রোগ্রাম ছিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী আমরা উৎপাদন করিয়াছি। এমন কি যুদ্ধের আগে যে হারে উৎপাদন হইত তাহাকেও আমরা ছাপাইয়া গিয়াছি। দিনের পর দিন উৎপাদন বাড়িতেছে। মালের কোয়ালিটি ভাল হইতেছে, দক্ষতার সাথে ও সস্তায় আমরা মাল তৈরী করিতেছি।"

মস্কোর বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকেরা গত ১৬ই জুন স্টালিনকে এই চিঠিখানা লেখেন:

ধনবাদী দুনিয়ার কাছে ইহা চমক লাগার মত কথা। ধনবাদী দুনিয়ায় যখন উৎপাদন কমিতেছে, কারখানা বন্ধ হইতেছে, আর্থিক সংকট সমাজ জীবন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছে, তখন সোস্যালিস্ট দুনিয়া বিজয়গর্ব্বে আর্থিক উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি

গত বছরে প্রথম কোয়াটারের উৎপাদনের তুলনায় এই বছরের প্রথম কোয়াটারে মস্কোর উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ২২ ভাগ। পাঁচশালা পরিকল্পনায় এই কোয়াটারে যা প্রোগ্রাম ছিল তাহার চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ বেশী উৎপাদন হইয়াছে। পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষ বছর ১৯৫০ সালে মাসিক গড় উৎপাদন করার যে প্রোগ্রাম ছিল মস্কোর কারখানার বেশীর ভাগ মালের বেলায়ই এই বছরের এপ্রিল মাসেই সেই হারে উৎপাদন সুরু হইয়া গিয়াছে।

তাই মস্কোর শ্রমিকরা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে স্টালিনকে জানাইয়া দিয়াছেন, "১৯৫০ সালে যে পরিমাণ মাল উৎপাদন করার প্রোগ্রাম ছিল আমরা ১৯৪৯ সালেই তাহা উৎপাদন করিব।"

শুধু মস্কোতেই নয়, গোটা সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্পেই প্রায় এই অবস্থা।

১৯৪৫ সালে সোভিয়েটে যা উৎপাদন হইয়াছে, তাহার চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশী হইয়াছে ১৯৪৬ সালে।

১৯৪৬ সালের চেয়ে শতকরা ২২ ভাগ বেশী উৎপাদন হইয়াছে ১৯৪৭ সালে।

১৯৪৭ সালের চেয়ে শতকরা ২৭ ভাগ বেশী উৎপাদন হইয়াছে ১৯৪৮ সালে।

এমনি করিয়া সোভিয়েটে বছরের পর বছর উৎপাদন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেহেতু এখানে কোন মুনাফার প্রশ্ন নাই, জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যই উৎপাদনের মাপ কাঠি; তাই উৎপাদনের সমস্ত দিকেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতেছে।

যেমন ভারী শিল্পে উৎপাদন বাড়িতেছে; তেমনি বাড়িতেছে হালকা শিল্পে। কলকারখানা তৈরীর শিল্পে (ভারী শিল্প) ১৯৪৫ সালের চেয়ে শতকরা ১৭ ভাগ বেশী উৎপাদন হয় ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৬ সালের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশী হয় ১৯৪৭ সালে। এবং ১৯৪৭ সালের চেয়ে শতকরা ২৬ ভাগ বেশী উৎপাদন হয় ১৯৪৮ সালে।

পাঁচশালা পরিকল্পনার এই তিন বছরে প্রায় ৪ হাজার নূতন কল-কারখানা চালু করা হইয়াছে।

তুলা, পশম, জুতা, মাখন, শস্য প্রভৃতির উৎপাদনও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪৭ সালের চেয়ে ১৯৪৮ সালে তুলার উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ২৫ ভাগ বেশী; পশমের বাড়িয়াছে শতকরা ২৯ ভাগ বেশী; মাখন বাড়িয়াছে শতকরা ৬৭ ভাগ বেশী। জুতার উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ২০ ভাগ বেশী।

আর শস্য উৎপাদন হইয়াছে সাত শত কোটি পুডেরও উপর (প্রায় ১১ কোটি ৪৮ লাখ টন)। ১৯৫০ সালে আট শত কোটি পুড ফসল উৎপন্ন হইবে। **দুনিয়ার ভিতর ফসল উৎপাদনে, বিশেষ করিয়া গম উৎপাদনে সোভিয়েট প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।**

জিনিস সস্তা

সোভিয়েট দেশে এই বিপুল উৎপাদনের সমগ্র ফল ভোগ করে মেহনতী জনতা। গত তিন বছরে জনসাধারণের জীবনের মান অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪৮ সালেই কারখানার ও অফিসের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ১৯৪৭ সালে মুদ্রা সংস্কার করা হয়। রেশনিং তুলিয়া দেওয়া হয়, জিনিসের দর কমান হয়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে দর আরও কমান হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে আবার দর কমান হয়। রুটি, ময়দা, মাখন, মাছ, মাংস, তামাক, কাপড়-চোপড়, তেল-সাবান, বাসন-কোষণ, সাইকেল, ক্যামেরা, রেডিও প্রভৃতির দর শতকরা ১০ হইতে ৩০ ভাগ কমানো হয়।

বলা বাহুল্য যে, জিনিসের দর কমার সাথে সাথে শ্রমিকের মজুরিতো কমেই নাই, বরং বাড়িয়াছে।

সোভিয়েটের সমগ্র শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর মজুরি ১৯৪৭ সালের চেয়ে ১৯৪৮ সালে শতকরা ১০ ভাগ বাড়িয়াছে। শুধু কারখানা শ্রমিকের মজুরি বাড়িয়াছে শতকরা ১৫ ভাগ।

এই অনুপাতে যৌথ খামারের কৃষকদেরও মজুরি বাড়িয়া গিয়াছে। প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ধনবাদী দেশে যখন বেকার শ্রমিকে দেশ ভরিয়া উঠিতেছে, সোভিয়েট দেশে তখন একজনও বেকার নাই। ধনবাদী দেশে যখন নিত্য শ্রমিক ছাঁটাই চলিয়াছে, সোভিয়েট দেশে কারখানায় কারখানায় মজুরের সংখ্যা বাড়িতেছে।

সোভিয়েট দেশে ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭, এই দুই বছরে কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ৪২ লাখ বাড়িয়াছে। ১৯৪৮ সালে আরও ২০ লাখ বাড়িয়াছে। যুদ্ধের আগে ১৯৪০ সালে সোভিয়েটে যত শ্রমিক কাজ করিত ১৯৪৮ সালে তাহার চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশী শ্রমিক কাজ করিতেছে।

জনতার ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবার সাথে সাথে মাল কাটতিও প্রচুর বাড়িয়া গিয়াছে। জনতা মাল কিনিতেছে অনেক বেশী।

১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে রুটির বিক্রি বাড়িয়াছে শতকরা ৫০ ভাগ। চিনি শতকরা ১০০ ভাগ। কাপড় চোপড় শতকরা ৫০ ভাগ। এবং জুতার বিক্রি বাড়িয়াছে শতকরা ৪৫ ভাগ।

আর ধনবাদের কল্যাণে ধনবাদী দেশে সংকট চরমে উঠিতেছে। পয়সার অভাবে গরীব জনতা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনিতে পারে না। ভুখা, নাংগা, অনশনে মৃত্যুর মুখে চলে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি

সোভিয়েট দেশের জনসাধারণ শুধু খাওয়াপরাতেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, তাহাই নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিতেও তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ধনবাদী দেশে যখন গরীবের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, চিকিৎসা নাই, সোভিয়েট দেশে তখন জনতার জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস, থাকিবার বাড়ী প্রভৃতি যথেষ্ট তৈরী করা হইতেছে। ১৯৪৬-৪৮ সালে সোভিয়েটের শহরে মোট ৫ কোটি ১০ লাখ বর্গ মিটার পরিমাণ বাড়ী তৈরী করা হইয়াছে। আর গ্রামে ১৬ লাখ বাড়ী তৈরী হইয়াছে।

এক ১৯৪৮ সালেই হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ২৭ হাজার বাড়ানো হইয়াছে। এবং স্বাস্থ্য নিবাসে ২৮ হাজার লোকের স্থান বাড়ানো হইয়াছে।

সোভিয়েট দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ লাখ। এবং এই বছর মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় সাড়ে তিন কোটি। আর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা মোট ১০ লাখ।

ধনবাদী দেশে যখন ধনিকরা কোন সংকটের সমাধান করিতে না পারিয়া মহাযুদ্ধের আয়োজনে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতেছে। মহাযুদ্ধের আগুনে কোটি কোটি মানুষকে বলি দিবার আয়োজন করিতেছে। সোভিয়েট দেশে তখন জনতার কল্যাণে কোটি কোটি রুবল খরচ করা হইতেছে।

এই বছরের সোভিয়েট বাজেটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক খাতে ব্যয় ধরা হইয়াছে গত বছরের তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ বেশী। মোট ব্যয় হইবে প্রায় ১২ হাজার কোটি রুবল (এক রুবল আমাদের দেশের দশ আনার সমান)। এমনি করিয়া আজ সোভিয়েট দুনিয়ার প্রাচুর্য্য, সম্পদ ও অগ্রগতি দুনিয়ার জনতার মনে আশা-ভরসা ও উৎসাহ জাগাইতেছে এবং ধনবাদী দুনিয়ার মহা সংকট দেউলিয়াপনা দুনিয়ার শোষিত জনতার সামনে নগ্নভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ধনবাদী দেশের জনসাধারণ বুঝিতেছে, যতদিন দেশে ধনবাদ থাকিবে ততদিন সংকট হইতে ত্রাণ নাই। বাঁচিবার আশা নাই। ধনবাদের উচ্ছেদ ও সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠার ফলেই সংকটের অবসান সম্ভব। জনসাধারণের বাঁচিবার ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার ইহাই পথ।

সমৃদ্ধির পথে সোস্যালিষ্ট দুনিয়া

সোস্যালিষ্ট সমাজ গঠনের পথে পূর্ব্ব ইয়োরোপ

ধনবাদী দুনিয়ায় যখন অর্থ-নীতিক সংকটের ছায়া নামিয়াছে, জনতার গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে তখন পূর্ণ উদ্যমে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের কাজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কৃষিতে চরম সংস্কার করিয়া বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্ক, যানবাহন প্রভৃতি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের নিঃস্বার্থ সাহায্যে এই দেশগুলি সোস্যালিজমের পথে পা বাড়াইয়াছে।

চেকোশ্লাভাকিয়া ১৯৪৮ সালে দুই শালা পরিকল্পনা সাফল্যের সাথে শেষ করিয়া জানুয়ারী হইতে পাঁচশালা পরিকল্পনায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের পর এখানকার শিল্পের উৎপাদন দ্বিগুণ হইয়াছে। যুদ্ধের আগের চেয়ে উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বেশী বাড়িয়াছে।

রুমানিয়ায় ১৯৪৯ সালের পরিকল্পনা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রথম ৪ মাসে শিল্পের উৎপাদন পরিকল্পনাকে ছাপাইয়া গিয়াছে।

হাঙ্গেরী ২ বছর ৫ মাসে তিনশালা পরিকল্পনা শেষ করিয়া পাঁচশালা পরিকল্পনা সুরু করিয়াছে।

বুলগেরিয়াতেও দুইশালা পরিকল্পনা শেষ হইয়া পাঁচশালা পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের আগে শিল্পে যাহা উৎপাদন হইত ১৯৪৭ সালে তাহার চেয়ে শতকরা ৫৭ ভাগ বেশী উৎপাদন হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের চেয়ে শতকরা ৩৬ ভাগ বেশী উৎপাদন হইয়াছে ১৯৪৮ সালে।

সমস্ত নয়াগণতন্ত্রেই এমনিভাবে উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে। উৎপাদন

ডলার সম্রাটদের দেশে পৌনে দুই কোটি বেকার ও আধাবেকার

"ডিসেম্বর মাসে যে উৎপাদন কমা সুরু হয়, তাহার গতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। আশা করা গিয়াছিল বসন্ত কালে উৎপাদন বাড়িবে, সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। ভবিষ্যতে উৎপাদন আরও কমিবে।"

ইহা কোন পশ্চাৎপদ দেশের কথা নয়। ধনবাদের সেরা দেশ ডলার মুল্লুকের কথা। মার্কিন পত্রিকা 'ইউনাইটেড এসোসিয়েটেড প্রেসের খবর যে তামার উৎপাদনও যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

সবচেয়ে উৎপাদন কমিয়াছে কয়েকটি বৃহৎ শিল্পে: চামড়া, সুতাকল, রবার, প্রভৃতি শিল্পে।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী কয়েক বছরে যে সময় উৎপাদন সব চেয়ে বেশী হইয়াছিল, তাহার তুলনায় ১৯৪৯ সালের বিভিন্ন উৎপাদন নিম্নলিখিত হারে নামিয়া গিয়াছে:

ডলার; সেখানে ১৯৪৮ সালে ধার দাঁড়াইয়াছে ১৬০০ কোটি ডলার।

অর্থনৈতিক সংকটের আর একটি বড় লক্ষণ হইতেছে ব্যবসায় ফেল পড়া। ১৯৪৭ সালে ফেল পড়া ব্যবসায়ের সংখ্যা ছিল ৩,৪৭৬; ১৯৪৮ সালে দাঁড়ায় ৫,২৫০। বর্ত্তমান বছরের মে মাসের এক সপ্তাহেই ২০৬টি কোম্পানী ফেল পড়ে।

সমস্ত সংকটের বোঝা মার্কিন ডলার সম্রাটরা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে।

প্রতিদিন অজস্র শ্রমিক ছাঁটাই

সংকটের আবর্ত্তে ধনবাদী জগত

স্টেটস নিউজ এণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টস' পত্রিকায় এই মন্তব্য করা হইয়াছে।

ডলার সম্রাটদের স্বর্গরাজ্যেও অর্থনীতিক সংকটের কালোছায়া নামিয়া আসিয়াছে। উৎপাদন কমিতেছে, বেকারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, শ্রমিকের মজুরি কমিয়াছে, মাল কাটতি নাই, স্টক জমিতেছে।

১৯৪৮ সালের অক্টোবরে আমেরিকায় শিল্পজাত মালের উৎপাদন সূচী ছিল ১৯৯। নভেম্বরে ১৯৫তে নামে। ডিসেম্বরে নামিয়া দাঁড়ায় ১৯০। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে ১৮৭, ফেব্রুয়ারীতে ১৮৫, মার্চ্চে ১৮১, এপ্রিলে ১৭৯ এবং মে মাসে নামে ১৭৪-এ।

যেমন ভারী শিল্পে তেমনি হাল্কা শিল্পে উৎপাদন কমা সুরু হইয়াছে। ইউনাইটেড প্রেসের ১০ই জুনের খবরে প্রকাশ, পিটসবুর্গ, চিকাগো প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে ইস্পাতের উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। 'আমেরিকান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ইনষ্টিটিউটের' হিসাব মতে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইস্পাত তৈরীর মোট ক্ষমতার ৮৬'৭ ভাগ উৎপাদন হইতেছে। গত ১০ বছরে এত কম উৎপাদন আর কখন হয় নাই।

জুতার উৎপাদন কমিয়াছে শতকরা ২৪ ভাগ। কাপড়-চোপড় শতকরা ২০ ভাগ। বাড়ীঘর তৈরী কমিয়াছে শতকরা ৫০ ভাগ।

১৯৪৮ সালের মে মাসে ৯৯,৪০০টি বাড়ী তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬ হাজার। আমেরিকার সব স্থান হইতে খবর আসিতেছে যে, বাড়ী কিনিবার বা ভাড়া নিবার ক্ষমতা লোকের নাই। ফলে সর্ব্বত্র শত শত বাড়ী খালি পড়িয়া থাকিতেছে।

ক্রয়ক্ষমতার অভাবে জিনিসপত্রের খুচরা কাটতিও কমিয়া যাইতেছে। ১৯৪৮ সালের প্রথম কোয়ার্টারের তুলনায় ১৯৪৯ সালের প্রথম কোয়ার্টারে মেইল-অর্ডার দোকানের কাটতি কমিয়াছে শতকরা ১৩ হইতে ১৬ ভাগ।

বিক্রির অভাবে কারখানায় অজস্র মাল জমা হইতেছে। ১৯৪৬ সালের তুলনায় শতকরা ১০০ভাগ মাল বেশী জমা হইয়াছে ১৯৪৮ সালে। ৩২০০ কোটি ডলারের মূল্যের মাল পড়িয়া আছে। ধারে বিক্রি বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪৫ সালে যেখানে ক্রেতাদের ধার ছিল ৬৬০ কোটি

হইতেছে। এক জানুয়ারী মাসেই ৭ লাখ শ্রমিক ছাঁটাই হয়। ফেব্রুয়ারীতে ছাঁটাই হয় সাড়ে পাঁচ লাখ শ্রমিক। ট্রেড ইউনিয়নের হিসাব মতে **বর্ত্তমানে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ।**

ইহা ছাড়া আধা বেকারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ।

যাহাদের চাকুরী আছে সেই সব শ্রমিকদেরও মজুরি কাটা হইতেছে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসেই শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মোট মজুরি কাটা হয় ১৭০ কোটি ডলার। জেনারেল মোটর কোম্পানীতে শ্রমিকদের প্রতি ঘণ্টায় ২ সেণ্ট করিয়া মজুরি কাটা হইতেছে। অথচ কোম্পানী মুনাফা লুঠিয়াছে ৮২ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

ধনবাদের স্বর্গে আজ এমনি করিয়াই ফাটল ধরিয়াছে।

ইউরোপের ১৬টি দেশে মার্কিন মনোপলি পুঁজি মার্শাল প্ল্যানে গুঁড় ছড়াইয়া ভাবিয়াছিল আর্থিক সংকটের সমাধান করিবে। কিন্তু সে আশা তাহাদের ব্যর্থ হইতেছে। ইংলণ্ডে সংকট দেখা দিয়াছে। সমগ্র মার্শাল দেশগুলিতে সংকটের ছায়া নামিয়াছে।

বিদেশে মার্কিন মাল রপ্তানী শতকরা ২৩ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

মার্কিন দেশের সংকট মার্শাল দেশগুলিকেও প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছে। প্রতি মাসে আমেরিকা ১৬টি মার্শাল দেশ হইতে যে মাল আমদানী করিত এপ্রিল মাসে তাহার চেয়ে শতকরা ২৭ ভাগ মাল কম আমদানী করিয়াছে। ইংলণ্ড মার্চ্চের তুলনায় এপ্রিলে শতকরা ৩৮ ভাগ কম মাল রপ্তানী করিতে পারিয়াছে। মহাযুদ্ধ বিধ্বস্ত মার্শাল দেশগুলিতে উৎপাদন যুদ্ধের আগের স্তরে উঠিবার আগেই উৎপাদন কমিতে সুরু করিয়াছে। এই সব দেশের পুনর্গঠন শেষ না হইতেই বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। জনতার জীবনের মান অসম্ভব কমিয়া যাইতেছে।

এমনি করিয়া গোটা ধনবাদী দুনিয়া আজ এক মহা সংকটের আবর্ত্তে ডুবিতেছে।

বৃদ্ধির সাথে সাথে জনতার জীবনের মানও এখানে বাড়িয়া চলিয়াছে।

নয়াগণতন্ত্রে কোথাও বেকার নাই, ছাঁটাই নাই। বরং শিল্পে কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে পোলাণ্ডের কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২২ লাখ। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩৮ লাখ।

শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরিও বাড়িয়া চলিয়াছে। হাঙ্গেরীতে ১৯৪৬ হইতে ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি শতকরা ১৩৮ ভাগ বাড়িয়াছে। পোলাণ্ডে মাত্র এক বছরের ভিতরই প্রকৃত মজুরি বাড়িয়াছে শতকরা ৩৫ ভাগ।

জনতার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সর্ব্বত্রই কমান হইতেছে। বুলগেরিয়াতে গত ৯ই মে রেশন রুটির দাম ৫০ লেভা হইতে ২০লেভায় নামানো হইয়াছে। ডিমের রেশন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ধনবাদী আমলে এই সব দেশে মেহনতী জনতার মাথা গুঁজিবার ভাল স্থান ছিল না। আজ নয়া গণতন্ত্রে যথেষ্ট ঘরবাড়ী তৈরী করা হইতেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির জন্যও বিপুল ব্যবস্থা করা হইতেছে। জনতার জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্য-নিবাস, স্কুল, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯৪৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার বাজেটে ১৯৪৮ সালের চেয়ে ১'৬ বিলিয়ন ক্রাউন মুদ্রা বেশী ব্যয় করা হইবে সোশ্যাল ইনসিওরেন্সের জন্য; জনস্বাস্থ্যের জন্য ৩'৮ বিলিয়ন ও শিক্ষার জন্য; ১'৫ বিলিয়ন ক্রাউন। পোলাণ্ডে ৫ লাখ কারখানার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর স্বাস্থানিবাসে কাটাইবার জন্য স্থান করা হইয়াছে।

বুর্জ্জোয়াদের শাসন ক্ষমতা উচ্ছেদ করিয়া জনতার হাতে ক্ষমতা আনিয়া সমাজে আমূল পরিবর্ত্তন করার ফলে এবং সোভিয়েটের সাহায্যে সোস্যালিজমের পথে অগ্রসর হওয়ার ফলেই জনতার গণতন্ত্রে এই বিরাট সাফল্য সম্ভব হইতেছে।

১৭ই জুলাই

ঝাণ্ডা লাল হয় এভাবেই

মে-দিবস....১৯৪৯....

দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র দেশের নাজভীদ জেলের একটি দৃশ্য....কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নকর্ম্মী এবং কিষাণ কর্ম্মীদের যে কক্ষে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে তাহার সম্মুখে আসিয়া পুলিস আর জেলের কর্ত্তারা থমকিয়া দাঁড়াইল। বন্দীরা একি করিতেছে?....

....বন্দীরা তখন ক্ষুর দিয়া নিজেদের দেহ কাটিয়া রক্ত বাহির করিতেছেন।

পুলিস আর জেলের কর্ত্তারা ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

....বন্দীরা নিজেদের দেহ কাটিয়া তাজা টক্‌টকে লাল রক্ত বাহির করিল; একজনের কাপড় ছিঁড়িয়া তাহারই একটি খণ্ড সেই রক্তে ভিজাইয়া তাহাকে লাল করিয়া লইল। তারপর একটি ছোট্ট বাঁশের লাঠির মাথায় সেই লাল কাপড়টিকে লটকাইল।

....এইভাবেই কংগ্রেসী জেলে তৈরী হইল লালঝাণ্ডা—শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী ঝাণ্ডা।

....নিজেদের রক্তেরঞ্জিত এই লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া বন্দীরা মে-দিবস পালন করিলেন—সারা দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে সংগ্রামী ঐক্য ঘোষণা করিলেন।....

তাহারা আওয়াজ তুলিল, "কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ," "লালঝাণ্ডা জিন্দাবাদ"।

....সমস্ত জেলখানার আকাশে বাতাসে এই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

....পুলিস আর জেলের কর্ত্তারা অসহায়ভাবে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাঁশবেড়িয়া চটকলের শ্রমিক জাতীয় টি-ইউ'কে চেনেন

বাঁশবেড়িয়া চটকলের শ্রমিকরা জাতীয় টি-ইউ-এর নেতাদের আর পাত্তা দিতেছেন না। গত ১লা জুলাই ব্যোমকেশ মজুমদার এক সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন; সেই সভাতেই দাঁড়াইয়া লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতা নারাণ সবাইকে জানাইয়া দেন যে, এই ব্যক্তি ও ফণী ঘোষ মালিকের দালালী করিয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে ছাঁটাই ও লক-আউটের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াই বানচাল করিয়া দেয়।

উপস্থিত প্রায় সমস্ত শ্রমিকই ইহার পর সভা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় জাতীয় টি-ইউ-নেতা নাজেহাল হইয়া ফিরিয়া যান।

দালালদের হাল দেখিয়া মালিক নারাণ ও লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের অন্যান্য কর্ম্মীকে ছাঁটাইয়ের হুমকি দিতেছে।

হাওড়ার গ্রামে পুলিস-রাজ

হাওড়া জেলার বড়গাছিয়া থানার ইসলামপুর গ্রাম....

এই গ্রামের উচ্চপ্রাইমারী স্কুলটি এক মাসের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়া এখন এখানে পুলিসের ক্যাম্প বসিয়াছে।

২৫শে জুন এই গ্রামে কৃষক জনতার উপর পুলিস গুলি চালায়। ফলে দেবেন মালিক, পঞ্চু বেরা, গণেশ ভুঞে এবং বারো বছরের বালক কানাই বাগ নিহত হন।

তাহার পর হইতে আটদিন ধরিয়া এই গ্রামের উপর পুলিসের হামলা চলিয়াছে।

কৃষকের ঘরে ঘরে পুলিস

২৬শে জুন সকাল ১০টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত দেড় শতাধিক সশস্ত্র পুলিস এই গ্রামটির উপর আক্রমণ চালায়। গ্রামের মধ্যে পুরুষদের না পাইয়া পুলিসেরা মেয়েদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে এবং ঘরের মধ্যকার জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলে। ভদ্রেশ্বর বেরার বাড়ীতে ঢুকিয়া ইহারা চারিটি ঘরের সমস্ত লেপ, কাঁথা, বালিশ, জামা-কাপড় হিঁড়িয়া উঠানে জমা করে এবং জলের জালাটি আনিয়া তাহার উপর ভাঙ্গিয়া দেয়; পরে জুতা দিয়া মাড়াইয়া ছেঁড়া লেপকাথাগুলি কাদার সহিত মিশাইয়া দেয়। বিভিন্ন রকমের বীজ ধান, বীজ কলাই প্রভৃতি একসাথে মিশাইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেয়। বাসন, হারিকেন, বেঞ্চ, টুল, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলে; টাকাপয়সা, দামী জিনিসপত্রগুলি চুরি করিয়া নেয়। এইভাবে ইহারা ত্রিশটি চাষীর বাড়ার জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া দেয়। কৃষককর্ম্মীদের ধরিবার জন্য ইহারা প্রত্যেকটি বাড়ীর ঝোপজঙ্গল পর্য্যন্ত তন্নতন্ন করিয়া তল্লাসী করে, কিন্তু কোথাও ইহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

পুলিসের রাজত্ব

পরের দিনও সমস্ত গ্রামে তল্লাসী চলে, কিন্তু কাহাকেও ধরিতে না পারিয়া ইহারা দালালদের মারফৎ চাষীদের, বিশেষ করিয়া বৃদ্ধদের একটি মিটিংএ টানিয়া আনিয়া জড় করে; সেখানে তাহাদের কৃষক নেতাদের ধরাইয়া দেবার প্রলোভন দেখানো হয়। কিন্তু ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় ইহারা বৃদ্ধদের পিটাইতে সুরু করে। রতন কামার ৮০ বছরের বৃদ্ধ—তাহার চারজন ছেলের একজনকেও ধরিতে না পারিয়া তাহার উপরই প্রচণ্ড মারপিট করা হয়। বৃদ্ধ পরেশ্টস ম্যান গিরিশ সাউ ও তাঁহার দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করিয়া বেদম মার দিয়াছে; দালালদের সহায়তায় ইহারা ডাঃ পূর্ণ ভুঞেকে গ্রেপ্তার করিয়া মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। ১৬ বছরের বালক বিজয় ঘোষ ও পুলিসের এই মার-পিটের হাত হইতে রেহাই পায় নাই।

এইভাবে আটদিন ধরিয়া অত্যাচার চলিয়াছে। এখন গ্রামে পুলিসের রাজত্ব।

পুলিসেরা চাষ-আবাদ বন্ধ করিয়া দিয়া চাষীদের কাঁধে কংগ্রেস ঝাণ্ডা বাঁধিয়া দিয়া জোর করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরাইতেছে; যে-কোন লোককে দিয়া ইহারা খুশীমতন কাজ করাইয়া লইতেছে; পুকুর হইতে মাছ ধরিতেছে, ছাগল কাড়িয়া নিয়া ভোজ খাইতেছে।

প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়া তাহারা জানাইয়া দিতেছে যে, গ্রামে এখন তাহাদেরই রাজত্ব।.....

* * * *

মাশিলা

হাওড়া জেলার আর একটি গ্রাম মাশিলা।.....

এই গ্রামটি আব্দুল ইউনিয়নের অন্তর্গত। কয়েক মাস আগে এই মাশিলায়-ই পুলিস গুলি চালাইয়া নারী-পুরুষ সমেত আট জন কৃষককে হত্যা করিয়াছে। এই অঞ্চলের কৃষকেরা জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের জন্য, মজুরি বৃদ্ধি ও খাজনার জন্য ব্যাপক আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন।

সেবাদল আর পুলিসের আক্রমণ

২৯শে জুন ভোর বেলা ৪০।৫০ জন কংগ্রেসী সেবাদল আর ১০।১২ জন সশস্ত্র পুলিস এই গ্রামের উপর আক্রমণ চালায়। কৃষকদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের উপর বর্ব্বর জুলুম চালানো হয়—অশ্লীল ভাষায় তাহাদের গালাগালি দেওয়া হয়। কৃষকদের ব্যবহারের জিনিস কুড়ুল, কাটারী বটি সব লুট করিয়া লয়—মেয়েরা বাধা দিতে আসিলে কুড়ুল কাটারী লইয়াই সেবাদলের লোকেরা তাহাদের তাড়া করে। কৃষকদের বাক্স ভাঙ্গিয়া ইহারা টাকাপয়সা আত্মসাৎ করে—ঘেটু রায়ের মেয়ের বিবাহের জন্য অতিকষ্টে সঞ্চিত ২০০৲ টাকা, কুনু কোলের পান বিক্রীর ১০৲ টাকা ইহারা কাড়িয়া নেয়। কৃষককর্ম্মীদের ধরিবার জন্য ইহারা পাটক্ষেতগুলি তছনছ করিয়া ফেলে। এই আক্রমণের সময় রাস্তাঘাটে ইহারা যাহাকে পাইয়াছে তাহাকে বেদম প্রহার করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। মারের ফলে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে।

কংগ্রেস সেবাদলের লোকেরা এখন হাটেবাজারে কৃষকদের একলা পাইলেই মারধর করিয়া গ্রেপ্তার করিতেছে। কৃষকদের উপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিয়া তাহাদের জোর করিয়া কংগ্রেস সেবাদলে নাম লিখাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কোথাও তাহারা সফলকাম হইতে পারিতেছে না।

বেঙ্গল জুটমিলে ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া পাওনা আদায়

লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতৃত্বে লড়াই চালাইয়া শিবপুরে বেঙ্গল জুটমিলের ৫ হাজার শ্রমিক 'প্রিভিলেজ লীভ' বাবদ পাওনা ৫ দিনের মজুরি আদায় করিয়া নিয়াছেন।

১লা, ২রা, ৪ঠা ও ৭ই জুলাই—এই চার দফায় হাজার হাজার শ্রমিক ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া তবে পাওনা আদায় করিয়াছেন। ম্যানেজারের টালবাহানায় ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা ৭ই জুলাই স্পষ্ট জানাইয়া দেন যে, তখুনই পাওনা না মিটাইলে তাহারা এলেনবেরির পথ ধরিতে বাধ্য হইবেন। তাহাতে ফল ফলে, তখুনই কিছু শ্রমিকের এবং তখনকার প্রতিশ্রুতি মত বাকিদের পাওনা ৯ই জুলাই মিটাইয়া দেওয়া হয়।

ট্রাইব্যুনালই মজুরিসহ বছরে ১৫ দিনের 'প্রিভিলেজ লীভ' স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ১০ দিনের মজুরি দিয়াই বসিয়াছিল। শ্রমিকের জঙ্গী মেজাজ দেখিয়া তাহারা আর টালবাহানা করিতে ভরসা পায় নাই।

ছাঁটাই নাকচ

ইতিমধ্যে ৫ই জুলাই, কোন কারণ না দেখাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ হঠাৎ ২ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করিয়া দেয়। ৬ই লালঝাণ্ডার ডাকে মিল ফটকের এক সভাতেই দেড় হাজার শ্রমিক এই জুলুমের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ গর্জ্জন তোলেন। ছাঁটাই শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে কাজে ফিরাইয়া নেওয়া হয়।

হাওড়া মিল ও শিবপুর মিলে এই পাওনা আগেই আদায় হইয়াছে। বেঙ্গল জুটমিলে লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন ছিল না বলিয়া মালিক শ্রমিকদের এতদিন হয়রান করিতে পারিয়াছে।

'সীক লীভে'র মজুরি

দিতেও মালিক এযার আর গড়িমসি করিতে সাহস পায় নাই; আগে ইহার জন্য শ্রমিকদের অনেক বেগ পাইতে হইত।

এক সপ্তাহ বন্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

গত ৯ই জুলাই শিবপুর মিলের কর্ত্তৃপক্ষ এক সপ্তাহের জন্য মিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফলে, শ্রমিকদের ভিতর তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

মাসে এক সপ্তাহ মিল বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে **হাওড়া ও বেঙ্গল মিলের শ্রমিকরাও** ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রতিদিন মিলের ফটকে ও বস্তিতে সভায় এই সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলিয়াছে।

প্রতিদিন বহু শ্রমিক আসিয়া লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের সদস্য হইতেছেন।

বস্তিতে বস্তিতে পুলিসের টহল চলিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সভ্যসংগ্রহ বা সভার অনুষ্ঠান কমে নাই।

[৪র্থ কলমের পর]

সন্ধ্যার অন্ধকারে দুই শত সশস্ত্র পুলিস এই মিছিলের উপর আক্রমণ চালায় এবং মিছিলটি ভাঙ্গিয়া দেয়। মিছিল হইতে পুলিসেরা তিন জন কৃষক মহিলা ও দুই জন কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিস আরো ২০ জন কৃষকমহিলা ও কৃষককর্ম্মীকে ধরিবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছে।

বজবজে ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে—

বজবজে ২৯শে জুন জেলে রাজবন্দীদের উপর সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে শ্রমিক, ছাত্র ও মহিলারা ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করেন। প্রথমে তাঁহারা চটকলের গেটে সভা করেন এবং সেখান হইতেই এক হাজার শ্রমিকের শোভাযাত্রা বাহির হয়।

৭ই জুলাই আবার তাহারা ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করেন। মিল গেট হইতে বাহির হইয়া শোভাযাত্রা কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর একদল সশস্ত্র পুলিস আসিয়া শোভাযাত্রার অগ্রগতির পথে বাধা দেয় এবং শোভাযাত্রার পুরোভাগ হইতে তিন জন মহিলাকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে।

কাকদ্বীপে—

কাকদ্বীপের রাধানগর ও দুর্গাপুরে জমিদার-জোতদারের কৃষক-কর্ম্মীদের চাষ-আবাদের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া নিয়াছে। সেবাদল গুণ্ডার সর্দ্দার কোকিল খাঁ আর ভুবন মণ্ডল কৃষককর্ম্মীদের ধরিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কাহাকেও ধরিতে না পারিয়া তাহারা এখন হতাশ হইয়া পড়িতেছে।

গত ১০ই আষাঢ় ৫ জন পুলিস লইয়া দালাল ভুবন মণ্ডল রাধানগরে আসে। তাহারা জোর করিয়া একজন কৃষকের পুকুর হইতে মাছ ধরিয়া এবং আর একজন ছাগল নিয়া খায়। কৃষকদের তাহারা পুলিস ক্যাম্পে মাছ লইয়া যাইতে বলে। কিন্তু কৃষকদের নিকট হইতে তাহারা কোনরূপ সাড়া পায় না। কোকিল খাঁর নেতৃত্বে সেবাদল গুণ্ডারা শতচেষ্টা করিয়াও কৃষকদের মধ্যে কোনরকম ভেদ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বরং কৃষকদের সংঘশক্তি দেখিয়া আজ সেবাদলের মধ্যেই ভয় ঢুকিয়াছে। দালাল ভুবন মণ্ডল এখন শান্তির কথা বলিতেছে—কোনরকমে একটা আপোষ করা যায় কিনা তাহার ধুয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, 'কৃষকের সংগ্রামে আপোষ নাই।'

মালদহে মিহির দিবসে পুলিসের হামলা

২৬শে জুন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মালদহের কমিউনিস্ট নেতা মিহির দাসের অনশনে মৃত্যু ঘটে। মালদহ শহরে এই সংবাদ পৌঁছানো মাত্রই ২৭শে জুন মালদহের শ্রমিক ও ছাত্ররা শোভাযাত্রা বাহির করেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

১লা জুলাই নঘরিয়া, অমৃতি, বোস্তিপুর, ভূতিডারি প্রভৃতি গ্রামে কৃষকেরা শহীদ মিহির দিবস পালন করেন। চারিশত মহিলা ও পুরুষের একটি মিছিল "মিহিরের হত্যার জবাব চাই", "বিধান মন্ত্রিসভার অবসান চাই" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে সরকারের দালাল জমিদারদের উচ্ছেদও দাবী করা হয়।

[৩য় কলমে দেখুন]

মল্লিল

অষ্ট্রেলিয়া সরকারের শ্রমিক-বিরোধী যুদ্ধবাদী নীতি

অষ্ট্রেলিয়ার কয়লাখনিগুলির ২৩ হাজার শ্রমিকের শক্তিশালী ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য অনেক রকমের চেষ্টা চলিয়াছে।

১(ক) ওখানকার শোষক-মালিকদের রক্ষা করিবার জন্য নেহরু-প্যাটেল সরকার কয়লা পাঠাইতেছেন;

(খ) অষ্ট্রেলিয়ার সরকার আইন করিয়াছে যে, কোন ইউনিয়ন ধর্ম্মঘটীদের অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে না। অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘটী খনি শ্রমিকদের সাহায্য করিবার জন্য অর্থ নিয়া আসিলে তাঁহাদের জেলে পোরা হইতেছে, তাঁহাদের অর্থ আটক করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য সমস্ত রকমের খনিশ্রমিক, লোহা শ্রমিক, ডক শ্রমিক ও বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকরা তাঁহাদের ইউনিয়নের তহবিল হইতে ধর্ম্মঘটীদের সাহায্য করিবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তোলেন। সেই অর্থ সালিশী আদালতের হাতে জমা দিতে অস্বীকার করায় লোহা শ্রমিক ইউনিয়নের দুই জন নেতাকে তাহারা জেলে পুরিয়াছে।

গত ৮ই জুলাই এই জুলুমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিল্পের হাজার হাজার শ্রমিক কোর্টের সামনে আসিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ফ্যাসিস্ট সরকার দেশের সমস্ত অঞ্চল হইতে তাড়াতাড়ি পুলিস আনিয়া ফেলে।

(২) ধর্ম্মঘটীদের জন্য সাহায্য বন্ধ করিবার জন্য পুলিস গত ৮ই জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে হানা দেয়। ৩॥০ ঘণ্টা তল্লাসী চালাইয়া তাহারা বহু পুস্তকাদি লইয়া যায়।

বহু সহস্র বিক্ষুব্ধ মানুষ তখন কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের সামনে জমায়েত হয়।

(৩) গুণ্ডা লাগাইয়া ধর্ম্মঘটের নেতাদের ভীতি প্রদর্শন ও হত্যার চক্রান্ত চলিতেছে। গত ৩০শে জুন গুণ্ডারা খনি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ইদ্‌রিস ইউলিয়মসকে চিঠি লিখিয়া হুমকি দেয় যে, ৫ই জুলাইয়ের ভিতর ধর্ম্মঘট শেষ না করিলে তাঁহাকে খুন করিবে। উইলিয়মস্ বলেন যে, কোন গুণ্ডাগিরি এই ধর্ম্মঘটকে ভাঙ্গিতে পারিবে না।

পারেও নাই। সরকারী ফ্যাসিস্ট "আইন" পুলিস, গুণ্ডা ও ভারত সরকারের 'স্ট্রাইক ভাঙা কয়ল'—কিছুই অষ্ট্রেলিয়ার খনি শ্রমিকদের দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। বরং আরও বেশী শ্রমিক জঙ্গী কায়দায় ধর্ম্মঘটীদের সমর্থনে আগাইয়া আসিতেছে।

ব্যাপক যুদ্ধ-প্রস্তুতি

অষ্ট্রেলিয়ার সরকার খনিশ্রমিকদের দাবী, শিল্পজাতীয়করণ, কাজের সময় কমানো ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য অর্থ না দিয়া ফ্যাসিস্ট জুলুম চালাইতেছে; কিন্তু, দেশের "রক্ষাব্যবস্থার" নামে তাহারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে সোভিয়েটবিরোধী ও এসিয়ার মুক্তি সংগ্রামের বিরোধী যুদ্ধের জন্য বহু কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিতেছে।

১৭ই জুলাই ১৯৪৭ সালে তাহারা যে পাঁচশালা সামরিক পরিকল্পনা চালু করে তাহার জন্য গত ৫ই জুলাই আরও ৪॥০ কোটি পাউণ্ড বরাদ্দ করিয়াছে। এই প্রথম নয়। ফৌজ, বিমান, নৌবাহিনী এবং নূতন নূতন মানুষমারা অস্ত্র তৈয়ারীর জন্য তাহারা এই পরিকল্পনার জন্য ইতিপূর্ব্বে সুরুতেই ২৫ কোটি ও '৪৯ সালে আরও ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে।

সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়ার যুদ্ধবাদী সরকার নিতান্ত ফ্যাসিস্ট কায়দায় এইভাবে যুদ্ধ-প্রস্তুতি চালাইতেছে।

আগামী ৫ বৎসরে সামরিক খাতে আরও ৫০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিবার পরিকল্পনাও তাহারা তৈরী করিয়া রাখিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধঘাঁটি গড়াই লক্ষ্য

দেশরক্ষা মন্ত্রী ডেডম্যান নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়াকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করাই এই পরিকল্পনার আশু লক্ষ্য।

এই জন্য কতকগুলি বিরাট অঞ্চলে নূতন রকমের বোমা, রকেট ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা চলিতেছে, ইঙ্গ-মার্কিন খুনী বিজ্ঞানীরা তাহার পরামর্শদাতা ও পরিচালক। এইসব অঞ্চল কড়া সামরিক পাহারায় সুরক্ষিত—খুনীদের এই সব গোপন রাজত্বে বিজ্ঞানীদের ভিতরও বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা প্রবেশ করিতে পায়।

মার্কিন সরকারও অষ্ট্রেলিয়ার এই সামরিক তোড়জোড়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছে। গত যুদ্ধে মার্কিন নৌবহর যে মানুস দ্বীপ ব্যবহার করিয়াছিল, সেখানে যত রকমের সামরিক সাজসরঞ্জাম ছিল, সবই অষ্ট্রেলিয়ার সরকারকে দিয়াছে। দয়াদাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়। মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করিবে। মানুস্ দ্বীপে ঘাঁটিটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্য ছাড়িয়া দিতেও আপত্তি নাই—অষ্ট্রেলিয়ার সরকার তাহা সরকারীভাবেই জানাইয়াছে।

এসিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে

দুনিয়াজোড়া নূতন যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঠিক অতলান্তিক যুদ্ধ-জোটের ছাঁচে একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধজোট গড়িয়া তুলিতেছে। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে সামরিক প্রাধান্যের জন্য অষ্ট্রেলিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার সরকারই ঐ জোট গঠনের জন্য সবার বেশি সোরগোল তুলিয়াছে।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্রগুলি বেশ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিতেছে যে, চীন, ভিয়েৎনাম, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের মুক্তিসংগ্রামের যে জোয়ার উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ভারত-মহাসাগরীয় ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাহাদের শোষণের স্বর্গ বজায় রাখিবার জন্যই এই সব সামরিক ব্যবস্থা।

এই পরিকল্পনার কামানের খোরাক অর্থাৎ সৈন্য যোগাইবার ভার দেওয়া হইতেছে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে। অষ্ট্রেলিয়া হইবে অস্ত্রাগার। "সিডনি মর্নিং হেরাল্ড" পত্রিকা ২৪শে এপ্রিল লিখিয়াছে—স্থলবাহিনীর প্রায় সমস্ত সৈনিকই দিবে ভারত ও পাকিস্তান সরকার; প্রধানত অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডই নৌ ও বিমানবাহিনীর সৈনিক যোগাইবে।

ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই অষ্ট্রেলিয়ার সরকার খনিশ্রমিকদের মজুরি না বাড়াইয়া যুদ্ধের জন্য কোটি কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিতেছে। ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়া পতিদের খুশি করিবার জন্যই তাহারা কয়লা শিল্প জাতীয়করণের বদলে শ্রমিক ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির উপর পুলিস লেলাইয়া দিতেছে।

ইন্দোনেশিয়ায় গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি

"ইন্দোনেশিয়ার মাউন্টব্যাটেন," ডাচ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি ভ্যান রয়েন, মার্কিন পত্নী হাতা কোম্পানীকে দ্বীপান্তর হইতে ফিরাইয়া আনিয়া যোগজাকার্ত্তায় "স্বাধীন" রাজত্বের গদীতে বসাইয়া দিয়াছে। সেদিনও রিপাব্লিকের লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষ—বর্ত্তমানে যোগজাকার্ত্তাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে ২০ মাইল পর্য্যন্ত হাতার রাজত্ব সীমাবদ্ধ, ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ২৫ লক্ষ। তবুও গত ডিসেম্বর মাস হইতে "বন্দী" হিসাবে ডাচদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া জনগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হাতা ৭ই মে'র চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন নির্দ্দেশে ঘোষণা করিয়াছিল—ডাচ দস্যুদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ বন্ধ কর! এই মূল্য দিয়া হাতা তাহার "রাজত্ব" ফিরিয়া পাইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার জনগণ একেবারে একবাক্যে হাতার এই গোলামীর চুক্তি বর্জ্জন করিয়াছে—জাভা ও সুমাত্রায় কেবল নয়, সারা-ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেকটি দ্বীপে আরও ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের জোয়ার ছুটাইয়া হাতার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত জবাব দিয়াছে।

৭ই মে'র বিশ্বাসঘাতক চুক্তির প্রতিবাদে 'ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিকের জাতীয় গণতন্ত্রী ফ্রন্ট।'

জাতীয় গণতন্ত্রী ফ্রন্ট

"মার্কিন পত্নী হাতা-জোটকে' যোগজাকার্ত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এবং এসিয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়াকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিবার" প্রতিবাদ করিয়া **"ইন্দোনেশীয় রিপাবলিকের গণতন্ত্রী ফ্রন্ট"** প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 'ওয়ার্কার্স-পার্টি,' (শ্রমিক দল) পেজেণ্ট পার্টি (কৃষক দল), সমাজতন্ত্রী যুব-সংগঠন এবং অন্যান্য দল ও গ্রুপ লইয়া গঠিত এই গণতন্ত্রী ফ্রন্টের ডাকে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিকামী জনগণ আরও দৃঢ়তার সহিত ডাচ সাম্রাজ্যবাদী দস্যু আর বিশ্বাসঘাতক হাতা-জোটের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ চালাইতেছে।

আরও নূতন নূতন অঞ্চলে লড়াই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ বাহিনীর অধিনায়ক পর্য্যন্ত গত ২২শে মে বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, **যে-সব অঞ্চল "বহুকাল যাবৎ শান্ত ছিল" সে-সব জায়গাতেও গেরিলা যুদ্ধ সুরু হইয়াছে।** জাভার মালাঙ্গা, সুরাকার্ত্তা, চেরিবনা, যম্বাঙ্গা, মদিওকার্ত্তা, বানিডমাস প্রভৃতি জেলায় গেরিলা প্রতিরোধের শক্তি ও তীব্রতা আরও বেশি। খাস যোগজাকার্ত্তায়ই ডাচ দস্যুরা কোনদিন শান্তি পায় নাই। পুতুল সুলতানও সেদিন একথা বলিয়াছে, মেয়েরাও গেরিলা-বাহিনীর সৈনিক।

সুমাত্রার একটি বিরাট অংশ ডাচ দস্যুদের কবলমুক্ত হইয়াছে। এখানে গণতন্ত্রী ফ্রন্টের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাপক প্রতিরোধ

অন্যান্য সর্ব্বত্র চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট সামরিক সন্ত্রাসবাদ সত্ত্বেও জনগণ সর্ব্বতোভাবে গেরিলাবাহিনীকে সাহায্য করিতেছে। সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুরাবায়া-মালাং রেলপথ ও বাটাভিয়া-চেরিবন রেলপথের উপর সর্ব্বক্ষণ গেরিলা আক্রমণ চলিতেছে।

ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম মুখপত্র 'মাসবোদে' পত্রিকা মে মাসের শেষে আক্ষেপ করিয়াছে: "জাভার অবস্থা দু'বছর আগে অপেক্ষাও খারাপ—সামরিক আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।"

হাতা জোটের বিশ্বাসঘাতকতা জনগণকে দলে টানিতে পারে নাই। জনগণ বরং আরও বেশি দৃঢ়তার সহিত আরও বেশি সংখ্যায় মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়াছে।

মঞ্জিলের টাকা ও চিঠি প্রেরণের ঠিকানা

হরিনারায়ণ সাহা

২৪ নূর মহম্মদ লেন,

কলিকাতা (৯)

'নেহরু বিরোধী' বিক্ষোভের তিনটি দিন

শালকাঠের শক্ত বেড়ার খোপগুলির মধ্যে জনসাধারণকে পুলিস-ঘেরা অবস্থায় রাখিয়া এবং সাধারণ মানুষ হইতে প্রায় পাঁচশত গজ দূরে ১৮ ফুট উঁচু মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ১৪ই জুলাই কলিকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। সভামণ্ডপ তৈয়ার করার জন্য প্রাদেশিক সরকার ১৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কলিকাতার পুলিস ছাড়াও পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে সশস্ত্র পুলিসের বিরাট সমারোহ করা হয়। তাহাছাড়া 'সাদা পোষাকের' গোয়েন্দা ও সেবাদলের লোকেরা পাবলিকের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে থাকে।

পণ্ডিত নেহরুর ১৮ ফুট উঁচু মঞ্চের নীচে বিরাট ফাঁকা জায়গা, তারপর হোমরা-চোমরা সরকারী কর্ম্মচারী; 'বিশেষ নিমন্ত্রিতে'র দল ও কংগ্রেসী এম-এল-এ এবং প্রাদেশিক কমিটি সভ্যদের বিশেষ বিশেষ আসন।

শিল্পাঞ্চল হইতে মিল মালিকদের লরীতে চাপাইয়া জাতীয় টি-ইউর নেতৃত্বে একদল অনুগত মানুষকেও জড়ো করা হয়। বড়বাজারের ব্যবসায়ী মহলও তোড়জোড় করিয়া সভার হাজির হয়।

পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতামঞ্চে উঠিবার সময় 'জয় জহর' বলিয়া ধ্বনি দিবার চেষ্টা কোন কোন মহল হইতে তুলিলেও একেবারেই কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটি বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ শ্রুত হয়। বহুলোক মনে করেন, উহা বুঝি তোপধ্বনি। কিন্তু ক্রমেই জানা যাইতে থাকে বোমা ফাটিয়াছে। সভামঞ্চ হইতে পরে ঘোষণা করা হয়, বোমা বিস্ফোরণের ফলে একজন পুলিস মারা গিয়াছে।

নেহরুর সভাস্থলকে নিরুদ্বিগ্ন করার জন্য পূর্ব্ব হইতেই মহানগরী ও শিল্পাঞ্চলের চারিদিকে সরকারী তৎপরতা বাড়িয়া গিয়াছিল। ৩ দিনে প্রায় ১০শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং প্রায় ১০টি স্থানে জনতার উপর লাঠি চার্জ্জ ও গুলি বর্ষণ করা হইয়াছে।

মিটিং ভবুও জমে নাই

'বিশেষ নিমন্ত্রিত'দের আসন ছাড়াইয়া জনসাধারণ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিছু সময় যাইতে না যাইতেই 'ফ্যাসিস্ট নেহরু ফিরিয়া যাও' বলিয়া সেখানে তুমুল বিক্ষোভ সুরু হয়। কালো পতাকার অভাবে ছাতাগুলি উর্দ্ধে তুলিতে থাকে। মঞ্চকে লক্ষ্য করিয়া জুতা নিক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। মঞ্চের অপেক্ষাকৃত পাশে সমবেত মহিলাদের মধ্য হইতেও 'নারী-হন্তাদের ক্ষমা নাই' বলিয়া বিক্ষোভ সুরু হয়।

পণ্ডিত নেহরু যে কোন বিরোধিতাকেই 'কমিউনিস্ট' 'হাঙ্গামাসৃষ্টিকারী' প্রভৃতি বলিয়া নিজের দলের লোকদের তাঁহাদিগকে নিজ হাতেই শায়েস্তা করার জন্য উত্তেজিতভাবে বলিতে থাকেন। 'সাদা পোষাকের' লোকেরা প্রস্তুতই ছিল। তাঁহারা মারামারি সুরু করে। জল বিতরণের জন্য সেবাদলের গাড়ী হইতেও লাঠি বাহির হইতে থাকে।

পণ্ডিত নেহরু এত সময় বলিতেছিলেন পুলিস যাইবে না, জনসাধারণই শান্তি দিবে। কিন্তু সাদা পোষাকের লোকেরা অসহায়-ভাবে এই সময় পুলিস ডাকে। পুলিস লাঠি চার্জ্জ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোর-সওয়ার সিপাহী হাজির হয়। বল্গাহীন অশ্ব সমস্ত ময়দানে ছুটাছুটি করিতে থাকে। প্রায় ৩৫ জন আহত হন। পণ্ডিত নেহরু প্রায় ১৫ মিঃ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন—সভার চারিপার্শ্বে চলিতে থাকে সংঘর্ষ—কখনো জনতার সঙ্গে পুলিসের কখনো জনতার সঙ্গে 'সেবাদল' ও 'সাদা পোষাকধারীদের।

পণ্ডিত নেহরু যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী তোলা এখন উচিৎ নহে—'নেহরু-বিরোধী' বিক্ষোভকে বিশেষ একদল লোক 'বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী' ঝগড়া বলিয়া রূপান্তরের চেষ্টা করে। কিন্তু জনতার সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ সেকথা ভাসাইয়া দেয়।

পুলিস-জনতা সংঘর্ষ চলার সময়ই হঠাৎ রিভলবারের আওয়াজ শুনা যায়। জানা গেল কার্য্যরত সশস্ত্র পুলিসের অফিসারের বিরুদ্ধে গুলি ছোড়া হইয়াছিল।

পণ্ডিত নেহরুর কলিকাতা পদার্পণের পর হইতেই ৩ দিনে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, প্যারেড গ্রাউণ্ডের ঘটনাবলী উহারই পরিণতি।

১২ই জুলাই এই পদার্পণের দিনই সিটি, বিদ্যাসাগর, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজে প্রায় ১২ হাজার ছাত্র ধর্ম্মঘট করেন।

শ্যামবাজারের মোড়ে পণ্ডিত নেহরু আসামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে ধ্বনি উঠে—'ফ্যাসিস্ট নেহরু ফিরিয়া যাও'। সশস্ত্র পুলিসের বিরাট সাঁজোয়া সত্ত্বেও তাহার গাড়ীতে জুতা নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর চলে পুলিসের তাণ্ডব।

এইদিন বৈকালেই ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়া ডালহৌসী স্কোয়ারে কর্ম্মচারীদের মিছিল বাহির হয়। লাট সাহেবের ভবনের পাশে কালোপতাকা প্রদর্শন কালে পুলিস তাড়া করিয়া মিছিল ছত্রভঙ্গ করে।

এইদিনই মেটিয়াবুরুজে শ্রমিক ও ছাত্রদের মিছিল বাহির হইলে পুলিস ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।

নেহরুবিরোধী অসংখ্য পোস্টার রাস্তা-ঘাটে লটকানো দেখা যায়। স্থানে স্থানে পুলিস হানা দিয়া গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। পোস্টার লাগানোর অপরাধে খিদিরপুর-মেটিয়াবুরুজ-আলমবাজারে কয়েকজন গ্রেপ্তার হন।

১৩ই জুলাই বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জড়ো হন। মিছিল বাহির হওয়া মাত্র পুলিস লাঠি চার্জ্জ করে। ছাত্ররা তবু মিছিল করিয়া বাহির হইলে ছাত্র-পুলিস সংঘর্ষে জলের ট্যাঙ্ক ইত্যাদি দিয়া ব্যারিকেড তৈয়ার করিতে দেখা যায়।

১৪ই জুলাই নেহরুবিরোধী বিক্ষোভ সুরু হয় টালিগঞ্জ শ্রমিক অঞ্চল হইতে। ভারত উল ভারত, কার্ব্বন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্ম্মাসিউটিক্যাল, রসা ডিষ্টিলারী প্রভৃতি বিভিন্ন কারখানার ২ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়াই মিছিল নামান। জনৈক শ্রমিক নিজের ছেঁড়া ছাতা ছিঁড়িয়া কালো পতাকা তৈয়ার করেন। পুলিস লাঠি চার্জ্জ করিয়া মিছিল ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

বেলা ২টার সময় বালিগঞ্জ ত্রিকোণ পার্ক হইতে ভারতীয়া, ট্রাম শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী ও মহিলাদের একটি মিছিল হাজরা পার্ক পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে পুলিস গুলি চালায়। এখানে একটি বোমাও ফাটে। পুলিস আক্রমণের পর নিকটস্থ বস্তিতে আশ্রয় লইলে সমস্ত বস্তি তল্লাসী হয় এবং সেখানে জনৈক ছাত্রকে বন্দুকের কুঁদা দিয়া আঘাত করা হয়।

দুইটার সময় শিয়ালদহ স্টেশন হইতেও একটি মিছিল বাহির হইতেছিল। শহর-তলীর প্রায় ৫শত শ্রমিক, বাস্তুত্যাগী ও মহিলা এখানে জড়ো হইয়াছিলেন। লালঝাণ্ডা উড়াইয়া শোভাযাত্রার চেষ্টা করা মাত্রই পুলিস লাঠি চার্জ্জ করে। এখানেও বোমা ফাটে। তারপর সমবেত জনতা অন্য আর একটি পথে পুলিস এড়াইয়া বাহির হইয়া আসেন।

হাওড়া হইতেও বিক্ষোভকারীদের একটি মিছিল স্টেশনে পুলিস ঘেরাও করিয়া সকলকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে মাত্র ২ জন গ্রেপ্তার হন—আর সকলে বাহির হইয়া আসেন।

২৭শে জুলাই খুলনা দিবস

পূর্ব্ব-পাক কৃষক সমিতির সম্পাদক আগামী ২৭শে জুলাই 'খুলনা-দিবস' পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন। খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে বেলুচী পল্টন আনিয়া বসানো হইয়াছে। ১৭টি গ্রামে পিউনিটি ট্যাক্স বসানো হইয়াছে। ৩ জন ক্ষেত-মজুর ও গরীবকৃষক ইতিমধ্যেই খুন হইয়াছেন।

এইদিন কারখানায়-কারখানায় গেট-মিটিং, বস্তি-মিটিং, বৈঠক ও সভা, স্কুল-কলেজে ধর্ম্মঘট, গ্রামে হাট-হরতাল প্রভৃতি করিয়া দাবী তুলিতে হইবে—পল্টন ফেরৎ পাঠাও; পিটুনী ট্যাক্স বরবাদ; মুরুল আমীন—দমননীতি বন্ধ করা নতুবা পদত্যাগ কর।

ফরিদপুরে মন্ত্রী আহূত সভায় অনাহারে মৃত ব্যক্তির লাশ

ফরিদপুরে চাউলের দর ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকায় উঠিয়াছে। গরীবের ঘরে ঘরে যেমন অনাহার, তেমনি বিক্ষোভ। সকলের মুখেই এক কথা। পাকিস্তান সরকার ধনী-জোতদারের সরকার, গরীবের খাদ্যের কোন ব্যবস্থা নাই।

এই বিক্ষোভ থামাইবার জন্য পূর্ব্ব-বঙ্গের মন্ত্রী আসিলেন মাদারীপুরে। রিলিফ মন্ত্রী জনাব মফিজুদ্দিন একা বুভুক্ষু জনতার সামনে যাইতে ভরসা পান না। তাই সাথে আনিলেন পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী জনাব হাসান আলি সাহেবকে। দুই মন্ত্রী মিলিয়া ২৫শে জুন মাদারীপুর শহরে সভা ডাকিলেন। সভায় লোক জমায়েৎ হইল। মন্ত্রীরা বুভুক্ষু জনতাকে বুঝাইতে লাগিলেন, পাকিস্তান সরকার একজনকেও না খাইয়া মরিতে দিবেন না। অনেক ভাল ভাল সরকারী পরিকল্পনার কথা মন্ত্রীরা বলিতে লাগিলেন।

ঠিক এমন সময় সেই দিনই অনাহারে মৃত এক ব্যক্তির লাস নিয়া কয়েকজন লোক মিছিল করিয়া সভায় হাজির হইল। লাশ দেখিয়া মন্ত্রী সাহেবদের মুখ শুকাইল। সমবেত জনতার বিক্ষোভ চরমে উঠিল। জনতা মন্ত্রীদের নিকট জবাব চাহিতে লাগিল। বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করিবার জন্য লীগ নেতা জনাব মোহন মিঞা ও ছাত্র লীগের জনৈক নেতা উঠিয়া দাঁড়ান। জনতা তাহাদের ধনী-জোতদারের দালাল বলিয়া তাড়া করে। বিক্ষুব্ধ জনতার হাত হইতে মন্ত্রী সাহেবরা কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া সভা হইতে সরিয়া পড়েন।

সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন

দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন [২৩শে জুলাই—২৬শে জুলাই : কলিকাতা]

কংগ্রেসী সরকারের শিক্ষা-সংকোচন ও সারা দেশব্যাপী দমননীতির বিরুদ্ধে ভারতের একমাত্র সংগ্রামী ছাত্র প্রতিষ্ঠান **ছাত্র ফেডারেশনের** দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন ২৩শে হইতে ২৬শে জুলাই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে।

সারা-ভারতের সংগ্রামী ছাত্র প্রতিনিধিরা যোগদান করিবেন।

অর্থ সাহায্য ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া সম্মেলনকে সফল করুন।

এই সম্মেলনে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ছাত্র ফেডারেশনকে আহ্বান জানানো হইয়াছে।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবহ্নি প্রেস হইতে মুদ্রিত।

মঞ্জিল

প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] ২৪শে জুলাই '৪৯ : ৮ই শ্রাবণ '৫৬ [তিন আনা

পশ্চিমবাংলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াই

একই সাথে বুলেট-রাজ ও সাধারণ নির্ব্বাচন

পুলিস ও মিলিটারী রাজের জন্য পাকা ব্যবস্থা করার পর পশ্চিম বাংলায় রক্তাক্ত অভিযান শেষ করিয়া দিগ্বিজয়ী নেহরু দিল্লী ফিরিয়াছেন। তারপর কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের মিটিং হইয়াছে। নেহরুর রিপোর্ট শুনিয়া ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: এবছর শীতকালের মধ্যেই পশ্চিম বাংলায় সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা একটু অদল-বদল হইয়া ততদিন পর্য্যন্ত গদিতে বহাল থাকিবে।

বুলেটরাজ ও গণতন্ত্রের মুখোস—এই দুই কায়দাই নেহরু এক সাথে চালাইয়াছেন। জনসভায় তিনি বলিয়া গেলেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গুলি চালানো হইবে। পুলিসের বর্ব্বর হত্যাকাণ্ডের, কলিকাতার রাজপথে নারীহত্যার নিন্দা পণ্ডিত নেহরু করেন নাই; বরং পুলিসের প্রশংসাই করিয়াছেন। তারপর দিল্লী ফিরিয়া তিনি গণতন্ত্রের মোহকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ধনিক ও জমিদারদের সরকার তাহাদের দুনিয়া জোড়া অভিজ্ঞতা হইতে জনতাকে শৃঙ্খলিত রাখিবার দুইটি উপায় বাহির করিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে দমননীতি, আর দ্বিতীয়টি হইতেছে ধোঁকাবাজী, তোষামোদ, মিঠাবুলি, অসংখ্য প্রতিশ্রুতি, সামান্য সামান্য সুবিধাদান প্রভৃতি মারফত শাসন চালাইবার পথ। কংগ্রেস নেতারা খুব বাহাদুরীর সাথে দুই পথই একসাথে প্রয়োগ করিতেছেন। পুলিস-রাজ ও গণতন্ত্র একই সাথে চলিবে ইহাই নেহরুর ফরমুলা।

অব্যাহত পুলিস-রাজ

প্রদেশের অধিকাংশ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি রহিয়াছে। সভা-সমিতি মিছিল করার অধিকার বন্ধ রহিয়াছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক খবরের কাগজ অন্ততঃ ২৫টি বন্ধ করা হইয়াছে। প্রায় ৫০০০ মজুর-কৃষক-ছাত্র আটক বা বিচারাধীন রহিয়াছেন। কংগ্রেসী ঘাতকদের হুকুমে ২২ জন নারী নিহত হইয়াছেন। পুরুষ হতাহতের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। শ্রমিকদের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী রহিয়াছে। হলঘরে পর্য্যন্ত সভা করার অনুমতি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। প্রগতিশীল বই বিক্রয় পর্য্যন্ত বন্ধ করা হইতেছে। ন্যূনতম নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লইয়া হাজার হাজার মজুর-কৃষককে জেলে রাখিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী রাখিয়া নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা জনসাধারণের সাথে তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। দিগ্বিজয়ী নেহরু ও ওয়ার্কিং কমিটি পশ্চিম বাংলার শোষিত জনসাধারণের সহিত সেই তামাসা-ই করিয়াছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন সরাসরি এদেশ শাসন করিত তখন সেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকারও নির্ব্বাচন ঘোষণা করার আগে ন্যূনতম নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ঘোষণা করিত; বে-আইনী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইত। ডিক্টেটর নেহরু পুরাপুরি ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে নির্ব্বাচন চালাইতে চলিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলার জনগণ তাহা কি সহ্য করিবে?

চার্চ্চিলী-আইনে ভোট ব্যবস্থা

নেহরু বলিয়াছেন, নির্ব্বাচনের মারফত জনসাধারণ তাহাদের নিজেদের গবর্ণমেণ্ট গড়িতে পারিবে, বিক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কয়জন ভোট দিবে? যাহারা সম্পত্তিশালী ও শিক্ষিত একমাত্র তাহারাই ভারত শাসন আইনের বিধানে ভোট দিতে অধিকারী। এই ভারত শাসন আইনে শতকরা মাত্র ১৩ জনের ভোট আছে, গরীব ও সর্ব্বহারা ৮৭ জনের কোন ভোট নাই। ৮৭ জনকে বাদ দিয়া বড়লোক ১৩ জনের ভোটে কেমন করিয়া জনসাধারণের গবর্ণমেণ্ট হইবে?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বলিত: গণতন্ত্রের জন্য সকলের ভোট দরকার কি? আজ গদিতে বসার পর নেহরুর মুখেও সেই সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি শোনা যাইতেছে। নেহরু আগে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের জন্য চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতেন। কিন্তু এটলী-বেভিনের সাথে সমঝোতার পর নেহরু বলিলেন, এখন তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তর হোক, সুতরাং ভারত শাসন আইন অনুযায়ী এখন নির্ব্বাচন করা যাক। তারপর ২ বৎসর গিয়াছে। এখনও আবার ভারত শাসন আইনে নির্ব্বাচন হইতে চলিয়াছে। চার্চ্চিলের যুক্তি নেহরুর মুখে বেশ মানাইয়াছে!

ভারত শাসন আইন অনুসারে আইন সভার ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য মাত্র ৮টি আসন; বাকী ২৪২টি বড়লোকের জন্য। গোটা কলিকাতা ও বজবজের মজুরদের জন্য মাত্র ১টি আসন; আর ধনিকদের জন্য শুধু কলিকাতায় সাধারণ ও বিশেষ আসন মোট অন্ততঃ ১২টি। রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরীর বাহিরে লক্ষ লক্ষ মজুর আছেন; তাহাদের ভোটের অধিকার নাই। শ্রমিকশ্রেণীকে পিষিয়া মারার আইন বলিয়া কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে এত পছন্দ করিতেছেন।

পশ্চিম বাংলার শতকরা প্রায় ৪০ জন ভূমিহীন ক্ষেতমজুর এবং আরও শতকরা প্রায় ২০ জন নিতান্ত গরীব চাষী ইহাদের ভোট নাই। বৃহৎ নারী সমাজের মধ্যে বিত্তশালিনী ও শিক্ষিতা ২।৪ জন ছাড়া কাহারও ভোট নাই। যে হাজার হাজার মজুর-কৃষক আজ জেলে রহিয়াছেন, তাহাদের মা বাপ ভাই আত্মীয় স্বজন মন্ত্রিসভার সম্পর্কে তাহাদের রায় জানাইতে পারিবে না—এই ভোটের মারফত। বড়া কমলাপুর, কাকদ্বীপ, তমলুক, বীরভূম প্রভৃতি জায়গায় যত লোক কংগ্রেসী বন্দুকে প্রাণ দিয়াছেন বা আহত হইয়াছেন, তাহাদের আত্মীয়-স্বজন এই নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবে না। কংগ্রেসী গুণ্ডাদের লুণ্ঠনে ও অত্যাচারে যাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতিহিংসাও এই ভোটের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে না।

কংগ্রেসী কুশাসনে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে থাকিতেছে ও মরিতেছে তাহারাও ভোট দিতে পারিবে না।

গত কয়েক মাসে কংগ্রেসী শাসনে ২২ জন নারীকে হত্যা করা হইয়াছে। গরীব ও সর্ব্বহারা নারীগণ নারীহন্তাদের শাস্তি দাবী করিয়া এই নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

ভারত শাসন আইনের নির্ব্বাচনে জনতার রায় পাওয়া যাইবে না। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ ভারত শাসনের জন্য এই সাম্রাজ্যবাদী আইনকে ঘৃণা করে। নেহরু আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে দাসখত লিখিয়া দিয়া আসিয়াছেন, কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীর আইনকে আজ তাহারা কায়েম রাখিতে চান। কিন্তু পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ কমনওয়েলথকে ঘৃণা করে। ভারত শাসন আইনের ছত্রে ছত্রে এদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শহীদদের রক্তের দাগ রহিয়াছে; তবুও কংগ্রেসমার্কা আজাদীর দুই বৎসর পরে সেই কলঙ্কিত আইনের বলেই ভোট হইবে!

গণ-বিক্ষোভে বিড়লার আর্ত্তনাদ

পুলিসরাজ অব্যাহত রাখিয়া, জনসাধারণের ভোটের অধিকার কাড়িয়া লইয়া এই নির্ব্বাচনের প্রহসন কংগ্রেসকে চালাইতেই হইবে। দমননীতির সাথে সাথে গণতন্ত্রের মোহবিস্তার ব্যতীত পশ্চিম বাংলার গণবিক্ষোভ রুখিবার আর কোন রাস্তা নেহরু চোখে দেখিতেছেন না। তাই এই নির্ব্বাচনের-ব্যবস্থা।

জনসাধারণের বিক্ষোভ যে কত তীব্র হইয়াছে নেহরু তাহা নিজের চোখেই দেখিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসের রক্ষিতা খবরের কাগজগুলিতে ও রেডিওতে জোর গলায় প্রচার করা হইয়াছে যে, নেহরুর সভায় দশ লাখ লোক হইয়াছিল। জনসাধারণ এখনও নেহরুর ভক্ত আছে—এই মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য প্রচার চালানো হইতেছে। আসলে জনসমাগম উহার চার ভাগের এক ভাগের বেশী হয় নাই। যাহারা সভায় গিয়াছিলেন, তাহারাও নেহরুর বাণী শোনার জন্য যান নাই, নেহরুর কৈফিয়ৎ লওয়ার জন্য গিয়াছিলেন।

নেহরুর সভা সম্পর্কে ধনিকশ্রেণীর বক্তব্য-ই ধরা যাক।

বিড়লার মুখপত্র ইস্টার্ন ইকনমিস্ট ১৫ই জুলাই তারিখে লিখিয়াছেন: "এই সপ্তাহে প্রধান-মন্ত্রীর কলিকাতা সফরে আগেকার মতো বিজয়-মিছিল হইতে পারে নাই। যদিও দশ লক্ষ লোক তাঁহার কথা শুনিয়াছিল—বোঝা যায় যে বাংলার লোককে এখনও তিনি আকৃষ্ট করিতে পারেন—তবুও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে, লোকের তাহার সম্পর্কে মোহমুক্তি হইয়াছে; এমন কি আগে যাহা তিনি কখনও দেখে নাই এইরূপ সোজাসুজি বিরোধিতাও দেখা গিয়াছিল। ইহা পরিষ্কার যে, পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিপত্তি প্রাদেশিক সরকারের অপেক্ষা কম ক্ষুণ্ণ হয় নাই; আরও ভয়ানক কথা যে বিশেষ কোন যুক্তি না থাকিলেও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে তাহাদের, যাহারা শুধু কংগ্রেসের নয়, স্বাধীনতা ও সুশৃঙ্খল উন্নতির শত্রু।..... ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, অতীতের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এক বেপরোয়াভাব বাংলাদেশে দেখা যাইতেছে। এই মনোভাব বাড়িতেছে বলিয়া কংগ্রেসের অতীতের অবদানের প্রতি নজর আকর্ষণের চেষ্টা নিরর্থক

(১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সরকারী "হুঁশিয়ারী"

'মঞ্জিল' ১ম সংখ্যার (১৯শে জুন) ৫ম পৃষ্ঠায় **"দক্ষিণ কলিকাতা উপ-নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করিয়াছে"** এবং ২য় সংখ্যা (২৬শে জুন) ১ম পৃষ্ঠায় **"চূড়ান্ত সংকট ও দেউলিয়া পথে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব"**—এই দুইটি প্রবন্ধে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার আপত্তি জানাইয়াছেন। সম্পাদকের উপর "হুঁশিয়ারি" জারি করিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাঁহারা আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বন্দী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকদের ছাড়িয়া দিয়া জেল খালি করা হইতেছে আর মজুর-কিসান-ছাত্র ও মহিলাদের দ্বারা জেল ভর্ত্তি করা হইতেছে। আর, এস্, এস্ দল সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইল। আর কমিউনিস্ট পার্টিকে এখনও পশ্চিম বাংলায় বে-আইনী রাখা হইতেছে, সারা ভারতে বে-আইনী করার তোড়-জোড় চলিতেছে; মজুর-কৃষক-মহিলা-ছাত্রদের ইউনিয়ন ও সমিতি নামে না হইলেও কাজে বে-আইনী করা হইয়াছে।

ভয়ানকভাবে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এবং একাধারে জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও খাঁটি সাম্যবাগী নেহরুজীর সরকারের এই আচরণে অনেকেই গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়িয়াছেন।

রহস্যের কিনারা করিয়া দিয়াছেন হিন্দু-মহাসভার সভাপতি শ্রীভোপৎকার। গত ১৪ই জুলাই তারিখে পুণা হইতে তিনি আবেদন করিয়াছেন, "কমিউনিজমের আসন্ন বিপদ হইতে ভারতকে রক্ষা করার জন্য একটি সাধারণ জাতীয় কর্ম্মসূচীর সাথে এক কমিউনিস্টবিরোধী সাধারণ জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করিতে হইবে।" সাথে সাথে তিনি "কংগ্রেস ও আর, এস, এস এর মধ্যে উভয়ের পক্ষেই সম্মানজনক সমঝোতার জন্য" উভয়কে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আর-এস্-এসদের গুরুজী গোলওয়ালকর এই সমঝোতার জন্যই জেল হইতে বাহির হইয়া নিজের দলের লোককে বলিয়াছেন, কংগ্রেস তোমাদের উপর যে খারাপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা এখন ভুলিয়া যাইতে হইবে।

সমঝোতা নূতন নয়। হাইকম্যাণ্ডের প্রশ্রয়েই আর-এস-এসদের এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। গান্ধী হত্যার পর দেশব্যাপী বিক্ষোভ, দুনিয়ার সামনে গণতন্ত্রের মুখোস রাখার লোভ এবং কংগ্রেসের সাধারণকর্ম্মী ও সদস্যদের বাধা এই তিন কারণে সমঝোতা এতদিন পর্দার আড়ালে ছিল।

কিন্তু আর ঢাকাঢাকির উপায় নাই। সাধারণ লোক কংগ্রেসকে আজ কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে চাহিতেছে। হাইকম্যাণ্ড তাহার আগেই শোষিত জনসাধারণকে, বিশেষভাবে শ্রমিকদের পিষিয়া মারার জন্য সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের ঐক্যবদ্ধ করিতেছেন। আজ তাহারা সার শিক্ষা লাভ করিয়াছেন: লাজ, মান, ভয়—তিন থাকতে নয়।

* * *

ভারতীয় ইউনিয়ন ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের ডেপুটি স্পীকার অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার নেহরু সরকারকে একটি সার্টিফিকেট দিয়াছেন, "অনেক জরুরী কাজের মধ্যেও নেহরু সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য করিতেছেন।"

করিতেছেন বৈকি! ৩২৫টি মোটর কর্ম্মীর চাকুরির জন্য কলিকাতায় ৫০০০০ দরখাস্ত পড়িয়াছে। পাটকলের পঞ্চাশ হাজার মজুর ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতা কলেও ছাঁটাই চলিতেছে। আহমেদাবাদে ৫০,০০০ সুতাকল শ্রমিকের ছাঁটাই সম্পর্কে ঘোষণা বাহির হইয়াছে।

এত করিয়াও নেহরু তাহার মুনিবদের মন পাইতেছেন না। ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক হইতে নেহরু যে ধার চাহিয়াছিলেন তাহার রকম বারো আনা না-মঞ্জুর হইয়াছে; ট্রুম্যানকে নেহরু এখনও খুসি করিতে পারেন নাই।

বিড়লাজীরা এখনও চোখ রাঙাইতেছেন। মালিক গোষ্ঠী চাহেন যে, উৎপাদন কমাইয়া মুনাফা বাড়াইবার জন্য কাপড়ের কণ্ট্রোল এখনই তুলিয়া দিতে হইবে। তাহারা কাপড়ের কল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিড়লার ইস্টার্ন ইকনমিস্ট লিখিতেছেন: এইতো মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সরকারের এত হাম্বি-তাম্বি কোথায় গেল? আরও মিল বন্ধ আরও হাজার হাজার সুতাকল মজুর ছাঁটাই হইতে চলিয়াছে।

বেশী শিল্পজাত পণ্য তৈয়ার হইলে দাম ও মুনাফা কমিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় ধনিকশ্রেণী যন্ত্রপাতি আমদানি শিল্পের উৎপাদন রোধ করিতে চাহেন! নেহরু সরকার যন্ত্রপাতির আমদানির জন্য পারমিট একরূপ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং কাজ পাওয়ার জন্য বেকারদের মধ্যে আর কোন প্রতিযোগিতা থাকিতেছে না, ইহাও বেকারদের প্রতি নেহরু সরকারের অনুগ্রহ। লক্ষ লক্ষ রেল মজুর, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি যাহাদের ছাঁটাই করা হইয়াছে ও যাহারা বেকার হইয়া ঘুরিতেছে তাহাদের কথা আর না-ই তুলিলাম।

ইহার পরও কেহ যদি বলে নেহরু সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করে নাই; তাহাদের গোস্তাকি স্বাধীন সরকার মাপ করিবেন না। ইহার জন্য কলিকাতায় পুলিস মিলিটারীর ব্যবস্থা খালাই করা হইতেছে। বেকারগণ মিটিং করিয়া স্থির করিতেছেন—ইহার পর আর 'নেহরু জিন্দাবাদ'—আওয়াজ তোলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। রাম রাজত্বে ইহা ছাড়া আর কি বেকার সমস্যার সমাধান হইবে!

* * *

পাকিস্তান সরকারও বেকারদের জন্য বড্ড তকলিফ্ লইতেছেন। শুধু পূর্ব্ববঙ্গে ১৫০০০ রেল মজুর ছাঁটাই করা হইতেছে। লোকে কাপড়ের অভাবে আত্মহত্যা করিতেছে; তবুও ঢাকেশ্বরী মিল ও মোহিনী মিল সব সময়ে চালু রাখার ব্যবস্থা হইতেছে না; হাজার হাজার সুতাকল মজুর বেকার হইতেছে। লেখাপড়া শিখিয়া যাহারা একটু চাকরী-বাকরী করিতেছিল, তাহারাও অনেকে পাক-সরকারের আমলে ছাঁটাই হইয়াছে আর কাজ পাইতেছে না।

পশ্চিম পাঞ্জাবের অবস্থা চরম হইয়াছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার অবস্থায় অনাহারে বিনা আশ্রয়ে মরিতেছে; আর বড় বড় কর্ম্মচারী প্রভৃতি আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য প্রভৃতি ওজুহাতে রাতারাতি বড়লোক হইতেছে।

বেকারীর জন্য বিক্ষোভ বড্ড বেশী বাড়িতে দেখিয়া পাক-সরকার জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার জন্য এক বেকারী তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাতেই বেকারদের জন্য পাক-সরকারের যে দরদ তাহার আসল চেহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তাহারা বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানে শিল্প অর্থাৎ ফ্যাক্টরী, কলকারখানা গড়িয়া তোলার কিছু মাত্র চেষ্টা না করিয়া কাঁচা মাল রপ্তানি করা হইতেছে আর বিদেশের শিল্প-জাত মাল অবাধে আমদানি করা হইতেছে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে খুশী করার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহারই ফলে বেকারের দল অতি দ্রুত ভারী হইতেছে।

পাক-ভারত সরকার বেকারদের উপকারই তো করিতেছেন: বেকারদের দলে ভারী করিয়া দিতেছেন, রক্ত-চোষা বড়লোকেরা ও তাহাদের গোলাম সরকার আর বেকারদের সাথে পারিয়া উঠিবে না।

* * *

পূর্ব্ববঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ মালেক আই, এল, ও সম্মেলনের উপলক্ষ্যে জেনেভায় গিয়াছিলেন।

সেখানে তাহার বক্তৃতা হইতে পাকিস্তানের আসল হাল, পাকিস্তানের আসল মুনিব কাহারা তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাতিসংঘের মারফত ৬০ লক্ষ ডলার মজুর করিয়াছেন, দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলিতে কারিগরী সাহায্য দানের ওজুহাতে। এই সাহায্যের মারফত উপনিবেশগুলিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য কায়েমের ষড়যন্ত্র হইতেছে এই প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য।

ডাঃ মালেকের বক্তৃতাটি এই টাকার বখরা পাওয়ার জন্য প্রথমে আবেদন পরে নিবেদন শেষে ক্রন্দন।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমেই শিল্প জাতীয়করণ হইবে না ইহা পাক সরকার পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন। তাহাদেরই হুকুমে পাক সরকারের ও ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা ইঙ্গ-মার্কিন দুয়ারে মূলধন খাটাইবার জন্য ধর্ণা দিতেছেন। করাচী ও চট্টগ্রামের বন্দর ইতিমধ্যেই মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাতে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। শওয়ালেস্, রেলী ব্রাদাস ইত্যাদি বড় বড় বৃটিশ কোম্পানী এবং অন্যান্য বড় মার্কিন কোম্পানী পাকিস্তানে আসিয়া রেজেষ্ট্রী হইতেছে। একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আইন পাস হইয়াছে; সেই অনুসারে শিল্পে ও কল কারখানায় শতকরা ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত বিদেশী মূলধন হইবে।

লিয়াকত আলি-নূরুল আমিন কোম্পানী এখনই ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দালালী করিয়া কমিশন পাইতেছেন। এই দালালীর কমিশন বাড়াইবার জন্য তাহারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। উহাদের দরবারে লিয়াকত-নূরুল আমিনদের লোক যাইয়া হাজিরা দিয়া নিত্যই বলিতেছে: কসম খাই, পাকিস্তানকে তোমাদের কাছে ইজারা না দিয়া ছাড়িব না; তোমরা আমাদের দিকে একটু নজর দাও।

তাই ডাঃ মালেক বলিয়াছেন: "অনুন্নত দেশে কারিগরী সাহায্যদানের জন্য যে ৬০ লক্ষ ডলার জাতিসঙ্ঘ মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা বণ্টনে সকল অনুন্নত দেশের প্রতি সুবিচার করা হইবে বলিয়া আমি মনে করি।"

পাকিস্তানের মজুর ডাঃ মালেকের দালালির পথের কাঁটা। মালেক কোম্পানীকে মজুর বরখাস্ত করিবে না।

* * * *

পূর্ব্ববঙ্গে লীগ নেতাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতেছে: ভোটবুক আসন্ন। লীগ পুনর্গঠন কর; সারা-পূর্ব্ববঙ্গে রিলিফ চালাও—এই আওয়াজ তুলিয়া তাহারা ভোট-যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় নামিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ আজ ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিতেছে, বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতেছে। জনসভায় লীগমন্ত্রীরা বে-ইজ্জত হইতেছেন। তাই লীগ নেতারা এখন আবার ভোটের মোহ সৃষ্টি করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

তাঁহারা সাধারণ লোককে দুটি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এক: জবরদস্তি করিয়া পাকিস্তানের গদি হইতে নামাইতে যাইয়ো না, গদি চুরমার করিও না। ভোটের পথে মনের মতো গবর্ণমেণ্ট তৈয়ার করো। দ্বিতীয়: লীগ গরীব জনসাধারণেরই প্রতিষ্ঠান। এই দেখো গরীবদের লইয়া লীগ পুনর্গঠন করিতেছি, রিলিফের জন্য সরকারের নিকট লীগ দাবী জানাইতেছে। লড়াই চালাইতেছে।

কিন্তু দুই বছরের লীগ শাসন পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণকে সাবালক করিয়া দিয়াছে।

চাষীর মনে নাই? লীগকে ভোট দাও; সাত দিনের মধ্যে বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করিয়া দিব। এখন জমিদারি উচ্ছেদ শিকায় উঠিয়াছে; জমিদারেরা দোস্ত হইয়াছে, তাহাদের সাথে খানাপিনা চালাইতেছে।

এক ভূমিদখল বিল আইন সভায় ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। লীগনেতাদের মতলব: ভোটের আগে ঐ বিল পাস করিয়া তাহারা ভোট আদায় করিবেন। কিন্তু গরীব চাষীরা বোকা হইলেও বুঝিয়াছে, ঐ বিলে গরীব কৃষকদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাক-সরকার তাই বড় লোকের ভোটেই সারিবার চেষ্টায় আছেন। ১৯৩৫ সালের পচা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আইনে দশজন বড়লোকের ভোট ছিল। আজাদ পাক সরকার সেই জালিম নাপাক ব্যবস্থা অনুসারে ভোট সারার চেষ্টায় আছেন।

কিন্তু শয়তানির জাল জনতা এবার টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। চালাকী তাহারা সহ্য করিবে কি? বৃদ্ধ মৌলানা সাহেব একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। বুড়া বয়সে ভীমরতি ধরে: পাকিস্তানকে তিনি আরও সংসেমিরা অবস্থায় ফেলিয়া দিলেন না তো?

মজলিশ

মতামত

* গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর-এস্-এস্—নেহরু আঁতাত
* রামরাজত্বে বেকারের স্বর্গ
* পাকিস্তানের জন্য ডলার ভিক্ষায় ডাঃ মালেক
* ভোটের মহড়ায় পূর্ব্ববঙ্গের লীগ

ধনিকশ্রেণীর ফ্যাসিষ্ট শাসনে বিনাবিচারে আটক ব্যবস্থা

"সংশোধিত ফৌজদারী আইন ও অনুরূপ আইনের উপরেই যে সরকারের নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, সাহিত্য ও সংবাদপত্র দমন না করিলে যাহার চলে না, যে সরকার শত শত সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করে, লোককে বিনা-বিচারে জেলে বন্দী করিয়া রাখে এবং ভারতে আজ যাহা ঘটিতেছে সেই রকম অন্যান্য কাজ করে সেই সরকারের অস্তিত্ব থাকিবার বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই।"

ইহা নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টএর বক্তৃতা নয়, নেহরু স্বয়ং লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ১৯৩৬ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে ঐ কথা বলেন।

আজ নেহরু-রাজ কায়েম হইয়াছে, নেহরু-সরকার কাহার উপর নির্ভর করিয়া কিভাবে শাসন চালাইতেছে?

পশ্চিমবঙ্গে সংশোধিত ফৌজদারী আইন

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষ-মন্ত্রিসভা জনমত পায় দলিয়া শিশির মণ্ডলের রক্তনদী অতিক্রম করিয়া কালা-কানুন—নিরাপত্তা আইন পাশ করিয়াছিলেন। আইন হইয়াছিল ছয় মাসের জন্য; কিন্তু মেয়াদ বাড়িয়া-ই চলিয়াছে। ১২ই মার্চ্চ তারিখে এবার পশ্চিমবঙ্গের জেলে প্রায় এক হাজার বিনাবিচারে বন্দী ছিলেন; ঐ তারিখে আইনের মেয়াদ শেষ হইয়া গেল; পুনরায় আইন বা অর্ডিন্যান্স জারি না করিয়াই সরকার উহাদের জেলে আটকাইয়া রাখিলেন। হাইকোর্টে হেবিয়াস কার্পাস দরখাস্ত করা হইলে হাইকোর্টের রায় হইল: উহাদের আটক রাখার কোন আইন নাই, এখনই বন্দীদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু জনতার বিক্ষোভে ধনিক সরকারের ভিত টলমল করিতেছে, তাই বিচারকদের রায়ের মর্য্যাদা রাখিবার সময় আজ আর শাসনকর্ত্তাদের নাই। তাহারা সেই পুরানো সংশোধিত ফৌজদারি আইনে বন্দীদের আটক রাখিল।

এদেশের পঞ্চাশ বৎসরের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বিরুদ্ধে, এই বিনাবিচারে আটক রাখার বে-আইনী স্বৈরাচারী আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিয়াছে। ধনিকশ্রেণী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারি করিতেছে, আর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সেই সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার দিয়া আঘাত করিতেছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কয়েকদিন আগে এই বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন: "ইহার চেয়ে সর্ব্বগ্রাসী আইন, শাসনবিভাগকে ইহার অপেক্ষা বেশী যথেচ্ছ ক্ষমতা দিবার আইন আমি আগে জানিতাম না। এই আইনটির প্রতি একবার তাকাইলেই বুঝা যাইবে যে, শাসন বিভাগ এমনভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে চাহেন যাহা আগে চিন্তাও করা যাইত না। এই আইন ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলই ধ্বংস করিয়া দিতেছে।" [নেশন ৬ই জুলাই]

আর একজন বিচারপতি মন্তব্য করিলেন, "ইহা বড়ই তাচ্ছিব কথা যে কংগ্রেস রাজত্বে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারি আইন ব্যবহৃত হইবে। এইটি ছিল একটি আইন, যেটি তুলিয়া দিবার জন্য কংগ্রেস বরাবর দাবি করিয়াছেন।" [স্টেটস্‌ম্যান ৬ই জুলাই]

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে, বিড়লা গোষ্ঠীর তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা এই সব কথায় ভ্রূক্ষেপ করার অবসর পাইতেছেন না। বরঞ্চ বিনাবিচারে আটক রাখার যথেচ্ছ ক্ষমতা ক্রমাগত বড়াইয়া লইতেছেন।

বিহার ও যুক্ত-প্রদেশে

বিহার গবর্ণমেণ্ট খুব হুঁশিয়ার। তাহারা আগে হইতেই আটঘাট বাঁধিয়া এমন আইন তৈয়ার করিয়াছেন যে, তাহাতে আর কোন ছিদ্র নাই; ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিবার এতটুকু আইনের ফাঁক নাই।

শ্রমিক ও শোষিত জনসাধারণের আন্দোলনকে পিষিয়া মারার জন্য যে বিনাবিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে, যুক্তপ্রদেশের সরকার তাহা এক রকম খোলাখুলি স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা একবারেই দুই বছরের জন্য নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ বাড়াইয়া দিয়াছেন। কারণ হিসাবে তাহারা বলিয়াছেন, বিনা বিচারে আটক কমিউনিস্টদের একবার ছাড়িয়া দিলে আবার ধরা যায় না; তাহারা নাকি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলিয়া যায়। ইহার একমাত্র অর্থ বিচার করিয়া শাস্তি দিবার মত কোন অপরাধের মধ্যে তাহাদের আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই মুস্কিলে পড়িয়া যুক্তপ্রদেশের সরকার দুই বছরের মধ্যে যাহাতে কাহাকেও ছাড়িতে না হয় সেই পাকা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে বিনাবিচারে আটকের অদ্ভুত অজুহাত

কিন্তু এত যথেচ্ছ ক্ষমতা পাইয়াও শাসন বিভাগ কংগ্রেসের গদী রক্ষা করিতে পারিয়া উঠিতেছেন না। মাদ্রাজে শ্রীমতী সূর্য্যবতী আটকবন্দী ছিলেন। তাঁহার হেরিয়াস কার্পাস মামলায় তাঁহাকে মুক্তির রায় দিতে গিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি বলিয়াছেন: আটক রাখার কারণের মধ্যে "কেবলমাত্র বলা হইয়াছে যে তাহার স্বামী একজন উৎসাহী কমিউনিস্ট এবং তাঁহার প্রভাবে পড়িয়া মহিলাও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ওজুহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি তাহার কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের সমুদয় সম্পত্তি পার্টিকে দান করিয়াছেন। এই সব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও যতক্ষণ কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করা না হয়, ততক্ষণ ইহার কোন কাজেই আইনের খেলাপ হয় না।"

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে বিচার বিভাগও ধনিক সরকারেরই একটি অঙ্গমাত্র।

বোম্বাইতেও অনুরূপ ঘটনা। বোম্বে কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়গণ বীরত্বের সহিত আইনসঙ্গত ধর্ম্মঘট চালাইতেছিলেন। ধর্ম্মঘটীদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বোম্বাই সরকার তাহাদের ইউ-নিয়নের সম্পাদক মিঃ জি, জে মানে-কে বিনাবিচারে আটক রাখেন। হাইকোর্টের বিচারপতি বলিয়াছেন, ধর্ম্মঘট তো বেআইনীভাবে হয় নাই; ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদককে আটক রাখার কোনই কারণ নাই।

মালয় প্রত্যাগত ভারতীয়গণ বিনা-বিচারে বন্দী

দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এমনি করিয়া হত্যা করা হইতেছে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। মালয়ের বীর গণপতি, বীরসেনান ও শাম্বশিবম ইঁহাদের ২১ জন সহকর্ম্মী ভারতে ফিরিবামাত্র তাঁহাদেরও বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই নেহরু সরকারের নির্লজ্জ কপটতার মুখোস খসিয়া পড়ে। তাহারা মালয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপ-নিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহেন এই দাবি যে একেবারে ধোঁকাবাজি তাহা প্রমাণিত হইয়া যায়।

এই ভারতীয়গণ মালয়ে থাকিতে কি করিয়াছেন তাহার বিবরণ দিয়া কে, আপ্পুর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে বলা হইয়াছে—"এই সব বিপজ্জনক কর্ম্মী এখন ভারতে পৌঁছিয়াছে। ইঁহারা দেশের ভাষা খুব ভাল ভাবে জানেন।....তাঁহাদের জনসাধারণের মধ্যে চলিতে ফিরিতে দেওয়া জনস্বার্থের বিরোধী।" ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, নেহরু আজ নরঘাতক ম্যাকডোনাল্ড-এর সহযোগী; ইহা হইতেই কমনওয়েলথ চুক্তির স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

২৪শে জুলাই

পূর্ব্ববঙ্গে স্বৈরাচারের সনদ

ভারতীয় ইউনিয়নের ন্যায় পাকিস্তানেও একমাত্র স্বৈরাচারের জোরেই শাসন চলিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদী ভারত শাসন আইনে গণ-বিক্ষোভ দমন করার জন্য অর্ডিন্যান্স করার ক্ষমতা ছিল। তারপর এখন আজাদী হইয়া গিয়াছে, তবে ইংরাজের সেই আইনই বহাল আছে।

যাহাই হউক, পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ভাবিলেন, এখন আজাদ হইয়া গিয়াছি এখন ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে আজাদী কোথায়? আগে আজাদী ছিল না, কাজেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া লইবার অর্ডিন্যান্স সযত্নে লিখিত হইত। কিন্তু এখন আর তাহার মূল্য কোথায়, অত কষ্ট করিয়া লাভ কি? পূর্ব্ববঙ্গ সরকার অর্ডিন্যান্স চালু রাখার জন্য একটি ছোট্ট অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া শত শত মানুষকে বিনাবিচারে আটকাইয়া রখিলেন। এই সেদিন হাইকোর্টের বিচারপতি দবিরুল ইসলামের মামলায় লিখিয়াছেন, আগের অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ বাড়াইয়া অর্ডিন্যান্স করার ক্ষমতা লাট সাহেবের নাই। কোন আইন না থাকা সত্ত্বেও আটকবন্দীরা এতদিন আটক রহিয়াছেন।

কিন্তু এইখানেই স্বৈরাচারের শেষ নয়। হাইকোর্টের বিচারপতি শাসন বিভাগের কাছে কয়েকটি ঘটনা জানিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার তাহা হাইকোর্টকে জানাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। জজ বলিয়াছেন, সরকারের এই কাজ অনুমোদনের অযোগ্য।

দবিরুল ইসলামের মামলা উঠিলে শাসন বিভাগ পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন যে, ঐ অর্ডিন্যান্স ভুল হইয়া গিয়াছে। তখন হাইকোর্টের রায় বাহির হওয়ার আগেই তাহারা আরাম বিলাস ত্যাগ করিয়া নূতন অর্ডিন্যান্স করিয়া ফেলিলেন। বেচারা দবিরুল ইসলাম জেলেই রহিয়া গেলেন।

সীমান্তপ্রদেশ, পশ্চিম-পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান—পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশেই বিনাবিচারে আটকের আইন রহিয়াছে। শুধু পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় এক হাজার রাজ-নৈতিক কর্ম্মী জেলে বন্দী রহিয়াছেন।

কিন্তু এত সত্ত্বেও ভারতীয় ইউনিয়নে ও পাকিস্তানে সারা ভারতে শাসন অচল হইতে চলিয়াছে। ধনিকশ্রেণী তাহাদের চোখের সামনে দেওয়ালে একটি কথা লেখা দেখিতেছেন: বিনা বিচারে আটকের বা স্বৈরাচারী শাসনের ক্ষমতার শেষ আছে, কিন্তু গণ-বিক্ষোভের কোন অন্ত নাই, সীমা নাই। চূড়ান্ত স্বৈরাচারের ক্ষমতাই ধনিকশ্রেণীর অমোঘ মৃত্যুবান।

রংপুর জেলে ইণ্ডারের চিনি চাহিবার ফল

রংপুর জেলের সিকিউরিটি বন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করার দুই দিন পরেই গত ২৯শে জুন বিচারাধীন রাজ-নীতিক বন্দীদের উপর লাঠি চার্জ্জ করা হয়। লাঠির আঘাতে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত রেল শ্রমিক নেতা কুট্টি মহম্মদ ও জব্বর মিঞা গুরুতরভাবে জখম হইয়াছেন। কুট্টি মহম্মদের মাথা ফাটিয়া ৪ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি গভীর ক্ষত হইয়াছে। জব্বর মিঞার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগার সাথে সাথেই তিনি জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান।

ইহারই মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁহারা

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ডিমিট্রভের জীবন : শান্তি, গণতন্ত্র ও সোস্যালিজমের যোদ্ধাদের জাবন্ত প্রেরণা

স্টালিন-মলোটভপ্রমুখ সোভিয়েট নেতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন

১৮৮২ সালের ১৮ই জুন রেডোমির শহরে এক শ্রমিক বিপ্লবী পরিবারে জর্জ্জী মিথেইলোভিচ ডিমিট্রভের জন্ম হয়। ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ করার সময়ই ১৫ বছরের বালক ডিমিট্রভ বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। বুলগেরিয়ার সব চাইতে পুরাতন ছাপাখানা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন।

১৯০২ সালে ডিমিট্রভ বুলগেরিয়ান শ্রমিকদের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগ দেন। ডিমিট্রিয়াগোইভের পরিচালিত টেসনিয়াকির বিপ্লবী মার্ক্সবাদী গ্রুপের পক্ষে দাঁড়াইয়া তিনি সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

বিপ্লবী সংগ্রামে ডিমিট্রভের আত্মত্যাগ বুলগেরিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকদের গভীর ভালোবাসা অর্জ্জন করে। ১৯০৫ সালে শ্রমিকরা তাঁহাকে বুলগেরিয়ার বিপ্লবী ট্রেড এসোসিয়েশনের যুক্ত সঙ্ঘের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত করেন। ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহার পর ফ্যাসিস্টরা সঙ্ঘটিই ভাঙ্গিয়া দেয়। বুলগেরিয়ার শ্রমিকদের সংগ্রাম পরিচালনা করিবার সময় ডিমিট্রভ বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি অটুট বিশ্বাস ও সাহস দেখাইয়াছেন। বারবার তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছে ও পুলিসের জুলুম সহিতে হইয়াছে। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন বুলগেরিয়ায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়, তখন ডিমিট্রভ ছিলেন কেন্দ্রীয় বিপ্লবী কমিটির নেতা। এই সময় তিনি বিপ্লবী নির্ভীকতা, শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ়তার আদর্শ স্থাপন করেন। ১৯২৩ সালে এই সশস্ত্র বিপ্লবে নেতৃত্ব করার জন্য ফ্যাসিস্ট বিচারালয় ডিমিট্রভের অনুপস্থিতিতেই তাঁহাকে ফাঁসির হুকুম দেয়। ১৯২৬ সালে ফ্যাসিস্টদের প্ররোচনায় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে বিচার হয় সেই বিচারেও তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডিমিট্রভের আবার ফাঁসির হুকুম হয়।

১৯২৩ সালে বুলগেরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া ডিমিট্রভ পেশাদার বিপ্লবীর জীবন যাপন করিতে থাকেন। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্য্যকরী কমিটিতে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ সুরু করেন।

বিপ্লবী কাজ চালাইবার ফলে ১৯৩৩ সালে ডিমিট্রভ বার্লিনে গ্রেপ্তার হন। লাইপজিগ বিচারের সময় ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা ডিমিট্রভ উচ্চে তুলিয়া ধরেন। বিচারের সময় তিনি বীরত্বপূর্ণ আচরণ করেন। রাইখস্টাগ অগ্নিসংযোগের ব্যাপারে ফ্যাসিস্টদের হীন উস্কানীর নগ্ন চেহারা খুলিয়া ধরিয়া ডিমিট্রভ ফ্যাসিস্টদের মুখের সামনে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠেন। ইহার ফলে দুনিয়াব্যাপী লাখ লাখ নূতন শ্রমিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাগিয়া উঠে।

১৯৩৫ সালে ডিমিট্রভ কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্য্যকরী কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। জার্ম্মানী, জাপান ও ইতালীর ফ্যাসিস্ট শাসকশ্রেণীর যুদ্ধের আয়োজনের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুক্ত শ্রমিক ফ্রন্ট ও যুক্ত গণফ্রন্ট গঠন করা ও সুদৃঢ় করার জন্য ডিমিট্রভ নিরন্তর সংগ্রাম চালাইয়া যান। ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের পথ রোধ করিতে কমিউনিস্ট পার্টির চারিদিকে সমবেত হইবার জন্য তিনি সমস্ত দেশের শ্রমিক জনতার নিকট অবিরাম আহ্বান জানান।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মহান্ আদর্শের প্রতি অনুরক্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীদের শ্রমিক আন্তর্জ্জাতিকতার আদর্শে, নিজ নিজ দেশের মেহনতী জনতার স্বার্থরক্ষার আদর্শে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ডিমিট্রভ আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক বিরাট কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্য ডিমিট্রভ কমিউনিস্টদের আহ্বান করেন। ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের হঠাইবার জন্য সমস্ত দেশভক্ত শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করার কাজে নিরলস ভাবে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। জার্ম্মান ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, বুলগেরিয়ার সেই সমস্ত দেশভক্তদের এবং বুলগেরিয়ার শ্রমিক পার্টির (কমিউনিস্ট) সংগ্রামে ডিমিট্রভ নেতৃত্ব করেন।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁহার বিশেষ অবদানের জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলী ডিমিট্রভকে 'অর্ডার অফ লেনিন' সম্মানে ভূষিত করেন।

ফ্যাসিস্ট জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর জর্জ্জী ডিমিট্রভ বুলগেরিয়ার নরা-জনতার গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক গঠন পরিচালিত করেন। এবং বুলগেরিয়ার জনগণের সাথে সোভিয়েট রুশিয়ার জনগণের চিরবন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্ত শিবিরের সুদৃঢ়তার জন্য অবিরাম কাজ করিয়া এবং সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ করিয়া জর্জ্জী ডিমিট্রভ টিটোর জাতীয়তাবাদী কুচক্রীদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্ত ফ্রন্ট ও সোস্যালিজমের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে নির্ম্মমভাবে সংগ্রাম করেন।

যিনি শ্রমিকশ্রেণীর চরম আদর্শের জন্য, কমিউনিজমের আদর্শের জন্য নিজের সমগ্র বীরত্ব পূর্ণ জীবন দিয়াছেন, সেই ডিমিট্রভকে হারাইয়া গোটা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী একজন তেজস্বী যোদ্ধাকে হারাইল। ডিমিট্রভের মৃত্যুতে সমগ্র আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের এবং স্থায়ী শান্তি ও জনতার গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকারী সমস্ত যোদ্ধাদের এক বিপুল ক্ষতি হইল। শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে আত্মত্যাগপূর্ণ সংগ্রামে, লেনিন ও স্টালিনের মহান আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ডিমিট্রভ গোটা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পরম প্রিয় ছিলেন।

লেনিন ও স্টালিনের সহযোগী কমরেড, সুদৃঢ় বিপ্লবী ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যোদ্ধা ডিমিট্রভের জীবন শান্তি, গণতন্ত্র ও কমিউনিজমের আদর্শে সংগ্রামকারী সমস্ত যোদ্ধার নিকট উৎসাহপূর্ণ প্রেরণার জীবন্ত নিদর্শন হইয়া থাকিবে।

প্রিয় বন্ধু, কমরেড, বিদায়!

স্বাঃ :—আন্দ্রেয়েভ, বেরিয়া, বুলগানিন, ভোরোশিলভ, কাগানোভিচ, কাশিগীন মালেনকভ, মিকোইয়ান, মলোটভ, পোনোমারেনকো, পোপোভ, পোস্পেলভ, স্টালিন, সুসলভ, ক্রুশচেভ, ভেরনিক, স্কিরিওটোভ।

রংপুর জেলে ইপ্তারে চিনি চাহিবার ফল

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

দীর্ঘ অনশন ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছেন। শরীর তখনও দুর্ব্বল। তাহার উপর রমজানের রোজা। এই অবস্থায় এইরূপ প্রচণ্ড লাঠির আঘাতের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর প্রিয় নেতাদের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহাদের অপরাধ তাঁহার রোজার দিনে ইপ্তারের জন্য সামান্য রুটি, চিনি, ফল দাবী করিয়াছিলেন। তাহার বদলে পাইয়াছেন লাঠির আঘাত।

ইপ্তারের জন্য সাধারণ কয়েদীদেরও বরাবরই রুটি, ফল, চিনি প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু হঠাৎ গত ২৯শে জুন রুটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১ ছটাক চিনির বদলে আধ ছটাকের হুকুম হইল। 'পাক' সরকার ভাবিলেন এইভাবেই রাজনীতিক বন্দীদের শায়েস্তা করিবেন।

রোজা শেষে কয়েদীরা ইপ্তারের জন্য বসিলে জব্বর ও কুট্টি জমাদারকে জিজ্ঞাসা করেন রুটি নাই কেন? চিনিই বা কম কেন?

'পাক' সরকারের 'পাক' জমাদার কয়েদীর এই বেয়াদবীতে ক্ষেপিয়া যায় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। নেতারা ইহারই প্রতিবাদ করিতে উঠেন। সমস্ত কয়েদী নেতাদের সমর্থন করে।

নিজেদের দুষ্কর্ম্মের ফলে জেল কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই শংকিত, এই প্রতিবাদে কর্ত্তারা ভাবিলেন বুঝি জেলে বিদ্রোহ সুরু হইয়া গিয়াছে। অমনি পাগলা ঘন্টি বাজিল। সাথে সাথে দলে দলে লাঠিধারী পুলিস আসিল। রোজায় রত কয়েদীদের আর ইপ্তার হইল না। লাঠির আঘাত খাইয়া রোজা ভাঙ্গিতে হইল।

সব চাইতে বেশী আক্রোশ আসিয়া পড়িল শ্রমিক নেতাদের উপর। ক্ষত বিক্ষত দেহে জব্বর ও কুট্টি এখন জেল হাসপাতালে।

অষ্ট্রেলিয়ায় জঙ্গী ধর্ম্মঘট

সারা অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত নাবিক গত ১২ই জুলাই এক দিনের সাধারণ ধর্ম্মঘট করেন।

ধর্ম্মঘটী কয়লা খনি শ্রমিকদের জন্য সাহায্য বন্ধ করিবার জন্য ফ্যাসিস্ট সরকার খনি শ্রমিক ও লোহা শ্রমিক নেতাদের জেলে পুরিয়াছে—তাহারই প্রতিবাদে এই ব্যাপক ধর্ম্মঘট।

ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি

১২ই জুলাই অষ্ট্রেলিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ট্রিবিউন' অফিসে পুলিস হানা দেয়।

ফ্যাসিস্ট সরকারের আদালত এক আইন জারি করিয়াছে যে, ধর্ম্মঘটের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ইউনিয়নকে অষ্ট্রেলিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সাহায্য করিতে পারিবে না।

এই ফ্যাসিস্ট "আইন" অচল। অষ্ট্রেলিয়ার ধর্ম্মঘট সংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই পরিচালিত হইতেছে।

নোংরা কয়লা

নেহরু সরকারের ৭ হাজার টন কয়লা অষ্ট্রেলিয়ার মাটি ছুঁইতে পায় নাই। কয়লা খনি শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ভাঙা এই নোংরা কয়লা কোন শ্রমিক স্পর্শও করেন নাই।

তাহার উপর আবার যাহাকে বলে "গোদের উপর বিষফোঁড়া—কয়লা গিয়াছে কানাডার জাহাজে। কোন সাচ্চা শ্রমিক সে জাহাজের মাল খালাস করিয়া কানাডার নাবিক ধর্ম্মঘটের দুশমনি করিবেন না।

বি-এন-আর গ্যাংম্যানদের ধর্ম্মঘট

একই কাজের জন্য একই মজুরির দাবীতে সাঁতরাগাছি ও খড়্গপুরের মাঝে ৪ শত গ্যাংম্যান গত ৫ই জুলাই বেঙ্গল নাগপুর রেলশ্রমিকদের লালঝাণ্ডা জঙ্গী কমিটির নেতৃত্বে ধর্ম্মঘট করেন।

শ্রমিকরা দাবী করেন যে, স্থায়ী ও অস্থায়ী গ্যাংম্যানদের সমান বেতন দিতে হইবে।

অস্থায়ী গ্যাংম্যানদের ভিতরও তিন রকমের মজুরি রহিয়াছে : (১) রামরাজাতলা-সাঁতরাগাছি বিভাগে—৬৫৲ টাকা, (২) খড়্গপুর পর্য্যন্ত অন্যান্যদের—৪৪৲ টাকা; (৩) উড়িষ্যা ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী অঞ্চলে—৩৫৲ টাকা। শ্রমিকরা দাবী করিয়াছেন যে, এই পার্থক্যও চলিবে না।

মজিল

গ্রামে, মাঠে, কারখানায়, শহরের গরীব পল্লীতে মেহনতী মেয়েদের অভিযান

বিধবা পুষ্প শিশু মেয়ের হাত ধরে বাপের বাড়ীতে এসে দাঁড়ালো। গরীব বাপেরই সংসার চলে না। কিছুদিন বাদে মা বাবাও মারা গেলেন—ছোট ভাইবোন ও নিজের শিশু মেয়ের সমস্ত দায়িত্ব পড়লো পুষ্পের উপর। ভাই-বোনদের নিত্য অর্দ্ধাহার, অনাহার পুষ্পকে পাগল করে তোলে; জমিদার-মহাজনের জুলুমে তার চোখে আগুন জলে। পেটের তাগিদে কৃষকের ঘরের মেয়ে পুষ্পকেও পথে বের হ'তে হোলো—মাছের ঝাঁকা মাথায় ক'রে পুষ্প বউবাজারে মাছ বেচতে সুরু করলো। মাছবেচা, গ্রামে ধানভানা, জলতোলা, গরুদেখা—সবই পুষ্পকে করতে হয়। তবুও সংসার চলে না।

মাছ বেচে ফেরার পথে পুষ্প অবাক হয়ে দেখে—রাস্তায় রাস্তায় লালঝাণ্ডা হাতে শ্রমিকদের মিছিল।

লালঝাণ্ডার ডাক এলো

পুষ্পদের গ্রাম ডুবিরভেড়ীতেও লাল-ঝাণ্ডার ডাক এলো। কৃষক সমিতির ডাক এসে পৌঁছলো পুষ্পের কাছে। তে-ভাগার আন্দোলনে সবার আগে পা বাড়ালো পুষ্প।

সংসারের কাজ সেরে যখন অন্য মেয়েরা শান্ত হ'য়ে একটু বিশ্রাম করতো সে সময় পুষ্প কৃষক সমিতির রসিদ বই নিয়ে আশে পাশের গ্রামের মেয়েদের সভ্য করতে বেরুত; জোতদার-জমিদারের শোষণের হাত থেকে বাঁচার পথ কি তা সবাইকে বোঝাত। দেখতে দেখতে পুষ্প এই এলাকার একজন অক্লান্তকর্ম্মী হ'য়ে উঠলো।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ সাল। কৃষক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য রাত্রির অন্ধকারে সশস্ত্র পুলিসের হামলা সুরু হ'লো হুগলীর এই ডুবীরভেড়ী গ্রামে। মেয়েদের নিয়ে পুলিস হামলা রুখতে এগিয়ে গেলো পুষ্প। ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিসের গুলি এসে পড়লো মেয়েদের বুকে—আরো নিনজন মেয়ের সাথে পুষ্পও প্রাণ দিল। ডুবীরভেড়ীর সবুজ মাঠ কৃষকের মেয়ের বুকের রক্তে লাল হয়ে গেলো।

* * * *

পুষ্পতো একা নয়

যে আগুন জ্বলেছিলো গরীব কৃষক মেয়ে পুষ্পের বুকে সেই স্ফুলিঙ্গ আজ দিকে দিকে গ্রামে শহরে মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। যারা ছিল চিরদিন অবগুণ্ঠিতা, যারা সমস্ত নির্য্যাতনের বোঝা নীরবে মাথা পেতে নিত তারা আজ অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিচ্ছে, সংগ্রামের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াচ্ছে, পিছিয়ে পড়া লোককে লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করছে।

এ রকম আর একটি মেয়ে ঘুঘু—

দিনমজুরের বৌ। ঘুঘু কৃষক সমিতিতে নাম দিয়েছে ব'লে স্বামী তাকে মারধর করে, ঘরে বন্ধ করে রাখে। একদিন ঘুঘুকে কাটারি নিয়ে যখন তার স্বামী কাটতে যায়, তখন সে-ও বঁটি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। ঘুঘু স্বামীকে বলে—"বেশ করবো, সমিতির সভ্য থাকবো; এতো গরীবদের বাঁচার জন্য লড়াই—তুমি একজন দিনমজুর, তোমার থাকার ঠাঁই নাই, পরণে কাপড় নাই, দুবেলা ভাত খেতে পাও না; তোমার লজ্জা করছে না এই জোতদার-জমিদারের লেজুড় হতে?"

এইভাবে ঘুঘু তার স্বামীকে ফেরায়—সমিতির মধ্যে আনে।

* * *

ভাঙড় গ্রামে—

চব্বিশপরগনার ভাঙড় গ্রাম। এখান-কার মেয়েরা কিছুদিন আগে মাত্র সমিতির কথা শুনেছে। উৎসাহ তাদের অফুরন্ত; কিন্তু সবাই ভাবছে: "আমরা ভাই অশিক্ষিত মেয়ে আমরা কি একা কিছু করতে পারবো?

তারপর তারা শোনে ডুবীরভেড়ী, মেদিনীপুর, মাসিলার মেয়েদের বীরত্ব-পূর্ণ ইতিহাস কিভাবে তাদের-ই মতন নিরক্ষর গরীব মেয়েরা লড়াই করছে। মন তাদের দৃঢ় হ'য়ে ওঠে। ৫ই জুন হঠাৎ কয়েকটি জোতদার-জমিদার পক্ষের দালাল মেয়েদের সঙ্গে রাখাল নিয়ে তাদের বচসা হয়। গরীব চাষী মেয়েরা দালাল মেয়েদের রেহাই দেয় না—ঝাটাপিটা করে তাদের ঠাণ্ডা করে দেয়। মেয়েদের লড়াইর ক্ষমতা দেখে কৃষক ছেলেরাও দালাল ঠেঙ্গাতে সুরু করে। গ্রামবাসীদের সভায় দালালদের বিচার হয়—দালালরা মাপচেয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, আর দালালী করবো না। বিজয়ী জনতার মিছিল বের হলো—মিছিলের সামনে এসে দাঁড়ালো কৃষক মেয়েরা।

শক্ত হাতে লালঝাণ্ডা ধরেছে মেয়েরা

৬ই জুন আবার মিছিল বেরুলো—কৃষক মেয়ে পুরুষদের বিরাট মিছিল; মেয়েরা শক্ত করে লালঝাণ্ডা ধরেছে। দু'খানা গ্রাম ঘোরা হলো। এতবড় মিছিল দেখে মহাজনরা, জোতদাররা দরজা জানালা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। সেই দিন-ই তারা পুলিস ডেকে আনে। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পুরুষ জমা হয়। মেয়েরা এগিয়ে যায়। পুলিস ভয় দেখিয়ে বলে—"পালাও, নয় গুলি করবো।" কিন্তু মেয়েরা পাল্টা জবাব দেয়—বলে: "গুলি করে কটাকে মারবে? এক্ষুণি হাজার হাজার লোক বেরিয়ে আসবে।"

সঙ্গে সঙ্গে কৃষক মেয়ে পুরুষের দল এগিয়ে আসে। সুদৃঢ় মেয়েদের সামনে সেদিন পুলিস দলকে ফিরে যেতে হয়।

পরদিন ৭ই জুন। এবার সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর সাথে আসে স্বয়ং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব। তারা এসেছে কৃষক মেয়েদের শায়েস্তা করতে। বুভুক্ষু কৃষক মেয়ে পুরুষেরা জীবনের তাগিদে মৃত্যুকে তুচ্ছ করেই এগিয়ে আসে।

লাঠি আর টিয়ারগ্যাসে সেদিন গ্রামের চেহারা বদলে যায়। কৃষকেরা পিছু হঁটে না—মেয়েরা বীরত্বের সাথে অগ্রসর হয়। তিন ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলে।

এক বুড়ী মা'কে পুলিস পাকরাও করে এবং বলে....."বেটী, তুই আমাদের মারার জন্য অস্ত্র নিয়ে তৈরি ছিলি—এখন কোথায় পালাবি?"

নির্ব্বিকার চিত্তে বুড়ী মা বলেন: "আমাকে তোমরা জেলে নিয়ে যাবে—এই ত?"

তখন পুলিসেরা তাকে প্রচণ্ড জেরা করে—জিগ্যেস করে, কে কে তাদের সঙ্গে ছিলো, তাদের নাম কি?

কিন্তু বুড়ীমা'র মুখ থেকে তারা একটি কথাও আদায় করতে পারেনি।

গ্রামের ঘরে ঘরে সেদিন খানাতল্লাসী আর পুলিসের তাণ্ডব চলে। মেয়েরা দাঁতে দাঁত চেপে বিক্ষোভে জ্বলে উঠে।

* * *

আর একটি ঘটনা—মালদহের

৭ই জুন সুদূর মালদহে তিনখানা গ্রাম থেকে ৬০ জন মেয়ের জুলুমবিরোধী মিছিল শহরে গিয়ে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট ঘেরাও করেছিল। এই ধরনের মিছিল এই জেলায় এই প্রথম।

কিছুদিন ধরেই মালদহের গ্রামে গ্রামে পুলিসের তাণ্ডব চলেছে। কসুর হল যে, এই জিলার কোন কোন অঞ্চলে কৃষকেরা জমি দখলের লড়াই সুরু করে অনাহারের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছে। যথা জিয়াড়া অঞ্চলের বিদ্রোহী কৃষক ৮।৯টা জলা দখল করেছে এবং তিনজন বিখ্যাত চোরাকারবারীর গোলা চড়াও করে তার মজুত করা ফসল ও চোরাই মালের কাপড় উদ্ধার করে নিজেদের মধ্যে বিলি করেছে। এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে চাষী মেয়েরা। গ্রামে গ্রামে যখন পুলিসের হামলা হয়েছে মেয়েরাই আগে রুখে দাঁড়াচ্ছে। নরহাট্টা গ্রামে পুলিস জনৈক কর্ম্মীর খোঁজে গেলে সেই বাড়ীর মেয়েরা পুলিসকে তেড়ে আসে। সেই কর্ম্মীর স্ত্রী দরজা আগলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পুলিসকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। ভর্ত্তিটারী গ্রামের চাষী মেয়েরা ঝাঁটা নিয়ে পুলিসকে তাড়া করে, গালাগাল করে তাদের বাড়ী ছাড়া করে। বাড়ীর পুরুষদের পুলিসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মেয়েরা নিজেরাই হাটবাজার করছে, এমন কি মাঠে গিয়ে ফসল বুনানী ও কাটানীর কাজ করছে। তাই ৭ই জুনের জুলুমবিরোধী মিছিল মেয়েরাই সব আগে বার করল। লোকে এই মিছিল দেখেছে আর বলেছে: "সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে এই রকম মিছিলই হওয়া দরকার—ধন্যি গ্রামের মেয়েদের সাহস" যখন ধ্বনি দিতে দিতে মেয়েরা কোর্ট ঘেরাও করলে তখন পুলিস বন্দুক উঁচু করে ধরেছিল, তাতে মেয়েরা বলে: "মারো গুলি, গুলিকে আমরা পরোয়া করি না।" কিন্তু সেদিন কৃষক, মজুর, ছাত্র, মহিলাদের মিলিত শক্তি দেখে পুলিস লাঠি গুলি কিছুই চালাতে সাহস করেনি। সাধারণ পুলিসের মধ্যে বরং সহানুভূতিই লক্ষ করা গেছে। মিছিল গ্রামে ফেরার পথে নৌকার মাঝি ভাড়া চাইলে ঘাটে মোতায়েন ৩।৪ জন পুলিস মেয়েদের পোস্টার দেখে বলে: "ও মাঝি বিনা পয়সায় ওদের পার করে দাও।"

* * *

শুধু কৃষক মেয়ে নয়, শ্রমিক মেয়েরাও আগুয়ান হইয়াছেন।—

হাওড়ার বাউড়িয়ার কোর্ট প্লটার টচফলের লালঝাণ্ডা শ্রমিকনেতা বিজয় হাজরা। ৩০শে এপ্রিল তাঁর উপর ছাঁটাইর হুকুম হয়। কিন্তু মালিকের সে হুকুম কাগজে কলমেই থেকে যায়। মিলের ছয় হাজার শ্রমিক একযোগে সশস্ত্র পুলিসের বাধা অগ্রাহ্য করে তাদের প্রিয় নেতা বিজয়কে নিয়ে কাজে গিয়েছে এবং বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। এরকম চলেছে সতেরো দিন। তারপর মিল মালিক মিলে লক-আউট ঘোষণা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এ অভিযানে মেয়েরা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে। ১৩ই মে বিজয় কখন কারখানা থেকে বের হবে তার জন্য পুলিস অপেক্ষা করতে থাকে। ৫০০ শ্রমিক মেয়ে পুলিসের সামনে এসে রুখে দাঁড়ালো—তারা বললো: "আমাদের মরদকে আমরা ধরতে দেব না, সাহস থাকে তো আমাদের গুলি করে বিজয়কে ধর।"

পুলিসের এ সাহস আর হয়নি। সহস্র সহস্র শ্রমিক মেয়ে পুরুষের বন্যার সামনে পুলিসের ব্যারিকেড ভেসে যায়।

* **আসানসোলের** ধাঙ্গর মেয়েরা নিজেদের দাবী আদায়ের লড়াইয়ে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিয়েছে। ১১ই জুন তারা তাদের বহুদিনের প্রত্যাখ্যাত দাবী—বাঁচার মতন মজুরি, পাকা চাকুরী, কোয়ার্টার প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, ছুটি ইত্যাদি আদায়ের জন্য ধর্ম্মঘট সুরু করে। ১৪ইজুন সারা ধাঙ্গড় বস্তি দুই লরী সশস্ত্র পুলিস ঘেরাও করে। শ্রমিকদের নেত্রী নলিনী দেবীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সমস্ত বস্তির ধাঙ্গড় মজুরেরা তাদের প্রিয় দিদিমনিকে ঘিরে দাঁড়ায়। একজন মেয়ে মজুর এগিয়ে এসে বলে: "দারোগা সাহেব তোমার কত গুলি আছে যে আমাদের দিদিমনিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সাহস কর? আগে আমাদের দুশো মেয়ে মজুরকে গুলি করে মারো তারপর আমাদের দিদিমনিকে নিয়ে যেও।" শ্রমিকরা জোর গলায় ঘোষণা করে, "আমাদের দিদিমনিকে ধরতে হলে বস্তির পুকুরের জল আর সাদা থাকবে না—লালে লাল হয়ে যাবে।" শ্রমিকদের জঙ্গী দৃঢ়তা দেখে পুলিস চলে যায়, কিন্তু আবার অধিক সংখ্যায় ফিরে আসে। এবার শ্রমিকরা তাদের বস্তির ধারেকাছে ঘেঁষতে দিল না।

পরদিন দিদিকে নিয়ে ২০০ মেয়ে শ্রমিক সামনে হেঁটে বিরাট শ্রমিক মিছিল বের হল—সমস্ত শহর ঘুরল—মিউনিসি-পাল অফিসের সামনে হাজার মজুরের সভায় দিদি প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিলেন—

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিঃ-ভাঃ-ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন আহ্বান

গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও অধিকারের জন্য কংগ্রেস

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ। এরই মধ্যে কংগ্রেসী রামরাজত্ব নির্জ্জলা ধনিক ডিক্টেটরশিপ হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করতে সুরু করেছে। শ্রীদুর্গার ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের উপর চলেছে গুলি। কোন্নগরে আঁতুরঘরের শিশুকে হত্যা করেছে ধনিক-শ্রেণীর কংগ্রেসী বরকন্দাজ। কোয়েম্বাটুর আর বাসন্তীর শ্রমিক ধর্ম্মঘট সুরু করেছে প্রতিরোধের নূতন ইতিহাস। স্কুল-কলেজে মাইনে বাড়ানোর প্রতিবাদে বিরাট ছাত্র মিছিল বেরিয়েছে লক্ষ্ণৌয়ের রাস্তায়। সেই মিছিলের উপর অশ্বারোহী পুলিস চালিয়ে দেওয়া হল, ৭০০ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেসী মন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দ হুকুম দিলেন, এমনিকরেই 'ছাত্রবিদ্রোহকে আমরা ধ্বংস করব।' বাংলা দেশের কালাকানুনের প্রতিরোধ করতে গিয়ে গান্ধীভক্ত প্রফুল্ল ঘোষের 'অহিংস' বুলেটে রিলিফকর্ম্মী ছাত্র শিশির মণ্ডল শহীদ হলেন।

এই পটভূমিকায় বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন আহূত হয়েছে। কংগ্রেসী মন্ত্রী মোবারজী দেশাই হুকুম দিয়েছেন, প্রকাশ্য সম্মেলন চলবে না। ৩১শে ডিসেম্বর বেলা চারটের সময় মোবারজীর পুলিস বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করে, কামগড় ময়দান অধিকার করলেন দলের পর দল ছাত্র-ছাত্রী। ১৯ রাউণ্ড গুলি চলল, লাঠির বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল, টিয়ার গ্যাসে ভরে গেল সারা ময়দান কিন্তু তবু সম্মেলন ঠেকাতে পারলো না 'মোবারজীর' পুলিস। আহত সাথীদের রক্তাক্ত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে বোম্বাই ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদিকা সুশীলা ম্যেভিমান ঘোষণা করলেন—"ধনিক শ্রেণীর সরকারের কাছে শিক্ষা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র কোনো কিছুই আশা করবার নেই। ছাত্র-সমাজের অধিকার রক্ষার জন্য একটি পথই খোলা আছে—সে পথ কামগড় ময়দানের পথ, সংগ্রামের পথ।" গত দেড় বছর সারা ভারতের বিপ্লবী ছাত্র সমাজ সেই পথেই অগ্রসর হয়েছে।

২০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ধর্ম্মঘট

গত এক বছরে সারা ভারতের প্রতিটি কেন্দ্রে ছাত্র সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠেছে শিক্ষার দাবীতে, বিপ্লবী ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায়, শ্রমজীবী জনতা ও ছাত্র-সমাজের উপর সরকারী আক্রমণের প্রতিরোধে **কুড়ি লক্ষের বেশী ছাত্র-ছাত্রী সারা ভারতের এই ধর্ম্মঘটের বন্যায় যোগ দিয়েছে।** শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে এবং পরীক্ষাকে শিক্ষা সংকোচনের কাজে পরিণত করে ধনিক সরকার শিক্ষাকে ধনীর দুলালদের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত করছে। তারই বিরুদ্ধে তীব্রতম ছাত্র সংগ্রাম হয়েছে ভারতের সর্ব্বত্র।

১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে ত্রিবাঙ্কুরে কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা উঠিয়ে দেবার প্রতিবাদে ছাত্রীদের কলেজের সামনে যখন ছাত্র-ছাত্রী পিকেটিং করছিলেন তখন সরকারী পুলিস তাঁদের উপর নৃশংসভাবে লাঠি চার্জ্জ করে। কলেজের মধ্যে ঢুকে পর্য্যন্ত লাঠি চালায় ও ছাত্র নেতাদের গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘটও ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত। কম্পার্টমেণ্টালের দাবীর লড়াই দমননীতির বিরুদ্ধে সাধারণ লড়াই-এ পরিণত হয়। স্লোগান ওঠে, "কম্পার্টমেণ্টাল মানতে হবে," "ধৃত ছাত্র নেতাদের মুক্তি দিতে হবে" 'অত্যাচারী পট্টমথানু পিল্লাই মন্ত্রিসভায় পদত্যাগ চাই।' ধনিকশ্রেণীর দালাল ছাত্র কংগ্রেসের নেতাদের সমস্ত বাধা ব্যর্থ করে এক লক্ষ ছাত্র ধর্ম্মঘটে অংশ নেয় সারা ত্রিবাঙ্কুরে। ছাত্রদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে পরদিন সাধারণ ধর্ম্মঘট করে, দমননীতিবিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান হাজার হাজার শ্রমিক। লক্ষাধিক শ্রমিক, ছাত্র ও নাগরিকের সভায় ছাত্রদের দাবী সমর্থিত হয়। শ্রমিকদের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতায় এই অভূতপূর্ব্ব প্রতিরোধে দমননীতির রথচক্র পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তখনকার মত সমস্ত দাবী স্বীকৃত হয় ও পিল্লাই মন্ত্রিসভা শেষ পর্য্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

পরীক্ষার ফাঁদ

১৯৪৮-এর ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে টেস্ট পরীক্ষার ছলে অধিকাংশ ছাত্রকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত করবার প্রতিবাদে সারা বিহারে ছাত্র ধর্ম্মঘট সুরু হয়। একজন ছাত্রও টেস্ট পরীক্ষা দিতে যায় না ও টেস্ট পরীক্ষা পরিত্যক্ত হয়। জবাবে কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত কলেজ বন্ধ করে দেন। ফের জানুয়ারীতে কলেজ খুললে আবার ত্রিশ হাজার ছাত্রের ধর্ম্মঘট সুরু হয়। আবার বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার ছাত্ররা "বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার ছাত্রদেরই" এই দাবীকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢোকেন। পুলিস তাদের উপর নৃশংসভাবে লাঠি চালায়। ছাত্ররা তখন এম, এল, এ ; ভাইসচ্যান্সেলার ও মন্ত্রীদের বাড়ী ঘেরাও করতে থাকেন। এইভাবে দুইমাস তাঁরা সংগ্রাম করেন।

মাইনে বাড়ানোর বিরুদ্ধে ১৯৪৮-এর জুলাই মাস থেকে ৬৫০০০ ছাত্র ফী কমানোর দাবীতে বোম্বাইয়ে ধর্ম্মঘট করেন। ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে আবার মেডিকেল ছাত্রদের মাহিনা বাড়ানোর প্রতিবাদে বোম্বাই-এর ছাত্ররা সাধারণ ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রা করেন। শোভাযাত্রার উপর লাঠি চলে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী গিলডার "কিছুতেই মাইনে কমাবো না।" এই হুমকী দেওয়া সত্ত্বেও পিছনের দরজা দিয়ে আপোষ করে ছাত্র কংগ্রেসের সোস্যালিস্ট নেতারা মেডিক্যাল ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে পিছন থেকে ছুরী মারেন। মাইনে বাড়ানোর বিরুদ্ধে এই লড়াই বোম্বাইতে এবছর আবার নূতন পর্য্যায়ে সুরু হয়েছে। ১৯৪৯-এর জুলাই মাসে কর্পোরেশনের প্রাথমিক স্কুলের শিশু ছাত্ররা পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করে।

ছাত্র-শিক্ষক মিলিত অভিযান

শিক্ষকদের জীবন ধারণের উপযুক্ত মাইনের দাবীর সমর্থনেও ছাত্ররা নির্ভীক সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। যুক্ত-প্রদেশে ৪০,০০০ শিক্ষকের এক মাস-ব্যাপী ধর্ম্মঘটের সমর্থনে সমস্ত লক্ষ্ণৌএর স্কুল কলেজে ধর্ম্মঘট হয়। কয়েক সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর মিছিলের উপর পুলিস হিংস্র আক্রমণ করে। লক্ষ্ণৌএর একজন ছাত্র-কর্ম্মী ১৮ ঘণ্টা অজ্ঞান হ'য়ে থাকেন। বহু ছাত্র আহত হন। এই হিংস্র আক্রমণের প্রতিবাদে সারা যুক্ত প্রদেশে ছাত্র বিক্ষোভ ফেটে পড়ে।

১৯৪৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতার ছাত্ররা ছাত্রসংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় রচনা করলেন ধর্ম্মঘটী পোর্ট শ্রমিক ও সিপাহীদের সমর্থনে বিরাট ছাত্রমিছিল করে। ছাত্রকংগ্রেসের দালাল নেতারা ১০০০০ ছাত্রের সভায় পোর্টের উপর প্রস্তাব আনতে বাধা দিল। ছাত্র সাধারণ বিপুল উৎসাহে তাদের বাধাকে চূর্ণ করে দিল এবং পোর্টের সমর্থনে উত্থাপিত ছাত্র ফেডারেশনের প্রস্তাবকে সমর্থন করে মিছিলে বেরোলেন। অমৃতবাজারে পুলিস আক্রমণকে ব্যর্থ করে আবার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ছাত্ররা পোর্টের শ্রমিক সভায় যোগ দিলেন।

৩০০০ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর মিছিলের উপর নেহরু সরকার নৃশংস লাঠি চালাল, নেহরুর 'বুদ্ধভক্তি' ও "অহিংসার" ভণ্ডামিকে প্রকাশ ক'রে দিয়ে প্রতিবাদে ১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারী কলকাতার ছাত্রসমাজ কলকাতার শ্রমজীবী জনতা ও নাগরিকদের সমর্থনে এক অপূর্ব্ব সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী ইতিহাস রচনা করলেন।

ব্যারিকেডের লড়াই

১৮ই তারিখে কয়েক হাজার ছাত্রের সভায় মিছিল বার করতে না দেবার সঙ্কল্প নিয়ে বিধান সরকারের পুলিস এসে পথ আটকায়। চারঘণ্টা ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে দুর্গ ক'রে, ছাত্রসসাজ গড়ে তোলেন এক ঐতিহাসিক প্রতিরোধ। গুলির জালকে জবাব দেন ইটের বৃষ্টি দিয়ে। সশস্ত্র পুলিসবাহিনী কলেজ স্কোয়ারেরর মধ্যে ইঁটে যায় আর সেখান থেকে গুলি করে হত্যা করে কিশোর তাপসকে, দিলীপ দ্বিবেদীকে, জীপ্তিকে! চারপাশের জনতা লড়াইএ নাবেন। জনতার ক্রোধের আগুনে ধনিক সরকারের বাস আর বিদেশী ধনিকের ট্রাম বাস পুড়িতে থাকে। পরের দিন শহীদ কমরেডদের মৃতদেহ আনতে আবার ছাত্ররা পথে বেরোন ; মর্গের দিকে অগ্রসর হন। আগের দিনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আজ সারা কলকাতার ছাত্রসমাজ ধর্ম্মঘট করেছে। মর্গের সামনে আবার পুলিসের বেপরোয়া গুলির মুখে তৈরী হয় জলের ট্যাঙ্ক আর ডাষ্টবিনের প্রতিরোধ, আবার চলে ইঁট। আওয়াজ উঠতে থাকে "ইয়ে সরকার ফ্যাসিস্ট হ্যায়", "ফ্যাসিস্ট কংগ্রেসী সরকার ধ্বংস হোক", "১৪৪ ধারা ধ্বংস কর", ছাত্রদের রক্ষা করতে যেয়ে প্রাণ দেন বস্তির শ্রমিক করিমুদ্দীন! ছাত্র-জনতা কংগ্রেস সরকারের নগ্নরূপ চিনে নিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তাই কংগ্রেসের বড় কর্ত্তা সুরেশ ব্যানার্জ্জি ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হ'ল।

পরদিন কলকাতার ও ২৪পরগনার শহরতলীর ৪০০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করলেন। ব্যারিকেড আর ধর্ম্মঘটের সামনে বিধান সরকার ইঁটে যেয়ে ১৪৪ ধারা তুলে নিতে বাধ্য হল। ধনিক সরকারের দালাল ছাত্রকংগ্রেসের নেতারা অবশ্য এই গৌরবময় প্রতিরোধকে 'অ্যাডভেঞ্চারিজম' ব'লে নিন্দা করে ধৃষ্টতার চরম দেখাল।

দালালদের পরিচয়

নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে পলায়ন করে বিদ্যাসাগর কলেজের এক সুরক্ষিত ঘরে তারা এই প্রতিরোধকে নিন্দা ক'রে 'জনসভা' ডাকল আর সেই জনসভায় ৮০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪০ জন আবার তারই প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করল। ধনিক সরকারের পদলেহী দালালরা ১১ জন শহীদের রক্তে যার হাত রঞ্জিত সেই মন্ত্রীর কাছে "দাবী" নিয়ে "আবেদন" করতে গেল। ১৮ই-১৯শের মৃত্যুঞ্জয়ী ছাত্র অভ্যুত্থানে অংশ নিল যে সহস্র সহস্র ছাত্র, কংগ্রেসের ধনিক ডিক্টেটরশিপ রাষ্ট্রের ধ্বংসের আওয়াজে মুখর করে তুলল যারা দুদিন ধরে কলকাতার শহর, নিজেদের সংগ্রামকে উচ্চস্তরে নেবার জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর দিকে মুখ ফিরিয়ে শহরে কারখানায় কারখানায় বক্তৃতার সময় শ্রমিকের অকুণ্ঠ সমর্থনের মধ্যে যারা শক্তিসঞ্চয় করল তাদের এই নতুন কায়দার ব্যারিকেড সংগ্রাম ভারতবর্ষের ছাত্রসংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করল।

তারপর থেকে কলকাতার ছাত্র-সমাজের অগ্রণী অংশ বার বার পথে নেবেছে পুলিসের গুলি আর ১৪৪ ধারাকে তুচ্ছ করে। রাজবন্দী মুক্তির দাবীতে মেয়েদের মিছিলে নিহত কমরেডের শবদেহ নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ছাত্ররা যে শবযাত্রা মিছিল বার করেন তাতে বউবাজার থেকে শ্যামবাজারে যাবার পথে ২২।২৩টি ব্যারিকেড রচনা করে হিংস্র পুলিসকে রুখতে রুখতে অগ্রসর হন তাঁরা।

নেহরু ফিরে যাও

এই সেদিন ১২ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী জনতা "কংগ্রেস সরকার নিপাত

জনগণের মুক্ত গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠার

মঞ্জিল

ধনিক ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামে অগ্রসর হও

যাক" এই ধ্বনি গণসংগ্রাম ও নির্ব্বাচন থেকে স্পষ্ট ঘোষণার পর ধনিকসরকারের সর্ব্বাধিক "জনপ্রিয়" নেতা নেহরু কলকাতায় এলেন পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে ধোকা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কলকাতার ৭০০০ ছাত্র স্কুলে কলেজে ধর্ম্মঘট ক'রে আওয়াজ তুললেন, "খুনী নেহরু ফিরে যাও"। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বার বার মিছিল বার করলেন, কালো পতাকা নিয়ে। শ্যামবাজারের মোড়ে সহস্র সহস্র ছাত্র ও জনতা কলকাতায় ঢোকবার মুখে ধনিকসমাজের এই "বীর'কে জুতো, কালো পতাকা এবং "খুনী নেহরু ফিরে যাও" আওয়াজে অভ্যর্থনা জানালেন। "নেহরু ফিরে যাও" আন্দোলনে আবার ছাত্র কংগ্রেসের নেতাদের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছাত্রকংগ্রেসের নেতারা দেখলেন যে, ছাত্ররা নেহরু সম্পর্কে এত বিরক্ত যে "নেহরু ফিরে যাও" আন্দোলনের থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ দূরে রাখলে ১৮।১৯শে জানুয়ারীর মত ছাত্রসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। তাই ছাত্রকংগ্রেসের কিছু অংশ ধর্ম্মঘট ডাকলেন পরদিন। কিন্তু যখন মিছিল নিয়ে বেরোনর প্রশ্ন হ'ল তখন পুলিসের স্তরে তাকে বাধা দেওয়া। স্কুলের ভিতরে এরজন্যে আছেন, হেড মাস্টাররা, কলেজে অধ্যক্ষরা। তা ছাড়া কলেজের স্কুলের ভিতরে ও বাইরে আছে ভাড়াটে গুণ্ডারা এবং তারপর সর্ব্বঘটে বিরাজমান পুলিসেরা, এই হেডমাস্টার-গুণ্ডা-পুলিস চক্র দিয়ে ধনিক সরকার ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনাকে ধ্বংস করবার মরীয়া অভিযানে নেমেছে। স্কুলে কলেজে পোস্টার, লিফলেট, বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করে হুকুম জারি করা হয়েছে। কোনও ছাত্র সেই চেষ্টা করলে তখনই অধ্যক্ষ বা হেডমাস্টারের দায়িত্ব, তার নাম সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে পৌঁছে দেওয়া এবং তাকে তাড়ানের চেষ্টা করা।

কংগ্রেসী সরকারের গেস্টাপো বাহিনী

তারপর ধর্ম্মঘট করলে পুলিসের আক্রমণ ছাড়াও গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ আছে। গত কিছুদিন এই গুণ্ডা আক্রমণ কলকাতার ছাত্র আন্দোলনে সরকারের একটা অতিরিক্ত পুলিসের কাজ করছে। দেশবন্ধু স্কুলে মেয়েদের ধর্ম্মঘটের উপর এরা আক্রমণ করে। বৌবাজার স্কুলের মাহিনা কমানোর দাবীতে ধর্ম্মঘট মিছিলের উপর এরা বোমা ছোঁড়ে। এবং সর্ব্বশেষ শ্যামবাজারের মোড়ে নেহরুর বিরুদ্ধে চলছে। ছাত্র কংগ্রেসের রং-বেরংয়ের ধনিক দালালরা মিলে ঘোষণা করছে যে, ছাত্র আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সরকারী কলেজ ইউনিয়ন ও স্কুল ইউনিয়নগুলির ভিত্তিতে তারা এক ছাত্র প্রতিষ্ঠান তৈরী করবে যার উদ্দেশ্য হবে "সকলের স্বার্থ-সম্মত ব্যাপার নিয়ে কাজ করা এবং আংশিক স্বার্থ বজায় রাখা", এবং বর্ত্তমানের "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বজায় রাখা ও শক্তিশালী করা।" এই মহৎ উদ্দেশ্যে নতুন প্রতিষ্ঠান খোলবার জন্য সরকারী সাহায্য নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে। এই সব বড় বড় কথাকে কাজ দিয়ে বিচার করলে আগের প্রত্যেকটা উদাহরণ থেকে দেখা যায়, এদের কাছে ছাত্র-সাধারণের মানে বাড়ানর বিরুদ্ধে সংগ্রাম "আংশিক স্বার্থ", ধনিকরাজের অত্যাচার ও দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম "আংশিক স্বার্থ", শিক্ষকদের সমর্থনে সংগ্রাম "আংশিক স্বার্থ", এবং নেহরু-প্যাটেলের নির্জলা ধনিক ডিক্টেটর শিপ রাষ্ট্র হচ্ছে "গণতন্ত্র" আর তারই স্বার্থে সমস্ত শ্রমজীবী জনতার উপর আক্রমণকে সমর্থন করা হচ্ছে "সকলের স্বার্থ"। এই নতুন বুলির চালে ঐক্যের সম্বন্ধে ছাত্র সাধারণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে তাকে অপব্যবহার করে এরা ছাত্র সমাজের মধ্যে দালাল-বাহিনী গড়তে চায়। ছাত্র আন্দোলনের উপরে ধনিকশ্রেণীর যে প্রভাব অতিদ্রুত নষ্ট পাচ্ছে তাকে আবার কিছু নতুন আয়ু দিতে চায়। কিন্তু ভারতবর্ষের বিপ্লবী ছাত্র সমাজ গত এক বছরে অতুলনীয় সাহস আর অপূর্ব্ব বীরত্ব নিয়ে মরণমরী সংগ্রাম চালিয়েছে ধনিক রাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রামের পরিচালক হিসাবে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সারা ভারতের বিপ্লবী ছাত্রসমাজ নিজেদের নতুন সংগ্রামী ঐক্য তুলেছে। এই অসংখ্য লড়াই-এর আগুনে তৈরী নতুন ঐক্যের হাতিয়ার দিয়েই বিপ্লবী ছাত্রসাধারণ ধনিক দালালদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করবে।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে

গত দেড় বছরে ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছেড়ে ছাত্র আন্দোলন ক্রমশঃ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই সামিল হয়েছে। এরই জন্য ছাত্র আন্দোলনে এসেছে নতুন 'সংগ্রামশক্তি' নতুন কায়দা। আক্রমণের উত্তরে আক্রমণ, দীর্ঘদিন ধরে লড়াই, দালালবাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করা এই সবই আজকের সংগ্রামের নতুন চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

ধনিকশ্রেণীর সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে বলে এই বছরের অধিকাংশ আন্দোলনই অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে সুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হচ্ছে। তার মধ্য থেকে আওয়াজ উঠছে, 'ধনিক সরকার ধ্বংস হোক।'

এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছাত্র-আন্দোলন প্রতিদিন সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এই ধনিক রাষ্ট্র থাকতে কোনও ভবিষ্যৎ নেই, একথা ক্রমশঃ ছাত্রছাত্রী সাধারণ বুঝতে পারছে। তাই এই রাষ্ট্রের অবসান করে নতুন শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সমস্ত শোষিত জনতার মুক্তি এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ছাত্র সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আর সেই সমাজতন্ত্র যে জয়প্রকাশ-নারায়ণের শ্রেণী সমন্বয়ের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র নয়, শ্রেণীসংগ্রামের কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধনিকশ্রেণীকে পরাজিত করে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ধনিকশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণ আর তার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর অপরাজেয় প্রতিরোধ ও প্রতি আক্রমণের মধ্যে।

সমাজতান্ত্রিক চেতনার জন্য সংগ্রাম

ধনিকশ্রেণীর তরফ থেকে আজ ক্রমাগত চলেছে এই সমাজতান্ত্রিক চেতনা যাতে অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে না আসতে পারে তার জন্য মরীয়া প্রচেষ্টা। সরাসরি খোলাখুলি অত্যাচার এবং আদর্শগত ভাবে শ্রেণীসংগ্রামকে "বিশৃঙ্খলা" "গণতন্ত্র-বিরোধী" ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করে ছাত্র সমাজকে ভুল বোঝানর চেষ্টা। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে আজ সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী জনতার বিরাট শ্রেণীসংগ্রাম চলেছে দুনিয়ার ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এই কথা ছাত্রদের কাছ থেকে বুর্জ্জোয়া সরকার ও তার দালালরা আড়াল করে রাখতে চায় আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে "নিরপেক্ষ" থাকবে বলে। কমনওয়েলথে যোগ দিয়ে ভারতের ধনিকশ্রেণী যেমন সোভিয়েটবিরোধী, দুনিয়ার শ্রেমিকশ্রেণী ও মুক্তিকামী জনতার বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছে এসব কথা লুকিয়ে ধনিকশ্রেণীর চরেরা প্রত্যেকটি আক্রমণকে রক্ষার

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

কংগ্রেসী বুলেটে বাঙ্গালার ছাত্র শহীদ

শিশির মণ্ডল (২১)
আইন পরিষদের ভিতরে
তাপস বসু (১৪) কলেজ স্কোয়ারে
দিলীপদ্বিবেদী (১৯)
প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিতরে
দীপ্তিরঞ্জন বসু (১৭)
কলেজস্কোয়ার
বিমান বসু (২২)
বৌবাজারের রাস্তার মোড়ে
মুকুল চক্রবর্ত্তী (২১) দমদম জেলে
গোবর্দ্ধন রায় (১৫) প্রেসিডেন্সী জেলে
গৌর গুহ (২২) বিশ্ব-বিদ্যালয় এলাকায়
ক্ষিতীশ রায় (২১) „
প্রমথ সরকার (১৯) „
সুধীন্দ্রনাথ রায় (১৯) „

সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হও

হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সজাগ করার বদলে ছাত্রসমাজ যাতে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ না ক'রে "অহিংস ও শান্তিপূর্ণ" ভাবে লাঠির ঘা সহ্য করে তার "আবেদন" করাই দাঁড়াল তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য এবং লাঠির প্রথম আবির্ভাবেই তাঁরা অহিংসভাবে প্রস্থান করলেন।

সর্ব্বাত্মক আক্রমণ

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ছাত্রসমাজের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিরোধ লক্ষ্য করে, কংগ্রেস সরকার এখন ছাত্রদের বিরুদ্ধে সকল দিক দিয়ে ব্যাপকতম আক্রমণ সুরু করেছে। এই চলতি বছরে বাংলা সরকার বেথুন কলেজ ও ব্রাবোর্ন কলেজে গরীবের ঘরের মেয়েদের ৪৲ বেতনে উচ্চশিক্ষার যে সুযোগ ছিল তা কেড়ে নিয়ে মাইনে করেছেন ১০৲। সমস্ত স্কুল কলেজেই এই হারে বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস, সি পরীক্ষায় পাশের হার হয়েছে এবার শতকরা মোটে ৩০।

এ ছাড়া সরাসরি অত্যাচার প্রতিটি গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং ছাত্র-আন্দোলনের বিরুদ্ধে তো লেগেই আছে। এক বাংলা দেশে একটি লড়াইতে ৯ জন ছাত্রকর্ম্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

এইসব আক্রমণ ছাড়াও সরকার জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনকে প্রতি পদে পদে আক্রমণের জন্য এক নতুন ব্যাপক কায়দা ধরেছেন। সে চেষ্টা হচ্ছে স্কুল কলেজের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং স্কুল কলেজের ছাত্ররা রাজনৈতিক কাজকর্ম্ম বা চিন্তায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছে দেখলেই সমস্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর পুলিসের নৃশংস অত্যাচার শেষ হ'লে জাতীয় বাহিনীর গুণ্ডারা ছোট ছোট দলে অতর্কিতে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ও বিশেষ ক'রে ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীদের আক্রমণ করে এবং কাউকে কাউকে গুরুতরভাবে জখম করে। ধনিক সরকার এই গুণ্ডাবাহিনী প্রত্যেকটি স্কুলে কলেজেও বিশেষ চেষ্টায় তৈরী করছে। স্কুল, কলেজ ও ছাত্রাবাসের ভিতরে পুলিস ঢুকে লাঠি চার্জ্জ, গুলি, গ্রেপ্তার এসব কাজ ধনিক সরকার প্রতিদিনকার ব্যাপার করে তুলেছে। এইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত করে ফ্যাসিস্ট কায়দায় আজ "চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত" করবার অপচেষ্টা করছে ধনিক সরকার।

যেমন ছাত্রসমাজ সমস্ত রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে ঠিক তেমনি এই হেডমাস্টার। গুণ্ডা-পুলিস চক্রের বিরুদ্ধেও ব্যাপকতম প্রতিরোধ চলেছে প্রতিটি স্কুলে, প্রতিটি কলেজে।

একদিকে ধনিক সরকার যেমন এই সরাসরি দমনের আয়োজন করেছে আর এক দিকে তার বিভিন্ন লেবেল আঁটা ছাত্র কংগ্রেসের দালাল নেতাদের দিয়ে ছাত্র আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করবার জন্য এক আদর্শগত আক্রমণের চেষ্টা করছে। সবকটা ছাত্র কংগ্রেস যারা গত এক বছরে প্রত্যেকটা বিপ্লবী আন্দোলনে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গা দালালবাহিনী হিসেবে স্বরূপ প্রকাশ করেছে, তাদের সকলকে দিয়ে "জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন" নামে এক নতুন ধর্ম্মঘট ভাঙ্গা প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা

বাংলার শ্রমিক নওজোয়ান

"বাংলার তরুণ" 'বাংলার যুবক' প্রভৃতি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে যে ছবিটা ভেসে উঠে তা এক মধ্যবিত্ত তরুণের ছবি। হয়ত সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অবশ্যই সে শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান; দেশপ্রেমে, প্রগতি আন্দোলনে সে অগ্রবর্ত্তী। বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই তরুণদলের দান সামান্য একথা কেউ বলবেন না। আজকে এই ভদ্র শিক্ষিত তরুণদের বিপ্লবী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শ্রমিকশ্রেণী সাগ্রহ সমর্থন জানাবে।

আরও যে কয়েক লক্ষ এই শহরেই

কিন্তু শুধু এদের দিয়েই বাংলার তারুণ্যের পূর্ণ পরিমাণ হতে পারে না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুলের প্রাঙ্গণেই তারা সীমাবদ্ধ নয়! অথচ শুধু কলকাতা এবং শহরতলীতে এই তরুণদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ যে ছাপিয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নাই।

এই তরুণেরা বহুল শ্রমিক পরিবারের তরুণ নতুবা এমন নিম্ন মধ্য পরিবারের ছেলে যারা অল্প বয়সেই স্কুল ছেড়ে মজুরি করতে সুরু করছেন।

স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত নয়—এদের পাওয়া যাবে কলে-কারখানায়, বস্তিতে, ছোটখাটো দোকানের চাকরীতে ব্যক্তিগত কারুকর্ম্মে।

সংখ্যানুপাতেই শুধু নয়, সামাজিক উদ্যোগে, বিপ্লবী কর্ম্মপ্রেরণায় কলকাতা এবং শহরতলীর রাস্তায় বার বার এদেরই দেখা গেছে এগিয়ে যেতে। লক্ষ্য না পড়লেও আসলে বাংলার তারুণ্য প্রধানতঃ এদের উপরেই নির্ভরশীল।

তাদের ঠিকানা

কারা এই তরুণ শ্রমিকশ্রেণী? কলকাতায় চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বড়ো বড়ো শিল্পেই প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় যারা বয়সে নিতান্ত বালক। বয়স গোপন করে অনেকে কাজে ঢোকেন। চটকলে এইসব 'ছোকরাদের' দেখা যায়, স্পীনিং, বর্বিন প্রভৃতি ডিপার্টে শ্রমিকদের জোগাড়ে হিসাবে খাটতে। ইঞ্জিনিয়ারীংএ এই 'জোগাড়ে' এবং 'এপ্রেন্টিস' বালক প্রচুর। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বালক শ্রমিক নিযুক্ত হয় ছোটোখাটো বিভিন্ন বিচিত্র কারখানা এবং দোকানে। এই কারখানাগুলির অধিকাংশেই কোন ফ্যাক্টরী আইনের বালাই নেই। অধিকাংশেরই অবস্থা কুটির শিল্পের মত। ছোটখাটো কেমিকেল ফ্যাক্টরী, সাবান ফ্যাক্টরী, কাঁচের ফ্যাক্টরী, প্যাকিং বাক্সের কারখানায়, বিড়ির দোকান, সাইকেল, মোটর রিপেয়ারের দোকান, টিনের কারখানা, কার্ডবোর্ড খামের কারখানা ইত্যাদি হরেক রকম ছোটো বড়ো শিল্পে হাজার হাজার বালক মজুর দিন ১০ ঘণ্টা ১২ ঘণ্টা ১৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাটছে। আর বেতন পাচ্ছে, আট আনা থেকে বড়ো জোর এক টাকা পাঁচ সিকে।

সংকটের প্রথম শিকার

এই বালক শ্রমিকের পরেই আসে তরুণ শ্রমিক, শ্রমিক নও-জোয়ান। সবেমাত্র কাজে লেগেছে বলে বড়ো বড়ো শিল্পে এই নওজোয়ানদের অধিকাংশেরই চাকরী অস্থায়ী এবং সম্প্রতি দলে দলে ছাঁটাই সুরু হওয়ার ফলে প্রধানতঃ তারাই আগে বেকার হতে সুরু করেছে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের মোট এককোটি বেকারের মধ্যে এদের সংখ্যা অন্তত অর্দ্ধেক যে হবেই তাতে সন্দেহ নেই। কলকাতায় গত মে মাসে এক চটকল থেকেই ১৫,০০০ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এদের অধিকাংশই বদলীওয়ালা অর্থাৎ অস্থায়ী। আন্দাজ করা অন্যায় হবে না যে, এই বদলীওয়ালাদের মধ্যে নওজোয়ান অংশ খুব ছোটো নয়। যুদ্ধের পর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সূতাকল প্রভৃতি প্রত্যেক সংগঠিত শিল্পেই দলে দলে শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এই ছাঁটাইয়ে প্রথম ঘা খেয়েছে শ্রমিক নওজোয়ানরা। যে বেকার সমস্যা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা যুবসম্প্রদায়ের প্রগতি আন্দোলনের মূলে শ্রমিক নওজোয়ানদের মধ্যে তা আরো তীব্র এবং ব্যাপক।

নওজোয়ানীই অভিশাপ

যাঁরা বেকার নন তাঁদের অবস্থাই বা কি? কংগ্রেস সরকারের ট্রাইব্যুনালের রায় অনুসারে চটকল মজুরের নিম্নতম বেতন মাত্র ২৬৲ টাকা, ইঞ্জিনিয়ারিং মজুরের মাত্র ৩০৲ টাকা। এ-আই-টি-ইউ-সি যেখানে মূল বেতন দাবি করছেন ৮০৲ টাকা, সেখানে এই প্রায় অর্দ্ধেক বেতনে শ্রমিকদের যে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় তা সহজেই অনুমেয়।

এ ক্ষেত্রেও নওজোয়ান শ্রমিকদেরই দুর্ভাগ্য আগে সইতে হয়। নওজোয়ান বলে, সবেমাত্র কাজে ঢুকেছে বলে ওপরের ঐ নিম্নতম বেতনটাই অধিকাংশ তরুণ শ্রমিকের পক্ষে উর্দ্ধতম।

লোহা কারখানাগুলিতে এপ্রেন্টিস শ্রমিকের সংখ্যা কম নয়, এই এপ্রেন্টিস শ্রমিকের সকলেই তরুণ। কাজ জানে না এই অজুহাতে তাদের ওপর শোষণ চলে সবচেয়ে বেশি। ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইব্যুনাল তাদের অদক্ষ শ্রমিকের নিম্নতম বেতন দিতেও অস্বীকার করেছে। সারা দিন পুরো শ্রমিকের মত খেটেও বেতন পাবেন দৈনিক মাত্র ৸০ থেকে ৸৵০ আনা। বহু কারখানায় আদৌ বেতন পান না।

তাঁদের সংস্কৃতি জীবন

যে সমাজ ব্যবস্থায় কাজ এবং মজুরির হাল এই রকম সেখানে যে কাজের ঘণ্টা, বাসগৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য গ্রেড, প্রমোশন প্রভৃতি মানুষের মত বেঁচে থাকার সমস্ত দাবিই উপেক্ষিত হবে তা বলাবাহুল্য। কলকাতার বড়ো বড়ো কোন কারখানা থেকেই তরুণ শ্রমিকদের জন্য অথবা শ্রমিক পরিবারের বালক ও তরুণদের জন্য কোন রকম শিক্ষা বা শিক্ষাভাতার ব্যবস্থা নেই।

কোন কারখানাতেই সংস্কৃতিমূলক কোন ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় না। শ্রমিকদের জন্য খবরের কাগজ, লাইব্রেরী, শ্রমিক ক্লাব ইত্যাদির জন্য এক পয়সাও ব্যয় করা হয় না।

শ্রমিকের নিজেদের চেষ্টাতেই কখনো কখনো দুই একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই স্কুলগুলি সব দিক দিয়ে অবহেলিত। শ্রমিকেরা অধিকাংশই হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষী কিন্তু শ্রমিকদের হিন্দী বা উর্দ্দু হাই স্কুল তো দূরের কথা প্রাথমিক স্কুলেরও ব্যবস্থা নেই, বই নেই।

আন্দাজী হিসাব মতে একশ জন লোকের মধ্যে ৫।৬ জনের বেশী লোক পাওয়া যাবে না যারা কলম ধরে নিজেদের নাম সই করতে পারে।

নওজোয়ানদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা একটু বেশী। শিক্ষার জন্য আগ্রহ তাদের মধ্যে আরো প্রবল।

আরও একসঙ্গে পাওয়া যাবে—বস্তিতে

বৃহৎ শিল্পের সংগঠিত মজুরদেরই যখন এই অবস্থা তখন ছোটোখাটো কলকারখানা দোকান ব্যবসায়ে যাঁরা খাটেন তাঁদের অবস্থা যে কি তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের শ্রমিক কর্ম্মচারী জনসংখ্যা মোট ৫।৬ কোটি এর মধ্যে বড় বড় শিল্পে সংগঠিত শ্রমিক জনসংখ্যা এক কোটির বেশী হবে না। বাকী সমস্তই হচ্ছে ছোটোখাটো শিল্প কারখানা ও কারুকর্ম্মের অসংগঠিত মেহনতকারী মানুষ।

কলকাতায় এই অসংগঠিত মেহনতকারী মানুষদের অনেককে একসঙ্গে যেখানে পাওয়া যাবে তা হচ্ছে বস্তি।

কলকাতার দালান কোঠার ঠিক পাশে পাশেই, বড় রাস্তার ঠিক কোণে কোণেই, শহরতলীর সূত্রপাতেই হরেক রকমের খাটিয়ে মানুষের আস্তানা রয়েছে। চারিদিক থেকে অর্থ-নৈতিক সংকটের আঘাত এসব জায়গায় ক্রমাগত বিচিত্র আবর্ত্ত সৃষ্টি করে চলেছে। আজ এ কাজ কাল ওকাজ, এখানে চার আনার মজুরি ওখানে সাত আনার ঠিকে কাজ এমনি করে এই সমস্ত বস্তির কয়েক লক্ষ মানুষ পুঁজিবাদী শোষণ ও অরাজকতায় হন্যে হয়ে ঘুরেছে।

বড় বড় শিল্পের এক বৃহৎসংখ্যক শ্রমিক আসেন বাংলার বাইরে থেকে, উৎসন্ন কৃষিজীবী ও ক্ষেত মজুরদের মধ্য থেকে। তারা অধিকাংশই পরিবার নিয়ে আসতে পারেন না। পুত্র পরিবার নিয়ে যাঁরা থাকেন তাঁরা অধিকাংশই থাকেন এইসব বস্তিতে অসংগঠিত ছোটছোট শিল্পে খাটিয়ে পরিবারদের সঙ্গে একত্রে।

কলকাতার উপরকার শ্রমিক নওজোয়ানেরা আসলে, এইসব বস্তিরই নওজোয়ান ছেলে। দশ বছর বারো বছর বয়স থেকেই তারা শুধু একটি কথাই শুনেছে, যেখান থেকে যেমন করে পারো রোজগার করো। রোজগার না করলে খাওয়া জুটবে না।

১০-১২ বছরের "রোজগেরে" ছেলেরা

রোজগারের ক্ষেত্র বিচিত্র, মজুরির হারের মা-বাপ নেই। কলাবাগান বস্তি, মাণিকতলা বস্তি, বেলেঘাটা, ট্যাংরা অথবা পার্ক সার্কাসের তাঁতীবাগান, চেতলা, খিদিরপুর বা বদরতলা—নওজোয়ানদের অবস্থা সর্ব্বত্র এক।

দিনের বেলা কাজের সময় এসব বস্তিতে দশ বছরের বেশী বয়সের ছেলে চোখে পড়বে না। বাচ্চারাও যে রাস্তার নোংড়ায় টিনের চাকায় বারি মেরে, ছেঁড়া কাগজকে ঘুড়ির মত উড়িয়ে একটু খেলবে তার জো নেই। খেলার ফাঁকে ফাঁকেই বাড়ীর ফাইফরমাজ খাটতে হয়, যেতে হয় কাঠ কুড়াতে, পোড়া কয়লা বাছতে, বাসন মেজে আনতে।

দশ বছরের বেশী বয়সের ছেলেরা সবাই রোজগেরে। চেতলা বস্তি। খেলা বা পড়ার সময় নেই, রাত ৮টা পর্য্যন্ত ঠায় বসে বসে টিনের কৌট কেরোসিন ল্যাম্প তৈরী করছে ছোটো ছোটো ছেলেরা পর্য্যন্ত। ঠিকে কাজ ১০০ ল্যাম্প তৈরী করতে পারলে ২৷৷০ টাকা। ছোটো ছেলেরা অন্ততঃ টাকাখানেকও ত রোজগার করতে পারবে।

এণ্টলী বাগান—পাটোয়ার বাগান, সারাজীবন বিড়ি পাকাতে পাকাতে নুয়ে পড়েছে এমনি শুকনো কুঁজো বুড়োর সঙ্গে একত্র বসে বিড়ি পাকাচ্ছে বিমর্ষ বাচ্চা আর ক্ষুধিত চেহারার নওজোয়ানেরা। হাজার বিড়ি তুলতে পারলে মজুরি মিলবে ২৷৷০/১০। সকাল হলেই রাজ মিস্ত্রী বাপ চাচার সঙ্গে ছেলেরাও বেরিয়ে যাচ্ছে জোগাড়ে হিসাবে খাটতে। কাজ জুটলে বার যেমন হাত ১ টাকা ১৷০ রোজগার হবে।

ঠিকে কাজ না জুটলে ফিরে আসবে কাজের এই সব রেট এমনভাবে বাঁধা যে সারাদিন খাটলেও গড়ে বড়ো বড়ো শিল্পের সাধারণ মজুরি মাত্রার

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্র সম্মেলনের ডাক

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য ভারতবর্ষের ছাত্রদের সমাজতান্ত্রিক চেতনা থেকে বিক্ষিপ্ত করতে চায়।

আগামী বছরে একদিকে সরকারের সমাজ আরও অসংখ্য কলকাতার ১৮ই ১৯শে জানুয়ারী; সেপ্টেম্বরের ত্রিবান্দ্রম আর জানুয়ারীর কানপুর, লক্ষ্ণৌ-এর মত ইতিহাস বারবার সৃষ্টি করবে, ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় তাকে বহুগুণ ছড়িয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সাধারণের প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে প্রখরতর করে এবং বাড়িয়ে নিয়ে সমগ্রভাবে সমস্ত ছাত্র সমাজকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সামিল করতে হবে।

বিপ্লবী ছাত্র সমাজের সৈন্যদল ছাত্র ফেডারেশনের নিখিল ভারত সম্মেলন সুরু হয়েছে কলকাতায় ২৩শে জুলাই থেকে। সেই সম্মেলন ভারতবর্ষের বিপ্লবী ছাত্র সমাজের সুমুখে নতুন আদর্শ উপস্থিত করবে।

নতুন বছরে নতুন চেতনায়, ব্যাপকতায়, সাহসিকতায়, বীরত্বে ভারতবর্ষের ছাত্র সমাজের বিগত বছরের গৌরবময় অধ্যায়কেও পিছনে ফেলে ধনিক সরকারের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করবে, ধনিক দালালদের ছত্রভঙ্গ করবে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সুদৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবে।

মঞ্জিল

কংগ্রেস ও লীগ শাসনে গরীবের খাদ্য নাই

জমি ও খাদ্যের উপর শোষকদের অধিকার কাড়িয়া নেওয়াই সমাধানের পথ

ধনিক সরকার 'ফসল বাড়াও'র হিতোপদেশ দিয়াই খালাস। গত সংখ্যায় দেখানো হইয়াছিল যে, এই হিতোপদেশে ফসল বাড়ে না; ক্রমেই কমিতেছে।

অঙ্কের হিসাবে দেখা যায়; খাদ্য-শস্যের জমি সারা ভারতে ১৯২১-২২ সালে ছিল ১৫৮·৬ মিলিয়ন একর, ২০ বছর পর এই পরিমাপ হয় ১৫৬·৫ মিলিয়ন একর।

১৯২১-২২ সালে মোট ৫৪·৩ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল; ১৯৪১-৪২ সালে উৎপন্ন হইল ৪৫·৭ মিলিয়ন টন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফসল আরও কমিয়া দাঁড়াইল ৪২·৭ মিলিয়ন টন।

১৯৪৮-৪৯এ পরিমাপ আরও কমিয়াছে। এই বৎসর খাদ্য শস্যের জমির পরিমাপ ৩৬ লক্ষ ৩৩ হাজার একর কমিয়াছে।

অন্যদিকে জমির ফলনও কমিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ২৫ বছরের হিসাবে দেখা যায় একর প্রতি জমিতে চাউলের পরিমাণ ২৫৪ পাউণ্ড অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়াছে। [৯৮২ পাউণ্ডের স্থলে ৭২৮ পর্য্যন্ত হয়] গম হয় পূর্ব্বে ৭২৪ পাউণ্ডের স্থলে বর্ত্তমানে ৬৩৬ পাউণ্ড।

এই সংখ্যায় খাদ্য শস্য বৃদ্ধি কেন হয় না, তাহাতে ক্ষতি কার, উপায় কি প্রভৃতি দেখানো হইয়াছে। [মঃ সঃ]

কিন্তু এইভাবে ফসল কম হইবার জন্য জমিদার, মহাজনদের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই—তাহারা তাহাদের শোষণের অংশ পূরামাত্রায়-ই নিয়াছে।

ফলে কৃষকের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ অনাহার নামিয়া আসিয়াছে; কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জমি হইতে উৎখাত হইয়াছে এবং জমিদার, জোতদার আর ধনীকৃষকেরা জমি নিজেদের কব্জা করিয়াছে।

গ্রাম অঞ্চলে জমির এই ব্যবস্থা বারে বারে এই কথা-ই স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, জমিদারী ব্যবস্থার অবসান না করিলে, চাষীর হাতে জমি না দিলে দুর্ভিক্ষ, অনাহার লাগিয়াই থাকিবে—এ সমস্যা সমাধান হইবে না।

শাসন ক্ষমতা হাতে পাইবার আগে কংগ্রেসের প্রোগ্রামে এই কথা-ই বলা হইয়াছে। কিন্তু আজ মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়া কংগ্রেসী নেতারা সে প্রোগ্রাম ধামা চাপা দিবার ব্যবস্থাই করিয়াছেন। খাদ্য সংকটের কথা বলিতে যাইয়া পণ্ডিত নেহরু জমি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন কথা-ই বলিতেছেন না।—

মন্ত্রীদের বক্তৃতার আসল কথা কি

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন: "অধিক ফসল ফলাও" ভারতের মাটিতে যাহারা ফসল ফলায় তাহাদের সাতকোটি হইতেছে ক্ষেত মজুর—অর্দ্ধদাস ব্যবস্থার নির্ম্মম শোষণে ইহারা জর্জ্জরিত। ইহাদের দৈনিক মজুরি হইল ছ'পয়সা হইতে এক টাকা। হইাদের না আছে জমি, না আছে বলদ, লাঙ্গল—জমি হইতে ইহারা উৎখাত হইয়াছে। মেহনতী কৃষকের অধিকাংশেরই ৫ একরের বেশি জমি নাই এবং সেই জমি চাষ করার মতন উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও তাহাদের নাই। সারা বৎসর মেহনৎ করিয়া যে ফসল ইহারা ফলায় পূর্ব্ব পুরুষের ঋণের দায়ে, খাজনার দায়ে তাহা জমিদার-জোতদার-মহাজনেরা লুটিয়া লইয়া যায়। জমিদার-জোতদারের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, অনাহারে ক্লিষ্ট এই কৃষককুলকে বড় লোকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্য অধিক ফসল ফলাইতে বলা হইতেছে।

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন: আরো বেশী জমি চাষ কর। কিন্তু কোন গ্রামে গরীব কৃষক জমিদারের পতিত জমি দখল করিয়া চাষ করিলে নেহরু সরকারের পুলিস যাইয়া সেই কৃষককে ভিটা ছাড়া করে। পশ্চিম বাংলায় কৃষকেরা তে-ভাগা দাবী করিয়া বসিয়াছে, কংগ্রেসী বিধান-মন্ত্রিসভা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে; কৃষকের জমির উপর ১৪৪ ধারা জারি করিয়া এবং জমিদার-জোতদারের সাহায্যে সশস্ত্র পুলিস পাঠাইয়া তাহারা কৃষকের চাষাবাদ বন্ধ করিতেছে।

বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে দর বৃদ্ধি

মন্ত্রীদের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় চাউলের দাম হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে হুগলীর উত্তরপাড়ার চাউলের দাম ছিল ৩২৲ টাকা মণ, এখন তাহা ৩৫৲ টাকায় উঠিয়াছে; হাওড়ার মাকড়দহে ৪ঠা জুলাই চাউলের দাম ছিল ৩১৲, ৫ই জুলাই হইল ৩২৲; মালদহে চাউল এখন ৩৪৲ মণ; বারাসতে ৩২৲ মণ। অন্যান্য জেলারও অনুরূপ অবস্থা।

মজুতদারের জন্য চাউল

পশ্চিম বাংলার খাদ্য আজ জমিদার-জোতদার-চোরাকারবারীর গোলায় মজুদ রহিয়াছে। তাহাদের গোলায় হাত দিবার সাধ্য কাহারো নাই—কারণ নলিনী-বিধান সরকারের ফৌজ রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে।

ধান সীজের নামে কাহাদের সর্ব্বনাশ করা হইতেছে.

পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে এখন ধান 'সীজ' চলিতেছে। গ্রামের কংগ্রেসের সমর্থক বড় বড় জোতদার-জমিদার-ধনী কৃষকদের উপর কংগ্রেসী সরকারের জন্য ধান্য সংগ্রহের ভার পড়িয়াছে। এই ধান ইহারা কি ভাবে সংগ্রহ করিতেছে? ইহারা কি নিজেদের গোলা হইতে ধান দিতেছে? সেরূপ আশা করিবার কোনই কারণ নাই। ইহারা মাঝারী ও গরীব কৃষকের-ই ঘাড় ভাঙিতেছে। রক্ষাকালী পূজার চাঁদা এবং নানারূপ গ্রাম্য চাঁদার নাম করিয়া ইহারা মাঝারী ও গরীব কৃষকদের নিকট হইতে ধান আদায় করিতেছে। তাছাড়া সোজাসুজি মাঝারী ও গরীব কৃষকদের যে সামান্য ধান ঘরে রহিয়াছে তাহা-ই ইহারা সীজ করিতেছে। এই ভাবে কৃষকদের মুখের অন্ন কাড়িয়া বিধান-সরকারের ধান সীজ চলিতেছে।—

কৃষকের জন্য গুলি

কিন্তু কোথাও যদি কৃষকের-দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য জোতদার-জমিদারের মজুত খাদ্য টানিয়া বাহির করে তবে তাহাদের উপর গুলি চালানো হয়; তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক রাখা হয়।

আসল কথাটি কি

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা জানাইয়া দিয়াছেন যে, ১৯৫১ সাল হইতে বাহির হইতে খাদ্য আনা বন্ধ করিয়া টাকা বাঁচাইতে হইবে এবং সেই টাকায় শিল্প বাড়াইবার জন্য যন্ত্রপাতি কেনা হইবে। কিন্তু এই সব শিল্পে জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাই জন্য জিনিসপত্র তৈরী হইবে না—বাহিরে রপ্তনী করার জন্যই এই সব শিল্পে জিনিসপত্র তৈরী হইবে এবং তাহাতে ধনিকশ্রেণীর প্রচুর মুনাফা হইবে।

ধনিকশ্রেণীর এই মুনাফার জন্যই খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ করিতে হইবে। সাধারণ মানুষ না খাইয়া মরুক, আর ধনিকশ্রেণীর মুনাফা বাড়ুক!—ইহাই কংগ্রেসী সরকারের নীতি।

এই নীতি যতদিন বলবৎ থাকিবে ততদিন খাদ্য-সংকট দূর করা যাইবে না।

সাধারণ মানুষের দাবী

মন্ত্রীরা বরই হিতোপদেশ দেন না কেন পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ তাহাতে বিভ্রান্ত হইবে না। শহরের মজুর আর নিম্ন মধ্যবিত্ত আজ আওয়াজ তুলিতেছেন—সস্তাদরে ভরপেট খাদ্য চাই; মজুতদারের ধান সীজ করিয়া খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী আর মাঝারী চাষী আওয়াজ উঠাইয়াছেন—জমিদার-জোতদার-ধনীকৃষকের গোলার ধান সীজ করিয়া খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইবে; গরীব ও মাঝারী চাষীর ধান সীজ করা চলিবে না।

কিন্তু এই পথ নেহরু-বিধান মন্ত্রিসভাদের পথ নয়—তাহারা খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে পারে না, কারণ তাহারা বড়লোক, জমিদার, জোতদার, মিল-মালিকদের স্বার্থ-ই দেখে এবং তাদের স্বার্থ-ই রক্ষা করে।—

প্রকৃত উপায়

আসলে জমি ও ফসল কৃষকের হাতে না আসিলে খাদ্যের অভাব দূর হইবে না, চোরাবাজার বন্ধ হইবে না, খাদ্য লইয়া সরকারের ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা ব্যবসায়ীদের মুনাফা শিকারের খেলা বন্ধ হইবে না।

খাদ্যসমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য চাই: জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ, চাষীর হাতে জমি, ক্ষেত মজুরের জন্য বাঁচিবার মত মজুরি, চোরাকারবারী ও মজুতদারদের ফাঁসি।

ভাতের বদলে বুলেট: 'শরিয়তী' না 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'?

পূর্ব্ববাংলার লীগনেতারা আজকাল জনতার খাদ্যের জন্য বড্ড বেশী মায়াকান্না সুরু করিয়াছেন। টাঙাইলের উপ-নির্ব্বাচনে বেদম হারিয়া, লীগ কাউন্সিলের রুদ্ধদ্বার সভায় চূড়ান্তভাবে নাজেহাল হইয়া, মাদারিপুরের সভায় জনতার হাতে গুরুতর প্রহার খাইয়া ইস্তক 'আজাদের' মৌলানা সাহেব ও মোহন মিঞা, লাগাত প্রধান মন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন একেবারে বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন।

অন্য কেহ নয়, পূর্ব্ববঙ্গ প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক মোহন মিঞা নিজে বলিয়াছেন, এখনই প্রতিকার না হইলে "পূর্ব্ববঙ্গে এবার আবার ১৩৫০ সালের পুনরাবৃত্তি হইবে।" অবস্থার গুরুত্ব কত তাহা বৃটিশ ধনিকদের মুখপত্র 'ক্যাপিট্যাল'এর বিবরণ হইতে বোঝা যাইবে।

"১২ই জুন তারিখের পূর্ব্ববঙ্গের পাইকারী মূল্যের সরকারী রিভিউ হইতে দেখা যায়....চাউলের দাম ২৪৷৷০ টাকা হইতে ৪৪৲ টাকা পর্য্যন্ত; ঢাকায় সব চেয়ে বেশী, সিলেটে সব চেয়ে কম। বরিশালে এই সপ্তাহে ধানের দাম হঠাৎ ১৬৷৷০ টাকা হইতে ২৭৲ টাকায় উঠিয়া যায়; প্রদেশের অন্যত্র ধানের দাম ১৬৲ টাকা হইতে ২৭৲ টাকার মধ্যে; সবচেয়ে কম সাতক্ষীরায়"। [ক্যাপিটাল ৭ই জুলাই]

গত বছর ১১ই জুন তারিখে জনাব নূরুল আমীন বলিয়াছিলেন, "চাউলের দামের পড়তা এবার সারাবছরই ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের তুলনায় বেশী ছিল। এখন ধানের প্রাদেশিক গড় দর ২৬৷৷/০ টাকা।"

[খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি ১২ই জুন]

এবার গতবারের তুলনায় দর অনেক বেশী। ধান চাউলের দর বছরের পর বছর বাড়িয়াই চলিয়াছে। কুষ্টিয়ার চাউলের দর ৪২৲ টাকা [আজাদ ১১ই জুলাই] ত্রিপুরায় আউষ চাউল ৩২৷৷০ টাকা। (ঐ) গাইবান্ধায় চাউলের দর ৪০৲ টাকা [ইত্তেহাদ ৮ই জুলাই]। ময়মনসিংহের কোন কোন স্থানে ৪৫৲ টাকা! যশোহরে ....গত আমন ও এবারের আউস একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চাউলের দর ৩৫৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকা।

অনাহারে মৃত্যুর খবরও কাগজে বাহির হইতেছে। কিন্তু লীগ-সরকারে মামুলী

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বগুড়ার ক্ষেতমজুরদের খাদ্যের লড়াই

বগুড়া, ৮ই জুলাই—বগুড়া জেলায় প্রচণ্ড খাদ্য সংকট সুরু হইয়াছে। এই জেলার মত উদ্বৃত্ত জেলায়ও চাউল প্রতিমণ ৩৪।৩৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী পাটের দাম কমাইতে হইবে বলিয়া বিবৃতি দেওয়ার পর হইতেই পাটের দাম কমিতে থাকে ও এখন গ্রাম অঞ্চলে পাট ৭।৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। এই সময়ে পাট বিক্রয় করেন গরীব চাষীগণ। পাটের দর এইভাবে পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহাদের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে। বানের জলে ক্ষেত-খামার ডুবিয়া যাওয়াতে ক্ষেতমজুরগণও কোন কাজ পাইতেছেন না।

এই পরিস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার পশ্চিম বগুড়ার চাঁদপুর, সুন্দরপুর ও বানাই গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ কৃষক সমিতির নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইয়া খাদ্যের জন্য গ্রামের জোতদার ও ধনী কৃষকদের বাড়ীতে বাড়ীতে উপস্থিত হন। দু'একজন জোতদার গুণ্ডার দল সমাবেশ করিয়া এই ভুখা জনগণকে বাঁধা দিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ আজ খাদ্য পাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহাদের জঙ্গী মনোভাবের নিকট জোতদারগণ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আয়েতুল্লা নামে একজন জোতদার টাকা পয়সা দিয়া কিছু গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক সমাবেশ করিয়া জনতাকে বাঁধা দিতে চেষ্টা করে। পরে জনতার দৃঢ়তা দেখিয়া সেই জোতদার ১ মণ ধান ও দশটাকা দিয়া আপোষ করে।

ইহার পর ভুখা জনতার দল কাজী নামে অন্য একজন জোতদারের বাড়ীতে যান। কাজীও প্রথমে বাঁধা দেয়। জনতা তখন কাজীকে কিছুটা পিটুনী লাগায় ও কাজীর ঘরে ঢুকিয়া খাদ্যের জন্য তল্লাসী করে। কিন্তু কাজী আগেই সব ধান সরাইয়া ফেলিয়াছিল।

তখন জনতা বঙ্কু মণ্ডল নামে আর একজন জোতদারের বাড়ী গিয়া ১৬ মণ ধান দখল করে।

এই সব ধান গ্রামের ক্ষুধিতদের ভিতর সমানভাবে বিলি করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বগুড়াতেও ক্ষেতমজুরগণ খাদ্যের দাবীতে লালঝাণ্ডা নিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রকাশ যে, ক্ষেতমজুরগণ ও গরীব কৃষকগণ খাদ্যের দাবীতে এই আন্দোলনকে গুলির মুখে স্তব্ধ করিবার হুকুম দিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ সব এলাকায় সশস্ত্র পুলিস পাঠাইতেছেন!

ম্যাজিষ্ট্রেটের এই হুকুমে জনতার বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধিই পাইতেছে।

খুলনার ১৭টি গ্রামে পিটুনী পুলিস ও পিটুনী কর

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও বৈঠকখানা থানার ১৭টি গ্রামে অতিরিক্ত পুলিস বাহিনীর ঘাঁটি বসান হইয়াছে। এবং এই পিটুনী পুলিসের সমস্ত খরচা আদায়ের জন্য সমস্ত গ্রামবাসীর উপর পিটুনীকর ধার্য্য করা হইয়াছে।

গোটা পূর্ব্ববঙ্গ জুড়িয়া চাউলের দর ৪০৲।৫০৲ উঠিয়াছে। গরীবের ঘরে অনাহার সুরু হইয়াছে। গরীব ও মাঝারি কৃষকদের ঘরে যে সামান্য ধান ছিল সরকারী ধান সিজের নামে সে ধানও টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। অথচ ধনির ঘরের ধানে হাত পড়ে নাই। গরীব মরিতেছে, ধনীরা মুনাফা লুঠিতেছে।

অনাহারের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য গরীব ও মাঝারী কৃষকরা নিজেদের ঘরের ধান সিজ করিতে দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

ইহারই ফলে খুলনা জিলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিস ও আনসার বাহিনী মিলিয়া ধনীর স্বার্থে সন্ত্রাসনের সৃষ্টি করিয়াছে।

২৪শে এপ্রিল ডুমুরিয়া থানার ধান-বুনিয়ার ক্ষেতমজুর মাদার বাছাড় ও রমাকান্ত বাইন এবং গরীব কৃষক সতীশ বাইন খাদ্য চাইতে গিয়া পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিয়াছে।

বুলেটের আঘাতেও যখন গরীবের ভাতের দাবী বন্ধ করা যায় নাই, কৃষকদের আন্দোলন কমে নাই, তখন পাকিস্তান সরকার পিটুনী পুলিস বসাইয়া ও পিটুনী কর ধার্য্য করিয়া বুভুক্ষু কৃষকের খাদ্যের দাবী বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ভাতের বদলে বুলেট

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

কথা : অনাহারে কোথায়, রোগে ভুগিয়া মরিয়াছে। লীগের নেতাদের, সরকারী বড়কর্ত্তাদের সাধারণ মানুষ তো সব সময়ে হাতের কাছে পায় না ; তাই সরেজমিনে অনাহারে মৃত্যুর প্রমাণ হয় না। কিন্তু এবার মাদারিপুরে নেতারা গেলেন বড় সভা করিবার জন্য। জনতা হাজির অনাহারে মৃতদেহ লইয়া। ইহারা সরেজমিনে দুর্ভিক্ষের প্রমাণ করিয়া এবার ছাড়িয়াছে। নেতারা পলাইয়া বাঁচিয়াছেন।

লীগ নেতাদের সমাধান—না খাইয়া মরিলেও চুপ করিয়া থাকো

লীগ নেতারা পাকিস্তানের ধনিক সরকার জনগণের সামনে সমাধানের কোন্ পথ তুলিয়া ধরিয়াছেন? তাহাদের তো বুলি হইয়াছে ইসলামীয় সমাজতন্ত্র, সেই অনুসারে সমাধানের পথ কি?

জনাব নুরুল আমিন (পূর্ব্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী) ৯ই জুলাই তারিখে মুন্সীগঞ্জে ইহা বাতলাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, খাদ্য-সমস্যা "এই প্রদেশের একার সমস্যা নয়; বরং বিশ্বের সর্ব্বত্রই আজ এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রধান সমস্যা খাদ্য-শস্যের দুষ্প্রাপ্যতা নয়। দুর্মূল্যতা। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে সহজতর করিতে হইলে জনসাধারণকে ধ্বংসমূলক সমালোচনা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।" [আজাদ ১০ই জুলাই]। ইহাই প্রধান মন্ত্রীর সমাধান। ইহার সোজা অর্থ : অনাহারে মরিলেও জনসাধারণকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে ইসলামীয় সমাজতন্ত্র কেমন করিয়া কায়েম হইবে? মুনাফার লোভে উন্মত্ত নূতন ধনিকেরা নররক্তের আস্বাদ পাইয়াছে ; সরকারী যন্ত্রের সাহায্যে মজুর, ক্ষেতমজুর, গরীব ও মাঝারি কৃষক, মধ্যবিত্ত-সকলের ধমনী হইতে সমস্ত রক্ত তাহারা নিঃশেষে বাহির করিয়া লইতেছে, সারা দেশের খাদ্য তাহারা ধনিকের ও সরকারের গোলায় মজুত করিতেছে। অনাহারে মৃত লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশুর কংকালের সিঁড়ি তৈয়ার করিয়া নুরুল আমিন-আফজলের দল শাসনের গদিতে বসিয়াছে, নিঃশঙ্কে অনাহারে মরার পথ ছাড়া আর কোন পথ তাহারা দেখাইতে পারে? ইহাই তো তাহাদের সমাজতন্ত্র!

ধনী কৃষক ও চোরাকারবারীর পায়ে চরম আত্মসমর্পণ

বিক্ষুব্ধ জনতার সামনে চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের দিন আসিয়া পড়িতেছে—এই সব ধোঁকাবাজি আর চলিবে না লীগনেতারা তাহা বুঝিতেছেন। তাড়াতাড়ি আর একবার নির্ব্বাচন শেষ করিয়া তাহারা লীগের গদী কায়েম রাখার আশা করিতেছেন। কি উপায়ে? জনতার দাবী মিটাইয়া নয়, জনগণকে খাদ্য দিয়া নয়, ধনিকদের লোভের আগুনে আরও ঘৃতাহুতি দিয়া লীগনেতারা নির্ব্বাচনে জয়লাভের ষড়যন্ত্র হাসিল করার চেষ্টা করিতেছেন। লীগনেতাদের কথা : 'ধনী, কৃষক, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর তোমরা যদি মজুর, গরীব চাষীদের কুচি-কুচি করিয়া নরমাংস খাইতে চাও, তাহাতেও আপত্তি করিব না, বরং সব রকম ব্যবস্থা করিয়া দিব ; বিনিময়ে তোমরা আর একবার লীগকে নির্ব্বাচনে জিতাইয়া দাও।

মৌলানা আক্রম খাঁ ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "খাদ্য বিভাগকে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের অপর বিভাগগুলি হইতে পৃথক করিয়া দিতে হইবে।" তাহা হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। [ষ্টেটস্‌ম্যান ৮ই জুলাই] ইহাই-লীগ সভাপতির শরিয়তী সমাধান।

ইহার অর্থ কি? তিনি চাহিয়াছেন, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ ধনিক শ্রেণীর হাতে পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে হইবে, খাদ্য সরবরাহের ভার সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে থাকিবে। অন্যতম বড়ো ধনিক হানিফএর হাতে আছে পূর্ব্ববঙ্গে কাপড় সরবরাহের একচেটিয়া ভার। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের অন্যান্য কাজ এইরূপ ধনিকদের একচেটিয়া অধিকার হইয়া আছে। খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থার উপরও ধনিকগণ এই অধিকার চায়। মৌলানা আক্রম খাঁ সেই খাদ্যনীতি দাবী করিয়াছেন।

খাদ্যমন্ত্রী আফজল এই নীতিই ঘোষণা করিয়াছেন। কোন কোন আমলা চোরাকারবারের পথে যে বাধা সৃষ্টি করে ; তাহা চলিবে না। কর্ডন আইনের কোন কোন ব্যবস্থা চোরাবাজারের প্রতিবন্ধক করিতেছে। তাহা আর চলিবে না, ধনী কৃষক, জোতদারদের স্বার্থে খাদ্য নীতি আরও বদলানো হইবে—ইহাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। শরিয়তের নামে ইহাই লীগ নেতারা চালাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

শয়তান ধনিক ও চোরাকারবারীদের কাছে পুরা আত্মসমর্পণ করিয়া, লীগ-নেতারা লীগ পুনর্গঠন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এই পথ খাদ্য সরবরাহের পথ নয়, সংকট আরও তীব্র করার পথ।

ভাতের বদলে বুলেট

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ভাত না খাইয়া বরং আটা খাও ; আটা আমাদের অনেক আছে। কিন্তু ধনী কৃষক চোরাকারবারীর সরকার কায়েম থাকিলে আটা থাকিতেও আটা মিলে না, মিলিতে পারে না। পশ্চিম পাঞ্জাবে গমের অনেক বাড়তি হইয়াছে, এই খবর দুই এক দিন আগে বাহির হইয়াছে ; সাথে সাথেই খবর বাহির হইয়াছে, ঢাকা শহরে আটার অভাবে রেশনের রুটি মিলিতেছে না।

সরকার তাই ভাতের বদলে বুলেটের ব্যবস্থা করিতেছেন। খুলনা জেলার মাঝারি ও গরীব কৃষকেরা তাহাদের নিকট জবরদস্তি বে-আইনী খাদ্য সংগ্রহে বাধা দিয়াছে ; সেখানে গুলি চলিয়াছে, বেলুচি সৈন্য মোতায়েন হইয়াছে, গ্রামের পর গ্রামে পিউনিটিভ ট্যাক্স বসিয়াছে। ময়মনসিংহে, রংপুরে, দিনাজপুরে গুলি লাঠি গ্রেপ্তার চলিতেছে, জনতা চোরা-কারবারীর ধান, ধনী কৃষকের ধান বিলি করিয়া অনাহারীদের বাঁচাইতেছে, এই অপরাধে।

রেলের মজুরদের ও সরকারী কর্ম্মচারী-দের গ্রেনশপের অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে, প্রতিবাদ স্তব্ধ করার জন্য লাঠি গুলি সমানে চলিয়াছে।

ফসল বাড়াইবার, সেচের বড় বড় প্লানেও করাচীতে ঘন ঘন সম্মেলন চলিয়াছে—গরীবের পয়সা খরচ করিয়া। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের শতকরা ৮৬ জন কৃষকের হাতে জমি নাই। জমি না থাকিলে তাহারা ফসল বাড়াইবে কি করিয়া? অথচ জমিদারি উচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা নাই—দেশের সমস্ত জমি মুষ্টিমেয় জোত-দার বা ধনী কৃষকের হাতে জমিতেছে, প্ল্যান তো অনেক দিন হইতেছে ; চাষীর হাতে জমি না আসিলে কিছুতেই কোন

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিল

বাংলার শ্রমিক নওজোয়ান

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

বেশী কোন দিন রোজগার হয় না। আর মালিকের খুসি না হলে, টিন, বিড়ির পাতা প্রভৃতি মাল অকুলান হলে বেকার থাকতে হবে। আর জুলুমতো পদে পদে।

নিশ্বাস ফেলার সময় নাই

যে কোন বস্তিতেই দেখা যাবে ১০ বছর ১২ বছর ১৪ বছরের ছেলেরা সকাল থেকে রাত ১০টা পর্য্যন্ত খাটছেন মুসলমানী হোটেলে বা হিন্দু চায়ের দোকানে। বকুনি খাচ্ছে, মার খাচ্ছে, লাথি খাচ্ছে। খেতে পাচ্ছে হোটেলের উদ্বৃত্ত একপ্লেট খানা। তারপর কেউ দু'চার আনা পয়সা পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না জরিমানা কাটা যাচ্ছে।

টিনের কৌটা যোগাড় করে আনা, টুকিটাকি জিনিস ফিরি করা, ষ্টীল-ট্রাংক দোকানে জোগাড়ে হিসাবে তেলকলে কাঁচের চুড়ির কারখানায়, কাঠের কারখানা, দিয়াশালাইয়ের কারখানায়, সাবান কারখানা, মোটর সাইকেলের মেরামতির দোকান, ছোটো ইঞ্জিনিয়ারিং দোকান, কার্ডবোর্ড বাক্সের কারখানা, প্রেস এমনি হাজার রকমের কাজে নিতান্ত তুচ্ছ মজুরিতে ১০।১২ ঘণ্টা খাটুনিতে বস্তির এই নওজোয়ানেরা নিশ্বাস ফেলার অবসর পায় না। যে ছেলে যে নওজোয়ান কোন কাজই পায় না সে ফিরি করে। নয়ত বস্তা কাঁধে করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় পথে। ডাস্টবিন জঞ্জাল ঘেঁটে খুঁজে বার করে বাতিল টিনের কৌটো, ছেঁড়া কাগজ, পচা ন্যাকড়া। সের দরে, চার পয়সা দুই আনায় কিনে নেবে গুদাম মালিকেরা।

বেকারীর সমস্যা এই সব বস্তিতে দেখা দেয় অন্যভাবে। হঠাৎ ব্যাপক ছাঁটাইয়ের মধ্য দিয়ে তত নয়। কারণ ছাঁটাই, দোকান বন্ধ, এবং ছোটো ছোটো কারখানা উঠে যাওয়া প্রায় সাধারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বেকারীর সমস্যা দেখা দেয় পুরো সপ্তাহ কাজ জুটাতে না পারায়। দুদিন তিনদিন কাজের ধান্দায় ঘুরতে হওয়ায়।

আর শিক্ষা, অল্প বয়সে বস্তির ছেলেরা অনেকেই উদ্যোগী হয়ে লেখাপড়া শিখতে সুরু করে। অনেকে সপ্তম অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত এগোয় কিন্তু তার পরেই রোজগারের তাড়ায় শেখা জিনিসও ভুলতে সুরু করে।

সংগঠনের অভাবের মাঝেও মরীয়া প্রচেষ্টা

জীবন ধারণের মত মজুরি প্রভৃতির জন্য বড়ো বড়ো কল-কারখানার শ্রমিকেরা যে ভাবে সংগঠিত লড়াই করতে পারেন, এই সব ছোটখাটো বিচিত্র শিল্পে ও দোকানে সে রকম সংগ্রাম ও সংগঠনের দৃষ্টান্ত কম। কিন্তু তার মানে এরা যে সংগঠিত হতে চান না তা মোটেই নয়।

ক্ষুদ্রায়তন দোকান কারখানায় সংগঠনের অভাব মেটাবার চেষ্টা হয় বস্তিতে বিভিন্ন অর্দ্ধস্ফুট সামাজিক সংগঠনের ভেতর দিয়ে।

এবং স্বভাবই বস্তির নওজোয়ান ছেলেরাই এতে সব চেয়ে অগ্রণী।

এক একটি বস্তিতে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত লোক বসবাস করলেও প্রায় দেখা যায়, শ্রমিক নওজোয়ান নিজেরাই মিলে একটা ক্লাবের মত বানিয়েছে। যত খাপছাড়াই হোক, সেখানে খেলাধূলা এবং আলোচনা জমে। কামারহাটির শ্রমিক বস্তিতে এই রকম ক্লাবে আধুনিক উর্দ্দু কবিতার আলোচনা পর্য্যন্ত হয়। হয় ত দেখা যাবে। ক্লাবও নয়। একটি মাত্র টেনিস বল আছে। তাই নিয়ে ফুটবল খেলার মহড়া চলছে এবং কিছু নওজোয়ান প্রত্যহ একত্র হচ্ছেন।

কোথাও দেখা যাবে একটি নাইট স্কুল কেউ খুলেছে। এবং সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীর পরেও বস্তির সমস্ত ছেলে ছোকরারা সাগ্রহে তাতে জমায়েত হচ্ছে। চেতলার এমনি একটি নাইট স্কুলে দুই বেলা প্রচুর শ্রমিক নওজোয়ান একত্র হন এবং রাজনৈতিক আলাপও করেন।

কোথাও হয়ত গানের দল আছে, যাত্রার দল আছে। কোথাও হয়ত নওজোয়ানেরা সন্ধ্যায় এমনি বসে এক যায়গায় দুটো কথা বলে আলাপ করে। এবং পকেটে পয়সা থাকলে দল বেঁধে সিনেমায় যায়। কোথাও হয়ত সংগঠনের সূত্র একটি খবরের কাগজ যে হোটেলে খবরের কাগজ আসে সেখানে ভীড় জমে, রাজনৈতিক তর্ক হয়। একজন বানান করে করে পড়ে আর সকলে উদ্গ্রীব হয়ে শোনেন দেশের খবর, চীন, বর্ম্মা, মালয়ের খবর, দুনিয়ার খবর।

সংগঠন হিসাবে এ গুলোর মূল্য অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ, কিন্তু একটা জিনিস এ থেকে চোখে না পড়ে পারে না—জোট বাঁধার ইচ্ছে এই শ্রমিক নওজোয়ানের মধ্যে কত তীব্র।

বিশেষ করে বড়ো বড়ো রাজনৈতিক ওলট-পালটের সময়, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে অংশগ্রহণের ঝোঁক যখন ব্যাপক হয়ে ওঠে, তখন এই সমস্ত বস্তিগুলো থেকেই যে সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত কম নয়।

এমনি এক সংগঠনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড। ধনী হোটেল-ওয়ালা, ব্যবসায়ী বাড়ী মালিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা যে ন্যাশনাল গার্ডকে তাদের স্বার্থে মজুরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল, সেটা অন্য প্রশ্ন। আজকের সংগঠনের প্রশ্ন তাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে চূর্ণ না করে হতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বস্তির গরীব মানুষেরা বিশেষ করে নওজোয়ানেরা সহজেই কত দৃঢ়ভাবে নিজেদের সংগঠিত করতে পারে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, নারকেলডাঙ্গার একটি যুব ক্লাব। মহল্লার শ্রমিক পরিবারের ছেলেদের নিয়ে এখানে যে ক্লাব হয় বছরের পর বছর তা থেকে সমস্ত এলাকায় নিয়মিতভাবে লালঝাণ্ডা ও বিপ্লবী রাজনীতির প্রচার হতে থাকে। শ্রমিক অন্দোলনের বহু একনিষ্ঠ কর্মী এই ক্লাবের রাজনৈতিক আলোচনা থেকেই বেরিয়ে এসেছেন।

ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্যা

বাংলায় বিপ্লবী ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সঙ্গে কারখানায় ও বস্তির এই নওজোয়ানদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন সম্পর্ক নেই।

খাস কলকাতায় মাণিকতলা, রাজাবাজার, কলাবাগান প্রভৃতি বস্তির বাসিন্দারা অধিকাংশ অবাঙ্গালী এবং মুসলমান হওয়ায় অর্থনৈতিক শ্রেণী ভেদ তো বটেই সামাজিক যোগাযোগও ক্ষীণ।

শহরতলীতে স্কুল ইত্যাদিতে বাঙালী শ্রমিক ছেলেরা যেখানে কিছু দূর পর্য্যন্ত পড়ে সেখানেও এই যোগাযোগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

কলকাতার শহরতলীতে বাঙালী মধ্যবিত্ত 'গ্রাম' এবং শ্রমিক বস্তি সর্ব্বত্রই পরস্পর সংলগ্ন। স্কুলগুলিতে, এমনকি হাইস্কুলগুলিতেও শ্রমিক পরিবারের ছেলেরা সংখ্যায় প্রচুর, কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন বদরতলা স্কুল) শতকরা ৯০ জনই শ্রমিক পরিবার ভুক্ত। স্কুলে ছাত্র আন্দোলনে এঁরা সোৎসাহে একত্রে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু তার পরেই যোগাযোগ ক্ষীণ হতে থাকে। শ্রমিক পরিবারের ছেলেরা পয়সা অভাবে স্কুল ছেড়ে দেয় এবং কোন কাজ নেয়। তারপর ক্রমশঃ ছাত্র আন্দোলন কিছুদিন পূর্ব্বেকার তাদের এই ছাত্রদের ভুলে যায়।

[১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মেহনতী মেয়েদের অভিযান

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ দূর থেকে দেখেও কাছে ঘেঁষতে সাহস করল না।

১৭ই জুন স্বয়ং এস, ডি, ও সাহেব এলেও তারই নাকের ডগা দিয়ে দিদিকে শ্রমিকরা পাচার করে দিল—সারা বস্তি তন্ন-তন্ন করে ঘুরেও তাকে মিলল না। এই শ্রমিক ঐক্যের সামনে কর্ত্তৃপক্ষ মাথা নোয়াতে বাধ্য হলো। ৪২৲ টাকার স্থলে ৫০৲ মজুরি ধাঙ্গড়রা আদায় করতে সমর্থ হল।

* বজবজ বিরাট চটকল এলাকা। একে শুষে এতকাল বিলাতি ধনিক-গোষ্ঠি কোটি কোটি টাকা লুটে এই অঞ্চলের শ্রমিকের ও তার সন্তানদের কঙ্কালসার দেহ আর ভূখা পেটের উপর নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। আজ চটকল এক হপ্তা প্রত্যেক মাসে বন্ধ করে তারা শ্রমিকের পেট কেটে নিজেদের লাভ রক্ষা করার নির্ম্মমনীতি চালু করেছে। এখানেও মেয়েরাই প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছে। ৮ই জুলাই মেয়েদের মিছিল মিল গেটের সামনে ছুটির সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়। "হপ্তা বন্ধ মেন না"—"শুকিয়ে মরার চাইতে লড়াই করে মরা ভাল" ইত্যাদি ধ্বনি শ্রমিকের মনে সাড়া জাগায়। মায়েরা শ্রমিক সন্তানদের কাছে বক্তৃতা দেয়—"তোমাদের স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা শুকিয়ে থাকবে আর মালিকেরা মোটা টাকা লুটে আরামে খানাপিনা করবে, জহরলালের বোনের ১০ হাজার টাকা লাগবে মাসহারা আর আমাদের সামান্য মজুরিও আজ বন্ধ—এ অন্যায় তোমরা কি নিরবে মেনে নেবে?" এমনি সময়ে পুলিস এসে বাধা দেয়—মিছিল বার করতে দেবে না। কিন্তু কতক মেয়ে সাহসের সঙ্গে কডন ভেঙ্গে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুলিস ঘিরে ফেলে। সেই ঘেরা অবস্থাতেও তারা বক্তৃতা করতে থাকে, ছেলেদের কাছে আবেদন জানাতে থাকে। বারে বারে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এগিয়ে আসে আর বারে বারে পুলিস বেয়নেট উঁচিয়ে তাদের তাড়া করে। শেষে পুলিস ভয় পেয়ে মেয়েদের তাড়াতাড়ি পুলিসলরীতে জোর করে তুলে থানায় নিয়ে গিয়ে রক্ষা পায়। কিন্তু মা-বোনেদের সাহস দেখে পরদিন থেকেই কারখানায় কারখানায় রব উঠেছে "যে কংগ্রেসের পুলিস আমাদের মা-বোনদের ধরে নিয়ে গেল—সেই দালাল কারখানার মধ্যে দেখলেই পেটাতে হবে।"

এই ভাবেই আজ মেদিনীপুরের অমর পুতপুতিয়া গ্রামের মেয়েদের সংগ্রামী ঐতিহ্য সমস্ত গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে পড়ছে। যে পুতপুতিয়া গ্রামের উপর দুর্দ্দমনীয় অত্যাচারের রথ ষাট বছরের বুড়ি মা, আসন্ন প্রসবা স্ত্রী আর ১০।১২ বছরের কিশোর বালককে বাদ দেয়নি—তাদের প্রহার করতে, বেইজ্জৎ করতে ছাড়েনি—সেই পুতপুতিয়ার শিশু, মেয়ে পুরুষ ঘর ছেড়েছে, সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখেছে তবু তারা হাতের লালঝাণ্ডা ছাড়েনি। তাকে আরও দৃঢ় করে উচ্চে তুলে ধরেছে।

আজ দিকে দিকে কংগ্রেসী শাসক, কলের মালিক, ধনিক, জমিদার, জোতদারের জুলুমের বিরুদ্ধে, মাঠে, কারখানায়, শহরের গরীব পল্লীতে শ্রমিক কৃষকের অভিযান চলেছে।

সে অভিযানে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েরা।

ভাতের বদলে বুলেট

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

ফল হইবে না, শুধু চোরের সুবিধা হইতেছে, তাহাই হইবে।

সমাধানের আসল পথ

লীগ সরকারের পথ খাদ্য দেওয়ার পথ নয়। জনতার খাদ্য কাড়িয়া লওয়ার পথ—জনসাধারণ তাহা বুঝিয়াছে। খাদ্য সমস্যা সমাধানের আসল পথে তাহারা নিজেরাই আগাইয়া চলিয়াছে।

* পূর্ব্ববঙ্গের শোষিত জনতা আজ আওয়াজ তুলিয়াছে—লাঙ্গল যার জমি তার ঃ ক্ষেতমজুরের ৩৲ টাকার কমে মজুরি নাই। বিভিন্ন জেলায় মজুরি ও জমির লড়াই চলিতেছে।

* শোষিত জনতা আওয়াজ তুলিয়াছে ঃ ধনীর গোলা ও সরকারের গুদাম হইতে ধান আনিয়া অনাহারীদের মধ্যে বিলি করো, তাহাদের বাঁচাও।

লীগনেতাদের পথ নয়, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনতার এই পথ আসল পথ। এই পথে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ধনিকের সরকারের বদলে জনতার গণতন্ত্র কায়েম হইবে। জমি ও খাদ্যের সমস্যার সমাধান হইবে।

কমিউনিষ্ট নেতা হরেণ দাসের মৃত্যু

পুলিসের কবলে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড হরেণের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

শহীদ হরেণের স্মরণে আমরা লালঝাণ্ডা অবনমিত করিতেছি।

ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় কমরেড হরেণকে ১৪ই জুলাই লেক হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার সশস্ত্র প্রহরীরা ২৪ ঘণ্টা তাঁহার পাশে হাজির থাকে। তাঁহার আত্মীয় স্বজনকেও কাছে ঘেঁসিতে দেওয়া হয় না।

হঠাৎ ১৯শে জুলাই কমরেড হরেণের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

কমরেড হরেণের বত্রিশ তেত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রত্যেকটি দিনই হইতেছে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি ছিলেন ঢাকার গ্রামের এক গরীব রজক পরিবারের ছেলে। 'নীচ জাতির' ছেলে হিসাবে প্রথম হইতেই সর্ব্বপ্রকার শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। বিদ্যালয়ে কিছুদূর পড়ার পরই তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য পড়া ছাড়িতে হয়। কলিকাতা ট্রামে কনডাক্টরের চাকুরী গ্রহণ করার পর হইতে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের এক নূতন দিক দেখিতে পান। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কালীঘাট ট্রাম শ্রমিকদের অগ্রণী শ্রমিক ও সংগঠক হিসাবে প্রিয় হইয়া উঠেন। ১৯৪২ সাল হইতে সুরু করিয়া ১৯৪৫ সালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-জাগরণের পূর্ব্বে ট্রাম শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্ম্মঘট, ১৯৪৭ সালের ধর্ম্মঘট প্রত্যেকটি লড়াইয়ে তিনি অপূর্ব্ব সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দেন।

২৭শে মার্চ্চ ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ট্রাম শ্রমিকেরা যে ধর্ম্মঘট করেন, তাঁহার অন্যতম নেতা হিসাবে কমরেড হরেণ বরখাস্ত হন।

সংগঠনে ও রাজনীতিতে সুবিধাবাদের প্রত্যেকটি গোপন আত্মপ্রকাশকে কমরেড হরেণ অনেক সময় একাকী দাঁড়াইয়া আঘাত করেন। এবং বিপ্লবী সংগঠক হিসাবে কলিকাতার কমিউনিস্টদের নেতা হইয়া দাঁড়ান।

মৃত্যুর অল্প কয়েক মাস আগে হইতে তাঁহার চরিত্রে যে দৃঢ়তা, শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের প্রতি নির্ম্মমতা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করার যে নিষ্ঠা দেখা দেয় তাহা শুধু শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পক্ষেই সম্ভব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সফলভাবে আয়ত্ত করার জন্য অল্প দিনের মধ্যেই অল্প শিক্ষিত কমরেড হরেণ কঠিন ইংরাজী ভাষার দখল অর্জ্জন করেন।

নেতা হিসাবে তাঁহার দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রধান গুণ ছিল গণ-সংযোগ। ট্রামের শ্রমিকেরা মন খুলিয়া কথা যাহার নিকট কহিতে চাহিত তবে সে হইতেছে প্রিয় নেতা হরেণ। শুধু ট্রামই নয়, কালীঘাট অঞ্চলের সমস্ত বস্তিগুলিতে এবং কর্পোরেশন ধাঙ্গরদের মধ্যে কমরেড হরেণের মত প্রিয় কেহ ছিল না।

গত ২০শে জুলাই তাঁহার মৃতদেহ লইয়া ট্রাম লাইনের উপর দিয়া এক বিরাট মিছিল কেওড়াতলায় যায়—পাইনে প্রায় ৩০।৪০টি ট্রাম জমিয়া যায় এবং মিছিলের অনুগমন করিতে থাকে।

সংগ্রাম ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আপোষ নাই—শ্রেণী শত্রুদের ক্ষমা নাই এই কথাই তিনি তাঁহার মৃত্যুর মধ্য দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বাংলার শ্রমিক নওজোয়ান

(১১ পৃষ্ঠার পর)

মৌলিক আশাপটাও স্তব্ধ হয়ে যেতে থাকে।

একটি দৃষ্টান্ত

ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক নওজোয়ানদের সম্পর্ক কিভাবে ছিন্ন হয়ে যায় তার একটি দৃষ্টান্ত গৌরীপুরে রা—। ১৭।১৮ বয়সের ছেলে। বাপ মজুর। ভাই পাড়া স্কুলে ক্লাস নাইন পর্য্যন্ত পড়েছিল, কিন্তু সমস্ত মজুর নওজোয়ানের মতই পড়া ছেড়ে তাকে কলে ঢুকতে হয়।

ভাটপাড়া স্কুলে সে যদ্দিন ছিল তদ্দিন প্রত্যেকটি ছাত্র আন্দোলনেই সে সামনে থাকত। অথচ তারপরে রা—কি করে ছাত্র আন্দোলন তার খোঁজ রাখেনি।

কিন্তু আন্দোলনকে রা— ছাড়েনি। গৌরীপুরের শ্রমিক এলাকায় রা—এবার সুরু করল মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। হাঁটাইয়ের ফলে কলে চাকুরী টিকল না। দোকানে চাকুরী নিল। তাও টিকল না, কিন্তু লালঝাণ্ডার প্রত্যেকটি মিছিলে, গেটের মিটিংএ এই নওজোয়ান শ্রমিক উৎসাহে এগিয়ে যেতে থাকে।

গত ৩রা জুলাই পুলিস আক্রমণের সামনে এই নওজোয়ান শ্রমিকই সবচেয়ে বীরত্বের পরিচয় দেয়। ধরা পড়েও একলা লড়াই করে সে পুলিসকে কাবু করে দুই জন অফিসার জখম হয়।

নজর রাখলেই দেখা যাবে রা—এর মত এমনি শত শত নওজোয়ান ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের সম্পর্ক হারালেও অন্যত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

লড়াইয়ের সামনের সারিতে

পুঁজিপতিদের আক্রমণ তাদের ওপরেই যে প্রথম আসে, হাঁটাই এবং বেকারী তাদেরই যে প্রথম সইতে হয় তাই নয়। বয়স্ক শ্রমিকের দৃঢ়তা ও অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এগুলি না থাকলেও তরুণ এবং যুবক বলে তাদের মধ্যে উদ্যোগও সবচেয়ে বেশি। আকাঙ্ক্ষা এবং কল্পনাশক্তি এবং গ্রহণের ক্ষমতা তাদের মধ্যে সবচেয়ে তাজা। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তাদেরই চঞ্চল করে তোলে সবচেয়ে আগে।

দেখা গিয়াছে, **হাওড়ার বিলিলিয়াস বোর্ডের** লোহা কারখানাগুলোতে অল্পদিন আগে কারখানা কায়েম করবার লড়াই সুরু হয় তাতে অগ্রণী অংশ গ্রহণ করেছিল সমস্তই ১৮ থেকে ২২ বছরের নওজোয়ান শ্রমিকেরা। **পটারার বিপ্লবী লড়াইয়ে** সর্ব্বপ্রথম যে কয়জন প্রতিরোধের লড়াইয়ে এগিয়ে যান তাঁরা হচ্ছেন এল-টি-পি ডিপার্টের ২২।২৩ বছরের ছেলেরা। **এলেনবেরীর** উদ্যোগী ভলাণ্টিয়ার এবং সংগঠকেরাও ছিলেন নিতান্ত যুবক। **কাশীপুরে** পুলিস এবং গুণ্ডাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে অটল সৈনিকের মত যাঁরা প্রতিরোধ চালিয়েছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই তরুণ। তরুণ শ্রমিকদের সবচেয়ে উদ্যোগী ভূমিকা দেখা যায়, **বাউড়িয়া চটকলে**। কারখানার নূতন নেতা বিজয় হাজরা আসলে ছিলেন স্পিনিং ডিপার্টের ছোকরা শ্রমিকদের দলপতি। বিজয়কে গ্রেপ্তার করতে দেব না এই দাবীতে তরুণ শ্রমিক মহল যে বিপ্লবী আন্দোলন সুরু করেন দেখতে দেখতে তা সমস্ত কারখানাকে এবং সমস্ত বাউড়িয়া এলাকাকেই জাগিয়ে তুলেছিল।

ব্যাপক রাজনৈতিক বিক্ষোভ

অপরদিকে কলকাতার ওপরকার বস্তিগুলিতে বিক্ষোভ এখনও ধূমায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন বিচিত্র ধরনের মানুষদের বিভিন্ন বিচিত্র দাবি অর্থ-নৈতিক সংগ্রামের কোন সরল পথ না পেয়ে দ্রুত রাজনৈতিক বিক্ষোভ পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তার সর্ব্বশেষ ব্যাপক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে দক্ষিণ কলিকাতার নির্ব্বাচনে। কংগ্রেসবিরোধী বিক্ষোভে মধ্যবিত্ত যুবকদের সঙ্গে সেদিন রাস্তায় নেমেছিল বস্তির ছেলেরা, রেস্টুরেণ্ট বয়, দোকান কর্ম্মচারী। চেতলা বহ্নির এবং হাজরা রোডের আশেপাশের বস্তির সমস্ত নওজোয়ানরা সেদিন এগিয়ে গিয়েছিল কংগ্রেসকে হারাবার জন্য।

বস্তির এই নওজোয়ানদের রক্তে রয়েছে ব্যারিকেড বাঁধার উন্মাদনা। ১৯৪৬ সালে রসিদ আলি দিবসের দিনগুলোয় বিদ্রোহী কলিকাতার যে সমস্ত রাস্তায় মিলিটারী লরী আক্রমণ করে জনতা বার বার গুলি অগ্রাহ্য করে এগিয়েছে তার প্রত্যেকটিই হচ্ছে এক একটি বস্তির সন্নিকটস্থল—হ্যারিসন রোড, মৌলালী, কলাবাগান, মানিকতলা, জগুবাবুর বাজার, হাজরা রোড প্রত্যেকটি ঝটিকা কেন্দ্রে দলে দলে যারা প্রাণ দিয়েছে তারা আর কেউ নয়—এই সব বস্তিরই বালক আর নওজোয়ানের দল।

সেদিনকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইকে পেছন থেকে ছুরি মেরে কংগ্রেস-লীগনেতারা শেষকে বিকিয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ডাকাতদের কাছে। বেকারীর বিরুদ্ধে জীবনধারণের মত মজুরি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ সুযোগের জন্য শ্রমিক নওজোয়ানেরা, যদি আজ দ্রুত সংগঠিত হয়ে উঠিতে পারে তবে এধারকার আরো পরাক্রান্ত এক অভ্যুত্থানের ধাক্কায় '৪৬ সালের বেইমানেরা লুপ্ত হয়ে যাবে বাংলা থেকে।

একই সাথে বুলেট ও সাধারণ নির্ব্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হইয়াছে; ইতিমধ্যেই তাহার প্রায় সবই বিস্মৃতির তলে গিয়াছে। এমনকি প্রধান মন্ত্রী যে বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসই দেশের রাজনৈতিক একতার একমাত্র আধার, তাহাও আর জনসাধারণের মনে কোন দাগ কাটিতে পারে নাই।"

[ইস্টার্ন ইকনমিস্ট ১৫ই জুলাই]

ইহাই প্রধান মন্ত্রীর কলিকাতা শফর সম্পর্কে বিড়লাগোষ্ঠির রিভিউ।

কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড হয়তো আবার রায়ের বদলে ঘোষ মন্ত্রিসভা কায়েম করিতে চাহিবেন। কিন্তু ডাঃ ঘোষকেও পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ ভোলে নাই। তিনি কালাকানুন চালু করিয়াছিলেন। তিনি-ই মজুর-কৃষকের উপর গুলি চালানো সুরু করিয়াছিলেন। বিড়লাগোষ্ঠীর বিশিষ্ট বিশ্বস্ত ব্যক্তি ডাঃ ঘোষ পশ্চিম বাংলার জনগণ তাহা ভালো করিয়াই জানে।

নেহরু আশা করিতেছেন যে, এই নির্ব্বাচনের ভাঁওতা শ্রমিকশ্রেণীকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিবে এবং আজ যে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও শোষিত মধ্যবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে লড়াইয়ের পথে আগাইয়া চলিয়াছে, সে পথ হইতে তাহাদের ফিরানো যাইবে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ

কিন্তু নেহরুর সে স্বপ্ন সফল হইবে না; ধনিকশ্রেণীর এই হিসাব কোন দেশে কোন দিন বিপ্লবী গণবিক্ষোভের হাত হইতে ধনিকশ্রেণীকে রক্ষা করিতে পারে নাই। **ঐ সাধারণ নির্ব্বাচনের আগেই এখনই পুরা নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের অধিকার জনসাধারণ আদায় করিবে। বাঁচার মত মজুরি ও ৮ ঘণ্টা খাটুনী, ছাঁটাই বন্ধ, মূল শিল্প জাতীয়করণ, বিনাখেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ ও জমি জাতীয়করণ করিয়া লাঙ্গল যার জমি তার এই ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য শ্রমিক ও শোষিত জনতার লড়াই চলতে থাকিবে।**

মেদিনীপুরে বন্দীদের মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি

মেদিনীপুর জেলের দুইজন অনশন ধর্ম্মঘটী রজনৈতিক বন্দী হরেন্দ্রনাথ মিত্র ও দ্বারিকানাথ ব্যানার্জি খড়্গপুর হাসপাতালে মারা গিয়াছেন বলিয়া আমাদের গত সংখ্যায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, বন্দীদের মৃত্যু হয় নাই।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।

৮০৲ নিম্নতম বেতনের ও মূল দাবীর ভিত্তিতে সাধারণ ধর্ম্মঘটের পথে আহ্বান

১৫,০০০ জনতার কণ্ঠে দমননীতিপ্রত্যাহার ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবী

ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাইয়ের ডাকে এবার-ময়দানে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে কলিকাতার ১৫,০০০ শ্রমিক, কর্ম্মচারী ও ছাত্রদের যে বিরাট গণসমাবেশ হয় তাহাতে বাঁচার মত মজুরি, ৮০৲ টাকা নিম্নতম বেতন, ছাঁটাই বন্ধ প্রভৃতি মূল দাবীতে এক দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সাধারণ সংগ্রাম গঠনের জন্য আহ্বান জানান হয়।

মুহুর্মুহু স্লোগান তুলিয়া সমগ্র জনতা এই আহ্বানকে অভিনন্দন জানান। হরতাল হামারা নাড়া হ্যায়—বার বার এই ধ্বনিতে সমগ্র জনতা ফাটিয়া পড়ে।

ইহারই সঙ্গে সঙ্গে দাবী উঠে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে। সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে। দমনমূলক সর্ব্বপ্রকার আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে। এই দাবীর জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানাইলে বিপুল জয়ধ্বনিতে সমাবেশ মুখরিত হইয়া উঠে।

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সংকট ফাটিয়া পড়ার মুহূর্ত্তে এবারের ২৯শে জুলাই। শ্রমিক কর্ম্মচারীর পেট কাটিয়া, ছাঁটাই ও বেকারী কায়েম করিয়া মুনাফা বাঁচাইবার এক জঘন্য চক্রান্ত চলিতেছে। চটকল, লোহাকল, রেল, ডাক-তার, ইঞ্জিনিয়ারিং সর্ব্বত্র ছাঁটাই খাটুনী বৃদ্ধিও বেতন হ্রাসের বিভীষিকা সুরু হইয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা লইয়া এবারের বিরাট গণসমাবেশ।

৯ই মার্চ্চের পর শ্রমিক-ছাত্র-মহিলা, কর্ম্মচারীর এত বড়ো ঐক্য সমাবেশ আর হয় নাই। গত কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন মিছিল ও সমাবেশ এইরূপ একটি ঐক্য সমাবেশের দিকে ঝুঁকিতেছিল। ২৬শে জুলাই ছাত্রদের বিরাট শোভাযাত্রা, ২৮শে জুলাই বাস্তুত্যাগীদের মিছিল পরিণতি লাভ করিল ২৯শে জুলাইয়ের বৃহত্তম গণ-সমাবেশে।

লালঝাণ্ডা উড়াইয়া অসংখ্য পোস্টার ও ফেস্টুন লইয়া বৈকাল হইতেই কলিকাতার চতুর্দ্দিক হইতে ছোট ছোট মিছিল আসিয়া জুটিতে থাকে মনুমেন্টের নীচে। লাল-ঝাণ্ডা ও ফেস্টুন লইয়া মিছিল আসে ই, আই, রেল শ্রমিকদের, খিদিরপুর হইতে মিছিল আনেন বি, এন, রেলের জঙ্গী শ্রমিক কর্ম্মচারীরা। কাজের পোষাক পরিয়া মার্চ্চ করিয়া আসেন বাহাদুর ট্রাম শ্রমিকদের একটি দল। লালঝাণ্ডা লইয়া ধ্বনি দিতে দিতে প্রবেশ করেন গুলির মোকাবিলা করা পটারী শ্রমিকদের বিরাট বাহিনী। মিছিল আনেন কলিকাতার বিড়ি মজুরেরা, বাদরতলার চটকল, লোহাকল ও সূতাকল শ্রমিকেরা, সুঙ্গির জুতা কারখানার শ্রমিকেরা, টালিগঞ্জের লোহা ও কেমিকেল শ্রমিকেরা। ইউ-পি-টি ডব্লিউ, ফেস্টুন লইয়া ডাক-তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের নেতৃত্বে ডালহৌসি স্কোয়ার হইতে মিছিল আসে প্রায় একহাজার শ্রমিক, পিয়ন, দরোয়ান ও বিভিন্ন সওদাগরী ও সরকারী অফিস কর্ম্মচারীদের। "সংস্কৃতি কর্ম্মীদের স্থান সংগ্রামী শ্রমিকদের পাশে" এই ফেস্টুন লইয়া মিছিল আসে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের। ফেস্টুনসহ হাসপাতাল কর্ম্মীদের, ছাত্র পতাকা লইয়া ছাত্রদের এবং ৩০০ মহিলা লইয়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মিছিল সমস্তই আসিয়া জড়ো হন ২৯শে জুলাইয়ের সমাবেশে।

জড়ো হন দুই বৎসরের কংগ্রেস শাসনের সমস্ত রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া। রুটির জন্য, ভাতকাপড় শিক্ষার জন্য, ছাঁটাই, বেতন হ্রাস, ও বেকারীর বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের প্রত্যেকটি দাবীকে নির্ম্মম দমননীতি দিয়া চূর্ণ করার চেষ্টা হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিরাট ইতিহাস রহিয়াছে এই সমাবেশের পিছনে। ৯ই মার্চ্চের ফ্যাসিস্ট দমন ও সোস্যালিস্ট বেইমানির অভিজ্ঞতা লইয়া আসিতেছেন রেল শ্রমিকেরা। ৯টি ধর্ম্মঘট সংগ্রামের দুর্জ্জয় প্রাণশক্তি আনিয়াছেন ট্রাম শ্রমিকেরা। পটারী শ্রমিকেরা আনিয়াছেন সশস্ত্র পুলিস আক্রমণ প্রতিরোধের বিপ্লবী উদ্দীপনা। সাধারণ ধর্ম্মঘটের অভিজ্ঞতা আনিয়াছেন কর্ম্মচারীরা। রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আনিয়াছেন টালীগঞ্জ ও হাওড়ার শ্রমিকেরা। বুলেট অস্বীকার করার সাহস আনিয়াছেন ভয়হীন মহিলা ও গণতন্ত্রী ছাত্রেরা।

আত্মশক্তিতে দৃঢ় এইরূপ সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে খুব কমই দেখাগিয়াছে।

কাশীপুরের শ্রমিক নেতা বৃদ্ধ সিংহ সভাপতিত্ব করেন। শ্রমিকদের জন্য ৮০ টাকা এবং কেরানীর জন্য ১২৫ টাকা নিম্নতম বেতনের দাবি উত্থাপন করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের নেতা ডি, পি বসু ঘোষণা করেন, পুঁজিবাদী মালিকেরা নিজেদের লাভ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংকটের বোঝা শ্রমিকদের উপর চাপাইয়া দিতেছে। শ্রমিকদের মাথার উপর ছাঁটাই, বেতন-হ্রাস ও বেকারীর অভিশাপ নামিতেছে। ইহার প্রতিরোধে সাধারণ ধর্ম্মঘটের পথে সমস্ত শ্রমিককে আগাইয়া যাইতে হইবে। ইহাই হইতেছে এবারকার ২৯শে জুলাইয়ের ডাক।

দমননীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনিয়া

(১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দশহাজার সংগ্রামী জনতার সমাবেশে ছাত্র সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা—

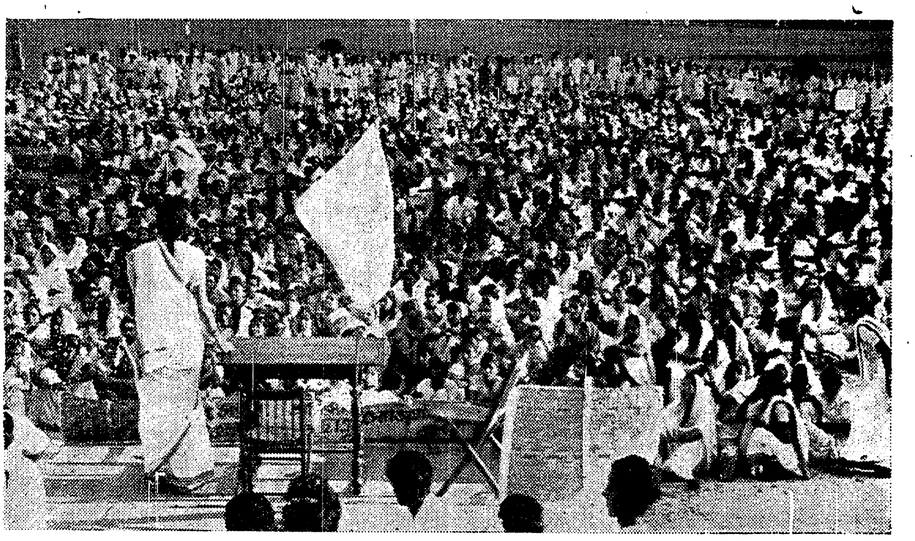

নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন

১০ হাজার ছাত্র ও মেহনতী জনতার সমাবেশ

শিক্ষা ও গণতন্ত্রের দাবিতে, বেকারী ও দমননীতির বিরুদ্ধে ৫ হাজার ছাত্র শ্রমিকের দুর্জ্জয় মিছিল

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের ছাত্র ফেডারেশনের প্রায় ৪৫০ জন সংগ্রামী ছাত্র প্রতিনিধি কলিকাতা শহরে চারদিনব্যাপী অধিবেশনের পর গত ২৬শে জুলাই ময়দানের ১০,০০০ শ্রমিক, ছাত্র ও গরীব মধ্যবিত্তের প্রকাশ্য সভায় তাহাদের সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করেন। সভার পর প্রায় ৫,০০০ সংগ্রামী মানুষের এক মিছিল অন্ততঃ দুই লক্ষ লোকের কাছে তাদের আহ্বান পৌঁছাইয়া দেন।

সারা ভারতের বিভিন্ন অংশের এই ছাত্র প্রতিনিধিরা নির্ম্মম দমননীতির মুখে গত দেড় বৎসরে শিক্ষার দাবীতে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শ্রমিক-কৃষক ও শিক্ষকের রুটির লড়াই এর সমর্থনে—সরকারের সাম্রাজ্যবাদ ঘেষানীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই চালাইয়াছেন—সারা ভারতের ২০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে এই লড়াই এর পিছনে সমাবেশ করিয়াছেন।

(১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মিছিল

প্রথম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] ৩১শে জুলাই '৪৯ : ১৫ই শ্রাবণ '৫৬ [তিন আনা

মতামত

* সিকিমে ভারত সরকারের নূতন চৌকিদারী
* ভুয়া ভোট-প্রস্তাবেও বিধান-নলিনীর আতংক
* আর-এস-এস গুণ্ডাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ
* বিদেশী মূলধনের স্বর্গ নেহরু ভারতবর্ষ
* ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের গহ্বরে 'নিরপেক্ষ' শরৎ বসু

নেহরু সরকার হঠাৎ সিকিমের শাসনভার গ্রহণ করিলেন কেন এখন সে রহস্য কিছুটা বুঝা যাইতেছে।

তিব্বত হইতে খবর আসিয়াছে যে, সেখানে গণ-বিপ্লব সুরু হইয়াছে; চিয়াং-কাই-শেকের গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়াছে; চিয়াং এর কর্ম্মচারীরা জনগণের হাতে মার খাইতেছে। তিব্বত ছাড়িয়া পলাইতেছে।

সিকিম তিব্বত হইতে দূরে নয়। সেখানে এতদিন বৃটিশ প্রভুরা যে সামন্ত-যুগীয় শাসন কায়েম রাখিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে; পার্ব্বত্য জাতীয় নরনারী জমি ও স্বাধীনতা দাবী করিতেছে। গণ-বিপ্লব তিব্বত হইতে সিকিমের দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে লক্ষ্য করিয়া নেহরু সরকার আতংকিত হইয়া উঠিয়াছেন; দার্জ্জিলিং-এর সমগ্র গোর্খা অঞ্চলকে গণ-বিপ্লব হইতে 'রক্ষা' করার জন্যই তাঁহারা সিকিমের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করিয়াছেন। খবর পাওয়া যাইতেছে যে, নেহরু সরকারের সৈন্যদল কালিম্পং-এর দিকে যাত্রা করিয়াছে। ভারতের পলিটিক্যাল মিশনের বৃটিশনেতা রিচার্ডশন সাহেব ইতিমধ্যেই বেশ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

এতদিন নেহরু সরকার শুধু বর্ম্মার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছিল, এবার তাহারা তিব্বতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ভারতের জনগণ এই সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ কখনো সহ্য করিবে না।

*   *   *

বিড়লার বন্ধু বিধান-নলিনী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারেও পশ্চিম বাংলায় কোন সাধারণ-নির্ব্বাচনে রাজী নন। শতকরা ১৩জন লোকের ভোট, শুধু পয়সাওয়ালা লোকদের ভোট। তাহাতেও তাঁহারা নিরাপদ বোধ করিতেছেন না। দক্ষিণ কলিকাতার উপ-নির্ব্বাচনের হার তাঁহারা এত সহজে ভুলিবেন কি করিয়া?

কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতাদের লইয়া। পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদের গালাগালি দিয়া বলিয়াছেন: তোমরা কাপুরুষ, তোমরা জনসাধারণের মধ্যে আমাদের ঢাক পিটাইতে ভয় পাও। ইহার জবাবে পরাজিত কংগ্রেসপ্রার্থী সুরেশ দাস বলিয়াছেন: মন্ত্রিসভার ঢাক-পিটাইতে গেলে শ্রমিকেরা আমাদেরই পিটাইতে আসে; কারণ মন্ত্রিসভা শ্রমিক-দের জন্যে গুঁটাই ছাড়া আর কি সু-ব্যবস্থা করিয়াছেন?

সুরেশ দাসরা জনগণের অসন্তোষকে মন্ত্রিত্বের গদী দখল করিবার কাজে ব্যবহার করিতে চাহেন। এই জন্যেই তাঁহারা এখন 'গণতান্ত্রিক' নামাবলী পরিয়া দিল্লীতে আনাগোণা করিতেছেন।

পশ্চিম বাংলার জনগণের সমস্যা নয়, কংগ্রেস নেতাদের নিজেদের ভাগ-বাঁটোয়ারার সমস্যাই যে দিল্লীর আলোচনায় প্রধান স্থান পাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

*   *   *

কিন্তু বিড়লাজীর সেবক কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট জনগণের অসন্তোষ দমনের জন্য অন্য পন্থা আবিষ্কার করিতে বিলম্ব করেন নাই।

কলিকাতার পুলিস কমিশনার জানাইয়া দিয়াছেন যে, নাগরিকদের স্পেশাল পুলিসের কাজ করিতে হইবে। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় টেগার্ট সাহেবেরা এই ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। শহরের ভদ্রলোকদের জেলে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে প্রথমে নোটিস দেওয়া হইত যে, আপনাকে পুলিসের ডিউটি লইতে হইবে। কোন ভদ্রলোক গবর্ণমেণ্টের রক্তাক্ত হাতের সহিত হাত মিলাইতে রাজী হইতেন না। পরে তাহার জন্যে তাহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু ময়দানে বক্তৃতার সময় জনসাধারণের "সহযোগিতা" চাহিয়াছিলেন। পুলিস কমিশনার সেই সহযোগিতা আদায় করার পথ বাহির করিয়াছেন।

*   *   *

'সহযোগিতা'র জন্য সত্যি সত্যি হাত বাড়াইয়াছে গান্ধীজীর হত্যাকারীরা।

বোম্বাই হইতে আর-এস-এস নেতা গোলওয়ালকার জানাইয়াছেন:

ভারতে কমিউনিজম দমনে, আর-এস-এস দল কাজ করিবে। [ষ্টেটসম্যান ২৭-১-৪৯]।

এই আর-এস-এসরা যাহাতে কাজে আসে তাহার জন্য প্রত্যহ রক্ষিতা সংবাদপত্র গোলওয়ালকার সম্বর্দ্ধনার বিরাট ফেনানো রিপোর্ট প্রচার করিতেছে। লক্ষ্ণৌ-এ ছাত্রছাত্রীরা যখন শিক্ষক ধর্ম্মঘটের সমর্থনে শোভাযাত্রা করেন তখন পুলিস একজন ছাত্রীকে নির্ম্মমভাবে জখম করে। আর সেই লক্ষ্ণৌ শহরে এখন আর-এস-এস দল প্রত্যহ বিনা অনুমতিতে সভা ও শোভাযাত্রা বাহির করিতেছে; 'গবর্ণমেণ্ট কোন বাধা দিতেছেন না।' [এডভান্স, ২৬-১-৪৯]।

কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে আর-এস-এসদের "কাজে" লাগাইবার চেষ্টা ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। বেল-ঘরিয়া বিড়লার কারখানা টেক্সমেকোতে, হাওড়া জুটমিলে, ঘুষুড়ী প্রভৃতি এলাকায় তাহারা ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের উপর হামলা সুরু করিয়াছে। বিড়লা প্রভুরা তাহাদের অর্থ যোগাইতেছে। 'জাতীয়' টি-ইউ-সির গুণ্ডারাও এখন 'কাজে' আসিতেছে না দেখিয়া কংগ্রেসী শাসকরা 'আর-এস-এস'দের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের জন্যে একই ভাগ্য অপেক্ষা করিতেছে।

*   *   *

মার্কিনমুলুক হইতে ডলার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া নেহরু সরকার আর একবার কসম খাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন: বিদেশী মূলধন শুধু নয়, ভারতে এখন যে সকল বিদেশী কোম্পানী আছে তাহাদের সহিত কোনরকমে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইবে না। ভারতের যে সকল শিল্প দুর্ব্বল বলিয়া এখন গবর্নমেণ্ট হইতে 'প্রটেকশন' পায় তাহাতে যদি বিদেশী মূলধন খাটে, তবে বিদেশী মূলধনও সেই সরকারী 'প্রটেকশনে'র সুযোগ পাইবেন।

ইহার সরল অর্থ হইল যে, বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে নেহরু সরকার যে শুধু কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না তাহাই নয় তাহাকে সাহায্য দিতেও প্রস্তুত থাকিবেন। ভারতে বিদেশী মূলধনে প্রতিষ্ঠিত-'শিশু-শিল্প' ভারতের শ্রমিক জনসাধারণকে অবাধ শোষণের অধিকার পাইবে।

ইঙ্গ-মার্কিন গোলামদের নিকট হইতে ইহা ছাড়া আর কি আশা করা যায়?

*   *   *

দেশী-বিদেশী ধনিকদের নিকট শ্রমিক জনগণের স্বার্থ বিক্রয়কে ঢাকিবার জন্যেই 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতারা তাঁহাদের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনেক গরম গরম বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, সরকার জিনিসপত্রের দর কমাইতে পারেন নাই, মালিকরা 'শিল্পে শান্তির' চুক্তি রক্ষা না করিয়া এখন কারখানা বন্ধ করিয়া দিতেছে। তাঁহাদের মতে এই অবস্থা চলিতে থাকিলে নাকি "শ্রমিক শ্রেণী এবং দেশের সর্ব্বনাশ হইবে।"

কলকারখানায় শ্রমিকদের ঐক্য ধ্বংস করিয়া যাহারা দিনরাত বিড়লার সেবা করিতেছেন তাঁহারা যে এখন 'বাপ বাপ' বলিতেছেন তাহা শুধুই শ্রমিকদের গুতার চোটে একথা শ্রমিকরা জানেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে সকল দালালকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন সমাজতন্ত্রী পঞ্চায়েত নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। পাটনায় রেল শ্রমিকের এক সভায় তিনি বলিয়াছেন: "রেল এবং পোস্ট অফিসের শ্রমিকরা যে আশায় ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখিয়াছেন তাহাতে ছাই পড়িয়াছে। তাহাদের আশা ভবিষ্যতে পূরণ হইবে কিনা তাহাও জানিনা।"

[ষ্টেটস্‌ম্যান-২৫-১-৪৯]

এই ভদ্রলোকরা ৯ই মার্চ্চের আগে কি বলিয়া রেল শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙ্গিয়াছিলেন, শ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া পুলিসের হাতে দিয়াছিলেন, জিপে চাপিয়া পুলিসের সহিত একত্রে ধর্ম্মঘটে বাধা দিয়াছিলেন, শ্রমিক সভায় গুণ্ডামি করিয়াছেন তাহা একবার স্মরণ করুন। জয়প্রকাশজী এখন প্রকাশ্যে স্বীকার করিতেছেন যে, শ্রমিকদের স্বার্থে নয়, 'গবর্নমেণ্টের স্বার্থেই তাঁহারা ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কেহ করিবেন না যে, ইহারা এখন শ্রমিকদের পক্ষ হইয়া সত্যি সত্যি লড়িবেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দালাল ফেডা-রেশনের বাহিরে রেল শ্রমিকদের লাল-ঝাণ্ডা ইউনিয়ন তৈরী করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন, সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন ডাকা হইয়াছে, তাহার জন্যেই শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার আশায় দালালনেতা এখন গরম বক্তৃতা করিতেছেন। ৯ই মার্চ্চের ইতিহাসকে এত সহজে শ্রমিকেরা ভুলিবে কেন?

*   *   *

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ভারতে পদার্পণ করার পর অনেক বক্তৃতা ও বিবৃতিতে তাঁহার কার্য্যক্রমের আভাষ দিতেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে বোম্বাই শহরে তিনি "সমাজতন্ত্রী" সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিতেছেন, সেখানেই ১৩ হাজার ধাঙ্গর আজ আড়াই মাস যাবৎ ধর্ম্মঘট করিয়া আছেন, তাহাদের সমর্থনে একটি কথা কোথাও বলেন নাই। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে তাঁহাকে আমরা কখনো কোন মন্তব্য করিতে দেখি নাই। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা ভাবাভাবা ভাবে কখনো কখনো বলেন বটে, কিন্তু ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কোন মন্তব্য করিতে শুনা যায় নাই; তিনি সাধারণ নির্ব্বাচন চাহেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করা এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা বলেন না। ইহা হইতেই বুঝা যে, তাঁহার "সমাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের কোন প্রয়োজন হয় না।

এই জন্যেই তিনি আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে 'নিরপেক্ষতার' আওয়াজ তুলিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পণ্ডিত নেহরু এবং সমাজ-তন্ত্রী দলের নেতারাও ঐ 'নিরপেক্ষতার' নীতি অনুকরণ করিয়াই এখন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে স্থান লইয়াছেন। তাঁহার "স্বাধীন এসিয়া" ব্লকের দাবী তো আসলে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের দপ্তর হইতে ধার করা দাবী, সেখানে এসিয়ার বিপ্লবী মুক্তি সেনাদের স্থান নাই, স্থান আছে স্নী-সোনায়ক-সোয়েকার্ণোর মত বিশ্বাসঘাতকদের।

শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু দক্ষিণ কলিকাতার যে সরকারবিরোধী জনমত লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা এই মেকী গণতন্ত্র এবং নিরপেক্ষতার ধাপ্পা বাজিতে কখনো বিভ্রান্ত হইবে না।

মঞ্জিলের নিয়মাবলী

(১) প্রতি রবিবার কাগজ বাহির হইবে। দাম তিন আনা।

(২) ১০ কপির কম এজেন্সী নাই। শতকরা ২৫ টাকা কমিশন।

(৩) গ্রাহকদের হার:—বার্ষিক ১০৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷৷০ টাকা।

ম্যানেজার
মঞ্জিল

শান্তি, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও গণতন্ত্রের জন্য বিশ্ব টি-ইউ ফেডারেশনের ঘোষণাপত্র

প্রথম বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন হইতে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সকল এই ফেডারেশনে সম্মিলিত হইয়াছেন। জাতি, দেশ, ধর্ম্মমত বা রাজনীতিক পার্থক্যের কোন বাছবিচার এখানে নাই। শ্রমিকশ্রেণীর এত বড় সম্পদ আর কী আছে! একতাই তো শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি।.....

"অতি জটিল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ভিতর ফেডারেশনের কাজকর্ম্ম চালাইতে হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন আবার এক দুনিয়াজোড়া যুদ্ধ বাধাইবার জন্য লাগিয়া গিয়াছে, এমনই সময়ে ফেডারেশনের কাজকর্ম্ম চালাইতে হইতেছে। ফাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য দেশে দেশে স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ রক্ত ঢালিয়াছেন। তাঁহারা রক্ত ঢালিয়াছেন সুন্দর ভবিষ্যৎ আর প্রগতির জন্য। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, আরেকটি নূতন যুদ্ধের বিপদ হইতে দুনিয়া মুক্ত হইবেই। তাঁহাদের মনে ভরসা ছিল যে, বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা কায়েম হইবে। তাঁহাদের আশা ছিল যে, কাহারও রুজিরোজগারের আর কোন ভাবনা থাকিবে না। গণতন্ত্রসম্মত অধিকারে আর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না; সর্ব্বপ্রকারের স্বাধীনতা আসিবে—এমনই বিশ্বাস তাহাদের মনে সৃষ্টি হইয়াছিল।

পুঁজিবাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে

"কিন্তু, পুঁজিবাদী সরকারগুলি যুদ্ধের সময় যে-সব প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়াছিল নির্লজ্জভাবে তাহা ভঙ্গ করিয়াছে। বিধবার চোখের জল, অনাথ ছেলে-মেয়েদের চোখের জল আজও শুকায় নাই; ফাসিস্টদের দ্বারা বিধ্বস্ত শহর-গ্রামগুলি আজও ধ্বংসস্তূপে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ইহারই ভিতর একটি নূতন যুদ্ধের তোড়জোড় সুরু করিয়া দিয়াছে—তাহারা সারা দুনিয়ার কায়েম করিতে চাহিতেছে।

"পুঁজিপতিদের পক্ষে যুদ্ধ হইল আরও ধনী হইবার উপায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আরও কতকগুলি পুঁজিবাদী দেশে আবারও অস্ত্রশস্ত্র বাড়াইবার দৌড় চলিয়াছে একেবারে পুরা বেগে। সামরিক খাতে খরচ-খরচার এই যে প্রকাণ্ড বোঝা, পুঁজিপতিরা ইহাকে পুরাপুরি চাপাইয়া দিয়াছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। সমস্ত মেহনতী মানুষের উপর। কাঁপা মুদ্রা আরও অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠিতেছে; ট্যাক্সের বোঝাও বাড়িয়া চলিয়াছে; অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির দাম বাড়িয়া চলিয়াছে একেবারে সর্ব্বনাশা বেগে। এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্গে মজুরি কমিয়াই চলিয়াছে; এখনই তো কোটি কোটি মানুষ বেকার, এবং এই সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে দ্রুত।

সাম্রাজ্যবাদী চরদের মতলব

"দেশে দেশে জনগণের উপর আর্থনীতিক, রাজনীতিক দাসত্ব চাপাইয়া দিবার জন্য তৈয়ারি হইয়াছে, 'মার্শাল পরিকল্পনা' আর উত্তর 'অতলান্তিক চুক্তি।' এই 'পরিকল্পনা' ও 'চুক্তি'তেই সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির নগ্ন প্রকাশ দেখা গিয়াছে। নূতন যুদ্ধের উস্কানিদাতারা যে-সব আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা করিয়াছে তাহারই হাতিয়ার হইল সাম্রাজ্যবাদের নীতি।

"সেই সব জঘন্য মতলব হাসিল করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়াব্যাপী মেহনতী মানুষের ঐক্য ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রত্যেকটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ভিতর অনৈক্য সৃষ্টি করিবার জন্য লাগিয়াছে।

"বিশ্ব টি-ইউ ফেডারেশনের ভিতরই এমন কেহ কেহ ছিল যাহারা ফেডারেশনের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল---কিন্তু পারে নাই। এই ফেডারেশনকে তুলিয়া দিয়া শ্রমিকশ্রেণীর দুনিয়াব্যাপী ঐক্য নষ্ট করাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু তাহাতে ব্যর্থ হইয়া তাহারা নিজ নিজ দেশের শ্রমিকদের মতামত না নিয়াই ফেডারেশন হইতে বাহির হইয়া যায়। এখন তাহারা বিশ্ব টি-ইউ ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক মতলব নিয়া এক সংগঠন খাড়া করিবার জন্য লাগিয়াছে। কেন? মেহনতী জনগণের একেবারে জীবনমরণ স্বার্থের বিরুদ্ধে একচেটিয়াপতিরা যখন আক্রমণ চালাইয়াছে সেই আক্রমণের মুখে শ্রমিকশ্রেণীতে ভাঙন ধরাইয়া ছিন্নভিন্ন করাই তাহাদের মতলব। কিন্তু, শান্তি ও শ্রমিকশ্রেণীর দুশমনরা মেহনতী জনগণের শিবিরে ভাঙন ধরাইবার এই যে অপচেষ্টা চালাইয়াছে, ইহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বিশ্ব টি-ইউ ফেডারেশনকে ধ্বংস করিবার সাধ্য নাই কাহারও।

শান্তি ও গণতন্ত্রের শক্তি অপরাজেয়

"শান্তির জন্য গণতন্ত্রী শক্তিগুলির বিরাট শক্তিশালী সমাবেশ হইয়াছে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি অপেক্ষা তাহার শক্তি ঢের বেশি—শান্তি ও গণতন্ত্রের শিবির আজ প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে দমন করিবার মত শক্তি রাখে। শান্তির জন্য লড়াইয়ে সৈনিকদের শক্তির উৎস কী? গণতন্ত্রী শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন; ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশগুলিতে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলন; সমস্ত সৎ মানুষের সমর্থন—এইগুলিই হইল শান্তির জন্য লড়াইয়ের শক্তির ভিত্তি।

"আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা কী হইবে? দুনিয়ার মেহনতী জনগণের সামনে কর্ত্তব্য কী? যুদ্ধবাদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া তোলা। সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনা ধ্বংস করা—ইহাই কর্ত্তব্য।

"কায়িক ও মানসিক শ্রমের যাঁহারা শ্রমিক! আমাদের আবেদন—শান্তি-রক্ষার্থে ব্যাপক কর্ম্মতৎপরতায় আগাইয়া আসুন! জাতি-দেশ-ধর্ম্মমত রাজনীতিক পার্থক্য নির্ব্বিশেষে একতা গড়িয়া তুলুন। যেখানেই সম্ভব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, শিল্প-ব্যবসা অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে 'শান্তি কমিটি' স্থাপন করুন—কায়িক ও মানসিক শ্রমের সমস্ত শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করুন।"

৩১শে জুলাই

লাঠি ও বুলেট উপেক্ষা করিয়া রাজস্থানের শ্রমিক ও কৃষকের অভিযান

রাজস্থানের লাখ লাখ আদিবাসী ও ভূমিহীন কৃষক আজ শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। লাঠি ও বুলেট উপেক্ষা করিয়া অভিযান সুরু করিয়াছে।

গত বছর এপ্রিল মাসে সর্দ্দার প্যাটেল ধ্বংসোন্মুখ সমস্ত রাজত্বগুলিকে একজোট করিয়া ভাবিয়াছিলেন "গণতান্ত্রিক নীতির অভিযানের বিরুদ্ধে" এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিবেন। সামন্ত শোষণেই জনতার জীবন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর চাপান হইল ধনবাদী শোষণ। বিড়লা ও জয়পুরিয়াদের মুনাফার স্বর্গ তৈরী হইল। কিন্তু সর্দ্দারজী ও ধনিক-রাজাদের স্বপ্ন চুরমার করিয়া শ্রমিক ও গরীব কৃষকদের অভিযান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

মারওয়াড়, মেবার, বিকানীর প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চলেই জায়গীরদারদের জুলুম ও লুঠ সুরু হইয়াছে। হাজার হাজার কৃষককে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইতেছে, কৃষকদের পাকা ফসলের উপর জায়গীরদাররা মই চালাইয়া দিতেছে। জুলুমবাজীর অন্ত নাই।

রাজস্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। শহরে বেকারের সংখ্যা ৩০ হাজার উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া আছে লাখ লাখ বাস্তুহারা।

তাহার উপর আছে ১৪৪ ধারা, লাঠি ও গুলি। শত শত কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও বামপন্থীকর্ম্মীদের জেলে রাখা হইয়াছে।

ইহারই বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে।

গত মাসে সরকারী গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদ করায় পিদাভ পরগণা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও একজন সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার প্রতিবাদে গণ মিছিল সুরু হয়। ফলে সরকার নেতাদের জামীনে খালাস দেয়। কিন্তু তাহার পরই সুরু হয় জোর জুলুম করিয়া ট্যাক্স আদায়। ইহার প্রতিবাদে কৃষকরা রুখিয়া দাঁড়ায়। সরকার ১০ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া উদয়পুরে পাঠাইবার আয়োজন করে।

খবর ছড়াইয়া পড়ার সাথে সাথে হাজার হাজার কৃষক বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ছুটিয়া আসে। রাস্তার খাল কাটিয়া, গাছ ফেলিয়া পথ আটকান হয়। দুই দিন ধরিয়া ২০ হাজার কৃষক নেতাদের মুক্তির দাবীতে দাঁড়াইয়া থাকে।

পুলিস লাঠি চালায়, মারপিট করে। ৪ জন কৃষক নিহত হয়, শত শত কৃষক আহত হয়। গোটা পরগণা গোর্খা পুলিসের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু কৃষকদের মনোবল ভাঙ্গে নাই।

শুধু এই একটি ঘটনাই নয়। গত ২৫শে জুন ৩৫টি গ্রামের ৩ হাজার বুভুক্ষু কৃষক যোধপুরের ওশিয়াতে ৩ ঘণ্টা ধরিয়া ট্রেন আটকাইয়া নায়েব তহশীলদারের নিকট হইতে খাদ্য দাবী করে।

যোধপুরের পালির সুতাকল শ্রমিকরা কঠোর সংগ্রাম করিয়া দাবী আদায় করিয়াছে। অভ্র কারখানায় শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে।

গত কয়েক সপ্তাহে ৪ বার গুলি চলিয়াছে। কত লোক মারা গিয়াছে জানা যায় নাই। ৩০।৪০ হইতে ৮০।৯০ পর্য্যন্ত মৃতের সংখ্যা হইবে।

ইহা তুচ্ছ করিয়াই শ্রমিক ও কৃষকের অভিযান চলিয়াছে।

ম্যানেজারের জরুরী বিজ্ঞপ্তি

প্রত্যেক জেলার এজেণ্টদের নাম [শহর ও গ্রাম সকল স্থানের] অবিলম্বে জানান।

মফঃস্বলের এজেণ্টগণ প্রত্যেক ২ সপ্তাহ কাগজ পাইবার পর নিজেরাই হিসাব করিয়া টাকা পাঠাইবেন। অফিস হইতে কোন বিলের জন্য অপেক্ষা করিয়া অযথা দেরী করিবেন না। টাকা পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা জানাইয়া একখানা চিঠিও দিবেন। ৩ সপ্তাহ পর কোন চিঠি বা টাকা না পাইলে আর মাত্র এক সপ্তাহের কাগজ পাঠাইয়া তারপর কোন নোটিস না দিয়াই কাগজ পাঠানো বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

রিপোর্ট, চিঠি, টাকা প্রভৃতি সকল কিছু প্রেরণের একমাত্র নাম ও ঠিকানা:—

হরিনারায়ণ সাহা
২৪ নূর মহম্মদ লেন,
কলিকাতা (৯).

রেলে খাটুনীবৃদ্ধি ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সুপারিশ

ভারতীয় রেল তদন্তকমিটির ভুয়া রিপোর্ট প্রতিরোধ করার জন্য আহ্বান

রেল পরিচালনায় নিট আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং কত কর্ম্মচারী উদ্বৃত্ত ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ করার জন্য ভারত সরকার ভারতীয় রেল তদন্ত কমিটি নামে এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটি সম্প্রতি এক বিপুল রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট মারফত আসলে শ্রমিকদের খাটুনী বৃদ্ধি করা এবং উদ্বৃত্ত রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করানরই পায়তাড়া হইতেছে।

ই-আই-রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে এই রিপোর্টকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা এবং খাটুনীবৃদ্ধি বা ছাঁটাইয়ের চেষ্টাকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানাইয়াছেন।

প্রত্যেকটি সরকারী রিপোর্টের মতই এই রিপোর্টেও আসল সমাধানের কোন নিদর্শন নাই। রেলের অব্যবস্থা এখন যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতেই থাকিবে। কিন্তু যাহা হইবে তাহা হইতেছে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ। রেলশ্রমিকদের কুৎসা রটনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের কার্য্যদক্ষতা ও কর্ম্মক্ষমতা অত্যন্ত কম।

দুই একটি কম দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে তদন্ত কমিটির যুক্তি কিরূপ ভুয়া।

কমিটি বলিয়াছেন লোকো, গ্যারেজ এবং ওয়াগন শপে উদ্বৃত্ত মজুরের সংখ্যা নাকি ৩৩০০০। অথচ আসলে ইহারা মোটেই উদ্বৃত্ত নন; মেসিন ইত্যাদির স্বল্পতা, যন্ত্রের পার্টস কমতি, দেশের ভিতরে গোলযোগ, রেল চলাচল বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণের অস্তিত্ব রিপোর্টেও স্বীকার করা হইয়াছে।

রিপোর্ট 'শিল্প ও ব্যবসা' উপদেষ্টা নামক এক প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কার হইতে বলিয়াছেন যে, মেসিনিস্ট ফিটার কুলী প্রভৃতিরা ৮ ঘণ্টায় যে কাজ করেন তাহা আসলে কিঞ্চিদধিক দুই ঘণ্টা কাজের সমান! এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত আবিষ্কার বৃটিশ ও আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও 'অমানুষিক' আখ্যা দিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ই আই, বি এন রেলের ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরাও এই রিপোর্ট গ্রহণ করিতে সাহস পান নাই। ভারত সরকার কিন্তু ইহাদিগকে মাসে ৩০০০ টাকা বেতন দিয়া আসিয়াছেন ও এই কুৎসা লুফিয়া লইয়াছেন।

ই আই রেলের কর্তৃপক্ষ যে হিসাব দেন তাহাতেও দেখা যায়, অল্প বেতনের রানিং স্টাফ শ্রমিকেরা প্রত্যেকে মাসে ২৪৪ হইতে ৩০০ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। কিন্তু সরকারী কমিটির মতে তাহাদের 'অক্ষমতার' পরিমাণ শতকরা ৩০।৩৯%। রেল কর্তৃপক্ষের হিসাবেই দেখা যায়, এত ঘণ্টা খাটাইয়াও প্রচুর কাজ জমিয়া থাকিতেছে। অনায়াসেই বলা যায় যে, এই কাজের রেট অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলেও শুধু মাত্র শেডগুলিতে শ্রমিক-কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু কমিটির সুপারিশ মত ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হইবে। এইরূপ হিসাব করিয়া কমিটি সুপারিশ করিয়াছে, এক একটি গ্যাংম্যানকে আরো বেশি পরিমাণ লাইন পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। গ্রেনশপ তুলিয়া দিতে হইবে। ইহার ফলেই সমস্ত রেলে ১২০০০ শ্রমিক কর্ম্মচারী উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িবে।

কমিটি ইহাও আবিষ্কার করিয়াছেন, বোম্বাইয়ে সীজন টিকেটের হার নাকি কম। অর্থাৎ শুধু রেলশ্রমিক নয় বোম্বাই শহরতলীর ট্রেনযাত্রী ছাত্র ও শ্রমিকদের পকেট হইতেও টাকা কাটা যাইবে।

ডিপ্রীসিয়েশন ফণ্ড কমিটি প্রতি বছরে ২২ কোটি করিয়া টাকা জমাইবার সুপারিশ করিয়াছে। এত বেশি করিয়া টাকা জমা রাখার নজির কোথাও নাই, এমন কি ওয়েজউড কমিটির মতেও এই ফণ্ডের মোট অর্থ ৫০ কোটির উর্দ্ধে উঠার প্রয়োজন নাই। ফণ্ডে বেশি টাকা জমা করিয়া আলাদা রাখিলে আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত কম করিয়া দেখাইবার সুবিধা হয়। তাহার ফলে প্রতিবার রেল বাজেটে টিকিটের ভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্ন ওঠে। ডাঃ জিয়াউদ্দিন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, মেসিন অদলবদলের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ফণ্ডে তাহার অনেক বেশি টাকা হইতেছে এবং টেক্সদাতা ও শ্রমিক মারা পড়িতেছে। শুধু ডিপ্রিসিয়েশন নয় কমিটি এমর্টিজেশন ফণ্ড নামে আর একটি নূতন ফণ্ড খোলার সুপারিশ করিয়াছেন। রেল বণ্ড হোল্ডারদের যে বিপুল সুদ দেওয়া হয় তদন্তে অবশ্য তাহার কোন উল্লেখ নাই। সুদের পরিমাণ বর্ত্তমানে মূলধনকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। আমাদের মত শোষিত জাতের উচিত এই সুদ বন্ধ করা।

সবদিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই রিপোর্ট শ্রমিক-কর্ম্মচারীকে মারার জন্য এক ভুয়া রিপোর্ট ছাড়া কিছু নয়।

মঞ্জিল

ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে 'আয় হ্রাসের' বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ভারত সরকার অর্ডন্যান্স ডিপোগুলি হইতে যে ১৫০০০ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তোড়জোড় সুরু করিয়াছেন ইছাপুর রাইফেল ও মেটাল কারখানাতে ১০,০০০ শ্রমিকের উপরেও তাহার ধাক্কা আসিয়াছে।

সম্প্রতি এখানে উৎপাদন সঙ্কোচ করিয়া ওভার টাইমের পরিমাণ দৈনিক দেড় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া আধ ঘণ্টা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে এই ওভার টাইমের উৎপাদনের জন্য শ্রমিকেরা বোনাস পাইতেন। এখন আর বোনাস দেওয়া হইবে না। মেটাল কারখানাতেও ওভার টাইম কমাইয়া দুই শিফ্‌ট তিন শিফ্‌ট কাজ চালু হইতেছে!

ইহার ফলে এক একজন শ্রমিকের রোজগার ২৫।৩০ টাকা করিয়া কমিয়া গিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এবং 'জাতীয়' টি-ইউর লোকেরা বলিয়াছিল অন্যত্র ছাঁটাই হইলেও ইছাপুর কারখানায় কাজ কমিবে না। এখন ব্যাপার দেখিয়া শ্রমিকেরা বুঝিতেছেন যে, ডিপো এবং অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের সহিত একত্রে প্রতিরোধ না করিলে এখানেও ছাঁটাই হইবে।

ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

গত ২২শে জুলাই হইতে শ্রমিকেরা একযোগে ওভার টাইম খাটা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন। ওভার টাইম খাটার জন্য সুপারিশ করিতে আসিয়া 'জাতীয়' টি-ইউর জনৈক পাণ্ডা শ্রমিকদের হাতে লাঞ্ছিত হন।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই রাইফেল ও মেটাল কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে ছিলেন। পাওয়ার হাউসের শ্রমিকেরা ডিপার্ট ইনচার্জকে ঘেরাও করেন। বি-এস ডিপার্টে অসুস্থ ৬ জনকে বরখাস্ত করা হইলে সমস্ত শ্রমিক সাহেবকে ঘেরাও করিয়া ৪ জনকে পুনর্বহাল করিতে বাধ্য করেন। সম্প্রতি ওভার টাইম টাকা কাটিয়া লওয়ায় শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

শুধু ওভার টাইম নয়, অন্যান্য নানা-ভাবেও শ্রমিকদের উপর আক্রমণ সুরু হইয়াছে। পেকমিশনের রায় হিসাবে শ্রমিকেরা বেতন পান মাত্র ৩০৲ টাকা। কোনরূপ নিয়মিত বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা নাই। শ্রমিকদের চাপে রেল যাতায়াতের জন্য সস্তায় টিকিটের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা সম্প্রতি প্রত্যাহার করা হইয়াছে। শ্রমিকেরা আন্দোলন করিয়া ১০ টাকা ঘর ভাড়া আদায় করিয়াছিলেন এখন রসিদ দেখানর নিয়ম করিয়া তাহা কাটিয়া লওয়ার চেষ্টা হইতেছে। দারোয়ানদের ১২ ঘণ্টা হইতে ১৬ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। হাসপাতাল কম্পাউণ্ডারদের ড্রেসারের পদে অবনত করার হুকুম হইয়াছে। তাহার উপর ছাঁটাইয়ের হুমকি আসিতেছে।

এই সমস্ত জুলুম প্রতিরোধের জন্য শ্রমিকেরা ছাঁটাই বন্ধ ও ৮০৲ টাকা মূল বেতনের দাবি তুলিয়াছেন এবং বিভিন্ন ডিপার্টে ডিপার্টে কমিটি ও সংগ্রাম কমিটি গঠন করিতে সুরু করিয়াছেন।

'জাতীয়' টি-ইউর শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসু এখন শ্রমিকদের সামনে যাইতেছে না, ইতিপূর্ব্বে তিনি এবং হরিহরনাথ শাস্ত্রী শ্রমিকদের নানা কথা বলিয়া শান্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতিই ভাঁওতা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রমিকরা নিজেরাই বুঝিতেছেন যে, ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা ছাড়া কোন পথ নাই। এই সরকার শ্রমিকদের কোন ভালো করিবে না।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে রেলশ্রমিক সম্মেলন আহ্বান

ই-আই রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এ-আই-টি-ইউ-সির নেতৃত্বে এক রেল শ্রমিক সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, নিঃ ভাঃ রেল শ্রমিক ফেডারেশন মারফৎ আর কোন সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। ইহারা প্রতিপদে রেল শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বর্ত্তমানে রেল মন্ত্রীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

এ-আই-টি-ইউ-সির গত অধিবেশনে ভারতের সমস্ত অংশ হইতে আগত রেল শ্রমিক প্রতিনিধিরা এই আলোচনা করেন যে, রেল শ্রমিকদের উপর আক্রমণ রুখিবার জন্য অবিলম্বে একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রামী সংগঠন গঠন করিতে হইবে।

ইতিমধ্যেই প্রথমশ্রেণীর রেলের ৮টি বড়ো বড়ো ইউনিয়ন, কোম্পানী পরিচালিত রেলের ৬টি ইউনিয়ন, দেশীয় রাষ্ট্রভুক্ত রেলের ৩টি ইউনিয়ন এবং কতকগুলি সংগ্রাম কাউন্সিল ও সেকশন কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। এই সমস্ত ইউনিয়নের শ্রমিক সংখ্যা দুই লক্ষেরও বেশি হইবে। সম্মেলনে দাবি করা হইবে—অবিলম্বে ৮০৲ টাকা নিম্নতম বেতন ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির দরুণ পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য আইন চাই।

রেল তদন্ত কমিটি যে সুপারিশ দাখিল করিয়াছেন তাহাতে শ্রমিকদের খাটুনী বৃদ্ধি করিয়া ছাঁটাইয়ের পথ প্রশস্ত করা হইতেছে। উহাকে সরাসরি বাতিল করিতে হইবে।

এ্যাডজুডিকেটরের রায়, রানিং স্টাফের "বেতন পরিবর্ত্তন" ওয়াটার হাউস ক্লাসিফিকেশন ট্রাইব্যুনাল প্রভৃতি ভুয়া রায়গুলিকে সরাসরি বাতিল করিতে হইবে।

জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ম ১৯৪৯ চালু করার জন্য রেল সার্ভিস কালাকানুন প্রত্যাহার চাই, পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সমস্ত ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে হইবে।

স্ট্যাণ্ডিং কমিটি সমস্ত রেল শ্রমিকদের ডিপার্টমেণ্টাল কমিটি গড়িয়া তুলিয়া বেইমান সুবিধাবাদী ও উচ্চ পদাভিলাষের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকদের নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানাইতেছেন। বিশ্বাস-ঘাতক এ-আই-আর-এফএর প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে কেহ যেন মোহ না রাখেন এবং এই উদ্দেশ্যে এ-আই-টি-ইউ-সির নেতৃত্বে আগামী সম্মেলন সফল করার জন্য যেন সকলে প্রচার সুরু করেন।

ক্ষেত-মজুর সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন

প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বান

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক কমরেড অমিয় সিং নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

"গ্রাম অঞ্চলে ক্ষেতমজুররা যত কম মজুরী পায় এবং যে ধরণের মধ্যযুগীয় অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে বাধ্য হয় পৃথিবীর আর কোথাও তাহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। প্রত্যহ খাদ্যের দর বাড়িতেছে; ইতিমধ্যেই কোন কোন জেলায় উহা ৩০৲ মণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অথচ ক্ষেতমজুরদের মজুরী গড়ে বারআনার বেশী নয়। মহিলা ক্ষেতমজুরদের ১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। অন্যান্য ক্ষেতমজুরদের মাসে ১৫ দিন কাজের অভাবে বেকার থাকিতে হয়। অভাবের তাড়নায় মেয়ে এবং ছোট ছেলেদের নামমাত্র মজুরী বা শুধু খোরাকীতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে হয়। গরীব কৃষকরাও শোষণের চাপে দিন দিন ক্ষেতমজুরে পরিণত হইতেছে। গ্রাম অঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে।

ধনিক-জমিদার সরকারের এই শোষণের বিরুদ্ধে গত একবছর ক্ষেতমজুররা অসংখ্য সংগ্রামে অতুলনীয় বীরত্ব দেখাইয়াছেন। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, মালদহ প্রভৃতি জেলার ক্ষেতমজুররা মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করিয়াছেন; অনেক ক্ষেত্রে জোতদার-জমিদারদের মজুরী বাড়াইতে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহারা লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের সংগ্রামী পথই বাছিয়া লইয়াছেন।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গত বোম্বাই অধিবেশন ক্ষেতমজুরদের এই সংগ্রামী শক্তিকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তাঁহারা ক্ষেতমজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লালঝাণ্ডার তলে সংঘবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলকারখানার জঙ্গী শ্রমিকদের সহিত ক্ষেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ করার সম্ভাবনা ঘোষণা করিয়াছেন।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঐ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্যই আমরা পশ্চিম বাংলায় ক্ষেতমজুর সম্মেলন আহ্বান করিয়াছি। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় ক্ষেতমজুরদের ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। জেলা সম্মেলন ডাকার জন্যে প্রস্তুতি চলিয়াছে।

আগামী ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে আগস্ট [পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১লা আগস্ট নয়] কলিকাতায় ক্ষেতমজুরদের প্রাদেশিক সম্মেলনে আহ্বান করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে জেলা ক্ষেতমজুর সমিতি হইতে প্রতি একশত সভ্যের জন্যে একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে বন্ধুত্বমূলক প্রতিনিধি পাঠানো হইবে। এই সম্মেলন হইতে ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম দাবী এবং সংগ্রামী কার্য্যক্রম গৃহীত হইবে।

ক্ষেতমজুররা শুধু গ্রাম অঞ্চলেই নয় সমগ্র পশ্চিম বাংলার মুক্তি-সংগ্রামে আজ পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কৃষক সমিতিগুলির দায়িত্ব হইল সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা। কলিকাতা ও শিল্প-অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর কাজ হইল সম্মেলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, সম্মেলনে বন্ধুত্বমূলক প্রতিনিধিদল পাঠাইয়া অভিনন্দন জানানো। ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ হইল সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অগ্রসর হওয়া।

এইভাবেই এই ঐতিহাসিক সম্মেলনকে ধনিক-জমিদার সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তম গণ-সমাবেশে পরিণত করিতে হইবে।"

ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম দাবীর খসড়া

(১) দৈনিক তিন টাকা মজুরি, দুইবেলা খোরাকী এবং সস্তা রেশন ও সস্তা জিনিসপত্র বাবদ দৈনিক একটাকা ভাতা—মোট ৪৲ টাকা চাই!

(২) দৈনিক ৭ ঘণ্টার বেশী কাজ নাই!

(৩) মাহিন্দারদের জন্যে মাসিক ৮০৲ বেতন, তিনবেলা খোরাকী ও ৩০৲ টাকা ভাতা চাই।

(৪) মেয়ে-পুরুষের সমান কাজের জন্যে সমান মজুরি চাই!

(৫) ক্ষেতমজুরের জন্যে কোন ট্যাক্স নাই!

(৬) চাকুরীর স্থায়িত্ব চাই, নতুবা নিম্নতম মজুরি ও ভাতা চাই!

(৭) বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই!

(৮) বছরে এক মাস বেতনসহ ছুটি চাই; অসুস্থতার সময়ে মজুরী ও চিকিৎসার খরচ চাই!

(৯) নাবালকদের খাটানো চলিবে না!

(১০) অস্পৃশ্যতা বে-আইনী করা চাই!

(১১) ক্ষেতমজুর সমিতি মানিয়া লও!

(১২) কালাকানুন ধ্বংস হোক; গ্রাম অঞ্চল হইতে সমস্ত পুলিস, মিলিটারী, সেবাদল ও আনসার গুণ্ডাদল খেদাও, ১৪৪ ধারা বাতিল কর!

(১৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী, শ্রমিক, কৃষক বন্দীদের মুক্ত কর!

(১৪) কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কর!

(১৫) শ্রমিক-কৃষকদের সমস্ত মামলা, ওয়ারেণ্ট বাতিল চাই!

(১৬) সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত চাই; হত্যাকারী ও অত্যাচারীদের শাস্তি চাই। আহত, নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুরা ক্ষতিপূরণ চাই!

(১৭) নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার অবসান চাই!

বৃহত্তর সংগ্রামের পথে আংশিক দাবি আদায়

কলিকাতা ডাক-তার কর্ম্মচারীদের ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলন

ডাক ও তারের কর্ম্মচারীরা সম্প্রতি ছাঁটাই, চাকুরীর স্থায়িত্ব, বদলী, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য স্থানীয় ও আংশিক দাবী আদায় করিয়াছেন।

গত দেড় মাস ধরিয়া ডাক ও তার কর্ম্মচারীরা যে একটানা জোরদার আন্দোলন করিয়াছেন—সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, ঘেরাও এবং অন্যান্য জঙ্গী কায়দায় বিভিন্ন অফিসে অফিসে যে লড়াই চালাইয়াছেন, তাহারই ফলে ডাক-তারের কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া এই আংশিক দাবীগুলি পূর্ণ করিয়াছেন। গত ২৫শে জুলাই তারিখে ইউ, পি,টি, ডব্লিউ-এর এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পোস্টমাস্টার জেনারেল নিম্নলিখিত দাবীগুলি মানিয়া নিয়াছেন।

(১) ১৯৪৭ সালের পরে যাহারা চাকুরী পাইয়াছেন, তাহাদের নতুন করিয়া আর একটি পরীক্ষা লইবার যে ব্যবস্থা করা হইতেছিল, তাহা বর্ত্তমানে স্থগিত থাকিবে। পরীক্ষার নাম করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ একদল কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, ইহাতে অন্ততঃ সাময়িকভাবে তাহা বানচাল হইয়া গেল।

(২) অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের একটা অংশকে অবিলম্বে স্থায়ী বলিয়া গণ্য করার ব্যবস্থা হইবে।

(৩) বাড়ী ভাড়ার রসিদ দাখিল করিবার জন্য যে নির্দ্দেশ জারি করা হইয়াছিল, তাহা ২ মাসের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

(৪) লাইনস্টাফের ২৯ জন কর্ম্মচারীকে ইহাদের মধ্যে কয়েকজন আছেন ইউ, পি, টি, ডব্লিউ-এর কর্ম্মী—বাংলার বাহিরে বদলী করার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা রদ করা হইবে।

ইহা ছাড়াও আর, এম, এস-এর কর্ম্মচারীদের পাক্ষিক ছুটি ও বিশ্রাম, সর্টিং ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীদের জন্য চেয়ার, ফ্যান এবং টিফিনরুমের ব্যবস্থা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্ম্মীদের টিফিনরুম, সেনট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের কর্ম্মচারীদের রাত্রে শোবার জন্য খাটের ব্যবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি দাবীও পি, এম, জি মানিয়া নিয়াছেন।

ডাক ও তার বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আর কহ নন-খোদ ভারত সরকার। তাহারা হঠাৎ এতটা নরম হইলেন কেন? এ প্রশ্নের জবাব মিলিবে গত দুইমাস যাবৎ ডাক ও তার কর্ম্মচারী বিভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার মধ্যে—সমস্ত ডাক-তার কর্ম্মচারীদের মেজাজ, আন্দোলন ও লড়াইএ যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহার মধ্যে।

* গত দেড় মাসের মধ্যে এই দাবী ও অন্যান্য কতকগুলি দাবী লইয়া ডাক ও তারের কর্ম্মচারীরা প্রত্যেকটি অফিসে সভা করিয়াছেন, মিছিল করিয়াছেন।

* তিন তিনবার দুই হইতে তিনশত কর্ম্মচারী মিলিয়া পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে ঘেরাও করিয়াছেন।

* প্রথমদিন ১০ই জুন পি-এম-জি কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখা তো করেনইনা, বরঞ্চ পুলিসে খবর দিয়া কর্ম্মচারীদের ভয় দেখাইবার চেষ্টা করেন।

* ঠিক ৪ দিন বাদে ১৪ই জুন ডাক-তার বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেলকে কুমার সিং হলে খানাপিনা দিবার এক ব্যবস্থা করেন পি, এম, জি এবং কয়েকজন দালাল অফিসার। দুইশত কর্ম্মচারী সেখানে গিয়া হাজির, ডাইরেক্টর জেনারেল ভয়ে খানা লইতে আসিলেনই না।

* ৮ই জুলাই আর, এম, এস অফিসে যে ঘটনা ঘটিল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ম্মচারীদের জঙ্গী মেজাজের পরিচয় আরও খানিকটা পাইলেন।

* আর, এম-এস এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পি, সি দাসগুপ্ত একজন কেরাণীকে বিনা কারনে সাস্পেণ্ড করেন। কয়েকজন কর্ম্মচারী কারণ জানিতে গেলে এই উদ্ধত অফিসারটী তাহাদের গালিগালাজ করিতে থাকে। অফিসের সমস্ত কর্ম্মচারী ইহাতে ক্ষেপিয়া উঠিয়া যে "জবাব" দিলেন তাহার ফলে ভদ্রলোক ৭ দিন অফিসে আসিতে পারিলেন না। সমস্ত আর, এম,

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

৩১ জুলাই

টেক্সম্যাকো—বেলঘড়িয়া

মহাশয়—

আমি বেলঘড়িয়া টেক্সম্যাকো কারখানার একজন শ্রমিক। খবরের কাগজে দেখিতেছি বাংলা দেশের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইতেছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গণতান্ত্রিক ভাবে দেশ শাসন করিতে চান তাহাই প্রচার করার ব্যবস্থা হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু যেদিন কলিকাতায় বক্তৃতা দিতেছিলেন সেদিন আমরা একদল শ্রমিক কলিকাতায় গিয়াছিলাম। শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া মিছিল করা মাত্র পুলিস আমাদের উপর লাঠি চালাইয়াছিল, কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। সেখান হইতে ভাড়িয়া সার্কুলার রোডে আবার মিছিল করিতে গেলে পুলিস আবার লাঠি চার্জ করে। পণ্ডিতজীর গণতন্ত্র কিরূপ সেই দিনই আমরা তাহা পরখ করিয়াছি।

আমাদের কারখানাটি বিড়লাজীর। তিনি পণ্ডিতজীর অনুগত বা পণ্ডিতজী তাঁহার অনুগত সেখানে আমাদের উপর প্রত্যহই জুলুম বাড়িতেছে। আমরা ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক—সর্ব্বত্রই দেখিতেছি কাজের রেট কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। আগে যে কাজ করিলে আমরা ২ টাকা পাইতাম এখন তাহাতে কোম্পানী ১৲ টাকাও দিতেছেন না। খাটিতে খাটিতে আমরা মরিয়া যাইতেছি। মেসিনের ফুল স্পীড দিয়া আমাদের টাইমিং দেখা হয়। কোম্পানী বলিতেছিল আমাদের ২০০ কাজ তোলা উচিত। অথচ ফোরম্যান ফুল স্পীড দিয়াও ১২৫ এর বেশী কাজ তুলিতে পারেন নাই। এইভাবে ভীষণ খাটাইয়া এবং তদুপরি ফুরণের কাজের রেট কমাইয়া দেওয়ায় মেসিন শপের শ্রমিকেরা আগে যেখানে রোজগার করিত ১০০।১২৫ টাকা এখন সেখানে ৭০।৭৫ টাকাও রোজগার করিতে পারিতেছেন না।

ইহার প্রতিবাদে আমরা বি-বে সেকশনে ১০ই জুলাই রাত্রের শিফটে এবং ১১ই জুলাই দিন দুইটা পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। ১৪ই জুলাই পণ্ডিতজী কলিকাতায় আসিলেন। মজুরদের ঠকাইয়া খাটাইয়া ভাতে মারিয়া বিড়লাজী লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিতেছেন। অথচ পণ্ডিতজীর পুলিসের লাঠি তাঁহার মাথায় না পড়িয়া পড়িল আমরা শ্রমিকদের উপর।

পণ্ডিতজীর রাজ্য চালনা সম্পর্কে সেইদিনই আমাদের খুব শিক্ষা হইয়াছে। হঠাৎ আবার সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা চলিতেছে। আমাদের কারখানার মালিকও এমনি নরম গরম দুই ভাবেই আমাদের ভাত মারিয়া আসিয়াছেন। আমাদের মত বুভুক্ষু শ্রমিকের মিছিলই সহিতে পারিতেছেন না, নির্ব্বাচনে আমাদের রায় শোনার সাহস কি পণ্ডিতজীর আছে? যদি থাকে, তবে ঘোষণা করুন যে শতকরা ১৩ জনের ভোট নয় গণভোট গ্রহণ করিতে হইবে এবং অবিলম্বে। ছয়মাস সময় কেন লইতেছেন? এইভাবেই জুলুম চালাইয়া ছয়মাসের মধ্যে গরীবদের আধমরা করিয়া ফেলিতে পারিবেন বলিয়া?

পণ্ডিতজীর গণতন্ত্রের আর একটি নমুনা আমার কারখানাতেই দেখিতেছি। কারখানার কর্তৃপক্ষ মহল এখানে এক আর, এস, এস বাহিনী গঠন করিয়াছেন। শ্রমিকদের পিটাইয়া ঠাণ্ডা করা ছাড়া তাহাদের আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাই। এই আর, এস, এস-দের পণ্ডিতজী বৈধ করিয়াছেন। কিন্তু কমিউনিস্টদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠিতেছে না। জেলখানা হইতে কমিউনিস্টদের ছাড়া হইতেছে না। প্রতি কারখানা হইতে ভালো ভালো লোকেদের পণ্ডিতজী জেলখানায় পাঠাইয়াছেন নয়ত তাঁহারা আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পণ্ডিতজী যদি ন্যায্য নির্ব্বাচন দেখিতে চান, যদি আমাদের মত শ্রমিকদের রায় কি জানিতে চান তবে আগে বৈধ করুন কমিউনিস্ট পার্টিকে, জেল হইতে বন্দীদের ছাড়িয়া দিন।

তাহা না করিয়া নির্ব্বাচনের ধোঁকা দিলে গরীব জনতা ভুলিবে না। তাহাদের রায় কি তাহা অন্য উপায়েই জানাইয়া দিবে। ইতি—

—বি, বে সেকসনের জনৈক শ্রমিক

রাইফেল মেটাল ষ্টীল ফ্যাক্টরী ইছাপুর

মহাশয়

এখানে আমাদের মজুরদের উপর সরকারের জুলুম খুব বাড়িয়াছে। আমাদের ঘর ভাড়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে। ওভার টাইম টাকা বন্ধ করা হইয়াছে। রেলগাড়ীর জন্য ভড়া পাশ করিয়াও ক্যানসেল করা হইয়াছে। মজুরের থাকার ঘর মিলিতেছে না। যাহা আছে তাহাও নিতান্ত খারাপ।

ঘর ভাড়া কাটা আর ওভার টাইম বন্ধ হওয়ার দরুণ আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। পরিবার প্রতিপালন অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। ঘর ভাড়া কাটা, ওভার টাইম বন্ধ হওয়ায় হর মজুরের ২৫ হইতে ৩০ টাকা আয় কমতি পড়িতেছে। ইহার উপর ছাঁটাই হওয়ার সম্ভাবনা নজরে পড়িতেছে। সরকারের এইরূপ জুলুমে আমাদের পরিস্থিতি দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর রাত-পহরী বোনাস কাটিয়া লওয়া হইতেছে, এবং দিনে মাত্র আধ ঘণ্টা ওভার টাইম খাটাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই জন্য বোনাস-কাটা এই ওভর টাইম খাটিতে আমরা মজুরেরা রাজী নহি। দালালরা উল্টা কথা বলায় দুই দালালকে শিক্ষা দিয়া আমরা মজুরেরা ওভার টাইম না খাটিয়া ফ্যাক্টরী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি। আর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া সভা করিয়াছেন বড়ো বড়ো লেকচার ঝাড়িয়াছেন কিন্তু আমাদের মজুরের জন্য কি করিলেন? তিনি আমাদের জন্য তলব-কাট এবং ছাঁটাই উপহার দিয়া গেলেন। তিনি বৃটিশ আমেরিকা; এবং টাটা বিড়লার দোস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং মজদুর জনতাকে ধোঁকা দিবার জন্য বলিলেন যে নির্ব্বাচন হইবে। যে নির্ব্বাচনে জনতার পুরা অধিকার নাই তাহাতে আমাদের কি উপকার হইবে? জনতার সাচ্চা নেতাদের জেলে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে এবং বাহিরের জুলুম বাড়িতেছে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করিয়া রাখা হইয়াছে। জনতার সাচ্চা নেতাদের বন্ধ করিয়া এ চুনাও-এর কোন মানে হয় না। কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে। নেহরু সরকার যদি সাচ্চা নির্ব্বাচন চাহেন তবে সার্বজনীন জনতার ভোট দিবার পুরা অধিকার দিতে হইবে। কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে আইন উঠাইয়া লইতে হইবে। ইহা না করিলে খাঁটি নির্ব্বাচন করার কোন মানে হইবে না। ইতি—

ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীর
জনৈক হিন্দুস্থানী শ্রমিক।

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা

সম্পাদক মহাশয়,

আমি একজন পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা। শহরতলীর যে ক্যাম্পে বাস করি তাহার দেওয়ালে দেওয়ালে 'সাবধান'বাণী খোদাই করা আছে—'এই ক্যাম্প বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কেহ বাস করিলে নিজের নিজের দায়িত্বে থাকিবেন।' তবু সেখানেই স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকি এবং অন্যের কথা ভাবিয়া ভাগ্যদেবী আমার কপালে সুপ্রসন্ন জানিয়া অবাক হই।

ব্যাঙ্কে একটি নোকরীও পাইয়াছি। বাস্তুহারা বলিয়া দয়ার চাকুরী, তাই বেতন কম। ৪০৲ টাকা বেতনের ৯৲ টাকা ট্রেণ ভাড়া [শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার পায়ে হাটিয়াই চলি বলিয়া ট্রাম ভাড়া লাগে না] দিবার পর বাকী টাকায় ৮ জন পোষ্যের সংসার চালাই।

দিনটা তবু একরকম ভালই কাটে; সংসারের কথা ভাবিয়া কুলকিনারা নাই বলিয়া চিন্তাটা স্থগিত রাখি। চাকুরীর মস্তলাভ সেইটাই। কিন্তু রাত্রে? শ্রাবনের অবিশ্রাম বর্ষার ধারা চাল ফুটা করিয়া, দেওয়ালের গা বাহিয়া শেষ পর্য্যন্ত যখন বিছানাটা পর্য্যন্ত ভাসাইয়া নেয়, তখন বড় যারা বুঝিয়া সুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিলেও শিশুগুলির চীৎকার আর থামে না।

দেশে থাকিতে বড় ছেলেটি ক্লাস সিক্স-এ পড়িত। এখন লোকাল ট্রেণে ট্রেণে ফেরী করে। ১১ বছরের ছেলে স্বাবলম্বী হইয়াছে; সংসারের অবলম্বন হইয়াছে। আমার চেয়ে সুখী কে?

আমি কি চিঠি লিখিব? আশ্রয় চাই, ভাত চাই, ছেলেমেয়েগুলিকে পড়াইতে চাই—এই সব লিখিব? কি লাভ? আমারই ঘরের চারিধারে অন্যান্য বাস্তুহারা পরিবার রহিয়াছেন। এঘরেওঘরে প্রায়ই কান্নার রোল পড়ে। গত কয়েকটি মাসে ৪ জন যক্ষ্মায় মারা গেলেন। তবু যদি কিছুসাহস করিয়া চাওয়া যায়, তবে বোধ হয় মৃত্যু কামনাই সবচেয়ে সোজা চাওয়া।

হ্যাঁ, তবু চিঠিখানি শেষ করিব। আমি মরিলেও মানুষ বাঁচিবেই। বাস্তুহারাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হইবে নিজকানে শুনিবার জন্য ১৪ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা শুনিতে যাইয়া কাঁদুনে-বোমার স্বাদ পাইয়া আসিয়াছি। তারপর শুনিতেছি সাধারণ নির্ব্বাচনই নাকি রোগমুক্তির পথ। শুধু বাস্তুহারা রোগ নয়, পশ্চিমবঙ্গের সকল রোগ নিরাময়ের একই পথ বলিয়া কংগ্রেস নেতারা স্থির করিয়াছেন।

কংগ্রেস নেতাদের দুইটি পথই প্রত্যক্ষ করিলাম—কাঁদুনে-বোমা ও ভোট।

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিল

—চিঠি-পত্র—

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

পাঠক, গ্রাহক ও দরদীদের নিকট হইতে আমরা অনবরত চিঠি চাই। দেশের সমস্যা, আপনার কারখানার খবর, গ্রামের সংবাদ সব কিছুই জানাইবেন। চিঠি সংক্ষিপ্ত করার দায়িত্ব আমাদিগকে দিতে হইবে। সম্পাদক, মঞ্জিল

'কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ কর'

ডাক-তার কর্ম্মচারীদের আন্দোলন

(আগের পৃষ্ঠার পর)

এসএ, সেদিন তিন ঘণ্টার জন্য কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পর দিনই অবশ্য ঐ কর্ম্মচারীটির সসপেণ্ড আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

* ১৯শে জুলাই আবার দুই হইতে আড়াইশত কর্ম্মচারী পি, এম, জির অফিস ঘেরাও করিলেন। এবারে তিনি অফিসের জানালা দিয়া পলাইয়া বাঁচিলেন।

* ২২শে জুলাই টেলিফোনের সমস্ত কর্ম্মচারী মিলিয়া জেনারেল ম্যানেজার সাহেবকে ঘেরাও করিলেন। এয়ারচেঞ্জের মধ্যে সভা করিবার, ইস্তাহার মারিবার অধিকার, পে-কমিশনের বাকী টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি কতকগুলি দাবী তখনি আদায় হইল। ইহার আগে ১০ই জুন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কেরাণীরা ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ারকে ঘেরাও করিয়া শনিবারেও ৫টা পর্য্যন্ত কাজ করিবার যে আদেশ জারী হইয়াছিল, তাহা রদ করাইতে বাধ্য করেন।

ডাক-তার কর্ম্মচারীদের মেজাজের এই দ্রুত পরিবর্ত্তন সরকার বাহাদুর লক্ষ্য করিয়াছেন, তাই তাহাদের কয়েকটা কয়েকটা দাবী মিটাইয়া দিয়াছেন অথবা মিটাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু ডাক-তার কর্ম্মচারীদের মূল যে সমস্ত দাবী আছে সে সম্বন্ধে তাহারা কিছুই বলেন নাই।

কর্ম্মচারীরাও তাহা জানেন। মার্চ্চ মাসের ধর্ম্মঘট ডাকা হইয়াছিল যে সমস্ত দাবীতে: যথা বাজার দর অনুযায়ী মাগ্‌গী ভাতা বাড়ানো, পে-কমিশনের রায়ের গলদ দূর করা, সমস্ত অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের স্থায়ী হিসাবে গণ্য করা এবং ধর্ম্মঘটের সময় যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের মুক্তি এবং কাজে পুনর্নিয়োগ—এই দাবীগুলির একটিও আদায় হয় নাই। তাই নতুন করিয়া এই বৃহত্তর লড়াই-এর জন্য তাঁহারা কোমর বাধিয়া প্রস্তুত হইতেছেন।

জনগণের গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক গঠনের জন্য চীনের জনগণের সংগ্রাম

সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরিয়া ফ্যাসিস্ট ঝাণ্ডা উড়াইয়া শ্রমিক কৃষকের রক্তে চীনের মাটি যে লাল করিয়া তুলিয়াছিল সেই চিয়াং-কাই-শেক আজ বিচারের ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতেছে—তাহার সেই ফ্যাসিস্ট ঝাণ্ডা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত।

চীনের নিপীড়িত জনগণের মুক্তির নিশান আজ চীনের দিকে দিকে উড়িতেছে। চীনের মাটিতে আজ এক নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্মলাভ করিতেছে। এই রাষ্ট্র গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি আজ এক বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রন্টে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

এই নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তুতি চলিয়াছে চীনের অতি পুরাতন রাজধানী পিপিং নগরীতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চীনের কমিউনিস্টরা চীনে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবী জানায়। চিয়াংএর নেতৃত্বে কুয়োমিনটাঙ সরকার মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের সাহায্যে সেই দাবীকে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহে। কিন্তু ১৯৪৬এর জানুয়ারী মাসে কুয়োমিনটাঙ সরকার কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটি সাময়িক চুক্তি করিতে বাধ্য হয়। এই চুক্তির প্রধান কথা ছিল দুইটি—(১) কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুয়োমিনটাঙ সরকারের সশস্ত্র অভিযান বন্ধ করা হইবে; (২) চীনে গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার স্থাপনের জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও গ্রুপের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলন ডাকিতে হইবে—এই সম্মেলন সমগ্র চীনে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিবে।

কিন্তু মার্কিন অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হইয়া চিয়াংএর নেতৃত্বে কুয়োমিনটাঙ সরকার এই চুক্তিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলে এবং ১৯৪৬এর জুলাই মাসে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান সুরু করিয়া দেয়। অন্যদিকে দেশবাসীকে ধোঁকা দিবার জন্য কুয়োমিনটাঙ দস্যুরা নিজেদের মনোমতন প্রতিনিধি লইয়া একটি রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের ব্যবস্থা করে—রাষ্ট্রব্যবস্থায় চীনের ধনিকগোষ্ঠীর অবাধ কর্তৃত্ব ঘোষণা করিয়া-ই সেই সম্মেলনের অবসান ঘটে।

কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য কুয়োমিনটাঙ প্রতিক্রিয়াশীলরা যে গৃহযুদ্ধ সুরু করিয়াছিল সেই যুদ্ধ আজ তাহাদেরই ধ্বংস করিতেছে। ইতিহাসের ইহাই নিয়ম। প্রগতি, শান্তি ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় ঘটিবে-ই।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের মুক্তিসেনারা শুধু যে কুয়োমিনটাঙ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া বিজয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা নয়; তাহাদের বিজয় অভিযানের সাথে সাথে তাহারা বারে বারে চীনে গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক স্থাপনের কথা ঘোষণা করিয়াছে।

কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা

১৯৪৮-এর মে-দিবসে কমিউনিস্ট পার্টি চীনের জনসাধারণ এবং চীনের সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি ও গ্রুপগুলির নিকট এক আবেদন প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করে যে, নতুন করিয়া রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলন ডাকিতে হইবে; এই সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীলদের কোন প্রতিনিধিদেরই স্থান হইবে না; এই সম্মেলন চীনে জনগণের গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকের স্থাপনা-ই ঘোষণা করিবে এবং সমগ্র চীনে গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠন করিবে।

কমিউনিস্ট পার্টির এই আবেদন চীনের জনগণ এবং চীনের সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি ও গ্রুপগুলির মধ্যে অপূর্ব্ব সাড়া জাগায়—তাহারা সকলেই আবেদনকে সমর্থন করিতে থাকে।

আজ সমগ্র উত্তর এবং মধ্য চীনে ফ্যাসিস্ট কুয়োমিনটাঙ শাসন হইতে মুক্ত। চিয়াং সরকারের সখের রাজধানী নানকিং, দেশী-বিদেশী বণিকদের শোষণের প্রধান কেন্দ্র সাংহাই এবং আরো বড় বড় শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র আজ মুক্তিসেনার দখলে। দক্ষিণ চীনে এবং উত্তর-পশ্চিম চীনে সাফল্যের সঙ্গে মুক্তি-সেনারা আজ আগাইয়া চলিয়াছে বিজয়ের পথে।—

জনগণের চেতনা

এই মুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়া চীনের শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ আজ এ কথা খুব ভালো ভাবে বুঝিয়াছে যে, জাতীয় স্বাধীনতা, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি, জমিদার ও পুঁজিপতিদের শোষণের খর্পর হইতে মুক্তি, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের অবসানের মধ্যেই তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত রহিয়াছে এবং চীনে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করিয়া এবং জনগণের গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক স্থাপন করিয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করা যাইতে পারে এবং এই পথে-ই তাহারা স্বাধীন সুখী জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তাই কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে চীনের জনগণ, চীনের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি আজ বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছে। চীনে নতুন এক রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের অধিবেশনের জন্য তাহারা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি সুরু করিয়া দিয়াছে।

প্রস্তুতি কমিটি

এই নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের অধিবেশনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ১৫ই জুন হইতে সুরু করিয়া পাঁচদিন ধরিয়া পিপিংএ এই কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই প্রস্তুতি কমিটিতে রহিয়াছেন কমিউনিস্ট নেতা তুঙ, চু-তে, চৌ-এন-লাই প্রভৃতি, লি-সি-সেনের নেতৃত্বে কুয়োমিনটাঙের বিপ্লবী কমিটির প্রতিনিধিরা। (ইহাদের সঙ্গে চিয়াংএর কুয়োমিনটা প্রতিক্রিয়াশীলদের কোন সম্পর্ক নাই) চীনের খ্যাতনামা সাহিত্যিক কুয়ো-মো-জো, চীনের ডেমোক্রেটিক লীগের প্রতিনিধিরা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি ও গ্রুপের প্রতিনিধিরা। একশত চৌত্রিশ জন সভ্য লইয়া এই প্রস্তুতি কমিটি গঠিত। এই কমিটি যে স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করিয়াছে তাহার সভাপতি হইলেন মাও-সেতুঙ।

কি ভিত্তিতে, কাহাদের প্রতিনিধি লইয়া এই নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলন ডাকা হইবে সে সম্পর্কে এই প্রস্তুতি কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। চীনের গৃহযুদ্ধ এখনো শেষ হয় নাই—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য চিয়াং ও কুয়োমিনটাঙ প্রতিক্রিয়াশীলরা এখনো চীনের এক অংশে শাসন ক্ষমতা দখলে রাখিয়াছে। তাহাদের নির্মূল না করা পর্য্যন্ত গৃহযুদ্ধের শেষ নাই। তাই এই অবস্থায় সাধারণ নির্ব্বাচন ডাকিয়া রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা সম্ভব নয়। তাই ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে যাহাতে এই নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলন গঠিত হয় তাহার দিকে প্রস্তুতি কমিটি বিশেষ জোর দিয়াছেন।

প্রস্তুতি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনসাধারণের ৪৫টি প্রতিষ্ঠান হইতে নির্ব্বাচিত ৫১০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। এই ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রহিয়াছে—(১) কমিউনিস্ট পার্টিসহ ১৪টি গণতান্ত্রিক পার্টি এবং গ্রুপ—ইহারা পাঠাইবেন ১৪২ জন প্রতিনিধি। (২) চীনের ৯টি মুক্ত অঞ্চল—ইহারা পাঠাইবেন ১০২ জন প্রতিনিধি। (৩) মুক্তিসেনার ৬টি ইউনিট—ইহারা পাঠাইবেন ৬০ জন প্রতিনিধি। (৪) জনগণের ১৬টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন—ইহারা পাঠাইবেন ২০৬ জন প্রতিনিধি। এই ১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রহিয়াছে শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, যুবক, ছাত্র, শিল্প ও ব্যবসা মহলের, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম্মীদের, সংখ্যালঘু জাতিদের, প্রবাসী চীনাদের এবং বিভিন্ন ধর্ম্মালম্বীদের প্রতিষ্ঠান।

সম্মেলনে কাহারা আসিবেন

এইভাবে এই নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনে চীনের সাধারণ মানুষের, শ্রমিক কৃষকের, মুক্তি সেনাদের, শ্রমজীবী জনগণের, সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের প্রতিনিধিরা আসিয়া জমায়েৎ হইবেন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তাঁহারাই নতুন চীনের গোড়াপত্তন করিবেন। কিন্তু এই সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীলদের কোন স্থান হইবে না। গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের এইরকম ব্যবস্থা চীনের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায় নাই।

রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে-ই বুঝা যায় যে, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া চীনের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইবে।

সম্মেলনের কাজ কি হইবে

এই সম্মেলনের প্রধান কাজ কি হইবে তাহা প্রস্তুতি কমিটির উদ্বোধনী বক্তৃতায় কমিউনিস্ট নেতা মাও-সেতুঙ পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মাও-সেতুঙের কথায়—"প্রস্তুতি কমিটির এই সভার কাজ হইল অতি তাড়াতাড়ি যাহাতে নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের অধিবেশন ডাকা যায় তাহার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ সুসম্পন্ন করা। এই নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনেই গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠিত হইবে। সেই সরকারকে অতি দ্রুতগতিতে দেশের মধ্য হইতে কুয়োমিনটাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তির এখনো যা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাকে নির্ম্মূল করার জন্য জনসাধারণকে পরিচালিত করিতে হইবে; সেই সরকারকে দেশব্যাপী রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং দেশরক্ষার পুনর্গঠনের কাজ সুসংবদ্ধ ভাবে এবং ধাপে ধাপে সুসম্পন্ন করার জন্য সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। দেশের জনসাধারণ আশা করে যে, আমরা-ই এই কাজ সম্পন্ন করি এবং এই কাজ আমাদের-ই করিতে হইবে।"

"চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি ও গ্রুপগুলি, জনসাধারণের সংগঠনগুলি, সমস্ত মহলের গণতন্ত্রপ্রিয়ব্যক্তিরা, দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহ, সাগরপারের প্রবাসী চীনারা ইহারা সকলেই চায় যে, সাম্রাজ্যবাদের, সামন্ততন্ত্রের, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনটাঙগোষ্ঠীর শাসনের উচ্ছেদ করা হউক এবং দেশের গণতান্ত্রিক পার্টি ও গ্রুপগুলির, জনসাধারণের সংগঠনগুলির, সমস্ত মহলের গণতন্ত্রপ্রিয় ব্যক্তিদের, সংখ্যালঘু জাতিসমূহের এবং প্রবাসী চীনাদের প্রতিনিধি লইয়া একটি রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলন ডাকা হউক। এই সম্মেলন-ই চীনের জনগণের গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকের প্রতিনিধি হিসাবে একটি গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার নির্ব্বাচিত করিবে। এইভাবেই আমাদের বিশাল মাতৃভূমি অর্দ্ধ-ঔপনিবেশিক এবং অর্দ্ধ-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিবে এবং জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি, শান্তি, ঐক্য শক্তি-সামর্থ্য এবং ঐশর্য্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।"

প্রস্তুতি কমিটির পাঁচদিনব্যাপী অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাতে এই পথের-ই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একমত ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, চীনের জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ—তাহাদের ঐক্য আজ অতি সুদৃঢ়।

ব্যাপক সম্মিলিত ফ্রন্ট

মাওসেতুঙের কথায়—"আমাদের রহিয়াছে একটি ব্যাপক এবং সুসংবদ্ধ বিপ্লবী

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের ঘোষণা

সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী গণছাত্র সংগ্রাম তীব্রতর কর

* শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছাত্র-ফেডারেশনের দুর্গে পরিণত কর

বিপুল বিপ্লবী উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ২৩শে জুলাই হইতে ক্রমাগত ৫দিন অধিবেশনের পর গত ২৭শে জুলাই কলিকাতায় নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশনের দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন সাফল্যের সহিত শেষ হয়।

গত দেড়বছরে কংগ্রেসী সরকার সারা দেশ জুড়ে ছাত্র আন্দোলনের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে। এমন কোন বড় শহর নেই যেখানে হয় গুলি নয় তো লাঠি ও টিয়ারগ্যাস চলেনি।

ছাত্রফেডারেশনের উপর আক্রমণ তো দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

কলিকাতা শহরেই পুলিস লক আপে একাধিক ছাত্রকর্ম্মীকে মেরে অজ্ঞান ক'রে দেয়া থেকে দমদম জেলে ছাত্রবন্দী মুকুল চক্রবর্ত্তীকে হত্যা পর্য্যন্ত কোন কিছুই আর বাকী নেই। ছাত্রফেডারেশনের প্রায় ১০০০ কর্ম্মী আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে বন্দী। নিঃ ভাঃ ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদক ও সভাপতিসহ শতাধিক ছাত্রনেতার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ছাত্রফেডারেশন কার্য্যতঃ বে-আইনী। জমিদার, কলকারখানার মালিক এবং কংগ্রেসীনেতাদের ছেলেদের নিয়ে মালাবারে স্কুলে কলেজে বিশেষ "ছাত্র পুলিসবাহিনী" তৈরী হয়েছে —বিনাপরোয়ানায় ক্লাসের মধ্য থেকেও ছাত্রফেডানেশন কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করার জন্য।

সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য কলিকাতার পুলিসও সব রকম বাঁধাই দিয়েছে। 'সম্মেলনের তিনদিন আগে জানান যে, সম্মেলনের অনুমতি দেয়া হবে না'। অফিসের মধ্যে সম্মেলনের প্রস্তুতিসভা ভাঙবার জন্য পুলিস হাজির হল, দলে দলে কলকাতার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রেপ্তার চলতে লাগল।

কিন্তু সরকারের সমস্ত আক্রমণই ব্যর্থ হয়েছে, ভারতের প্রতি প্রান্তে সরকারী অত্যাচারের বাঁধা ভেঙে সংগ্রামী ছাত্রদের অগ্রবাহিনী ছাত্রফেডারেশন বিপুল শক্তিতে এগিয়ে চলেছে। ছাত্রফেডারেশন আজ বিপ্লবী ছাত্র সাধারণের একমাত্র গণছাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, তারই জীবন্ত প্রমাণ কলিকাতা সম্মেলনের অভূতপূর্ব্ব সাফল্য। নেপাল থেকে ত্রিবাঙ্কুর, আসাম থেকে বোম্বাই আর সবার উপর হায়দ্রাবাদ প্রতিটি প্রদেশের ছাত্রসংগ্রামের সেরা সৈনিক ৪৫০ প্রতিনিধি ও ২০০ ছাত্র দর্শক সামিল হয়েছিলেন বহু ছাত্র শহীদের রক্তে রাঙা কলিকাতা শহরে। এবারকার প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০% ভাগ ছিলেন স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রী। পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকেও অসংখ্য ছাত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর এক প্রতিনিধি দল।

সারাভারতের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কলিকাতার ছাত্র ও জনসাধারণ ছাত্রফেডারেশনের এই সম্মেলনকে যেরূপ অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন নিঃ ভাঃ ছাত্রফেডারেশনের সম্মেলনের ইতিহাসে তা' নূতন। সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে দশহাজার ছাত্র ও জনসমাবেশ, পাঁচহাজার ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকের জঙ্গী শোভাযাত্রা, মাত্র দিন সাতেকের মধ্যে ৫০০০ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও ৫০০ স্বেচ্ছাসৈনিকের সমাবেশ—এসবই ছাত্রফেডারেশনের প্রতি ছাত্র সাধারণের ব্যাপক সমর্থন ও শোষিত জনতার ভালবাসার সুস্পষ্ট পরিচয়। সংগ্রামী জনতার এই উৎসাহ ও সমর্থনের উপর দাঁড়িয়েই বিপ্লবী ছাত্রদের সম্মেলন সারাভারত জুড়ে ছাত্রসাধারণের সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তীব্রতর করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছে।

কংগ্রেসী সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আরো জোরের সাথে লড়াই সুরু কর, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সারা দুনিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তির পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা শান্তি ও প্রগতির জন্য ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের তাবেদার নেহরু সরকারের সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধচক্রান্তকে ব্যর্থ কর, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের শোষিত জনতার হাতে হাত মিলিয়ে ধনিক শাসনের অবসান ও শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করার পথে অগ্রসরহও—ইহাই এবারকার সম্মেলনের প্রধান আওয়াজ।

সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিতে একদিকে প্রকাশ করা হয়েছে ধনিকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির নগ্নরূপ, অপরদিকে সেই নীতিকে পরাস্ত করার জন্য আরো বৃহত্তর সংগ্রামের সুস্পষ্ট আহ্বান।

কংগ্রেসী সরকারের শিক্ষাসংকোচন নীতির বিরুদ্ধে গত একবছরে যে অসংখ্য স্থানীয় ও স্বতস্ফূর্ত্ত সংগ্রাম ফেটে পড়েছে সেগুলিকে সারাভারত জুড়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য শিক্ষার দাবী সংক্রান্ত প্রস্তাবে নির্দ্দেশ দেয়া হয়েছে আগামী ২৫শে আগস্ট "নিখিল ভারত ছাত্রদাবী দিবস" পালন করার। এই প্রস্তাবের আলোচনার মধ্যেই তারযোগে বোম্বাই ছাত্র ইউনিয়ন (ছাত্র ফেডারেশনের শাখা) থেকে খবর আসে—"২২শে জুলাই বোম্বাই শহরের ৬০,০০০ স্কুলছাত্র ও ১১০০ শিক্ষক পূর্ণ ধর্ম্মঘট করেছেন শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে।" এমনি ভাবেই সুরু হয়েছে ২৫শে আগস্টের প্রস্তুতি।

ছাত্র ফেডারেশনের পতাকার তলায় সমস্ত সংগ্রামী ছাত্রের ঐক্যকে গড়ে তোলবার আহ্বান দেওয়া হয় "জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন" সংক্রান্ত প্রস্তাবে। গত দেড় বছরে ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্র বিক্ষোভে ভীত হ'য়ে কংগ্রেস সরকার তার পেটোয়া ছাত্র নেতাদের নিয়ে "জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন" নামে এক হাতের পুতুল ছাত্র-প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। দক্ষিণপন্থী ছাত্রনেতারা এর "উদ্যোক্তা," সমাজতান্ত্রিক দালাল ছাত্র-নেতারা তা'দের সাকরেদ ছাত্রদের ঐক্যের আগ্রহকে ভাঙ্গিয়ে এরা টিকে থাকতে চায়। এই দালাল ছাত্রনেতাদের মুখোস খুলে তাদের ছাত্র আন্দোলন থেকে তাড়িয়ে সংগ্রামী ছাত্রদের সত্যিকারের ঐক্য গড়তে হবে ছাত্র ফেডারেশনের পতাকার তলায় তারই আহ্বান জানান হয় এই প্রস্তাবে। এবারকার সম্মেলনের নূতনত্ব বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পাশে ছাত্র আন্দোলনকে সামিল করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা ও উৎসাহ।

প্রথম দিনের সম্মেলনে ইছাপুরের ধর্ম্মঘটী শ্রমিক কমরেড সুনীলের অভিনন্দন বক্তৃতায় সমস্ত ছাত্র-প্রতিনিধি ও দর্শকেরা বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করেন। এই বক্তৃতার পরই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে সম্মেলন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে সরকারী দালালদের অপপ্রচার রুখবার প্রতিজ্ঞা নেয় এবং অভিনন্দন জানান হয় সমস্ত ফ্যাসিষ্ট অত্যাচার উপেক্ষা ক'রে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবিচলিত নেতৃত্ব দেবার জন্য এ, আই, টি, ইউ, সিকে। এই প্রস্তাব গ্রহণের সময় সমস্ত প্রতিনিধিরা বারবার "শ্রমিক-ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ" আওয়াজে হল মুখরিত ক'রে তোলেন।

সমাজতন্ত্রের দুর্গ, শান্তির অগ্রদূত এবং সমস্ত দেশের জনতার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের চির সমর্থক সোভিয়েট ইউনিয়নকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান

মঞ্জিল

গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক গঠনের জন্য চীনের সংগ্রাম

সম্মিলিত ফ্রন্ট ; ইহা এত ব্যাপক যে, ইহার মধ্যে রহিয়াছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটবুর্জ্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জ্জোয়ারা ; ইহা এত শক্তিশালী যে, সমস্ত শত্রু দলকে ধ্বংস করার এবং সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার সুদৃঢ় সংকল্প এবং অফুরন্ত সম্ভাবনা ইহার রহিয়াছে।"

শত্রু সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি

কিন্তু এই সাথে সাথে মাওসেতুঙ দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, চীনের জনগণের অগ্রগতির পথে এখনো প্রচুর বাধাবিপত্তি রহিয়াছে। চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা এখনো অস্ত্র ত্যাগ করে নাই—ইহাদের নির্ম্মূল করার দায়িত্ব চীনের জনগণের এবং এ কাজ তাহাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীরাও চীনের জনগণকে শোষণ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে নাই—ইহারা আজ জনগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখার জন্য নব নব পরিকল্পনা রচনা করিতেছে ; মুক্ত জীবনের যে স্বাদ চীনের জনগণ আজ পাইয়াছে তাহা কাড়িয়া লইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন অস্ত্র শানাইতেছে। তাই ইহারা আজ সুদূর প্রাচ্যে "কমিউনিস্ট বিভীষিকার জিগীর তুলিয়াছে।"

চীনের জয় দুনিয়ার জনগণের জয়

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে জনগণের যে লড়াই চলিয়াছে, সে লড়াই আর চীনের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম আজ অভিন্ন। চীনের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম দুনিয়াজোড়া জনগণের মুক্তি সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট অংশ। মাওসেতুঙ সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন : "চীনের জনগণের জয় দুনিয়ার জনগণের জয়। শত্রুদলের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের সংগ্রাম আর দুনিয়ার জনগণের সংগ্রাম একই লক্ষ্য লইয়া করা হইতেছে।"

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের খর্পর হইতে মুক্তি এবং জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করাই হইল জনগণের এই সংগ্রামের লক্ষ্য।

চীনের জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই লক্ষ্য লইয়াই আগাইয়া চলিয়াছে। তাই গণতান্ত্রিক চীনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা শত্রুর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকিতে, সতর্ক থাকিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

নতুন চীনের ভবিষ্যৎ

নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের মধ্য দিয়া চীনে যে গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠিত হইবে সে-সরকার শত্রুর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া চীনের জনগণকে নতুন গণতান্ত্রিক চীন গড়িয়া তোলার পথে-ই পরিচালিত করিবে। সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি চুয়েহে-ফ্যানের কথায়—আসন্ন এই নতুন রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের মধ্য দিয়া সাড়ে সাতচল্লিশ কোটি জনসংখ্যার একটি নতুন গণতান্ত্রিক দেশ জন্মলাভ করিবে। সোভিয়েটের নেতৃত্বে দুনিয়ার যে গণতান্ত্রিক শক্তি আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, এই নতুন গণতান্ত্রিক দেশের আবির্ভাবে সেই শক্তি আরো শক্তিশালী হইবে।

সর্ব্বসাধারণের নাগালে শিক্ষা; গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য—

বিপ্লবী ছাত্র সমাজের প্রতি জরুরী আহ্বান

স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতিকামী ছাত্রসমাজের মুখপাত্র নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মূল কথা হইল—ভারত সরকার ঘরে বাহিরে ধনিক-সামন্ত সাম্রাজ্যবাদী-নীতি গ্রহণ করিয়া দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যে সর্ব্বাত্মক আক্রমণ চালাইয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহা তেমনই ব্যাপক ও হিংস্র হইয়া ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছে।

সমস্ত বাধাবিপত্তি ও বিভ্রান্তি অতিক্রম করিয়া এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দেশের সমস্ত ছাত্রকে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী পতাকাতলে সমবেত হইতে হইবে ইহাই সম্মেলনের জরুরী আহ্বান।

"....অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলির দাম যখন বাড়িয়াই চলিয়াছে, মধ্যবিত্ত-সমেত সমস্ত মেহনতী মানুষ যখন জীবনযাত্রার অসহ্য ব্যয়বৃদ্ধি আর বেকারির মাঝে নিদারুণ দুর্দ্দশা আর অনাহারের মাঝে, আজ যাহারা স্কুলে-কলেজে পড়াশুনা করিতেছে তাহাদের পড়াশুনা কোনমতে চালাইবার জন্যই যখন শিক্ষার ব্যয় বহুলাংশে কমাইয়া দেওয়া দরকার তখনই ফী বাড়ানো হইয়াছে।"

শিক্ষা হইতে বঞ্চনার নীতি

এই "ফী বৃদ্ধির বিরুদ্ধে" প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, এই সরকার শতকরা ২৫ ভাগ হইতে শতকরা ৩০০ ভাগ পর্য্যন্ত ফী বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিক, মেহনতী কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে, দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে—স্কুল-কলেজের সীমানাও ঘেঁসিতে না দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ীই এই শিক্ষানীতি বা শিক্ষা হইতে বঞ্চনার নীতি চলিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, যুক্তপ্রদেশ ও অন্যত্র লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সুদৃঢ় সংগ্রামে অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্তাবে হুঁশিয়ারি জানানো হইয়াছে: "প্রতিরোধ না করিলে শিক্ষার বিরুদ্ধে এই সরকারী আক্রমণ বাড়িয়াই চলিবে"। প্রত্যেকটি গণতন্ত্রসম্মত অধিকার ও শিক্ষা সংক্রান্ত দাবীগুলির জন্য "....সুদৃঢ় লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে গত এক বছরে যে ২০ লক্ষের মত ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা গিয়াছে, ভারতের ছাত্র-ছাত্রীরা কংগ্রেস সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

ছাত্র, শিক্ষা ও শিক্ষক

সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে এইসব লড়াইয়ে ছাত্রছাত্রীদের অপূর্ব্ব জঙ্গী দৃঢ়তা ও সাহসকে অভিনন্দন জানাইয়া **"শিক্ষা সম্পর্কিত দাবী"র** প্রস্তাবে দেখানো হইয়াছে—গত বছর ডিসেম্বর মাসে মওলানা আজাদ বলিয়াছেন যে, ফাঁপা মুদ্রার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার অংশ হিসাবে কিছুকালের ভিতর শিক্ষার জন্য আর নূতন কোন সরকারী ব্যয় মঞ্জুর করা হইবে না; অথচ, সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগ। বহু নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রস্তাবে দেখানো হইয়াছে যে, সহস্র প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সহিত ফী বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষাকে ধনীর দুলালদের একচেটিয়া করিয়া তোলাই সরকারী নীতির লক্ষ্য।

ছাত্র, শিক্ষা ও শিক্ষকের সম্পর্ক অভিন্ন। তাই, সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে শিক্ষকরাও যে-ভাবে তাঁহাদের অতি ন্যায্য দাবীদাওয়ার জন্য লড়াই করিতে নামিয়াছেন, একটি প্রস্তাবে ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদের অভিনন্দন জানানো হইয়াছে এবং তাহাদের দাবী ও সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন ঘোষণা করা হইয়াছে।

দুইটি প্রস্তাবে দেখানো হইয়াছে যে, প্রধানত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সমাধানের জন্যই বর্ত্তমান **ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষাব্যবস্থা** ও পাসের কম হারের 'কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।'

'চিন্তা নিয়ন্ত্রণ' ব্যবস্থা

"....সরকার নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা হইতে সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, শাসকশ্রেণীর স্বার্থে শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্র মিথ্যায় ভরিয়া তোলা হইতেছে; 'চিন্তা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' চাপাইবার চেষ্টা চলিয়াছে; এবং ইহার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান সরকার ও বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার অনুগত ভৃত্য সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।" এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবে দেখানো হইয়াছে যে, ইহারই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সুপরিকল্পিতভাবে সমস্ত রকমের ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ছাত্রদের মনে জাগাইয়া দেওয়া হইতেছে।

এই সমস্ত ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রত্যেকটি প্রতিবাদ ও লড়াইকে পিষিয়া মারিবার জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ভিতরে পর্য্যন্ত গুলি চলিয়াছে, হোস্টেলে পর্য্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে, গ্রামের স্কুলে স্কুলে পুলিসের ক্যাম্প বসিয়াছে, ছাত্র কংগ্রেসের মত সংগঠনের মারফৎ এবং সরাসরি ধনীর ঘরের ছাত্রদের দিয়া গোয়েন্দার কাজ করানো হইতেছে।

ত্রিবাঙ্কুর ও অন্যান্য স্থানে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের সমর্থনে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কিভাবে এইসব আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া "শিক্ষা সম্পর্কিত দাবীর" প্রস্তাবে আরও তীব্র ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্র সমাজকে হুঁশিয়ার করিয়া বলিষ্ঠ ঘোষণা করা হইয়াছে: ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী নেতৃত্বে ছাত্রসমাজের জয় অনিবার্য্য।

ছাত্র সম্মেলনে 'জাতীয়' টি, ইউ

গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সরকারী আক্রমণ আরও এক নূতন পথে আসিয়াছে। **শ্রমিক আন্দোলনে 'জাতীয়' টি ইউ এর মতো ছাত্র আন্দোলনে এক 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন'** খাড়া করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে এক প্রস্তাবে দেখানো হইয়াছে যে, সরাসরি কংগ্রেসী মন্ত্রী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা এবং সোশ্যালিস্টদের লইয়া গঠিত 'প্রস্তুতি কমিটি' ও 'পরামর্শদাতা কমিটি'ই এই "ইউনিয়ন" বানাইয়াছে।

ছাত্র আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির জন্য গঠিত এই "ইউনিয়নে"র ঘোষণায় গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষা, কম-ব্যয়ে শিক্ষা ইত্যাদি কোন প্রশ্নই নাই। "সমস্ত রকমের সভা, মিছিল ইত্যাদি কার্য্যক্রম এবং রাজনীতিক কার্য্যকলাপ হইতে" ছাত্রদের সরাইয়া নিবার প্রকাশ্য ঘোষণার ভিতর দিয়াই এই "ইউনিয়নে"র স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, "ইহার অর্থ হইল—দমননীতি, লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, গুলি, ব্যাপক গ্রেপ্তার এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি ব্যাপক প্রতিরোধ বন্ধ করাই" এই "ইউনিয়নে"র উদ্দেশ্য।

কিন্তু, বোম্বাই ও আসামে 'ইউনিয়নে'র সোশ্যালিস্ট পাণ্ডারা যে আঘাত খাইয়াছে তাহাতেই বোঝা গিয়াছে যে, সংগ্রামী ছাত্রসমাজ এই বিভেদ ও বিভ্রান্তির ফাঁদে পা দিবেন না।

তেলেঙ্গানাকে অভিনন্দন

দেড় হাজার শহীদের রক্ত দিয়া তেলেঙ্গানার বীর কৃষক আড়াই হাজার গ্রামে জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে অমিতবিক্রমে লড়িয়া সে কর্তৃত্ব রক্ষা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, সে কর্তৃত্ব তাঁহারা নূতন নূতন অঞ্চলে বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। তেলেঙ্গানা সম্পর্কিত এই প্রস্তাবে বীর কৃষকদের অভিনন্দন জানানো হইয়াছে।

নালাগোণ্ডার ১৫ বছরের ছাত্র রামরেড্ডীসহ ৭ জন বীর কৃষক বন্দীর উপর মিলিটারী ট্রাইব্যুনাল বসাইয়া যে ফাঁসীর আদেশ জারি করা হইয়াছে একটি বিশেষ প্রস্তাবে ছাত্র সম্মেলন সে আদেশের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং এ আদেশ

(১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

হয় আর একটি বিশেষ প্রস্তাবে। সম্মেলনের শেষের দিকে যখন নিঃ ভাঃ ছাত্রফেডারেশনের বর্ত্তমান অধিবেশনকে অভিনন্দন জানিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের যুবসংগঠনের বাণী পৌঁছে তখন প্রায় ১৫ মিনিট ধরে সমস্ত প্রতিনিধি ও দর্শকেরা অবিশ্রান্ত করতালি দেন। "সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ" ধ্বনি তুলে উঠে দাঁড়ান।

এমনিভাবে আগামীদিনের আরো তীব্রতর এবং কঠিন সংগ্রামের দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে দেশের এবং দুনিয়ার সমস্ত বিপ্লবী জনতার পাশে দাঁড়িয়ে লড়বার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কলকাতার ঐতিহাসিক সম্মেলন শেষ হল।

সম্মেলনের মাত্র ১৫ দিন আগে অত্যাচারী ধনিকশ্রেণীর প্রধান পাণ্ডা পণ্ডিত নেহরু কলকাতার জনতার কাছে আহ্বান জানান—"সমাজবিরোধী" শক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার জন্য। এই "সমাজবিরোধী" শক্তির মধ্যে তিনি ছাত্রফেডারেশনকেও ফেলেন। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের বর্ত্তমান অধিবেশনের বিরাট সাফল্য, ২৬শে জুলাইর প্রকাশ্য অধিবেশন এবং জঙ্গী মিছিল পণ্ডিত নেহরুকে জানিয়ে দিয়েছে—কলকাতার শ্রমিক-ছাত্র ও শোষিত মধ্যবিত্ত জনতা অগ্রসরই হয়ে চলেছে হাজারে হাজারে! তবে পণ্ডিত নেহরু যেদিকে চেয়েছিলেন সেদিক নয়, তার বিপরীত দিকে—নেহরু সরকারের ফ্যাসিস্ট অত্যাচার ও জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির অবসানের দিকে।

৩১শে জুলাই

নিঃ ভাঃ ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে

ভারতের মুক্তি-যোদ্ধাদের সোভিয়েটের অভিবাদন

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন
৮৪।১এ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোভিয়েট ইউনিয়নের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীদের তরফ হইতে আমরা এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের ও তাহাদের মারফৎ নিখিল ভারত ছাত্র-ফেডারেশনের সমস্ত সভ্য-সভ্যাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাই। ভারতবর্ষের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য এবং জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য দেশের প্রগতিশীল যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনারা করিতেছেন আমরা তার সাফল্য কামনা করি।

বন্ধুত্বপূর্ণ অভিবাদন
সোভিয়েট ইউনিয়নের ফ্যাসি-বিরোধী কমিটি

বিপ্লবী ছাত্রসমাজের প্রতি জরুরী আহ্বান

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যাহারের জন্য সারা ভারতে আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়াছে।

দমননীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব

'দমননীতির বিরুদ্ধে' প্রস্তাবে শ্রমিক-শ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে অভিনন্দন জানাইয়া দেশের সমস্ত ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে যে, "দমন-নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়া তুলিতে হইবে; বিনাবিচারে আটক সমস্ত বন্দীর বিচার অথবা মুক্তির দাবীকে অপরাজেয় করিয়া তুলিতে হইবে। তথাকথিত 'জননিরাপত্তা' আইন ও অন্যান্য ফ্যাশিস্ট আইন তুলিয়া দিবার জন্য; পশ্চিমবঙ্গ, ইন্দোর ও হায়দরাবাদে কমিউ-নিস্ট পার্টিকে বৈধ করিবার জন্য; এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা-নিষেধ অপসারিত করিবার জন্য; পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার সমেত জন-গণের সমস্ত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়া তুলিতে হইবে।" মিছিল, সভা ও ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া এই সংগ্রাম পরিচালিত হইবে।

নেহরু সরকার—ধনিক শ্রেণীর সরকার

ভারতবর্ষের জনসাধারণ তার ন্যূনতম দাবীগুলি লইয়া লড়াই করিতে গিয়া নেহরু সরকারের যে হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার ফলে সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে, "এ সরকার মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত।"

"নেহরু সরকারের" উপর একটি মূল প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, "গত ১৯৪৭-এর আগস্ট পরবর্ত্তী দুই বৎসরে এ কথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, কংগ্রেস শাসকেরা পুনর্গঠন পরিকল্পনা ও জন-সাধারণের জীবন যাত্রার উন্নতির নাম করিয়া যে "সময় দাও" বলিয়া চেঁচা-ইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজী, এই দুই বৎসরে মধ্যে তাহারা জনসাধা-রণকে পিষিয়া মারার সর্ব্ব প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে—কিন্তু তার পেটের সমস্যার এতটুকুও সমা-ধান করে নাই।"

"কংগ্রেস-বিরোধিতা", "সমাজতন্ত্র" প্রভৃতির মুখোস পরিয়া আজ যাহারা এই অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ ও আন্দোলন পিছন হইতে ছুরি চালাইতেছে সেই স্যোসালিস্টপার্টির বিশ্বাসঘাতক ভূমিকাকে এই প্রস্তাবে তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে।

এই প্রস্তাবে আরও কতকগুলি বাম-পন্থী দল বিশেষ করিয়া শরৎ বসুর দলের দুমুখো নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে হুঁসিয়ারী জানানো হইয়াছে।

এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে—"একমাত্র শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত মধ্যবিত্তের সরকারই এই অনাহার, অমানুষিক শোষণ ও অসহ্য অত্যাচারের হাত হইতে জনসাধারণকে মুক্তি দিতে পারে"—তাই এই সম্মেলন "এই ধনিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপের অবসান করার সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাথে হাত মিলাইবার জন্য" ছাত্রসাধারণকে আহ্বান জানাইয়াছে।

প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য

"ভারত ও কমনওয়েল্থ" প্রস্তাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিকট বিশ্বাসঘাতক আত্ম-সমর্পণ এবং ভারতের জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা বিকাইয়া দিবার পরিণতি হিসাবেই নেহরু সরকার বৃটিশ কমন-ওয়েল্থ-এ যোগ দিয়াছে।"

জনগণের প্রকৃত স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য লড়াইয়ে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের পাশে গিয়া ছাত্রদের দাঁড়াইতে আহ্বান জানাইয়া এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতের জনগণ কমনওয়েল্থ-এর গোলামি ও বিশ্বাসঘাতকতা বরদাস্ত করিবে না।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে নেহরু সরকার বর্ম্মার মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতেছে, জনগণের বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্তে যোগ দিয়াছে।—**'বর্ম্মা' সম্পর্কে প্রস্তাবে** ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতের ছাত্রসমাজ সর্ব্বপ্রকারে এই খুনী প্রচেষ্টায় বাধা দিবে। "মালয়ের" উপর এক প্রস্তাবে মালয়ের মুক্তি যোদ্ধা-দের অভিনন্দন জানানো হয় ও গণপতির হত্যাকারী ম্যাকডোনাল্ডের সাথে নেহরু সরকারের মিতালির বিরুদ্ধে ছাত্র সাধারণকে আন্দোলন করবার আহ্বান জানানো হইয়াছে।

শান্তির লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে

ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দেশে দেশে জনগণের মুক্তি সংগ্রাম এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নূতন গণতন্ত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে দুনিয় জোড়া এক নূতন যুদ্ধের আগুন জ্বালাইতে চাহিতেছে। **"শান্তির জন্য সংগ্রাম"** প্রস্তাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নেহরু-প্যাটেল সরকার কমনওয়েলথ-এর গোপন রাজনীতিক-সামরিক দাস-চুক্তির ভিতর দিয়া ভারতকে এই সোভিয়েট ও গণতন্ত্র-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত বাঁধিয়া দিয়াছে।

দুনিয়ার শান্তি ও গণতন্ত্রকামী শক্তি-গুলির উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবে সংকল্প ঘোষণা করা হইয়াছে—ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জন-গণের সহিত একযোগে ভারতের ছাত্রসমাজ ও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় পুঁজিপতি সামন্ত গোষ্ঠীর যুদ্ধ-চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হইবে।

দুনিয়ার শান্তি ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সোভিয়েট ইউনিয়নের গৌরবময় ভূমিকায় বিপ্লবী অভিনন্দন জানানো হইয়াছে এই প্রস্তাবে।

সারা-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 'শান্তি-সম্মেলনের' আহ্বানকে স্বাগত জানাইয়া "শান্তির জন্য সংগ্রাম" প্রস্তাবে ফেডারেশনের প্রত্যেকটি সদস্য ইউনিটকে আহ্বান জানানো হইয়াছে যে, শান্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।"

সোভিয়েট রাশিয়া ও মুক্ত চীন

শান্তির প্রহরী ও সমাজতন্ত্রের দুর্গ সোভিয়েট ইউনিয়নকে ভারতবর্ষের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের তরফ হইতে অভি-নন্দন জানাইয়া একটি প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে।

যে দেশের ছেলেমেয়েরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, শিক্ষার উপর আঘাতের বিরুদ্ধে, আসন্ন বেকারী ও অনাহারের বিরুদ্ধে প্রতিদিন সংগ্রাম করিতেছে সে দেশের তরফ হইতে এই ছাত্র সম্মেলন সমাজতন্ত্রের দেশের সোভিয়েট রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের অভিনন্দন জানাইয়াছে, যাহারা আজ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

৩০ কোটি মানুষকে অত্যাচার ও শোষণ হইতে মুক্ত করিয়া চীনের মুক্তি ফৌজ যে বিজয় অভিযান চালাইয়াছে সে মুক্তি ফৌজ ও তার প্রিয় নেতা মাও-সে-তুংকে অভিনন্দনস জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীকে অভিনন্দন

আর অভিনন্দন জানানো হইয়াছে ভারতবর্ষের সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর ও তাহার প্রতিষ্ঠানকে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে।

ধনিক শ্রেণীর সরকারের দমননীতি স্বভাবতঃই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উপর আঘাত হানিয়াছে সবচেয়ে বেশী, এই হিংস্র দমননীতির বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন যায়গায় শ্রমিকেরা যে অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহসের সাথে লড়াই করিতেছেন তাহা সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

শিক্ষা, গণতন্ত্র ও শান্তির লড়াই এ এই সংগ্রামী শ্রমিকের সাথে ঐক্যবদ্ধ হইয়া লড়াই করার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান জানাইয়াছে।

বোনাসেরদাবীতে ম্যানেজার ঘেরাও

গত ২০শে জুলাই মেটিয়াব্রুজ এ-ই-আই, এম কারখানার শ্রমিকরা বোনাসের দাবীতে ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। বেগতিক দেখিয়া ম্যানেজার ১০ দিন সময় লইয়া শ্রমিকের হাত হইতে আত্মরক্ষা করেন।

ঘেরাও যাহাতে না হয় তাহার জন্যে 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালরা প্রচার করিতে থাকে যে, ঘেরাও করিলে লক-আউট হইবে। কোম্পানীর অফিসাররা পুলিস ডাকিবার ভয় দেখায়। কিন্তু শ্রমিকরা লালঝাণ্ডার ডাকে একত্রিত হন; দালাল ও পুলিসের সামনাসামনি দাঁড়াইবার জন্যে প্রস্তুত থাকেন।

কারখানার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা আওয়াজ তুলিয়াছেন:

বোনাস না পাওয়া পর্য্যন্ত লড়াইয়ের বিরতি নাই!

ঘর ভাড়া ও পুরানো শ্রমিকদের কাজ চাই!

১৫০ টাকা মাহিনা ও মাগ্‌গীভাতা চাই!

শ্রমিকের শত্রু দালালদের ক্ষমা নাই!

সকল শ্রমিক-কর্ম্মচারীকে লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের সভ্য করা চাই!

পাহাড়পুর টিম্বারে ওভারটাইম ধর্ম্মঘট

পাহাড়পুর টিম্বার শ্রমিকদের বিনা পয়সায় ওভারটাইম খাটানো হয়। এই বর্ব্বর শোষণের প্রতিবাদে এবং ১৫০৲ মজুরি ও ভাতার দাবী, ঘরভাড়া ও জখমী শ্রমিকদের খেসারত দাবী, মারপিট বন্ধ করা প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে শ্রমিকরা গণ-দরখাস্ত করেন, ঘেরাও করেন এবং তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় সকলে একযোগে ওভারটাইম কাজ করা বন্ধ করেন। শ্রমিকদের এই জঙ্গী ঐক্য গড়িয়া উঠার মালিকদের মারপিট বন্ধ হইয়াছে।

দমননীতির প্রতিবাদে শ্রমিকদের সংগ্রাম

জি, আই, পি রেলওয়েমেন্স ই উ নি য় ন, ইলেকট্রিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘের মিলিত উদ্যোগে ঝাঁসীতে কংগ্রেস সরকারের ফ্যাসিস্ট দমননীতির বিরুদ্ধে বিরাট সমাবেশ হইয়া গিয়াছে।

২২শে জুন হাজার হাজার শ্রমিক ও জনসাধারণ এক বিরাট মিছিল বাহির করেন। মিছিলের পর এক বিরাট সভা হয়। সভায় সমগ্র ভারতের ২৫ হাজার রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। সমস্ত দমননীতি তুলিয়া নিবার প্রস্তাব করা হয়। হায়দরাবাদের ৮ জন কর্ম্মীর ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা রদের দাবী করা হয়।

প্রগতিশীল পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

নিউ পাবলিশার্স

৬নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

অর্ডার দিলে ভি-পিতে পার্শেল পাঠানো হয়।

ট্রাম শ্রমিকদের ধরপাকড় ও চার্জসীট

ফ্যাসিষ্ট কায়দায় সরকার ও মালিকের আক্রমণঃ সোশ্যালিষ্ট নেতাদের দালালীর স্বরূপ ফাঁস

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী শ্রমিকদের 'শায়েস্তা' করার এক ফ্যাসিস্ট কায়দা গ্রহণ করিয়াছে। এক একজন শ্রমিকের নামে কোম্পানী কোর্ট স্লিপ জারী করিতেছে। এই স্লিপ পাওয়া মাত্র শ্রমিককে কোর্টে বা থানায় গিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হইতে বলা হইতেছে। এইভাবে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তাহাদের গ্রেপ্তার করিতেছে। থানায় না গেলে ছাঁটাই করা হইতেছে।

ইতিমধ্যেই বালীগঞ্জ হইতে ৫ জন এবং কালিঘাট হইতে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কোম্পানীর কোর্ট স্লিপ পাইয়া থানায় যাইতে যাহারা অস্বীকার করিতেছে তাহাদের ছাঁটাই করা হইতেছে। ৩ জনকে ছাঁটাই করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় আরো ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জসীট দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশী পুঁজিপতি মালিকরা যাহা বলিতেছে বাংলার কংগ্রেসী পুলিস এবং আদালত তৎক্ষণাৎ সে হুকুম পালন করিতেছে। ইহার এইরূপ নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে খুব কমই দেখা গিয়াছে।

যে সকল শ্রমিককে এইভাবে গ্রেপ্তার ও চার্জসীট দেওয়া হইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গত ধর্ম্মঘটে তাহারা সক্রিয় ভূমিকা লইয়াছিলেন। এই ধৃত বরখাস্ত ও চার্জসীট প্রাপ্ত শ্রমিকদের মধ্যে লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের লোকেরা তো আছেনই, পঞ্চায়েতের অনেক সাধারণ কর্ম্মীরাও বাদ যান নাই। গত ৮ই হইতে ১২ই জুলাই এই সকল সাধারণ শ্রমিকেরা দক্ষিণ কলিকাতায় ঐক্যবদ্ধভাবে বেতনবৃদ্ধি এবং দুই মাসের বোনাসের দাবিতে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মঘট চালাইয়া যান। তাহারা ইহাও দাবি করেন কোন শ্রমিকের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলিবে না।

সাধারণ শ্রমিকদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সামনে সোস্যালিস্ট নেতারা কোন কথা বলিতে সাহস পান নাই। পঞ্চায়েতের সাধারণ কর্ম্মীরা তেওয়াড়ী রামইকবাল প্রভৃতি সোস্যালিস্ট নেতাদের প্রতি প্রকাশ্যেই অনাস্থার ভাব দেখান এবং ধর্ম্মঘট পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। তীব্র দমননীতিতে তাঁহারা পিছান না।

সাধারণ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তা দেখিয়া কোম্পানী একমাসের বোনাস ও বেতন বৃদ্ধি দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের সহিত চুক্তি না করিয়া পঞ্চায়েতের নেতাদের সহিত চুক্তি করেন।

সমস্ত দাবি পাওয়া গিয়াছে এই ধুয়া তুলিয়া পঞ্চায়েত নেতারা শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়া যাইতে বলেন ও ধর্ম্মঘট তুলিয়া লন। সমস্ত দাবির মধ্যে প্রধান দাবিই ছিল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চলিবে না।

এখন দেখা যাইতেছে পঞ্চায়েত নেতারা ধোঁকা দিয়াছিলেন। এই সকল নেতাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না হইলেও ধর্ম্মঘটের অপরাধে পঞ্চায়েতের সাধারণ শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করা ও চার্জসীট দেওয়া হইতেছে!

সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের জোরে এক-মাস বোনাসের যেটুকুবা সুবিধা সাধারণ শ্রমিকেরা আদায় করিয়াছিলেন অন্যদিক দিয়া তাহা কাটিয়া লওয়ার চক্রান্ত চলিতেছে। কোম্পানী নতুন টাইম টেবল চালু করিতেছেন। ইহাতে কনডাক্টর প্রভৃতিদের ৫৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাটিতে হইবে। মোনাপুকুর কারখানায় খাটুনী বৃদ্ধি ও জুলুম বাড়িয়াই চলিতেছে। ঘরভাড়া, মাগ্‌গীভাতা ও মূল বেতন বৃদ্ধির কোন দাবিরই ফয়সালা হয় নাই। শ্রমিকেরা বুঝিতেছেন সংগ্রামের জন্য অবিলম্বে ঐক্য গড়িয়া না তুলিলে চলিবে না। অবিলম্বে টাইমটেবল প্রত্যাহার, ৮০ টাকা মূল বেতন, ছাঁটাই ও শ্রমিকদের পূনর্ব্বহাল ও ধৃত নেতাদের মুক্তি প্রভৃতির দাবিতে তাঁহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হইয়াছে। পঞ্চায়েতের অধীন শ্রমিকরাও গত ২৫শে জুলাই হেড অফিস ঘেরাও করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোস্যালিস্টর নেতাদের দালালীর স্বরূপও তাঁহারা বুঝিতে শুরু করিয়াছেন। গত দুই বৎসরে ট্রামে ৯টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে এবং প্রতিবার সোস্যালিস্ট নেতারা দালালী করিয়াছে। সংগ্রামী শ্রমিকদের পুলিসের নিকট ধরাইয়া দিয়াছে। সাধারণ শ্রমিকদের উপর মারপিট করিয়াছে।

তখন তাহারা বুঝাইয়াছিলেন ধর্ম্মঘট ভাঙাই হইতেছে পাঁটি জাতিয়তাবাদীর কর্ত্তব্য। কিন্তু দুই বৎসরের অভিজ্ঞতার পর পঞ্চায়েতের অধীন সাধারণ শ্রমিকেরা আজ আর কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ বা প্রাদেশিকতা কোন অজুহাতেই দালালী করিতে স্বীকৃত নয়।

গত ধর্ম্মঘটে তাহারা আরো শিক্ষা পাইয়াছেন। কোনক্রমেই ধর্ম্মঘটে ফাটল ধরাইতে না পারিয়া পঞ্চায়েত নেতারা ধুয়া তুলিয়াছিলেন পণ্ডিতজী আসিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজী ভালো লোক। হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের প্রিয় লোক। এখন ধর্ম্মঘট চালাইলে কমিউনিস্টদের 'সুবিধা' হইবে।

সাধারণ শ্রমিকেরা তাহাতে কিছুটা দ্বিধা গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় না করিয়াই ধর্ম্মঘট তুলিয়া লওয়ার বিরুদ্ধে তাঁহারা শক্ত হইয়া দাঁড়ান নাই। ভাবিয়াছিলেন এমনিতেই পণ্ডিতজী তাহাদের সব দাবী মিটাইয়া দিবার জন্য 'চাপ' দিবেন।

এখন উল্টা ব্যাপার ঘটিয়াছে। নেহরুর প্রতি দুর্ব্বলতা দেখানতে সুবিধা হইয়াছে একমাত্র মালিকের। মজুরদের দাবী মানাতো দূরের কথা সাদা মালিকদের সই করা কাগজই আজ পুলিসের আইন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু এবং সোস্যালিস্ট নেতারা যে পুঁজিপতিদের বন্ধু, ট্রামের সাধারণ শ্রমিকেরা সে কথা ভালো করিয়া বুঝিতে শুরু করিয়াছেন।

চিঠি-পত্র

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী দুইটি কি একই সঙ্গে চলিবে?

বাস্তহারাদের কথা উচ্চারণ করিতে যাইয়া ছেলেমেয়েরা জেল খাটিতেছে। গরীব মানুষের আন্দোলন করে বলিয়া কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী। ভোট যদি করিতেই হয়, বন্দীদের না ছাড়িয়া, কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ না করিয়া তাহাতো একেবারেই ছেলেখেলা। কংগ্রেসনেতারা সে সব কথা বলিতেছেন না কেন?

কে না জানে আজ যদি ভোট হয়, তবে সেখানে দুই বিপরীত শক্তির একপক্ষ হইল আজ যারা জেলে আছেন তারাই। কংগ্রেসের পারিবারিক কলহের বদলে সত্যই যদি নির্ব্বাচনকে নেতারা দেশের সমস্যা-বিচারের কোন মানদণ্ড বলিয়া মনে করেন, তবে এখনই রাজবন্দীদের মুক্তি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে। উহা ব্যতীত ভোট গ্রহণ একেবারেই নিরর্থক ও জনসাধারণের টাকা খরচ। ইতি—

জনৈক বাস্তহারা, ইছাপুর ক্যাম্প

সদ্যমুক্ত অনশন ধর্ম্মঘটকারী রাজবন্দী মহাশয়,

"পশ্চিমবঙ্গে আগামী ছয় মাসের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন হবে" বলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেছে। এই নির্ব্বাচন ১৯৩৫ সালের ইংরাজের ভারত শাসন আইন অনুসারে শতকরা ১৩ জনের ভোটের ভিত্তিতে হবে। কিছুদিন আগে রাজবন্দীদের অনশন ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলায় যে আগুণ জ্বলে উঠেছিল তার পরিমাপ বোঝার জন্যে দিল্লীর মসনদ থেকে ভারতের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বাংলার জমিতে নেমে এসেছিলেন। বাংলার অবস্থার ওপর বহু গবেষণা ও আলোচনার পর তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে গণ-বিক্ষোভ প্রশমিত করার জন্যে জনগণকে তাঁর রাষ্ট্র নেতা পুনঃনির্ব্বাচনের সুযোগ নাকি এই নির্ব্বাচন মারফৎ দেওয়া হচ্ছে। এই নির্ব্বাচন মারফৎ গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার নাকি জেনে নেওয়া হোচ্ছে।

পণ্ডিতজী কলকাতায় আসবার মাত্র একপক্ষ কাল আগে আমরা পঃ বাংলার বিভিন্ন জেলের প্রায় বার শত রাজবন্দীরা যে অনশন ধর্ম্মঘট করেছিলাম তার অন্যতম প্রধান দাবি ছিল—নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রবর্ত্তন করতে হবে। আমরা রাজবন্দীরা দাবি করেছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে, সমস্ত বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

কারাপ্রাচীরের দুর্ভেদ্য দেওয়াল অতিক্রম করে আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ জনগণের কাছে পৌঁছে ছিল। আমরা জানি। কিন্তু রাজবন্দীদের দাবি পণ্ডিতজীর দপ্তরের ছেড়া কাগজের টুকরির মধ্যে স্থান পেয়েছিল সেদিন। ময়দানে একটা কথাও বলেন নি।

বহু আলোচনা ও গবেষণার পর পঃ বাংলার নির্ব্বাচনের আদেশের সাথে সাথে আমরা আশা করেছিলাম রাজবন্দীদের এই প্রাথমিক দাবি নাগরিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ঘোষিত হবে। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? একদিকে যখন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের কথা বলা হোচ্ছে তখন সভাসমিতির অধিকার কেড়ে নেওয়া হোয়েছে; জনগণের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হোয়েছে; ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক-সভাগুলিকে অকেজো করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এক-দিকে যখন রাষ্ট্রের নায়ক হিসাবে জনগণের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে কথা ঘোষণা করা হোচ্ছে তখনই জনগণের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের, শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের নেতাদের, জনগণের প্রতিনিধিদের ঘৃণ্য এণ্ডারসনী 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট' অনুসারে বিনা বিচারে জেলে আটক রেখে অকথ্য অত্যাচার করা হোচ্ছে।

তাই রাজবন্দীদের তরফ থেকে আমি দাবী করচি যে নির্ব্বাচনের আগে:—

(১) সমস্ত বিনা বিচারে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে

(২) সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করতে হবে।

(৩) সমস্ত প্রকারের নিষেধাজ্ঞামূলক আইন [নাগরিক স্বাধীনতা বিরোধী সমস্ত প্রকারের নিষেধাজ্ঞামূলক আইন] প্রত্যাহার করতে হবে।

এবং নির্ব্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের আগে এই কাজ না করে গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের কথা বলা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণের নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে জনগণের পার্টিগুলিকে বৈধ ঘোষণার পরই নির্ব্বাচন সম্ভব হোতে পারে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র নেতাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে মাত্র তিন বছর আগে সমস্ত বন্দীদের জেল থেকে মুক্ত করার পরে সমস্ত পার্টিকে আইনসঙ্গত অধিকার দানের পরই সাধারণ নির্ব্বাচন সম্ভব হোয়েছিল। ইংরাজ রাজত্বের উত্তরাধিকারীরা আশা করি ইংরাজী ধনিকতন্ত্রের দেওয়া এই সামান্য অধিকারটুকু মেনে নেবেন।

জনৈক সদ্যমুক্ত অনশন ধর্ম্মঘটী বন্দী

[দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য ছাড়া পাইয়াছেন।]

পড়ুন ও পড়ান

মার্ক্সবাদী

[চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইয়াছে]

দাম—পাঁচসিকা

দুর্জ্জয় তেলেঙ্গানা

আব্দুল সালাম [তিন আনা]

লকআউটের বিরুদ্ধে

পটারী শ্রমিকদের দৃঢ় প্রতিরোধ

অর্দ্ধেক ছাঁটাই করিয়া মালিক কর্তৃক কারখানা খোলার চেষ্টা

গত ৮ই জুন ট্যাংরার বেঙ্গল পটারীতে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণের পর হইতে আজ ৫২ দিন হইল কারখানায় লক আউট চলিতেছে।

দীর্ঘদিন ধরিয়া পুলিস অত্যাচার গ্রেপ্তার ও ধরপাকড়ের পর কর্তৃপক্ষ এবার কারখানা খোলার মতলব করিতেছেন। জানা গেল পটারীর প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিকের মধ্যে অর্দ্ধেক শ্রমিককেই ছাঁটাই করা হইবে। পুরাতন শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা কাজ পাইবেন তাহাদেরও পুরাতন সার্ভিস বাতিল করিয়া নূতন ভর্ত্তি হিসাবে গণ্য করা হইবে। তাহার উপর তাহাদের একটি করিয়া বণ্ড বা দাসখৎ সহি করিতে হইবে। দাসখতে লেখা থাকিবে কোম্পানীর কোন হুকুম কেহ অমান্য করিতে পারিবে না।

মালিক এক ধোঁকা দিয়াছেন যে তিনমাস পর্য্যন্ত শ্রমিকদের স্বভাব পরীক্ষা করা হইবে। সন্তোষজনক বোধ হইলে পুরাতন সার্ভিস বহাল হইবে।

কোম্পানীর এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় টি-ইউ দালালরা ময়দানে নামিয়াছে ও প্রচার সুরু করিয়াছে বণ্ডে সহি দাও। সহি দিয়া কারখানা খোলা হোক।

এই প্রচার সুরু করার পূর্ব্বে লক-আউটের সমগ্র ৫২ দিন যাবৎ পটারী শ্রমিকদের উপর অকথ্য পুলিস অত্যাচার চালানো হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিস গাড়ী প্রত্যহ শ্রমিকদের উপর হামলা করিয়াছে। বেতার ভ্যান সমস্ত এলাকা টহল দিয়া বেড়াইয়াছে। পটারী শ্রমিকেরা মিটিং করিতে গেলেই গাড়ী গাড়ী পুলিস আসিয়া তাহাদের ঘেরাও করিয়াছে। সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করিয়াছে। ২৩১ জন সাধারণ শ্রমিক ধৃত হইয়াছেন। তাহাদের নামে মামলা চলিতেছে!

মালিক ও জাতীয় টি, ইউ দালালরা ভাবিয়াছিল এই ফ্যাসিস্ট অত্যাচারে শ্রমিকদের মনোবল ভাঙা সম্ভব হইবে।

কিন্তু তাহাদের সমস্ত পৈশাচিক আশাকে ছাই করিয়া বাহাদুর পটারী শ্রমিকেরা এই ৫২ দিন যাবৎ যে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ চালাইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের অভিজ্ঞতা তাহাদের পূর্ব হইতেই আছে। কালাকানুনের প্রতিবাদে ৫ই জানুয়ারী '৪৭ ধর্ম্মঘট করার সময় হইতে জাতীয় টি-ইউর গুণ্ডারা এবং মিলিটারী তাহাদের ইউনিয়ন অফিস ভাঙ্গিয়া জ্বালাইয়া দেয়। শ্রমিকদের আক্রমণ করিয়া জখম করে। দাঙ্গার সুযোগে মালিক কারখানা হইতে দলে দলে শ্রমিক ছাঁটাই করেন। সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া বেতন বৃদ্ধি, ঘরভাড়া, ছাঁটাই ও বরখাস্ত বন্ধ প্রভৃতি শ্রমিকদের প্রত্যেকটি নূন্যতম দাবিকে বাতিল করার চেষ্টা হয়।

কিন্তু ৮ই জুন এই সমস্ত জুলুম অগ্রাহ্য করিয়াই শ্রমিকেরা দাবি তোলেন তাহাদের সদ্য কারামুক্ত শ্রমিক ভাই রামধনীকে কাজে লইতে হইবে। এই দাবির জন্য শ্রমিকেরা পুলিস আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া শহীদ রামলক্ষণ মুনিয়াকে হারায়।

শহীদ রামলক্ষণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, গুলিচালনার তদন্ত করিয়া অপরাধীদের শাস্তি দিতে হইবে, কোনরূপ ছাঁটাই চলিবে না, এবং অবিলম্বে কারখানা চালু করিতে হইবে, মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে, নেতাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই নূন্যতম দাবিতে শ্রমিকেরা ৫২ দিন যাবৎ মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছেন। লক আউটের ফলে তাহারা অনেকে বেতন পান নাই। পুলিসের গ্রেপ্তার এড়াইয়া যাহারা টিকিয়া আছেন তাঁহাদের ঘরে খাদ্য নাই। কেহ কুলী খাটিয়া, কেহ জুতা সেলাই করিয়া কেহ টুকিটাকি কাজ করিয়া দুমুঠো ভাতের জোগাড় করিতেছেন। রিলিফ কণ্ড যেটুকু বা উঠিতেছে ২০১ জনের মামলার খরচে সরকার তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা উপরের ঐ নূন্যতম দাবিতে অটল আছেন।

জাতীয় টি-ইউর লোকেরা শ্রমিকদের দৃঢ়তা দেখিয়া প্রথমদিকে সরাসরি অন্য কথা পাড়িতে সাহস পান নাই। রামলক্ষণের জন্য ক্ষতিপূরণ চাই, ছাঁটাই করা চলিবে না ইত্যাদি, দাবি স্বীকার করিয়াই শ্রমিকদের ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে মুখোসও থাকিতেছে না। খোলাখুলি ছাঁটাই মানিয়া বণ্ড সহি করার উপদেশ দিতেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডামী করিয়া শ্রমিকদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা চলিতেছে।

হাজার নির্য্যাতনের মধ্যে থাকিলেও এবং অধিকাংশ শ্রমিক পেটের ধান্ধায় অন্যত্র বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকিলেও শ্রমিকেরা ইহার জবাব দিতে দ্বিধা করেন নাই। ১২ই জুলাই জাতীয় টি-ইউর গুণ্ডা নেতা মহাদেব শ্রমিকদের হাতে প্রহৃত হন। বণ্ড সহি করানো শুরু হওয়া মাত্র শ্রমিকেরা আবার লালঝাণ্ডার তলে দাঁড়াইয়া মিটিং করিতে শুরু করিয়াছেন। ২৯শে জুলাই শ্রমিকদের একটি মিটিং পুলিস আসিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আবার জমায়েৎ হইয়া প্রায় ৫০০ শ্রমিকের এক সভা করেন এবং কেহ বণ্ড সহি করিবে না বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহাদের নূতন সংগ্রামের ঘোষণা লইয়া ১০০ শ্রমিকের এক মিছিল ২৯শে জুলাইয়ের সমাবেশে যোগদান করেন এবং ২৯শে জুলাইয়ের ১০,০০০ মানুষের শোভাযাত্রা এই বাহাদুর শ্রমকিদের নেতৃত্বেই সমস্ত ট্যাংরা ও ইণ্টালী এলাকা পরিভ্রমণ করে।

মালিক ছাঁটাই করিয়া কারখানা চালু যাহাতে না করিতে পারে তজ্জন্য পটারী শ্রমিকেরা নূতন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

চা বাগান শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিয়া দাবীর প্রতিশ্রুতি আদায়

চট্টগ্রামে ৩ শত মরদ ও মেয়ে মজুরের বীরত্বপূর্ণ লড়াই

চট্টগ্রাম কৈয়াছড়া, কৈর্য়াপুকিয়া ও ডলু বাগানের চা-শ্রমিকগণ ১১ই জুলাই হইতে ১৩ই জুলাই ধর্ম্মঘট করিয়া কয়েকটি আংশিক দাবীর প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন। ৩০০ মরদ ও মেয়ে মজুর এই ধর্ম্মঘটে বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মত শ্রমিকদের নিম্নলিখিত দাবী কয়টি মানা হইয়াছে :—

(ক) আগে ৬৪ নলের বদলে এখন ৪০ নল জঙ্গল কাটার নিরিখ হইবে;
(খ) আচলের ৫ সের চা বাদ দেওয়া বন্ধ হইবে; (গ) ২ বেলা কাজে মেয়েদের ৸০ আনা ও পুরুষরা ১৲ টাকা পাইবেন; (ঘ) ১৫ দিনের প্রস্তুতি-ভাতা দেওয়া হইবে; (ঙ) এক সপ্তাহের মধ্যে শ্রমিকদের রেশনদরে কাপড় সরবরাহ করা হইবে এবং (চ) ডাক্তার ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হইবে।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কোম্পানী এই দাবীগুলি মানে নাই; ম্যানেজার ও দারোগাই গ্রেপ্তার, মারধর ও গুলি করিবার ভয় দেখাইয়াও ধর্ম্মঘট কোনক্রমে ভাঙ্গিতে না পারিয়া ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক অনুমোদনের সর্ত্তে এই দাবীগুলি মানিয়া নিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

মেয়ে-মরদ সকল শ্রমিক তাই নিশ্চিন্তে বসিয়া না থাকিয়া প্রতিশ্রুতি খেলাপ করিলে আরও দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম্মঘটের জন্যই প্রস্তুত হইতেছেন।

তবুও ১১ই-১৩ইর ধর্ম্মঘট শ্রমিকদের বহু অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়াছে। প্রতিশ্রুতি ছাড়াও সেই অভিজ্ঞতাই তাঁহাদের প্রধান সম্পদ।

প্রায় একমাস আগে ১৫ই জুন শ্রমিকরা লেবার কমিশনারের কাছে গণদরখাস্ত করিয়া তাঁহাদের দাবী মানা না হইলে ষ্ট্রাইক নোটিস দেয়। কর্তৃপক্ষ দাবী সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া দমননীতির জন্য পুলিস পাঠায়। বাগানের ম্যানেজার এ-ডি-এমকে বলে যে কমিউনিস্টরা ছুমছুম ষ্ট্রাইক উস্কাইয়া কোম্পানী ও সরকারের ক্ষতি করিতে চায়। এ ডি-এম পুলিস সাহেবকে লিখিত হুকুম দেন নেতৃস্থানীয় সমস্ত মজুরকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখ।

দারোগা, পুলিস ও সহর হইতে গোয়েন্দারা আসিয়া চারিদিকে লিকলিক করিতে থাকে। কিন্তু তবু ১০ই জুলাই রাত্রে পোস্টারে ধর্ম্মঘটের কথা ঘোষিত হয় এবং ১২ই জুলাই ধর্ম্মঘট শুরু হইয়া যায়। কলঘরের চাবি লইয়া গুদামবাবু আসিলে ভলাণ্টিয়ারগণ তাঁহাকেও সরিয়া পড়িতে অনুরোধ করেন। তিনি চলিয়া যান। চৌকিদার, সর্দ্দার, দালাল কেউই কাজে ঢুকিতে সাহস করে না। দুপুরে মেয়েদের মিটিং হয়। পূর্ব্বেই লড়াই কমিটি গঠিত হইয়াছিল।

শ্রমিকদের জমাট একতা দেখিয়া দালালরা কাজে ঢুকিতে পারে নাই কিন্তু তলে তলে নানা কৌশলে প্রচার চালাইতে থাকে। তাহারা বলে—পোস্টারগুলি লাল কালিতে লেখা ভাল হয় নাই, সকলে কমিউনিস্ট বলিবে। জঙ্গী শ্রমিকগণ জবাব দেন আমাদের রক্তেই পোষ্টারগুলি লেখা হইয়াছে।

এই সময় গুজব রটে যে, পুলিস ২৭।২৮ জন জঙ্গী মজুরকে গ্রেপ্তার করিবে। দারোগা কতগুলি নাম বাছাই করিয়া তাহাদের বাংলোতে ডাকিয়া পাঠান। ১২ই তারিখ ৯ টার মধ্যে দেখা করার জন্য ৩ বার তাগাদা পাঠানো হয়। শ্রমিকরা জানান যে, বাংলোতে কেহ যাইবে না; দারোগা কলঘরের সম্মুখে সকল শ্রমিকের সঙ্গে দেখা করিতে পারেন।

অনন্যোপায় দারোগা কলঘরের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন—সকলে কেন আসিয়াছে? মজুরগণ জবাব দেন কত লোককে ধরিতে পার দেখিতে আসিয়াছি। ম্যানেজার ও দরোগা চৌকিদার ও দালালদের সঙ্গে কানাঘুষা পরামর্শ করিয়া বুঝিলেন লিস্ট করা লোকদের এরেষ্ট করিলে আগুন জ্বলিবে। তখন দারোগা ও ম্যানেজার অন্য পথ ধরিলেন।

দারোগা বলিলেন—আপনাদের দাবী ন্যায় সঙ্গত; আমি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কোম্পানীকে জানাইয়া বুঝাইয়া বলিব; এক মাসের সময় চাই।

দালালরা তখনই সরব ও সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং তাহাদের চেষ্টাতেই শ্রমিকরা ১৫ দিনের সময় দিয়া ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারে রাজী হইয়া যান।

জঙ্গী শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার জন্য যে দারোগা আসিয়াছিলেন, সে কাজে অসমর্থ হইয়াই তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির মূল্য যে কত দুর্ব্বল, শ্রমিকরা তাহা আলোচনা করিতেছেন।

মঞ্জিল

কুলটি ও বার্নপুর লোহা কারখানায় ডিপার্টে ডিপার্টে খণ্ড-সংগ্রাম

মালিকের নূতন নূতন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

কুলটি ও বার্নপুরের লোহা কারখানার শ্রমিকরা গত এক দেড় মাসে ডিপার্টে ডিপার্টে অনেক ছোটখাট লড়াই চালাইয়াছেন। ইহা হইতেই আসন্ন ঝড়ের আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইব্যুনালের রায় বাহির হইবার পর কংগ্রেসী সরকারের শ্রম-নীতি সম্পর্কে শ্রমিকদের মোহ কাটিয়া গিয়াছে। শ্রমিকদের রোজগার বাড়া তো দূরের কথা, তাহাদের জীবনধারণের উপর কোম্পানীর আক্রমণ কিভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে দেখুন ঃ

(ক) প্রকাশ্যে এবং কৌশলে-গোপনে ছাঁটাই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিছুদিন আগে বার্নপুর ওয়াগন কারখানা হইতে তিন দফায় ৭৫ জনকে 'কাজ নাই' অজুহাত দিয়া ছাঁটাই করা হইয়াছে। মাস্টার রোলের হিসাব হইতে দেখা যায়, নানা অজুহাতে প্রায় ২০০০ শ্রমিককে কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বয়লার খারাপ বা কাজ না থাকার অজুহাতে গত এক বছরে ১৫০০ শ্রমিককে "লে-অফ" পন্থায় নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে।

(খ) প্রফিট শেয়ারিং বোনাসের নামে শ্রমিকদের ধোঁকা দিবার জন্য যে সামান্য টাকা শ্রমিকদের দেওয়া হইয়াছিল বর্তমানে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রডাকসন বোনাসের নামে যে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হইতেছিল তাহার পরিমাণও ক্রমানো হইতেছে [কুলটি কোকওভেন শ্রমিকদের দৃষ্টান্ত]। নূতন গ্রেড তৈরী হইতেছে এই ধাপ্পা দিয়া প্রায় সমস্ত শ্রমিকের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ রাখা হইয়াছে। ক্যাস ডিপার্টের স্টাফ স্পেশাল ভাতা হিসাবে ১০৲ পাইত, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(গ) অথচ শ্রমিকের সংখ্যা কমানোর ফলে প্রত্যেক শ্রমিকের কাজের বোঝা বাড়িয়াছে; ডিসিপ্লেনের নামে কথায় কথায় তাহাদের উপর চার্জ্জ সীট আসিতেছে; ছুটি সম্পর্কে কড়াকড়ি সুরু হইয়াছে, কেহ ছুটি হইতে ফিরিতে দেরী করিলে তাহাকে ছাঁটাই করা হইতেছে; মেডিক্যাল আনফিটের নামে ছাঁটাই চলিয়াছে। এইভাবে মালিকের আক্রমণে জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিতেছে।

এই আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে কয়েকটি সংগ্রামে।

কুলটির কোকওভেন্সের শ্রমিকদের প্রোডাকসন বোনাস হঠাৎ ৩ টাকা হইতে কমিয়া ২ টাকা করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডিপার্টের প্রায় ৪০০ শ্রমিক 'স্লো-ডাউন ষ্ট্রাইক' করিয়া উৎপাদন প্রায় অর্দ্ধেক করিয়া দেন।

ষ্টীল কাস্টিং কারখানার ১৪০০ শ্রমিকের "স্লো ডাউন ষ্ট্রাইক" এখনো চলিতেছে। ঐ একই কাজের জন্যে মেইন কারখানার শ্রমিকরা যেখানে ১৷৵০ রেট পান সেখানে ইঁহাদের দেওয়া হয় ১৷৷০।

কুলটির বিজলী ডিপার্টের ৫০০ শ্রমিক ও রেট বৃদ্ধির দাবীতেই "স্লো-ডাউন ষ্ট্রাইক" চালাইয়া যাইতেছেন।

বার্নপুর ষ্টীল ও স্কবের ক্যাশ ডিপার্টের ২০ জন স্টাফ স্পেশাল ভাতা বন্ধ করায় ওভার টাইম খাটিতে অস্বীকার করেন। সমস্ত কর্ম্মচারী ইহাদের লড়াইয়ে সমর্থন জানান।

বার্নপুর স্কব কারখানার এম-ই ডিপার্টের ফিটাররা হরতাল করেন। শ্রমিকদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোককে ইনচার্জ্জ পদে প্রমোশন না দিয়া জবরদস্তি একজন শিক্ষানবীশকে প্রমোশন দেওয়ার প্রতিবাদে এই হরতাল হয়। বি-শিফ্‌টের ফিটাররা মেসিনের উপর চুপচাপ বসিয়া থাকেন। ম্যানেজার নূতন লোক দিয়া অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা করার পর কাজ চালু হয়।

ষ্টীল কারখানার কোকওভেন্সের বি-শিফ্‌টের শ্রমিকরা গত সপ্তাহে একদিন কারখানায় ঢুকিবার পর কাজ বন্ধ করিয়া ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। একজন মজুরকে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে এই ঘেরাও হয়। ম্যানেজার শ্রমিকটিকে কাজে পুনর্ব্বহাল করিতে বাধ্য হন।

ডিপার্টে ডিপার্টে এই সকল সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকরা 'জাতীয়' টি-ইউ-সি ও সমাজতন্ত্রী দালালদের সম্পর্কে মোহমুক্ত হইতেছেন। 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালাল জোন সাহেব যখনই শ্রমিকরা লড়াইয়ের কথা বলেন, তখনই গ্রেড সিস্টেম-এর ভাওতা দিয়া তাহাদের ঠাণ্ডা রাখিতে চাহে। এই ধাপ্পা অগ্রাহ্য করিয়া শ্রমিকরা যখনই লড়াইয়ে নামেন, তখনই সে মধ্যস্ততার নাম করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করে, মালিকের পক্ষ হইয়া সময় চায়; লড়াইয়ের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিয়া তাহা দ্বারা গুণ্ডা নিযুক্ত করে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান ভেদ-সৃষ্টি করিয়া এই দালালরা এখনো নিজেদের নেতৃত্ব রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

জোনের উপর শ্রমিকদের আস্থা কমিতেছে দেখিয়া মালিকরা সমাতন্ত্রী নেতাদের ডাকিয়া আনিয়াছে। কংগ্রেসী গবর্নমেণ্ট তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; তাহারা মুখে জোনের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে কোম্পানীর বা কংগ্রেসী সরকারের সম্পর্কে মোহ বিস্তার করে।

শ্রমিকরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন যে, শক্তিশালী লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন না থাকার জন্যেই কোম্পানী ও কংগ্রেসী সরকার এত সহজে আক্রমণ করিতে সাহস করে। শ্রমিকদের মধ্যে লালঝাণ্ডার প্রভাব দিন দিনই বাড়িতেছে।

উত্তরপাড়া হিন্দুস্থান মেশিনারীতে শ্রমিকদের 'রামরাজত্ব' উপভোগ

'হিন্দ স্থান মেশিনারী' হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার একটি ছোট্ট লোহাকারখানা। ৩০০ শ্রমিক এখানে কাজ করেন। এই কারখানার ডিরেক্টার বোর্ডের নেতৃস্থানীয় সভ্যদের মধ্যে একজন হইলেন পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ।

একেবারে খাস 'রামরাজত্ব'!

কারখানাটি ছোট, কিন্তু মালিকের দাপট অনেক বেশি—শ্রমিকদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন বড় বড় কারখানাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন গড়ে ৫৫৲ টাকা; পুরা এক বৎসর চাকরী না হইলে কাহাকেও প্রোডাক্সন বোনাস দেওয়া হয় না; পুরাতন শ্রমিকদেরও ছলে বলে কৌশলে বদলীওয়ালায় পরিণত করে; শ্রমিকদের আট ঘণ্টার বেশি খাটানো হয়—ওভার টাইম খাটুনির জন্য কোন মজুরি নাই। কথায় কথায় মজুর ছাঁটাই এ কারখানার রেওয়াজ—ম্যানেজারের মেজাজ সব সময়েই সপ্তমে চড়িয়া থাকে।

কংগ্রেস সরকারের দালাল সোস্যালিস্ট পার্টি নিজেদের ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এখানে একটা ইউনিয়ন গড়িয়াছিল; কিন্তু সে ইউনিয়ন সোস্যালিস্ট পার্টির অফিসের ফাইলে-ই রহিয়া গিয়াছে—মজুরদের দাবীদাওয়া লইয়া কোন আন্দোলনই এই ইউনিয়ন করে নাই।

কিন্তু শ্রমিকেরা তাহার জন্য পিছাইয়া থাকেন নাই—তাঁহারা সংগ্রামের পথেই আগাইয়া চলিয়াছেন।

ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে

গত ২রা জুলাই এই কারখানার ঢালাই ডিপার্টমেণ্টের ছয় জন শ্রমিককে "কাজ নাই" এই অজুহাত দিয়া মালিকেরা ছাঁটাই করে। শ্রমিকেরা এই ছাঁটাই মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। ৩রা জুলাই ঢালাই ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকেরা জঙ্গী কায়দার ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন এবং দাবী জানান যে, অবিলম্বে ছাঁটাইর নোটিস উঠাইয়া লইতে হইবে। **শ্রমিকদের এই সংঘ শক্তির সম্মুখে ম্যানেজার হার মানে—ছাঁটাইর আদেশ বাতিল করা হয়। ছাঁটাই শ্রমিকেরা আবার কাজ করিতে আরম্ভ করেন।**

৪ঠা জুলাই সাধারণ সভা করিয়া শ্রমিকেরা লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন গঠন করেন—ডিপার্টে ডিপার্টে সেই দিনই জঙ্গী কমিটি গঠিত হয়।

কংগ্রেসী বিধানের বিরুদ্ধে

এদিকে কংগ্রেস সভাপতি সুরেন ঘোষের কড়া নির্দ্দেশ আসে ছাঁটাই বাতিল করা চলিবে না! যাহাদের ছাঁটাই করা হইয়াছিল তাহাদের আবার ছাঁটাই করিতে হইবে!

১১ই জুলাই ম্যানেজার আবার সেই ছয় জন শ্রমিককে ছাঁটাই করিল। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিল। শ্রমিকেরা স্থির করিলেন, ছাঁটাই ভাইদের লইয়াই তাঁহারা কারখানায় ঢুকিবেন। ১২ই জুলাই সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া **ছাঁটাই ভাইদের লইয়াই তাঁহারা কারখানায় ঢুকিলেন। সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত তাঁহারা কারখানা দখল করিয়া রাখিলেন।** অফিস ম্যানেজার দালাল লইয়া আসিল; তাহারা শ্রমিকদের উপর হামলা করিতে যাইয়া নিজেরা-ই বিতাড়িত হইয়া আসিল।

টিফিনের সময় শ্রমিকেরা কারখানার বাইরে আসিলেন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলিতে থাকিল। এই সময় যে ওয়ার্কস ম্যানেজার ছাঁটাই করিয়াছে তাহাকে ঘেরাও করিয়া শ্রমিকেরা ছাঁটাই উঠাইয়া নেবার দাবী জানাইলেন। ম্যানেজার তখন ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে লওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় এবং তক্ষুনি ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজের টিকিট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তখন শ্রমিকেরেরা আবার ছাঁটাই ভাইদের লইয়া কারখানায় ঢোকেন।

শ্রমিকের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন

ইতিমধ্যে মালিকেরা পুলিসে খবর পাঠায়। বিকালে পুলিস আসিয়া জোর করিয়া শ্রমিকদের কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতে থাকে।

কারখানা হইতে বাহির হইয়া তাঁহারা সাধারণ সভা করেন এবং সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ছাঁটাই বন্ধ করা এবং ৮০৲ টাকা মূল বেতন, ৫০৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা ও ২০৲ টাকা ঘর ভাড়া এই দাবী লইয়া ১৩ই জুলাই হইতেই সাধারণ ধর্ম্মঘট সুরু করা হইবে।

১৩ই জুলাই সম্পূর্ণ ধর্ম্মঘট হয়। শ্রমিকেরা বিভিন্ন স্কোয়াড করিয়া নিজেদের দাবীদাওয়ার কথা, নিজেদের লড়াই এর কথা জনসাধারণের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে এবং পাশের বোন মিলের শ্রমিকদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে থাকেন। সকলের কাছ হইতে-ই অভূতপূর্ব্ব সাড়া পাওয়া যায়—শ্রমিক, ছাত্র ও জনসাধারণের দানে ধর্ম্মঘটীদের চাঁদার বাক্স ভরিয়া উঠিতে থাকে।

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

৩১শে জুলাই

সাধারণ ধর্ম্মঘটের ঐতিহ্য স্মরণের দিন ২৯শে জুলাই

২৯শে জুলাই। লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও বুলেটের ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসন ভেদ করিয়া ২৯শে জুলাইর তৃতীয় বার্ষিকী আসিয়াছে।

শ্রমিকশ্রেণী ২৯শে জুলাই ভুলে নাই। নলিনী-বিধান সরকারের নির্ম্মম দমননীতি শ্রমিককে দমাইতে পারে নাই। নিরাপত্তা আইনের শাণিত তরবারি শ্রমিককে টলাইতে পারে নাই। গত বছর ২৯শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে এক লাখ শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ময়দানে সমবেত হইয়া বজ্র মুষ্টি তুলিয়া সংগ্রামের শপথ নিয়াছেন। শপথ নিয়াছেন—সরকার-সমর্থিত ধনিকের আক্রমণ রুখিব, জীবন ধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য আর প্রকৃত স্বাধীনতা, জনগণের গণতান্ত্রিক রাজ-সমাজ তন্ত্রের জন্য সুদৃঢ় সংগ্রাম চালাইব।

ইহার পর এক বছর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রমিকের উপর সরকার ও ধনিকের হামলা আসিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণী অপূর্ব্ব বীরত্বের সাথে সে হামলা রুখিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

শ্রমিকের উপর হামলা

এই এক বছরে, বিশেষ করিয়া ৯ই মার্চ্চের পর, প্রত্যেকটি শিল্পে শ্রমিকের জীবনের মানের উপর প্রবল আক্রমণ আসিয়াছে। এমন আক্রমণ আর কোন দিনই আসে নাই। আক্রমণ আসিয়াছে চটকলে, সুতাকলে, রেলে, ইন্‌জিনিয়ারিং, ট্রাম, পোর্ট, মিউনিসিপ্যাল, চা-বাগান, ডাক ও তার, অর্ডনান্স প্রভৃতি সমস্ত শ্রমিকের জীবনের উপর।

ব্যাপক ছাঁটাই, ঘুরাইয়া মজুরি কাটা, মাগ্‌গী ভাতা কমান, গ্রেনশপের সুবিধা তুলিয়া দেওয়া, বোনাসের দাবী অস্বীকার করা, রেশনালিজেশন, কাজের বোঝা বাড়ান, বেপরোয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা, কারখানা বন্ধ করা, তাঁত বন্ধ করা, সমস্ত শিফ্‌ট ও ডিপার্ট বন্ধ করা ট্রাইব্যুনালের রায় নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করা—এমনি ভাবেই প্রতিদিন কোন না কোন কারখানায়, কোন না শিল্পে শ্রমিকদের উপর সরকার ও ধনিক মালিকের বহুমুখী হামলা চলিয়াছে। আর ইহারই সাথে চলিয়াছে প্রচণ্ড দমননীতি ও সন্ত্রাসন। টাটা, বিড়লা, ওয়াকার সাহেবদের এই মুনাফাখোরী প্ল্যানের সামান্য প্রতিবাদেও যখন শ্রমিকশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, তখনই কংগ্রেসী সরকারের চরম দমননীতি নামিয়া আসিতেছে শ্রমিকদের উপর। পুলিসের গুলি, লাঠি, টিয়ারগ্যাস, ব্যাপক গ্রেপ্তার, বিনা-বিচারে আটক হামেশাই চলিয়াছে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, সমস্ত ধর্ম্মঘট বে-আইনী করা হইতেছে, সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা পাকাপাকি কায়েম করা হইতেছে, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের গুণ্ডা লেলাইয়া জঙ্গী শ্রমিকদের উপর হামলা করা হইতেছে। পাইকারীভাবে জঙ্গী শ্রমিকদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইতেছে। মালিকদের মুনাফা রক্ষার কংগ্রেসী সরকার এইভাবেই শ্রমিকদের উপর চরম দমননীতি চালাইতেছে। ইহারই চরম নিদর্শন ৯ই মার্চ্চ রেল শ্রমিক ধর্ম্মঘট দমনে কার্য্যতঃ সামরিক আইন জারি।

শ্রমিকশ্রেণী হামলা রুখিতেছে

কিন্তু এই ফ্যাসিস্ট জুলুম শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গিতে পারে নাই। ২৯শে জুলাইর সুদৃঢ় শপথ টলাইতে পারে নাই। বরং শ্রমিকেরা ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাইর পর এই তিন বছরে পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছেন, সেদিন সংগ্রামের যে হাতিয়ার নিয়া শ্রমিকরা সংগ্রামী ঐক্যের মাঝে আগাইয়া আসিয়াছিলেন সেই সাধারণ ধর্ম্মঘট ছাড়া আজ শ্রমিকের সামনে আর কোন পথ নাই।

শ্রমিকের মনে এই চেতনা বাড়িতেছে বলিয়াই গত বৎসর শ্রমিকরা শোষকদের বিরুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্বের সাথে লড়িয়াছেন।

গত বছরের ২৯শে জুলাইর এক লাখ শ্রমিক কর্ম্মচারীর সমাবেশ সমগ্র শ্রমিক কর্ম্মচারীর মনে উৎসাহ জোগাইয়াছে, সকলকে সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। হাজার হাজার শ্রমিককে লড়াইয়ের পথে নামাইয়াছে।

* লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের ধর্ম্মঘটী কর্ম্মচারীদের সমর্থনে ১৮ই আগস্ট ১৮ হাজার ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট করেন।
* সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকরা মাহিনা বৃদ্ধির দাবীতে একদিন বিরাট সাধারণ ধর্ম্মঘট করেন।
* কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড সিপাহীরা ধর্ম্মঘট করেন, ব্যারিকেড করিয়া সংগ্রাম করেন। পুলিস নির্ম্মম গুলি চালায়। ইহার প্রতিবাদে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৭ হাজার পোর্ট শ্রমিক ধর্ম্মঘট করেন।

তিন সপ্তাহে তিনটি সাধারণ ধর্ম্মঘট! সরকার ও মালিকরা চাহিয়াছিল ২৯শে জুলাইয়ের ঐতিহ্য গুঁড়াইয়া দিতে। শ্রমিকরা তিন তিনটি সাধারণ ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া তাহার উপযুক্ত জবাব দিয়াছেন।

সংগ্রামে নূতন পর্য্যায়

শুধু এই তিনটি সাধারণ ধর্ম্মঘটেই শ্রমিক অভিযান শেষ হয় নাই। পরবর্ত্তী ৬ মাসে শ্রমিকরা আরও বীরত্বের সাথে অনেক সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন।

ফ্যাসিস্ট নিপীড়নের মাঝেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া অমৃত বাজার পত্রিকার কর্ম্মচারীরা কঠোর সংগ্রাম চালাইয়াছেন। ভার্ত্তিয়া, ম্যানসফিল্ড, ইণ্ডিয়া ফ্যান, লিপটন ও অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সাথে লড়াই করিয়াছেন। সস্তা রেশন শপ তুলিয়া দেওয়ার প্রতিবাদে টালা জলকলের শ্রমিকরা বীরত্বের সাথে সংগ্রাম করেন, জলকল দখল করিয়া থাকেন। হাওড়া, হুগলীর সুতাকল ও ইন্‌জিনিয়ারিং কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক বোনাসের দাবীতে ও বরখাস্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যান।

সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসী সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে আলমবাজার জুট শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাধে। শ্রমিকরা কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া কারখানা দখল করিয়া ব্যারিকেড করিয়া থাকেন। পুলিস বেপরোয়া গুলি চালায়। প্রবল সংঘর্ষ চলে। ট্রাইব্যুনালের রায়ের কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে শ্রমিকরা পরিষ্কার বুঝিতে চাহিয়াছিলেন; মালিকরা তাহা অস্বীকার করে। তাহারই ফলে এই সংঘর্ষ। সামান্য দাবীতে পর্য্যন্ত শ্রমিকদের সংগ্রাম কোন্ পর্য্যায়ে উঠিতে পারে, ইহা তাহারই নিদর্শন। শ্রমিকদের মনোভাব আজ কি আকার নিতেছে ইহা তাহারই ইঙ্গিত।

বেপরোয়া চার্জ্জশীট ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, গ্রেনশপ তুলিয়া দেওয়া, ঘুরাইয়া মজুরি কাটা প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা অনেক গণ-সংগ্রাম চালাইয়াছেন। কলিকাতার ট্রাম শ্রমিক, খড়্‌গপুর ও লিলুয়ার রেলশ্রমিক, গার্ডেনরীচ রেল অফিসের কর্ম্মচারী, দার্জ্জিলিং ও ডেঙ্গুয়াঝাড়ের চা-বাগান শ্রমিক এবং আরও অনেক কারখানায় শ্রমিকরা বীরত্বপূর্ণ গণ-সংগ্রাম করিয়াছেন।

৯ই মার্চ্চের শিক্ষা

৯ই মার্চ্চ। কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, পুলিস ফৌজ, সরকারী দমনযন্ত্রের এই বিরাট সাঁজোয়া দিয়া সেদিন নেহরু সরকার সাময়িক জয়লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল ভাঙ্গিতে পারে নাই। সেদিনকার ফ্যাসিস্ট দমননীতি অদূরভবিষ্যতের বিরাট ঝড়ের মেঘ জমাইয়া দিয়াছে! শ্রমিকশ্রেণী সেদিন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে, নেহরু সরকারের নগ্ন ফ্যাসিস্ট চেহারা, দেখিতে পাইয়াছে, শ্রমিকের সামান্য দাবীর উত্তরে ধনিকশ্রেণী ও তাহার সরকার প্রকাশ্য গৃহ যুদ্ধের রক্তাক্ত পথের সূচনা করে। শ্রমিকশ্রেণী ৯ই মার্চ্চ হইতে এই শিক্ষাই পাইয়াছেন যে, আরও দৃঢ়তার সাথে, সাহস ও বীরত্বের সাথে, নূতন পর্য্যায়ে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই।

তাই ঠিক ৯ই মার্চ্চের পর ন্যাশনাল আইরন এণ্ড ষ্টীল কোম্পনীতে, নয়া ইন্‌জিনিয়ারিং-এ, পানাগড় অর্ডনান্স ডিপোতে, লিপটনে, শিবপুর চটকলে, কাশীপুর ন্যাশনাল কার্ব্বনে, পটারী এলেনবেরীতে, বি, এন, আর গ্যাংম্যানদের মাঝে অসংখ্য শ্রমিক নূতন কায়দায় মরণ তুচ্ছ করিয়া সংগ্রাম চালাইয়াছেন। ছাঁটাইর হুকুম অস্বীকার করিয়া তাঁহারা কারখানায় ঢুকিয়াছেন। লক-আউট ভাঙ্গিয়া কারখানা দখল করিয়াছেন। পুলিসের কবল হইতে গ্রেপ্তার করা কর্ম্মীদের ছিনাইয়া আনিয়া দমননীতি রুখিয়াছেন।

এমনি করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর বীর-সন্তানরা দেখাইয়া দিয়াছেন—২৯শে জুলাইর ঐতিহ্য তাঁহারা ভুলেন নাই; সে ঐতিহ্যকে আত্মত্যাগ ও বুকের রক্ত দিয়া নূতন পর্য্যায়ে উঠাইয়া নিয়া চলিয়াছেন।

এই অপূর্ব্ব বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ভিতর দিয়াই এবারকার ২৯শে জুলাই আসিয়াছে।

সারা ভারতে

শুধু বাংলা দেশেই নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন। চরম দমননীতির সামনে দাঁড়াইয়া শ্রমিকশ্রেণী যে দৃঢ়তা, ঐক্য ও সংগ্রামী মনোবলের পরিচয় দিতেছেন, তাহা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব।

* কোয়েম্বাতুরের ৩৮ হাজার সুতাকল শ্রমিক রেশনালিজেশনের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ৪ মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট চালাইয়া গিয়াছেন।
* নাগপুরের ৩০ হাজার সুতাকল শ্রমিক সরকারী এনকোয়ারী কমিটির প্রতিক্রিয়াশীল রায়ের বিরুদ্ধে ২ মাস ধর্ম্মঘট সংগ্রাম করিয়াছেন।
* এস, আই, রেলের ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান মজুরি কাটার বিরুদ্ধে ৩ সপ্তাহ ধরিয়া ধর্ম্মঘট চালাইয়াছেন।
* গ্রেনশপ বন্ধের বিরুদ্ধে আসামের রেল-শ্রমিকরা সুদীর্ঘ ধর্ম্মঘট চালাইয়াছেন।
* কোলার সোনাখনির ২৫ হাজার শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ৬০ দিন ধর্ম্মঘট চালাইয়াছেন।
* বোম্বাইর ফায়ারস্টোন রবার ও টায়ার কারখানার শ্রমিকরা ৪ মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট সংগ্রাম করিয়াছেন।
* বোম্বাই কর্পোরেশনের ১৫ হাজার ধাঙ্গড় ১৩ই মে হইতে সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতেছেন।

বিভিন্ন প্রদেশে এমনি আরও অনেক ধর্ম্মঘট সংগ্রাম চলিতেছে। শুধু কয়েকটির উল্লেখ করা হইল মাত্র।

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শ্রমিকের রামরাজত্ব উপভোগ

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

রামরাজত্বের মহিমা!

পরের দিন স্বয়ং এস, ডি, ওর নেতৃত্বে ধর্ম্মঘট ভাঙার জন্য সশস্ত্র পুলিসবাহিনী আসিয়া হাজির হয়। বেপরোয়া গ্রেপ্তার, অত্যাচার উৎপীড়নে তাহারা বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে। শ্রমিকেরা তখন পিছু হটিতে বাধ্য হন। পরের দিন হইতে পুলিসের সাহায্যে মালিকেরা মিল চালাইতে সক্ষম হয়।

কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়া, এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়া মজুরের চেতনা আরো শতগুণ বাড়িয়া গেল—তাঁহারা দেখিলেন মিল মালিক আর কংগ্রেস সরকারের যোগাযোগ জিনিসটা কি?

আজ তাই তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতেছেন—লালঝাণ্ডা যে বলিয়াছিল কংগ্রেসী সরকার আর নেহরু-বিধান প্রভৃতি ধনীদের দালাল তাহা ঠিক; মালিকদের সাহায্যের জন্য কংগ্রেসী সরকার বারে বারে পুলিস পাঠাইবে।

এইভাবেই কারখানার শ্রমিকরা আজ নেহরু সরকারকে, বিধান মন্ত্রিসভাকে চিনিতেছেন।

জীবিকা ও মজুরির জন্য বিভেদ ও দমননীতি ব্যর্থ করিয়া সংগ্রামের একটি বছর—

(১০ পৃষ্ঠার পর)

ইহার প্রত্যেকটি সংগ্রামই অপূর্ব্ব বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। ইহার আগে আর কোন দিনই এমন প্রচণ্ড দমননীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করিতে হয় নাই।

দমননীতির বিরুদ্ধে

কোয়েম্বাতুরে ১০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে। কোলার খনিতে ৪০০ শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বোম্বাই ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটীদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৮০০। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সোস্যালিস্ট নেতৃত্ব ইহার প্রত্যেকটি সংগ্রামে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে। শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে শ্রমিকরা দমেন নাই। নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের নেতৃত্বে লালঝাণ্ডার নীচের দাঁড়াইয়া শ্রমিকরা বিভেদকারীর ষড়যন্ত্র ও পুলিসের দমননীতি ব্যর্থ করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন।

শ্রমিকদের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলেই আজও ভারতের শত শত কারখানায় লাখ লাখ শ্রমিক চাকুরীতে বহাল আছেন। আজও সমগ্র শিল্পে প্রকাশ্যে রেশনালিজেশন চালু করা হয় নাই; ইচ্ছাসত্বেও বেশীর ভাগ মালিকই আজও সর্ব্বক্ষেত্রে মজুরি কাটিতে পারে নাই।

এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের বিপুল ফ্রন্টই ধনিকের পথ রোধ করিয়াছে। তাহাদের হামলার পরিকল্পনা বিলম্বিত করিয়াছে, থামাইয়া দিয়াছে, বানচাল করিয়াছে বহুক্ষেত্রে ধনিকদের পিছু হটিতে ও সুবিধা দিতে বাধ্য করিয়াছে। ধনিকরা একদিকে ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছে, অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর এই বিপুল সংগ্রামী শক্তির পরিচয়ে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

'শিল্পে-শান্তির' মুখোস ছিন্ন

'শিল্পে-শান্তি'র নামে শ্রমিকবিরোধী যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করা হইয়াছিল, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের আগুনে তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। সরকার, ধনিক, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সোস্যালিস্টরা মিলিয়া 'শিল্পে-শান্তির' যে ফাঁদ পাতিয়াছিল, তাহা যে শ্রমিকের বিরুদ্ধে মালিকের নির্ম্মম আক্রমণেরই কৌশলী আবরণ মাত্র, গত বছরের অভিজ্ঞতা দিয়া শ্রমিক শ্রেণী সেকথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন।

* ন্যায্য মজুরি দিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছিল। 'শিল্পে-শান্তি' চুক্তির দেড় বছর পর বলা হইতেছে—বর্ত্তমান মজুরিই ন্যায্য মজুরি।

* ধনিকদের "ন্যায্য মুনাফা"র তুষ্ট থাকিতে বলা হইয়াছিল এবং ইহার বদলে শিল্প জাতীয়করণ না করার গ্যারাণ্টি দেওয়া হইয়াছিল; আজ সমস্ত কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুনাফাখোরী ও চোরাবাজারীর পথের সমস্ত বাধা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। শিল্পের ট্যাক্স কমানো হইয়াছে। এবং আমাদের দেশ শোষণ করার জন্য প্রকাশ্যেই ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিকে সাদর আমন্ত্রণ করা হইতেছে।

* মালিকের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশীদার করা হইবে বলিয়া ঢাক পিটান হইয়াছিল। মালিকের কৃপায় সে প্ল্যানও শিকায় তোলা হইয়াছে।

* সালিশীর রায় মানা হইবে এবং শেষ উপায় হিসাবেই ধর্ম্মঘট করা হইবে—এই কথা স্বীকার করা হইয়াছিল। আজ সালিশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ধনিকের হাতিয়ার—শ্রমিকের সমস্ত অধিকার খর্ব্ব করিবার হাতিয়ার, বর্ত্তমানের নিম্নতম জীবনের মানও কাটিয়া দিবার হাতিয়ার। নাৎসী নেতা গোয়েরিং-এর মতই নেহরু এখন বলিতেছেন, ধর্ম্মঘটের কথা শুনিলেই, বন্দুকের দিকেই আমার হাত যায়।

* আর শ্রমিকের ধর্ম্মঘটের অধিকার? দিল্লীর দপ্তরে নয়া কালা কানুন তৈরী হইতেছে। রেল, যানবাহন, এসেনশিয়াল সার্ভিস, ডাক-তার, পোর্ট-ডক, অর্ডনান্স প্রভৃতিতে যে কোন ধর্ম্মঘটই বে-আইনী ঘোষণা করা হইতেছে।

* "উৎপাদন বাড়ানোর" জন্য চীৎকার করিয়া আকাশ-বাতাস কাঁপান হইয়াছিল। আর আজ, স্টক জমিতেছে বলিয়া আমেদাবাদ ও বোম্বাইতে সূতাকল বন্ধ হইতে চলিয়াছে, অথচ কোটি কোটি লোকের পরণের নেংটি জোটে না। এবং কল বন্ধের সম্ভাবনায় ৫০ হাজার সূতাকল শ্রমিক বেকার হইতে চলিয়াছেন।

চটকলে শতকরা ১২॥ ভাগ তাঁত বন্ধ করা হইয়াছে। ৪ সপ্তাহে এক সপ্তাহ কল বন্ধ রাখা হইতেছে। অর্ডনান্স কারখানায় ১০ হাজার দক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করার প্ল্যান হইয়াছে। ৫০ হাজার রেল শ্রমিককে 'বাড়তি' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

'জাতীয়' টি-ইউ ও সোস্যালিষ্টদের বিশ্বাসঘাতকতা

'শিল্পে শান্তির' মুখোস এমনি নগ্ন ভাবেই আজ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। "শান্তির" অংশীদার 'জাতীয়' ট্রেড ইউনিয়ন ও সোস্যালিস্ট নেতারা পর্য্যন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। কখনো তাহারা হুমকি ছাড়িতেছে যে, মালিকেরা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করিতেছে; কখনো তাহারা হাত জোড় করিয়া নেহরুর নিকট আবেদন করিতেছে, সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, একটা কিছু কর, নহিলে শ্রমিকরা সব কমিউনিস্টদের ঝাণ্ডার নীচে চলিয়া গেল।

কিন্তু ইহাদের দিন ঘুরিয়াছে। 'হুমকি' আর 'আবেদনে'ও এখন কুলাইতেছে না। দেবেন সেন, খান্দুভাই দেশাই, অশোক মেহতা আর রুইকরদের মুখোস খুলিয়া পড়িতেছে। শ্রমিকরা নিজেদের দাবীর সমর্থনে যে সংগ্রাম চালাইতেছেন, তাহার প্রত্যেকটি সংগ্রামে ইহারা, বিশ্বাসঘাতকতা করায় শ্রমিকদের নিকট ইহাদের চেহারা নগ্নভাবেই ধরা পড়িয়া যাইতেছে। ৯ই মার্চ্চ ইহারা প্রকাশ্যেই গুপ্ত পুলিসের সাথে সহযোগিতা করে, স্পাই ও পুলিসের গুপ্তচরের কাজ করিয়া জঙ্গী শ্রমিকদের ধরাইয়া দেয়।

শ্রমিকদের কে মিত্র আর কে শত্রু তাহার বিচার হয় কথায় নয় কাজে। শ্রমিকরা জানেন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সোস্যালিস্ট নেতারা "শান্তি"-চুক্তিতে সহি দিয়াছেন শ্রমিকের বুকের রক্ত চিরিয়া নিয়া। **শ্রমিকরা ভাল করিয়াই জানেন, শ্রমিকদের সত্যিকারের বন্ধু লালঝাণ্ডা ও নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া ইহারাই লাঠি খাইয়াছেন, গুলির মুখে প্রাণ দিয়া শহীদ হইয়াছেন। ২৫ হাজার লালঝাণ্ডা শ্রমিকনেতা কারা প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ হইয়াছেন। শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধি এই লালঝাণ্ডা। নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।**

২৯শে জুলাইর তৃতীয় বার্ষিকীতে শ্রমিকশ্রেণী নিজের দুর্ভেদ্য শক্তি ও সুনিশ্চিত জয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিবেন। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুরা যতই কঠিন শিকলের নাগ পাশে শ্রমিকদের বাঁধিবার চেষ্টা করুক না কেন, শ্রমিকশ্রেণীর দুর্জ্জয় শক্তির জোরে আগামী বছর সে শৃংখল ছিঁড়িয়া খান খান হইয়া যাইবে; শিল্পে শান্তির ষড়যন্ত্র জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। আর সেই সাথে শিল্পে-শান্তির রচয়িতাদেরও স্থান হইবে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায়।

৩১শে জুলাই

বাস্তুহারাদের বিরাট মিছিল

"ভাত-কাপড়-শিক্ষা দাও নইলে গদী ছেড়ে দাও" ধ্বনিতে পঃ বঙ্গের মেহনতি জনতার সহিত মিলিত সংগ্রামের ঘোষণা

"বাস্তহারা আন্দোলনের কাছে ১৪ই তারিখটি অবিস্মরণীয় হইয়া রহিল।"

"১৪ই জানুয়ারী পণ্ডিত নেহরু যখন কলিকাতার ময়দানে অহিংস বুদ্ধের শিষ্যদ্বয়ের অস্থিঃপূজার মেলা বসাইয়াছিলেন, সেসময়ই শিয়ালদহ স্টেশনে বাস্তহারা নারী বৃদ্ধ শিশুর উপর প্রথম গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস চলে। বাস্তহারাদের কঠিন মোহমুক্তির উহাই প্রথম দিন।"

"আবার ১৪ই জুলাই। ময়দানে এই দিনও পণ্ডিত নেহরুর সভা। প্রায় ৭ শত বাস্তহারা নরনারী শিয়ালদহ স্টেশনে মিছিল নামাইতে যাইয়া কংগ্রেসী সরকারের টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হইলেন।"

"কিন্তু ১৪ই জানুয়ারী ও ১৪ই জুলাই-এ অনেক তফাৎ। ১৪ই জুলাই জনতা নেহরুর কাছে ভিক্ষার ঝুলি হাতে আসেন নাই, আসিয়াছিলেন জবাবদীহির জন্য।"

গত ২৮শে জুলাই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বাস্তহারাদের বিরাট সভার বক্তার পর বক্তা এই মোহমুক্তির ইতিহাস ও কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন।

বক্তারা বলেন: কিন্তু উহারই সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র জমায়েতের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তহারাদের সম্মিলিত মোর্চ্চা। এই দরিদ্র জনতা ভারতভূমিতে বাস্তহারা না থাকিয়া কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীকেই বাস্তুচ্যুত করিবে।

বাস্তহারা ক্যাম্পের প্রতিনিধিরা বর্ণনা করেন: পতিত জমি দখল করিয়া তাহারা কোথায়ও কোথায়ও যে বাসস্থান গড়িয়াছেন, কংগ্রেস সরকার তাঁহাকে বে-আইনী বলিতেছেন। জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'পবিত্রতা' শাসকদের অন্ধ করিয়াছে।

সভার পর ১ হাজার লোকের একটি মিছিল আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড দিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে শেষ হয়। তাঁহাদের পোস্টার ও স্লোগান ছিল—"ভাত-কাপড়-শিক্ষা দাও নইলে গদী ছেড়ে দাও।"

শোলাপুরে ২০ হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

১৭ই জুলাই শোলাপুরের ২০ হাজার সূতাকল শ্রমিক লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১ দিনের ধর্ম্মঘট করেন।

বিষ্ণু এবং নারসিংগুজ্জা মিলে কয়েক শত শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। ইহার প্রতিবাদে এবং মজুরি কাটার বিরুদ্ধে ১০ই জুলাই হইতে ঐ দুইটি মিলের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়া আছেন।

ইহাদেরই সমর্থনে শোলাপুর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এক দিনের ধর্ম্মঘটের ডাক দেন।

কংগ্রেস নেতা, মালিক ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ একযোগে ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। স্বয়ং বোম্বাইর প্রধানমন্ত্রী খের কমিউনিস্টবিরোধিতার ধূয়া তুলিয়া হুংকার ছাড়েন।

১৭ই জুলাই শ্রমিকরা ইহার যোগ্য উত্তর দেন। সকাল ৭টায় শ্রমিকরা মিল গেটে আসেন এবং মিলে ঢুকিয়া পড়েন। ১০।১৫ মিনিট পর সমস্ত মিলের শ্রমিকরা একযোগে মিল হইতে বাহির হইয়া আসেন। কেবল জাম ও লক্ষ্মী মিলের শ্রমিকরা বাহিরে আসিতে পারেন না। কারণ মালিকরা সমস্ত গেটে শক্ত তালা লাগাইয়া দেয় ও গেটে শসস্ত্র পুলিস পাহারা রাখে।

২০ হাজার শ্রমিকের এক বিরাট মিছিল বাহির হয়। এবং মিছিল শেষে কমরেড কুলকারণীর সভাপতিত্বে সভা হয়।

১১ জন ছাত্র-শহীদের স্মৃতি-চিহ্নিত রাজপথে ছাত্রদের মিছিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৯৬,০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে সংগঠিত করিয়াছেন।

হায়দরাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর, বিহার ও মালাবার, বোম্বাই ও অন্ধ্র, কর্ণাটক, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলা—ভারতের বিভিন্ন জায়গার এই সংগ্রামী প্রতিনিধিরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

"যে সরকার প্রত্যেকটি মানুষকে শিক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে স্কুলের বেতন বাড়াইয়া দিয়া, পরীক্ষায় ফেলের হার বাড়াইয়া দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে গরীবের ছেলেদের শিক্ষা জীবন হইতে বাহির করিয়া দেয়—যে সরকার মানুষকে বাঁচার দাবী তুলিলে আক্রমণ করে, যে সরকার মুষ্টিমেয় কয়জন লোভীর জন্য দেশে বেকারী বাড়াইয়া তুলিতেছে—সে সরকার জনসাধারণের সরকার নহে। ক্রমবর্দ্ধমান সংকটের মুখে এই ধনিকশ্রেণীর সরকার ছাত্রদের শিক্ষার উপর আরও আঘাত হানিবে—শ্রমিকদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিবে, বেকারী আরও বাড়াইয়া তুলিবে ইহারই বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে শিক্ষা, গণতন্ত্র ও শান্তির এই লড়াইকে আরও তীব্র, আরও ব্যাপক করিয়া তুলিতে হইবে। এই লড়াইয়ের পিছনে আরও বৃহৎ ছাত্র সমাবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের সঙ্গে হাত মিলাইয়া আরও বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইতে হইবে।"

গত ২৬শে জুলাই সারা ভারতের ছাত্র প্রতিনিধিরা ১০,০০০ ছাত্র, শ্রমিক ও গরীব মধ্যবিত্তের জমায়েতে এই সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেন।

জমায়েতের সংগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের এই ৪,৫০০ জন প্রতিনিধি ও কলকাতার ৫০০ স্বেচ্ছাসৈনিক স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতির পতাকা হাতে মিছিল করিয়া বাহির হন কলকাতার রাজপথে, যে রাজপথের উপর গত দেড় বৎসরে ১১টি ছাত্র শিক্ষা ও গণতন্ত্রের দাবীতে কণ্ঠ তুলিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন।

মিছিল বাংলা ও হিন্দী, তামিল ও উর্দু, ইংরেজী ও মারাঠী বিভিন্ন ভাষায় যে ধ্বনি তুলিয়া অগ্রসর হইল তার অর্থ একই—

শিক্ষা সংকোচন ও দমননীতি, কথনওয়েলথের দাসত্ব ও বেকারীর বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ তৈয়ার হও।

স্বাধীনতা শান্তি ও গণতন্ত্রের লড়াইয়ে অগ্রসর হও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মিছিল আসিয়া উপস্থিত হইলে কলকাতার ছাত্র নেতা বাইরের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

"কমরেডস—এই সেই বিশ্ববিদ্যালয়, এই সেই প্রেসিডেন্সী কলেজ যার ভিতরে গুলি চালাইয়া গত ১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারী কংগ্রেস সরকার ১৪ হইতে ১৯ বছর পর্য্যন্ত বয়সের ৭জন ছাত্রকে হত্যা করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোহার গেট ফুটা করিয়া যে গুলি ছুটিয়াছিল তার চিহ্ন ঐ রহিয়াছে। এখানেই ব্যারিকেড রচনা করিয়া কলকাতার বীর ছাত্ররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু হাতে ইট নিয়া বুলেটের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে।"

শহীদ তাপস ও দীলিপদের স্মরণে ৫ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিছিল আরও বলিষ্ঠ আরও দৃঢ় কণ্ঠে আওয়াজ তুলিল "এই অত্যাচারী শাসনের অবসান চাই"।

বিভিন্ন রাজপথ ঘুরিয়া ছাত্র মিছিল ময়দানে আসিয়া পৌঁছাইল।

সেখানে তখন বিভিন্ন এলাকা হইতে শ্রমিক, গরীব মধ্যবিত্ত, বাস্তুহারা জমায়েত হইয়াছেন—তাদের আওয়াজের সাথে এই সংগ্রামী ছাত্রদের আওয়াজ মিলাইবার জন্য। ছাত্রদের সমাবেশে শ্রমিক, গরীব, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির এই জমায়েত দেখিয়াই আতঙ্কিত রক্ষিতা কাগজগুলি পরের দিন মন্তব্য করিয়াছিল, "ছাত্রদের সমাবেশে অছাত্র দেখা গেল বেশী"।

২৬শে জুলাইর এই গণতান্ত্রিক সমাবেশের কিছুদিন আগে ১৪ই জুলাই ১৮ ফুট মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পাঁচ হাজার সৈন্য ও পুলিস পরিণত হইয়া পণ্ডিত নেহরু যখন "গণ-সংযোগ" করিতেছিলেন তখন কলকাতার চারদিকে ১৪৪ ধারা মারফৎ জনসাধারণের টুঁটি চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। সেদিনই সারা দিনের মধ্যে টালিগঞ্জের শ্রমিক, নৈহাটির বাস্তুহারা, কলকাতার ছাত্র ও মধ্যবিত্তের অন্ততঃ পাঁচটা মিছিলকে লাঠি ও গুলি দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২৬শে জুলাই অত্যাচারিত মানুষ কণ্ঠ তুলিবার সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে সমাবেশে ভীড় করিয়াছেন।

ফেস্টুন, পোস্টার, ছাত্রপতাকা ও লাল পতাকায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

প্রায় ১০,০০০ ছাত্র, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের সমাবেশে ছাত্রনেতারা নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করিলেন।

কলকাতার সংগ্রামী শ্রমিকদের তরফ হইতে একজন শ্রমিক গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের অভিনন্দন জানাইলেন।

দুইমাস কণ্ঠরুদ্ধ থাকার পর মিছিল আবার বাহির হইল, পাঁচহাজার শ্রমিক, ছাত্র ও মধ্যবিত্তের আওয়াজ উঠিল—ভাত, কাপড়, শিক্ষা ও চাকুরীর দাবীতে।

আওয়াজ উঠিল "ধনিকের সরকার—টাটা-বিড়লার সরকারের অবসান কর—গরীবের সরকার কায়েম কর," আওয়াজ উঠিল "কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কর—" "আমাদের ভাই বোনদের মুক্ত কর।" কারখানার শ্রমিক ও স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী সত্তদাগরী অফিসের কেরানী ও বস্তীর মজুর—হাতে ফেস্টুন নিয়া মিছিল করিয়া চলিয়াছে। তাতে লেখা আছে—

"কল-কারখানায় হাঁটাই চলবে না"—
"স্কুল কলেজের ছাত্রদের মাহিনা বাড়ানো চলবে না"
"শিক্ষকদের বাঁচার মত বেতন দিতে হবে"
"বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই"
"বেকারদের ভাতা চাই"
"কমনওয়েলথের দাসত্ব মানবো না"
"দমননীতি ধ্বংস হোক"
"নারী ও ছাত্র হত্তাদের শাস্তি চাই"
"শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র এক হও"
"কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কর ইত্যাদি।

পতাকা ও ছাত্র পতাকা সামনে নিয়া ধর্ম্মতলার রাস্তা দিয়া মিছিল অগ্রসর হইল, ট্রাম বাস থামিয়া গিয়াছে—রাস্তার হাজার হাজার জনতা মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া গিয়াছে—

কলকাতার অন্ততঃ দুই লক্ষ জনতার কাছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আওয়াজ পৌঁছাইয়া দিয়া মিছিল আজাদ হিন্দ বাগে আসিয়া পৌঁছাইল।

স্কোয়ারের এক কোণে এক গরীব মা তার দুইটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া এই কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের মিছিলের আওয়াজ শুনিতেছিলেন। "ভাত কাপড় শিক্ষা দাও নয়তো গদী ছেড়ে দাও"—এই আওয়াজের রেশ তখনও তার কান হইতে মিলাইয়া যায় নাই—ছেলে দুটি জিজ্ঞাসা করিল "মা ওরা কি বোলছে?" "তোমরা যাতে ইস্কুলে যেতে পার, তোমরা যাতে পেট ভরে খেতে পার তার জন্য এই ছেলেমেয়েরা কাজ কোরছে।"

আর পণ্ডিত নেহরু ১৮ ফিট উঁচু ঐ মঞ্চ হইতে ঘোষণা করিয়াছেন—তার সরকারের বিরুদ্ধে বোমা ছুড়িয়া, ট্রাম জ্বালাইয়া কিছু গুণ্ডা নাকি গুণ্ডামী করিতেছে এবং পাঁচহাজার সৈন্য পরিবৃত পণ্ডিত নেহরু জনতাকে আহ্বান করিয়াছেন এই গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে। জনতা দাঁড়াইয়াছে। তবে পণ্ডিতজীর "জনতা" সেদিন পরিচিত গলিগুলির ভিতর আত্মগোপন করিয়াছে, আর উপবাসী জনতা, বেকার জনতা, শ্রমিক ও ছাত্র জনতা দৃঢ় পদক্ষেপে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়াছে, "ধনিক সরকারের অবসান কর"; "শ্রমিক কৃষক রাষ্ট্র কায়েম কর।"

২৯শে জুলাই ১০,০০০ মানুষের বিরাট ঐক্য অভিযান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রীযুত অজয় রায় দাবী তোলেন "কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে।" সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে এবং গুলি-চালনার বে-সরকারী তদন্ত করিতে হইবে।

তিনি বলেন ক্রমবর্দ্ধমান ফ্যাসিস্ট শাসনে বিক্ষুব্ধ হইয়া বংলার জনসাধারণ দাবী তুলিয়াছিল বিধান-নলিনী কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার অবসান চাই। বিপদে পড়িয়া শাসনকর্ত্তারা ধোকা দিয়া ছয়মাস পরে এক নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইতিমধ্যে এই মন্ত্রীসভাকেই কিছু অদল বদল করিয়া বহাল রাখা হইবে। নারী হত্যার পাপে পাপী মন্ত্রীদের আশ্রয় দেয়া হইবে। জনসাধারণ ইহা সহ্য করিবে না।

প্রস্তাবের সমর্থনে অমিতাভ সেন, অজিত বিশ্বাস, ডাকতার শ্রমিকনেতা কে, জি বসু, হাওড়ার শ্রমিকনেতা প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সভায় শহীদ হরেন দাস ও সমস্ত শ্রমিক, কর্ম্মী, নেতা ও অন্যান্য শহীদের নামে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাশেষে এক বিরাট মিছিল এণ্টালী ট্যাংরা ঘুরিয়া পটারী কারখানা এলাকায় যায় ও ঘুরিয়া মৌলালী মোড় পর্য্যন্ত আসে। মিছিল শেষ হওয়ার পর কতিপয় 'জাতীয়' টি-ইউ গুণ্ডা নিঃসঙ একদল মজুরের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া যায়। পটারী শ্রমিকেরা মিছিলের সামনে লালঝাণ্ডা, ছাত্র ঝাণ্ডা ও পঃ বঃ ফরোয়ার্ড ব্লক ঝাণ্ডা লইয়া প্রায় দশহাজার শ্রমিক-ছাত্র-মহিলার এক বিরাট মিছিল এণ্টালী ট্যাংরার শ্রমিক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অসংখ্য পোস্টারে ও ছবিতে ঘোষিত হইতে থাকে গরীব মানুষদের দাবী 'ছাঁটাই করা চলবে না।' 'নিম্নতম বেতন ৮০ টাকা ও অন্যান্য ভাতা চাই।' "রুটির দাবিতে সাধারণ ধর্ম্মঘটের পথে অগ্রসর হও।"

ইহারই সাথে সাথে বড়ো বড়ো পোস্টার চলিয়াছে, "কালাকানুন চলবে না" "ধর্ম্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার চাই।" "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়," "সোভিয়েট-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত ধ্বংস হোক।"

আর ধ্বনি উঠিতেছে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করো। হত্যাকারী মন্ত্রিসভা নিপাত যাক। লালঝাণ্ডাকি জয়!

এণ্টালী ও ট্যাংরার শ্রমিক এলাকা দিয়া মিছিল যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই দুপাশে শ্রমজীবী জনতা ভীড় করিয়া আসিতে থাকে। উদ্ভাসিত মুখে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মানুষেরা মন্তব্য করিতে থাকেন হ্যাঁ তাহারা জানেন, ইহা লালঝাণ্ডার জোলুস, মজদুর পার্টির জোলুস।

পটারী কারখানার নিকট মিছিল আসিলে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠে "পটারীর লড়াই আমাদের লড়াই।" "রামলক্ষণের খুনের জবাব চাই।"

চতুর্দ্দিক হইতে বস্তীর সাধারণ শ্রমিকেরা মিছিলে আসিয়া যোগ দিতে থাকেন। পটারী শ্রমিকদের পিছনে যে কলিকাতার সমস্ত শ্রমিক রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া উৎসাহিত শ্রমিক নওজোয়ানেরা ছুটিয়া আসিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতে থাকেন।

চতুর্দ্দিক হইতে জনতা কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া রাত দশটায় মিছিল শেষ হয়।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।

কংগ্রেসী সাধারণ নির্ব্বাচনের মুখোস খুলিবার জন্যে

নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার কুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র কর

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পশ্চিম বাংলার জন্যে ছয় মাসের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরী ঘৃণ্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে শতকরা মাত্র ১৩ জন নরনারীর ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্ব্বাচন হইবে।

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী শাসকরা মৃত্যু শয্যায়। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদের বাঁচাইবার জন্যে কলিকাতায় ছুটিয়াছিলেন। তাঁহার রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই নাকি এই নির্ব্বাচনী দাওয়াই বাতলান হইয়াছে!

সারা ভারতের মধ্যে শুধু পশ্চিম বাংলার জন্যেই এই বিশেষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ, এখানে কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর পরাজয় সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে আতংক সৃষ্টি করিয়াছে।

এখানকার কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীই বিড়লা-ওয়াকারদের স্বার্থে শ্রমিকদের উপর অবাধ আক্রমণ চালাইবার জন্যে সকলের আগে কালাকানুন পাশ করেন, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করেন, তাঁহাদের সংবাদপত্র 'স্বাধীনতা' বন্ধ করিয়া দেন, ধর্ম্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লন, ১৪৪ ধারার নাগপাশে শহরের জীবন বাধিয়া রাখেন। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিনা বিচারে আটক রাখেন, কারখানাকে দালাল গুণ্ডা ও পুলিসের রাজত্বে পরিণত করেন, কিন্তু এখানকার শ্রমিকশ্রেণী এত বাধা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি কারখানা ও রাজপথকে লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত করিয়াছে। সরকারী হিসাব হইতেই দেখা যাইতেছে, গত মে মাসে সারা ভারতে যত ধর্ম্মঘট হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে পশ্চিম বাংলায় [মোট ৩৫৬০০০ দিন]। শুধু সংখ্যা দিয়া এই সকল সংগ্রামের তীব্রতা হিসাব করা যায় না। মালিকরা যেখানে আশা করিয়াছিল, বিনা প্রতিবাদে শ্রমিক ছাঁটাই করা যাইবে, সেখানে শ্রমিকরা কারখানা দখল করিয়া ছাঁটাই শ্রমিককে কাজে পুনর্বহাল করার জন্যে লড়িয়াছে। শাসকশ্রেণী যেখানে আশা করিয়াছিল, ১৪৪ ধারা জারি করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা যাইবে; সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক-ছাত্র-নাগরিকের পায়ের তলায় শহরের বুকের প্রতিটি শৃঙ্খল চূর্ণ হইয়াছে। ঠিক এমনই সংগ্রাম হইয়াছে গ্রামের ধনিক-জমিদার-শ্রেণীর শত সহস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে—জমি হইতে উচ্ছেদ, ফসল সীজ করা, ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে গ্রাম অঞ্চলে গরীব কৃষকের গণ-প্রতিরোধ সুরু হইয়াছে। শত শত পুলিস-পল্টন পাঠাইয়া ও ধনী কৃষক-জমিদারদের আতংক দূর করা যাইতেছে না। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনগণের এই ক্রোধই ফাটিয়া পড়িয়াছে দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে। লক্ষ লক্ষ জনতার কণ্ঠ হইতে আওয়াজ উঠিয়াছে: বিড়লাজীর বন্ধু বিধান-নলিনী সরকারের কুশাসনের অবশান চাই!

বিপ্লবী জনগণের এই আক্রমণের মুখে আতংকিত কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী এক পা পিছনে হাঁটিয়া সাধারণ নির্ব্বাচনের চাল চালিয়াছেন। তাঁহারা ইহার মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণীর উপর নূতন আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হইতে চাহিতেছেন। বিড়লাজীর নিজের হিসাবমতই দেখা যায়, এই বছর শেষ হইবার আগেই পশ্চিম বাংলার কমপক্ষে ৫০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করার প্রয়োজন হইবে। এই আক্রমণের পথ প্রশস্ত করার জন্যেই বিড়লার বন্ধু কংগ্রেসী বড়কর্ত্তারা 'সাধারণ নির্ব্বাচনের' ধাপ্পা-বাজিতে জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিতেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতলবটি ভালভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 'স্টেটসম্যান পত্রিকা'র একটি মাত্র মন্তব্যে। তাঁহারা বলিয়াছেন: যে চরমপন্থী শক্তি ভীষণভাবে বাড়িতে ছিল তাহাকে যদি অন্তত আংশিকভাবেও পার্লামেণ্টারী এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করা যায় তবেই এই 'কড়া দাওয়াই' সার্থক হইবে। [৩০-৭-৪৯] ইহার সহজ অর্থ হইল, কংগ্রেস নেতারা প্রচার করিতে থাকিবেন, সাধারণ নির্ব্বাচনের পর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর বিড়লা-ওয়াকার সাহেবরা সেই ডামাডোলের মধ্যে নির্ব্বিবাদে চটকল, সুতাকলে শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া যাইবেন; কারখানাকে কারখানা বন্ধ রাখিবেন। মজুরি ও ভাতা কাটিবেন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই সাধারণ নির্ব্বাচনের অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই সাধারণ নির্ব্বাচনের সহিত গণ-তন্ত্রের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। কারণ গণতন্ত্রকে হত্যা করিয়াই কংগ্রেসী ধনিক-শ্রেণী আজ তাঁহাদের ডিক্টেটরী শাসন কায়েম রাখিয়াছেন। গণতন্ত্রকে ভয় করেন বলিয়াই তাঁহারা এখনো বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার অবসান ঘোষণা করিতে সাহস করেন না, কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে সাহস করেন না, বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দিতে সাহস করেন না। কালাকানুন প্রত্যাহার করার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না; এতগুলি রক্ষিতা সংবাদপত্র এবং এত রেডিও থাকিতেও মজুরদের একখানা সংবাদপত্রকে সহ্য করিতে পারেন না। জনগণের ভয়ে ভীত বলিয়াই তাঁহারা নির্ব্বাচনে গণ-ভোটের বিরুদ্ধে এত ওজর-আপত্তি দেখাইতে ব্যস্ত। জনগণের স্বাধীন ভোটের সামনে তাঁহাদের কতখানি লাঞ্ছনা পাইতে হইবে তাহার সামান্য আভাব তাঁহারা পাইয়াছেন দক্ষিণ কলিকাতায়। জনগণের হাতে মার খাইবার ভয়েই তাঁহারা ঘৃণ্য বৃটিশ আমলের আইনের আশ্রয় লইয়াছেন; পশ্চিম বাংলাকে কালাকানুনের নাগ-পাশে বাধিয়া নির্ব্বাচনের তামাসা সুরু করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। শ্রমিক-শ্রেণীকে শ্রেণী সংগ্রামের পথ হইতে ফিরাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এই নূতন চাল চালিয়াছেন। নির্ব্বাচনী পর্দ্দার আড়ালে তাঁহারা বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার কুশাসনকে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন।

কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর এই কাজে

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

১৫ই আগষ্ট

১৫ই আগস্ট আসিতেছে। ১৯৪৭ সালে এই ১৫ই আগস্ট তারিখে মাউণ্ট-ব্যাটেন রোয়েদাদ অনুযায়ী ভারত বিভাগ কাজে পরিণত হইয়াছিল। ১৫ই আগস্ট সেই দিন, টাটা বিড়লা প্রভৃতির নেতৃত্বে এদেশের ধনিকশ্রেণী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতা করিয়া যেদিন ভারত-বিভাগ ও দুই ডোমিনিয়নে ধনিক-জমিদারদের সরকার গঠন করিয়াছিল। ১৫ই আগস্ট সেইদিন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুর্নিবার গতিবেগের মধ্যে কংগ্রেস ও লীগের নেতারা যে তারিখে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পিছন হইতে ছুরি মারিয়াছিল। ভারতীয় ইউনিয়নে ও পাকিস্তানে—গোটা ভারতবর্ষে সবচেয়ে কলঙ্কের দিন ১৫ই আগস্ট।

কিন্তু ধনিকশ্রেণী মনোরম সাজসজ্জার আড়ালে কুৎসিত কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখিতে ওস্তাদ। তাই ১৯৪৭ সালের এই দিনে, এই চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকার দিনকে তাহারা স্বাধীনতাবিজয়-দিবস রূপে পালন করিয়াছিল। শ্রমিকদের অনেককে সেদিন কিছু বোনাসের টাকা দিয়া বোঝানো হইয়াছিল যে, তাহাদের জীবনে নূতন যুগ আসিতেছে। স্কুল ছুটি দিয়া ও শিশুদের কমলা লেবু দিয়া বুঝানো হইয়াছিল তাহাদের আনন্দের দিনের সূচনা হইল। বড়লোকের দৈনিক পত্রিকাগুলি এখন টাটা-বিড়লাদিগের রক্ষিতা। তাহারা হৈচৈ চালাইল: আসিয়াছে, স্বাধীনতা আসিয়াছে। সর্ব্বহারা মজুর, খালিপেটে থাকা গ্রামের গরীব, অর্দ্ধাহারে অভ্যস্ত কেরানী ভাবিল: এইবার আমাদের অসহ্য শোষণ হইতে মুক্তির দিন আসিয়াছে।

কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে দুই বছরের কংগ্রেস ও লীগ-শাসন। মজুরশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই দুই বছর তাহাদের আক্রমণ চলিয়াছে, পুরা দমে, বীভৎস বর্ব্বরতার সাথে। বেতন ও মাগ্যিভাতা অনেক জায়গায় কমিয়াছে, অথচ জীবন যাত্রার খরচ অনেক বেশী বাড়িয়াছে। ছাঁটাই হইয়াছেন লক্ষ লক্ষ মজুর, কেরানী ও কর্ম্মচারী।

আজ যখন ১৫ই আগস্ট আসিতেছে, ঠিক তখনই পাটকলের মজুরদের মাসে এক হপ্তা কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পঞ্চাশ হাজার পাটকল মজুরকে ছাঁটাই করার ঘোষণা করা হইয়াছে। কাপড়ের কল বন্ধ করিয়া হাজার হাজার মজুরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। লোহা কারখানার মজুরদের বোনাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রেল মজুরদের সরকারী কর্ম্মচারীদের গ্রেনশপ দুই বাংলাতেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাই এবার মজুরশ্রেণীর জন্য ১৫ই আগস্টের পুরস্কার!

গ্রামাঞ্চলে দুই বাংলাতে শতকরা অন্ততঃ ৩৬ জনই ক্ষেতমজুর ছিল ১৯৪৬ সালে। কংগ্রেস ও লীগ শাসনের দুই বছরে ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ক্ষেতমজুরদের মজুরি কিছুটা বাড়িয়াছিল; কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ সরকারের আমলে ধনী কৃষকেরা গ্রামের রাজা হইয়াছে; তাই তাহারা গুণ্ডা ও সরকারী ডাণ্ডার জোরে ক্ষেতমজুরদের দিনকার মজুরির হার কমাইয়া দিয়াছে। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পর হইতে গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও বছরের কয়েক মাসের জন্য গরীবদের সস্তায় চাউল দেওয়ার সরকারী ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ধনিকের ধান-চাউলের কারবারে মুনাফা বাড়াইবার জন্য এখনকার সরকার তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। চাউলের দর পূর্ব্ববঙ্গে হইয়াছে

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

মাঙ্গল

প্রথম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] ৭ই আগস্ট '৪৯ : ২২শে শ্রাবণ '৫৬ [তিন আনা

শিল্প উপদেষ্টা কমিটিতে 'শিল্পে শান্তি'র নামে শ্রমিক-শ্রেণীর উপর নূতন আক্রমণের ষড়যন্ত্র

ব্যাপক ছাঁটাই, কাজ বৃদ্ধি ও মজুরি কাটায় গবর্নমেণ্ট, মালিক, 'জাতীয়' টি-ইউ-সি, সমাজতন্ত্রী একজোট

গত ২৮শে জুলাই নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা কমিটির সভায় শিল্প-মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী বলেন :

"বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজন হইল গবর্নমেণ্ট, শিল্পপতি এবং শ্রমিকদের এক যোগে কাজ করা। এই তিনশক্তি একত্রে কাজ করিলে তবেই আজকার দিনের বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানে গবর্নমেণ্টের পক্ষপাতিত্ব করার কোন প্রশ্নই উঠে না।"

'সমাজতন্ত্রী' মজদুর পঞ্চায়েতের পক্ষ হইতে শ্রীমতী মনিবেন কারা ডাঃ মুখার্জ্জীকে আশ্বাস দেন :

"'জাতীয়' টি-ইউ-সির সহিত আমাদের যতই মতভেদ থাকুক না কেন জাতির স্বার্থে আমরা একযোগে কাজ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি এবং একযোগে কাজ করিতে যাইতেছি।"

মালিকদের পক্ষ হইতে স্যার আর দেশীর দালাল এবং শ্রমিকদের নাম করিয়া শ্রীমতী কারা ডাঃ মুখার্জ্জিকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দেন যে, **পরস্পর-বিরোধী স্বার্থকে একত্র করায় তিনি খুবই ওস্তাদ।**

[স্টেটস্‌ম্যান, ৩০-৭-৪৯]।

মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে আর কোন লড়াই যাহাতে না হয়, নয়াদিল্লীতে 'জাতীয়' টি-ইউ-সি এবং সমাজতন্ত্রী পঞ্চায়েতের দালালরা মালিক এবং গবর্নমেণ্টের নিকট আবার নূতন করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন। মালিক এবং শ্রমিকের লড়াই-এ নেহরু সরকার আবার 'নিরপেক্ষতা'র ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'দেশের স্বার্থের' নাম করিয়া আবার তাঁহারা শ্রমিকদিগকে বিনা প্রতিবাদে মালিকের প্রত্যেকটি নূতন নূতন আক্রমণ মানিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নেহরু "শিল্পে শান্তিরক্ষা করা"র যে নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাই উপদেষ্টা সম্মেলনে নূতন করিয়া ঘোষিত হইল।

কিন্তু দিল্লীর দপ্তরে নেহরু সরকার এবং টাটা-বিড়লার দল তাঁহাদের মুষ্টিমেয় দালাল লইয়া "শিল্পে শান্তি রক্ষার" যে পরিকল্পনাই করুন না কেন সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী সেই ঘৃণ্য আত্মসমর্পণের পথকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। সরকারী হিসাব মতই দেখা যাইতেছে যে, **১৯৪৮ সালে সারা ভারতে শ্রমিকরা ৮২ লক্ষ দিন ধর্ম্মঘট করিয়াছে। [১৯৪৩ সালে মাত্র ২৩৪২২৮৭ দিন ধর্ম্মঘট করিয়াছে; এই বছর একমাত্র সে মাসেই ৭৮,৮৫৯ দিন তাহারা কাজ বন্ধ রাখিয়াছে। ইহার মধ্যে একমাত্র পশ্চিম বাংলায়ই তাহারা কাজ বন্ধ রাখিয়াছে ৩৫৬০০০ দিন [এপ্রিলে কাজ বন্ধ ছিল ২৬৮,০০০ দিন]।**

সরকারী হিসাবে রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটকে ধরা হয় না। উহাতে অনেক ধর্ম্মঘটেই ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা কম করিয়া দেখানো হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, শ্রমিকশ্রেণী সহযোগিতার পথ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রেণী সংগ্রামের পথেই দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। নেহরু সরকার মুখে 'নিরপেক্ষতা'র মিষ্টি কথা বলিলেও প্রত্যেকটি শ্রমিকবিরোধে সশস্ত্র পুলিস পাঠাইতে ভোলেন নাই; ১৪৪ ধারা ও কাঁদুনে গ্যাসের সমারোহ কোথাও কম হয় নাই; শুধু দালাল গুণ্ডাদের উপর নির্ভর না করিয়া তাহারা বন্দুক ও লাঠির জোরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'শিল্পে শান্তি' রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বাড়িতেছে ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, শ্রমিকরা কংগ্রেসীদের 'শিল্পে শান্তি'র ধাপ্পা বাজি ধরিয়া ফেলিয়াছে।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ধনিক নেহরু সরকার, টাটা-বিড়লার দল এবং তাহাদের দালালরা কিভাবে 'সঙ্কটের' নামে শ্রমিকদের ধোঁকা দিতেছিলেন তাহা একবার দেখুন। প্রথমে তাঁহারা বলিলেন : কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে শত্রু হানা দিয়াছে, সুতরাং এই 'জাতীয়-সংকট' হাল করার জন্যে তোমরা না খাইয়াও উৎপাদন বাড়াও। 'জাতীয়' টি-ইউ-সি ও 'সমাজ তন্ত্রী' দালালরা সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার কাজে লাগিয়া গেলেন।

কিন্তু নেহরু সরকার ঐ "জাতীয় সংকটকে কিভাবে হাল করিলেন? হায়দরাবাদে তাঁহারা নিজামকে খতম করিলেন না, জায়গীরদারী-জমিদারীপ্রথা খতম করিলেন না, কৃষককে জমি দিলেন না, শ্রমিকের মজুরি বাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন না। শুধু হায়দরাবাদে টাটা-বিড়লার অবাধ শোষণের পথ খুলিয়া দিলেন।

কাশ্মীরের যুদ্ধে নেহরু গবর্নমেণ্ট মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যস্ত মানিয়া লইয়া কাশ্মীরকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করিলেন। কাশ্মীরের জনগণ মজুরি জমি বা স্বাধীনতা কিছুই পায় নাই। কাশ্মীরেও ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর শোষণের পথই উন্মুক্ত হইল। শ্রমিকশ্রেণী স্পষ্টই আজ দেখিতে পাইতেছে যে, দেশীয় রাজ্যে ধনিকশ্রেণীর শোষণের পথ উন্মুক্ত করার জন্যই নেহরু সরকার এবং তাঁহাদের দালালরা তাঁহাদিগকে না খাইয়া উৎপাদন বাড়াইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

হায়দরাবাদ এবং কাশ্মীর যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে নেহরু সরকার এবং তাঁহাদের দালালরা আওয়াজ তুলিলেন : দেশে মুদ্রাস্ফীতির সংকট দেখা দিয়াছে। উহা রুখিবার জন্যে গবর্নমেণ্ট, মালিক ও শ্রমিকদের **সমানভাবে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে।**

মুদ্রাস্ফীতি ধনিকশ্রেণীর হাতে শ্রমিকদের গলাকাটার নূতন কৌশল। উহা চালু করিয়া তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে শ্রমিকদের আসল মজুরিকে তিনভাগের একভাগে পরিণত করিয়া দিয়াছে। নেহরু সরকারই এই নীতিকে চালু রাখিয়া মালিকদের মুনাফার হার ঠিক রাখিতেছেন; কিন্তু সেই সত্যটি ঢাকিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন : উৎপাদন বাড়াইলেই জিনিসপত্রের দর কমিবে সুতরাং, না খাইয়া উৎপাদন বাড়াও, তবেই সস্তায় খাদ্য-বস্ত্র পাইবে। উৎপাদনের ব্যাপারে মালিকদের উৎসাহিত করার জন্যে তাঁহারা শিল্পপতিদের ট্যাক্স কমাইয়া দিলেন। আর শ্রমিকদের উপদেশ দিলেন যে, মজুরি বা ভাতা এখন যতটুকু পাও তাহাও খরচ না করিয়া পোস্ট অফিসে সঞ্চয় কর। সমাজতন্ত্রী নেতা অশোক মেহতা 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া 'মুদ্রাস্ফীতি সংকটের' ঐ সমাধান সমর্থন করিলেন। উৎপাদনে গাফিলতি করার জন্যে 'জনতা' পত্রিকায় টাটা শ্রমিকদের গালমন্দ করা হইল। জয়প্রকাশ রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিলেন।

কিন্তু আসলে 'মুদ্রাস্ফীতি' রুখিবার' আওয়াজ মালিকদের হাতে শ্রমিকদের উপর নূতন আক্রমণ চালানোর অস্ত্র হিসাবেই আসিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে কংগ্রেসী সরকারের ট্রাইব্যুনাল যে কয়টি রায় দিয়াছেন, বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে যে কয়টি সরকারী তদন্ত কমিটি বসিয়াছে তাঁহারা প্রত্যেকে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, ভাতা বৃদ্ধির ন্যায্যতা আংশিকভাবে স্বীকার করার পরও "মুদ্রাস্ফীতির" নাম করিয়া উহা হইতে শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়াছেন।

অথচ, তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি রোখা গিয়াছে কি? তাহা যায় নাই। কারণ তাহা এদেশের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে নয়। জিনিসপত্রের দর কমা তো দূরের কথা উহা এখন ১৯৪৮ সালের সীমাও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সরকারী হিসাবে বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই কথা প্রতিসপ্তাহে স্বীকৃত হইতেছে।

শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতেই দেখিতে পাইয়াছে যে, না খাইয়া উৎপাদন বাড়াইলেও জিনিসপত্র সস্তা হয় না। তাহারা দেখিতে পাইয়াছে যে, কংগ্রেসী সরকারের ট্রাইব্যুনাল 'সমানস্বার্থত্যাগে'র নাম করিয়া মালিকের মুনাফা রক্ষা করেন, আর শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির পথ বন্ধ করেন। কংগ্রেসী ট্রাইব্যুনালের 'নিরপেক্ষ' বিচার সম্পর্কে তাহারা মোহমুক্ত হইয়াছে। এবার কংগ্রেসী সরকার এবং তাহাদের দালালরা "অর্থনৈতিক সংকটে"র বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যে শ্রমিকদের সাহায্য চাহিয়াছেন।

প্রায় দুই বছর 'শিল্পে শান্তি রক্ষা' করার পরও এই "অর্থনৈতিক সংকট" আসিল কেন? ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি একবছর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নূতন শিল্পনীতি কার্য্যকরী করা হইলে ১৯৪৭ সালের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে। শিল্পনীতি কার্য্যকরী করার জন্যে তাহারা শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছেন, শ্রমিকনেতাদের বিনাবিচারে জেলে আটক করিয়াছেন, ধর্ম্মঘট কার্য্যত বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটিতে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে : গত বছরের তুলনায় অবস্থা সামান্য ভাল। বস্তুত ১৯৪৮ সালের শেষের ছয় মাসে [যে সময়ে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা কিছুটা কম ছিল] উৎপাদন বাড়ে নাই বলিলেই চলে। কয়লার উৎপাদন এক অবস্থায়ই থাকে। ইস্পাতের উৎপাদন মাত্র শতকরা ৪ ভাগ বাড়ে। কাপড়ের উৎপাদন অনেক কমিয়া যায়। চটের উৎপাদন আগেকার দুই বছরে গড়ে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা কম দেখা যায়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী বলিয়াছিলেন : বিদেশে মাল পাঠাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে, তবেই অর্থনৈতিক সংকটের হাল হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কি দেখা যাইতেছে? বিদেশে ভারতের রপ্তানী দিন দিনই কমিতেছে। গত বছরের এপ্রিল-মাসের তুলনায় এবারকার এপ্রিল মাসে উহার পরিমাণ ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। দেশের নরনারীকে বঞ্চিত করিয়া নেহরু সরকার যে কাপড় ও চিনি বিদেশে পাঠাইবার প্লান করিয়াছিলেন তাহাও বানচাল হইয়া গিয়াছে।

এখন নেহরু সরকার এবং তাঁহাদের দালালরা আওয়াজ তুলিয়াছেন : সস্তায় মালতৈরী করিয়া অর্থনৈতিক সংকট হইতে বাঁচিতে হইবে তাহার জন্যে, শ্রমিকদের আরো কম মজুরিতে কাজ করিতে হইবে, তাহাদের কাজের বোঝা আরো বাড়াইতে হইবে। তাহার জন্যেই এখন কল-কারখানায় ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই করিতে হইবে। দরকার মত কোন কোন কারখানা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। বিড়লাজীরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, **একমাত্র কাপড়ের কলেই দুই লক্ষ শ্রমিককে "অস্থায়ী ভাবে বেকার" করিয়া রাখিতে হইবে [ইষ্টার্ন ইকনমিষ্ট ২৯-৭-৪৯]** উপদেষ্টা কমিটিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী বলিয়াছেন : এ কাজ একা গবর্নমেণ্ট বা মালিকরা করিতে পারেন না, ইহার জন্যে সকলের সমবেত চেষ্টা চাই। অর্থাৎ, এইভাবে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করা শুধু পুলিস-পল্টন লইয়া করা যায় না। ইহার জন্যে দালাল আবশ্যক। শ্রীমতী কারা তাঁহার

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মঞ্জিল

হিটলারী দমননীতির বিরুদ্ধে—

ময়মনসিংহের ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের মৃত্যু-ভয়হীন লড়াই

ময়মনসিংহ জেলার উত্তর অংশে সুসং পরগনার গরীব কৃষকদের খাদ্যের আন্দোলনকে দমাইবার জন্য নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার ফৌজ ১৭ই জুলাই গুলি চালাইয়া ১২ জনকে নিহত করিয়াছে। পরে ২০শে জুলাই আবার পুলিস গুলি চালনা করিয়াছে।

এই এলাকায় গত জানুয়ারী মাস হইতে টংকপ্রথা উচ্ছেদ ও খাদ্যের জন্য ক্ষেত মজুর ও কৃষকগণ যে লড়াই চালাইতেছেন তাহার উপর এ-পর্য্যন্ত পুলিস অগণিত বার গুলি বর্ষণ করিয়াছে। তবুও লড়াই থামে নাই। অবিরত ধারায় তাহা চলিয়াছে।

গত জানুয়ারী মাস হইতে এ-পর্য্যন্ত ৩৩ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক—ইহাদের ভিতর দুইজন নারী—ময়মনসিংহের উত্তর এলাকায় খাদ্য ও জমির আন্দোলনে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার পুলিসের গুলিতে শহীদ হইয়াছেন।

বীভৎস দমননীতি

কমলাকান্দা থানা হইতে সুরু করিয়া নলিতাবাড়ী থানা পর্য্যন্ত গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশ জুড়িয়া প্রায় ৭০ মাইল লম্বা ও দশ মাইল প্রস্থ এই এলাকাকে প্রায় ১ হাজার সশস্ত্র পুলিস, পাঠান ফৌজ ও আনসার বাহিনী দ্বারা গত জানুয়ারী মাস হইতে ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। খাদ্য সংগ্রহের নামে ধনীদের ধান ছাড়িয়া দিয়া লীগ সরকার শুধুমাত্র গরীব কৃষক ও মধ্য কৃষকদের ধান নিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও "কমিউনিস্ট খোঁজার" নামে ও "অশান্তি দমনের" জন্য লীগ সরকারের ফৌজের দল শত শত কৃষকের বাড়ী হইতে যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া নিয়া গিয়াছে। লীগের ফৌজ কোন কোন স্থানে মেয়েদের উপর বলাৎকারও করিয়াছে।

গ্রামে গ্রামে পুলিসের ক্যাম্পগুলি হইয়াছে সাধারণ লোকের বভীবিকা ও হিটলারী অত্যাচারের কেন্দ্র। সেখানে হামেশাই হাজং, মুসলমান, গারো গরীব গ্রামবাসী-দের ধরিয়া নিয়া অমানুষিক প্রহার করা হয়। মেয়েদেরকেও ধরিয়া নিয়া ক্যাম্পে নির্য্যাতন করা হয়। হালুয়াঘাটের একটি পুলিস ক্যাম্পে একজন ক্ষেত মজুরকে "কমিউনিস্টরা কোথায় আছে বলিয়া না দেওয়ায় তাহার হাত ধারালো ছুরি দিয়া বহুস্থানে কাটিয়া দেওয়া হয়। সেই ক্ষেতমজুর কিছুতেই কোন কথা বলিতে রাজী না হওয়ায় রক্তাক্ত দেহে তাহাকে ক্যাম্প হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একজন ক্ষেতমজুর কর্ম্মীকে পুলিস ক্যাম্পে ধরিয়া নিয়া বেদম প্রহার করা হয়। মারের চোটে তাহার সারা শরীর রক্তে লাল হইয়া যায়। মারিতে মারিতে পুলিস অফিসার তাহাকে বলে, "বল শালা পাকিস্তান জিন্দাবাদ বল।" কিন্তু, মারের মুখে প্রতিবারই সেই ক্ষেতমজুর কর্ম্মী বলিতে থাকেন, "কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ"। পুলিস অফিসার তাঁহাকে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলে।

অগণিত সাধারণ হাজং, মুসলমান, গারোকে পুলিস ক্যাম্পে নিয়া নখের নীচে সুচ ফুটাইয়া, হাত মোচড়াইয়া পুলিস অফিসাররা 'এনকোয়ারী' করে, "বল্ শালারা কমিউনিস্টরা কোথায়।"

এইরূপে অত্যাচার করিয়া পুলিসের দল সাধারণ গরীবদের নিকট হইতে হামেশাই ঘুষও নিতেছে।

হালুয়াঘাটের নিকটে একটি পুলিস ক্যাম্পে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মেয়েদের ধরিয়া আনিয়া ফৌজের দল তাঁহাদের উপর পাশবিক অত্যাচারও করিয়াছে।

খাদ্য নাই

নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার এই নিষ্ঠুর দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের সঙ্কটও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ এলাকা ময়মনসিংহ জেলার শস্য ভাণ্ডার। ৫০ সনের মন্বন্তরের সময়েও ধানের দাম মণ প্রতি ৬।৭ টাকার বেশী হয় নাই। এবার ঐ এলাকায় এখন ধানের দাম মণ প্রতি ১৬।১৭ টাকা। অপর দিকে মিঃ নুরুল আমীনের 'খাদ্য সংগ্রহে' গরীবের ধান চলিয়া গিয়াছে সরকারের গোলায়। সরকার সেই ধানের এক কণাও সেই এলাকায় বিক্রয় করে নাই। তদুপরি, ফৌজের দল অগণিত গরীবের বাড়ী হইতে ধান, চাউল, হাঁস, কবুতর টাকাকড়ি সব কিছু লুঠ করিয়া নিয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে সব গরীবদের সামনে অনাহারে মৃত্যুর বিভীষিকা আসিয়া গিয়াছে।

জনতা কর্ত্তৃক খাদ্য দখল

'অনাহার হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য গত ছয় মাসের নারকীয় অত্যাচার ও পুলিসের অবিরত গুলি তুচ্ছ করিয়াই গরীব জনতা সব শক্তি নিয়া আবার লড়াইএ নামিয়াছেন। এবার লড়াই খাদ্য-দখলের। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার দৌলতে যে ধনী কৃষক ও জোতদাররা ধান মজুত করিয়া চোরাকারবারে হাজার হাজার টাকা মুনাফা করিতেছিল, ২৫শে জুন হইতে সুসং এলাকায় গরীব জনতা দল বাঁধিয়া দলবদ্ধ ভাবে সেই সব রক্তচোষাদের ধান দখল করিয়া ক্ষেত মজুর ও গরীবদের ভিতর বিলি করিয়া দিতে থাকেন। ব্রজ মোড়ল নামে একজন জোতদার গুণ্ডার দল নিয়া জনতাকে মারপিটক রিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জনতার সংগ্রামী শক্তির সামনে গুণ্ডার দল পালাইয়া যায়। ব্রজ মণ্ডল পরিবার সহ বাড়ী ছাড়িয়া নিকটে পুলিস ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। পুলিসও ভয়ে ক্যাম্পের ভিতর বসিয়া থাকে। জনতার সংগ্রামের সামনে আসিতে সাহস পায় নাই। জনতার নিজস্ব কায়দায় খাদ্য পাওয়ার এই গণতান্ত্রিক লড়াই চারিদিকেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। শুধু এক সুসং এলাকাতেই দুই সপ্তাহে জনতা এক হাজার মণ খাদ্য দখল করিয়া তাহা ভুখা গরীবদের ভিতর বিলাইয়া দিয়াছেন।

নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা এখন সেই এলাকায় আরও পাঠান ফৌজ পাঠাইয়াছে। জাগ্রত জনতা ১৭ই জুলাই তারিখে সেই সৈন্যের সম্মুখীন হয়। স্টেনগান ও রাইফেল সজ্জিত সৈন্যদল তখন বেপরোয়া গুলি চালায়। প্রকাশ যে, জনতাও ফৌজের গুলির বদলে গুলি চালাইয়াছে। এই সংঘর্ষে আবার ১২ জন গরীব শহীদ হইয়াছেন।

কিন্তু, জনতার মনে আজ আর মরণের ভয় নাই। ২০শে জুলাই আবার দলবদ্ধ জনতার সঙ্গে ফৌজের সংঘর্ষ হয়। ফৌজ আবার বেপরোয়া গুলি চালাইয়াছে।

হাজার গুলির দ্বারাও জনতার এই লড়াই থামিবে না।

৯ই ১০ই ভাদ্র পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদকের বিবৃতি

"রায় মন্ত্রিসভা যখন কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করে, তখন হইতেই তাহারা কৃষক সভাকেও নামে না হইলেও কাজে বে-আইনী করিয়া রাখিয়াছে। প্রাদেশিক কৃষক সভার অফিস তাহারা প্রথম কয়েক মাস তালা বন্ধ রাখে; তাহার পরও স্বাধীনভাবে প্রাদেশিক অফিসের কাজ চালু করিতে দেয় নাই। জেলায় জেলায় কৃষক সমিতি অফিসে পুলিস যখন খুশী হানা দিয়াছে। জিনিস-পত্র তছনছ করিয়াছে, নির্ব্বিচারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মহকুমায়, ইউনিয়নে ও গ্রামে সমিতির অফিস তাহারা একরূপ বন্ধই রাখিয়াছে।

কিন্তু ১৬ মাস পরে আজ দেখা যাইতেছে, জেলায় জেলায় সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহাদের মিলিটারী পুলিস, সেবাদল, ধনী কৃষক ও তাহাদের গুণ্ডারা আজ কৃষক সমিতির ভয়ে আতঙ্কিত। সমিতির অফিস বন্ধ রাখিয়াও সমিতির চাবীর ভয়ে ধনীরা আজ চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছে। কংগ্রেসী সরকারের দমননীতি ব্যর্থ হইয়াছে। এখন তাহারা কলিকাতার ১৪৪ ধারা তুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সামরিক পিছু হটিয়া নূতন আক্রমণ ও দমননীতির জন্য তাহারা তৈয়ার হইতেছে।

"ঠিক এই সময়ে গ্রামের গরীবদের লড়াইকে জোরদার করার জন্য এখনই সরকার ও ধনিকশ্রেণীর সকল বাধা

(৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

বর্দ্ধমান জেলা ক্ষেতমজুর সম্মেলন

গত ২৯শে জুলাই বর্দ্ধমান জেলার সদর এলাকার সভ্যা গ্রামে জেলা ক্ষেত-মজুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। চাষের ভরা মরশুম এবং অবিশ্রাম বৃষ্টি সত্ত্বেও প্রায় হাজার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক এই সম্মেলনে যোগ দেন। গোবিন্দপুর ও সভ্যার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকরা সেদিন ধর্ম্মঘট করিয়া দলে দলে সম্মেলনে উপস্থিত হন।

কাটোয়া, রায়না, মেমারি, সদর পশ্চিম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে সমবেত হন। এই সম্মেলন হইতে বর্দ্ধমান জেলা অস্থায়ী ক্ষেতমজুর কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ক্ষেতমজুরদের মূল দাবীসকল, তে-ভাগার দাবী এবং অন্যান্য দাবীর জন্য লড়াই চালাইবার জন্য সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্যান্য প্রস্তাবের ভিতর দমননীতিবিরোধী সংকল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামী ঐক্যে আতঙ্কিত ধনী কৃষক ও সম্পন্ন মধ্যবিত্তেরা ক্ষেতমজুর আন্দোলনের নেতাদের নামের তালিকা লইয়া পুলিস ডাকিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু, সাধারণ মধ্যবিত্তরা ক্ষেতমজুরদের দাবীদাওয়া সমর্থন করিতেছেন।

ধনী কৃষকরা চেষ্টা করিয়াছিল, ক্ষেতমজুরদের ডাক্তার ও দোকান বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু, ক্ষেতমজুররাই পাল্টা ব্যবস্থা নিয়া ফেলিয়াছেন। জোতদারদের দোকান বয়কট হইতেছে; যাহারা পুলিস ডাকিবার উদ্যোক্তা তাহাদের জন্য কেহ রাখাল, মুনিস বা ঝিয়ের কাজ করিতে রাজি হইতেছেন না।

গত ৩১শে জুলাই প্রায় ২ শত ক্ষেতমজুরের এক মিছিল সম্মেলনের সংকল্প ঘোষণা করিয়া ঘোরে। ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের ভিতর মহা উৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছে।

ইতিমধ্যে দালাল ও গুণ্ডারা নাজেহাল হইতেছে। যাহারা পুলিস ডাকিবার উদ্যোক্তা ছিল তাহাদের ভিতর কয়েকজন জোতদার ৩১শে মিছিলের পর সভায় আসিয়া ক্ষমা চায়।

৭ই আগষ্ট

বোনাস, ১৫০৲ ন্যূনতম আয়, ছাঁটাই বন্ধ

ট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ও অবস্থান ধর্মঘট ও

গত সপ্তাহে পূজা বোনাস, ৮০৲ টাকা নিম্নতম বেতন, ৫০৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা, ২০৲টাকা ঘরভাড়া, ছাঁটাই বন্ধ এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার রক্ষা ও অন্যান্য দাবিতে কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ারিং অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে এক বিরাট বিক্ষোভের জোয়ার সুরু হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট সশস্ত্র পুলিসবাহিনী প্রেরণ করিয়া মালিকের স্বার্থরক্ষা করার চেষ্টা করিতেছেন।

ডিপোর ও কারখানার ভিতরে শ্রমিকেরা মিটিং করেন এই অভিযোগে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর নোনাপুকুর কারখানার তিন জন নেতৃস্থানীয় শ্রমিকের উপর চার্জশীট দেওয়া হইলে গত ৪ঠা আগস্ট কারখানার সমগ্র ১৫০০ শ্রমিক অবস্থান ধর্মঘট সুরু করেন।

কয়েকজন অফিসার ধোঁকা দেন যে, চার্জশীট প্রত্যাহার করা হইবে। ইহাতে বেলা দুইটার সময় শ্রমিকেরা কাজে ফিরিয়া যান। কিন্তু পরদিন ৫ই আগস্ট সকালে চার্জশীট প্রত্যাহার করা হয় নাই, এই খবর জানামাত্র পুনরায় সমস্ত শ্রমিক অবস্থান ধর্মঘট সুরু করেন।

কর্তৃপক্ষ কয়েকগাড়ী সশস্ত্র পুলিস প্রেরণ করেন। শ্রমিকেরা কারখানার দখল ছাড়েন না। রাত ৮টায় ১৫০০ অবস্থান ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে প্রায় দুই হাজার সশস্ত্র পুলিস নিয়োগ করা হয়। লাঠি চার্জ করিয়া পুলিস কারখানা পুনর্দখল করে।

ট্রাফিক ও অন্যান্য শ্রমিকদের উপরেও কোম্পানী আগে হইতেই চার্জশীট দিতেছিলেন। নোনাপুকুরের লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে সমগ্র ট্রামে নূতন চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। সোস্তালিষ্ট পঞ্চায়েত নেতাদের দালালীতে বিরক্ত হইয়া ট্রামের সাধারণ শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন।

৬ই আগস্ট হইতে নোনাপুকুর কারখানায় কোম্পানী লকআউট ঘোষণা করিয়াছেন।

বেলঘড়িয়ায় মেসিনগান

বেলঘড়িয়া টেক্সম্যাকো কারখানায় লকআউট ঘোষণা করিয়া পুলিস তিনটি মেসিনগান মোতায়েন করিয়া কারখানা পাহারা দিতেছে। শ্রমিকেরা ধর্মঘট চালাইয়া যাইতেছেন।

অত্যন্ত খাটুনী বৃদ্ধি এবং পীস্ রেট প্রায় অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়ায় এখানকার মেসিনশপের শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগিতেছিল। শ্রমিকেরা দাবি করেন, কম পক্ষে ১০০ টাকা বেতন, মাগ্‌গীভাতা এবং ক্যান্টিনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কর্তৃপক্ষ কয়েকবার সময় লইয়া কথা খেলাপ করে। ৩০শে জুলাই বি-বে সেকশনের শ্রমিকেরা অবস্থান ধর্মঘট সুরু করিলে তাহা সমগ্র মেসিন শপে ছড়াইয়া পড়ে। সোমবার ১লা আগস্ট শ্রমিকেরা পুনরায় ধর্মঘট করেন এবং চীফ ম্যানেজার ও সেক্রেটারীকে ঘেরাও করিয়া রাত নয়টা পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখেন। রাত্রে সশস্ত্র পুলিস কর্ত্তা ও ম্যানেজার উভয়েই শ্রমিকদের নিকট হইতে সময় চান। কিন্তু পুনরায় কথা খেলাপ করিলে ৩রা আগস্ট শ্রমিকেরা আবার অবস্থান ধর্মঘট সুরু করেন।

ইতিমধ্যে শ্রমিকদের প্রিয় সহকর্ম্মী শান্তি সরকার একদল রাজনৈতিক গুণ্ডার ছুরির আঘাতে নিহত হন। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র শ্রমিকরা কারখানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসেন, গুণ্ডাদের শাস্তি দেন ও একটি শোক মিছিল বাহির করেন।

এই সুযোগে কর্তৃপক্ষ কারখানায় লকআউট ঘোষণা করেন। মেসিনগান সহ প্রায় ২০০ পুলিস কারখানা দখল করিয়া আছে।

শ্রমিকেরা ধর্মঘট চালাইয়া যাইতেছেন।

গার্ডেনরীচে বিক্ষোভ

মেটিয়াবুরুজ গার্ডেন রীচ কারখানায় চারীর মধ্যে ধর্মঘট ছড়াইয়া যায়। শ্রমিকেরা ম্যানেজারের অফিস ঘেরাও করিয়া অবিলম্বে ফয়সালা দাবি করেন। পুলিস আসিয়া পাওয়ার চালাইবার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হয়। কর্তৃপক্ষ এবং পুলিস অফিসাররা ট্রাইব্যুনালের কথা বলিলে শ্রমিকেরা জানাইয়া দেন যে, তাঁহারা ট্রাইব্যুনাল মানেন না।

ফণী ঘোষের অনুরক্ত 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালরা শ্রমিকদের উপদেশ দিতে বিরুদ্ধে ডিপার্টে ডিপার্টে সংগ্রাম কমিটি নির্ব্বাচন করিতে সুরু করিয়াছেন।

তাঁহারা দাবি করিয়াছেন—

(১) একমাসের বোনাস দিতে হইবে
(২) কমপক্ষে ১৫০ টাকা বেতন চাই
(৩) ১০৲ টাকা টিফিন এলাওয়েন্স চাই

শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থা নিরসন করিতে হইলে ইহাই ন্যূনতম দাবি। ইহার পরিবর্ত্তে 'জাতীয়' টি-ইউর লোকেরা, গাবিকে ছোট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন; তাহারা 'গরমজলের পরিবর্ত্তে ঠাণ্ডা জল চাই' প্রভৃতি অবাস্তব দাবি তুলেন ও মোড়লী করার চেষ্টা করেন। ইহাতে শ্রমিকের ক্ষেপিয়া গিয়া তাহাদের উচিত শিক্ষা দিয়া দেন।

আই-জি-এন'এ অবস্থান ধর্মঘট ও ঘেরাও

গত ৪ঠা আগস্ট মেটিয়াবুরুজ আই-

১৫০০ অবস্থান ধর্মঘটীর বিরুদ্ধে ২০০০ সশস্ত্র পুলিসের লাঠিচার্জ্জ ও টিয়ারগ্যাস

অনেকদিন হইতে উপযুক্ত মাগ্‌গীভাতা ও টিফিন এলাউয়েন্সের জন্য শ্রমিকেরা দাবি জানাইয়া আসিতেছিলেন।

কর্তৃপক্ষ কোন কান না দেওয়ায় গত ১লা আগস্ট ডকের ৩০০০ শ্রমিক সর্ব্বপ্রথমে ধর্মঘট করিয়া পাওয়ার হাউসে আসেন এবং সমগ্র ১০০০ শ্রমিক কর্ম্মআসিলে শ্রমিকেরা তাহাদের তাড়াইয়া দেন।

বেগতিক দেখিয়া কোম্পানী কথা দেন যে, ৪ঠা আগস্ট ফয়সালা হইবে। কিন্তু সেদিন লেবার কমিশনার দেখা দেন না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য শ্রমিকেরা জাতীয় টি-ইউর

শান্তি সরকার স্মরণে

গত ৩রা আগস্ট বেলঘড়িয়ার টেক্সম্যাকো কারখানার লালঝাণ্ডা শ্রমিক শান্তি সরকার অতর্কিতে গুণ্ডার ছুরির আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

কে গুণ্ডাদল তাহাকে চুপি চুপি ছুরি মারিয়া পালায় তাহারা নিজেদের ফরোয়ার্ড ব্লক বলিয়া জাহির করেন। রুইকরকে নেতা বলিয়া মানেন। বেলঘড়িয়ায় তাহাদের একমাত্র কাজ ছিল শ্রমিক সংগ্রামের বিরোধিতা করা। কমিউনিস্ট বিদ্বেষের প্রচার করা। গতবার মোহিনীমিল ধর্মঘটে ইহারাই দালালীর কাজ করিয়াছিল।

কমরেড শান্তি ছিলেন একজন জঙ্গী শ্রমিক। বেলঘরিয়ার এক গরীব চাষীর ছেলে, অল্পবয়স হইতেই বিভিন্ন কারখানায় কাজ করিতে সুরু করেন। টেক্সম্যাকো কারখানায় গত ৩ বছরে ৩টি ধর্মঘট এবং বর্ত্তমান বৎসরে 'ছাত্র হত্যা, বন্দী হত্যা প্রভৃতি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ধর্মঘট পরিচালনা করিয়া তিনি দালালদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গত ২৯শে জুলাইয়ের সমাবেশে উক্ত গুণ্ডাদল এ-আই-টি-ইউ-সির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করার চেষ্টা করিলে দৃঢ়ভাবে তাহার জবাব দেন।

৩রা আগস্ট কমরেড শান্তি ছুরিকাহত হইয়াছেন শোনামাত্র বেলঘরিয়ার সমস্ত সাধারণ লোক ছুটিয়া আসিয়া আততায়ীকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহাকে চরম শাস্তি দেন। আততায়ী হাসপাতালে মারা যায়।

জীবন দিয়া কমরেড শান্তি লালঝাণ্ডার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া লালঝাণ্ডা অবনত করিতেছি।

কাঁচড়াপাড়া রেলষ্টোর শ্রমিকদের দাবী আদায়

গত ১৬ই জুলাই—কাঁচড়াপাড়ার রেল স্টোর্স'এর ৪শত হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী-বিহারী শ্রমিক জেলার স্টোর্স কন্ট্রোলারকে (ডি-সি-ও-এস'কে) ঘেরাও করিয়া তাঁহাদের কয়েক দফা দাবী আদায় করিয়াছেন। দালালরা বাঙ্গালী-বিহারী বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া বানচাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু, পারে নাই। বরং, এই ৮শত শ্রমিকের অধিকাংশই হিন্দুস্থানী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের নেতৃত্ব করিয়াছেন একজন বাঙ্গালী মুসলমান শ্রমিক।

শ্রমিকদের প্রধান দাবী ছিল—"বাড়তি" বলিয়া যে ১৬০ জনের নাম ছাঁটাইয়ের তালিকায় তোলা হইয়াছে, সে ছাঁটাই চলিবে না। **ডি-সি-ও-এস প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন যে, তাঁহাদের জন্য মিহিজান বা অন্যত্র কাজের ব্যবস্থা করা হইবে, এবং ইতিমধ্যে তাঁহারা এখানে কাজে বাহালই থাকিবেন।**

এই সম্মিলিত ঘেরাওয়ের ফলে কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকটি দাবী মানিয়া নিয়াছেন।

১। '৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী যে মজুরি বৃদ্ধির পাওনা এই দেড় বছর যাবৎ বাকি পড়িয়াছিল তাহা ২১-২২শে তারিখে মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে;

২। কুলী-খালাসীদের দিয়া অফিসারদের জন্য বেগার খাটুনি বন্ধ করিয়া সার্কুলার পড়িয়াছে।

৩। ৫-৭-১০ বছর যাবৎ কাজ করিতেছেন এমন লোককেও "নিয়োগের জন্য প্রার্থী" বলিয়া ডাক্তারী পরীক্ষায় পাঠাইয়া ছাঁটাই করিবার অপকৌশল চালু ছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে।

৪। বাংলা বিভাগের পূর্ব্বেকার পাওনা মিটাইবার জন্য তালিকা প্রস্তুত করিবার হুকুম হইয়াছে।

৫। 'অস্থায়ী' শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের স্থায়ী করিবার জন্য কে কতদিন কাজ করিয়াছেন সেই 'সিনিয়রিটি' হিসাবে তালিকা তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

৬। পদোন্নতির ব্যাপারে যে দুর্নীতি ছিল এবং ভাল কয়লা পুড়াইয়া "ইঞ্জিন ঝাড়া" বলিয়া অফিসারদের জন্য আত্মসাৎ করিবার দুর্নীতিও বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রমিকদের সম্মিলিত ঘেরাওয়ের এই সাফল্য উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য যে, মাস-খানেক আগেও শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধিদলকে কর্তৃপক্ষ 'না' জবাব দিয়া ফিরাইয়া দিতে সাহসী হইয়াছিলেন; কিন্তু, এবার পণ্ডিত নেহরুর সভা উপলক্ষে নূতন করিয়া প্রাদেশিকতার বীজ ছড়াইবার অপচেষ্টা সত্ত্বেও তাহার মাত্র তিন দিনের ভিতরই বাঙ্গালী-বাহারী শ্রমিকের জঙ্গী ঐক্য এই সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে।

এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবীতে

অন্যান্য কারখানায় ধর্ম্মঘটের জোয়ার

জি-এন কারখানায় শ্রমিকেরা বোনাস, ১৫০ টাকা বেতন প্রভৃতির দাবিতে অবস্থান ধর্ম্মঘট করিয়া প্রথমে ওয়েলফেয়ার অফিসার ও পরে ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন।

শ্রমিকদের জেরায় ম্যানেজারের মুখ হইতে ফাঁস হইয়া যায় যে, শ্রমিকদের যাহাতে ঠাণ্ডা রাখা হয় তজ্জন্য 'জাতীয়' টি-ইউকে তিনি নাকি ১৭০০ টাকা দিয়াছিলেন।

ইহাতে শ্রমকেরা ক্ষেপিয়া গিয়া 'জাতীয়' টি ইউর দুইজন দালালকে উচিত শিক্ষা দেন।

ম্যানেজার কয়েকদিন সময় চাহিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রমিকেরা আসন্ন লড়াইয়ের জন্য কারখানা কমিটি গঠন করিতে ও সকলকে দালালদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিতে সুরু করিয়াছেন।

এ, ই, আই, এম-এ লক আউটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

৩ মাসের বোনাসের দাবিতে গত ২০শে জুলাই শ্রমিকেরা ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। ইহার পর হইতে কর্তৃপক্ষ আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির ধোঁকা দিয়া শ্রমিকদের ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করিতে থাকেন এবং 'জাতীয়' টি-ইউ নেতাদের সহিত গোপান চুক্তি করিতে থাকেন।

শেষ পর্য্যন্ত ৩০শে জুলাই কোম্পানী নোটিস দেন যে, শ্রমিকদিগের কোন দাবিই মানা হইবে না।

৩রা আগস্ট তথাপি 'জাতীয়' টি-ইউর লোকেরা লেবার কমিশনারের নিকট দেখা করিতে যান। লেবার কমিশনারও না করিয়া দেন।

ইহাতে মজুরদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। ৪ঠা আগস্ট মজুরেরা কারখানার বিলাতি ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। জনৈক দালাল পার্শ্বস্থ জি-ইউ-সি কারখানায় শ্রমিকদের ম্যানেজারকে রক্ষা করার কথা বলিলে শ্রমিকেরা তাহাকে ভাগাইয়া দেন ও শ্রমিক ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বৈকালের দিকে এই কারখানায় মাত্র তিন শতাধিক ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে পোর্ট পুলিস ডেপুটি কমিশনার ৬০০ সশস্ত্র পুলিস লইয়া আসিয়া উপস্থিত হন এবং কারখানা হইতে সমস্ত শ্রমিককে বহিষ্কৃত করেন।

কোম্পানী এক নোটিসে সমস্ত শ্রমিককে বরখাস্ত করিয়া লক আউট ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রমিকেরা লক-আউটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালু রাখার জন্য জঙ্গী কমিটি গঠন করিয়াছেন।

ছাঁটাই করিয়া পটারী কারখানা চালু রাখার ব্যর্থ চেষ্টা

শ্রমিকদের একটি দাবি না মানিয়া ও প্রায় ২,০০০ শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া পটারি মালিক ১লা আগস্ট হইতে কারখানা চালু করার চেষ্টা করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে প্রচুর পুলিস পাহারা বসানো হইয়াছে। পুলিস পাহারায় 'জাতীয়' টি-ইউর দালালরা শ্রমিকদের উপর জুলুম করিতেছেন।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত মালিকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। প্রথমদিন টিপসহি দিয়া যে সকল শ্রমিক কাজে যান তাহাদের অনেকেও পরদিন হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন

শুধু লালঝাণ্ডা নয় 'জাতীয়' টি-ইউর অনেকে গ্রেপ্তার হন। ধর্ম্মঘটীদের সহিত দালালদের সংঘর্ষে একটি বোমা ফাটে, একজন দালাল ও একজন আই-বি জখম হয়।

বেগতিক দেখিয়া স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অমিয় দাসগুপ্ত নূতন ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি নিজেকে গুণ্ডা মহাদেব হইতে পৃথক বলিয়া জাহির করার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু অন্যদিকে ছাঁটাই বন্ধ ও রামলক্ষ্মণের ক্ষতিপূরণ মূলদাবি প্রভৃতি প্রত্যেকটি দাবিকেই ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মুখে কোম্পানীর বিরোধিতা করিলেও 'তিনি কোম্পানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধ সংগঠিত করার বদলে তিনি চুপিচুপি কংগ্রেসনেতা,

'জাতীয়' টি-ইউ ও সোস্যালিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকদের জঙ্গী-ঐক্য

অনুগামী বহু শ্রমিক কর্ম্মচারীকেও মালিক ছাঁটাই করিয়াছেন। সাধারণ 'জাতীয়' টি-ইউ শ্রমিকেরা ইহাতে ক্ষেপিয়া গিয়া লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের সহিত একত্রে পিকেটিং করিতেছেন। পুলিস, আই-বি এবং 'জাতীয়' টি-ইউর গুণ্ডা মহাদেবের দলের বিরুদ্ধে একত্রে প্রতিরোধ করিতে গিয়া তাহাদের মালিক ও পুলিস অফিসারদের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ফাটল ধরানোর জন্য তিনি পিকেটিংএর মধ্যেই কমিউনিস্ট বিদ্বেষের ধ্বনি দিতেছেন।

অমিয় দাসগুপ্তের এই চতুর 'শ্রমিক-দরদের' বিরুদ্ধে সাধারণ কংগ্রেস প্রভাবাধীন ও লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতেছেন। গেটের সামনে ও মোড়ে মোড়ে প্রত্যহ প্রায় ২০০০ শ্রমিক সমানে পাহারা দিয়া যাইতেছেন। মিছিল করিয়া বেড়াইতেছেন।

পুলিসের গ্রেপ্তারে কমরেড রাখাল বাগের মৃত্যু

তমলুকের সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের নেতা কমরেড রাখাল বাগ গত ১৭ই জুলাই পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইয়া মারা গিয়াছেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে লালঝাণ্ডা অবনমিত করিতেছি।

কমরেড রাখাল বাগ গত তিন মাস যাবৎ কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। প্রথমে টাইফয়েডে ভুগিয়া গ্রেপ্তারের সময় তিনি লীভার অ্যাবসেস-এ অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীরে শয্যাশায়ী ছিলেন। এমন অবস্থায় গ্রেপ্তার ও পুলিস পাহারায় চালান যাইবার চোটই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। সর্ব্বক্ষণ ডাক্তারের সতর্ক দৃষ্টি ও আত্মীয়-স্বজনের সস্নেহে সেবা শ্রুশ্রূষা যখন একান্ত অপরিহার্য্য ছিল, তখনই সরকারের এই অস্বাভাবিক তৎপরতা এবং পুলিসের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ও কঠোর হস্তক্ষেপই কৃষক নেতার মৃত্যু ঘটাইল।

বাড়ি হইতে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইবার পথেই তিনি মারা যান।

হুগলী ও ডুয়ার্স জেলে বন্দীদের অনশন

জুন মাসে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীরা নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য যে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালাইয়াছিলেন তাহার কাছে বিধান মন্ত্রিসভাকে মাথা নত করিতে হইয়াছিল। বন্দীদের দাবী মানিয়া নিতে বিধান সরকার বাধ্য হইল। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই বিধান সরকার বন্দীদের দাবী পূরণ করিতে টালবাহানা করিতেছে—বন্দীদের আবার অনশনের মুখে ঠেলিয়া দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

জলপাইগুড়ীর সংবাদে দেখা যায় যে, **আলিপুর ডুয়ার্স অঞ্চলে দিনহাটা জেলে চারজন রাজবন্দী ১৫ই জুলাই হইতে অনশন করিয়া রহিয়াছেন।** আলিপুর, প্রেসিডেন্সী, দমদম প্রভৃতি জেলের রাজবন্দীদের যে সুবিধা দিতে বিধান সরকার রাজী হইয়াছে সেই সমস্ত সুবিধা দিনহাটা জেলের বন্দীদের দিতে সরকার অস্বীকার করিতেছে।

হুগলী জেলে

হুগলী জেলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। ফলে **রাজবন্দীরা আবার ২৬শে জুলাই হইতে অনশন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।** বন্দীরা দাবী জানাইয়াছিলেন যে, অনশনের পর আলিপুর, প্রেসিডেন্সী, দমদমে বন্দীদের যে দাবীগুলি মানিয়া লইতে সরকার স্বীকার করিয়াছে সেই সমস্ত শর্ত্ত তাহাদের জানানো হউক এবং তাঁহাদেরও সেই সমস্ত সুবিধা দেওয়া হউক।

হুগলী জেলে রাজবন্দীদের ঐ শর্ত্তানুযায়ী কোনরূপ সুবিধাই দেওয়া হইতেছে না—সরকার সেই পুরানো হাল বজায় রাখিয়া-ই চলিয়াছে। ৮০ জন মজুর কৃষককে এক বছর ধরিয়া বিচারাধীন বন্দী হিসাবে রাখা হইয়াছে—মামলার তারিখ ফেলাইয়া দিনের পর দিন তাঁহাদের অন্যান্য স্বজনদের হয়রান করা হইতেছে। তাঁহাদের কোন জামা কাপড় দেওয়া হইতেছে না। বন্দীদের অতি জঘন্য রকমের খাদ্য দেওয়া হইতেছে।

হাজরা পার্কে বন্দী-মুক্তির দাবীর সমাবেশে গুলিচালনা

বাঙ্গলার রাজবন্দীদের বাংলার বাহিরে কোন বন্দী নিবাসে প্রেরণ করা হইবে না এই মর্ম্মে সরকার কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতেছেন না।

গত ২রা আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার নিকট হইতে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট জবাব দাবি করার জন্য হাজরা পার্কে যে জনসভা হয়, লাঠি চার্জ্জ করিয়া ও পরে গুলিচালাইয়া সে সভা ছত্রভঙ্গ করা হয়। ১৪৪ ধারা তুলিয়া লইয়া লোক দেখানো যে গণতন্ত্রের ধোঁকা দেওয়া হইয়াছিল এই ঘটনায় তাহার স্বরূপ ফাঁস হইয়া পড়ে।

২০০০ শ্রমিক-ছাত্র-মাহিলার এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পোর্টের জনৈক শ্রমিক। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সদ্যমুক্ত হইয়াছেন এইরূপ একজন অনশন ধর্ম্মঘটী প্রকাশ করেন যে সরকার বন্দীদের সহিত যে সকল চুক্তি করিয়াছিলেন তাহা আদৌ মানা হইতেছে না। প্রচুর মিলিটারী নিয়োগ করিয়া বন্দীদের জোর করিয়া বাংলার বাহিরে লওয়া হইবে এইরূপ একটি কথা উঠিয়াছে। তাহাদের লওয়া হইবে না, সরকারকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। জেলের ভিতর বন্দী ও বাহিরের জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা অবিলম্বে বন্দীদের মুক্তি দাবী করিতেছে।

সভায় গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য পুলিস এই সময় প্ররোচকের মত একজন পত্রিকা বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করে। জনসাধারণ তাহার মুক্তি দাবি করিলে আর একটি পুলিসদল লাঠিচার্জ্জ করিয়া জনসভা ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে।

ইহার ফলে জনতার সহিত পুলিসের এক খণ্ড সংঘর্ষ সুরু হয়। ইষ্টক বর্ষণের ফলে কয়েকজন পুলিস আহত হয়। আশুতোষ কলেজের নিকটের রাস্তা ও চতুষ্পার্শের মানুষ জমায়েত হইলে পুলিস গুলি ও টিয়ারগ্যাস চালায়। গুলিতে কেহ হতাহত হয় নাই।

১৫ই আগষ্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪০৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ; পশ্চিম বঙ্গে ৩০৲ টাকা উঠিয়াছে। ট্যাক্সের পর ট্যাক্সের বোঝা গ্রামের গরীবদের সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। এবারকার ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস ও লীগ সরকারের এই আশীর্ব্বাদের কথা-ই গ্রামের সর্ব্বহারা ও গরীবদের মনে পড়িতেছে।

দুই বছরের কুশাসনে কংগ্রেস ও লীগ সরকার গোটা ভারতবর্ষকে এক বিরাট কয়েদখানায় পরিণত করিয়াছে। গণতন্ত্রের নামে জনসাধারণের সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারও তাহারা নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছে! নগরীর রাজপথ ও গ্রামের রাস্তা শতাধিক মজুর-কৃষক-নারী ও ছাত্রের রক্তে রক্তাক্ত হইয়াছে কংগ্রেস ও লীগের কর্ত্তাদের আদেশে। কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে বে-আইনী ঘোষিত এবং পাকিস্তানে ও ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যত্র অঘোষিতভাবে বে-আইনী হইয়াছে। হাজার হাজার গণতান্ত্রিক নেতা ও কর্ম্মী, হাজার হাজার মজুর, কৃষক, নারী, ছাত্র বিনাবিচারে কালাকানুনে আটক রহিয়াছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে, বিড়লাগোষ্ঠীর প্রয়োজনে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যার চেষ্টা চলিতেছে।

কিন্তু এসব সত্বেও গণবিক্ষোভ আজ ফাটিয়া পড়িতেছে ; শত শহীদের রক্তে রাঙা ঝাণ্ডা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া অপরাজেয় শ্রমিকশ্রেণীর জয়যাত্রা সগৌরবে আগাইয়া চলিয়াছে। পটারী ও এলেনবেরী প্রভৃতির মজুর, কাকদ্বীপ, বড়াকমলাপুর, খেতুয়া, ডেঙ্গুয়াঝোড়া, লয়ানগঞ্জ প্রভৃতির ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক তাহাদেব অমর প্রতিরোধের মধ্য দিয়া পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী সরকারের সকল ষড়যন্ত্র চানচাল করিয়া দিয়াছে। মরমনসিংহের গারো পাহাড়ের নীচে, উত্তর বঙ্গের সীমান্তে ও সুন্দর বনের প্রান্তে সারা পূর্ব্ববঙ্গের সংগ্রামী ক্ষেতমজুর ও শোষিত কৃষক নিজেদের রক্ত ঢালিয়া স্বাধীনতার নূতন লড়াই গড়িয়া তুলিয়াছে, নেতৃত্ব করিতেছে মজুরশ্রেণীর—লালমণির হাটের রেলমজুর, কুষ্টিয়ার সুতাকল শ্রমিক। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শোষিত জনতার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিরোধ কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের সকল প্ল্যান বানচাল, ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে।

নেহরু-লিয়াকত ভাবিয়াছিল গ্রেডী সাহেবের দাওয়াই শিল্পে শান্তির ভেলায় চড়িয়া তাহারা সংকট সমুদ্র পার হইয়া যাইবে! কিন্তু নেহরু-লিয়াকতের কলার-ভেলা তো কোন্ ছার, গ্রেডী সাহেবের কলের জাহাজও আজ সংকট ও মন্দার ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া ডুবিয়া যাইতেছে! ডলার ঘাটতির আবর্ত্তে পড়িয়া ধনিকশ্রেণী হাবুডুবু খাইতেছে।

নেহরু-লিয়াকত ও তাহাদের প্রভু বিড়লা-ইস্পাহানীর দল ভাবিয়াছিল, মার্শাল পরিকল্পনা ও মার্কিন অস্ত্র ও এটমবোমার সহায়তায় দুনিয়া হইতে শ্রমিকরাজ লুপ্ত হইয়া যাইবে, বিড়লা-টাটার শোষণ ব্যবস্থা, নেহরু-লিয়াকতের শাসন-গদি চিরদিন কায়েম মোকাম থাকিবে। এই ভরসায়ই ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং প্রভৃতি অগণিত শহীদ যে ইউনিয়ন জ্যাক নামাইবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, সেই ইউনিয়ন জ্যাককে নেহরু-লিয়াকত বেহারার মতো উড়াইয়াছে! সেই ভরসায় নেহরু-লিয়াকত কমনওয়েলথের বাহিরে আসার বদলে এটলী-বেভিনের ল্যাজে ল্যাজে ঘুরাবার জন্য, কমনওয়েলথ্ গোলামীর সনদকে আগে ঘোষণা করিয়া বাহাদুরি লইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছে।

আমাদের দেশের ও গোটা দুনিয়ার বুকে ও সারা দেহে এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষত দগ্‌দগ্ করিতেছে। কিন্তু মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখনই মুনাফার পাহাড়ের আকাঙ্ক্ষায় আর এক মহাযুদ্ধের বড়যন্ত্র করিতেছিল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার গণতন্ত্র ও শান্তির শিবিরের বিরুদ্ধে। ট্রুম্যান-এটলীর আর্দ্দালী সাজিয়া নেহরু ও লিয়াকত মহাউৎসাহে গোটা ভারতবর্ষকে সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধঘাঁটি করিবার কাজে লাগিয়া গিয়াছে। নেহরুর গায়ে লেবেল—গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। লিয়াকতের গায়ে লেবেল—ইসলামী শরিয়ত ও ইসলামী সমাজতন্ত্র। মুখে মুখোস ; উপরে লেখা নিরপেক্ষতা। পায়ে ঘুঙুর-বাঁধা ঔষধ বিক্রেতার ন্যায় তাহারা সারা দুনিয়ার নিরপেক্ষতা বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। আর কাজ কি করিয়াছে ? সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে মালয়ের গণ-অভ্যুত্থান দমনের জন্য এদেশ হইতে সৈন্য গিয়াছে। বর্ম্মার গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিবার জন্য অস্ত্র পাঠাইতেছে নেহরু-লিয়াকতের সরকার। এসিয়ায় কমিউনিজম-এর প্রসার রোধ করার সুপবিত্র দায়িত্ব লইয়াছে ভারতবর্ষের দুই ধনিক সরকার। কিন্তু চীনে-মুক্তি ফৌজ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিজয় দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় অপরাজেয় মুক্তি-যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ধারালো মুখ ভোঁতা করিয়া দিয়াছে—কমিউনিজমএর ভয়ে নেহরু-লিয়াকত ও তাহাদের প্রভু মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কাঁপিতেছে।

তাই এবারকার ১৫ই আগস্টের পূর্ব্বাহ্নে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদে বড়ো বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে! কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বলিয়াছেন, এবার ১৫ই আগস্ট উৎসব নয়, শুধু প্রার্থনা ও সেবা কর, ফসল বাড়াও। পাকিস্তানের বড়লাট নাজিমউদ্দিন বলিয়াছেন পাকিস্তানের অনেক অগ্রগতি হইয়াছে ; তাহার দীর্ঘ জীবনের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা কর। গণবিক্ষোভের দাবানল দেখিয়া এবার আর উৎসবের উৎসাহ নাই ; আঙ্গুর বড় টক হইয়া গিয়াছে।

ভুঁইফোড় ধনিকগণ পাকিস্তানের জন্য দোয়া করিতেছে সন্দেহ নাই। পারমিট-ওয়ালার দল, মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর দল, বিড়লা-টাটা-ইস্পাহানীর গোষ্ঠী মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের শরতানীকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণী এবার নিজেদের পথে ১৫ই আগস্টে সমারোহ করিবে। কারখানায় তাহারা উড়াইয়া দিবে মজুরের লালঝাণ্ডা। ধনিক শ্রেণী যদি কারখানা খোলা রাখে তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে। গোটা শিল্পাঞ্চলে, যেখানে মজুর, যেখানে তাহার বস্তী, সর্ব্বত্র তাহারা বিক্ষোভ সংগঠন করিবে, হরতাল করিবে গ্রামের ক্ষেত মজুর, গরীব চাষী। বিক্ষোভ দেখাইবে ছাত্র-নারী-কৃষক-মজুর—সমগ্র গণতান্ত্রিক জনতা। কমনওয়েলথ গোলামী খতম করার জন্য মার্কিন ও বৃটিশ তাবেদারি খতম করার জন্য, জনতার গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রমিকশ্রেণী এবার অমোঘ শপথ লইবে।

এবারের ১৫ই আগস্ট তারিখে সাম্রাজ্যবাদের ও ধনিক-জমিদারের দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করার সংকল্প সারা বাংলায় ঘোষিত হইবে, ধ্বনিতেপ্রতিধ্বনিত হইবে। ধনিকের ১৫ই আগস্ট আর না ফিরিয়া আসে তাহারই জন্য মুষ্টিবদ্ধ হস্তে বজ্রদৃঢ় শপথ লইবে সংগ্রামী জনতা ও শ্রমিক শ্রেণী।

নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার কুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র কর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাহায্য করিতেছেন দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা। সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে বক্তৃতা ও বিবৃতির কোথাও তাঁহারা বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি কথা বলেন নাই। বরং সমাজতন্ত্রীনেতা লোহিয়া কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর নিকট 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে হাত বাড়াইয়াছেন। পশ্চিম বাংলার শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়মতান্ত্রিক পথে টানিবার উদ্দেশ্য লইয়া জয়প্রকাশনারায়ণ কলিকাতায় আসিয়াছেন। কারখানায় ধর্ম্মঘটের ময়দানে নয়, ভোটের বাক্সে বিড়লাজীর রাজত্ব খতম করিব—সমাজতন্ত্রী নেতারা শ্রমিকদের মধ্যে এই মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করারই চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বক্তৃতা ও বিবৃতি দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের অনুকরণেই তৈরী। শ্রীবসু এমন কি গণভোটের দাবী পর্য্যন্ত তোলেন নাই ; নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কালাকানুন প্রত্যাহার, কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ করা, বিনাবিচারে আটকদের মুক্ত করার কথা বলিয়া কংগ্রেসী শাসকদের বিব্রত করিতে চাহেন নাই। শরৎ বসু বা জয়প্রকাশনারায়ণ নির্ব্বাচনকে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করার কথা কল্পনা করিতে পারেন না বলিয়াই গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রাম তাঁহাদের কার্য্যক্রমে স্থান পায় না। নির্ব্বাচনী ধাপ্পাবাজির মুখোস খোলার পরিবর্ত্তে তাঁহারা নির্ব্বাচন সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মোহ সৃষ্টি করেন, নির্ব্বাচনকে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য গড়িবার কাজে ব্যবহার না করিয়া ঐ উপলক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভেদ-সৃষ্টি করেন।

পশ্চিম বাংলার জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণী কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর এই নির্ব্বাচনী ধাপ্পাবাজিকে চূর্ণ করিবে অসংখ্য শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে। বিড়লার বন্ধু নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার অবসান ছাড়া কারখানায় হাঁটাই হইতে বাঁচিবার উপায় নাই, কথায় কথায় গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক হইবার সম্ভাবনা হইতে রেহাই নাই। 'অর্থনৈতিক সংকট' হাল করার নামে তাঁহারা মজুরি কাটার বড়যন্ত্র করিতেছেন, 'খাদ্য-সংকট' হাল করার নামে তাঁহারা গরীব কৃষকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছেন, জনগণকে আরো কম খাইতে উপদেশ দিতেছেন ; সরকারী ব্যয় কমাইবার নামে তাঁহারা আশ্রয়প্রার্থীদের বৃষ্টির জলে ঠেলিয়া দিতেছেন। বিনা-বিচারে আটক বন্দীদের দেশান্তরে পাঠাইয়া তাঁহারা পশ্চিম বাংলাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বিড়লাজীর জন্যে নিরাপদ করিতেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে সমগ্র গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ এই নূতন নূতন আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করিয়াই নির্ব্বাচনী খেলার আসল মতলব ফাঁস করিয়া দিবে। যে সাধারণ নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী তাঁহাদের অত্যাচারী শাসনকে স্থায়ী করার স্বপ্ন দেখিতেছেন, শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করিয়া ঐ সাধারণ নির্ব্বাচনকেই শ্রমিকশ্রেণী কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গণ-বিপ্লবে পরিণত করিবে।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষকসভার বিবৃতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিহত করিয়া আমাদের সারা প্রদেশে কৃষক সভার কাজ ও সংগঠনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের সামনে এই মুহূর্ত্তের সব চেয়ে জরুরী আওয়াজ : **কৃষক সভার সংগঠন চালু কর : গাঁয়ে গাঁয়ে গরীব চাষীর নেতৃত্বে কৃষক সমিতি গড়ে তোল।**

ক্ষেতমজুরগণ আজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে নিজেদের সম্মেলন করিতেছেন, নিজেদের সমিতি গ্রামে গ্রামে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি গ্রামের ক্ষেত মজুর সমিতি ও কৃষক সমিতি মিলিয়া যুব লড়াই কমিটি গড়িয়া তুলিবে : যুক্ত নেতৃত্বে গ্রামের গরীবদের লড়াই পরিচালনা করিবে।

আগামী ৮ই ও ৯ই ভাদ্র কলিকাতায় প্রাদেশিক ক্ষেত মজুর সম্মেলন হইবে। তারপরই কলিকাতায় ৯ই ও ১০ই ভাদ্র (২৬শে ও ২৭শে আগস্ট) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ঐ ১০ই ভাদ্র বিকালে ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশ হইবে।

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় প্রত্যেক জিলা কৃষক সমিতিকে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা জেলা কৃষক সমিতির বৈঠকে এই সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবেন।

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষক সমিতিকে এই অধিবেশনে (ভ্রাতৃত্বমূলক) প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

মঞ্জিল

ঢাকায় ৯ই মার্চ্চের পর রেল-মজুরদের নূতন জাগরণ

৯ই মার্চ্চের পর পাকিস্তান সরকার এবং তাহার চেলাচামুণ্ডারা রেল-শ্রমিকদের উপর তিনটি বড় ধরনের আক্রমণ করিয়াছে।

প্রথমত, সস্তা গ্রেনশপ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, ঢাকায় কমপক্ষে তিন শত শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে, ইহার বেশীর ভাগই কারখানার শ্রমিক এবং গ্যাংম্যান।

তৃতীয়ত, শত শত শ্রমিককে রিভার্ট করা হইয়াছে।

গ্রেনশপ সম্পর্কে শ্রমিকরা দাবী করিয়াছিল গ্রেনশপের দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা দূর করিতে হইবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ঠিক উল্টা আঘাত হানিয়াছে, সস্তা গ্রেনশপই তুলিয়া দিয়াছে। পে-কমিশনের রায় ২৪ টাকা হইবে ৩০ টাকা হারে মাগ্‌গিভাতা বাড়াইয়াছে। কিন্তু নগদ পাইবার একমাস যাইতে না যাইতে অনগ্রসর শ্রমিক পর্য্যন্ত এ সত্য বুঝিতে পারিয়াছে যে, লাভের গুড় পিপড়ায় খাইয়া দিতেছে, এখন শ্রমিকের বুকের হাড় চিবাইয়া খাইবার অবস্থা হইয়াছে। আগে সস্তা গ্রেনশপ হইতে যে রেশন কিনিতে ১৬ টাকা লাগিত এখন ঢাকার মত রেশন এলাকাতেও তাহা কিনিতে ৫৬ টাকায় কুলায় না, রেললাইনে যেখানে রেশন ব্যবস্থা চালু নাই সেখানে অবস্থা আরো সঙ্গীন। ঢাকা শহরে রেশন এলাকার কথাই ধরা থাক। আগে সস্তা গ্রেনশপে চাল ছিল প্রতিমণ ৮৮০ আনা, এখন রেশনের চালের দাম ২১।০; আগে তেল মিলিত আট আনা সের; এখন তিন টাকা আট আনা, আগে চিনি ছিল ছয় আনা, এখন এক টাকা; আগে ডাল ছিল চার আনা, এখন সেখানে এক টাকা; আগে গুড় ছিল তিন আনা এখন বারো আনা; আগে সাবান ছিল দশ আনা, এখন এক টাকা ইত্যাদি। তছাড়া রেশন এলাকাতেও রেশনের চালে সারা সপ্তাহ চলে না, চোরাবাজারে ৪০ টাকা দামে কিনিতে হয়। লাইনের শ্রমিকদের অবস্থা আরো দুঃসহ। কারণ ৬০ টাকা মাহিনার শ্রমিককে ৪০ টাকা দরে চাল কিনিয়া খাইতে হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে চাকুরী নামে মাত্র দাঁড়াইয়াছে। জমিচাষ ও অন্যান্য ভাবে খাটিয়াও সংসার চলিতেছে না। ঢাকার তিন হাজারের মধ্যে ৫০০ শত শ্রমিক লাইনে কাজ করে। গ্রেনশপ উঠিয়া যাওয়া ইহাদের মৃত্যুর রাজপথে আনিয়া খাড়া করিয়াছে।

গ্রেনশপ তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে যেকথা ছাঁটাই সম্পর্কেও সেই একই কথা। শ্রমিকরা দাবী করিয়াছিল মূল বেতন বৃদ্ধি এবং স্থায়ী চাকুরী, বদলে পাইতেছে—ছাঁটাই। [illegible] পরের সুযোগ লইয়া রেলের কর্ত্তৃপক্ষ মরিয়া হইয়া ৩ শত শ্রমিককে ছাঁটাই করিয়াছে।

আবার ছাঁটাইয়েরই নামান্তর হইল রিভার্শন, অর্থাৎ এই যে, গলা টিপিয়া একেবারে না মারিয়া তিলে তিলে মারার এ-এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। রিভার্ট করিলেই খরচ বাঁচে, কম টাকায় একই কাজ করানো যায়। ড্রাইভারকে ফায়ারম্যান, ফায়ারম্যানকে ক্লিনার, ক্লিনারকে ফিটার অথবা ফায়ারম্যান ক্লিনার হইতে সরাসরি গ্যাং খালাসী। এক ঢাকা শেড হইতেই ২ শত জনকে রিভার্ট করা হইয়াছে। অন্য জেলা হইতে প্রায় এক শত গ্যাং খালাসী রিভার্ট হইয়া ঢাকায় আসিয়াছে।

৯ই মার্চ্চের পরে এমনি ভাবে বেপরোয়া আক্রমণ চলিয়াছে, এমনিভাবে পে-কমিশনের নামে সস্তা রেশন শপ উঠাইয়া দিয়া, ছাঁটাই করিয়া এবং রিভার্শনের দ্বারা অকথ্য অত্যাচার চলিতেছে।

এই সঙ্গে আছে প্রতিদিনের আরও অসংখ্য আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই আক্রমণ এতভাবে এত দিক দিয়া আসিতেছে যে, সবগুলির হিসাব দেওয়া শক্ত। শ্রমিকদের উঠিতে বসিতে বাপান্ত করা হইতেছে।

আগে ৫॥ টায় ছুটি হইত, ১লা জুন হইতে ফরমান জারি হইয়াছে, ৫টা হইতে ছুটি হইবে। যাহাদের মাহিনার হার ৬০-৭৫৲ টাকা তাহাদের মাগ্‌গীভাতা ৩০৲ টাকার বদলে হঠাৎ ২৪৲ টাকা দেওয়া সুরু হইল। পূজার ৯ দিনের ছুটি দেওয়া বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঈদের ছুটির সঙ্গে যোগ করা হইল না, অর্থাৎ শ্রমিকদের ৯ দিন বেশী কাজ করান হইল।

ইহার মধ্যে আবার রানিং শেডে অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কোন মজুর অনুপস্থিত থাকিলে নীচের স্তরের শ্রমিককে দিয়া 'রিলিফ' করানো হইত, ফলে সেই ক'দিনের জন্য তাহাকে উপরিহারের মজুরের মাহিনা দেওয়া হইত, গত তিন মাস সে-সব উঠিয়া গিয়াছে। উপরিহারের মজুরি যাহাতে বুভুক্ষু মজুরের হাতে দু'টো টাকাও না আনিতে পারে সে জন্য রিলিফের কাজ নিত্যই নূতন নূতন শ্রমিককে দিয়া করানো হইতেছে।

পূর্ব্বে ড্রাইভার ফায়ারম্যানদের 'কল বুক' হইলেই তাকে 'অনডিউটি' ধরা হইত, কিন্তু গত তিন মাস রানিং সেডে সে নিয়ম বন্ধ হইয়াছে, ফলে রানিং শেড হইতে ইঞ্জিন মাজিয়া ঘসিয়া বাহির করিয়া যে পর্য্যন্ত না গাড়ীতে জোড়া হইতেছে সে পর্য্যন্ত (তার অর্থ আগে পিছে দেড় ঘণ্টা করিয়া মোট তিন ঘণ্টা!) বেগার খাটিতে হইবে, অথচ তিন মাস আগেও এ কাজের জন্য মাহিনার রীতি ছিল।

রানিং শেডের মত ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টেও রিলিভিয়ের ব্যাপারে জোচ্চুরি চলিতেছে। পে-কমিশনে ঘোষণা করা হইয়াছিল, ট্রাফিকের শ্রমিকদের এগারো আনার বদলে এক টাকা দু'আনা ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স দেওয়া হইবে, কিন্তু এখনো আগের নিয়মই চলিতেছে, পার্থক্য শুধু এই যে, বিল করিলেও তাহা পাশ হইয়া আসিতেছে না, ৪।৫ দিন পর অফিসের মর্জ্জিমত কাটাকাটি করিয়া আসিতেছে।

আগে মজুররা অসুস্থ হইলে হেড কোয়ার্টারে যাইয়া চিকিৎসা করাইত এবং সুবিধা অনুযায়ী থাকিতে পারিত, বর্ত্তমানে এলাকার অফিসারদের কাছ 'সীক' রিপোর্ট করিতে হয়, ফলে প্রকৃতপক্ষে অচিকিৎসায় অসুস্থ শ্রমিক দিন কাটাইতেছে।

গ্যাংম্যানদের জোর করিয়া দশ এগারো ঘণ্টা খাটানো হইতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ৯ই মার্চ্চের পর ঘুষের রাজত্বে সীমানা বাড়িয়াগিয়াছে, ছুটি, অসুখ, চার্জ্জসীট, রিভার্শন কোন ব্যাপারেই ঘুষ ছাড়া কিছু হইবার উপায় নাই।

কিছুদিন হইতে একটা ফাঁকা কাগজে সহি নেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। তাহাতে লেখা আছেঃ পে-কমিশনের রায় যখন ঠিকমত বাহির হইবে তখন যাহারা গত দু'মাসে বেশী টাকা পাইতেছে (!) তাহাদের টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে। ইতিমধ্যেই উক্ত ফাঁকা কাগজের জোরে বহু মজুরের কাছ হইতে কিছু কিছু টাকা কাটিয়া লওয়া হইতেছে।

বর্ত্তমানে নাকি কর্ত্তারা একটা বণ্ড তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহাতে মজুরের জবানীতে লেখা আছেঃ আমরা আর মাহিনা বৃদ্ধি চাহিব না!

৯ই মার্চ্চের পর এইভাবে প্রতিদিন রেল শ্রমিকের রুজি-রোজগার সংসার পরিবার, মান-ইজ্জত পাকিস্তানী লীগ সরকারের বুটের তলায় দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শ্রমিকের ধূমায়িত অসন্তোষ তাই প্রতি ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ফাটিয়া পড়িতেছে। একটা বৃহত্তর সংগ্রামের আগে বিক্ষোভগুলি আংশিক ও স্থানীয় সংগ্রামে রূপ ধরিতেছে। ঢাকা কারখানায় ২৯শে জুন, ১লা জুলাই এবং ৮ই জুলাই তিন তিন বার প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধর্ম্মঘটের রূপ ধরিয়াছে।

ঢাকা কারখানার গুরুত্ব হইল এই জায়গায় যে, ঢাকার অন্যান্য রেলশ্রমিকরা ওয়ার্কসপের ১৪ শত শ্রমিকের উপর ভরসা করিয়া থাকে এবং লাইনের শ্রমিকেরা আবার ঢাকার শ্রমিকদের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই ওয়ার্কশপের শ্রমিকরাই ৩১শে জানুয়ারী ঢাকার ষ্টেশন দখল করিয়া ৬ ঘণ্টার জন্য রেল চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; তাহারাই ৯ই মার্চ্চের বীর সেনার কাজ করিয়াছে, প্রচারের দিক হইতে তাহারাই সকলের পুরোভাগে ছিল। ৯ই মার্চ্চের দমননীতির প্রায় ষোল আনা তাহাদেরই ভোগ করিতে হইয়াছে। পাকিস্তানী পুলিস মিলিটারী তাহাদের ফ্যাক্টরী কলোনী ঘিরিয়া ভয়ের রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল। এসব সত্ত্বেও এবারও ওয়ার্কশপের শ্রমিকরাই পথ দেখাইয়াছে।

রেল কর্ত্তৃপক্ষ শুক্রবারের নামাজের ছুটির বদলে প্রতিদিন আধ ঘণ্টা বেশী কাজ করাইতেছিল এবং হঠাৎ ৬০।৭৫৲ টাকা মাহিনার মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা ৩০৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকা করে। ইহাতে ওয়ার্কশপের ১৩টি ডিপার্টের ১৪ শত শ্রমিক দাবী করে—৫॥০টায় ছুটি চাই, ৩০৲ টাকার এক পয়সা কম মাহিনা দেওয়া চলিবে না।

হঠাৎ ওয়ার্কশপ নিস্তব্ধ হইয়া গেল, শ্রমিকদের থামাইতে আসিয়া এমপ্লয়িজ লীগের দালাল প্রচণ্ড প্রহার খাইল। শ্রমিকদের চোখে মুখে আগুন, তাহারা ৯ই মার্চ বহুৎ পুলিস দেখিয়াছে এবার সেজন্যও তাহারা প্রস্তুত। আড়াই ঘণ্টা পর পুলিস ডাকিতে ইতস্ততঃ করিয়া ডি-এম-ই শ্রমিকদের সামনে হাজির হইলেন। দাবী মানিয়া লইলেন, ছুটির প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর কাজ সুরু হইল।

কিন্তু ১লা জুলাই ৫॥০টার প্রতিশ্রুত ছুটির ঘণ্টা বাজিল না, শ্রমিকরা দাঁতে দাঁত চাপিয়া বাহির হইয়া আসিল। আট জন মিস্ত্রী কারখানার মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইল, ৫টায় ছুটির ভেঁপু বাজিল, কিন্তু তার আগেই মালিকের বদলে শ্রমিকেরা নিজেদের ছুটির ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

৮ই জুলাই প্রবল উত্তেজনা সুরু হয়, ৩০৲ টাকা ভাতা ও ছুটি আইনতঃভাবে স্বীকৃতির দাবী লইয়া শ্রমিকেরা অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে। ডি-এম-ই মাথা হেঁট করিয়া দাবী মানিতে বাধ্য হয়। তখন শ্রমিকদের মধ্যে পূজার পাওনা ছুটি লইয়া প্রচণ্ড হৈ-চৈ চলিতে থাকে। তা'ছাড়া সমস্ত শ্রমিক দাবী তোলেঃ পে-কমিশনের বকেয়া পাওনা (জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ) হইতে এক মাসের মাহিনা ঈদের পূর্ব্বে দিতে হইবে। ডি-এম-ইকে শ্রমিকরা ঘিরিয়া ফেলে। ফলে ডি-এম-ই নোটিস দিয়াছে, যে মাহিনা ৮ই আগষ্ট দেওয়ার কথা সে মাহিনা ১৫দিন আগে ২২শে জুলাই দেওয়া হইবে।

রানিং শেডেও শ্রমিকের প্রতিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। মে মাসের শেষ দিকে ক্লিনাররা ফোরম্যানকে ঘেরাও করে, প্রায় ১ঘণ্টা কাজ বন্ধ থাকে, উপযুক্ত নেতৃত্ব দিলে ওয়ার্কশপের মতই প্রতিরোধ প্রতি আক্রমণের রূপ লইত।

সম্প্রতি রিলিভিং-রের বদমাইয়েসী লইয়া একজন শ্রমিক ফোরম্যানকে মারিতে যায়। পরে ডি-এম-ই এবং এ-ডি-এম-ই আসিলে তাহাদেরও সেই শ্রমিক ভাই মারিতে উদ্যত হয়। তাহাকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য সসপেণ্ড করা হইয়াছে। ইহাতে একে একে ৯ জন ট্রাফিক শ্রমিক প্রতিবাদ করিলে তাহাদেরও সসপেণ্ড করা হয়, নিশ্চিত সসপেণ্ড হইবে জানিয়াও মজুর ভাইয়েরা প্রতিবাদ করিতে ভয় পায় না।

কারাই ষ্টেশনে টি-আইকে মারিবার জন্য শ্রমিকেরা জটলা বাঁধে। টি-আই প্রাণ লইয়া কোনমতে পালাইয়া বাঁচে।

ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই যে, কোনো স্থানে কোনো একটা ঘটনা ঘটিলেই শ্রমিকদের চোখমুখ আনন্দ-উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

৯ই মার্চ্চের পর সংকটবৃদ্ধি এবং অকথ্য জুলুমের ফলে মজুরের শ্রেণীচেতনা বাস্তবে রূপ পাইতেছে, মূলদাবী অর্থাৎ সস্তা

(১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসনের দুইবছর

পূর্ব্ববঙ্গে তথা পাকিস্তানে লীগ শাসনের আরও এক বছর শেষ হইয়াছে।

৩৫ই আগস্ট এই বছর শেষ হওয়ার কিছুদিন আগে ঈদের বাণীতে পাকিস্তানের বড়লাট খাজা নাজিমুদ্দিন বলিয়াছেন, "গত দুই বছরে আমরা যে অগ্রগতি করিয়াছি তাহাতে আমাদের মন উৎসাহ ও আশায় ভরিয়া গিয়াছে।"

'অগ্রগতিই' বটে! চাউলের দামের 'অগ্রগতি' হইয়া আজ পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিমণ ৩০।৪০৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। মজুরের মজুরি কাটা, ছাঁটাই, মেহনতী কৃষকের অনাহার, মধ্যবিত্তের বেকারী পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জনসাধারণকে যে ধ্বংসের পথে 'অগ্রগতি' করিয়া দিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তা ছাড়া নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার ফৌজের গুলিতে গত এক বছরে চট্টগ্রামের মাদারশায়, ময়মনসিংহে, খুলনায়, রংপুরে ৬৫ জন নিহত ও অগণিত আহত গরীবের রক্তে গ্রামের মাঠ লাল হইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহে, খুলনায়, রংপুরে লীগ মন্ত্রিসভার এই ফৌজ বহু নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারও করিয়াছে।

জনসাধারণের অনাহার, গরীবের রক্ত ও নারীর ইজ্জত নাশের উপর দিয়াই এবার লীগ নেতাদের 'স্বাধীনতা' দিবস উদ্‌যাপিত হইতেছে।

কমনওয়েলথের দাসত্ব

পূর্ব্ববঙ্গে আজ যে বর্ব্বর দমননীতি চলিয়াছে তাহার নির্লজ্জ সমর্থনে লীগ নেতারা বলেন: "পাকিস্তানের স্বাধীনতা'কে রক্ষা করার জন্যই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।"

স্বাধীনতার একটি মূল কথা হইল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি কমনওয়েলথ চুক্তিতে সহি দিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের পায়ে দাসখত লিখিয়া দিয়া জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।

দুনিয়ার গণতান্ত্রিক জনগণ আজ জানে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীগণ দুনিয়া হইতে গণতন্ত্রকে মুছিয়া ফেলার জন্য সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই যুদ্ধের জন্যই সোভিয়েটকে বাদ দিয়া ধনবাদী দেশগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে 'আটলান্টিক চুক্তির' আড়ালে যুদ্ধের জোট বাঁধিয়াছে।

এসিয়াতে যুদ্ধের ঘাঁটি বানাইবার জন্য ও বর্ম্মা, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতার লড়াইকে পিষিয়া মারার জন্য আরও একটি সামরিক জোট বাঁধার উদ্দেশ্যেই মার্কিন ধনকুবেরদের হুকুমমতই 'কমনওয়েথ সম্মেলন' হয়। সেই কমনওয়েলথ চুক্তিতে সহি দিয়া মিঃ লিয়াকত আলি পাকিস্তানের ধনজনকে সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাদীদের হাতে সপিয়া দিয়াছেন। সেই কমনওয়েলথ চুক্তি অনুসারেই লিয়াকত আলি সরকার নেহরু সরকারের সহিত একজোটে থাকিন-নু সরকারকে সাহায্য পাঠাইয়া বর্ম্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘাতকের কাজ করিতেছেন।

পাকিস্তানের লীগ সরকার দেশের জনগণকে ভাত কাপড় হইতে বঞ্চিত করিয়া এবারকার বাজেটে ৪০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরিয়াছেন। দেশের জনগণ যখন দু'মুঠো ভাতও পায় না, তখন এত টাকা সামরিক খাতে কেন ব্যয় হইতেছে তাহার কৈফিয়তে লীগ নেতারা বলেন যে 'ভারতের আক্রমণ হইতে পাকিস্তানের আত্মরক্ষার জন্যই সামরিক খাতে এত টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে।' এই কথা কি সত্যি?

নেহরু সরকারের সঙ্গে লিয়াকত আলি সরকারের এখন গলায় গলায় পীরিত। উভয়েই কমনওয়েলথের দাস। কাশ্মীর নিয়া উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহাও এখন ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের হুকুম মত মিটিয়া গিয়াছে। ভারতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার আওয়াজ মিছে কথা।

আসলে, ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাদীদের হুকুমে লীগ সরকার জনগণকে ভুখা রাখিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যই ৪০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা খরচ করিতেছে।

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের পর ইস্পাহানী হাসেম কাসেম দাদা হারুণ প্রভৃতি ধনিকগোষ্ঠী ও নবাব জমিদারগণ পাকিস্তানের মালিক হইয়াছেন। গণজাগরণে এই শোষকদল আজ ভীত। এই শোষকদলের স্বার্থে ও নির্দ্দেশেই লিয়াকত আলী সরকার কমনওয়েলথ চুক্তিতে সহি দিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে পাকিস্তানের ধনজন সপিয়া দিয়াছেন।

কাজেই লীগ শাসনের দুই বছর জনগণকে স্বাধীনতা দেয় নাই—দিয়াছে ইঙ্গ-মার্কিন ধনকুবেরদের গোলামী ও যুদ্ধের বিভীষিকা।

অন্যদিকে, ধনীদের স্বার্থের জন্যই গত এক বছরের লীগ শাসনে মজুরের উপর আক্রমণ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

গত মার্চ্চ মাসে সরকার পে-কমিশন চালু করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের রেলের ৬৫ হাজার মজুরের আসল মজুরি কাটিয়া দিয়াছেন। পে-কমিশনে রেল মজুরদের মাসিক মাহিনা টাকার অংকে ৩০৲ টাকা বাড়িয়া মোট ৬৫৲ টাকা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যখন জীবন ধারণের খরচ প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন রেল মজুরদের মাহিনা ৩৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা করা হইলেও ইহাতে মজুরদের কোন সমস্যাই দূর হয় নাই। তদুপরি যে গ্রেনশপ গরীব মজুরদের নিকট ছিল একটা রক্ষা কবচের মত, পে-কমিশনে লীগ সরকার সেই গ্রেনশপই উঠাইয়া দিয়াছেন। ফলে, আগে মজুরগণ গ্রেনশপ হইতে ৯ টাকা দরে প্রতিমণ চাউল পাইতেন। এখন সেই চাউল কিনিতে হয় ৩০৲।৪০৲ দরে। আগে গ্রেনশপ হইতে মজুরগণ তেল, নুন, কাপড়, সাবান প্রভৃতি জিনিস যে দরে পাইতেন এখন ঐ সব জিনিস তিন চার গুণ দাম দিয়া বাজার হইতে কিনিতে হয়। ইহাতে পে-কমিশনের বাড়তি ৩০৲ টাকা খরচ ত হয়ই বরং আরও বেশীই খরচ করিতে হয়। এইভাবে লীগ সরকারের পে-কমিশনে রেলমজুরদের আসল মাহিনা কাটা হইয়াছে। লীগ শাসনের দুই বছরের শেষে তাই রেলমজুরদের ঘরে ঘরে অনাহার। সম্প্রতি ফরিদপুরের একজন রেল মজুর (গ্যাংম্যান) অনাহারে মারা গিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, পে-কমিশন রেলমজুরদের প্রতি সরকারের মোনাফেকী ছাড়া আর কিছুই নয়।

লীগ শাসনের গত এক বছরে সরকার এই রেলমজুরদের মধ্য হইতেই হাজার হাজার লোককে ছাঁটাই করিয়াছে। লীগ নেতাগণের এই সব মজুরকে পাকিস্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদা দিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসার লোভ দেখাইয়াছিলেন। বহু রেলমজুর তাহাতে বিশ্বাস করিয়াই নিজের চিরদিনের ঘর ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে এখন হাজার হাজার লোককে ছাঁটাই করিয়া তাঁহাদিগকে পথের ভিখারী বানানো হইয়াছে। হাজার হাজার রেল মজুরকে আলো-বাতাসহীন ওয়াগনে বালবাচ্চা বিবি নিয়া বাস করিতে হইতেছে।

লীগ সরকার বলেন যে, 'পাকিস্তান সরকারের তহবিলে টাকা নাই—কাজেই রেলমজুরদের মাহিনা আর বাড়ানো বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।' কিন্তু, সরকারের এই যুক্তি একটা বিরাট জালিয়াতী। রেলমজুরদের অনাহারে মরণের পথে ঠেলিয়া দিয়া লীগ সরকার ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের হুকুমে ৪০ কোটি টাকারও বেশী সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধের জন্য সামরিক খাতে ব্যয় করিতেছে। রেলমজুরদের বাসস্থানের জন্য যখন টাকা মিলে না তখন আমেরিকা ও বিলাতে পাকিস্তানের দূতের বাড়ীর জন্য যথাক্রমে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ও ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। তখনই মিঃ লিয়াকত আলীর বেগম সরকারী খরচায় বাড়ী সাজাইবার জন্য ৩৬ হাজার টাকার গালিচা কিনিয়াছে।

আসলে, মজুরের কাঁধে মরণের বোঝা চাপাইয়া ধনীর স্বার্থে ও বিলাসে অর্থ ব্যয় করাই লীগ সরকারের নীতি।

নারায়ণগঞ্জের সুতাকলগুলিতে লীগ শাসনের আমলে মজুরদের মজুরি মাসে ৩০।৪০৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ ঠিক এই সময়েই লীগ সরকার ধনীদের মুনাফার জন্য কাপড়ের দাম শতকরা ১২৫ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাতে জনগণকে শোষণ করিয়া যে বাড়তি লাখ লাখ টাকা মুনাফা হইয়াছে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ নিয়াছে সূর্য্য প্রভৃতি কাপড়ের কলের মালিক গোষ্ঠী ও হাণ্ডলিং এজেন্ট হানিফ এবং শতকরা ২৫ ভাগ নিয়াছে সরকার। আবার, অনবরত শোষণে জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়াতে যখন এই চড়া দামে কাপড় বিক্রয় না হইয়া গুদামে জমিতে থাকিল, তখনই মালিকগণ বহু তাঁত বন্ধ করিয়া হাজার হাজার মজুরকে ছাঁটাই করিয়াছে। লীগ শাসনের দুই বছরে সুতাকলগুলির প্রায় ৩ হাজার মজুর ছাঁটাই হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন। চা প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পেও ঠিক একই হাল।

এইভাবে হিন্দু-মুসলমান মজুরদের পেট কাটিয়া বিদেশী দেশী হিন্দু-মুসলমান ধনিক গোষ্ঠীর বিপুল মুনাফা করাই 'ইসলামী সাম্যের' ধ্বজাধারী নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার শ্রমনীতি। ইস্পাহানী-দাদা-হাব্রিফ-আমিন ব্রাদার্স সূর্য্যবোস রেলী এণ্ডাইয়ুল প্রভৃতি ধনিকের মুনাফার খাতিরে মজুরের উপর এই বীভৎস শোষণ চালু রাখিবার জন্যই লীগ নেতারা বলিতেছেন 'স্বার্থত্যাগ করিয়া পাকিস্তান গড়' 'শিল্পে শান্তি রক্ষা কর'।

ধনীর দালাল ফয়েজ আহমদ ও মোনাফেক রেল এমপ্লয়ীজ লীগের নেতারাও সরকারের পো ধরিয়া মজুরগণকে সেই একই কথা বলিতেছে।

'পাকিস্তান গড়া' ও 'শিল্পে শান্তির' কথার আসল অর্থ হইল—'মজুর-তুমি ধনীর মুনাফার জন্য না খাইয়া কাজ কর ও শান্তিতে কবরে যাও।'

দুই বছরের লীগ শাসন মজুরশ্রেণীকে দিয়াছে শুধু শোষণ ও অনাহার।

চাষীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

বাংলায় কৃষকের দাবী ছিল বিনা খেসারতে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ ও চাষীর হাতে জমি। লীগ নেতারাও চাষীকে জমি দিবার ওয়াদা দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ওয়াদা পায়ে মাড়াইয়া নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা জমিদারী ক্রয়ের যে বিল আনিয়াছে তাহাতে জমিদারদের কোটি কোটি টাকা খেসারত দেওয়া হইবে ও চাষীকে জমি দিবার বদলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উপর ধনী কৃষকদের ও জোতদারদের তীব্র শোষণের পথ করা হইয়াছে।

খাদ্য সম্পর্কে মিঃ নুরুল আমীন গত অক্টোবর মাসে খুব বড়াই করিয়া বলিয়া-

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মঞ্জিল

রেলমজুরদের নূতন জাগরণ

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রেনশপ এবং মূলবেতন বৃদ্ধির দাবী সমস্ত শ্রমিককে আজ একত্র করিতেছে!

এমপ্লয়িজ লীগের দালালরা শ্রমিকদিগকে ভুলাইবার জন্য নানা প্রচার করিতে সুরু করিয়াছে। তাহারা 'একতার' বুলি কপচাইতেছে অর্থাৎ লালঝাণ্ডা ছাড়িয়া এমপ্লয়িজ লীগের পতাকাতলে এক হও! তাহা হইলে জয় হইবে এবং দমননীতি চলিবে না। শ্রমিকরা তীব্র সংকট এবং তীব্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বুঝিয়াছে, কত ধানে কত চাল। তাই, ৭ই জুলাই তারিখ রাত্রিতে লাল ঝাণ্ডার প্রচার বাহিনীকে দেখিয়া বিভিন্ন কোয়ার্টারের অসংখ্য শ্রমিক রাত্রি বারোটার সময় বাহির হইয়া আসে। অনেকে হাত তুলিয়া লালঝাণ্ডার জয়ের জন্য দোওয়া মাঙ্গিতে থাকে!

অধিকাংশ শ্রমিকেরা আজ উপলব্ধি করিয়াছে যে, লালঝাণ্ডা ইউনিয়নই তাহাদের আসল দোস্ত। লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতেছে।

পূর্ব্ববাংলার গণতান্ত্রিক জনতার দাবী

ইস্পাহানী-দাদা-আমীন-হানিফদের দালাল মন্ত্রিসভার অবসান চাই

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

ছিলেন : বড়লোকদের মজুত খাদ্য সীজ করিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হইবে। কিন্তু, কার্য্যক্ষেত্রে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা কি করিতেছেন? নীচে মিঃ নুরুল আমীনের খাদ্য সংগ্রহের নমুনা দেওয়া হইল :

রংপুর জেলা—

নাম	কত জমির অধিকারী	কত ধান সীজের নোটিস
গিয়াসউদ্দিন চণ্ডীপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—	১৫০ বিঘা	০
কেফাতুল্লা হরিপুরের জমিদার—	৫০০ ”	০
মোহন্ত কুমার চণ্ডীপুরের ইউ, বি মেম্বার—	৮০ ”	৯ মণ
অথচ, মহিম সরকার বোচাগাড়ী—	৮ ”	৭১ ”
কীর্ত্তি নারায়ণ বোচাগাড়ী—	১৫ ”	৭৫ ”

খুলনা—

ইসমাইল শেখ প্রেসিডেন্ট মিঠাখালি ইউ, বি—	১৫০০ ”	১৫০ ”
আতোয়ার মিঞা জোতদার বঠিয়াঘাটা—	৫০০ ”	১৫ ”
অথচ, সুজাউদ্দিন মৃধা বাজীরখণ্ড বধিয়াঘাটা—	১৪ ”	৬৭ ”
হরসিত মণ্ডল ভেন্নাবুনিয়া বঠিয়াঘাটা—	১৮ ”	১৪৫ ”

ময়মনসিংহ—

নাম	কত ধানের মালিক	কত ধানের নোটিস জারী হইয়াছে
ভূপেন্দ্র চৌধুরী জমিদার ফুলপুর—	১২ হাজার মণ	৬০০ মণ
খান বাহাদুর সরফউদ্দীন এম্, এল্, এ—	৫০০ ”	৭৫ ”
অথচ, হুসেন আলি ফুলপুর—	৯০ ”	৮০ ”
তালেব হোসেন ফুলপুর—	৭০ ”	১২৫ মণ

এইরূপ তালিকা আরও ভূরি ভূরি দেওয়া যায়। খাদ্য সংগ্রহের এই তালিকা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছে যে, ধনীদের ধান ছাড়িয়া দিয়া নুরুল আমীন মন্ত্রীসভা গরীবের ধান লুঠ করিয়া নিয়া গিয়াছে। যখন গরীবের দল ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, তখন 'কমিউনিস্ট উস্কানি' বন্ধ করার নাম দিয়া গ্রামে গ্রামে ফৌজ লেলাইয়া দেওয়া হইতেছে। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার এই উৎকট খাদ্য নীতিই আজ পূর্ব্ব বাংলার ঘরে ঘরে অনাহার ও মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে।

অপর দিকে, গ্রাম্য ধনীর দল সরকারের সমর্থনে মজুত চাউল মণ প্রতি ৩৫।৪০ টাকায় বিক্রি করিয়া লাখ লাখ টাকা মুনাফা করিয়াছে।

লীগ নেতারা এখন বলিতেছেন যে, খাদ্যের দাম কমিতেছে। ২০শে জুলাই খাদ্য মন্ত্রী সৈয়দ আফজল বলেন, "প্রদেশের কোন অংশেই চাউলের মূল্য ২৮ টাকার বেশী নাই।" (আজাদ ২১শে জুলাই) 'অথচ, সেই দিনের 'আজাদে'ই খবর বাহির হইয়াছে যে, "ঢাকার কাওরান বাজারে চাউলের দর মণ প্রতি ৩৩৲ দর", "ময়মনসিংএ আমনের চাউল ৩৩৲ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে", "চুয়াডাঙ্গায় চাউলের দাম ৩২৲ টাকা।"

লীগ নেতারা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতা ঢাকিবার জন্য এখন মিথ্যা প্রতারণা চালাইয়াছেন। লীগ শাসনের দুই বছরের শেষে এবার পূর্ব্ববঙ্গে চাউলের দাম যত বাড়িয়াছে তাহা বাংলার ইতিহাসে কোনদিনই হয় নাই। খাদ্যের এই সংকট লীগ শাসনের ব্যর্থতাকে উলঙ্গ করিয়া দেখাইয়াছে।

পূর্ব্ব বাংলার মেহনতী চাষীর অমূল্য সম্পদ পাট। এই পাটের কারবারে রেলী-এণ্ডাইয়ুল-লোহিয়া-ইস্পাহানী-আমিন ব্রাদার্স লাখ লাখ টাকা মুনাফা করে। এই পাটের শিল্পে কলিকাতায় ত্রকচেটিয়া বৃটিশ পুঁজিপতিগণ মজুরকে শোষণ করিয়া মুনাফার পাহাড় জমায়। বাংলার চাষীর দাবী ছিল পাটের নীচু দাম ৪০৲ টাকা চাই। লীগ নেতারাও ওয়াদা দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পাটের দাম বাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু লীগ শাসনের দুই বছরের শেষে এবার পাটের দাম হইয়াছে মণ প্রতি ১০।১২ টাকা। মেহনতী চাষী নিজের এই সম্পদ জলের দরে বেচিতেছেন, আর সেই পাট নিয়া বিলাতী মাড়োয়ারী মুসলমান ধনিকগোষ্ঠী লাখ লাখ টাকা মুনাফা করিতেছে। পূর্ব্ব বাংলার পাট চাষীর নিকট ইহাই 'পাকিস্তানী স্বাধীনতার' ইনাম।

দেখা যাইতেছে, লীগ নেতারা পূর্ব্ব বাংলার চাষীকে যে সব ওয়াদা দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিকেই লীগ নেতারা ভাঙ্গিয়াছেন। লীগ শাসনের দুই বছরে ধনীর শোষণে পূর্ব্ববাংলার ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক এবং মধ্য কৃষকেরও জীবন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে।

মধ্যবিত্তের দুর্গতি ও শিক্ষার সংকোচ

লীগ নেতারা মধ্যবিত্ত সমাজকে ওয়াদা দিয়াছিলেন যে, পাকিস্তানে চাকুরী ও শিক্ষার সুবিধা হইবে।

অথচ জীবনধারণের খরচ প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পাইলেও মধ্যবিত্ত কেরানীদের মাহিনা নুরুল আমীন সরকার এক পয়সাও বাড়ান নাই। ফলে মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে অনটন। অন্যদিকে বেকারীও বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে' নাম লিখাইবার জন্য এক দিনেই পাঁচ হাজার মধ্যবিত্ত বেকার ভীড় করিয়াছিল। ইহাতেই লীগ শাসনের আমলে বেকারীর বীভৎস চেহারা অনুমান করা যায়।

সেলট্যাক্স বাড়াইয়াও সরকার ছোট দোকানদারদের উপর নূতন আক্রমণ করিয়াছেন।

শিক্ষার অবস্থাই বা কি! প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন বাড়ানোর বদলে চট্টগ্রামে ৭০০ প্রাথমিক স্কুলই নুরুল আমিন তুলিয়া দিয়াছে। স্কুলে ও কলেজের মাহিনা গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাড়ানোর ফলে গরীব মধ্যবিত্তের ঘরের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ারই সংকট দেখা দিয়াছে। তদুপরি কম মাহিনা ও লীগ সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির জন্য ঢাকা

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

১১

'শিল্পে শান্তি'র নামে শ্রমিকশ্রেণীর উপর নূতন আক্রমণের ষড়যন্ত্র

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

বক্তৃতায় সেই দালালীর প্রতিশ্রুতিই দিয়াছেন।

কিন্তু যে সময়ে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং তাঁহাদের দালালরা "অর্থনৈতিক সংকট" হাল করার জন্যে দিল্লীতে বসিয়া শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি কাটার ষড়যন্ত্র করিতেছেন, যে সময়ে চট তৈরীর খরচ কমাইবার নাম করিয়া হাজার হাজার চটকল শ্রমিকও ছাঁটাই করা হইতেছে, তাহাদের মাসে এক সপ্তাহ বেকার থাকিতে বাধ্য করা হইতেছে, সেই সময়েই শুধু বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকরা ২০ কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে; বেঙ্গল জুট মিল ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয়মাসে মোট ৮ লক্ষ টাকার মত মুনাফা করিয়াছে। শ্যামলা কয়লার খনি বছরের শেষ ছয়মাসে ২ লক্ষ টাকার উপরে মুনাফা করিয়া লিখিতেছে, মুনাফা বাড়তির দিকে।

'অর্থনৈতিক সংকট' হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করা নয়, মালিকদের এই বিরাট মুনাফা রক্ষা করার জন্যই দিল্লীতে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসিয়াছিল। এবং তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সহিত শ্রমিকশ্রেণীর বাঁচিবার কোন সমস্যার সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

'শিল্পে শান্তিরক্ষা'র জন্যে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে যখন সম্মেলন হয় তখন স্থির হইয়াছিল, শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরি আইন করিয়া বাধিয়া দেওয়া হইবে, মুনাফা বোনাসের ব্যবস্থা করা হইবে—বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে আরো কত কি করা হইবে! তাহার পর প্রায় দুই বছর অতীত হইতে চলিল। 'নিরপেক্ষ নেহরু সরকার এইদুই বছর সময় 'ন্যায্য মজুরি' কাহাকে বলে তাহা স্থির করিতে ব্যয় করিয়াছেন। এখন 'সমাজতন্ত্রী' নেতা অশোক মেহতা এবং মালিক নেতা স্যার আর দেশীর দালাল এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, চটকল প্রভৃতি বড় বড় শিল্পে শ্রমিকরা এখন যে মজুরি পায় উহাই 'ন্যায্য মজুরি'। এই মহাসত্যটি আবিষ্কার করিতে ইহাদের দুই বছর লাগিয়াছে। লক্ষ লক্ষ সরকারী টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। বোনাসের ব্যাপারে মালিকরা পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা উহা দিতে রাজী নন। বাসস্থানের প্ল্যান শিকায় উঠিয়াছে, কারণ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে টাকা খরচ করার পর সরকারী তহবিলে আর কোন টাকা থাকিবে না। এই ভাবেই গবর্নমেণ্ট, মালিক ও তাঁহাদের দালালরা "শিল্পে শান্তি" রক্ষার শর্ত্তগুলি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর নিকট ইহা এখন পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে, 'অর্থনৈতিক সংকট' ধনিক নেহরু সরকার নিজেই সৃষ্টি করিয়াছেন। মালিকরা নিজেদের মুনাফার জন্যে ছাড়া আর কোন স্বার্থে উৎপাদন বাড়ায় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ধনতান্ত্রিক শিবিরে থাকিয়া এই সংকট হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না কারণ নেহরু গবর্নমেণ্ট ও মালিকশ্রেণী সর্ব্বদা সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপাইতে চাহিতেছে। শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ বাড়াইয়া নিজেদের মুনাফা ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। সরকারী শিল্পনীতি সেই উদ্দেশ্য লইয়াই তৈরী হইয়াছে। উহার সহিত আপোষ করিয়া নয়, উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই শ্রমিকশ্রেণীকে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সংকট হইতে বাঁচিতে হইবে। কারখানায় প্রত্যেকটি শ্রমিক ছাঁটাইয়ে বাধা দিতে হইবে, মজুরি হ্রাসে, কাজের বোঝা বাড়ানোতে বাধা দিতে হইবে, ধর্ম্মঘটের অধিকারকে রক্ষা করিতে হইবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা আদায় করিতে হইবে। ৯ই মার্চ্চ রেল ধর্ম্মঘটে লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে সরকারী শ্রমিকনীতি ও সমাজতন্ত্রী-'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালীর মুখোস খুলিয়া দিয়াছিল। আজ সেই বিপ্লবী অভিজ্ঞতা হইতেই শ্রমিকশ্রেণী আবার সাধারণ ধর্ম্মঘট সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হইতেছে।

৭ই আগস্ট

পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসনের দুইবছর

(১১ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও বহু কলেজের শিক্ষক চলিয়া যাওয়াতে চলতি শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে। লীগ শাসনের দুই বছরে শিক্ষার বিস্তার না হইয়া শিক্ষার সংকোচ হইয়াছে।

বাংলা ভাষার জবাই

পূর্ব্ব বাংলার অধিবাসীদের ভাষার উপরও লীগ সরকার চালাইয়াছেন জঘন্য আক্রমণ। 'ইসলামী তমদ্দুনের' নামে উর্দ্দু চাপাইয়া বাংলা ভাষাকে জবাই করা হইতেছে। 'ইসলামী তমদ্দুনের' কথা একটা ধাপ্পা মাত্র। আসলে, পাকিস্তান হওয়ারপর ইস্পাহানী-হাসেম-কাসেম-দাদা-আমিন ব্রাদার্স—হানিফ প্রভৃতি অবাঙ্গালী কোটিপতিগণ পূর্ব্ববাংলায় অর্থনীতিকে নিজেদের কব্জা করিয়াছে। প্রাদেশিক সরকারী দপ্তরের বিভাগের মাথায় মাথায় বসিয়াছে অবাঙ্গালী আজিজ-আহমদ-করিম-এন-এম-খাঁ প্রভৃতি। এই অবাঙ্গালী ধনীদের ব্যবসা ও চাকুরীর সুবিধার জন্যই 'ইসলামী তমদ্দুনের' আওয়াজে বাংলা ভাষাকে জবাই করা হইতেছে।

বীভৎস দমননীতি

পূর্ব্ববঙ্গের শ্রমিক মেহনতী কৃষক ও গরীব ও মধ্যবিত্ত সমাজের মজুরি খাদ্য ও ভাষার উপরে নুরুল আমীন সরকারের এই সর্ব্বব্যাপী আক্রমণের বিরুদ্ধে যখন জনগণের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতেছে, তখন ধনিক-জমিদারদের শোষণের রাজত্ব বজায় রাখার জন্য নুরুল আমীন সরকার এক বীভৎস দমননীতি চালাইয়াছে।

শ্রমিকদের বৈধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করিতে গেলেও তাহার উপর আসে পুলিসের হামলা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর প্রভৃতি স্থানের রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অফিসগুলি পুলিস জোর করিয়া বন্ধ করিয়াছে। ৯ই মার্চ্চ রেল মজুরদের ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে সরকার ৬০০০ হাজার ফৌজ ও পুলিস মোতায়েন করিয়াছিল। এখনও রেলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পুলিস মোতায়েন আছে

মার্ক্সপন্থী সাহিত্য বিক্রয় বন্ধ করার জন্য ঢাকা বুক ও চট্টগ্রামের ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর দোকান নুরুল আমীন তালাবন্ধ করিয়া দিয়াছে।

গ্রামে গ্রামে মেহনতী কৃষকদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার ফৌজ লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ফৌজের দলের বার বার গুলি বর্ষণে গত এক বছরে লীগ শাসনে চট্টগ্রামের মাদরশায় ২৭ জন, ময়মনসিংহে ৩৩ জন, (দুইজন নারী সহ) রংপুরে ১০, খুলনায় ৩, মাণিকগঞ্জে ১, সিরাজগঞ্জে ১ মোট ৬৫ জন নরনারী খুন হইয়াছেন—আর আহত হইয়াছেন অগণিত। বস্তুত, নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার অধীনে গত এক বছরে পূর্ব্ব বাংলার গ্রামের সবুজ মাঠ লাল হইয়া গিয়াছে।

নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার এই ফৌজ ময়মনসিংহ, রংপুর, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় গ্রামের হাজার হাজার কৃষকের বাড়ী লুট করিয়াছে।

ময়মনসিংহ, রংপুর ও খুলনায় বহু নারীকেও ইহারা ধর্ষণ করিয়াছে।

সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বন্ধ করার জন্য বহু স্থানে ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে নয়াদুনিয়া, রোশনী, ছায়াপথ প্রভৃতি প্রগতিশীল সাপ্তাহিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন কি সরকারের সমালোচনা করে বলিয়া লীগ পন্থী 'ইত্তেহাদের' প্রবেশও এখন পূর্ব্ববঙ্গে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কমিউনিস্ট পার্টি আজ পূর্ব্ববঙ্গে জনতার গণতান্ত্রিক লড়াইএর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া নুরুল আমীন সরকারের আক্রমণ কমিউনিস্ট পার্টির উপরই সর্ব্বাধিক। পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় এক হাজার কমিউনিস্ট কর্ম্মী আজ নুরুল আমীন সরকারের ফ্যাসিস্ট জেলে আবদ্ধ।

বস্তুতঃ নুরুল আমীন সরকার জনগণের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভিযান চালাইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে জনগণের কোন গণ-তান্ত্রিক অধিকার নাই।

জনগণের নূতন জাগরণ

জনগণও নুরুল আমীন সরকারের এই জুলুমশাহীকে সকল শক্তি দিয়াই আজ প্রতিরোধ করিতেছেন।

গত একবছরে রেলের লাইনে লাইনে মজুরগণ নিজেদের অধিকারের দাবী নিয়া বার বার ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। লালমণির হাটে গত জানুয়ারী মাসে রেল মজুরগণ রেশনের দাবীর জন্য টেলিফোন অফিস, ইঞ্জিন প্রভৃতি দখল করিয়া বৈপ্লবিক লড়াইএর কায়দা দেখাইয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোট ২০০০০ রেলমজুর বিভিন্ন কেন্দ্রে ধর্ম্মঘট করিয়া সরকারের জুলুমশাহীর জবাব দিয়াছেন। ৯ই মার্চ্চ তারিখে সব রেলমজুরই একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ৯ই মার্চ্চের সরকারী সন্ত্রাসবাদের পরও আবার জুন-জুলাই মাসে চট্টগ্রামে ঢাকায় আবার রেলমজুরগণ ধর্ম্মঘট সংগ্রাম সুরু করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, আজ মজুরের শক্তি অপরাজেয়।

কুষ্টিয়া ও নারায়ণগঞ্জের সুতাকল শ্রমিকগণ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চাঁদপুরের পাট-প্রেসের শ্রমিকগণও গত একবছরে বার বার ধর্ম্মঘট করিয়া মালিকের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ছাত্র-সমাজও দমননীতি ও শিক্ষা সংকোচের বিরুদ্ধে নভেম্বর মাস হইতে সুরু করিয়া সারা পূর্ব্ববঙ্গে অবিরত ধর্ম্মঘট ও বিক্ষোভ করিয়া চলিয়াছেন। ছাত্রলীগের বিশ্বাসঘাতকতা, সরকারের দমননীতি তুচ্ছ করিয়াই ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামের জোয়ার বহিয়া চলিয়াছে। ২৫শে এপ্রিল তারিখে ঢাকায় ছাত্রদের সাধারণ হরতালের দিন গরীব বস্তীবাসীগণও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়া একত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "লীগ সরকারের জুলুমশাহী বরবাদ"। গত নভেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত সারা পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় ৭০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ধর্ম্মঘট করিয়া ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার উপর তাহাদের কোন আস্থা নাই।

গ্রামে গ্রামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ আজ খাদ্য, মজুরি বৃদ্ধি ও জমির জন্য যে লড়াই চালাইতেছেন বাংলার ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার লাখ লাখ ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক লালঝাণ্ডা হাতে করিয়া মজুরি বৃদ্ধি, আধি প্রথা, টংক প্রথা খতম, খাদ্য দখলের সংগ্রামে আগুয়ান হইয়া চলিয়াছেন। পেটের ক্ষুধা ও অত্যাচারে আজ এইসব মেহনতী মানুষকে বেপরোয়া করিয়া দিয়াছে। তাই ময়মনসিংহ, খুলনা ও রংপুরে এই ভুখানাঙ্গা মানুষ ফৌজের গুলির বিরুদ্ধে বার বার অমর গণপ্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। নুরুল আমীন সরকারের ফৌজের বিরুদ্ধে তাঁহারা বার বার সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া নিজেদের কলিজার রক্ত দ্বারা নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছেন। এই জুলুমশাহীর বিরুদ্ধে গত এক বছরে সংগ্রামে পূর্ব্ব বাংলার ৬৫ জন গরীব নরনারী শহীদ হইয়া লীগ শাসনের অবসানের বার্ত্তাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

মুক্তির পথ

শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের এই সংগ্রামী আঘাতে লীগের শাসকশ্রেণী আজ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা যে জনতার সব সমর্থন হারাইয়াছে টাঙ্গাইলের উপনির্ব্বাচনই তাহার প্রমাণ।

লীগের এই চূড়ান্ত সংকট হেতুই লীগের ভিতর আরম্ভ হইয়াছে জঘন্য দলাদলি। ধনিকশ্রেণীর এই সংকটে লীগের নেতা ফজলুল হক, ভাষাণীর মওলানা প্রভৃতি 'জনগণের লীগের' আড়ালে ধনিকদের রাজত্ব রক্ষার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু জনতা ইহাতে ভুলিবে না। লীগ শাসনের গত দুই বছরের গোলামী, অনাহার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শহরে ও গ্রামে শ্রমিক-কৃষকের যে নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে—এই নূতন শক্তি যে লড়াই সুরু করিয়াছে সেই লড়াইএর পথই জনগণের মুক্তির পথ।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ।

আজ সারা দুনিয়ার সামনে সোভিয়েট জনগণের মুক্তির মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। চীনের মুক্তি ফৌজ, বর্ম্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়ার, ইন্দোচীনের শ্রমিক কৃষক আজ দুর্ব্বার লড়াইএর পথে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভারতের জনগণও আজ নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই সুরু করিয়াছে। দুনিয়ার ধনবাদ আজ মুমূর্ষু। দুনিয়ার জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, ভারতের জনতার সঙ্গে এক কদমে চলিয়া লড়াইয়ের পথেই পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের মুক্তি। পূর্ব্ববঙ্গের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে আজ ১৫ই আগস্টের দাসত্বের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কণ্ঠে আওয়াজ তুলিতে হইবে :

—নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার অবসান চাই
—ইঙ্গ-মার্কিন গোলামী বরবাদ
—ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ বড়যন্ত্র বরবাদ
—চাই সোভিয়েটের সঙ্গে সহযোগিতা
—কমনওয়েলথের দাসত্ব বরবাদ
—চাই পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বন্দীদের মুক্তি
—শিল্পের জাতীয়করণ চাই
—মজুরের বাঁচার মত মজুরি চাই
—ক্ষেতমজুরের বাঁচার মত মজুরি চাই
—চাই চাষীর হাতে জমি
—চাই সকলের জন্য শিক্ষা ও জীবিকা
—চাই পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার।

লীগ শাসনে ইস্পাহানী-দাদা-আমীন-ব্রাদার্স হানিফ প্রভৃতি ধনিকগোষ্ঠির ও নবাব জমিদারদের যে রাজত্ব কায়েম হইয়াছে, তাহাকে জনগণের সংগ্রামী ঐক্য দ্বারা খতম করা সম্ভব। এই ধনিকের রাজত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে উপরের দাবীর ভিত্তিতে মেহনতী জনতার ঐক্যই মুক্তির পথ।

মতামত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি নয়াদিল্লীতে বৃটিশ হাই কমিশনারের দপ্তরে পত্র লিখিয়াছেন : কোম্পানীকে বেতন বাবদ সাড়ে চার লক্ষ টাকা যাহাতে দিতে না হয় তাহার জন্যে জোর তদ্বির সুরু হইয়াছে। বৃটিশ হাই কমিশনারকে ভারত সরকার অসন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না, মালিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে।

'সমাজতন্ত্রী' ও 'জাতীয়' টি ইউ-সির দালালরা যখন একযোগে কারখানায় কারখানায় শ্রমিকের সংগ্রামী ঐক্যকে আঘাত করিতেছে, তাহাদের মনিবরা সে সময়ে শ্রমিকের গলা কাটিবার জন্যে এমন কোন কৌশল নাই যাহা প্রয়োগ না করিতেছে।

মঞ্জিলের নিয়মাবলী

(১) প্রতি রবিবার কাগজ বাহির হইবে। দাম তিন আনা।

(২) ১০ কপির কম এজেন্সী নাই। শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন।

(৩) গ্রাহকদের হার :—বার্ষিক ১০৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷৷০ টাকা।

ম্যানেজার
মঞ্জিল

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।

বেলঘরিয়া টেক্সম্যাকো কারখানার ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ

ইউনিয়ন সম্পাদকসহ ২ জন নিহত

সংগঠন ভাঙ্গার জন্য পুলিস, মালিক ও গুণ্ডাদের পূর্ব্বপরিকল্পিত চক্রান্ত

গত ১২ই আগষ্ট বেলঘরিয়া টেক্সমাকো কারখানার ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিস গুলিবর্ষণ করিয়াছে।

লেখার সময় পর্য্যন্ত যে খবর পাওয়া যায় তাহাতে জানা গেল অন্ততঃ দুইজন ঘটনাস্থলেই নিহত হইয়াছেন।

নিহতদের একজন হইতেছেন টেক্সম্যাকো শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীসুবোধ সরকার। দ্বিতীয় জন কারখানার মালি। গুলিবর্ষণের সময় সুবোধ সরকার কারখানার ম্যানেজার মিঃ ফতিয়ার সহিত আলাপ করিতেছিলেন।

গুলীবর্ষণের সঙ্গেসঙ্গে একদল মজুত গুণ্ডা নির্ম্মমভাবে লাঠি চালাইতে থাকে। কারখানার নিকটস্থ তিনটি দোকানকে লুট ও বিধ্বস্ত করা হয়। মিলিত বর্ব্বর আক্রমণ হইতে রাস্তায় সাধারণ লোকও রেহাই পায় নাই। পুলিসের সঙ্গে সঙ্গে মজুত দারোয়ান ও গুণ্ডারাও গুলি চালায়।

গুলি ও লাঠির ঘা খাইয়া বহু আহত শ্রমিক নিকটস্থ জলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। সেখান হইতেও তাহাদের টানিয়া আনিয়া লাঠি ও বন্দুকের খোঁচা দিয়া পিটানো হইয়াছে।

জলার মধ্যে আহত বা নিহত কেহ পড়িয়া আছে কিনা এখনো তাহা জানা যায় নাই। সারারাত্রের জন্য পুলিস কলখানা এলাকায় স্থানীয় ভাবে কারফিউ জারী করে।

প্রায় ৩২ জন আহত শ্রমিক ও জনসাধারণকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মঘটীদের শ্রমিকের উপর এই বর্ব্বর আক্রমণকে 'ন্যায্য' বলিয়া দেখাইবার জন্য মালিক ও পুলিসের লোকেরা আগে হইতেই এক পৈশাচিক চক্রান্ত খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল।

কারখানার মালিক 'কে কে বিড়লা বাঁচার মত মজুরীর দাবী অস্বীকার এবং ছাঁটাই কায়েম করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ পরিকল্পনা করেন যেমন করিয়া হোক এখানকার শক্তিশালী লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের সংগঠনকে ভাঙিতে হইবে।

গত ৩রা আগস্ট লালঝাণ্ডা শ্রমিক নেতা শান্তি সর্দ্দার গুণ্ডার ছুরিতে নিহত হন। শ্রমিকেরা প্রতিবাদে কারখানা হইতে মিছিল করিয়া বাহির হইলে কর্ত্তৃপক্ষ লক আউট ঘোষণা করেন।

শ্রমিকদের সমাবেশ ভাঙার জন্য সেইদিন হইতে কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন দালাল মারফৎ শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালী বিহারী ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। গতসপ্তাহে দুইবার দালালের সাহায্যে কারখানা খোলার চেষ্টা করেন কিন্তু শ্রমিকদের সংগ্রামী ঐক্যের কাছে বারবার পরাস্ত হইয়া সরাসরি আক্রমণের পথ গ্রহণ করেন।

এই মালিকেরই গোয়লিয়রে আর একটি বড়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে। ১৯৪৬ সালে গুলি চালাইয়া তথায় ১২ জন শ্রমিককে নিহত করা হয়।

ওখানে যিনি তখন ম্যানেজার ছিলেন সেই মিঃ রাজঘড়িয়াই বর্ত্তমানে টেক্সম্যাকো কারখানার ম্যানেজার। লকআউটের পর তিনি গোয়ালিয়র গুলিবর্ষণের উল্লেখ করিয়া হুমকি দিতে থাকেন বেলঘড়িয়া শ্রমিকদেরও শায়েস্তা করা হইবে।

শ্রমিকের পক্ষ হইতে এসডিও, এবং লেবার কমিশনেরর নিকট কয়েকবার ধর্না দিয়াও কোন ফল হয় নাই। তাঁহারা 'সময় চাহি না' চুপ করিয়া আছেন, অর্থাৎ যাহা খুশী করার জন্য মালিককে সুযোগ দিয়াছেন।

১২ই আগস্ট সেই শায়েস্তার জন্য মঞ্চ তৈয়ারী হয়। কারখানার ভিতরে আগে হইতেই প্রচুর গুণ্ডা জমায়েত করিয়া রাখা হয়। গেটে পুলিস পাহারা থাকে। কথাছিল ঐদিন শ্রমিক প্রতিনিধিরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে মীমাংসার শর্ত্ত দাবি করিবেন।

বেলা ৮॥ টার সময় মালিকেরই

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ডাঃ বিধান রায়ের পুলিস গুলি চালাইয়া নারীহত্যা করিয়াছে

বহুবাজার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে করোনারের স্বীকৃতি

৪ জন মহিলাসহ মোট ৮ জন লোকের প্রাণ নিয়া গত ২৭শে এপ্রিল বহুবাজার ষ্ট্রীটে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, সম্প্রতি করোনারের আদালতের বিচারে করোনার এবং জুরীরা একমত হইয়া ইহার উপর রায় দিয়া বলিয়াছেন যে, ঘটনা এমন কিছু ঘটে নাই যাহার ফলে গুলি ছোড়ার প্রয়োজন পড়িয়াছিল।

২৭শে এপ্রিল। অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের সমর্থনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে মহিলাদের এক সভা হয় ইণ্ডিয়ানএসোসিয়েশন হলে। সভার শেষে মহিলারা যখন ফিরিতেছিলেন, তখন পুলিস এই নিরস্ত্র মহিলাদের উপর নির্ব্বিচারে গুলি চালায়, পুলিসের সম্মুখে কংগ্রেসী গুণ্ডারা ইহাদের উপর বোমা ছাড়ে—৪ জন মহিলা লতিকা সেন, গীতা সরকার, প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয়া দত্ত এবং ৪ জন পুরুষ গুলি ও বোমার আঘাতে নিহত হন!

এই নৃশংস নারীহত্যার সংবাদে সমস্ত দেশ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছিল তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে জনসাধারণ বারে বারে দাবী তুলিয়াছে "বিধান মন্ত্রি সভার বিচার চাই"। অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর সমস্ত ঔদ্ধত্য ও অহমিকা লইয়া বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা বরাবর এই দাবীকে অস্বীকার করিয়াছেন, লাঠিগুলি দিয়া ইহার উত্তর দিয়াছেন।

কিন্তু লতিকা সেন এবং অন্যান্য মৃত শহীদদের পক্ষ হইতেই করোনারের আদালতে যখন মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তের দাবী জানানো হয় তখন বর্ত্তমান আইনের সীমাবদ্ধ তদন্ত হইতেও আর অব্যাহতি পাওয়া গেল না।

শাসকশ্রেণীর নিজের নিযুক্ত এই আদালত যে রায় দিয়াছে তাহাতে রাষ্ট্র মন্ত্রিসভা এই হত্যাকাণ্ডের যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন; তাহাদের জঘন্য কুকীর্ত্তিকে

(১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংগ্রামী মজুরদের ঐক্য গঠন

ট্রাম, পটারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকদের সমাবেশ ও মিছিল

গত সপ্তাহে কলিকাতার ধর্ম্মঘটী ও সংগ্রামী শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পর ঐক্যগঠনের এক নূতন উদ্যোগ দেখা দেয়।

কলিকাতায় ধর্ম্মঘটী ট্রাম ও পটারী শ্রমিকদের ঐক্য মহড়া এবং মেটিয়াবুরুজে গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ, আই-জি-এন, এ-আই-ই-এম প্রভৃতি ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকদের মিলিত সমাবেশ এই দিক দিয়া নূতন পথ দেখাইয়াছে।

শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনা আসিয়াছে যে তাহাদের সংগ্রামের পাশে অন্যান্য ধর্ম্মঘটী ও সংগ্রামী শ্রমিকেরাও আছেন। জয় না হওয়া পর্য্যন্ত একজায়গার সংগ্রাম অন্য স্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

আগস্টের মিলিত মিছিলে। ইটালী চিলড্রেনস-পার্কে পটারী ধর্ম্মঘটী কার্ডবোর্ড পালিশ এবং বি পি টি ইউ সির অন্যান্য শ্রমিক ও ছাত্রদের সভা হইতে এই মিছিল সুরু হয়। তথা হইতে মিছিল যায় মনুমেণ্টের তলে। সেখানে ধর্ম্মঘটী নোনাপুকুর কারখানার শ্রমিক আর একটি সভা করিতেছিলেন।

সন্ধ্যা সাতটায় ট্রাম এবং পটারী উভয় শ্রমিকদেরই বিরাট মিছিল পুনরায় ফিরিয়া যায় পটারী কারখানা এলাকায়।

নোনাপুকুরের লড়াই আমাদের, পটারী মজুরের লড়াই দাবি না মানা পর্য্যন্ত হরতাল

(১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাঞ্চল

প্রথম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] ১৪ই আগস্ট '৪৯ : ২৯শে শ্রাবণ '৫৬ [তিন আনা

মতামত

* যুদ্ধবিরতি লাইন না কাশ্মীর-ব্যবচ্ছেদ !
* হাতা-নেহরু-লিয়াকত মিতালি
* বামপন্থী সমন্বয়ের আসল চেহারা

নেহরু-লিয়াকত সরকারের প্রচার, আর ধনিকশ্রেণীর রক্ষিতা পত্রিকাগুলির হেড লাইন দেখিয়া তখন মনে হইয়াছিল, কাশ্মীরের গণ-ভোট বুঝি হইয়াই গেল ! গণ-ভোটে কোন্ দিকে ভোট দিতে হইবে তাহাই যেন আশু সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল !

কাশ্মীর সম্পর্কে ইউ-এন-ও কমিশন তাহাদের সিদ্ধান্ত লয়েন এক বছর আগে, ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্ট। তারপর ট্রুম্যান-এটলি কোম্পানীর এই গণভোটের ধূয়া দালাল নেহরু-লিয়াকতের হিজ মাস্টারস্ ভয়েস বিশ্বস্তভাবে রিলে করিয়া চলিয়াছিল ! কিন্তু গণ-ভোট কোথায় ?

পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি হয় গত ১লা জানুয়ারী তারিখে। তারপর এতদিনের চেষ্টায় মাত্র যুদ্ধ-বিরতি লাইন বা সীমারেখা ঠিক হইয়াছে। অথচ ইহারই জন্য প্রকাশ্যে এবং টুরিস্ট ও সাংবাদিকের ছদ্মবেশে কত যে মার্কিন যুদ্ধ-বিশারদ কাশ্মীরে আমদানি হইয়াছে, তাহার লেখাজোখা নাই !

যুদ্ধ-বিরতি লাইনটি কাশ্মীরের দক্ষিণ সীমান্তে মানাওয়ার হইতে উত্তরে কেরাণ পর্য্যন্ত ও কেরাণ হইতে পূর্ব্বদিকে চালুক্কা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

১লা জানুয়ারী তারিখে পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের সৈন্য কোথায় ছিল তাহা ঠিক করিতে কেন সাত মাস লাগিল, এই লাইন দেখিলে তাহার কারণ বেশ বোঝা যায়। এই লাইনের দ্বারা কাশ্মীর এমনভাবে ভাগ হইয়াছে যে যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিবে। আর মীমাংসা করিবার জন্য ইউ-এন-ও কমিশনের ভূত অর্থাৎ মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তৃক কাশ্মীরে পাকা পোক্ত হইয়া থাকিবে। তাহার সাথে সাথে দুই ডমিনিয়নের ধনিকশ্রেণী ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন।

এই লাইন অনুসারে গিলগিট পড়ে পাকিস্তানের দিকে। কিন্তু গিলগিট সোভিয়েট সীমান্তের খুব কাছে। সুতরাং এখানে কাশ্মীরীদের তো বটেই, পাকিস্তানী ফৌজেরও প্রবেশ নিষেধ। এখানে শুধু থাকিবেন পর্য্যবেক্ষকের বেশে মার্কিন ও বৃটিশ যুদ্ধ-বিশারদগণ।

যুদ্ধ-বিরতির লাইন ঠিক হওয়ার খবর দেখিয়া পাছে কেহ মনে করে কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঝগড়া বুঝি মিটিয়া গেল, তাই নেহরু ৫ই আগস্ট বলিয়াছেন না, আমাদের মধ্যে ট্রুস লাইন বা সাময়িক সন্ধিরও লাইন ঠিক হয় নাই। কাশ্মীর-বিভাগটি হাসিল হইয়াছে, কিন্তু সন্ধি হয় নাই। লিয়াকতও পুরা কাশ্মীরের উপর দাবি রাখিয়া খুব আস্ফালন করিতেছেন।

কারণ বোঝা কঠিন নয়। সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধ ঘাঁটির জন্য কাশ্মীরকে প্রয়োজন মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের। কিন্তু কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাহার পথে কণ্টক। গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিভক্ত ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে দেশ বিভাগ সাম্রাজ্যবাদের বহু পরীক্ষিত হাতিয়ার। তাই ভারতবর্ষ দুই ডমিনিয়নে ভাগ হইয়াছে, তাই যুদ্ধ-বিরতি লাইন মারফত এই ভাবে কাশ্মীর বিভাগও যুদ্ধ জীয়াইয়া রাখার ব্যবস্থা। ইহারই জন্য গণভোটের ধূম্রজাল।

কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্র সফল হইবে কি ?

কাশ্মীরীগণ তো এমনিই বলিতেছে : ইউ-এন্-ও কমিশন দূর হইলে আপদ ঘোচে। ইউ-এন-ও জনগণকে দিয়াছে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু! তাহার পর কাশ্মীর বিভাগ কি জনতা বরদাস্ত করিবে ?

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পাকিস্তান, ভারতীয় ইউনিয়ন, কাশ্মীর প্রভৃতি লইয়া গোটা ভারতবর্ষে জনতার গণতন্ত্র কায়েম করার যে সংগ্রাম গড়িয়া উঠিতেছে তাহা হইতে কাশ্মীরী জনতাকে আলাদা রাখিবার জন্য ট্রুম্যান এটলির হুকুমে নেহরু-লিয়াকত কতই না কসরত করিতেছে ! মজুরের গ্রেনশপ তুলিয়া দিয়া বা রেশন কাটিয়া তাহারা কাশ্মীরীদের চাউল দেওয়ার জন্য কত দরদ দেখাইতেছে ! কিন্তু এই সব ছলনায় কি কাশ্মীরী জনতাকে ভুলানো যাইবে ?

* * *

ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হাতা হেগে চলিয়াছেন। যাওয়ার পথে তিনি অতিথি হইয়াছেন নেহরু ও লিয়াকত আলির, দিল্লীতে ও করাচীতে।

হাতা যাইতেছেন ডাচ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতার জন্য ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত দলিলে স্বাক্ষর দিবার জন্য। এই বেইমানীর পথে হাতার অগ্রজ হইতেছেন নেহরু ও লিয়াকত; তাই যাত্রার পথে তাহাদের সহিত হাতার দেখা করিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু শুধু তাহাই নয়; নেহরু-লিয়াকতের সাথে শলাপরামর্শ করিয়া যাওয়ার গুরুতর প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

চীনের বিজয়ী জনসাধারণ চিয়াংকে চীন হইতে দূর করিয়া দিবার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চোখে আঁধার দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে চিয়াংএর বন্ধু নেহরু এসিয়ায় মার্কিন দালালীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। নেহরু-লিয়াকত-থাকিন নু। বাও দাই-কুইনো প্রভৃতিকে লইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় প্যাসিফিক প্যাক্টের তোড়জোড় চলিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার মার্কিন দালাল হইতেছেন হাতা। এই দালালীর শলা-পরামর্শের জন্যই হাতার আগমন। ক্রিপস্ প্রভৃতি শীঘ্রই আমেরিকা যাইতেছেন। নেহরুও শীঘ্রই ওয়াশিংটন যাইবেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার প্রতিক্রিয়া শিবিরের ষড়যন্ত্র পাকাপাকি সেখানেই হইবে।

হাতা-ডাচ সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে মার্কিন হুকুমে যেটুকু ক্ষমতার বখরা পাইবেন, তাহাও নির্ভর করিবে এশিয়ায় এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে হাতা কি ভূমিকা লইবেন তাহার উপর। দেশের মধ্যে কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্র হত্যার জন্য হাতার পরিকল্পনার উপর। সেই ভূমিকা নির্দ্ধারণের জন্যই হাতার দিল্লী ও করাচী আগমন।

দালাল-মজলিশের নেতা নেহরুকে তারিফ করিতে হয় ! জরিফউদ্দিন ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইন্দোনেশীয় নেতার রক্তে যাহার হাত কলুষিত, তাহাদের সহিত আতিথ্যে ও ভোজে রত নেহরুকে দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে যাহাতে নেহরু সম্পর্কে কোনরূপ মোহ না থাকে, নেহরু কী তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন ?

* * *

পশ্চিম বাংলায় সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের ঘোষণার পর হইতে বামপন্থী ঐক্যের আওয়াজে আসর গরম হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু খোলাখুলিই বলিয়াছেন যে বামপন্থীরা একসাথ হইয়া নির্ব্বাচনে না দাঁড়াইলে মোটের উপর কংগ্রেসকে পরাস্ত করা যাইবে না। জয়প্রকাশ বলিয়াছেন, পূর্ণ ঐক্য না হইলেও নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাপার লইয়া বামপন্থীদের মিলিতভাবে কাজ করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

শরৎ বসু-জয়প্রকাশ সংবাদ চলিয়াছে ; আবার স্বামী সহজানন্দ প্রভৃতির বামপন্থী ফ্রন্টের সাথেও শ্রীশরৎ বসুর আলাপ আলোচনা চলিতেছে।

মিলিত ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ হইতে শ্রীমৃণালকান্তি বসুও নাকি শ্রীশরৎ বসুর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ভোট যুদ্ধের ঢাক বাজিয়া ওঠার সাথে সাথে ইহাদের সকল দলের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে।

ঠিক এই সময়টিতে অন্ততঃ বামপন্থী-দল সমাজতন্ত্রীদের আসল চেহারা বাহির হইয়া পড়িতেছে। পণ্ডিত নেহরু সেদিন বলিয়া দিয়াছেন যে, আগামী দশ বছরে কেন কোন দিনই শিল্প জাতীয়করণের ভরসা তিনি দিতে পারেন না। ইহার পর সমাজতন্ত্রী অশোক মেহতা বলিয়াছেন, ধন্য পণ্ডিত নেহরু ! তুমি যে কিছুতেই মজুরি কমাইতে দিবে না বলিয়াছ ইহার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ঠিক এই সময়ে জয়প্রকাশ পরামর্শ দিয়াছেন নেহরু তুমি এখন কংগ্রেস ছাড়িয়া সোস্যালিস্টদলে ভিড়িয়া পড়ো !

আর জাতীয়করণের সমস্যার সমাধান জয়প্রকাশ দেশপ্রিয় পার্কের সভায় বাতলাইয়া দিয়াছেন। বিলাতে এটলি-বেভিন যেমন লোহা-শিল্প জাতীয়করণ করিয়াছে—কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে ধনিক গোষ্ঠীর হাতে, যন্ত্রপাতি বদলাইবার টাকা ও মুনাফা দিতেছে সরকারী তহবিল—তেমনই ভাবে এদেশে জাতীয়করণের পরামর্শ দিয়াছেন জয়প্রকাশ। মালিকের কর্ত্তৃত্ব তাহার কারখানায় থাকুক, সরকার হইতে শতকরা ৫৲ টাকা মুনাফার গ্যারাণ্টি দাও, মূলধন হু হু করিয়া আসিবে—ইহাই সোস্যালিস্ট জাতীয়করণ।

পণ্ডিত নেহরু না খাইয়া থাকার উপদেশ দিয়া খাদ্য অভিযান সুরু করিয়াছেন, ইহাতে সমাজতন্ত্রী নেতারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। নেহরু বলিতে গলিয়া-পড়া এই বামপন্থীদের ভাবসাব দেখিয়া লোক তাজ্জব বনিয়া যাইতেছে।

তাই আসর গরম হইলেও জমিতেছে না। সাধারণ লোক জানে বিড়লা টাটার পরিচালিত কংগ্রেস আসল দক্ষিণপন্থী ; আর তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে জোরালো নেতৃত্ব করিতেছে কমিউনিস্টরা। বাঁচার মতো মজুরির জন্য, বা ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে মজুরের সামনে দাঁড়াইয়া লড়িয়াছে, প্রাণ দিয়াছে এই কমিউনিস্টরা। ক্ষেত-মজুর ও গ্রামের গরীবদের বাঁচার মতো মজুরি, ফসল ও জমির লড়াইতে তাহাদের সাথে রক্তধারা মিশাইয়া দিয়াছে কমিউনিস্টরা, কংগ্রেসী পুলিস মিলিটারীর গুলিতে প্রাণ দিয়াছে কমিউনিস্টরা। কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না—এই কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার জন্য দাবি উঠিতেছে না কেন ? শিবহীন যজ্ঞ কি করিয়া হয় ? রামকে বাদ দিয়া রামায়ণের কাহিনী সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারিতেছে না।

শুধু ইহাই নয়। শোনা যাইতেছে, বিভিন্ন বামপন্থী দলের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত একটি মাত্র বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ে ঐক্য হয় নাই। এমন কি এখনই রায় মন্ত্রী সভাকে অপসারিত করার দাবিতে পর্য্যন্ত একতা হয় নাই। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ গত উপনির্ব্বাচনে রায় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে তাহাদের রায় দিয়াছে। সারা পশ্চিম বাংলা রায়মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতেছে। তবুও দেশপ্রিয় পার্কের সভায় জয়প্রকাশ এই মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করেন নাই।

যে একটি বিষয়ে এইসব বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্য হইয়াছে তাহা হইতেছে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার বা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি এখন তোলা হইবে না।

ইহা ট্রুম্যান-এটলি-নেহরু-প্যাটেলের লাইন। তাহারা ইহাতে খুশীই হইবে। কিন্তু এই বামপন্থীদের গদী দখলের ব্যাপারে ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে কি ?

শোষিত জনসাধারণকে বাদ দিয়া এই ভোটযুদ্ধের ভরসায় বসিয়া থাকার ফুরসুৎ থাকিতেছে না শ্রমিক ও জনসাধারণের। নেহরু সরকারের আঘাতে শ্রমিকশ্রেণী আজ লড়াইয়ের ময়দানে ধনিকশ্রেণীকে মোকাবিলা করিতে বাধ্য হইতেছে। এই তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের কষ্টি পাথরে বামপন্থীদের যাচাই না করিয়া শ্রমিকশ্রেণী ছাড়িবে কি ?

মঞ্জিল

পূর্ব্ববঙ্গের অপরাজেয় রেলমজুর

(বিশেষ সংবাদদাতা)

ঢাকা, ৩০শে জুলাই—ঢাকার রেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের সঙ্গে কসাইখানার তফাৎ এই যে, এখানে নানারকম কায়দায় গলা কাটা হয়। কিছু কিছু শ্রমিকের সরাসরি গলা কাটিয়া ফেলা হয়। যেমন, ঢাকার ৩ শত শ্রমিককে একেবারে ছাঁটাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছু কিছু শ্রমিকের গলা আধাআধি কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহারা না মরা না বাঁচার মাঝামাঝি অবস্থায় রক্তাক্ত কলেবরে চিল্লায়-কাতরায়, যেমন হাজার খানেক শ্রমিককে রিভার্ট করা হইয়াছে। কিছু কিছু শ্রমিককে ওভারটাইমের উপর ওভারটাইম খাটাইয়া যাঁতাকলে পিষিয়া ফেলা হয়, যেমন ফায়ারম্যান ড্রাইভার প্রভৃতি। আর টিপিয়া টিপিয়া মারার এত রকম পদ্ধতি আছে যে, উল্লেখ করিয়া লাভ নাই। মজুরশ্রেণীকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারার কৌশল সস্তা গ্রেণশপ উঠাইয়া দেওয়ার মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। অবশ্য ঢাকার ঘা চেহারা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের রেলের সেই চেহারা।

কসাইখানা থাকিলে তাহার ঘাতক প্রয়োজন হয়। ঢাকা রাণিং শেডে আগে মাত্র একজন ঘাতক অর্থাৎ ফোরম্যান ছিল। আড়াই'শ হইতে ৫ শত টাকার ফোরম্যানদের কাজ শুধু শ্রমিকদের উপর তম্বি করা, শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া, শ্রমিককে ওভারটাইম খাটাইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে বলা : এই দেখো আগের তুলনায় কত কম শ্রমিক দিয়া কাজ চালাইতেছি! ঢাকা রাণিং শেডে আগে ছিল একজন ফোরম্যান, এখন ঘাতকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬ জনে। রাণিং শেডের ৪৩৭ জন শ্রমিকের জন্য ১ জনের বদলে পাকিস্তানী আমলে ১৬ জন ঘাতক। ইহারা গড়-পড়তায় ১০ জন করিয়া এবং একুনে ১৬২ জন শ্রমিককে রিভার্ট করিয়া ঘাতকের কাজ করিতেছে।

এই আধাকাটা না-মরা না-বাঁচা রিভার্টেড শ্রমিকের রক্তাক্ত হৃদয়ের চিৎকার ঢাকা রেলের মধ্যে ঘোরাঘুরি করিলে কানে না শুনিয়া উপায় নাই। যাহাদের একেবারে ঘাড়ে গর্দ্দানে কাটিয়া ছাঁটাই করা হইয়াছে সেইসব ছাঁটাই মজুরদের অধিকাংশ দেশে চলিয়া গিয়াছে, কেউ শহরে এটা ওটা করার চেষ্টা করিতেছে, রেল কলোনীতে তাহাদের দুইচার-জনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু রিভার্টেড শ্রমিকের মর্ম্মভেদী হাহাকার এবং প্রচণ্ড ক্রোধের আগুন দূর হইতেই তাহাদের চিনাইয়া দেয়।

কোন অফিসের বড়বাবুকে ছোটবাবুর পদে নামাইয়া দিলে বা বড়কে ডিঙ্গাইয়া ছোটকে প্রমোশন দিলে কি রকম অবস্থা হয় মধ্যবিত্তরা হয়ত তার দুই চারটা নজির জানে এবং ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু রেলের শ্রমিক দেখিতেছে পলকে পলকে কী করিয়া বহু বৎসরের সাধনাকে পায়ের তলায় লুটাইয়া শত শত শ্রমিককে বড়-কর্ত্তার খেয়াল মাফিক ঠেলিয়া নীচে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে—বিনা দোষে বিনা বিচারে। একজন শ্রমিকের সারা জীবনের স্বপ্ন এবং সম্মান চক্ষের পলকে ধুলায় লুটাইয়া পড়িতেছে। ইহাতে প্রতিবাদ করিতে গেলে, একেবারে ছাঁটাই হইতে হইবে, হয়ত পার্ব্বতীপুরের ৪ হাজার রিজার্ভ শ্রমিকের মধ্য হইতে একজনকে আনিয়া ঐ কাজেই লাগানো হইবে। এই অবস্থায় আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন রিভার্টেড রেলশ্রমিকের চোখে অশ্রু এবং আগুনের খেলা কঠিন রিপোর্টারের মনকেও প্রচণ্ড দোলা না দিয়ে পারে না।

ঘন সাদা দাড়ি বৃদ্ধ ড্রাইভার—সহজে সে ড্রাইভার হইতে পারে নাই। ১৯১৪ সালের চাকুরী। প্রথমে ক্লিনার, তারপর সেকেণ্ড ফায়ার ম্যান, তারপর ফার্স্ট ফায়ার ম্যান, তারপর মাষ্টার, তারপর ড্রাইভার! বহু বছরের প্রাণান্ত সাধনার পর ৭ বৎসর ধরিয়া ড্রাইভারি করিতেছে। আদ্রায় বাড়ী। কথায় কথায় এখনো 'খোদা হাফেজ' বলে, অপ্ট করিয়া হিন্দুস্থান ছাড়িয়া 'পাকিস্তানের সেবা' করিতে আসিয়াছে। যৌবনকালে একদিন বি-এন-আরের বিখ্যাত ষ্ট্রাইকের নেতৃত্ব করিয়াছিল। হঠাৎ তাহাকে বিনাকারণে ফায়ার-ম্যান অর্থাৎ ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার কাজে রিভার্ট করা হইয়াছে। বৃদ্ধের মনে এখন তাই আবার বি-এন-আরের পুরা-তন স্টাইকের দিনগুলির কথা মনে পড়িতেছে। কাজেই বৃদ্ধের নাম বলিব না....এই বৃদ্ধ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে, 'রেলওয়াইকে মজদুর আদমী নেই, কোরবাণীকে জানোয়ার হ্যায়!' বৃদ্ধের বালবাচ্চা জরু লইয়া পরিবারে ১১ জন খানেওয়ালা। দেশে কিছু জমি ছিল, এখন বিক্রি করিয়া পাকিস্তানে খাইখরচ চলিতেছে। তবু বৃদ্ধ ব্যাঘ্র বি-এন-আরের শাণিত দণ্ড এবং নখরের স্বপ্ন দেখিতেছে।

সাত আট বৎসরের সাণ্টার আবদুল ওয়াহিদ, আবদুল আহমেদের ভাগ্যে ঠিক এমনি ধরণের রিভার্শন আসিয়াছে। তবে তাহারা নিজেদের রিভার্শন ঠেকাইতে পারিত—অফিসারদের ঘুষ দিতে পারিলে। কারণ অফিসাররা উচ্চপদের লোভ দেখাইয়া কয়েকজন যুবক শ্রমিকের কথা সর্ব্বস্ব ঘুষ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু উপরোক্ত সাণ্টারদের না সরাইতে পারিলে চাকুরী দেওয়া যায় না। কাজেই হয় সমপরিমাণ ঘুষ দাও, নয় রিভার্টেড হও! সংসারী বৃদ্ধ মাষ্টাররা ঘুষ দিবে কি করিয়া? কাজেই 'পাকিস্তানের জন্য' কোরবাণী হইতে হইল।

কিন্তু তাহাদের 'পাকিস্তানকে সেবা' করিবার সাধ মিটিয়াছে, তাহারা মনের দুঃখে রাগে ক্রোধে সমস্ত সংসারের ঝক্কি ঘাড়ে লইয়াও ২৫শে জুন পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছে। কিন্তু পদত্যাগ পত্রও গ্রহণ করা হইতেছে না, অথচ তাহাদের কাজ করা সত্ত্বেও 'অ্যাবসেণ্ট' বলিয়া গণ্য করা হইতেছে।

মাষ্টার সোনালাল ঢাকার মেন লাইনে ড্রাইভারি পর্য্যন্ত করিয়াছিল, তাহাকে ফার্স্ট ফায়ারম্যানে রিভার্ট করা হইয়াছে। ঠিক একই অবস্থায় একই ধরণের 'মুছিবত' আসিয়াছে শেখ নানা, আবদুল আজিজ, ফজলু মিঞা, সবুর শেখের উপর। শেখ মদিনার অবস্থা আরো করুন। ১৯২৫ সালে চাকুরীতে ঢুকিয়া ক্লিনার হইতে সেকেণ্ড ফায়ারম্যান, সেকেণ্ড ফায়ারম্যান হইতে ফার্স্ট ফায়ারম্যান, তারপর পরীক্ষা দিয়া রিলিভিং মাষ্টার হইয়াছিল। এখন ২৪ বৎসর পরে আবার ক্লিনার হইয়াছে। যৌবনের ২৪টি বৎসরের আপ্রাণ সাধনার পাকিস্তানী পুরস্কার! ঠিক এমনিভাবেই ১৯২৫ সালে চাকুরীতে ঢুকিয়া আবদুর রেজ্জাক ফার্স্ট ফায়ারম্যান হওয়ার পরে আবার সেকেণ্ড ফায়ারম্যানে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই ফায়ারম্যানের বুকে আগুন জ্বলিবে না তো আগুন জ্বলিবে কাহার বুকে?

বৃদ্ধ ড্রাইভার বুদ্ধু ১৯১৪ সাল হইতে অর্থাৎ প্রায় ৩৪ বৎসর চাকুরী করিবার পর সাণ্টারে রিভার্টেড হইয়াছে। বৃদ্ধ ড্রাইভার আলমচাঁদ ১৯১৮ সাল হইতে চাকুরীতে আছে। তাহাকেও সাণ্টার করা হইয়াছে। ঠিক একই অবস্থা ঘটিয়াছে ড্রাইভার মুন্নালালের। তাহারও চাকুরী ১৯১৪ সাল হইতে। ড্রাইভার রহমত আলী সাত আট বৎসর ড্রাইভারি করার পর সাণ্টার হইবার পুরস্কার পাইয়াছে। রিভার্শনের এই হৃদয়বিদারক কাহিনীর অন্ত নাই।

এক ঢাকা শেডেই ১২ জন ড্রাইভার রিভার্টেড হইয়াছে সাণ্টারে, ৮ জন সাণ্টার ফার্স্ট ফায়ারম্যান, ৬৪ জন সেকেণ্ড ফায়ারম্যান ক্লিনারে, ৬৬ জন ক্লিনার গ্যাং খালাসীতে!

কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় ট্রান্সফার্ড বা এমন কি রিভার্টেড হইতেও চাহে তার ভাগ্যেও যে অনেক সময় কোরবাণীর ফল আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত শেড ক্লার্ক নুর মহম্মদ। এই নুর মহম্মদ আদ্রা জেলা হইতে অপ্ট করিয়া 'পাকি-স্তানের সেবার' জন্য আসিয়াছিল। তাহাকে মধ্যবিত্ত কেরাণী বলা যায়, তাহার মূল বেতন ছিল ৮৫৲ টাকা, ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স প্রভৃতি মিলাইয়া প্রায় ১৫০ টাকা পাইত। ভদ্রলোকের পরিবারে অনেক লোকজন—দুই ওয়াগন ভর্ত্তি, ঢাকা স্টেশনের পাশে ফুলবাড়ী রোডের ধারে। নুর মহম্মদ মারা যাওয়ার পর এখনো ওয়াগন ভর্ত্তি তাহার পরিবার ওখানেই আছে। নুর মহম্মদ কি করিয়া মারা গেল তাহাই বলিতেছি, কিন্তু ভদ্রলোকেরা ইচ্ছা করিলে ওয়াগন দুইটি দেখিয়া আসিতে পারেন, পাকিস্তানের রক্তচোষা শাসক শ্রেণীকে চিনিতে পারিবেন।

রানিং শেডের ক্লার্ক নুর মহম্মদ বছরের পর বছর বিভিন্ন রানিং শেডে কাজ করার ফলে ইঞ্জিন নর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একটি ফুসফুস খারাপ করিয়া ফেলে। অন্য জায়গায় কাজের জন্য বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও ফল হয় নাই। গত মার্চ্চ মাসে নুর মহম্মদ বড়কর্ত্তা খোদ ডি-এম-ইর সামনে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হাসপাতালে পাঠানো হয়। কয়েকদিন পর হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাওয়ার সময় ডি-এম-ও অর্থাৎ বড় ডাক্তারবাবুকে ধরা বিহীন যে কোন স্থানে ট্রান্সফার করিতে বলে। কিন্তু ঘুষ না পাইলে বড় ডাক্তার ভালো কাজ করিবে কি করিয়া? আর বহু পোষ্যের সংসার থাকায় নুর মহম্মদই বা ঘুষ দিবার মত টাকা পাইবে কোথায়? কাজেই ফুসফুস খারাপ নুর মহম্মদ হৃৎ-পীণ্ডের জ্বালা চিরতরে জুড়াইবার ব্যবস্থা করিল। যে রেল ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় তাহার বুক ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে সেই ইঞ্জিনের নীচেই সে নিজেকে সমর্পণ করিল—ঠিক ঢাকা স্টেশনের সামনে! জর্জ্জরিত দেহ-খানা দুই ফাঁক হইয়া গেল। কিন্তু কাফন দেওয়ার মত টাকাও নুর মহম্মদের ঘরে ছিল না। রেলের কর্ত্তারা কিছু করিলেন না। কাজেই রেলের শ্রমিক এবং পাশের বাজারের গরীব দোকানদারর চাঁদা তুলিয়া কাটা দেহটাকে জোড়া দিয়া কবর দিবার ব্যবস্থা করিল। নুর মহম্মদের 'পাকিস্তানকে সেবা' করিবার সাধ মিটিল। কিন্তু নুর মহম্মদের মতই যদি শ্রমিক এবং কেরাণীরা পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীকে ধনির রাষ্ট্রকে কবর দিতে চায় তা হইলে কে প্রতিবাদ করিবে?

যাই হোক, নুর মহম্মদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা এখনো তাহার পরিবারবর্গ পায় নাই। নুর মহম্মদের বড় ছেলেটি মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়িত এবং ছোটটি ম্যাট্রিক ক্লাসে। বড়টি এখন টো-টো কোম্পানীতে নাম লিখাইয়া চাকরী খুঁজিতেছে, ছোটটি ঢাকা শহরেই রাস্তার ধারে পানবিড়ির দোকান দিয়া মিথ্যাই রোজগারের চেষ্টা করিতেছে। আর পর্দ্দানসীন মেয়েরা?

ঢাকা লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের সম্পাদক ছাঁটাই শ্রমিক সিরাজুল ইসলামের বৌ বাড়ী বসিয়া বিড়ি বানায়। কিন্তু ভালো 'সুখা' কিনিবার পয়সা নাই, তাই বিড়িটা একটু খারাপ হয়, তাই বিক্রি করারও অসুবিধা। যে সব দোকানে বাকীতে গরীব লোকেরা জিনিস কেনে সেখানে ঐ বিড়ি রাখিলে হয়ত কিছু বিক্রি হইতে পারে, কিন্তু বাকী পয়সা পাওয়া দুষ্কর। কাজেই এক গাল দাড়ি লইয়া উস্কোখুস্কো চুল, শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলাম পকেটে বিড়ির বাণ্ডেল লইয়া ঘোরে। সিরাজুল নামকরা মেকানিক ছিল, ৯ই মার্চ্চের প্রস্তুতির সময় জেল হয় এবং তাহার পর চাকুরী গিয়াছে। একদিকে জীবিকা নির্ব্বাহের সংগ্রাম চলিয়াছে, অন্যদিকে আই-বি-র লোক এখনো তাহার পিছু পিছু ঘুরিতেছে, কখনো বা একাধিক! একজন বেকারের পিছনে দুইজন

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভাষার সমানাধিকার অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দস্যুতা

কংগ্রেস নেতারা ভাষা সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, এই সম্মেলন তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। কংগ্রেস নেতাদের এই নীতিতে সমস্ত ভাষার সমান অধিকার অস্বীকার করা হইতেছে; হিন্দীকেই ভারতের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করাই ইহার লক্ষ্য; হিন্দী ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষীদের উপর জোর করিয়া হিন্দী ভাষা চাপাইয়া দিবার জন্যই কংগ্রেস নেতারা এই নীতি অনুসরণ করিতেছেন।

অন্যান্য ভাষাভাষীদের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে কৌশলে চুপিচুপি হিন্দী চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। যেমন, মাদ্রাজে প্রথমে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা হইল; এবং তাহার পর প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলেই কেবল হিন্দী শিক্ষা দিবার সুযোগসুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার যে মতলব, তাহার রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

শোষকদের ভণ্ডামি

ভাষা সম্পর্কে এই নীতির সমর্থনে কংগ্রেস নেতারা ভারতের "ঐক্য" "জনগণের" ঐক্য, "ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র,"—এইসব বুলি আওড়াইতেছেন। কিন্তু, এইসব বুলি ভণ্ডামি মাত্র। সমগ্র দেশের জনসাধারণের উপর দেশের একটি অংশের ভাষা জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া অন্যান্য ভাষাকে নিম্ন পর্য্যায়ে হীন করিয়া ফেলিবার যে ব্যবস্থা, তাহার ভিত্তিতে কখনও ভারতের জনসাধারণের ঐক্য গঠিত হইতে পারে না —ইহাই এই সম্মেলনের ঘোষণা।

অতীত ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ইত্যাদি জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেখানে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশকে ও প্রত্যেকটি নাগরিককে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে কেবল সেই সব জনসাধারণ ও রাষ্ট্রই প্রকৃত শক্তিশালী হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে সমানাধিকার হইতে বঞ্চনা করিবার যে নীতি তাহারই ভিত্তিতে "ঐক্য ও শক্তি" গড়িবার বুলি; অধিকাংশের উপর মুষ্টিমেয় মানুষের আধিপত্য কায়েম করিবার কৌশল ভিন্ন আর কিছু নয়।

মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণ

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও পুঁজিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের আগুনে ভারতের জনগণের যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে বজায় রাখিয়া আরও শক্তিশালী করিবার একটি মাত্র পথই আছে। তাহা এই: কোটি কোটি মেহনতী জনগণকে শোষক শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য হইতে স্বাধীনতা দিতে হইবে; ভারতের প্রত্যেকটি 'জাতি' এবং প্রত্যেকটি ভাষার জন্য সুনিশ্চিত সমানাধিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে রাষ্ট্র এইসব দাবী পূরণের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করিতে পারিবে, একমাত্র সেই রাষ্ট্রই ভারতের কোটি কোটি মেহনতী জনগণের সমর্থন পাইবে।

নেহরু-প্যাটেল জোটের নেতৃত্বে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিপতি ও জমিদারদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী দমননীতির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই একই নীতি অনুযায়ী নেহরু-প্যাটেল জোটের এই রাষ্ট্র হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপাইয়া দিয়া, অন্যান্য ভাষার সমানাধিকার অস্বীকার করিয়া অপর একটি নূতন অন্যায় ও দমনমূলক ব্যবস্থা চাপাইয়া দিতেছে।

এই জুলুমের ভিতর দিয়া যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে সে নহে মেহনতী জনগণের ঐক্য—সে হইল মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে শোষকদের এবং তাহাদের রাষ্ট্রের ঐক্য।

অন্যান্য মারোয়াড়ী গুজরাটী শোষক জোটের স্বার্থে রাষ্ট্রভাষার উপর একটি ভাষার আধিপত্য কায়েম করা আজ মারোয়াড়ী ও গুজরাটী পুঁজিপতিদের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই মাড়োয়ারি গুজরাটী পুঁজিপতিরা ভারতের বাজারে বৃটিশের আসন গ্রহণ করিতে চাহিতেছে—প্রত্যেকটি 'জাতিকে' ভাষার ভিত্তিতে যে অঞ্চলগুলি আছে সেই অঞ্চলগুলিকে এবং অন্যত্র সব অঞ্চলগুলিকে শোষণ করিবার জন্য তাহাদের শোষণের শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থে এমনি একটি ভাষার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। মেহনতী জনগণের উপর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আধিপত্য চালু রাখিবার জন্য শোষক ও তাহাদের ভৃত্যদের ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা, ইত্যাদি কাজে এমনি একটি সাধারণ মাধ্যমের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

বিভিন্ন 'জাতির' ভাষাগুলিকে দমন করিয়া ধ্বংস করিবার হাতিয়ার হিসাবেই রাষ্ট্র এইভাবে হিন্দী চাপাইয়া দিতে চাহিতেছে। জাতিগুলির সাংস্কৃতিক বিকাশের অধিকার, তাহাদের ভাষার সমানাধিকার দমন করিবার হাতিয়ার হইবে এই ব্যবস্থা। ভারতীয় ইউনিয়নের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা যদি হয় হিন্দী, তাহা হইলে আইন, ইত্যাদি নিজ নিজ ভাষায় পাইবার যে অধিকার, তাহা হইতে হিন্দী ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষীরা বঞ্চিত হইবে; রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহারা অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে না;—এইভাবে, হিন্দী ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষী মেহনতী জনগণের আইনসভা, ইত্যাদি কাজে অংশ গ্রহণের পথ রুদ্ধ হইবে।

হিন্দীকে এই বিশিষ্ট স্থান দিয়া রাষ্ট্র নিজ স্বার্থেই এই তারতম্য বজায় রাখিতে চাহিবে; হিন্দীর জন্য যাবতীয় সুযোগ করিয়া অন্যান্য ভাষার স্বাধীন বিকাশে বাধা দিবে—কেননা, তাহাদের ভয় আছে যে, অন্যান্য ভাষা বিকাশের সুযোগ পাইলে সমস্ত ভাষার সমানাধিকারের দাবী বারবার দেখা দিবে। তাই, রাষ্ট্রই অন্যান্য ভাষাকে দখল করিতে উদ্যোগী হইয়া উঠে।

সর্ব্বব্যাপী শোষণেরই অঙ্গ

ভাষার ভিত্তিতে বর্ত্তমান জনসমষ্টিগুলির এবং জাতিগুলির নিজনিজ ভাষার বিকাশের যে অধিকার, তাহারই বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে আসিতেছে এই একটি মাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার ব্যবস্থাটি; ভাষার সমানাধিকারের বিরুদ্ধেই এই আক্রমণ। পুঁজিপতিদের ভিতর মারোয়াড়ী, গুজরাটি জোটটিই সর্ব্বপ্রধান। ক্ষুদ্র 'জাতি'গুলিকে দমন করিবার কাজ সুরু হইতেছে এই ভাষার উপর আক্রমণে। কি হিন্দী ভাষাভাষী, কি অন্যান্য ভাষাভাষী, সমগ্র জনগণের উপর যে ব্যাপক দমননীতি কংগ্রেস সরকার ক্ষমতা পাইবার দিন হইতেই চালাইয়া আসিতেছে তাহারই অঙ্গ এই ভাষার উপর আক্রমণ।

প্রতিরোধের সৈনিক হুঁশিয়ার

হিন্দী ভাষাভাষী জনগণ—শ্রমিক, কৃষক ছাত্র আজ অন্যান্য ভাষাভাষী জঙ্গী মেহনতী জনগণের সহিত একত্রে নেহরু-সরকারের পাশব আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে—কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ের জন্য হিন্দী ভাষাভাষী ও অন্যান্য ভাষাভাষী মেহনতী জনগণের এই ঐক্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই হিন্দী ভাষাভাষী মেহনতী জনগণ কখনও দাবী করিতে পারে না যে, অন্যান্যের উপর তাহাদের দাবী চাপাইয়া দেওয়া হউক—এমন দাবী তাহারা কখনও করে নাই। এমন দাবীকে সমর্থন করিলে, কিংবা ইহার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালাইতে অসমর্থ হইলে, কোটি কোটি মেহনতী জনগণের ভিতর অনৈক্য সৃষ্টি হইবে, পুঁজিপতিদের জঘন্য আক্রমণেই সাহায্য হইবে। এই সম্মেলন তাই, বিশেষভাবে হিন্দী ভাষাভাষী ছাত্র ও অন্যান্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে: অন্যান্য ভাষাভাষীদের উপর হিন্দী চাপাইয়া দিবার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হোন; অন্যান্য ভাষাভাষীদের উপর আধিপত্য বিস্তার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, একটি মাত্র ভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় মত ঘোষণা করুন!

এই আক্রমণ প্রতিহত কর

ভারতের জনগণের ঐক্যের জন্য সমগ্র ছাত্রসমাজের প্রবল আগ্রহ আছে। এই সম্মেলন আহ্বান জানাইতেছে: পুঁজিবাদী আধিপত্যের জন্য, একটি জাতির বিরুদ্ধে আর একটি জাতিকে উস্কাইয়া দিবার জন্য, কংগ্রেসী শাসকেরা যেন সেই প্রবল আগ্রহের সুযোগ লইতে না পারে; মুষ্টিমের শোষকের স্বার্থে যেন একটি ভাষাগত জনসমষ্টির বিরুদ্ধে আরেকটি জনসমষ্টিকে উস্কাইয়া দিতে না পারে। বিড়লা ইত্যাদি পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করিবার যে নীতি, তাহারই সঙ্গে এই হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা। এবং কেবল তাহাই নহে। অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতি দমন করিবার জন্যও এই নীতি; ভারতের অসংখ্য মেহনতী জনগণকে জোর করিয়া নির্ব্বাক দাসে পরিণত করাও এই নীতির লক্ষ্য। সর্ব্বসাধারণের নিকট এই সম্মেলন আহ্বান জানাইতেছে—সংগ্রামে অগ্রসর হোন; এই নীতিকে পরাস্ত করুন!

ভারতের সমস্ত ছাত্রের প্রতি এই সম্মেলন আহ্বান জানাইতেছে: হিন্দীকে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিবার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেহনতী জনগণের সহিত একত্রে অগ্রসর হোন! ভারতের সমস্ত ভাষার সমান অধিকারের জন্য, একেবারে উচ্চতম পর্য্যায়ে পর্য্যন্ত নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অধিকারের জন্য এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হিন্দীকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা করিবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হোন!

প্রকৃত ঐক্যের একমাত্র পথ

অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সহিত সমস্ত ভাষার সামানাধিকারের নিশ্চয়তা চাই; রাষ্ট্রের কাজে সমস্ত ভাষার সমানাধিকার চাই—অর্থাৎ, সমস্ত আইন-কানুন, ঘোষণা ইত্যাদি নিজ নিজ ভাষায় পাইবার অধিকার চাই; উর্দ্ধতম পর্য্যায়ে পর্য্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হওয়া চাই নিজ নিজ মাতৃভাষা; কোন একটি ভাষাকে বিশেষ মর্য্যাদা ও সুযোগ সুবিধা দিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ হওয়া চাই। এই সম্মেলন মনে করে যে, তাতেই ভারতের সমগ্র জনগণ স্বেচ্ছায় একটি ভ্রাতৃত্বমূলক সমাবেশে একত্রিত হইতে পারিবে। একমাত্র এইরূপ ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রদেশ ও 'জাতির' জনগণের ভিতর ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক ও সহযোগিতা গড়িয়া উঠিতে পারে। সমস্ত ভাষার এই সমান অধিকারের মর্য্যাদাই বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের ভিতর পরস্পরের ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে; তাহার ফলে সমস্ত ভাষার অধ্যয়ন ও বিকাশের পথই প্রশস্ত হইবে—এবং সমস্ত ভাষাভাষীর ভিতর সাধারণ যোগাযোগ ও মেলামেশার সমস্যারও সমাধান হইবে ইহারই ভিতর দিয়া।

মঞ্জিল

নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের আলোচনা প্রস্তাব

চটকলে 'বন্দীহপ্তার' অভিশাপ লইয়া ১৫ই আগষ্টের সপ্তাহ সুরু

শ্রমিকদের পকেট কাটিয়া মালিকদের মাসে ২৪ লক্ষ টাকা রোজগারের স্বাধীনতা

১৫ই আগস্ট কংগ্রেসী শাসনের দুই বৎসর পুরা হইবে, আর ঠিক এই তারিখ হইতেই চটকলের তিনলক্ষ শ্রমিককে আবার এক সপ্তাহ বেকার বসিয়া থাকিতে হইবে।

গত মাসেও তাহারা এইভাবে একহপ্তা বেকার বসিয়াছিল। ইহার ফলে সোজা হিসাবে তাহারা প্রায় ২৪লক্ষ টাকা মজুরি হারাইয়াছে এবং মাসে এই ২৪ লক্ষ টাকা মালিকেরা লাভ করিতেছে।

মজুরের পেট কাটিয়া চোখের সামনে মালিকেরা যাহাতে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করিতে পারে তাহার জন্যই কংগ্রেসের স্বাধীনতা।

শুধু ২৪ লক্ষ টাকাই নয়, কয়েকমাস আগে১২॥ পারসেন্ট তাঁত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় ১৫,০০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে।

গতবার ছাঁটাইয়ের সময় জাতীয় টি. ইউ ও সোশ্যালিষ্ট দালালরা বুঝাইয়াছিল, মানিয়া লও আর কিছু হইবে না। দেখা গেল ঠিক তাহারই এক হপ্তা বন্দীর হুকুম হইল। এবারও দালালরা বুঝাই-য়াছে—মানিয়া লও আর কিছু হইবে না। কিন্তু নূতন আক্রমণ পুনরায় সুরু হইয়াছে।

আধা মজুরীও ফাঁকি দেওয়ার মতলব

আক্রমণের ফল হইবে শ্রমিকদের বেতন আরো হ্রাস করা, খাটুনি বৃদ্ধি—একজন মজুরকে দিয়া দুইজনের কাজ তোলা এবং পরিশেষে আরও ছাঁটাই করা। চটকল এলাকায় বেকারের ভিড় বাড়ানো।

এক হপ্তা কাজ বন্ধ রাখিয়াই মালিকরা সন্তুষ্ট নয়। বন্দীহপ্তার জন্য যে আধা মজুরী দিতে হয় তাহাও কাটিয়া লওয়ার চেষ্টা হয় কামারহাটিতে।

মালিক এখানে নোটিস দেন—মাসে এক হপ্তা বন্ধের বদলে দৈনিক ১॥ ঘণ্টা করিয়া মিল বন্ধ রাখা হইবে। অর্থাৎ প্রত্যহ ৮ঘণ্টার বদলে সাড়ে ৬॥ ঘণ্টা খাটিতে হইবে।

কামারহাটির এই নোটিস দেখিয়া মনে হয় অন্যান্য চটকলেও মালিকেরা এই পথ ধরিবেন।

ইহার মতলব বন্দীহপ্তার দরুণ মজুরদের প্রাপ্য আধা-মজুরীও ফাঁকি দেওয়া। চটকলের অধিকাংশ শ্রমিকই ফুরণের কাজ করেন। দেড় ঘণ্টা করিয়া কম খাটিলে তাহাদের মজুরীও দেড় ঘণ্টা কমিয়া যাইবে। মজুরদের ফাঁকি দিয়া মালিকরা আরও ২০লক্ষ টাকা মুনাফা করিতে পারিবেন।

ডবল খাটুনি আয় হ্রাস

ইতিমধ্যে জায়গায় জায়গায় ডবল খাটুনির চেষ্টা চলিতেছে। নদীয়া মিলে বন্দীহপ্তার ফাঁকে নূতন ধরণের হাতীকল বসিতেছে। ইহাতে ৪টি মেয়ে শ্রমিকের বদলে একজন মেয়েশ্রমিক দিয়াই কাজ হইবে। ফলে বাকি ৩জনকে ছাঁটাই করিতে হইবে।

১৪ই আগস্ট

জগদ্দলের সাউথ মিলেও নতুন কল বসিতেছে। একজন মেয়ে শ্রমিক দুইটি কল দেখিবে।

হাজিনগরের নৈহাটি জুট মিলেও মাস কয়েক পূর্ব্বেই নতুন কল বসাইয়া দুইশ মেয়েকে ছাঁটাই করা হইয়াছে।

অনেক মিলে নতুন কল বসাইবার মত টাকাও মালিকেরা খরচ করিতে রাজী নহেন। তাই নানা ফন্দী করিয়া পুরানো দেওয়ার নামে বদলী ও বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া তোলা হইতেছে।

মাল খারাপ হইলে মেঘনাতে টিপসহি আদায় করা হইতেছে। সুবিধামত পরে ছাঁটাই করা হইবে।

১২॥% তাঁত বন্ধের সময় বদলী শ্রেণিনে রক্ষছাঁটাই হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত স্থায়ীশ্রমিকেরা যে কাজ পাইতেছেন তাহা নহে।

কামারহাটিতে স্থায়ী শ্রমিকদেরও মাঝে মাঝে এক সপ্তাহ বসিয়া থাকিতে হইতেছে। সেই তাঁতে অন্য আর একজন স্থায়ী শ্রমিক কাজ পাইতেছেন।

কেহ ছুটিতে গেলে খালিতাঁত বদ-লীরা বিশেষ পাইতেছেন না। উদ্বৃত্ত স্থায়ী শ্রমিক দিয়া তাহা পূরণ হইতেছে। তাহাতেও কুলাইতেছে না।

এইভাবে স্থায়ী শ্রমিকদেরও এক আধ সপ্তাহ বেকার এবং শেষ পর্য্যন্ত ছাঁটাই হইতে হইবে।

গতবার ছুটিতে যাহারা গিয়াছিলেন তাহাদের অনেকে ফিরিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কলে কাজ মিলিতেছে না। ফলে

ছাঁটাই ও দুর্ভিক্ষরোধের পথ—ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম

কলেই তাহারা মজুরদের খাটাইতে সুরু করিয়াছেন।

গৌরীপুর চটকলে হুকুম হয় দুই বেলায় ১৫ মিনিট করিয়া আধঘণ্টা বিনা মজুরীতে বেশী খাটিতে হইবে।

জগদ্দলের সাউথ মিলে স্পীনিংএর স্পীড দেড়গুণেরও বেশি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক ঘণ্টায় ২১৩টি বুকানলী উৎপন্ন হইত এখন ৫১৬টি করিয়া উৎপন্ন করিতে হইতেছে।

খাটুনীবৃদ্ধির ধাক্কা লাগিতেছে প্রধানত স্পীনিং প্রভৃতি ডিপার্টমেন্টের উপর। ইহার ফলে বেশী সুতা উৎপন্ন হইলে ফুরণের কাজ বলিয়া তাঁতীদের রোজগার হয়ত বাড়িত। কিন্তু সেদিকেও অষ্টরম্ভা। একজন স্পীনিং মজুর করিয়া যদি দুই জনের কাজ হয় তবে উৎপাদন কম রাখার জন্য ছাঁটাই প্রয়োজন হইবে। অন্যদিকে তাঁতীরা যাহাতে বেশি আয় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। মেঘনা মিলে কম বীমা দেওয়া হইতেছে। প্রত্যেক মিলেই এমন সস্তা ও খারাপ পাট দেওয়া হইতেছে যে বুনিতে গেলেই ছিড়িয়া যায়। ডবল খাটুনী পড়ে কিন্তু হপ্তা উঠে না।

কামার হাটিতে তাঁতীদের ১৷৷ হপ্তা কম উঠিতেছে।

ছাঁটাই বেকারী

ইতিমধ্যে আস্তে আস্তে বরখাস্তের ষড়যন্ত্র করা হইতেছে। কাজ খাটিয়া লেবার অফিসে কর্মপ্রার্থী বেকার চটকল শ্রমিকের লাইন দিনদিনই বাড়িয়া উঠি-তেছে।

জগদ্দলে আলেকজাণ্ডার মিলে আগে ৫০।৬০ জন লাইন দিত, এখন দেন, ৫০০।৬০০ জন।

এলায়েন্স মিলে আগে লাইন দিতেন ১০০।১৫০ জন এখন তিন শিফ্ট মিলিয়া ৫০০।৬০০ জন।

কামারহাটিতে কিছুদিন আগেও ৪০০—৫০০ জন লাইন দিতেছিলেন। বেকার অবস্থায় বেশি দিন চালাইতে না পারিয়া অনেকে পুনরায় দেশে যাইতেছেন।

সংসার খরচ বৃদ্ধি

এদিকে সংসার খরচও কেবলি বাড়ি-তেছে। সবচেয়ে বড়ো খরচ চাল। প্রত্যেক শ্রমিককেই তাহা বাজার হইতে কিনিতে হয়। গঙ্গার ওপারে চালের দর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতি ৫ সেরী পাল্লায় আরো।০, ৷/০ বাড়িয়াছে।

বর্ষার সুরুতে আলু পটল তরীতরকারী প্রত্যেকটিরই দর দ্বিগুণ। কিছুদিন আগেও হোটেলে এক আদমীর খানা মিলিত ৪ টাকা হপ্তায় এখন লাগে ৫৷৷০ টাকা।

বারে বারে আয় কমিতেছে অন্যদিকে খরচ বাড়িতেছে বারে বারে বেকার মানুষ বাড়িতেছে ইহাই হইতেছে 'স্বাধীন-তা'র তৃতীয় বৎসরের সুরুতে অবস্থা।

একেকটি আক্রমণের পর চটকল শ্রমিক ভাবিয়াছিল, আর বুঝি কিছু হইবে না। এখন অবস্থা দেখিয়া বোঝা যাইতেছে শ্রমিকদের চূড়ান্ত ভাবে শোষণ না করা পর্য্যন্ত মালিকেরা থামিবে না।

একটি আক্রমণের পর আবার নূতন আক্রমণ আসিবে। একবার ছাঁটাইয়ের পর আবার ছাঁটাই হইবে। চটকল মালিকদের নেতা মিঃ ওয়াকার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ পুঁজিবাদী জগতে এক ঘোরতর সংকট উপস্থিত হইয়াছে। মাল বেচিয়া আর বেশী লাভ করা যায় না, তাই সরাসরি মজুরের পেট না কাটিলে মালিকের মুনাফা বজায় থাকে না।

গত দিল্লীর সম্মেলনে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা জানাইয়া দিয়াছেন, চটকলের শাদাচামড়া মালিকেরা যত খুশী মজুরের পেট কাটিতে পারিবেন।

কিছু কষ্ট হইলেও কোনরকমে বাঁচিয়া থাকিবে—চটকল শ্রমিকদের পক্ষে আজ আর এ উপায়ও নাই। মালিকেরা বাঁচিতে দিতে পারে না।

শুধু এক রাস্তা আছে—সংঘবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়ানো। মুনাফার জন্য মজুরের পেট কাটিতে না দিয়া পেট ভরাইবার জন্য মালিকের মুনাফা কাড়িয়া লওয়া।

মজুর রুখিয়া দাঁড়াইলে যে মালিকের আক্রমণ বন্ধ হইয়া যায় তাহার প্রমাণ কামারহাটি। ৬॥ ঘণ্টা কাজ চালানোর নোটিস দিয়াও মজুরের মেজাজ দেখিয়া সে নোটিস প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

আধঘণ্টা বেশী খাটিতে অস্বীকার করিয়া গৌরীপুর চটকল শ্রমিকেরা মালিককে বেকায়দায় ফেলেন। নিয়মিত কাজ না পাওয়ায় টিটাগড়ে বদলী শ্রমিকেরা কিছুদিন পূর্ব্বে দুইদিন হরতাল করিয়া মালিককে নরম হইতে বাধ্য করেন।

গতবার ১২% তাঁত বন্ধের সময় যে ঘেরাও ধর্ম্মঘটের ঝড় জাগিয়াছিল তাহা ভোলার নয়।

বেকার, বদলী এবং আধামজুরীর চটকল শ্রমিকদের মধ্যে যে বেপরোয়া রাগ বাড়িতে সুরু করিয়াছে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের রূপ লইলে তাহা মালিকের সমস্ত আক্রমণকে এক মুহূর্তে বানচাল করিয়া দিতে পারে।

তাই শুধু ছোটোখাটো দাবি নয়, মূলদাবিতে চটকল শ্রমিকদের আগাইতে হইবে। 'জাতীয়' টি-ইউ ও সোস্যালিস্ট দালালদের কোনঠাসা করিয়া সমস্ত চটকল মজুরের জঙ্গী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়িয়া তুলিতে হইবে।

গত বোম্বাই সম্মেলনে চটকল শ্রমিকদের জন্য এ-আই-টি-ইউ-সি দাবি করিয়াছেন—

১। কমপক্ষে ৮০ টাকা বনিয়াদী বেতন, ৫০ টাকা মাগ্গীভাতা এবং ২০ টাকা ঘর ভাড়া চাই।

২। ছাঁটাই চলিবে না, খাটুনী বৃদ্ধি চলিবে না।

৩। ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে লাগাও, বন্ধ তাঁত চালু করো।

৪। লকআউট, বন্দী ইত্যাদির জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ চাই।

৫। চাকুরির নিরাপত্তা চাই।

৭। বিনা ক্ষতিপূরণে চটকলকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে।

আসাম শান্তি সম্মেলনে গুলিবর্ষণ :

আসাম মন্ত্রিসভার কুৎসার প্রতারণা

পণ্ডিত নেহরুর সাম্রাজ্যবাদী

বিকৃতি ও মিথ্যা প্রচারের ব্যূহ ভেদ করিয়া আসাম হইতে এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ডিব্রুগড়ে আসাম সরকারের পুলিস গুলি চালাইয়া দুইজন মহিলাসহ ৪জন মানুষের মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

যাহাদের উপর গুলি চলিয়াছে তাঁহারা ছিলেন আসাম শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি ও দর্শক। নিহত বৃদ্ধা কৃষক মহিলা জাতিকা দাইমারী ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতমা।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্যারিসে ও প্রাগে ৭২টি দেশের ৬০ কোটি নরনারীর পক্ষ হইতে যে শান্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহাতে সাড়া দিয়া ডিব্রুগড়ের রেল কলোনীতে এই শান্তি সম্মেলন আহূত হয়। কিন্তু সম্মেলন প্যাণ্ডেল সহসা শতশত সামরিক পুলিস বেষ্টন করিয়া ফেলে। বেঅনেট উচা করিয়া, লাঠি চার্জ্জ করিতে করিতে তাহারা শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি ও দর্শকদের দিকে আগাইয়া যায়। সম্মেলনের কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং রেল কলোনীর অন্যান্য মহিলারা এই সময় একত্রে গিয়া দাঁড়ান পুলিসের বেঅনেটের সামনে। পুলিসের নিকট তাঁহারা আবেদন জানান—"আক্রমণ বন্ধ কর। শান্তি সংগ্রামে তোমরাও আগাও। শান্তি সংগ্রামে তোমরাও যোগ দাও।"

চতুর্দিকে লাঠিচার্জের মধ্যে নিরস্ত্র মহিলাদের পক্ষ হইতে শান্তির এই নির্ভীক আবেদনে পুলিস কর্তারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। নৃশংস লাঠি চার্জ ও গুলিবর্ষণ সুরু হয়। মহিলা সভানেত্রী ৬০ বছরের জাতিকা দাইমারী এবং ১৮ বছরের কৃষক কন্যা বীণা বড়া ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিস আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আগাইতে গিয়া ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন জনৈক জঙ্গী রেল শ্রমিক সহ আরো দুই জন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি এই ঘটনার নৃশংসতার কাছে ম্লান হইয়া যাইবে। গুলিচালনার পর ৮০০ সশস্ত্র পুলিসকে লেলাইয়া দেওয়া হয় রেল কলোনীর মানুষদের বিরুদ্ধে। চাবুক ও রাইফেলের কুঁদা দিয়া, বেয়নেট ও মারাত্মক অস্ত্রাদি দিয়া নারী, পুরুষ ও শিশুর উপর চলিল নির্বিচার আক্রমণ। বস্তীর ঘরগুলি তছনছ করা হইল, ধূলিসাৎ করিয়া ফেলা হইল কুঁড়ে ঘর। তল্লাস করার নামে তাহারা এলোমেলো আঙিনা ও মাটি খুঁড়িয়া জল বাহির করিয়া ফেলিল।

প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবক সহ শ্রমিক বস্তীর প্রায় সমস্ত পুরুষদের পুলিস আটক করে। জখম হন নাই এমন লোক বিরল। প্রায় ৬০০ গ্রেপ্তার হন।

প্রায় ১০০ জন গুরুতর আহত হইয়াছেন। তাণ্ডবের সময় তাহাদের একত্রে সিবিল হাসপাতাল ও জেল কম্পাউণ্ডে গাদা করিয়া রাখা হয়। রক্তাক্ত জখম লইয়া ইহারা সারা সন্ধ্যা ও সারা রাত একইভাবে পড়িয়া থাকেন। যন্ত্রণার গোঙানিতে বাতাস ভারী হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে গণনাট্য সঙ্ঘের শ্রীযুত নিরঞ্জন সেন যে বিবৃতি দেন, তাহাতে আরো জানা যায় যে, এই তাণ্ডবের সময় শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের উপর পুলিস পাশবিক অত্যাচার করে। জেলের ভিতর আহতদের মধ্যে অন্তত ৩ জন মারা গিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

৩০ বৎসর পরে 'স্বাধীন' ভারতের পশ্চিম প্রান্তের এই দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালা বাগের 'নায়ক' হইতেছেন আসাম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ডেপুটি পুলিস কমিশনার এবং আসাম আইন সভার কংগ্রেসী স্পীকার লখেশ্বর বড়ুয়া। আক্রমণ পরিচালনার সময় ইহারা উপস্থিত ছিলেন।

সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর পিছনে ছিল প্ররোচক গুণ্ডার দল। তাহার পিছনে ছিল ডি-এম-ই প্রভৃতি জাঁদরেল রেল অফিসার এবং আই, বি কর্তারা।

মিথ্যার লৌহপ্রাচীর

আসাম সরকার এবং বাংলা ও বিহারের সংবাদপত্রগুলি এই সমস্ত ঘটনাকে যে ভাবে অবরুদ্ধ ও বিকৃত করিয়াছেন তাহার তুলনা মেলা ভার। শান্তি সম্মেলনের উপর গুলি চলিয়াছে এই প্রধান ঘটনাটিকেই চাপিয়া রাখিয়া প্রথমে বলা হয়, সিনেমার ব্যাপার লইয়া দুই দলে নাকি ঝগড়া বাধিয়াছিল!

দুইজন মহিলা নিহত হইয়াছেন এই পাপ সংবাদ বেমালুম চাপিয়া গিয়া জনৈক পুলিস অফিসারের মৃত্যুর ঘটনা ঢাক পিটাইয়া প্রচার করা হয়।

এই মিথ্যাপ্রচারের নেতৃত্ব করিয়াছেন আসাম সরকারের অস্থায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী। নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খবরে তিনি উল্লাস চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। ২৬শে এপ্রিল ইউ-পি-আই প্রচারিত তাঁহার বিবৃতিতে বোঝাইবার চেষ্টা করা হয় যে, বাড়িয়া উঠিবার আগেই ডিব্রুগড়ে এক কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানকে তাঁহারা রোধ করিয়াছেন। গণনাট্য সংঘের আড়ালে কমিউনিস্টরা নাকি এক 'চক্রান্ত' করিতেছিল!

কিসের 'চক্রান্ত' তাহা প্রমাণ করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কারণ 'চক্রান্ত' আর কিছু নয় শান্তি সম্মেলন। বিশ্বশান্তি সম্মেলনের ডাকে সাড়া দিয়া ডিব্রুগড়ের নালিয়াপোল রেল কলোনীতে ১৭ই জুলাই এক শান্তি সম্মেলন ডাকা হইয়াছিল ইহাই হইতেছে শাসকশ্রেণীর আতঙ্কের কারণ। আসাম প্রদেশের বিভিন্ন গণ-সংগঠনের পক্ষ হইতে সম্মেলন ডাকা হইয়াছিল। প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন আসাম প্রাদেশিক গণনাট্য সংঘ, প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, লামডিং প্রভৃতি স্থানের রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। আসাম ছাত্র ফেডারেশন, চা-বাগান মজদুর সংগ্রাম কমিটি, আসাম তৈল কোম্পানী সংগ্রাম কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন গণ-সংগ্রামের পক্ষ হইতে।

কয়েকদিন ধরিয়া সম্মেলনের প্রচার বাহিনী লখিমপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলিতে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। তিতাবর, ফারকাটিং, বেতিয়ানি, তেকিয়া, তোলাগুড়ি প্রভৃতি স্থানে স্থানীয়ভাবে সভা ও শোভাযাত্রা হইতে এই সম্মেলনে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। ১০ই জুলাই নওগাঁ হইতে হাজার হাজার কৃষক শহরে আসিয়া শান্তি সম্মেলনে মোবারক জানাইয়াছে।

বেলতলা, দামিরা, তিতাবর, নাহারকাটিয়া প্রভৃতি সংগ্রামী গ্রামগুলি হইতে দলে দলে কৃষক মেয়ে-পুরুষেরা প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবক হইয়া আসেন। ডিব্রুগড় তিনসুকিয়া, লাডমিং প্রভৃতি জঙ্গী রেল কেন্দ্রগুলি হইতে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক হাজির হন। প্রতিনিধি পাঠান ডিগবয়ের রেলশ্রমিক ও চাবাগান শ্রমিকেরা।

শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষদের মধ্যে এই শান্তি সম্মেলন এক অভূতপূর্ব উৎসাহ সৃষ্টি করে। এই একই সময়ে গণনাট্য সংঘের প্রাদেশিক সম্মেলন চলিতেছিল। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মিছিল আসিতেছিল রেল কলোনীর দিকে। তাঁহারা ধ্বনি তুলিতেছিলেন—"যুদ্ধবাদীরা নিপাত যাক।" "দঃ পূঃ এসিয়া হইতে হাত উঠাও।" "সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।"

ইহাই হইতেছে অহিংস কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ও কর্তৃপক্ষের আতঙ্কের কারণ। বিশ্বশান্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী

কংগ্রেস-লীগ যুদ্ধ জোটের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের জনগণ

দেশের ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থে 'কমনওয়েলথ' নামধারী হঙ্গ-মার্কিন দাসখতে সহি দিয়া আসিয়াই লিয়াকত-নেহরু সরকার বর্ম্মার শ্রমিক-কৃষকদের লড়াই-এর বিরুদ্ধে আদাজল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। বর্ম্মার জনগণের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন-পাকিস্তান-ভারতের ধনিকশ্রেণীর মিলিত রক্তাক্ত অভিযান চালাইবার অন্যতম কেন্দ্র চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বন্দর দিয়া ইতিমধ্যেই লীগ-কংগ্রেস সরকার সামরিক টেকনিসিয়ান ও অস্ত্রশস্ত্র চালান দিতেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী বড়লাট ডাঃ কাটজু পূর্ব্ববঙ্গের বিলাতী বড়লাট মিঃ ফ্রেডারিক বোর্নের সঙ্গে কক্সবাজারে 'হাওয়া খাওয়ার' নাম করিয়া গিয়া বর্ম্মায় অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি একটি আমেরিকান মিশনও চট্টগ্রাম-বর্ম্মা সীমান্ত পরিদর্শন করিয়াছে।

লীগের সাম্প্রদায়িক জিগীর

লীগ সরকার বর্ম্মার গণ-জাগরণের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অস্ত্রও ব্যবহার করিতেছে। বর্ম্মার গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ার আজ আরাকানকে ভাসাইয়া নিতে চলিয়াছে। বাতুল যেমন বালির বাঁধ দিয়া উত্তাল জলতরঙ্গ রোধ করিবার চেষ্টা করে, তেমনি লীগ নেতারা আরাকানে গণ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মংডু-বুথিডংএ 'স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র চাই' এই আওয়াজ উঠাইয়াছে। মংডু-বুথিডংএ 'স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপন' করিবার জন্য যে 'মুজাহিদ বাহিনী' গঠিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সুউচ্চ লীগ নেতাদের যোগাযোগ আছে।

অন্যদিকে চট্টগ্রামের লাখপতি ধানের ব্যাপারীরা এই 'মুজাহিদ বাহিনী'কে ও 'স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রের' আন্দোলনকে অর্থ যোগাইতেছে। মংডু-বুথিডংএ প্রচুর ধান হয়। সেই ধান সস্তায় কিনিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ভুখা জনগণের নিকট বেশী দরে বিক্রয় করিয়া মুনাফা করাই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেইজন্য ইহারা মংডু-বুথিডংকে নিজেদের তাবে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। সেইজন্যই মংডু-বুথিডংএ 'স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রের' জন্য ইহাদের মাথা ব্যাথা।

মংডু-বুথিডং এ 'স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রের' অন্যতম পিতা হইলেন চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, করিম। ইনি এখন পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর। ইনিই চট্টগ্রাম থাকা কালে সেখানকার চাউল ব্যবসায়ীদের মারফত আরাকানের বড় বড় জোতদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইনি তখন দু'একবার মংডু-বুথিডং ভ্রমণ করেন। সম্প্রতি ইনি 'বর্ম্মা রিফিউজি' ক্যাম্প পরিদর্শন করার নামে চট্টগ্রামে আসিয়া 'মুজাহিদ বাহিনীর' নেতাদের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

দমননীতিতে কংগ্রেস লীগ মিতালী

এইভাবে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বর্ম্মার গণমুক্তির আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী ধনিকদের ও তাহাদের দালাল লীগ-কংগ্রেস সরকারের ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। ইহার জন্য চট্টগ্রামে

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

২ জন মহিলা সহ মোট ৭ জন নিহত

ভাঙ্গিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর ভয়ঙ্কর বিবরণ

পররাষ্ট্র-নীতির স্বরূপ ফাঁস

মানুষদের এই পরাক্রান্ত অভিযানকে তাহারা সরাসরি আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই।

গুণ্ডাবাহিনীর ফ্যাসিষ্ট কৌশল

তাই গুণ্ডাবাহিনী নিয়োগ করার এক ফ্যাসিস্ট কৌশল তাহারা অবলম্বন করিলেন।

গত এপ্রিলে কলিকাতায় 'মহিলাদের বিরুদ্ধে যেভাবে সশস্ত্র গুণ্ডা পাঠাইয়া পুলিস হত্যাকাণ্ডের পথ প্রশস্ত করে, এখানেও সেই একই নীতি গ্রহণ করা হইল।

সম্মেলনের আগের দিন ১৬ই জুলাই রাত্রে যখন গণনাট্য সংঘের প্রকাশ্য সম্মেলন চলিতেছিল, তখন একদল মাতাল গুণ্ডা প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করিতে চাহিয়া হল্লা সৃষ্টি করে।

হল্লা সৃষ্টির জন্য তাহারা জঘন্য প্রাদেশিকতা উস্কাইতে থাকে।

প্রবেশ পথে স্বেচ্ছাসেবকেরা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ সুরু করিলে তাহারা পলাইয়া যায়, কিন্তু কিছু পরেই সশস্ত্র বিরাট একদল গুণ্ডা বাহিনী আসিয়া সম্মেলন স্থল ঘেরিয়া ফেলে। সারারাত্রি প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে শান্তি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্মেলন রক্ষা করিতে থাকেন। এই সারারাত পুলিস দেখা যায় নাই।

পুলিস আসে পরদিন সকালে। শত শত সশস্ত্র পুলিস আসিয়া কলোনীকে ঘেরাও করিয়া থাকে। বেলা দুইটা হইতে কলোনীর সহিত বহির্জগতের সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করা হয়। তাহার পর ডেপুটি কমিশনার ও লখেশ্বর বড়ুয়ার উপস্থিতিতে শত শত সশস্ত্র পুলিস ও গুণ্ডা বাহিনী আক্রমণ সুরু করে।

ঘটনাস্থলে কংগ্রেস নেতা শান্তির বুলি আওড়াইতে থাকেন। ডেপুটি কমিশনার আইন ও শৃঙ্খলার বুলি চালান; এবং পুলিস নৃশংসভাবে লাঠি চার্জ, বেয়নেট চার্জ ও গুলিবর্ষণ সুরু করে।

ভণ্ডামী ও নৃশংসতার এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

আসল চক্রান্তকারী কে

এই হত্যাকাণ্ড একমুহূর্তে চিনাইয়া দিয়াছে মানুষের বিরুদ্ধে আসল চক্রান্তকারী কাহারা।

এই চক্রান্তকারীরা হইতেছেন বিষ্ণুরাম মেধী স্বয়ং, আসামের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। এক শ্রেণীর জনসাধারণের ভাত কাপড়ের দাবীর বিরুদ্ধেই শুধু নয়, তাহাদের কণ্ঠের দাবীর বিরুদ্ধেও তাঁহাদের চক্রান্ত।

আসল চক্রান্ত হইতেছে পণ্ডিত নেহরুর তাঁবেদার সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র নীতি।

এই পররাষ্ট্রনীতির ফলে পণ্ডিত নেহরু কমনওয়েলথে দেশ বিক্রয় করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, ভারতবর্ষকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য এক যুদ্ধঘাঁটিতে পরিণত করিতেছেন।

আসন্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি মারফৎ চীন, ব্রহ্ম, মালয় দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ার মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে সামরিক ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতেছেন।

আসাম সীমান্ত হইতেছে এই পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রয়োগ ক্ষেত্র। এখনকার আসল প্রভু হইতেছেন চা-বাগান ও তৈল খনির শাদা চামড়া মালিকেরা। তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে দেশীয় ব্যবসায়ী, আফিং-এর চোরাকারবারী কংগ্রেসীরা। আসামকে পরিণত করা হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী পুঁজিবাদের এক সুরক্ষিত অঞ্চল।

দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ার মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইহাকেই অন্যতম ঘাঁটি করিয়া তোলা হইতেছে।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আসামের মেহনতী ও গণতান্ত্রিক মানুষ তাই শান্তির ধ্বনি তুলিলেই ভারতবর্ষের বেতনভুক্ত যুদ্ধবাদীরা উন্মাদ হইয়া রাইফেল লইয়া আগাইয়া গিয়াছেন।

শুধু আসামের গরিব মানুষদেরই নয় তাঁহারা আঘাত করিয়াছেন বিশ্বশান্তি সম্মেলনের বিরুদ্ধেই—এতদূর তাঁহাদের সাহস।

এক-সংগ্রাম

এই বর্ব্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে ডিব্রুগড়ের অগ্রণী রেলশ্রমিক, মহিলা ও কিষাণেরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণ দিয়া তাঁহারা অত্ম মেস কংগ্ম করিয়াছেন।

বিশ্বশান্তি আন্দোলনের শহীদের সম্মান তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছেন।

শান্তির সংগ্রাম এবং জমি, ভাত কাপড়ের জন্য সংগ্রাম তাহাদের অভিজ্ঞতায় আজ অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মজুরির দাবীতে ধর্ম্মঘটের ধ্বনি দিয়া আসাম রেলশ্রমিকেরা দেখিয়াছেন ফ্যাসিস্ট অত্যাচার সুরু হইয়াছে।

জমির দাবি করিলে আসামের উপজাতি কৃষকদের বিরুদ্ধে দলে দলে সশস্ত্র পুলিস প্রেরিত হইয়াছে।

যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ব্রহ্ম, মালয় জন সাধারণের পক্ষে, সোভিয়েট ও শান্তি সৈনিকদের পক্ষে, আজ শান্তির দাবী জানাইলেও সেই একই মালিকেরা ছুটিয়া আসিতেছেন একই অস্ত্র লইয়া।

একই কমিউনিস্ট বিরোধিতার ধুয়া তুলিয়া তাঁহারা উভয় সংগ্রামকেই দমন করিতে চাহিতেছেন।

আগামী সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় পঃ বঃ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন

বি-পি-টি-ইউ-সির আহ্বানে বুদ্ধিজীবি ও বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত

বি পি টি ইউ সির আহ্বানে গত ১০ই আগস্ট মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগঠন একত্র হইয়া এক শান্তি কনভেনশন ডাকেন।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন প্রগতিশীল ও শান্তিকামী প্রতিষ্ঠান জন সাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় এক প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন আহূত হইয়াছে। এই সভায় তাহার জন্য প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

মহিলা সহ ৪ জনের যে মৃত্যু ঘটানো হয়, তাহার তীব্র নিন্দা করিয়া ও ডিব্রুগড়ের শ্রমিক কৃষক ও মহিলা শান্তি সৈনিকদের অভিনন্দন জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া গণনাট্য সঙ্ঘের শ্রীযুত নিরঞ্জন সেন আসাম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার নৃশংস আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি কংগ্রেসের

—ইঙ্গ-মার্কিণ মুনাফালোভী যুদ্ধবাদীদের ধ্বংসের জন্য

—কমনওয়েলথ দাসখত ছিঁড়িয়া ফেলার জন্য

—সোভিয়েট, চীন ও দঃ পূর্ব্ব এশিয়ার ও দুনিয়ার মুক্তিকামী জনসাধারণের স্বপক্ষে দৃঢ়কর্ম্ম বাংলার শান্তিকামীদের ঘোষণা

সভায় প্রায় ৬২টি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, প্রাদেশিক কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতি ছাড়াও সুতাকল ফেডারেশন, জয়নগর কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতি, ই আই রেলশ্রমিক, গ্যাস ও মিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মোটর কারখানা শ্রমিক, ব্যাঙ্ক ও সরকারী কর্ম্মচারী, অধ্যাপক, ও বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন।

শ্রমিক নেতা কুঞ্জবিহারী সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ডিব্রুগড়ে আসাম প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনে গুলিবর্ষণ করিয়া দুইজন

ফতোয়া উপস্থিত করেন অধ্যাপক শ্রীযুত অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র।

অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, উর্দ্দু প্রগতি লেখক এবং বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বিভিন্ন বক্তা তাহাকে সমর্থন জানান।

এই ফতোয়াতে এই হুসিয়ারী করা হয় যে, তৃতীয় মহাসমরের চক্রান্ত সম্পর্কে বাংলার জনসাধারণ ঘুমিয়ে নেই। কাহারা এই চক্রান্তকারী সে সম্পর্কেও জনসাধারণ সজাগ আছে।

এই চক্রান্তকারী হইতেছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তাহারাই কাশ্মীর যুদ্ধের চক্রান্ত করিতেছে, ভারত সীমান্তে তাহাদের যুদ্ধ ঘাঁটি বসাইতেছে।ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের হত্যা অভিযান চালাইয়াছে।

এই অভিযানে সাম্রাজ্যবাদী ও বিভিন্ন দেশের বিশ্বাসঘাতক শাসকদের সঙ্গে একযোট হইয়া ভারতের ধনিকরা ও নেহরু সরকার এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিতেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সম্পদকে বলি দিতে সুরু করিয়াছে।

ফতোয়াতে দাবি করা হয়, কমনওয়েলথ চুক্তি ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে; এসিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে কোনরূপ আক্রমণ ভারতের জনগণ সহ্য করিবে না।

ফতোয়াতে চীনের মুক্তি অভিযানকে অভিনন্দিত করা হয়, সোভিয়েটের শান্তি নীতির পিছনে সমগ্র জনগণের সমর্থন ঘোষিত হয়।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে, ইউরোপে জনগণের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, এসিয়ার মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধবাদীদের নেতৃত্বে যে সমরপ্রস্তুতি তাকে ব্যর্থ করার জন্য সংকল্প ঘোষিত হয়।

ফতোয়াতে ঘোষণা করা হয় বিশ্বব্যাপী শান্তির শিবির বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার শিবির অপেক্ষা আজ অনেক পরাক্রান্ত। এই শিবিরের সৈনিক হইবার জন্য ব্যাপক আহ্বান জানান হয় সমস্ত শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্তকে, সমস্ত বৈজ্ঞানিক, লেখক ও শিল্পীদের, মানব হিতৈষী, দেশপ্রেমিক, গণতন্ত্রী ও শান্তি সমর্থকদের।

"ভারতের নওজোয়ান সোভিয়েটের সঙ্গে" "সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ভারত অস্ত্রধারণ করিবে না" "হিন্দুস্থান আজ রুটি রুজি আর বাসস্থান দাবি করিতেছে" "কমনওয়েলথ চুক্তি খতম কর' প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্বনিতে সভাস্থল বারবার প্রতি ধ্বনিত হইতে থাকে।

আগামী শান্তি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধি মণ্ডলির পক্ষ হইতে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

বক্তিণ

হাসপাতালে নার্স ও শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের জোয়ার

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের নার্স, জমাদার, আয়া, ওয়ার্ডবয়, দারোয়ান প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা মূল বেতন, মাগ্‌গীভাতা, বাড়ীভাড়া সহ মোট ১৭০ টাকা মাহিনা, পাকা চাকুরী, দৈনিক ৭ ঘণ্টা ডিউটি, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং অন্যান্য স্থানীয় দাবীর ভিত্তিতে আগামী সপ্তাহ হইতে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

দিনরাত যাহারা রোগীর সেবাশুশ্রূষা করেন সেই সেবাব্রতী কর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট করিলে জনসাধারণের দুর্ভোগের সীমা থাকে না, তাহা তো এদের অজানা নয়। তবু এরা ধর্ম্মঘট করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন? ইহার দায়িত্ব কাহার?

৫ টাকা মাসে মাহিনা

সেবাসদনের কর্তৃপক্ষ বলিতে যাহাকে বুঝায় তিনি হইতেছেন পঃ বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়; তাহার এই খাস জমিদারীতে নার্সরা ট্রেনিং পিরিয়ডে খাওয়া ছাড়া মাহিনা পান মাসিক মাত্র ৫ টাকা। আর দাই, কুলি, আয়া, জমাদার প্রভৃতি শ্রমিকরা পান খাওয়া ছাড়া ৪২ টাকা। অথচ দৈনিক এদের দিয়ে খাটাইয়া নেওয়া হয় কম পক্ষে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা, কোন কোন ক্ষেত্রে ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত।

হাসপাতাল শ্রমিকদের এই সামান্য আয়ে দুবেলা অন্ন জোটানই মুস্কিল, তাই এদের নিজেদের ঘর ভাড়া করার কোন বালাই নাই। হাসপাতালেরই বারান্দায়, সিঁড়ির নীচে, ষ্টোর রুমের ওমট গরমে এরা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে রাত কাটায়। শিশু সদনের সামনে রাস্তায় ফুটপাতের উপর ৬ মাসের শিশু শোয়াইয়া রাখিয়া মা যান মাসিক ৪২ টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করিতে।

নির্লজ্জ শোষণ

শ্রমিকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব বলিতে কিছু নাই, যেদিন খুসী তাদের গলাধাক্কা দিয়া রাস্তার বাহির করিয়া দেওয়া হয়। রোগীর সংখ্যা বাড়িতেছে অথচ 'টাকা নাই' এই অজুহাতে নতুন কোন লোক নেওয়া হইতেছে না। ফলে সম্প্রতি নার্স, জমাদার, আয়া, পিওন, ওয়ার্ড বয় সকলকেই ওভার টাইম খাটান হইতেছে। নার্সদের দিয়া বেডপ্যান পরিষ্কার করান, রোগীদের থালা ধোয়ান হইতেছে, আবার ওয়ার্ডবয়দের দিয়া ইন্‌জেকসান দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। একজন নার্সকে একা ৫২ জন কঠিন রোগের রোগীর ভার লইতে হইতেছে, আর একজন জমাদারকে গড়ে একশত রোগীর ময়লা পরিষ্কার করিতে হইতেছে।

কথায় কথায় ছাঁটাই, সসপেণ্ড, ফাইন, গালাগালি—ইহা তো কমসে লাগিয়াই আছে।

নার্সদের কোয়ার্টার নিয়া এত ঢাক ঢোল পিটান হয়; কিন্তু সেগুলিকে কোয়ার্টার না বলিয়া কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্প বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বীরকন্যা গীতা এবং মৃণালিনীর জন্ম দিয়াছে এরা, তাই আইন ও শাসনের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষের চেষ্টার কোন অবধি নাই। বিনা অনুমতিতে কোয়ার্টারের বাহিরে যাওয়া চলিবে না, চিঠিপত্র লেখা, দেখা সাক্ষাতের কড়াকড়ি, কর্তৃপক্ষের পেটোয়া গোয়েন্দাদের অহরহ গরম শাসানি আর খবরদারি—সব মিলিয়া এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি বন্দী নার্সদের জীবনে নারকীয় যন্ত্রণার মতন অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই সমস্ত জুলুম, শোষণ, নির্য্যাতন শুধু সেবাসদনের নয়, সমস্ত সরকারী বে-সরকারী হাঁসপাতালেই সমান ভাবে আছে—সর্ব্বত্রই ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গড়িয়া উঠিয়াছে। মেডিকেল কলেজের সমস্ত নার্সরা গত জুন মাসে খাওয়ার প্রতিবাদে ১০।১২ দিন অনশন ধর্ম্মঘট করেন, লেক মেডিক্যাল কলেজে টুকরা টুকরা লড়াই প্রায়ই দুই একটি হইতেছে। গত মাসে ওভারটাইম খাটিতে অস্বীকার করার জন্য একজন ওয়ার্ড বয়কে ফাইন করার প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমিকরা পরপর দুইদিন কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করেন। তক্ষুনি দাবি আদায় হয়। সেবাসদনে জুনমাসে ইউনিয়ন সভানেত্রী উষা গুপ্তাকে আটকের প্রতিবাদে সমস্ত নার্স ও শ্রমিকেরা ২ ঘণ্টার জন্য কাজ বন্ধ করিয়া দেন। ১০ই জুলাই তারিখে একজন জমাদার জমাদারণীকে ১০ টাকা ফাইন করিলে, ইহারা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ঘেরাও করিয়া ধর্ম্মঘটের হুমকী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাইন মকুব হয়।

সমস্ত হাসপাতালে হাসপাতালে এই বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং সংগঠনের মধ্যে দানা পাকিয়া উঠিতেছে। সেরা অংশ সেবা সদনের কর্ম্মীরা ধর্ম্মঘটের পথে পা দিয়াছেন, অন্য সব যায়গায়ই প্রস্তুতি চলিয়াছে।

হাঁসপাতাল শ্রমিকদের দাবী:

(ক) নার্স ও শ্রমিকদের সকলের জন্য মূল বেতন ৮০৲। মাগ্‌গীভাতা ৫০৲, ঘরভাড়া ৪০৲ টাকা।
(খ) পাকা চাকুরী
(গ) দৈনিক ৭ঘণ্টা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা ডিউটি
(ঘ) বছরে একমাস হক ছুটি, ১৫দিন হঠাৎ কাজের ছুটি, ১৫দিন অসুস্থতার ছুটি।
(ঙ) প্রতি ৮জন রোগীর জন্য একজন করিয়া নার্স, কুলি ও জমাদার।
(চ) ইউনিয়ন গড়ার অধিকার।
(ছ) ডিউটির সময়ের পর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।
(জ) সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিজের ও পরিবারের চিকিৎসার ব্যবস্থা।

পূর্ব্ববঙ্গের অপরাজেয় রেলমজুর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চাকুরীজীবী গোয়েন্দা! সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে মামলা চলিতেছে।

মেকানিক সিরাজুল ইসলাম এরই মধ্যে সিসার একরকম তালা আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করার মূলধন কোথায়? সিরাজুল এক ধরনের পেট্রোম্যাক্স বানাইতে পারে যাহাতে অল্প তেল এবং বেশী আলো হয়, কিন্তু মূলধন কোথায়? দোকানীরা হয়ত দুই চার টাকায় প্যাটার্ণটা কিনিয়া তাহাকে বিদায় করিবে। কাজেই সিরাজুল অন্য কাজ করার চেষ্টা করে। তের আনার কাঠ কিনিয়া তুরপুন বানাইয়াছিল, কিন্তু বাজারে একটার বেশী বিক্রি হয় নাই; তারপর এক টাকা দু'আনার কাঠ কিনিয়া রুটি বানাইবার বেলুন বানাইয়া বিক্রি করে। তবে নুন আনিতে পান্তা ফুরায়; চলে না সংসার। কয়েকদিন মাথায় করিয়া আম বিক্রি করার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেখানেও কিছুটা বেশী পুঁজি থাকিলে সুবিধা। অতএব অনাহারে উপবাসে চলিতেছে।

ইতিমধ্যে 'ইসলামিক সোসালিস্ট' অর্থাৎ ভাষাণীর মওলানা এবং ফয়েজ আহমদের দালালরা আসিয়া সিরাজুল ইসলামকে এক শ'টাকা দিতে চায়। বলে, আমরাও'তো সাম্যবাদ চাই, আমাদের হয়ে কাজ কর, তাতে দমননীতিও সহ্য করতে হবে না। অনাহারক্লিষ্ট সিরাজুল সে টাকা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর এই নূতন বীরত্বের তুলনা কোথায়?

তবে ৯ই মার্চ্চের ১৭ জন ছাঁটাই শ্রমিকের মধ্যে ১ জনকে দালাল 'ইসলামিক সোসালিস্টরা' টাকা দিয়া ভাগাইয়া লইয়া গিয়াছে। ভুখা মজুরকে টাকার লোভ দেখাইয়া সর্ব্বনাশ করাই এই 'ইসলামিক সোসালিস্টদের' পেশা।

৯ই মার্চ্চের ছাঁটাই শ্রমিক নূরুল ইসলাম বৌকে শ্বশুর বাড়ী জোর করিয়া পাঠাইয়াছে, আর বলিতেছে, আবার আমি জেলে যাবো। নূরুল নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী সুতাকলের বন্দীমজুরদের জেলে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে যে বাহিরে গিয়া উহাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করিবে। সে-কথা সে ভোলে নাই। কোনো মিষ্টির দোকান থেকে একটু আটা, কোনোটা থেকে একটু মশলা প্রভৃতি আনিয়া রাস্তার ধারে ফুলরী জাতীয় জিনিস বানাইয়া জীবিকার চেষ্টাও মাঝে মাঝে করিতে হয়। ছাঁটাই শ্রমিক জয়নালকে গ্রামের দিকে যাইয়া জনমজুরী খাটিতে বলায় প্রকৃত শ্রমিকের মত জবাব দিয়াছিল, রেলের আশপাশে থাকিবেই, যদি কিছু একটা হয়!

'যদি কিছু একটা'র স্বপ্ন রেলের সমস্ত শ্রমিক দেখিতেছে, আর অগ্রগামীরা বুঝিতেছে 'যদি' নয়, হইবেই। ঢাকার ওয়ার্কশপের শ্রমিক পথ দেখাইয়াছে, গেটের নিদারুণ ক্ষুধা সস্তা গ্রেনশপের কথা স্মরণ করাইয়া পথ দেখাইতেছে, ছাঁটাই রিভার্শনের মরিয়া আক্রমণ পথ দেখাইতেছে, পূর্ব্ববঙ্গের ক্রমবর্দ্ধমান সংকট পথ দেখাইতেছে, আন্তর্জ্জাতিক সংকট এবং শ্রমিকশ্রেণীর জয়যাত্রা পথ দেখাইতেছে। ঢাকার রেল শ্রমিক কেন্দ্রের মত পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেকটি রেল শ্রমিককেন্দ্রই দাবানলের জ্বালা বুকে করিয়া আছে। আজ রেলশ্রমিক একতার দিকে অগ্রসর হইয়া সারা পূর্ব্ববঙ্গে বিপ্লবী জনতার নেতৃত্ব লইতে যাইতেছে। সেই জয়যাত্রার পথে রিভার্টেড ড্রাইভার ড্রাইভারি করিবে, ফায়ারম্যান আগুন জ্বালাইবে, ক্লিনার বিপ্লবের ইঞ্জিন পরিষ্কার করিবে। ইহাকে যে কাব্য বলিয়া উড়াইয়া দিবে সে রিভার্শন, ছাঁটাই এবং রেল মজুরকে দেখে নাই।

দমদম কাগজ কারখানায় সংগ্রাম

রুইকর পন্থীদের দালালী

২৯শে জুলাই হইতে দমদমের এসিয়াটিক পেপার এণ্ড বোর্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এ লক আউট চলিতেছে।

ঐদিন কারখানার মালিক ২০জন মেয়ে শ্রমিককে বরখাস্ত করেন। ইহার প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমিক অবস্থান ধর্ম্মঘট করিয়া ১৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি ও বরখাস্ত নোটিস প্রত্যাহার দাবি করেন। পরদিন হইতে লক আউট সুরু হয়।

লকআউটের আগে হইতেই মালিক ইউনিয়ন ভাঙ্গার চেষ্টা করিতেছিলেন। মেয়ে শ্রমিকদের পিছনে তিনি গুণ্ডা নিয়োগ করেন। শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট চালাইবার জন্য প্রস্তুত।

ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হইতেছেন রুইকর পন্থী। শ্রমিকদের সংগ্রাম গঠন করার বদলে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাহার বিরোধিতাই করিতেছেন।

২৯শে জুলাই অবস্থান ধর্ম্মঘটের সময় শ্রমিকেরা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি দেখা দেন না। তিনি শ্রমিকদের জঙ্গী প্রতিরোধের নিন্দা করিতেছেন এবং দূরে দূরে থাকিতেছেন।

শ্রমিকেরা বুঝিতে সুরু করিয়াছেন, লড়াই করিতে হইলে তাঁহাকে বাদ দিয়াই আগাইয়া যাইতে হইবে এবং শক্ত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(১) কাহাকেও ছাঁটাই করা চলিবে না (২) প্রত্যেকের ১৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি চাই (৩) ছুটি ইত্যাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই, এই দাবিতে শ্রমিকেরা আছেন।

মজিদ

বন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘটের পর আবার সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন বন্দীশালায় তিনবার অনশন ধর্ম্মঘট ও একবার প্রত্যক্ষ লড়াই হোয়ে গেছে। জেলের মধ্যে ৪ জন বন্দী গুলিতে ও অনশনে নিহত হয়েছিল আর বন্দীদের দাবি সমর্থনের 'অপরাধে' কলকাতার রাজপথে নারী ও নাগরিকেরা প্রাণ দিয়েছেন। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও বিপুল গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বন্দীদের দাবি কিছু কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই বন্দীরা আবার সরকারের বিরুদ্ধে শর্ত্তভঙ্গের অভিযোগ এনেছে। "আবার" এই কথাটা বলা হোল, কারণ স্মরণ থাকতে পারে যে, গত জুন মাসের অনশন ধর্ম্মঘটের মূল দাবি ছিল: "সরকারের পূর্ব্ব স্বীকৃত লিখিত শর্ত্ত পালন করতে হবে।" এবং এবারেও অনশনের মীমাংসায় অন্যতম শর্ত্ত হিসাবে আবার সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়: "এপ্রিলের স্বীকৃত সমস্ত শর্ত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্যই পালন করবে বলে ঘোষণা করছে।" তবুও তা কি পালিত হোয়েছে?

১। প্রথমেই ধরা যাক বন্দীদের মূল দাবি উচ্চশ্রেণীভুক্ত করার কথা যা সরকার এপ্রিলের অনশনের সময় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সরকার ও বন্দীদের মীমাংসায় লিখিত শর্ত্ত ছিল: "শ্রমিক কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত সমস্ত বিচারাধীন বন্দীকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং বিচারের পর কারাদণ্ড হোলে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হবে।" অথচ একমাত্র মেদিনীপুর জেলের ৫০০ রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে শোনা যাচ্ছে মাত্র ২০ জনকে নাকি উচ্চ শ্রেণীভুক্ত করা হোয়েছে। বিশেষভাবে শ্রমিক-কৃষক বন্দীদের গবর্নমেণ্ট উচ্চশ্রেণীভুক্ত করতে অস্বীকার করছে। অন্যান্য জেল, বিশেষ কোরে কলকাতা থেকে দূরস্থানে অবস্থিত জেলগুলোর এই একই অবস্থা। বন্দীদের কাছে স্বীকৃত, দ্বিতীয় বার ঘোষিত, সরকারী প্রতিজ্ঞা, পালন করা হোচ্ছে না কেন? কেন এই ভাবে শর্ত্ত ভাঙ্গা হচ্ছে? সরকারের তরফ থেকে এখন নানা জটিল প্রশ্ন 'উচ্চ শ্রেণীভুক্ত করার ক্ষেত্রে' তোলা হোচ্ছে। জমি দখলের লড়াই "কৃষক আন্দোলন কি না? অথবা "হিংসাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত" ব্যক্তি এই শর্ত্তের মধ্যে পড়ে কিনা—প্রভৃতি কথার মারপ্যাচে অনশনের সময় স্বীকৃত শর্ত্ত থেকে সরকার বর্তমানে ফিরে যেতে চায়। ওপরে লিখিত শর্ত্তের ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট। সরকারবিরোধী রাজনৈতিক কারণে এবং কৃষক ও মজুর গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত হিংসাত্মক মারপিট অথবা হিংসাত্মক বক্তৃতা যে কোন অভিযোগেই হোক না কেন তারা সমাজের যেকোন স্তর থেকে আসুক না কেন, সমস্ত বন্দীকে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে—এই হচ্ছে শর্ত্তের ভাষা ও অর্থ। লিখিত শর্ত্তের কালী না শুকাতে, শহীদের রক্তে ভেজা মাটির লাল রং বিবর্ণ হওয়ার আগেই পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিজ অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে সুরু করেছেন।

(২) যেখানে মূল শর্ত্ত উপেক্ষিত ও ভাঙ্গা হয়েছে সেখানে অন্যান্য শর্ত্তের কথা তোলা বাহুল্য মাত্র।

পারিবারিক ভাতার দাবি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার কোরে অনশন ভঙ্গের মীমাংসার অন্যতম শর্ত্তের মধ্যে লিখেছিল: "বন্দীর আয় থেকে তার নিজস্ব খরচ বাদ দিয়ে বাকীটা পারিবারিক ভাতা দেওয়া হবে; বিশেষ ক্ষেত্রে বন্দী যেখানে পরিবারের একমাত্র উপায়ক্ষম ব্যক্তি সেখানে পারিবারিক ভাতা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হবে।" অথচ আজ পর্য্যন্ত একটি ক্ষেত্রেও পাঁচশত টাকা দেওয়া হয়নি। বন্দীদের একটা বিরাট অংশ শ্রমিক-কৃষক-কেরাণী। তারাই সংসারের একমাত্র রোজগারী ছিলেন ইহা কে না জানে! আজ স্পষ্ট যে কেবলমাত্র প্রচারের জন্যেই গবর্নমেণ্ট ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। শর্ত্তে আরো লেখাছিল: বন্দীর পরিবারের নির্ভরশীলদের কষ্ট লাঘবের জন্যে জেলে ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৫০৲ পর্য্যন্ত সাময়িক (মাসিক) ভাতা দেওয়া হবে। ক'জনকে এই ভাতা জেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হোয়েছে? একজনের নামও সরকার করতে পারবে না। সাধারণত তিনমাস থেকে ছ'মাস পরে এই ভাতা সম্পর্কে সরকার মনস্থির করে থাকে। ২।৩ মাসের আগে সাময়িক ভাতা পর্য্যন্ত স্থির হয় না। পরিবারের প্রয়োজন তো বহু দূরের কথা—আয়ের অনুপাতেও ভাতা স্থির করা হয় না। ২০।৩০টাকার উর্দ্ধে পারিবারিক ভাতা খুব কম ক্ষেত্রেই নির্দ্দিষ্ট হোয়ে থাকে। বর্ত্তমানে কোন পরিবারের একাধিক ব্যক্তির সংসার এই টাকার মধ্যে চলতে পারে?

রেল শ্রমিক হিতাও নুনিয়ার ৬ মাসের মধ্যে একবার মাত্র আধ মাসের মাইনে পেয়েছিলেন: পারিবারিক ভাতা সম্পর্কে সরকার জানিয়েছে যে তার দরখাস্ত বাতিল করা হোয়েছে। বলা বাহুল্য সরকার কোন কারণ জানানো দরকার মনে করেনি। দেশে হিতাও নুনিয়ার স্ত্রী নাবালক শিশু পুত্রদের নিয়ে আজ অনাহারে মৃত্যুদশায়। আর এইভাবে এটা একটা মাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—শত শত বিনা বিচারে আটক শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত রাজবন্দীর পারিবারিক জীবন ধ্বংস হোতে চলেছে। এর মূলে রয়েছে সরকারের ইচ্ছাকৃত শর্ত্তভঙ্গ।

(৩) "নিরাপত্তা বন্দীদের (মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমেত) সমস্ত রাজনৈতিক সাহিত্য দেওয়া হবে, কিন্তু তা দেবার আগে সেন্সর করার অধিকার সরকারের থাকবে।" এপ্রিলের লিখিত শর্ত্তের দ্বিতীয় ধারা। জুন মাসে সরকার আর একধাপ অগ্রসর হোয়ে শর্ত্তের সাথে জুড়ে দিল যে নতুন বই সেন্সর হোতে এক পক্ষ কাল, পত্রিকা ১০ দিন লাগবে—পুরানো বই যা একবার সেন্সর হোয়ে গেছে তা সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হবে।

অথচ দমদম বিশেষ করে মফঃস্বল জেলগুলো থেকে অভিযোগ আসছে যে বই দেওয়ার ব্যাপারে আগেকার গাফিলতি পুরা মাত্রাই বজায় আছে। বাজারে যে সমস্ত সোভিয়েট ও রাজনৈতিক পুস্তক ও পত্রিক হাজারে হাজারে বিক্রি হোয়ে থাকে তা পর্য্যন্ত বন্দীদের দেওয়া হয় না। "রাজনৈতিক সাহিত্য বিশেষ কোরে মার্ক্সবাদী সাহিত্য বন্দীদের দেওয়া হবে" বলে যে প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছিল তা তারা ভঙ্গ করেছে।

এ সমস্ত ছাড়াও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জেল থেকে রাজবন্দীদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত খবর আসছে তাতে যে কোন সুস্থ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক বিচলিত না হয়ে পারে না। সমস্ত জেল থেকে অভিযোগ আসছে যে রাজবন্দীদের প্রতি জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ় ও অভদ্রোচিত হোয়ে উঠছে। যেকোন উপায়ে যেন একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি করা এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে বলে রাজবন্দীরা মনে করছেন। বিশেষ কোরে যখন কথায় কথায় "শাস্তি" ও "অধিকার কেড়ে" নেবার ধমকি আসে তখন এর পেছনের উদ্দেশ্য আর গোপন থাকে না। যেভাবে সমস্ত জেলগুলো থেকে একই ধরনের অভিযোগ আসছে তাতে মনে হয় "কড়া" হবার "নির্দ্দেশ" সম্ভবত লালদীঘির পাড় থেকেই এসেছে। প্রেসিডেন্সী জেলের কর্তৃপক্ষ "স্লোগান" এমনকি "সমবেত সঙ্গীতে" পর্য্যন্ত আঁতকে ওঠেন। রাজবন্দীদের সুবিধা কেড়ে নেবার কোন শেষ নেই। (ক) অনশনের সময় অধিকাংশ রাজবন্দীর ১০ থেকে ২০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন কমে গেছে, তবু কোন বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য দিতে মেডিকেল অফিসার অস্বীকার করেন। বর্তমানে তারই নির্দ্দেশে পেটেণ্ট ঔষধ পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ হয়েছে। সরকারের কম খাওয়ার নীতি তিনি রোগীদের ওপর প্রয়োগ করেছেন; সম্ভবত এই সব কারনেই বাংলায় বড় বড় তিনটি জেলের ৬।৭ হাজার বন্দীর তিনিই একমাত্র অবিসংবাদিত মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হোয়ে আছেন। ফলে ওয়ার্ড পরিদর্শন অথবা রোগীদের দেখার সময় আর তার হোয়ে ওঠে না।

(খ) রাজবন্দীদের সংখ্যা রোজই বাড়ছে। কিন্তু নতুন ওয়ার্ড খোলার রেওয়াজ উঠে গেছে। প্রেসিডেন্সি যেলের কর্তৃপক্ষ বলেন, "জেলে আর জায়গা নেই যা পারেন করুন।" (অর্থাৎ রাজবন্দীরা যাতে কোন সংঘর্ষের মধ্যে যেতে বাধ্য হয়। তার উস্কানি জেল কর্তৃপক্ষ দিয়েই চলেছে)। (গ) বর্ষাকালে থাকার জন্যে প্রেসিডেন্সি জেলে যে জায়গা দেওয়া হোয়েছিল—ক্রমশ লোক ঢুকিয়ে সেখানেও থাকতে বাধ্য করা হোচ্ছে; সাধারণ কয়েদীদের স্থানান্তরিত করে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অনায়াসে স্থান করা সম্ভব তা না করে রাজবন্দীদের স্থানান্তরিত করার জমি তৈরী করা হচ্ছে; রাজবন্দীদের বৃষ্টি জলে খোলা চালার খেতে যেতে বাধ্য করছে। (ঘ) আগে নিরাপত্তা বন্দী হওয়ার সাথে সাথে প্রাপ্য টাকার জিনিসপত্র কেনবার সুযোগ দেওয়া হোত। এবারের অনশনের পর হতে সে সমস্ত সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। "কনফর-মেশন" না হওয়া পর্য্যন্ত নাকি রাজবন্দীদের পুরা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবেনা। কিন্তু কেন? মীমাংসার শর্ত্তের মধ্যে এই অধিকার কেড়ে নিবার কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্ত ছিল না।

এক কথায় প্রতিদিনের জীবনে জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার অসহনীয় হোয়ে উঠেছে। মীমাংসায় স্বীকৃত চুক্তি সরকার ভঙ্গ করেছেন, জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার দিনের পর দিন অপমানজনক ও রূঢ় হোয়ে উঠছে।

তার ওপর আবার রাজবন্দীদের বাংলার বাইরে নির্ব্বাসিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই বন্দীদের দেউলী, পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে পাঠানো হবে। এই আশঙ্কা আরও প্রবল হয়েছে গবর্নর জেনারেলের অধুনা প্রচারিত অর্ডিনান্স। ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি বিল রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাড়াহুড়া করে অর্ডিনান্সে জারী করা হলো কেন তা'র রহস্য কে না'বোঝে? পশ্চিমবাংলার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নলিনী সরকার অবশ্য তার বিবৃতিতে বলেছেন: স্থানান্তরিত করার সংবাদ ভিত্তিহীন। কিন্তু তিনি একথা বলেন নাই, আপোষ চুক্তির সময় গবর্নমেণ্ট বন্দীদের স্থানান্তরিত করা হবে না বলে কোন লিখিত শর্ত্তে রাজী হলেন না কেন? তিনি একথাও বলেন নাই পুলিস কমিশনার এস-এন-চাটার্জ্জী সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী জেল ঘুরে আসলেন কেন? তিনি তার বিবৃতিতে এমন কথাও বলেন নাই যে বন্দী স্থানান্তরিত করার কোন প্ল্যানই তাঁদের নেই। এখন বন্দী স্থানান্তরিত করার বিরুদ্ধে বন্দীদের দৃঢ়তা এবং বাহিরে জনগণের বিক্ষোভ দেখে তাঁরা যদি সাময়িকভাবে পিছু হটে থাকেন তাতে জনগণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। নলিনীবাবুর উদ্দেশ্য কতখানি সাধু তা' তিনি বন্দী স্থানান্তরিত না করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রমাণ করুন এবং বন্দীদের আজ পর্য্যন্ত যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পালন করে দেখান। কিন্তু বিড়লার বন্ধুদের কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণ এটা কখনো আশা করেন না।

অনশনের মীমাংসায় স্বীকৃত শর্ত্তাবলী এখনি ছাপতে হবে, মানতে হবে; জেলে এবং কলকাতার পথে যারা গুলি চালিয়েছিল তাদের শাস্তি দিতে হবে; কোন রাজবন্দীদের দূরে বাংলার বাহিরে স্থানান্তরিত করা চলবে না; শ্রমিক-কৃষক

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৪ই আগষ্ট

কোটিপতিদের মনোপলী ব্যাঙ্কগুলিতে মধ্যবিত্তের জবাই সুরু

ভারতের ব্যাঙ্ক মালিকরা টাটা-বিড়লা-সিংহানিয়ার দল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের রুজি ও রোজগারের উপর চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ সুরু করিয়াছেন।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে বোম্বাইএ একটি কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল বসিয়াছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার গত বাৎসরিক অধিবেশনে (টাটার পশ্চিম বাংলার এই ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখায় গত বৎসর কর্মচারীরা তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চালাইবার পর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া কর্মচারীদের দাবী মানিয়া নেন, ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ক্যাপ্টেন প্রথম এই ধরনের একটা আদালত বসাইবার কথা তোলেন। মিঃ ক্যাপ্টেনের এই পরামর্শ লুফিয়া নিয়া নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির সভাপতি 'বিপ্লবী' সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর কংগ্রেসের ভাড়াটিয়া অর্থনীতিবিদ কে'টি, সাহর মারফতে পণ্ডিত নেহরুকে চাপ দেন, অবিলম্বে এই ধরনের আদালত বসাইবার জন্য। এই দুয়ের যোগ ফলে এই ট্রাইব্যুনালের সৃষ্টি। এহেন ট্রাইব্যুনালের রায় যে কি হইবে তাহা সকল ব্যাঙ্ক কর্মচারীই আন্দাজ করিতে পারিতেছেন। ইহা কর্মচারীদের ছাঁটাই, বেতন কাটার ব্যবস্থা করিবে এবং অতিরিক্ত খাটুনীর ব্যবস্থা করিবে। লীভ, বোনাস, ইনক্রিমেণ্ট, গ্র্যাচুয়িটি প্রভৃতি বর্ত্তমানের সামান্য সুযোগ সুবিধা এবং সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে কর্মচারীদের বঞ্চিত করিবে।

মালিকেরা অবশ্য রায়ের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন এমন নহে। তাহারা তাহাদের কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন।

ছাঁটাই সুরু

কলিকাতার সমস্ত ব্যাঙ্কে ইতিমধ্যে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের কথা উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে এবং হিন্দুস্থান মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কে ৪জন করিয়া কর্মচারী ছাঁটাই হইয়াছেন। প্রথম ব্যাঙ্কটি উক্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে পুলিসের খারাপ রিপোর্টের অজুহাত তুলিয়াছেন, দ্বিতীয়টি সোজা বলিয়া দিয়াছেন "বাড়তি ষ্টাফ রাখিবার মতন সঙ্গতি তাহাদের নাই"। কিছুদিন আগে নাথ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ৬০জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করিয়াছেন। সরাসরি ছাঁটাই না করিয়া ঘুরাইয়া ছাঁটাই করার চেষ্টাও চলিতেছে। কর্মচারীদের কলিকাতা হেড অফিস হইতে দূর দুরান্তর ভিন্ন প্রদেশে বদলী করা হইতেছে। যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ছাঁটাইয়ের হুমকী দেওয়া হইতেছে। হেড অফিস হইতে নগণ্য ব্রাঞ্চগুলিতে বদলী করা হইতেছে এই মতলবে যে সেখানে 'বাড়তি' বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহাদের ছাঁটাই করার সুবিধা হইবে। লয়েডস্ ব্যাঙ্কে 'অসুস্থ' এই কারন দেখাইয়া একজন কর্মচারীকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

খাটুনির চাপ বাড়িয়াছে

খাটুনীর চাপ বাড়াইবার জন্য নানারকম প্ল্যান চলিতেছে! একচেটিয়া কর্তৃত্ব পাওয়ার ফলে কয়েকটি ব্যাঙ্কে সাময়িকভাবে কাজ কর্ম যথেষ্ট বাড়িলেও, নতুন কর্মচারী নেওয়ার কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না! 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' (অবশ্য মালিক বিলাতী) সম্প্রতি চৌরঙ্গীতে নতুন ব্রাঞ্চ খুলিয়া হেড অফিসের লোকদের দিয়া এই ব্রাঞ্চের কাজ চালাইতেছেন। কিন্তু এই জন্য হেড অফিসে নতুন কোন কর্মচারী নিয়োগ করা হয় নাই। ফলে ঐ অফিসের কর্মচারীদের এখন দুইজনের কাজ একজনের করিতে হয়।

মোট মাহিনা কমিতেছে

কর্মচারীরা যা অল্প বেতন পান প্রাদেশিক ট্রাইব্যুনালগুলির রায়ের মারফৎ তাহাও কাটিয়া নেওয়া হইতেছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা সম্প্রতি এক ট্রাইব্যুনালের রায়ে যে বাড়ীভাড়া বাবদ এলাওয়েন্স পাইতেন, তাহা খোয়াইয়াছেন। হিন্দুস্তান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের একটি মোটা অংশের মাহিনা একটি ট্রাইব্যুনালের রায়ে আবও ৫ টাকা কমিয়া গিয়াছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কর্মচারীরা প্রতি বছর ১ মাসের বেতন বোনাস পান। এবারে হঠাৎ কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করেন যে, প্রতিজন কর্মচারী বছরে যে মাহিনা লইয়াছেন তাহার ১/১২ ভাগ বোনাস পাইবেন। দারোয়ান পিওন প্রভৃতি নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের একটা মোটা অংশ বছরে কিছুদিন বিনা বেতনে ছুটি নিয়া দেশে যান। এই নতুন নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যই ছিল এই কর্মচারীদের প্রাপ্য বোনাসের একটা অংশকে আত্মসাৎ করা।

ধূমায়িত বিক্ষোভ

ইহার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিক্ষোভ গড়িয়া উঠিতেছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কর্মচারীরা ২বার ঘেরাও করিয়া একবার একজন কর্মচারী বদলীর আদেশ আর একবার পূর্ব্বোক্ত বোনাস কাটার আদেশ রদ করাইয়াছেন। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা উপযুক্ত পরিমাণে মাগগীভাতা না দিবার প্রতিবাদে একদিন কলম ধর্ম্মঘট করার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন। সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতারা কর্মচারীদের নানারকম ভয় দেখাইয়া এই কলম ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব তুলিয়া নিতে রাজী করান। খণ্ডখণ্ড এই সমস্ত আন্দোলন ক্রমেই এক কেন্দ্রীভূত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ নিতেছে এবং ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা সর্ব্বত্র একই আওয়াজ তুলিয়া দ্রুত সংঘবদ্ধ হইতেছেন (ক) জীবনধারণের উপযুক্ত বেতন চাই, (খ) চাকুরীর স্থায়ীত্ব চাই (গ) সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চাই।

ষ্টেট বাসের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

'বাঘ' মার্কা সরকারী বাসের কণ্ডাক্টর ও ড্রাইভার পদের জন্য ৫০ হাজার যুবক দরখাস্ত করিয়াছিলেন; উহার মধ্যে ৪৫,৭০০ শতের বেকারী ঘোচে নাই; কিন্তু যে ৩ শত মানুষের 'বেকারী' ঘুচিয়াছে তাহাদের অবস্থা কি?

তাঁহারা মাসিক বেতন পান কণ্ডাক্টার ৮১৲ টাকা এবং ড্রাইভার ১০১৲ টাকা। কাগজে কলমে নিয়ম থাকিলেও যখন তখন অতিরিক্ত খাটিতে হয়; কিন্তু ওভার টাইমের ব্যবস্থা নাই।

সরকারী চাকুরীয়া হইলেও চাকুরীর স্থায়িত্ব নাই; প্রফিডেণ্ট ফণ্ডের সুবিধা নাই। রেলের শ্রমিকরাও বছরে দেড় মাস ছুটি পান, বাসের শ্রমিকদের বেলায় শুধু নিয়ম 'কাজ নাই তো পয়সা নাই।'

হাজার বারশ টাকার মাহিনার মন্ত্রী ও পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী পোষ্য ও অফিসাররা সকলেই তাঁহাদের কর্তা। কথায় কথায় 'সাসপেণ্ড' ও মাহিনা কাটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ৯৯নং ড্রাইভারকে কোন কারণ না দেখাইয়া 'সাসপেণ্ড' করা হইয়াছিল; তাঁহার চাকুরী কখন চিরতরে গেল তাহা তিনি জানিবার আগেই অন্য এক শ্রমিকের গায়ে ৯৯ মার্কাটি দেখা গেল।

সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ আর একটি নূতন আদেশ জারি করিয়াছেন প্রত্যেক কণ্ডাক্টরকে ১ শত ও ষ্টোর কীপারকে ৫ শত টাকা জমা দিতে হইবে। চাকুরী দিবার সময় এই শর্ত্ত ছিল না। দিন আনা-দিন-খাওয়া ব্যক্তিদের অত টাকা থাকিলে আর দুঃখ ছিল কি?

বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার ৯৲ টাকা ভাতা দিতেন, নানা ছুতায় উহা কাটিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে।

এই সব অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে ও বাঁচার নিম্নতম প্রয়োজনের জন্য ছয় শত শ্রমিকের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত দাবীসমূহ লইয়া সভাসমিতিতে প্রস্তাব করা হইতেছে:

(ক) চাকুরীর স্থায়িত্ব ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা; (খ) ১ মাসের সিকলিভ, ১ মাসের প্রিভিলেজ এবং ১২ দিনের ক্যাজুয়াললিভ; (গ) পূজা-বোনাস এবং (ঘ) সাসপেণ্ড করিতে হইলে লিখিত কারণ দেখাইতে হইবে।

ইহা ছাড়াও গুমটির সকলের জন্য ইউনিফর্ম্ম, দুর্ঘটনায় অসুস্থতা কালীন সময়ের পুরা বেতন ইত্যাদি দাবীও তাঁহারা তুলিয়াছেন।

শ্রমিকদের এইভাবে সংঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া আতঙ্কিত কর্তৃপক্ষ আই-এন-টি-ইউ-সির মৈত্রেয়ী বসু ও অন্যান্যকে লইয়া একটি পাণ্টা ইউনিয়নের ফন্দি আঁটিতেছেন। 'বাজারী' কাগজগুলিতে ছাপাইয়া তাহারা উহা খাড়া করিয়াও ফেলিয়াছেন। 'জাতীয়' টি-ইউ-সির পাণ্ডা স্টোর্টার তারাপদ চক্রবর্ত্তী সরকারী ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্টের একখানা 'জীপও' পাইয়াছেন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য।

এই সব ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলারা শ্রমিকদের কাছে বড়ই পরিচিত। মাত্র এক বছর আগে এই মৈত্রেয়ী বসু ও অন্যান্যদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতাতেই ৫ শত সিভিল সাপ্লাইয়ের লরী ড্রাইভার চাকুরী খোয়াইয়াছিলেন। তাই শ্রমিকরা ইহাদের কোন ভাওতায় ভুলিতেছেন না।

সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

বন্দীদের আলাদা রাখা চলবে না; বিনা বিচারে কাকেও আটক রাখা চলবে না; পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, জেলের জুলুম বন্ধ করতে হবে—এ দাবী সগ্রাম শ্রমিকশ্রেণী এবং জনতার দাবীতে পরিণত করতে হবে। ধনিক কংগ্রেসী সরকার বিড়লার শোষণের পথ খোলা রাখার জন্যেই শ্রমিক নেতাদের বিনা বিচারে আটক করেছে; নলিনী বিধান মন্ত্রিসভা শ্রমিক নেতাদের জেলে পুরিয়া এখন কারখানায় কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই আর মজুরী কাটার পথ অনুসরণ করেছে। এ জন্যই এখন বন্দীমুক্তির সংগ্রামকে শক্তিশালী করা, মজুরদের ছাঁটাই বিরোধী সংগ্রামকেই শক্তিশালী করবে। বন্দীদের দাবীর উপর সংগ্রামে লালঝাণ্ডা শ্রমিকদেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।

প্রগতিশীল পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

নিউ পাবলিশার্স

৬নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

অর্ডার দিলে ভি-পিতে পার্শেল পাঠানো হয়।

মঞ্জিলের নিয়মাবলী

(১) প্রতি রবিবার কাগজ বাহির হইবে। দাম তিন আনা।

(২) ১০ কপির কম এজেন্সী নাই। শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন।

(৩) গ্রাহকদের হার:—বার্ষিক ১০৲ টাকা, যাণ্মাসিক ৫৲ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷৷০ টাকা।

ম্যানেজার
মঞ্জিল

মঞ্জিল

টি-ইউ-সি'র নেতৃত্বে সারা ভারত রেল শ্রমিক সম্মেলন আহ্বান

সংগ্রামী ঐক্য সম্ভাবনায় আতঙ্কিত জয়প্রকাশ গুরুস্বামীর মুখে নূতন ধোঁকার গরম বুলি

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস রেল শ্রমিকদের একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলন রেল শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মপন্থা স্থির করিবে।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই সম্মেলন আহ্বানের কথা শুনিয়াই জয়প্রকাশ-গুরুস্বামী এণ্ড কোং শ্রমিকদের বিপথগামী করার জন্য তাঁহাদের চিরাচরিত পথ ধরিয়াছেন। রেলওয়ে বোর্ড ও কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে আপোষ করিয়াই শ্রমিকদের সবদাবী আদায় করিয়া দিবেন বলিয়া যাবারা শপথ করিতেছিলেন. ৯ই মার্চ্চের ছয় মাস পর এখন তাঁহারা বলিতে সুরু করিয়াছেন 'ধর্ম্মঘট বন্ধ করিয়া ফেডারেশন যে মনোভাব দেখাইয়াছিল, সরকার তাহাতে মুখ ফিরায় নাই।' তাঁহারা আরও বলিতেছেন "শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ আবার তীব্র হইয়া উঠিতেছে এবং তাঁহারা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে।' জয়প্রকাশ গুরুস্বামী এণ্ড কোংএর জিহ্বায় 'নমুনা ধর্ম্মঘটে'র কথা পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে।

কিন্তু রেলশ্রমিক ভুলিবে কেমন করিয়া? সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিকের ভোটের রায়কে অস্বীকার করিয়া জয়প্রকাশ, গুরুস্বামী ও দালাল ফেডারেশনের অন্যান্য নেতারা যখন ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘটের সময় শ্রমিকদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন, সে কথা কি ভোলা যায়? কংগ্রেসী সরকারের লরীতে চাপিয়া ৩ হাজার শ্রমিককে যাহারা ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা কি হঠাৎ সাধু হইয়া গেলেন?

সামরিক পিছু হটাইতে নিজেদের আবার মুক্ত করিয়া রেলশ্রমিক আবার জোট বাঁধিতে সুরু করিয়াছেন, তাঁহাদের বিক্ষোভ আবার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এবারকার এই বিক্ষোভ পে-কমিশনের রায়ের কিছু অদল-বদলের দাবী লইয়া নহে [অবশ্য জয়প্রকাশের কর্ত্তারা সেটুকুও মানেন নাই]। ৯ই মার্চ্চ নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শ্রমিকদের মূল বেতন বৃদ্ধি, মাগ্‌গীভাতা, গ্রেনসপের সুবিধা, ৭ ঘণ্টা খাটুনী, সকলের স্থায়ী কাজ সবকিছুই অস্বীকৃত হইয়াছে। আধ-পেট খাওয়া শ্রমিকদের ঘরে ঘরে এইভাবে উপবাসের দিন আসিয়াছে। অর্দ্ধাহারী স্ত্রী-পুত্র, পরণে কাপড় নাই, রোগে ঔষধ নাই ও থাকার যায়গা নাই এইসবই শ্রমিকদের কপালে জুটিয়াছে।

কংগ্রেসী সরকারের মিলিটারী বিভীষিকা ও সোস্যালিস্ট নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা শ্রমিকদের কাছে এই নগ্ন সত্য চাপা দিবে কেমন করিয়া? তাই শ্রমিকদের মধ্যে আবার জাগরণ, ধর্ম্মঘট সংগ্রাম ছাড়া আর কোন উপায় নাই এই মোহমুক্ত চেতনায় সমৃদ্ধ দৃঢ়তা।

রেলশ্রমিক আরও দেখিয়াছেন, জয়প্রকাশ এণ্ড কোংর বিশ্বাসঘাতকতা ৯ই মার্চ্চের পর আরও অনেক নূতন আক্রমণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। ৯ই মার্চ্চের পর প্রকাশিত রেলওয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে গ্যাংম্যানদের জন্য আরও অধিক রেল-মাইল এবং লোকো ও অন্যান্য ষ্টাফের জন্যও খাটুনী বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই রিপোর্টেই শ্রমিকদের কাজে আরও অধিক 'তদারকী' 'কাজে ঢিলা' দেখিলে শাস্তি, খাঁটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারীদের চাকুরী খতম, গ্রেনসপ একেবারে বন্ধ করা প্রভৃতি সুপারীশ করা হইয়াছে। তদন্ত কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, রেলে নাকি ৫০ হাজার অতিরিক্ত শ্রমিক আছে এবং শ্রমিকদের নামে জঘন্য কুৎসা রটনা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা অলস ও কাজে ফাঁকি দিয়া সময় উড়াইয়া দেয়। আশ্চর্য্য হইয়া লাভ নাই যে, জয়প্রকাশের ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী গুরুস্বামীর স্বাক্ষরও এই চূড়ান্ত শ্রমিক বিরোধী রিপোর্টখানির মধ্যে শোভা পাইতেছে।

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে রেলওয়ে বোর্ড শ্রমিক বিরোধী অভিযানও সুরু করিয়াছেন। শতশত শ্রমিকের বিরুদ্ধে চার্জ্জশীট, ওয়ার্কশপে অতিরিক্ত লোকের লিষ্ট তৈয়ার; গ্রেনশপের সুবিধা সঙ্কুচিত করিয়া আত্মীয়দের দিব না বলিয়া শ্রমিকদের বঞ্চনা প্রভৃতি নানা উপায়ে এই ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। কংগ্রেসী সরকার নূতন সার্ভিস রুল চালু করিয়াছেন যে, "নাশকতামূলক" কাজের জন্য ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা যেকোন শ্রমিককে যখন তখন তাড়াইয়া দিতে পারেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করার 'অপরাধে' ইতিমধ্যেই এইভাবে কয়েকজন শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

এই অবস্থার মধ্যে জয়প্রকাশ-গুরুস্বামীর নূতন পোষাকে চির-পুরাতন খেলায় কোন রেল শ্রমিক ভুলিবেন না। তাঁহারা জানেন 'নেতা'দের এই মৌখিক সরকার বিরোধিতার আসল অর্থ কি!

৯ই মার্চ্চের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রেল শ্রমিক সারাভারত ব্যাপিয়া সপ, সেড, ইয়ার্ড ও অফিসে. প্রত্যেকটি ডিপার্টে ডিপার্টে সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলিবেন এবং সোশ্যালিষ্ট নেতাদের মুখোস খুলিয়া আসল চেহারা প্রকাশ করিয়া দিবেন। এই সংগ্রামী শ্রমিকরাই ধনিক কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে নির্ম্মম সংগ্রাম পরিচালনা করিবেন ও সাধারণ ধর্ম্মঘটের জন্য সারা ভারতের জঙ্গী সংগঠন তৈয়ার করিবেন। এই নূতন প্রতিষ্ঠান যে সকল দাবী সম্মুখে লইয়া লড়াই চালাইবে তাহা হইল—বাঁচার মত মজুরী, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং বিনা বিচারে কারারুদ্ধ রেলশ্রমিক ও নেতাদের বিনাশর্ত্তে মুক্তি।

কংগ্রেস-লীগ যুদ্ধ জোটের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের জনগণ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

চলিয়াছে এক দানবীয় দমননীতি। চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে অগণিত নূতন নূতন সশস্ত্র পুলিস ক্যাম্প বসিয়াছে। গ্রেপ্তার, অমানুষিক মারপিট ও ১৪৪ ধারা প্রভৃতির দ্বারা সারা চট্টগ্রামে এক বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই দমননীতিতে লীগ সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য নেহরু সরকার সম্প্রতি কলিকাতা হইতে একদল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা অফিসার চট্টগ্রামে পাঠাইয়াছে।

চট্টগ্রাম-বর্ম্মা সীমান্তে লীগ সরকার বহু ফৌজ মোতায়েন করিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, নেহরু সরকার নাকি সেই সীমান্ত পাহারার জন্য দরকার হইলে লীগ সরকারের সাহায্যে গোর্খা ফৌজ পাঠাইবে।

শ্রমিক-কৃষকের লড়াই

কিন্তু এই দমননীতির লৌহজাল ভেদ করিয়াই চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ আজ নূতন শক্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

গত মে-জুন মাসে আধঘণ্টা বেশী কাজ করাইবার হুকুমের বিরুদ্ধে রেলমজুরগণ ৫ দিন আধঘণ্টা ধরিয়া অবস্থান ধর্ম্মঘট করেন এবং ১লা জুন তারিখে বিকাল ৪-৩০ মিনিটের স্থলে ৪টায় সাইরেণ বাজাইয়া সব মজুর কারখানা হইতে বাহির হইয়া আসেন। পরে কর্ত্তৃপক্ষ আধঘণ্টা বেশী কাজ করার হুকুম উঠাইয়া নেয়।

সেই সময়ই ৫০০ রেলমজুর 'রিভার্ট মজুরদের আগের পোষ্টে বহাল কর' 'গ্রেনসপ চালু কর' প্রভৃতি দাবীও জানায়। পে-কমিশন ঘোষণার পর রেলমজুরদের এককালীন ২১ টাকা ভাতা দেওয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহা কাটিয়া নেওয়ার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদের দ্বারা একটা বণ্ড সহি করাইতে চায়। ১৭ই জুন ৫ শতের অধিক রেলমজুর এক সভায় জমায়েত হইয়া ঘোষণা করেন, "যদি বণ্ড সহির জন্য জোর করা হয়, তবে রেল-উপড়াইয়া দিব।" ইহার পর কর্ত্তৃপক্ষ আর বণ্ডের কথা বলে নাই। দালাল এমপ্লয়েজ লীগ ও ফজলুল কাদের চৌধুরী নানা ধোঁকা দিয়া রেলমজুরদেরকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু রেলমজুরদের বিক্ষোভ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জুন মাসেই চট্টগ্রাম শহরে ডক, বি, ও-সি এবং মাটরের দেড় হাজার মজুর লালদিঘীর পাড়ে সভা করিয়া দাবী জানাইয়াছে: "বাঁচিবার মত মজুরি চাই।" গ্রামে গ্রামেও লড়াইএর বান ডাকিয়াছে। রাঙ্গুনীয়ার চাষীরা ধনী-কৃষক ও জোতদারদের খড়ের গাদায় আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন। ৪।৫ দিন প্রতি রাতে ৪।৫টি খড়ের গাদায় আগুন জ্বলিয়াছে। রাওজান থানার বাগোয়ানে কৃষকেরা নিজেদের লাঠির জোরে জমি পুনর্দ্দখল করিয়াছেন। দুলহরা ইউনিয়নে ক্ষেত-মজুর ও গরীব কৃষকগণ—৩২ খানা লাঙ্গল লইয়া জোতদারদের গুণ্ডাদের পিটাইয়া জমি পুনর্দ্দখল করিয়াছেন।

শ্রমিক কৃষকের এই জাগ্রত শক্তিই চট্টগ্রামে বিদেশী-দেশী ধনিকদের ও কংগ্রেস-লীগ সরকারের ষড়যন্ত্র চুরমার করিয়া দিবে।

টেক্সম্যাকো কারখানায় গুলিবর্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কথা মত সুবোধ সরকার ম্যানেজারের সহিত গেটের সম্মুখে আলাপ সুরু করেন। কিছু মজুর কথাবর্ত্তার ফলাফলের জন্য অদূরে দাঁড়াইয়াছিল।

এই সময় কয়েকটি পটকা ফাটে। সুবোধ সরকার বা রাজঘড়িয়া একত্রেই দাঁড়াইয়াছিলেন। পটকায় উভয়ের কেহই আহত হন না। কিন্তু ইহাকেই ছুতা করিয়া অকস্মাৎ গুলিবর্ষণ সুরু হয়। গেট গলিয়া সশস্ত্র দারোয়ান ও গুণ্ডাদল বন্দুক চালাইতে চালাইতে ও লাঠি মারিতে মারিতে অগ্রসর হয়।

দুই সেকেণ্ডের মধ্যে সুবোধ সরকারের প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়ে।

পটকাগুলি যে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আদৌ ছোঁড়া হয় নাই, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষ দর্শীদের অভিমত, কারখানার মধ্যে যে একদল অপরিচিত গুণ্ডা মোতায়েন রাখা হইয়াছিল তাহারাই আক্রমণের ছুতা হিসাবে পটকা ছোঁড়ে।

কলিকাতায় মহিলাদের উপর গুলিবর্ষণের সময়ও ঠিক একই পন্থায় "বোমা" ছোঁড়া অজুহাত দেওয়া হইয়াছিল।

আকস্মিক এই আক্রমণে রাস্তার সাধারণ লোক এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্রমিকেরা আগাইয়া গেলে তাহাদের উপর নির্ম্মমভাবে লাঠি চালানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকতা উস্কাইবারও চেষ্টা হয়।

এই পৈশাচিক গুলি বর্ষণের জবাব দাবি করিয়া বেলঘরিয়ার শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে।

ছাঁটাই হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া বিনানী কারখানায় ২৬ জন শ্রমিককে কাজ প্রদান

কারখানায় কারখানায় সংগ্রামের বিস্তার ঃ সোশ্যালিষ্ট দালালদের মুখোস ফাঁস

২৬ জন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া হাওড়া বিনানী মেটাল ওয়ার্কসের শ্রমিকেরা গত ১২ই আগস্ট হইতে জোর করিয়া ছাঁটাই ভাইদের কাজ দিতেছেন।

ট্রামের নোনাপুকুর কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সহিত পার্ক সার্কাস এবং গড়িয়াহাট ডিপোর ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকেরাও ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছেন।

পটারী, ওরিয়েণ্টফ্যান, মেটিয়াবুরুজ, ইলেকট্রিক, এলেনবেরী এবং দমদম কাগজ কারখানায় সংগ্রাম চালু আছে।

বোনাস, ছাঁটাই বন্ধ ১৫০ টাকা আয় ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবিতে গত দুই সপ্তাহ হইতে যে সংগ্রাম সুরু হইয়াছে তাহা ক্রমশঃই ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে।

পটারী ও বাউড়িয়ার চটকল শ্রমিকদের গৌরবময় পথে লড়াই সুরু করিয়াছেন হাওড়ার বিনানী মেটাল ওয়ার্কসের ৬ শত শ্রমিক।

কয়েকদিন আগে হইতেই শ্রমিকেরা কানাঘুষা শুনিতেছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ছাঁটাইয়ের নোটিস বাহির হইবামাত্র শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাহারা মালিককে সোজা জানাইয়া দেন যে, ছাঁটাই হইলে তাহারা ছাঁটাই শ্রমিকদের নিয়াই কাজে ঢুকিবেন। মালিক ভয় পাইয়া পুলিসে খবর দেয়।

পরদিন ১২ই আগস্ট শুক্রবার মজুরেরা ২৬ জন ছাঁটাই শ্রমিককে সঙ্গে লইয়া মিছিল করিয়া কাজে ঢোকেন। কারখানার কয়েকজন দারোয়ান বাধা দিতে চেষ্টা করিলে, শ্রমিকেরা তাহাদের উপযুক্ত 'ব্যবস্থা' দেন। দারোয়ানদের এই হাল দেখিয়া পুলিস আর কিছু করিতে সাহস পায় না। ছাঁটাই শ্রমিকরা যিনি যে কাজ করিতেন, সেই কাজ করিতে থাকেন।

কোম্পানী নাকি ঠিক করিয়াছে যে, ইহার পর তাহারা কারখানা লক্-আউট ঘোষণা করিবে। শ্রমিকেরাও লক-আউট বিরোধী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

নোনাপুকুর ইঞ্জিনীয়ারিং

নোনাপুকুরের ৩জন শ্রমিক নেতার উপর বিলাতী ট্রাম কোম্পানীর চার্জ্জশীট ও ১৫০০ শ্রমিকের উপর, কংগ্রেসী সরকারের ২,০০০ সশস্ত্র পুলিসের আক্রমণের প্রতিবাদে নোনাপুকুর ইঞ্জিনীয়ারিংএ সংগ্রাম গত সাতদিন যাবৎ অব্যাহত রহিয়াছে। ইতিমধ্যে মালিক কারখানার গেট খুলিয়া দিয়া ও রিজার্ভ গাড়ী চালু করিয়া শ্রমিকদের কাজে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা সুরু করিয়াছে। কিন্তু দাবী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত নোনাপুকুরের ১৫০০ ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক কাজে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। নোনাপুকুরের সংগ্রামী শ্রমিকদের সমর্থনে ডিপো ইঞ্জিনীয়ারিংএর শ্রমিকেরা আগাইয়া আসিয়াছেন। গড়িয়াহাট ও পার্কসার্কাস ডিপোর প্রায় ২০০ ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক নোনাপুকুরের সংগ্রামী ভাইদের সমর্থনে গত ১১ই আগস্ট হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ওয়ার্কস ইউনিয়নের নেতৃত্বে ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য ট্রাম শ্রমিক প্রায় প্রতিদিন সভা করিতেছেন। লালঝাণ্ডা হাতে মিছিল করিয়া তাহারা জনসাধারণের কাছে তাহাদের সংগ্রামের কথা পৌঁছাইয়া দিতেছেন। নোনাপুকুরের হরতাল প্রত্যেকটি সেক্সনে ছড়াইয়া দিয়া মালিক ও সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের আহ্বান তাহারা সভা ও মিছিলে জানাইতেছেন। সে সভা ও মিছিলে পঞ্চায়েতের বহু সাধারণ শ্রমিকও যোগ দিতেছেন।

এদিকে সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েত নেতারা মুখে ধর্ম্মঘট সমর্থন করিলেও দাবিকে ছোট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ছাঁটাই ভাইদের চাকুরী এবং চার্জ্জশীট ও পুলিস কেস প্রত্যাহার দাবি চাপিয়া গিয়া তাহারা শুধু লক আউট তোলার আবেদন জানাইতেছেন। মজুরদের দাবি মানিতে না হইলে মালিক যে লক আউট তুলিতে খুশীই হইবেন তাহা ট্রাম কোম্পানীর বিবৃতি পড়িলেই বোঝা যায়। ট্রামের ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক নিম্নলিখিত দাবী নিয়া লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে লড়াই চালাইয়া যাইবেন।

—সমস্ত ছাঁটাই ভাইদের চাকুরী চাই

—সমস্ত চার্জশীট ও পুলিস কেস উঠাইয়া লইতে হইবে।

—লক-আউট উঠাইয়া নিতে হইবে

—লক-আউটের সময়ের পুরা বেতন চাই।

—কম্‌সেকম্‌ ১৫০ টাকা আয় চাই।

কলাম্বিয়া রেকর্ড বয়কট

কর্ম্মচারী ছাঁটাইএর প্রতিবাদে শিল্পীদের সিদ্ধান্ত

গত ১০ই আগস্ট কলাম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানী ৬জন কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া সমস্ত দেওয়ায় আর্টিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রেকর্ড শিল্পী ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। কলাম্বিয়া রেকর্ডে যে সমস্ত শিল্পীরা গান অথবা বাজনা দিয়া থাকেন তাহারা এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের পুনর্বহাল না করা পর্য্যন্ত রেকর্ড কোম্পানীকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

ডাঃ বিধান রায়ের পুলিস নারীহত্যা করিয়াছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকিবার জন্য যে কুৎসা, মিথ্যা প্রচারণার জাল বুনিয়াছিলেন, তাহার অনেকটাই টিঁকে নাই।

হত্যাকাণ্ডের পর ডাঃ রায়ের বিবৃতি, প্রেসনোটে, বিভিন্ন রক্ষিতা সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে এই একই প্রচার চালাইয়াছিল যে, মহিলারা 'উশৃঙ্খল' হইয়া পুলিসের উপর বোমা ছুড়িয়াছিল, পুলিসের রিভলবার কাড়িয়া নিবার চেষ্টা করিয়াছিল ইত্যাদি। এই মামলায়ও সরকারপক্ষ ঐ ধরণের সাক্ষী সাবুদ খাড়া করিয়াছিল। পুলিসের এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার, ইন্‌স্পেকটার, সাবইন্‌স্পেকটার এবং আর্ম্মড কনেস্টবল সকলে এই সাক্ষ্য দিয়াছিল যে মহিলারা বোমা ছুড়িয়া, ইট মারিয়া রিভলভার কাড়িয়া নিবার চেষ্টা করিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে পুলিস 'আত্মরক্ষার' জন্য গুলি ছোঁড়ে।

এই নির্লজ্জ মিথ্যাকে হজম করা এই আদালতের পক্ষে অসম্ভব হয় এবং তাহারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় দেন যে **পুলিসের গুলি ছুঁড়িয়া দুইজন মহিলাকে হত্যা করার মত কোন ঘটনাই সেদিন ঘটে নাই।**

হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতকরা নিজেরাই গোয়েবেলসের কায়দায় প্রচার সুরু করে "শোভাযাত্রীরা যে বোমা ছোড়ে তাহাদের বোমার আঘাতেই মৃতদের মৃত্যু ঘটিয়াছে" —এই আদালতেও রায়মন্ত্রিসভা সেই সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আদালত গোয়েবেলসের শিষ্যদের মুখে চুনকালি লেপিয়া রায় দিয়াছে **অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের** বোমার টুকরায় ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

গুলি ছুড়িয়া লতিকা সেন এবং গীতা সরকারকে হত্যা করার জন্য আদালত দুইজন সশস্ত্র কনেষ্টবলকে কার্য্যতঃ দায়ী করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের আর একটি ঘটনা মনে পড়ে। সেটি হইতেছে ১৯৪৫ সনের ২১শে নভেম্বরের শহীদ রামেশ্বরের হত্যাকাণ্ড। সেদিনও রামেশ্বরের হত্যাকারী লীগ মন্ত্রিসভা এবং কুখ্যাত ডেপুটি কমিশনার মিঃ দোহা নিজেদের কুকীর্ত্তিকে ঢাকা দিবার জন্য করোনারের আদালতে হ্যামণ্ডের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিজেদের চামরা বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের মুখ রক্ষা করার জন্য সুরাবর্দ্দী মন্ত্রিসভা সার্জ্জেণ্ট হ্যামণ্ডকে এই ঘটনার পর প্রমোশন দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিল। নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা আর্ম্মড কনেষ্টবল কৃষ্ণ বাহাদুর এবং রাজ বাহাদুরকে এইভাবে পুরস্কৃত করিবেন না এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

রামেশ্বরের প্রকৃত হত্যাকারী সারোয়ার্দ্দী মন্ত্রিসভা এবং কমিশনার, ডেপুটি কমিশনারের দলকে সেদিন জনসাধারণ চিনিতে ভুল করে নাই, আজিকার লতিকা-গীতা-প্রতিভা-অমিয়া এবং অন্যান্য ৪ জনের হত্যাকারীদেরও জনসাধারণ চিনিতে ভুল করিবে না।

সংগ্রামী মজুরদের ঐক্য গঠন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জারী রহিবে প্রভৃতি ধ্বনিতে বিরাট মিছিল এবং চতুষ্পার্শের শ্রমিক এলাকা প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

মিছিল অগ্রসর হওয়ার সময় রাস্তার দুপাশে ট্রাম ড্রাইভার ও কনডাকটরদের প্রতি ধর্ম্মঘটের আবেদন জানায়।

পটারী এলাকার মিছিল যাইতে দুপাশের বস্তী হইতে বহু শ্রমিক স্লোগানে সাড়া দিতে থাকেন ও মিছিলে আসিয়া যোগ দেন।

এই সপ্তাহে ওয়ার্কস ইউনিয়নের নেতৃত্বে নোনাপুকুরের ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে ময়দানে মোট ৩টি সমাবেশ মিছিল হয়। প্রত্যেকটি সমাবেশে প্রায় এক হাজার ধর্ম্মঘটী শ্রমিক উপস্থিত হইয়া জনসাধারণের কাছে তাহাদের সংগ্রামের কথা পৌঁছাইয়া দেন।

গত ১২ই আগস্ট নোনাপুকুরের প্রায় পাঁচশত ধর্ম্মঘটী শ্রমিক মিছিলে বাহির হন। লালঝাণ্ডা হাতে ট্রাম লাইন ধরিয়া এই জঙ্গী মিছিল অগ্রসর হয় মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে ট্রাফিক শ্রমিকদের আগাইয়া আসিয়া চাকা বন্ধ করিতে আহ্বান জানাইয়া মিছিল রাজাবাজার ডিপো পর্য্যন্ত যায়।

গত শনিবার মেটিয়াবুরুজ এলাকায় বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের এক সভা হয়। এ, ই, আই, আই, জি, বি, আই হাড্ডিকলের মধ্যে শ্রমিকেরা সভায় সমবেত হন। এই তিনটি কারখানাতেই বোনাস, মাগ্‌গীভাতা প্রভৃতির দাবীতে গত সপ্তাহে বিক্ষোভের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে।

সভায় জনৈক শ্রমিক ঘোষণা করেন, —বিভিন্ন দাবীতে বিক্ষোভ সুরু হইলেও আজ দেখা যাইতেছে সকলেই ১৫০ টাকা দাবী তুলিতেছেন এবং সকলেই একই ধর্ম্মঘটের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও ১২৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত

টাটা-বিড়লার স্বর্গে

দুই বছরের কংগ্রেসী শাসনের চেহারা

* দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করিয়াছে কে?—নেহরু-নলিনী কংগ্রেসী সরকার

* দুর্ভিক্ষ, বেকারী ও অনশন আনিয়াছে কে?—বিড়লার বন্ধু কংগ্রেসী সরকার

* দেশভক্ত শ্রমিক-কৃষক-মেয়ে-ছাত্রদের হত্যা করিয়াছে কে?
—এণ্ডারসন-টেগার্টের শিষ্য কংগ্রেসী সরকার

* দেশকে ডলার সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছে কে?
—চার্চ্চিল-এটলির সাকরেদ নেহরু সরকার

"মাদ্রাজের গ্রামে একজন কৃষক রমণী অভাবের তাড়নায় তাহার তিনজন সন্তানকে কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করার পর নিজেও কুপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে।"
পি-টি-আই-রয়টার

* * *

"রাণাঘাটে কে বা কাহারা একটি শিশুকে রেল-লাইনের উপর ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। * * নিরন্ন বাস্তুহারাগণ পেটের জ্বালাতেই তাহাদের প্রিয়তম সন্তানদের পর্য্যন্ত আজ রাস্তায় ছাড়িয়া দিতেছে। এখানে পিতা-পুত্র-কন্যা কোন সম্বন্ধ নাই।"—পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ৬ই আগস্ট।

* * *

শুধু মাদ্রাজ বা পশ্চিম বাংলার এক-খানা গ্রাম বা শহর নয় ইহাই গত দুই বছরের কংগ্রেসী ধনিক শাসনের চেহারা! কংগ্রেসী 'রাম রাজত্বে' সারা ভারতেই এই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু কংগ্রেসী শাসক শ্রেণীর ঔদ্ধত্যের সীমা নাই। ১৫ই আগস্টের মাত্র ১০ দিন আগে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু রাজধানীতে বসিয়া সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন: কমিউনিস্টরাই ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস [সাবোতাজ] করিতে চাহিতেছে।

ইহা কোন নূতন ধরনের ঔদ্ধত্য নয়, পণ্ডিতজী! একদিন হিটলারও জনগণের উপর মুষ্টিমেয় ধনিকের শাসন শোষণ চাপাইবার সময় এই ধরনের "কমিউনিস্ট বিরোধী" অভিযান চালাইয়াছিল। পণ্ডিত-জীর প্রিয়তম বন্ধু চীয়াং-কাই-শেকও চীনের প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের জন্যে কমিউনিস্টদের দায়ী করিতেছিল, তাহাদের "ধ্বংসকারী" বলিয়া গালাগালি করিতেছিল। কিন্তু ইতিহাস তাহাদের প্রতি নির্ম্মম উপহাস করিয়াছে; জনগণ তাহাদের সেই ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিয়াছে।

কংগ্রেসের গত দুই বছরের শাসনের ইতিহাস, ধনিকশ্রেণীর নির্লজ্জ অবাধ ডিক্টেটরী শাসনের ইতিহাস—এ কথা প্রধানমন্ত্রী ঢাকিয়া রাখিতে পারিয়াছেন কি? তাহা পারেন নাই। ৫ই আগস্টের বক্তৃতার মধ্যেই তাহা কি ভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে দেখুন।

"হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস"

কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা কমিটিতে ভারতের বণিক শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে মিঃ এম-পি-বিড়লা বলেন:

"শিল্পের ক্ষেত্রে র‍্যাশন্যালাইজেশন চালু করিয়া উৎপাদন খরচ কমাইবার পথে অন্যতম বাধা এই যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার এবং শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন মানিয়া লইতে চাহেন না।"

পনরদিন যাইতে না যাইতেই পণ্ডিত নেহরু বিড়লাজীর আব্দার মানিয়া লইয়া ঘোষণা করিলেন:

"সাধারণতঃ শ্রমিকরা র‍্যাশন্যালাইজেশনের বিরোধী, কারণ তাহাতে বেকারের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু কোন উপায় নাই।" [৫ই আগস্টের বক্তৃতা]।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে বিড়লাজীরা এখন ছাঁটাই-এর লিখিত হুকুম পাইলেন। বিড়লাজীর "ইস্টার্ন ইকনমিস্ট" হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন একমাত্র কাপড়ের কলেই দুই লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করার প্রয়োজন হইবে। ইহাই পণ্ডিত নেহরুর 'রাজরাজত্বে'র উপহার। যে কেহ এই উপহার নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে প্রধান মন্ত্রীর নিকট সেই হইবে "ধ্বংসকারী"।

শ্রমিক-কেরাণীরা কেন বিনা প্রতিবাদে এই বেকার জীবন মানিয়া লইতে রাজী হইবে? কারণ, টাটা-বিড়লাজীদের "অর্থনৈতিক সংকট" হইতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারেও কোন নূতনত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদী প্রভুদের অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের মতই সংকটের হাত হইতে রক্ষা না পাইয়া আরও গভীর সংকটের মধ্যে যাইয়া পড়িতেছেন।

ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক সংকটে টাটা-বিড়লাদের মুনাফা ঠিক রাখার জন্যে, সমস্ত সংকটের বোঝা শ্রমিক কৃষক জনগণের উপর চাপাইবার জন্যে নেহরুজী আজ পর্য্যন্ত কি কি আওয়াজ তুলিয়াছেন?

ধনিক শাসকের 'সংকট'

প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের "শিল্পে শান্তি" রক্ষা করার উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন: শিল্পে শান্তি রক্ষা করিলেই উৎপাদন বাড়িবে। উৎপাদন বাড়িলেই অর্থনৈতিক সংকট হাল হইবে। সোস্যালিস্ট ও জাতীয় টি-ইউ-সির দালালরা প্রাণপণে "শিল্পে শান্তি" রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু উৎপাদনের অবস্থা কি?

১৯৪৭ সালের তুলনায় তুলাজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৩২·২ পয়েন্ট হইতে কমিয়া ১৯৪৮ সালে ১০৪·৮ পয়েন্টে নামিয়াছে। চটকলের উৎপাদন ১০০ পয়েন্ট হইতে নামিয়া ৯৩·৭ পয়েন্ট হইয়াছে; ইস্পাতের উৎপাদন ১৩১·২ হইতে নামিয়া ১১৮ হইয়াছে; কাঁচা লোহার উৎপাদন ৮৩·৯ হইতে নামিয়া ৮১ হইয়াছে। সিমেন্টের উৎপাদন ১২৮ হইতে নামিয়া ১২০ হইয়াছে; চিনির উৎপাদন ১২৫·২ হইতে নামিয়া ১১৯·৩ হইয়াছে; বিদ্যুতের উৎপাদন ১৬৭·৫ হইতে নামিয়া ১৫৩·৩ হইয়াছে গড়ে শিল্প উৎপাদন ১২০ পয়েন্ট হইতে নামিয়া ১০৫ পয়েন্ট হইয়াছে।

১৯৪৯ সালে শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী গর্ব্ব করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন: গতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদন বাড়ানো হইবে; এখন তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন: 'এ পর্য্যন্ত নামমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।' কয়লার উৎপাদন বাড়ে নাই; ইস্পাতের উৎপাদন মাত্র শতকরা ৪ ভাগ বাড়িয়াছে [এখনো ১৯৪৭ সালের তুলনায় কম]; কাপড়ের উৎপাদন ভীষণভাবে কমিয়া গিয়াছে; চটের উৎপাদন গত দুই বছরে গড়ে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা কম।

মুদ্রাস্ফীতি—ধনিক শোষণের অস্ত্র

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, শিল্পে শান্তি রক্ষা করা হইলে জিনিস-পত্রের দর কমিয়া যাইবে। সমাজতন্ত্রী ও 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালরা "মুদ্রা-স্ফীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের" নাম করিয়া মালিক ও শ্রমিক উভয়কে সমান ক্ষতি স্বীকার করতে পরামর্শ দিয়াছে, মজুরি ও মুনাফা বাড়ানো কমানো স্থগিত রাখিতে ['ফ্রিজ' করিতে] পরামর্শ দিয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে জিনিসপত্রের দর কমিয়াছে কি?

তাহা কমে নাই। মুদ্রাস্ফীতি শ্রমিকদের শোষণ করার জন্যে নেহরুজীর হাতে নূতন ধরনের অস্ত্র। উহা এখনো সমানভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে: দ্রব্য মূল্যের মান ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতেছে।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে উহা ছিল ৩২৯·২ পয়েন্ট, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে উহা ৩৭৬ পয়েন্ট হইয়াছে; জুলাইতে উহা আরো বাড়িয়া ৩৭৯ পয়েন্টে উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে খাদ্যের দর বাড়িয়া হইয়াছে ৩৯১·৩ পয়েন্ট [১৯৩৯এ ১০০ পয়েন্ট ধরা হইয়াছে]।

রপ্তানী কমিতেছে

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রচার করিয়াছিলেন: রপ্তানী বাড়াইয়া দেশের অর্থনৈতিক সংকট হাল করা হইবে। তাহার জন্যে তাহার জিনিসপত্রের উপর নামমাত্র কন্‌ট্রোল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের রপ্তানী কিছুমাত্র বাড়িয়াছে কি? তাহা বাড়ে নাই। ভারতের আমদানী বাড়িতেছে, রপ্তানী কমিতেছে।

১৯৪৮-৪৯ সালে রপ্তানীর তুলনায় ১৭০ কোটি হইতে ২৩০ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এমন কি পাকিস্তানে পর্য্যন্ত ভারতের কাপড় ও চিনির বিক্রয় কমিয়া যাইতেছে।

প্ল্যানিং-এর ধাপ্পাবাজী

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ভারতে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তোলা হইবে। কলিকাতা ময়দানের বক্তৃতায় পর্য্যন্ত তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, প্ল্যানিং কমিটি বড় বড় শিল্পের প্ল্যান তৈরী করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সকল প্ল্যান তৈরীর জন্যে বাজেটে কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু আসল ঘটনা কি?

আসলে ইহা একটা বড় রকমের ধাপ্পাবাজিতে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে নেহরুজী যে প্ল্যানিং উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইস্পাত ও সিমেন্টের প্ল্যানগুলির উপর মন্তব্য করিয়াছেন:

"এই সকল প্ল্যান তৈরীর জন্যে জনসাধারণের টাকা নষ্ট করার আগে কেন্দ্রীয় সেচ বিভাগের হিসাব করিয়া দেখা উচিৎ ছিল, ইস্পাত ও সিমেন্টের চাহিদা কতখানি। ভারত সরকারের হাতে এখন ১৭০টি প্ল্যান আছে; তাহার মধ্যে ৪টি কার্য্যকরী করা হইতেছে। এখন প্রশ্ন এই নয় যে কোন প্ল্যান প্রথম কার্য্যকরী করা হইবে; প্রশ্ন হইল, যে সকল প্ল্যান কার্য্যকরী করা হইতেছে তাহাতে ঢিলা দেওয়া।"

যে চারটি প্ল্যান কার্য্যকরী করা সুরু হইয়াছে পশ্চিম বাংলার দামোদর প্ল্যান তাহার মধ্যে অন্যতম। নেহরু সরকার এখনাও ঢিলা দেওয়ার নীতি গ্রহণ

মঞ্জিল
১৫ই আগষ্ট—বিশেষ সংখ্যা
—দাম এক আনা—

করিয়াছেন। শ্রমমন্ত্রী জগজীবন আইন সভায় বলিয়াছেন যে, সিমেন্টের অভাবেই শ্রমিকদের জন্যে গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইতেছে না; আর প্ল্যানিং দপ্তর সিমেন্টের প্ল্যান স্থগিত রাখিতেছে। নেহরুজীর রামরাজত্বে নূতন শিল্পের আজ আর স্থান কোথায়? যেখানে পুরানো কলকারখানাই বন্ধ হইয়া যাইতেছে সেখানে নূতন কলকারখানা বসানোর সুযোগ কোথায়?

কারখানা বন্ধ হইতেছে—বেকারী বাড়িতেছে

পশ্চিম বাংলার চটকলে শতকরা সাড়ে বারখানা তাঁত বন্ধ রাখা হইতেছে; মাসে একসপ্তাহ তাঁত বন্ধ রাখা হইতেছে। আমেদাবাদে ৩০টি সুতাকল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। [দেশের লোক আগে গড়ে বছরে ১৫ গজ কাপড় পড়িত, এখন ১০ গজের বেশী কাপড় কিনিবার ক্ষমতা নাই] অসংখ্য ছোটখাট কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হিসাব করিয়া দেখাইয়াছে, ইতিমধ্যে ২০ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে, [একমাত্র অর্ডনান্স কারখানায় ছাঁটাই হইয়াছে ২৫।৩০ হাজার শ্রমিক] এমন কি বিড়লাজীর ইস্টার্ন ইকনমিস্টের হিসাব মতও দেখা যায়, এই বছর শেষ না হইতে পশ্চিম বাংলার আরও ৫০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে ভারতের অর্থনীতি ধ্বংস হইতেছে না। যাহারা ইহার প্রতিবাদ করিতেছে প্রধানমন্ত্রী তাহাদেরই চোখরাঙ্গাইয়া বলিতেছেন "ধ্বংসকারী।"

কাজ বাড়িতেছে, মজুরি কমিতেছে

এবার প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ তুলিয়াছেন: উৎপাদনের খরচ কমাইতে হইবে। উৎপাদনের খরচ কমাইবার জন্য তিনি মালিকদের মুনাফা কমাইবার পরামর্শ দিয়াছেন কি? এ প্রশ্নও হাস্যকর। কারণ মালিকদের মুনাফা বাড়ানোর জন্যেই প্রধানমন্ত্রী এখন বিড়লা টাটার আওয়াজকে নিজের আওয়াজে পরিণত করিয়াছেন। সংকট যাহাতে মালিকদের মুনাফাকে আঘাত না করিতে পারে তাহার জন্যে অর্থমন্ত্রী মাথাই বার বার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, তাহাদের ট্যাক্সের বোঝা কমানো হইবে, প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন—মজুরের খাটুনী বাড়ানোর অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে।

মালিকের ঘরে মুনাফার পাহাড়

মজুরের রক্ত কি ভাবে মালিকের মুনাফার পাহাড় সৃষ্টি করিতেছে তাহা একবার দেখুন।

১৯৪৮ সালে একমাত্র বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকরা মুনাফা করিয়াছে ২০ কোটি টাকা [মিলমালিক সমিতির রিপোর্ট]। কানপুর স্বদেশী মিলে ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে ৩১ লক্ষ টাকা বেশী মুনাফা হইয়াছে।

—১৯৪৮ এর জুনে যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে সেই ছয়মাসে বেঙ্গল জুটমিল মুনাফা করিয়াছে—১১৯৬৫৮ টাকা।

—১৯৪৮ সালের টাটা লোহা কারখানার মালিকরা মুনাফা করিয়াছে ৫ কোটি টাকা। এই বছর আরো বেশী হইবে।

—১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে সেই ছয় মাসে সামলা কয়লা খনির মালিকরা মুনাফা করিয়াছে—১৮৭২৫২ টাকা।

—১৯৪৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া চিনিকলের মালিকরা মুনাফা করিয়াছে 'আগেকার যে কোন বছর অপেক্ষা বেশী'। কানপুর সুগার মিলে ১৯৪৭ সালে মুনাফা হইয়াছিল ৪৪৮৬০৯ টাকা, ১৯৪৮ সালে উহা বাড়িয়া হইয়াছে ৯৬২৪৭৩ টাকা।

—১৯৪৮ সালের প্রথম ছয়মাসে বেঙ্গল পেপার মিলের মুনাফা হইয়াছে—২৭৭০১০ টাকা [আগেকার ছয়মাসে হইয়াছিল—২৪১৩৯৩ টাকা]।

—কলিকাতা ইলেকট্রিক কোম্পানীর মালিকদের ১৯৪৮ সালে বন্টনযোগ্য মুনাফা হইয়াছে—৪৬১৬৮৩ পাউণ্ড [এক পাউণ্ড প্রায় ১৫ টাকার সমান]

—১৯৪৮ সালে চায়ের রাজা ডানকান ব্রাদার্স মুনাফা করিয়াছে—৩২৭৩২০২ টাকা।

—বিড়লাজীর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৪৮ সালে মুনাফা করিয়াছে—৩৬৪৮৫০০ টাকা। জি-ডি বিড়লা নিজেই বলিয়াছেন, 'উহা ১৯৪৭ সালের তুলনায় কিছু বেশী।'

শ্রমিকের ঘরে অনাহারের মজুরি

এবার ইহার সহিত তুলনা করুন, এই সকল শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি। প্রধানমন্ত্রী ঘটা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, শিল্পে ট্রাইব্যুনাল ও তদন্ত কমিটি গঠন করা হইবে; শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট না করিয়াই বাঁচিবার মত 'ন্যায্য' মজুরি পাইয়া যাইবে। সমাজতন্ত্রী এবং 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালরা এই প্রতিশ্রুতির উপর কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে লাগিয়া যায়, পাণ্টা ইউনিয়ন গড়িয়া শ্রমিককে বিপন্ন করে।

কংগ্রেসী ট্রাইব্যুনালের 'বিচারে' শ্রমিকদের জন্য কত মজুরি ধার্য্য হইয়াছে?

—বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকরা পাইতেছে মাসিক—৩০৲।

মাদ্রাজের সুতাকল শ্রমিকরা পাইতেছে ২৮৲।

—নাগপুরের সুতাকল শ্রমিকরা পাইতেছে ২৬৲।

—আমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিকরা পাইতেছে ২৮৲।

—পশ্চিম বাংলার সুতাকল শ্রমিকরা পাইতেছে ২০৲।

—পশ্চিম বাংলার চটকল শ্রমিকরা পাইতেছে ২৬৲।

—পশ্চিম বাংলার লোহাকল শ্রমিকরা পাইতেছে ৩০৲।

—যুক্তপ্রদেশের শ্রমিকদের জন্যে তদন্ত কমিটি ৩০৲ ধার্য্য করিয়াছে। কিন্তু বড় বেশী বলিয়া কংগ্রেসী সরকার উহা এখনো কার্য্যকরী করেন নাই।

—আমেদাবাদ ধাঙ্গররা পাইতেছে —২৫৲। মধ্যপ্রদেশের ধাঙ্গররা —২০৲।

—বোম্বাই পোর্টের শ্রমিকরা পাইতেছে ৩০৲।

এই সকল শিল্পের শ্রমিক সবচেয়ে বেশী সংগঠিত। তাই তাহারা ২০৲ হইতে ৩০৲ নিম্নতম মজুরি আদায় করিতে পারিয়াছে। সমাজতন্ত্রী দালাল অশোক মেহতা সরকারী 'ন্যায্য' মজুরি কমিটিতে ইহাকেই 'ন্যায্য' বলিয়া মানিয়া লইতে পারে, এই মজুরি আরো কমানো হইবে না বলিয়া প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাইতে পারে [৬ই আগস্টের বিবৃতি দেখুন] কিন্তু উহা মানুষের কেন আজকার দিনে কোন জানোয়ার পুষিবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

আসল মজুরি কাটিতেছে

সরকারী হিসাব মতই জীবন ধারণের খরচ বৃদ্ধির সহিত উহার তুলনা করিলে দেখা যাইবে, **বাংলার শ্রমিকদের আয় বাড়া তো দূরের কথা তাহাদের আসল মজুরি শতকরা ২১.৯ ভাগ কমিয়াছে, বিহারের কমিয়াছে ৩৯.৭ ভাগ, যুক্তপ্রদেশে কমিয়াছে ২৩ ভাগ।** বৃটিশ আমল হইতেও শ্রমিকের শোষণ বাড়িয়াছে। শ্রমিকরা যদি এই শোষণ মাথা নত করিয়া মানিয়া না লয় তবেই তাহারা ধ্বংসকারী। এবং সমাজতন্ত্রী 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালী এবং পণ্ডিত নেহরুর পুলিস মিলিটারী সত্ত্বেও ১৯৪৭-৪৮ সালে সারা ভারতে ৩৪৪৫টি কারখানায় ৩১৫৭,০০০ শ্রমিক "ধ্বংসকারী"র খাতায় নাম লিখাইয়াছে [সরকারী ঐ হিসাবে ১২ লক্ষ শ্রমিকের রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট এবং ১০ লক্ষ ছাত্রের ধর্ম্মঘট স্থান পায় নাই, অন্যান্য ধর্ম্মঘটের সংখ্যাও কম করিয়া দেখানো হইয়াছে]। পশ্চিম বাংলায় একমাত্র গত মে মাসেই শ্রমিকরা সাড়ে তিন লক্ষ দিন কাজ বন্ধ রাখিয়া পণ্ডিত নেহরুর রামরাজত্বে শিল্পে শান্তির ধাপ্পাবাজির মুখোস খুলিয়া দিয়াছে।

শ্রমিকরা বেশী মজুরি পায় এবং কম কাজ করে ইহা যে টাটা-বিড়লার প্রচার ছাড়া কিছু নয় এবং 'সমাজতন্ত্রী' জয়প্রকাশের দল ছাড়া আর কেহ যে ইহা বিশ্বাস করিবে না তাহাতে সন্দেহ নাই। চটকল সমিতির সভাপতি ওয়াকার সাহেব নিজেও জানেন যে, ১৯৪৭ সালে বিলাত হইতে ডাণ্ডীর একটি প্রতিনিধিদল কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এখানকার অবস্থা দেখিতে। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখেন যে, **বিলাতে একটন চট তৈরী করিতে শ্রমিক প্রভৃতি বাবদ খরচ হয় ৩৭-১৬-৫ পাউণ্ড। আর তাহার তুলনায় পশ্চিম বাংলায় উহার জন্যে খরচ পড়ে ২০-১০-০** পাউণ্ড। চটকলের শতকরা সাড়ে সাতাশ ভাগ টাকা যায় ম্যানেজিং এজেন্টদের পকেটে। বিলাতের মালিকরা মুনাফা করে না—একথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু পণ্ডিতজীর 'রামরাজত্ব' শোষণের এতবড় স্বর্গ বলিয়াই এখনো বিলাতী মূলধন ভারতে যাত্রা করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী এইভাবে শ্রমিকদের বেকার করিয়া, তাহাদের মজুরি ও ভাতা কাটিয়াই শিল্প সংকটের সমাধান করিতেছেন।

'রামরাজত্বে' দুর্ভিক্ষ

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সংকটের সমাধানও ইহা অপেক্ষা কম নৃশংস নয়।

নেহরুজী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের 'রামরাজত্বে' একজন লোকও না খাইয়া থাকিবে না। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটিয়াছে?

গুজরাট, রাজস্থান, মাদ্রাজ প্রভৃতি এলাকায় দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অনাহার সুরু হইয়াছে; দৈনিক ১২ আউন্স রেশন কমাইয়া কোথাও কোথাও ৬ আউন্স করা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলার গ্রাম অঞ্চলে চাউলের দর এখনই ২৫-৩০৲ হইয়াছে।

কিন্তু ১৭টি শক্তিশালী রেডিও ষ্টেশন হইতে প্রধানমন্ত্রী উপদেশ দিয়াছেন, আরো কম খাও, ভাতের বদলে কলা খাও, বাক্সের মধ্যে ফসল উৎপাদন কর!

দেশের দরিদ্র নরনারী, গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক—ইহাকে উপহাস বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু ইহা উপহাস নয়। ইহা মৃত্যু ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণীর খাদ্যনীতি। কংগ্রেসী শাসকরা কিভাবে এই খাদ্যনীতি অনুকরণ করিয়া চলিয়াছেন দেখুন।

মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের খাদ্যনীতি

১৯৪৩-৪৬ সালে তিন বছরে গবর্নমেণ্ট ফসল বৃদ্ধির জন্যে ১৬ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন। এবং তাহার ফল কি হইয়াছে?

১৯১৬-১৭ সালে যুক্ত ভারতে ৩৩ কোটি একর জমিতে খাদ্য ফলিয়াছিল ১২ কোটি টন।

১৯৪১-৪২ সালে ৩০ কোটি একর জমিতে খাদ্য ফলিয়াছে ৮ কোটি টন।

বিভক্ত ভারতের হিসাবে ১৯৪২-৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে খাদ্য ফলিয়াছে ৩০ লক্ষ টন কম।

১৯৪৮-৪৯ সালে দেখা যাইতেছে আবাদের পরিমাণ আরো ৩৬৩৩০০০৯ একর কমিয়াছে।

ভারতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ একর আবাদ যোগ্য জমি যেখানে এখনো অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে প্রধানমন্ত্রী বাক্সের মধ্যে ফসল জন্মাইবার জন্যে উপদেশ দিতেছেন, লাটপ্রাসাদে ফসল ফলাইতেছেন বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন!

গ্রামে জমিদার ও ধনীকৃষক কৃষকদের প্রতিদিন জমি-ছাড়া করিতেছে, ক্ষেত মজুরদের অবাধে শোষণ করিতেছে। **পশ্চিম বাংলায় শতকরা ৫৪ জন গ্রামবাসীর হাতে শতকরা ৬ ভাগ চাষের জমি আর শতকরা ১৪ জন ধনী, জমিদার, জোতদারের হাতে শতকরা ৬২.৮ ভাগ জমি রহিয়াছে। নেহরুজীর নিজের প্রদেশ যুক্তপ্রদেশে শতকরা দেড়জন জমিদার-জোতদারের হাতে আবাদী জমির শতকরা ৫৮ ভাগ আসিয়া জমিয়াছে।** খাদ্যের উৎপাদনের উপর ধনীকৃষক জমিদারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম হইয়াছে। গ্রামের শতকরা ৭৫ জনেরও বেশী কৃষককে আজ চোরাবাজারী ধনী

কৃষকের নিকট হইতে খাদ্য কিনিয়া খাইতে হইতেছে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 'রামরাজত্বে' এই জমিদার ধনী কৃষকের-শোষণের পথে কোন বাধা নাই। কংগ্রেসী খাদ্যনীতি তাহাদের শোষণের পথই আরো পরিষ্কার করিতেছে। জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের নামে যে বিল আনা হইয়াছে, তাহাতে জমির খাজনা কমানোর কোন প্রতিশ্রুতি নাই। শুধু কৃষক ও জনসাধারণের টাকায় ধনী কৃষককে কৃষি মার্শ তৈরীর সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে। গরীব কৃষকদের জমি কাড়িয়া লইয়া ক্ষেতমজুরে পরিণত করার ব্যবস্থা আছে। যুক্তপ্রদেশের সমাজতন্ত্রী দালালরা ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি পূরণ দিয়া উহাকে বরণ করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যুক্তপ্রদেশের কৃষক যে উহা মানিয়া লইবে না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ক্রমবর্দ্ধমান কৃষক-জমিদার সংঘর্ষে। [গত এক বছরে উহার সংখ্যা দুই হাজারের স্থানে পুরা চার হাজার হইয়াছে —রয়টার]

রেশনিং তুলিবার প্রস্তুতি

কৃষককে জমি দেওয়া নয়, ক্ষেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধি নয় বাক্যে ফসল বাড়াইয়া নেহরুজী খাদ্য সংকটের সমাধান করিবেন। কংগ্রেসী সরকারের নিজের হিসাব মতই দেখা যায়, ১৯৫১ সালের মধ্যে তাহারা ৮ লক্ষ একর নূতন জমি আবাদ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। উহাতে যে ফসল হইবে তাহাতে আমাদের খাদ্যাভাব মিটিবে কি? দৈনিক ৬ আউন্স রেশন এবং শুধু শহর অঞ্চলে মুষ্টিমেয় লোককে রেশন দেওয়ার জন্যেই ভারত সরকারকে ১৯৪৮ সালে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইয়াছিল ২৮ লক্ষ টন, এবার খাদ্য আমদানী করিতে হইবে ৪০ লক্ষ টন। নূতন জমিতে ফসল হইলে উহা ঐ ৪০ লক্ষ টনের আট ভাগও হইবে কিনা সন্দেহ।

তবে নেহরুজী উহার জন্য আকাশ বাতাস ফাটাইতেছেন কেন? কারণ, আমেরিকা খাদ্যের জন্যে কড়া দর আদায় করিতেছে; খাদ্য কিনিবার টাকা দিয়া গবর্নমেণ্ট সৈন্যদের জন্যে আরো মদ আমদানী করিতে চাহিতেছে; তাই এখন তাহারা বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করা বন্ধ করিতে যাইতেছেন। ফসল বাড়াও আন্দোলন তাহারই প্রস্তুতি। ইহার ফলে যে অপদার্থ এবং সংকীর্ণ রেশনিং ব্যবস্থাটুকু আছে তাহাও বিপন্ন হইবে। তারপর শহর অঞ্চলের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের নামে গ্রামের গরীব কৃষকদের শেষ অন্নটুকুও পুলিস পাঠাইয়া আদায় করা হইবে। মালিক-ব্যবসায়ী এবং সমাজতন্ত্রী দালাল ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া গত বারে যেমন ভাবে সরকারী পণ্য ও মূল্য বোর্ড হইতে রেশনিং তুলিবার পরামর্শ দিয়া খাদ্য চোরদের জন্য স্বর্ণ সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। [সেপ্টেম্বরের আগ পর্য্যন্ত, আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিবে] ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার মত দালালরা প্রধানমন্ত্রীর 'খাদ্য নীতি' সফল করার জন্যে "সৈন্যদল" [ল্যাণ্ড আর্মি!] তৈরী করিতে পারে, কিন্তু গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক জানে যে কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী উহার সাহায্যে কৃষকের শেষ রক্ত বিন্দুই শোষণ করিতেছে, ২৫।৩০৲ দরে খাদ্য ক্রয় করিতে অসমর্থ বলিয়াই গ্রাম অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক এবং শহরের গরীব বাসিন্দারা "ধ্বংসকারী"দের দলে নাম লিখাইতেছে, বাজে ফসল বাড়াইবার পরিবর্ত্তে তাহারা জমি দখল করিয়া চাষ করিতেছে, কলা খাইবার পরিবর্ত্তে তাহারা ফসল দখল করিয়া গরীবদের মধ্যে বিলি করিতেছে।

কালোবাজারী লুটের বাজার

কিন্তু কংগ্রেসী 'রামরাজ্যে' শ্রমিক-কৃষক জনগণের উপর ধনিকশ্রেণীর লুণ্ঠন এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। কংগ্রেসের সহিত কালোবাজারের নাম এক হইয়া গিয়াছে; সরকারী দপ্তর হইতেই এই কালোবাজারকে সযত্নে লালনপালন করা হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার কলিকাতা ময়দানের বক্তৃতায় কালোবাজারের সমর্থনে যুক্তি দিয়া বলিয়াছেন: জনগণই বা কম দুর্নীতিপরায়ণ কি? কিন্তু প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সংবাদপত্রে এবং লিখিতভাবে কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার একটি সম্পর্কেও টুশব্দ করেন নাই।

লুণ্ঠনের বখরা লইয়া কংগ্রেসীদের নিজেদের মধ্যেই কলহ লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা নিজেরাই একে অপরের চুরি কিছু কিছু প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

* পশ্চিম বাংলায় সুতা ও কাপড় বিলির ব্যাপারে, স্টেট বাসের ব্যাপারে, ট্যাক্সির লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে, হাওয়াই জাহাজ কিনার ব্যাপারে, আত্মীয়স্বজনকে ভাল চাকুরীতে উন্নত করার ব্যাপারে—রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ আসিয়াছে।

* মাদ্রাজে লাইসেন্স ও পারমিট বিলির ব্যাপারে, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য বহু গুরুতর অভিযোগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনা হইয়াছে।

* পূর্ব্ব পাঞ্জাবে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আত্মীয় স্বজন ইস্পাতের চোরাকারবারে ধরা পড়িয়াছে।

বিন্ধ্য প্রদেশে কংগ্রেসী ২৫ হাজার টাকা ঘুষ খাইতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছে।

* কাণপুরে কংগ্রেসী নেতারা মিলমালিকদের সাহায্যে বছরে দুইলক্ষ টাকা শ্রমিকদের পকেট হইতে আত্মসাৎ করিতেছে।

* প্রধানমন্ত্রীর খাস নিজের মন্ত্রিসভায়ই এখন পর্য্যন্ত দুইজন মন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়ায় বিদায় লইতে হইয়াছে। কিন্তু বিদেশে মাল ক্রয়ের ব্যাপারে, দূতাবাসে অর্থ অপব্যয়ের ব্যাপারে, রপ্তানী লাইসেন্স বিলি করার ব্যাপারে, বড় বড় মালিকদের ট্যাক্স আদায় করার ব্যাপারে এখনো যে শত শত অভিযোগ রহিয়াছে প্রধানমন্ত্রী তাহাকে 'জনগণের দুর্নীতি'র সহিত-সমান দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। নেহরুজীর নিজের ভগিনী বিজয় লক্ষ্মী ১০ হাজার টাকা মাসিক বেতনের উপরে দূতাবাসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার যে স্বাধীনতা পাইয়াছেন তাহাকে জনগণের স্বাধীনতার সহিত তুলনা না করিলে চলিবে কেন?

লুণ্ঠনকারীর দুঃসাহস

সরকারী অনুমোদন ও সরকারী সাহায্য লাভ করিতেছে বলিয়াই লুণ্ঠনকারীরা আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত কংগ্রেসনেতা তাহার সম্পকারী পদের সুযোগ লইয়া অনাথা আশ্রয়প্রার্থী বালিকার উপর বলাৎকার করিতে সাহস করিতেছে; লক্ষ্ণৌয়ে রিকসাচালক মজুরি দাবি করিলে কংগ্রেসী এম-এল-এ তাহাকে গুলি করিতে সাহস করিতেছে। গত দুই বছরে কংগ্রেসী 'রামরাজ্য' এইভাবে মুষ্টিমেয় ধনিক-জমিদার-জোতদারের অত্যাচারী ডিক্টেটরী শাসনে পরিণত হইয়াছে

কিন্তু এই অত্যাচারী ডিক্টেটরী শাসন শ্রমিক-কৃষক জনগণ মাথা নত করিয়া মানিয়া লইবে না—কংগ্রেসী ধনিকশ্রেণী এবং তাহাদের নেতা নেহরু-প্যাটেল তাহা ভালভাবেই জানিতেন। শুধু সমাজতন্ত্রী ও 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালদের ভেদনীতির উপর নির্ভর করা যায় না; অসংখ্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাহারা তাহা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার জন্যেই সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুলিস রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী তাহার ৫ই আগস্টের বক্তৃতায় বলিয়াছেন: আমার নিকট প্রমাণ আছে যে, কমিউনিস্টরা হত্যাকাণ্ড ও হিংসাত্মক কাজ করিতে চায়। কিন্তু কংগ্রেসী পুলিস পল্টন গত দুই বছর নেহরুজীর রামরাজ্যে কিভাবে 'অহিংসাব্রত' পালন করিয়াছে তাহা একবার দেখুন।

হত্যাকাণ্ড ও হিংসায় মত্ত কাহারা

কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের 'যুদ্ধ' শেষ হইয়াছে, কিন্তু পণ্ডিতজীর বাজেটে মিলিটারীর বরাদ্দ কমে নাই, বরং বাড়িয়া উহা ১৫৭ কোটি টাকা হইয়াছে [১৯৩৯ সালে যুক্ত ভারতে উহা ছিল ৪৭ কোটি টাকা]; **প্রতিদিন মিলিটারীর জন্য ৪৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা খরচ করিতে হইতেছে, প্রত্যেক ভারতবাসীকে গড়ে সাড়ে ছয়টাকা খরচ করিতে হইতেছে। মিলিটারী অফিসারদের শুধু মদ খাইবার জন্যে মাসিক ৭০ টাকা দেওয়া হইতেছে।** [একজন মজুরের মজুরি ও ভাতার চেয়ে বেশী!]

এই সকল মিলিটারী কাহার বিরুদ্ধে লড়িবে—কলিকাতার রাজপথে ছাত্র অভিযান, ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘট ও হায়দরাবাদের দিকে তাকাইলে তাহা বুঝা যায়। হায়দরাবাদে এখনো মিলিটারী গবর্নরের ডিক্টেটরী শাসন চলিতেছে কেন? তাহারা কি নিজাম বা রাজকর নেতাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে।

ইহা আজ হাস্যকর প্রশ্ন। কারণ, হায়দরাবাদে এখনো নিজামের শোষণের অবসান হয় নাই। সরোজিনী নাইডুর পুত্র ডাঃ জয়সূর্য্য পর্য্যন্ত একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কংগ্রেসী মিলিটারী আজ পর্য্যন্ত একজন রাজাকর নেতাকে শাস্তি দিতে পারে নাই।

কিন্তু কংগ্রেসী মিলিটারী প্রায় বিনা বিচারেই ফাঁসীর হুকুম জারি করিয়াছে। তেলেঙ্গানার সেই আটজন শ্রমিক কৃষক ছাত্র নেতারা উপর যাহারা নিজেদের জান কবুল করিয়া এতদিন নিজাম ও রাজাকর দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন। রাজাকর নেতাদের জেল খানায় মাসে ৭৫০৲ ভাতা দেওয়া হইতেছে, সরকারী খরচে ব্যারিস্টার লাগাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হইতেছে; আর লালঝাণ্ডার কয়েদীদের জেলের মধ্যে অকথ্য নির্য্যাতন করা হইতেছে। এই সকল লালঝাণ্ডা কর্ম্মীদের অপরাধ কি?

তেলেঙ্গানার অপরাধ!

তাহারা দেশীয় রাজ্যের সমস্যাকে সর্দ্দার প্যাটেলের মত বাহুবলী উপায়ে সমাধান করিতে রাজী হয় নাই! তাহারা তেলেঙ্গানাকে মুক্ত এলাকায় পরিণত করিয়াছে: গরীব কৃষকের মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমি বিলি করিয়াছে, দুই লক্ষ বস্তা খাদ্য বিলি করিয়াছে; গ্রামের গরীবদের সমস্ত ট্যাক্স, দেনা প্রভৃতি নাকচ করিয়া দিয়াছে; গ্রামবাসীর জন্যে চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে; নির্ব্বাচিত গ্রাম্য কমিটির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইহার সহিত তুলনা করুন প্যাটেল সাহেবের স্বাধীন রাজস্থান গঠনের কৌশল। এখানে গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরের মধ্যে আজ ব্যাপক অনশন সুরু হইয়াছে, আর তাহাদের শোষণ করিয়া সেই অর্থে মহারাজাদের এইভাবে বার্ষিক সেলামী দেওয়া হইতেছে:

জয়পুর—১৮০০,০০০৲
জোধপুর—১৭৫০,০০০৲
বিকানীর—১৭০০,০০০৲
মেবার—১০০০,০০০৲
কোটা—৭০০,০০০৲ ইত্যাদি
মোট—৮২৭১০০০৲

প্যাটেলজী "দেশীয় রাজ্যের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছেন" সেখানে শাসনতন্ত্রের সহিত এখন ধনতান্ত্রিক শোষণের পথও উন্মুক্ত করিয়াছেন; তেলেঙ্গানার লালঝাণ্ডা সৈনিকরা ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক—সকল শোষণের পথ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই আজ সেখানে কংগ্রেসী মিলিটারী ছুটিয়াছে। পাঁচটি প্রদেশের মিলিটারী কৃষকের হাত হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া তাহা আবার দেশমুখদের হাতে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে, এমন কি রাজাকর দেশমুখদের পর্য্যন্ত আবার মিলিটারী পাহারায় গ্রামে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, গৃহদাহ প্রভৃতির কাজ এখন কংগ্রেস নেতাদের নিত্যকার কার্য্যক্রমে স্থান পাইয়াছে।

অন্ধ্র দেশ ধর্ষিত

তেলেঙ্গানার গাঁয়ে অন্ধ্র প্রদেশ। সেখানে গত ৬/৭ মাসে মিলিটারী ও পুলিস একত্র হইয়া যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার সামান্য হিসাব এখানে দেওয়া হইল:

—এক হাজার গ্রামে হানা দিয়াছে।

—২৫ হাজার নরনারীর উপর মার-পিট করিয়াছে।

—৫০০০ লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—পাঁচ শত লোককে বিনা বিচারে আটক রাখিয়াছে।

—সম্পত্তি লুট করিয়াছে ৫ লক্ষ টাকার বেশী।

—১৫ জন মেয়ের উপর বলাৎকার করিয়াছে।

—৫ জন লোককে খুন করিয়াছে।

হিটলারের মৃত্যু-কুঠরী পশ্চিম বাংলা

কিন্তু পশ্চিম বাংলার হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের কোন হিসাব তৈরী করা সম্ভব নয়।

এখানে কাঠ কয়লা হইতে সুরু করিয়া দোকানের ফুল পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের উপর ট্যাক্স বসাইয়া সরকারী তহবিল ভারী করা হয় এই পুলিস বাহিনীকে দিনের পর দিন বড় করার জন্যে। যুক্ত বাংলার পুলিসের জন্যে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল, 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শুধু পশ্চিম বাংলার জন্যেই তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা পুলিসের জন্যে খরচ করা হইতেছে। পুলিস অফিসারদের জন্যে সরকারী খরচে দুধের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিরাট পুলিস বাহিনীর কাজ কি?

ইহারা কংগ্রেসী কালাকানুনকে কার্য্যকরী করিতেছে। কালাকানুন যেখানে অচল, সেখানে টেগার্ট সাহেবদের সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রয়োগ করিতেছে। পুলিস মন্ত্রী আদেশ দিয়াছেন: খুন করার জন্যেই গুলি চালাইতে হইবে। মন্ত্রিসভা ক্ষমতা দিয়াছেন, কোন পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করা যাইবে। পুলিস সাহেবরা সেই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করিতেছে—কলকারখানা ও গ্রামে, স্কুল কলেজে ও বাস্তহারাদের ক্যাম্পে, শহরের রাজপথে।

—তাহারা গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে ৯২ জন নরনারীকে। তাহাদের মধ্যে মেয়ে আছেন ২২ জন, ছাত্র ১১ জন। একমাত্র জুন মাসেই তাহারা হত্যা করিয়াছে ১৯ জনকে।

—তাহারা বিনাবিচারে আটক করিয়াছে হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক ছাত্রনেতাদের; তাহারা ২০ খানা সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করিয়াছে; তাহারা কৃষকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।

—তাহারা বিনা বিচারে আটক বন্দীদের উপর গুলি চালাইয়া তিনজন বন্দীকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের উপর লাঠি চালাইয়াছে।

—তাহারা যেখানে ধর্ম্মঘট করিয়াছে সেখানে হাজির হইয়া শ্রমিকদের উপর লাঠি চালাইয়াছে, টিয়ার গ্যাস চালাইয়াছে, পিকেটিং ও ধর্ম্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে; লালঝাণ্ডা, টি-ইউ-সি অফিসে তালা লাগাইয়া দিয়াছে। তাহারা কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভাসমিতির অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে; জমির উপর ১৪৪ ধারা জারি করিয়া জমির উপর চাষের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে।

—তাহারা মেয়েদের শোভাযাত্রার উপর ঘোড়সওয়ার পুলিস চালাইয়া দিয়াছে; আশ্রয়প্রার্থী মেয়েদের আশ্রয় শিবির হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে; তাহাদের শোভাযাত্রার উপর লাঠি ও টিয়ার গ্যাস চালাইয়াছে।

—তাহারা কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করিয়া শ্রমিকদের দল গঠনের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছে। এইভাবে সারা দেশকে এক বিরাট কারাগারে পরিনত করিয়াছে।

—তাহারা সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা, আর-এস-এস ও সেবাদলদের কারামুক্ত করিয়াছে, লালন-পালন করিতেছে। গ্রামে গ্রামে তাহাদের ঘাঁটি তৈরী করিতে সাহায্য করিতেছে।

ইহাই বিড়লাজীর বন্ধু নলিনী-বিধানের 'রামরাজ্যের' চেহারা। নেহরুজী এই পুলিশী শাসনের সমর্থনেই বলিয়াছেন: ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা যাহারা বলে তাহারা নিতান্ত বাজে কথা [রাসকেল এণ্ড ননসেন্স] বলে। বিড়লাজীর মুনাফা রক্ষাই যেখানে বড় প্রশ্ন, সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বাজে কথা ছাড়া আর কি?

শিক্ষা ও সংস্কৃতি আক্রান্ত

কিন্তু শুধু নুনিয়া, অহল্যা, মুকুল, লতিকার মত শত শত শহীদের রক্তে বিড়লাজীদের তৃপ্তি নাই। 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট আতংকিত হইয়া মন্তব্য করিয়াছেন, ইহাতেও বাংলার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের কমিউনিস্ট প্রভাব হইতে রক্ষা করা যাইবে না। তাহার জন্যেই সুরু হইয়াছে জনগণের —শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর হিংস্র আক্রমণ।—নিজামবিরোধী সংগ্রামের কাহিনী "মা-ভূমি" পুস্তক লিখিয়াছিলেন ভাস্কর রাও। কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী তাহাকে শুধু কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া খুশী থাকিতে পারে নাই। তাঁহারই চোখের উপর তাঁহার নূতন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পোড়ানো হইয়াছে।

—একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশে পুলিস জনগণের প্রায় একলক্ষ টাকার বই নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

—পশ্চিম বাংলায় বিধান মন্ত্রিসভা ন্যাশনাল বুক এজেন্সী বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, কমিউনিস্ট-ম্যানিফেস্টো প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

—আসামে গণনাট্য সঙ্ঘ ও শান্তি সম্মেলনে গুলি চালাইয়া পুলিস তিনজন নরনারীকে হত্যা করিয়াছে।

—বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেসী শাসকরা এপর্য্যন্ত ১৭ খানি সোভিয়েট ছবি নিষিদ্ধ করিয়াছে ['নিরপেক্ষ নেহরু!], রবীন্দ্র জয়ন্তি নিষিদ্ধ করিয়াছে।

—ঘোড়াপালনের যুক্তিতে নেহরুজী ঘোড়দৌড়ের জুয়া সমর্থন করিতেছেন; পুলিসের টাকা জোগাইবার জন্য মদ্য বর্জ্জনের প্ল্যান বাতিল করিয়াছেন।

—শিক্ষা সঙ্কোচের জন্য সারাভারতে স্কুল কলেজের বেতন বাড়ানো হইতেছে। পরীক্ষায় ফেলের সংখ্যা বাড়ানো হইতেছে। সমস্ত শিক্ষা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

—টাটা-বিড়লা মাড়োয়ারী প্রভুদের সংস্কৃতিকে সারাভারতের উপর চাপাইবার জন্য কংগ্রেসী শাসকরা হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, বিহার সীমান্তে বাংলা শিক্ষার উপর হামলা করিতেছেন। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধের বীজ বপন করিতেছেন।

—মধ্য প্রদেশের কংগ্রেসী শাসকরা জানাইয়া দিয়াছেন যে, যাহারা ব্যবসায়ের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করিবেন না, তাহাদের পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

—মাদ্রাজের কংগ্রেসী শাসকরা জানাইয়া দিয়াছেন, কমিউনিস্ট ছাত্রদের স্কুল কলেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ধনিকশ্রেণীর এই ধরণের আক্রমণ নূতন নয়। হিটলারও একদিন রাজপথে প্রগতি সাহিত্যের বহ্ন্যুৎসব করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বুদ্ধিজীবী তরুণদের প্রগতির পথ হইতে ফিরানো সম্ভব হয় নাই।

১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসী ইস্তাহারে নেহরুজী বলিয়াছিলেন: "নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিলে আমাদের প্রথম কাজ হইবে জনগণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, বেকার সমস্যার সমাধান করা, মানুষের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা।" আজ মাত্র দুই বছরের কংগ্রেসী শাসনেই অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হইতেছে, বেকারের সংখ্যা আকাশ ছুঁইতেছে, মানুষ ধনিকের ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে।

নয়া শাসনতন্ত্র—অবাধ শোষণের দাস

এই ফ্যাসিস্ট শাসনকে স্থায়ী করার জন্যেই-ধনিক-জমিদার মহারাজদের গঠনতন্ত্র পরিষদে নূতন শাসনতন্ত্র তৈরি হইতেছে। ঐ শাসনতন্ত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরী ১৯৩৫ সালের দাস-শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও প্রতিক্রিয়াশীল। মুষ্টিমেয় ধনিক কিভাবে গণতন্ত্রের নামে সারা দেশে নিজেদের ডিক্টেটরী শাসন কায়েম রাখিতে পারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়া নয়া শাসনতন্ত্রে তাহার সুনিপুণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

* এতদিন কংগ্রেস নেতারা বলিতেন, ভাষার ভিত্তিতে নূতন করিয়া প্রদেশ পুনর্গঠন করা হইবে। কিন্তু পাছে তাহাতে টাটা-বিড়লা-মাড়োয়ারী প্রভুদের সারা দেশের উপরে অবাধ শোষণ চালাইতে অসুবিধা হয় সে জন্যে উহা ১০ বছরের জন্যে স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রদেশিকতা সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ভাঙ্গিবার কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে।

* এতদিন কংগ্রেস নেতারা বলিতেন, প্রদেশকে 'অটোনমী' দেওয়া হইবে, কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রে শুধু বৈদেশিক বা দেশ রক্ষার ব্যাপারে, রেল পোস্ট অফিসের ব্যাপারে নয়, পেট্রোল, কাগজ, খনি, খাদ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির ব্যাপারে এবং ট্যাক্সের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের হাতে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে, প্রদেশের সম্পদের উপর টাটা-বিড়লা-ডালমিয়ার অবাধ শোষণের অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

* এতদিন কংগ্রেস নেতারা বলিতেন, শিল্প জাতীয়করণ হইবে, কিন্তু দেশী শিল্পই শুধু নয় বিদেশী মূলধনকে পর্য্যন্ত নয়া শাসনতন্ত্রে **অবাধ** এবং **সমান** শোষণাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

* এতদিন কংগ্রেসনেতারা বলিতেন, করাচী কংগ্রেসের মৌলিক অধিকারই তাঁহাদের লক্ষ্য; কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রে বিনা বিচারে আটক করা, বন্দীদের বিদেশে পাঠানো, সংবাদপত্র, সংগঠন ও সভা-সমিতির অধিকার কাড়িয়া লওয়া, ধর্ম্মঘট করা ও অস্ত্রধারণ করার অধিকার কাড়িয়া লওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা হইয়াছে।

* গবর্নরদের মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহাদের হাতে বৃটিশ গবর্নরদের মত অফুরন্ত 'বিশেষ ক্ষমতা' দেওয়া হইয়াছে।

* প্রেসিডেন্টকে গণভোটে নয়, মুষ্টিমেয় ধনিকের ভোটে নির্ব্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং 'জরুরী অবস্থা'র নাম করিয়া তিনি ডিক্টেটর হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন। কংগ্রেসনেতারা ইহাকেই নাম দিতেছেন—'স্বাধীন' ভারতের শাসনতন্ত্র।

চার্চ্চিলের মুখে হাসি

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার বন্ধুরা বৃটিশ মনিবদের নিকট হইতে আপোষে যে 'স্বাধীনতা' পাইয়াছেন তাহার এই কদর্য্য চেহারা দেখিয়া চমকিত হইবার কারণ নাই। কারণ, মাউণ্টব্যাটন রোয়েদাদ মারফত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের ধনিকশ্রেণীর সহিত যে আপোষ করিয়াছে তাহাতে তাহাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শাসন না থাকিলেও ভারতের উপর অর্থনৈতিক রাজত্ব শেষ হয় নাই। মাউণ্টব্যাটন রোয়েদাদে ভারতকে দুই ভাগ করিয়া, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষকে বাঁচাইয়া রাখিয়া এবং উভয়কে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উপর নির্ভরশীল করিয়া বৃটিশ ধুরন্ধররা যে চাল চালিয়াছিল গত দুইবছরে তাহার আসল রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ভারত বা পাকিস্তান কেহই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, ভারতে বৃটিশ মূলধনের শোষণ [ট্রাম, ইলেকট্রিক, চটকল, চা-বাগান, খনি প্রভৃতিতে] ও কর্তৃত্ব বিন্দুমাত্র কমে নাই। বরং সেখানে নূতন মূলধন আমদানী হইতেছে [ইলেকট্রিক প্রভৃতিতে] আজও ভারতের সৈন্যবাহিনীতে বৃটিশ অফিসারই প্রাধান্য করিতেছে; বিড়লা-ব্যাবকক প্রভৃতি মিলিত কোম্পানী গঠিত হইতেছে, মিলিত জাহাজ কোম্পানী গঠনের আলোচনা চলিয়াছে, উভয়ের মিলিত কোম্পানীই তীব্রতর হইতেছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্ল্যান

কংগ্রেস নেতাদের এই চরম বিশ্বাস-

ঘাতকতা আরও স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে গত কমনওয়েলথ সম্মেলনে।

জাতিবিদ্বেষে প্রণোদিত হইয়া আফ্রিকায় যাহারা ভারতীয়দের হত্যা করিতেছে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে যাহারা কালো আদমীদের তাড়াইতেছে, সিংহল হইতে যাহারা শ্রমিক বিতাড়ন করিতেছে সেই ফ্যাসিস্ট কমনওয়েলথ পাণ্ডাদের সহিত নেহরুজী খানাপিনা করিয়া কমনওয়েলথএ থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সিদ্ধান্তে চার্চিল সাহেব এতই খুশী হইয়াছেন যে, নেহরুজীকে বাড়ীতে ডাকিয়া ভোজ দিয়াছেন। সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে নেহরুজীর ধন্তি ধন্তি পড়িয়া গিয়াছে।

ঐ সম্মেলনের আসল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছে ষ্টেটস্ টাইম পত্রিকা। তাঁহারা লিখিতেছেন:

"নূতন দেশরক্ষা প্ল্যান অনুসারে অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড বিমান ও নৌ-ঘাঁটির কাজ করিবে; ভারত ও পাকিস্তানকেই প্রধান স্থল-বাহিনী সরবরাহ করিতে হইবে; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি ত্রিঙ্কোমালী হইবে সিংহলের দান।"

দেশরক্ষা নয়, উহা সাম্রাজ্যরক্ষার প্ল্যান। কমনওয়েলথ সম্মেলনের আগে হইতে এই প্ল্যান তৈরী হইতেছিল। চীনে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বার্ম্মা, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন, বৃটিশ, ডাচ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ জনগণের হাতে মার খাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্ল্যান লইয়া আলোচনা সুরু হইয়াছিল। তাহার জন্যেই নয়াদিল্লীতে সোভিয়েট এসিয়াকে বাদ দিয়া 'এসিয়া সম্মেলন' ডাকা হইয়াছিল; সেখানে (বর্ম্মায়) জনগণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। তাহার জন্যই চন্দননগর-পণ্ডিচারীতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি এবং গোয়াতে ফ্যাসিস্ট পর্ত্তুগালের ঘাঁটির সমর্থনে নেহরু আজ আজগুবি যুক্তি উপস্থিত করিতেছে। কমনওয়েলথ-এ থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়া নেহরুজী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-শিবিরে পাকাপাকি ভাবে স্থান লইয়াছেন। উহা কংগ্রেসী ধনিক-শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার প্রকাশ্য ঘোষণা মাত্র।

"নিরপেক্ষতার" আবরণ খসিয়াছে

কিন্তু ইহাকে নেহরুজী এখনো "নিরপেক্ষতা" বলিয়া চালাইতে চাহেন কোন সাহসে? ৫ই আগস্টের বক্তৃতায়ও তিনি "নিরপেক্ষতার" বড়াই করেন কোন মুখে?

১৯৪৯ সালের "বর্ষফল" গণনা করিতে যাইয়া বিড়লাজীর "ইস্টার্ন ইকনমিস্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন:

"কমনওয়েলথ সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ; সুতরাং কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মানেই হইল আমেরিকার দিকে ঝোঁকা। জাতিসংঘ বা আর কোথাও ছোটখাট ব্যাপার ছাড়া কখনো আমরা কমনওয়েলথ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী লাইন গ্রহণ করিতে পারি না। ১৯৪৯ সালে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর পররাষ্ট্র নীতিরই সামিল হইবে।"

১৪ই আগস্ট

ডলারের নিকট দেশ বিক্রয়

এই পররাষ্ট্রনীতির একমাত্র লক্ষ্য হইল, দেশকে টাটা-বিড়লার স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া। গত দুই বছর যাবৎ তাহার প্রস্তুতি চলিয়াছে এবং এবার ১১ই অক্টোবর প্রধান মন্ত্রী সাহেব নিজে ওয়াশিংটনে যাইয়া বিক্রয়-পত্রে সহি করিয়া আসিবেন।

'নিরপেক্ষ' নেহরু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট হইতে ডলার পাইবার আশায় ভারতের স্বার্থকে কিভাবে বিক্রয় করিতে চলিয়াছেন?

—তাঁহারা বিদেশী মূলধন সম্পর্কে নূতন করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, দশ বছর কেন কখনো উহা জাতীয়করণ হইবে না; দেশী ও বিদেশী মূলধনকে শোষণের সমান সুযোগ দেওয়া হইবে; এমন কি যে ক্ষেত্রে দেশী মূলধন "প্রটেকশন" পায়, সেখানে বিদেশী মূলধন নিযুক্ত হইলে তাহারাও "প্রটেকশন" পাইবে।

—তাঁহারা বিদেশী মূলধনকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, মার্কিন মুলুকের অনুকরণে আইন পাস করিয়া ধর্ম্মঘট বে-আইনী করা হইবে, শিল্পে শান্তি রক্ষা করা হইবে, কমিউনিস্টদের দমন করা হইবে। এই কাজে ট্রেনিং লইবার জন্যে পুলিস ও সৈন্য বিভাগের বড় কর্ত্তাদের আমেরিকায় পাঠাইয়া ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে।

—তাহারা শুধু কাশ্মীর ও কাটা-মুণ্ডুতে নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানে ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধ ঘাঁটি তৈরী করার সুযোগ দিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের 'বিশেষজ্ঞরা' দলে দলে ভারত পর্যটন করিয়া যাইতেছে; বিমান ঘাঁটি, রেল প্রভৃতি তৈরীর জন্যে ডলার আসিতেছে। ভারতে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

—তাহারা ভারতের শ্রমিক প্রতিনিধিদের মিলানে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান করিবার সুযোগ দেন নাই, বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদের প্যারিসে বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসে যোগদান করিবার অনুমতি দেন নাই। কিন্তু মার্কিন শ্রমিক দালাল, এ-এফ-এল, এর নেতারা বোম্বাইয়ে অফিস খুলিবার অনুমতি পাইয়াছে; শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিবার জন্যে অর্থ ব্যয় করার অনুমতি পাইয়াছে।

—ভারতের কৃষি, রেডিও শিল্প প্রভৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্যে মার্কিন মূলধনওয়ালারা প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিন মুলুক ভ্রমণ করিয়া বিড়লাজী এই যৌথ শোষণের ব্যবস্থা পাকা করিয়া আসিয়াছেন।

—অর্থ মন্ত্রী ডাঃ মাথাই স্টার্লিং সম্মেলন হইতে ফিরিয়া তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ডলার প্রভুদের সহিত সম্মেলন না করা পর্য্যন্ত কোন অর্থনৈতিক ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। আমেরিকাকে সবচেয়ে বেশী সুবিধা দানের খসড়াচুক্তি লইয়া নয়াদিল্লীতে আলোচনা সুরু হইয়াছে।

মার্কিন দস্যুদের চৌকিদার নেহরু

ইহা 'নিরতো' নয়, স্বদেশ-বিক্রয়ের প্রস্তুতি, মার্কিন গোলামী মানিয়া লইবার প্রস্তুতি, ভারতের নওজোয়ানদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বলি দিবার প্রস্তুতি, ভারতের শিল্প ও অর্থনীতির উপর মার্কিন প্রভুত্ব কায়েম করার প্রস্তুতি। মার্শাল সাহায্য পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির অর্থনীতিকে ধ্বংস করিয়াছে, সেখানে আজ উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে, বেকারী বাড়িতেছে, মন্দা দেখা দিতেছে। খাস মার্কিন মুলুকে আর্থিক মন্দা আসিয়াছে। ইহা হইতে বাঁচিবার জন্যে প্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নূতন বাজার খুঁজিতেছে। ভারতকে তাহারা নূতন উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহিতেছে। নেহরুজী সামান্য ডলার লইয়া দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট বিক্রয় করার জন্যেই আমেরিকায় যাইতেছেন। এতদিন চিয়াং-কাই-শেক সাম্রাজ্যবাদী দালাল হিসাবে যেভাবে এসিয়ায় চৌকিদারী করিয়াছে, নেহরু সাহেবের উপর আজ সেই চৌকিদারীর দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই তাঁহারা 'শান্তিরক্ষার' জন্যে ভারতকে পুলিস রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছেন, সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছেন। এসিয়ার মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলাকে সাম্রাজ্যবাদীরা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বলিয়া মনে করে। তাহার জন্যেই এখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্দ্দেশে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মেয়েদের এমনভাবে দমন করা হইতেছে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ

কংগ্রেসী ধনিকশ্রেণী এবং তাঁহাদের নেতা নেহরুজীর এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধেই আজ চারিদিকে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতেছে। পশ্চিম বাংলায় জনগণের মধ্য হইতে দাবী উঠিয়াছে: বিড়লাজীর বন্ধু নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা খতম কর। দক্ষিণ কলিকাতার উপ-নির্ব্বাচনে কলিকাতা তথা পশ্চিম বাংলার নাগরিক এই কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধেই রায় দিয়াছে। পণ্ডিতজীর কলিকাতা সফরে এবং ময়দানের সমাবেশে জনগণ পুলিস-বুলেটের পরোয়া না করিয়া এই আওয়াজই তুলিয়াছে: কংগ্রেসী আজাদী বিড়লাজীর আজাদী।

নেহরুজী তাঁহার ৫ই আগস্টের বক্তৃতায় বলিয়াছেন: কলিকাতা ভ্রমণের পর জনগণ কংগ্রেসী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে সুরু করিয়াছে, কমিউনিস্টরা পশ্চিমবাংলায় খতম হইয়া গিয়াছে।

চিয়াং-কাই-শেকও অনেকবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, চীনে কমিউনিস্টদের প্রভাব শেষ হইয়াছে। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম সম্পর্কেও নেহরুজী গত একবছর যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন, কমিউনিস্টরা খতম হইয়াছে। কিন্তু এখনও দেখা যাইতেছে সেখানে মিলিটারী শাসন শেষ হয় নাই; কারণ সংগ্রাম অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা প্রভৃতি জেলায় আরো বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

নেহরুজী পশ্চিম বাংলার জন্যে সাধারণ নির্ব্বাচনের ধাপ্পা দিয়াছেন। ঘৃণ্য ১৯৩৫ সালের আইনে শতকরা ১৩ জনের ভোটে নলিনী-বিধানের হাতে এই নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছেন, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী রাখিয়া হাজার হাজার দেশভক্তকে বিনা বিচারে আটক রাখিয়া এই 'গণতন্ত্রের খেলা' দেখাইবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এবং তাঁহারা আশা করিতেছেন এই ধাপ্পাবাজী শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে, নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে টানিতে পারিবে।

নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গণ-জেহাদ

কিন্তু কলিকাতার শ্রমিক পণ্ডিতজীর আশায় ছাই দিয়াছে। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংগ্রামে যোগদান করিয়া প্রধানমন্ত্রীর অহঙ্কারের সমুচিত জবাব দিয়াছে। সমাজতন্ত্রী ও 'জাতীয়' টি-ইউ-সি'র ভেদনীতিকে লড়াইয়ের ময়দানে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে; দালালদের মুখ দেখানো অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

তেমনি সুরু হইয়াছে ২৪পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের অসংখ্য ধর্ম্মঘট সংগ্রাম। এই বিরাট শ্রমিক সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিম বাংলায় জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসী ধনিক শাসনের ধ্বংসনীতি, হিংসানীতি, যুদ্ধনীতি ও দেশ-দ্রোহিতা নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার কুশাসন সম্পর্কে অতি অল্প দিনের মধ্যে জনগণ শুধু মোহ-মুক্তই হয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করিয়াছে। জনগণের হাতে পরাজিত নেহরুজী সাংবাদিক সম্মেলনে যত চীৎকার করুন না কেন, উহাতে তাহার আতংকিত কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে নাই। দুই বছরে কংগ্রেসী দুঃশাসন সারা ভারতে আজ তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জনগণের বিপ্লবী প্রতিরোধকে ঠেকাইবার জন্যে মার্কিন ডলার যথেষ্ট নয়। চীন, গ্রীস ও কোরিয়ায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৫ই আগস্টের কালো তারিখে অসংখ্য শহীদের নামে জনগণ এই শপথই লইবে: নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা ধ্বংস করার জন্যে সংগ্রামকে তীব্রতর করিব। প্রকৃত স্বাধীনতা, নয়া-গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে জীবনপণ সংগ্রাম করিব।

মঞ্জিলের নিয়মাবলী

(১) প্রতি রবিবার কাগজ বাহির হইবে। দাম তিন আনা।

(২) ১০ কপির কম এজেন্সী নাই। শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন।

(৩) গ্রাহকদের হার:—বার্ষিক ১০৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা, ত্রৈমাসিক ২।।০ টাকা।

অফিসের ঠিকানা

২৪নং নূর মহম্মদ লেন।

কলিকাতা (৯)

আর-এস-পি নেতৃত্বে তথাকথিত 'বামপন্থীদের' কীর্তি

৯ই আগষ্ট 'কমনওয়েলথ-বিরোধী' ছাত্র সমাবেশকে ধ্বংসের অপচেষ্টা

১৯৪৯-এর ৯ই আগস্ট ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে কলিকাতার স্কুল কলেজের প্রায় ৮,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ধর্মঘট করিয়া কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে "কমনওয়েলথ বিরোধী দিবস" হিসাবে দিনটিকে পালন করেন। স্কুল কলেজে ধর্মঘটের পর অনেকগুলি ছোট ছোট মিছিল "কমনওয়েলথের ফাঁস ছিঁড়ে ফেল," "সোভিয়েট-বিরোধী যুক্ত চক্রান্ত ধ্বংস হোক" প্রভৃতি ধ্বনি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সভায় জড়ো হয়।

৯ই আগস্ট বিভিন্ন জায়গায় প্রচারপত্র ও ইস্তাহার মারফৎ যে প্রচার হয় তাহাতে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই "কমনওয়েলথ বিরোধীদিবস" হিসাবে দিনটি পালনের জন্য আহ্বান করিয়াছিল।

ইউনিভার্সিটি লনে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান যে সভা ডাকে, সে সভাও একই আওয়াজে ডাকা হয়। তাই বিভিন্ন ছাত্র কংগ্রেস সবগুলি মিলিয়া দেব নাথ দাসের সভাপতিত্বে লনে যখন আলাদা সভা করার আয়োজন করিতেছিল তখন ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সভা করিয়া কংগ্রেসী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিতে আহ্বান জানানো হয়। আর-এস-পি ছাত্র কংগ্রেসের উদ্যোগে সে আহ্বান অগ্রাহ্য করা হয়ঃ বিভিন্ন জায়গা হইতে ছোট ছোট মিছিল করিয়া ছাত্র ফেডারেশনের পতাকাতলে তখন প্রায় ছয়শত ছাত্র-ছাত্রী আসিয়া সামিল হইয়াছেন।

বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র কংগ্রেসের মিলিত সভায় তখন ৭০।৮০ জন ছাত্র জড়ো হইয়াছেন। কিন্তু "বামপন্থী" "ছাত্র নেতা"রা ছাত্র ফেডারেশনের ঐক্যবদ্ধ ভাবে সভা করার আহ্বান উপেক্ষা করেন। কংগ্রেস-নেতাদের কমনওয়েলথে যোগদান করিয়া দেশদ্রোহী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রদের এই ঐক্যবদ্ধ আওয়াজকে বানচাল করিয়াই 'বামপন্থী' ছাত্রনেতারা ক্ষান্ত হইলেন না, দিনটিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহারা হঠাৎ আওয়াজ তুলিতে সুরু করেন 'কমিউনিস্ট পার্টিকে খতম কর।'

ছাত্র ফেডারেশনের সভা ছাড়িয়া তাহাদের "ক্রান্তিকারী" সভায় ছাত্রদের যোগ দিবার জন্য তাহারা তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাদের "ক্রান্তির" নমুনা গত এক বৎসরে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ হামেসাই দেখিয়াছে। এই ইউনিভার্সিটি লনেই এই সমাজতন্ত্রী ছাত্র নেতারা ১০,০০০ ছাত্রর সমাবেশে পোর্ট শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাবে আনা হইলে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। ১৮ই জানুয়ারীর মরণপণ লড়াই হইতে সুরু করিয়া কংগ্রেসী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি লড়াইকে ইহারা "জঙ্গীপনা" বলিয়া আখ্যা দিয়াছে।

তাই সংগ্রামী ছাত্রসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এই "বামপন্থী" ছাত্র নেতারা কমনওয়েলথবিরোধী দিবসে পাগলের মত বিভেদ সৃষ্টিকারী আওয়াজ তুলিতে লাগিলেন।

ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে তখন ছয় শত ছাত্র-ছাত্রী নিয়া সভা সুরু হইয়াছে। সে সভায় আওয়াজ উঠিল "কমনওয়েলথের ফাঁস ছিঁড়ে ফেল" "সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধ চক্রান্ত ধ্বংস হোক" "কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কর", ইত্যাদি। ৮০ জন ছাত্র নিয়া পাশাপাশি সভা চালানো অসম্ভব দেখিয়া এই "ক্রান্তিকারী" ছাত্র নেতারা লনের উপর দুইটি পটকা ছুড়িয়া প্রথমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করিল —তারপর একজন ছাত্রফেডারেশনের কর্মীকে ইহারা ছুরিকাঘাত করে। ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে উপস্থিত এই ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ এই ইউনিভার্সিটি লনেই গত ১৮ই জানুয়ারী কংগ্রেসী সরকারের গুলির মোকাবেলা করিয়াছেন —পরবর্তী বিভিন্ন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছেন। তাই ছাত্র সমাজ হইতে বিভিন্ন "ক্রান্তিকারী ছাত্র নেতাদের" এই দুঃসাহসে এই সংগ্রামী ছাত্র বাহিনী বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠেন। প্রায় পাঁচশত ছাত্র-ছাত্রী এই হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইলে আধিকাংশ ক্রান্তিকারী ছাত্র নেতারা হাতজোড় করিতে করিতে পলাইয়া যায়। এই "বামপন্থী" ছাত্র নেতাদের সাহায্যকল্পে জাতীয় রক্ষী দলের কিছু লোক আনাইয়া মারপিটের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু বিপুল সংখ্যক ছাত্রের আওয়াজে তাঁহারা ভাসিয়া যায়। 'বামপন্থী' নামধারী দালাল ছাত্রনেতাদের ছাত্রদের হাতে মার খাইয়া হাসপাতালে কেহ কেহ স্থান নেন। এই ঘটনার পর পাঁচশত ছাত্র-ছাত্রী ছাত্রফেডারেশনের পতাকা ও ফেষ্টুন নিয়া দালালী ও গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিতে তুলিতে ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়া অগ্রসর হইল। জাতীয় রক্ষী দলের লোকদের সাথে নিয়া লাঠি সোডা সাথে ইহাদের কেহ কেহ মিছিলকে আক্রমণ করিতে আস্ফালন করিল, পাশে পুলিস ট্রাকও উপস্থিত ছিল কিন্তু ছাত্র মিছিলের জঙ্গী চেহারা দেখিয়া ইহারা আর ভরসা পাইল না।

তার পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি ধনিকশ্রেণীর কাগজ মারফৎ এই "বামপন্থী" ছাত্র নেতারা "কমিউনিস্টদের গুণ্ডামীর" বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। ইহাদের কেহ কেহ মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় বিভিন্ন স্কুল কলেজে গিয়া সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিটি, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কলেজে আর, এস, এস ও জাতীয় রক্ষী দলের লোকদের সাথে নিয়া ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের উপর হামলা করিতে চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের নিকট কোনরূপ সহানুভূতি ইহারা পায় নাই। ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে বিভিন্ন স্কুল, কলেজে পোস্টার ও সভা করিয়া আসল ঘটনাকে প্রচার করা হইয়াছে। কমনওয়েলথবিরোধী দিবসকে বানচাল করার চেষ্টা করিয়া যাহারা চার্চিল এট্‌লীর কমনওয়েলথ চক্রান্তকারীদের প্রত্যক্ষ দালাল হিসাবে পরিণত হয়—ধনিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যাহারা এইভাবে বাধা দেয় তাহাদের বরুদ্ধে ছাত্রফেডারেশন বিভিন্ন স্কুল, কলেজে প্রচার চালাইতেছে।

সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনে নূতন চীনের অভিনন্দন

নূতন চীনেরপিপিং হইতে সারা-চীন ছাত্র ফেডারেশন তারযোগে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন উপলক্ষে এক অভিনন্দন বাণী পাঠাইয়াছিলেন, উহাতে বলা হইয়াছে—"সম্মেলনের প্রতি ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন। নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকারের জন্য সংগ্রামে সমর্থন জানাইতেছি।"

বিশ্ব টি-ইউ ফেডারেশন হইতে ডাঙ্গের প্রতি অভিনন্দন প্রস্তাব

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের দ্বিতীয় সম্মেলনে ভি কুজনেৎসভ (সোভিয়েট ইউনিয়ন) ও এফ-শান্তি'র (ইতালি) রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত প্রস্তাবে ('শান্তি, জনগণের গণতন্ত্রসম্মত অধিকার ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য বিশ্ব টি-ইউ ফেডারেশনের নীতি ও সংগ্রাম সম্পর্কে প্রস্তাবে) কমরেড এস-এ ডাঙ্গের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানানো হয়েছে:

"....কমরেড ডাঙ্গে ও অন্যান্য যে সব জঙ্গী বন্ধুরা কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, ট্রেড ইউনিয়নের জন্য সেই সব সাহসী সৈনিকদের উদ্দেশে এই সম্মেলন আন্তরিক ও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন পাঠাইতেছে।"

• নূতন সহ-সভাপতি মণ্ডলী

বিশ্ব টি, ইউ, ফেডারেশনের নব নির্বাচিত কার্য্যকরী সমিতির প্রথম সভায় দি ভিত্তরিতন ফেডারেশনের সভাপতি হইয়াছেন। সহসভাপতি হইয়াছেন: কুজনেৎসব (সোভিয়েট ইউনিয়ন), লা সীপ (ফ্রান্স) লি-নিং-ই (চীন), লম্বার্ডো তোলেদানো (দক্ষিণ আমেরিকা), ব্রুকজাইল (হল্যাণ্ড), এস-এ ডাঙ্গে (ভারত), পেনা (কিউবা) ও ডায়ালো আব্দুল্লা (দক্ষিণ আফ্রিকা)। বৃটিশ ও মার্কিন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের জন্য ২ জন সহ-সভাপতির আসন খালি রাখা হইয়াছে।

এই মুহূর্তে কিনুন এবং পড়ুন

গ্রামের গরীবদের প্রতি—১৲; রাষ্ট্র ও বিপ্লব—২৷৷৹; ১৯০৫ সালের বিপ্লব—৷৷৴৹; সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—৪৲; রুশ বিপ্লবের ইতিহাস—১৷৷৹; আজিকার ভারত (১ম)—৩৲; আজিকার ভারত (২য়)—৪৲; ভারত ও সোভিয়েট মধ্য এসিয়া—৩৷৷৹; বাংলার নারী আন্দোলন—২৷৹; গণতন্ত্রের রূপ—১৷৵৹; ভারতে নয়াগণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—৵৹; কৃষক সমস্যার নূতন ধারা—৷৹; বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন (এ, লজভস্কি)—৷৵৹।

নিউ পাবলিশার্স—
৬নং, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

ভিঃ, পিঃ-তে মাল পাঠানো হয়।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।

বেতন-হ্রাস রোখার জন্য বোনাসের দাবীতে লড়াই তীব্রতর শ্রেণী-সংগ্রামেরই ঘোষণা

ঈদ চুকিয়া গিয়াছে, সামনে পূজা। বাংলা দেশের বড় বড় শিল্পগুলিতে হাজার হাজার মুসলমান শ্রমিক পেটে পাথর বাঁধিয়া নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এবারে মুখ কালো করিয়া ঈদের পরব সারিতে হইয়াছে তাঁহাদের। বৎসরান্তের এত বড় একটা পরব কেবল তীব্রভাবে তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া গেল নিজেদের শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির কথা, দিন দিন যাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। পরিবার-পরিজনের জন্য নূতন কাপড়, কাচ্চা-বাচ্চাদের জন্য মণ্ডা-মিঠাই, আত্মীয়-বন্ধুদের দাওত-জিয়াফৎ—এ-সকল পাওনার আনন্দ তাঁহাদের দিতে অক্ষম মনের তিক্ততার সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। মজুরি যা পাওয়া যায় তাহাতে তো গোটা পরিবারের দুইবেলার অন্ন-সংস্থানও হয় না, পরবের সামারোহ আসিবে কোথা হইতে? বছরে একবার বৈ দুইবার আসে না ঈদ, তবু এমন পরবেও শত শত মজুর পরিবারকে হয় মহাজনের দুয়ারে ধর্না দিতে হয় হাওলাতের জন্য, নয় তো বিসর্জ্জন দিতে হয় সমস্ত আনন্দই।

হাজার হাজার হিন্দু শ্রমিক মুসলমান ভাইদের দুরাবস্থা চোখে দেখিয়া আসন্ন পূজায় অনুরূপ নিরানন্দতা আশঙ্কা করিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছেন। কি করিয়া তাঁহারা ছেলেমেয়ে আর আশ্রিতদের মনের সাধ মিটাইবেন? সকলকে উপবাসের হাত হইতে বাঁচাইতেই জান কাবার করিতে হয়, একটি পয়সাও সঞ্চয় তো দূরের কথা। ঘাড়ের উপর দুর্বিষহ বোঝার মত চাপিয়া আছে মহাজনের ঋণ। কোনও শালার মালিকও কোন বিশেষ বোনাস দিবে না, দিবেনা এক মাসের বেতন অগ্রিম! কী উপায় হইবে?

ঈদ আর পূজা। প্রতিবছর এই সময় বাংলার সমস্ত শ্রমিক বোনাসের সাধারণ দাবীতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেন। দাবীর এই অচ্ছেদ্য বন্ধন শুধু যে হিন্দু আর মুসলমান শ্রমিককেই ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া দেয় তা নয়,—লালঝাণ্ডা, সোশ্যালিস্ট, এমন কি কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন জঙ্গী শ্রমিকদেরও টানিয়া আনে মালিকদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টে।

১৯৪৮ সালের কথা একবার স্মরণ করুন। কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘোষিত হওয়ার ৪।৫ মাসের মধ্যেই—যে সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে চলিতেছে অশ্রুতপূর্ব্ব দমননীতি, বোনাসের দাবী নিয়া এক জোরদার লড়াই সুরু হইয়া গেল সারা প্রদেশব্যাপী। ট্রাম, বার্ন, ভার্তিয়া, কেশোরাম, হাওড়া ও হুগলির কাপড় কলগুলি, জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং এবং আরও অনেকগুলি শিল্প ও কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক আই-এন-টি-ইউ-সি ও সোস্যালিস্ট নেতাদের দালালীর বাধা অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মঘট ভঙ্গ ঘেরাওয়ের মধ্য দিয়া বোনাসের দাবীতে এক সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তোলেন।

বোনাসের এই দাবীকে কিন্তু ঈদ ও পূজার জরুরী তাগিদে উদ্ভূত বৎসরান্তের এক মামুলী দাবী হিসাবে দেখিলে চলিবে না। ইহা সমগ্র ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর একটি প্রধান, মূল দাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই নূতন আলোকে ইহাকে বুঝিতে হইবে ও ইহার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

ইহা অন্যতম প্রধান ও মূল দাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে কেন? যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের প্রথম বৎসরগুলিতে (১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চোখে বোনাসের দাবীকে দেখা হইত মামুলী বকশিস হিসাবে—টাটাদের মত মালিকরা ইহা দিত স্বেচ্ছাপরবশ হইয়া অন্যান্য যে সব মালিক প্রচুর মুনাফা লুটিয়াছে তাহারাও কখনও কখনও 'নৈতিক' কারণে বোনাস দিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাকে কখনও সমস্ত শ্রমিকের সাধারণ মূল দাবী বা ন্যায্য অধিকার হিসাবে দখা হয় নাই।

কিন্তু গত পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত কিছুর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়, এমন কি যুদ্ধের পরেও শিল্পপতিরা যে নীতিহীন, বল্গাহীন মুনাফা শিকার করিয়াছে, কোটি কোটি টাকা নির্লজ্জভাবে লুট করিয়াছে, তাহাই এই পরিবর্ত্তনের মূলে। কাপড়, চট, চা, চিনি, কয়লা, লোহা, ইস্পাত এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মুদ্রাস্ফীতিজনিত চড়া দামে কারবার করিয়া এবং শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনতাকে নিরঙ্কুশভাবে শোষণ করিয়া মুনাফার পাহাড় রচনা করিয়াছে।

খোদ ভারত সরকারেরই হিসাব অনুযায়ী শিল্পে কারখানায় লাভের সূচক-সংখ্যা ১৯৩৯ সালে যেখানে ছিল ২৭'৪, ১৯৪৬ সালে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ১৫৯'৪। এক ১৯৪৮ সালেই বোম্বাইয়ের সুতাকল মালিকরা ২০ কোটি টাকা মুনাফা লোটে। কাপড়ের ব্যবসায়ে লাভের সূচকসংখ্যা ১৫৪'৫ (১৯৩৯) হইতে বাড়িয়া ৬৮০'৫ (১৯৪৬)-এ দাঁড়াইয়াছে, পাটে বাড়িয়াছে ১৩'৬ হইতে ৫৮'১, লৌহ ও ইস্পাতে ২৮৯'৩ হইতে ৩২৪'৭ ইত্যাদি।

ইহাকেই ভিত্তি করিয়া বোনাসের দাবী নূতন তাৎপর্য্য ও ন্যায্যতা লইয়া দেখা দিয়াছে। শ্রমিকরা ক্রমশ অধিক সংখ্যায় বুঝিতে সুরু করিয়াছেন যে ইহা কোনো 'বকশিস'-এর প্রশ্ন নয় (এই প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব আজ ধনিকশ্রেণী ও তাহাদের 'জাতীয়' টি-ইউ-সি ও সোশ্যালিস্ট দালালরা ফলাও করিয়া প্রচার করে); যুদ্ধের বাজারে রক্ত-জল-করা পরিশ্রমে তাঁহারা মালিকের জন্য কোটি কোটি টাকা মুনাফার পাহাড় রচনা করিয়াছেন, তাই বোনাসের দাবী তাঁহাদের জন্মগত ও মৌলিক অধিকার।

যুদ্ধকালীন দানবীয় শোষণের ন্যায্য প্রতিদান হিসাবেই ইহা দাবী করেন তাঁহারা। যে ধনিকশ্রেণী বাঁচিবার মতো মজুরি হইতে তাঁহাদের বঞ্চিত করে, চাকুরীর স্থায়িত্ব অস্বীকার করে বোনাসের দাবী সেই ধনিকশ্রেণীরই কাছে। শ্রমিকরা ইহা দাবী করেন, মুদ্রাস্ফীতির বুর্জ্জোয়া নীতি হইতে আত্মরক্ষার আংশিক একটি উপায় হিসাবে, শ্রমজীবী মানুষের রক্তের বিনিময়ে মুনাফা লুটিবার যে নীতি চালু আছে তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে। এই জন্যই এ-আই-টি-ইউ-সি'র সাম্প্রতিক অধিবেশনে বোনাসের দাবীকে মূল দাবীগুলির অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে।

বোনাসের এই দাবীর পরিণতি কি হইতে পারে ধনিকশ্রেণী ও সরকার তাহা বেশ ভালো করিয়াই জানে; তাহারা বোঝে যে, তাহাদের 'মজুরির খরচ' কমানোর নীতির বিরুদ্ধে ইহা একটি আঘাত। সেই জন্যই শ্রমিকদের এই বোনাসের দাবী তাহাদের অর্থ-নৈতিক আক্রমণের একটি প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে 'শিল্পে-শান্তি'

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

রায় মন্ত্রিসভা কায়েম রাখার এই চাল ব্যর্থ করো!

আগামী ছয় মাসের মধ্যে, বিশেষ করিয়া শুধু পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচনের ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য সাধারণ নির্বাচনের আওয়াজ কেন তুলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

দক্ষিণ-কলিকাতা উপনির্ব্বাচনের ফল এবং তাহার পূর্ব্বের ও পরের কয়েক মাসে পশ্চিম বাংলায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জনতার ক্রোধ কংগ্রেসী সরকারকে আতঙ্কিত করিয়াছে, এক পা পিছু হটিতে বাধ্য করিয়াছে।

এই অবস্থায় সাধারণ নির্ব্বাচনের ঘোষণায় কেহ হয়তো ভাবিতে পারেন যে, নেহরু সরকার এবার তাহাদের নীতি পরিবর্ত্তন করিবে। কিন্তু সে কথা মনে করিলে বিষম ভুল হইবে; কারণ কংগ্রেসী সরকারের আচরণে কোথাও সেরূপ সদিচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না। যে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট নীতি অনুসারে এই দুই বছর কংগ্রেসী শাসন চলিয়াছে, তাহার কোনটির বদল হয় নাই। ট্রুম্যান-এটলি-টাটা-বিড়লার শাসন ও শোষণ কংগ্রেসের নামে চলিতেছে। যে রায়মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার জনতার বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছিল, তাহা এখনও সরকারী গদিতে বসিয়া রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলার শ্রমিক, শোষিত কৃষক ও মধ্যবিত্ত—, সমগ্র জনসাধারণ একবাক্যে দাবি করিয়াছে: এখনই রায় মন্ত্রিসভা খতম কর; তাহার জবাবে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের রায় হইয়াছে, দরকার মতো অদলবদল করিয়া এই মন্ত্রিসভাই কায়েম রাখা হইবে।

বস্তুতঃ বিড়লাগোষ্ঠী ও মার্কিন পুঁজিপতিরা কলিকাতার মসনদে রায় মন্ত্রিসভাকেই কায়েম রাখিতে চায়, এতদিন যে শ্রমিকবিরোধী ও শোষিত চাষী-মধ্যবিত্তবিরোধী নীতি চলিয়াছে তাহাকেই অব্যাহত রাখিতে চায় বলিয়া এইরূপ সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

রায় মন্ত্রিসভা ধ্বংস কর—এই আওয়াজের মধ্য দিয়া জনতার সীমাহীন বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছে। এই সাধারণ নির্ব্বাচনের ঘোষণা জনতার অনিবার্য্য দাবির স্বীকৃতি নয়: এই দাবিকে অস্বীকার করিবার জন্যই নেহরু সরকার এই সাধারণ নির্ব্বাচনের ধূম্রজাল রচনা

(শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মাঙ্গল

প্রথম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] ২১শে আগস্ট '৪৯ : ৪ঠা ভাদ্র '৫৬ [তিন আনা

মতামত

* ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্র নেতাদের 'আশ্বাসহীন' বাণী
* পশ্চিম বাংলার মত মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের জেলেও গুলিচালনা ও বন্দীহত্যা
* মার্কিন-নেতৃত্বে প্যাসিফিক যুদ্ধপ্যাক্টের অংশীদার 'নিরপেক্ষ' নেহরু

ধনিকশ্রেণীর "স্বাধীনতা দিবস" ১৫ই আগস্টে এবারও কংগ্রেস এবং লীগ নেতারা নিজেদের সংবাদপত্র ও রেডিও মারফৎ অনেক 'বাণী' প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু খুবই লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই সকল 'বাণীর' মধ্যে কোথাও কোন প্রতিশ্রুতি নাই। অন্যান্য বারের মত এবার তাঁহারা কেহই "রামরাজ্য" বা "ইসলামী রাজ্যের" ছবি তুলিয়া ধরেন নাই।

এবার তাঁহাদের বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে কৈফিয়ৎ ও আত্মরক্ষার চেষ্টাই অনেকখানি। জনগণের হাতে মার খাইয়া তাঁহারা নেহাৎ ভালমানুষ সাজিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বড়লাট রাজাজী বলিয়াছেন: তোমরা আমাদের ডিক্টেটরী শাসন বল কেন? মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা কি আমরা খর্ব্ব করি? এত সমালোচনা না করিয়া আমাদের সহিত সহযোগিতা করিলেই তো পারো?

প্যাটেলজী বলিয়াছেন: যে সকল সমস্যার এখনও কোন সমাধান করিতে পারি নাই, বারবার তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দেও কেন? তোমাদের এরকম একতরফা দৃষ্টি কেন? এখনই তোমরা এত হতাশাচ্ছন্ন হইবার মত কি দেখিলে?

পশ্চিম বাংলার গবর্নর কাটজু সাহেব বয়স্কদের কোন উপদেশ না দিয়া শুধু তরুণদের লক্ষ্য করিয়া 'বাণী' দিয়াছেন। [কারণ তরুণরাই এখানে তাঁহাদের 'স্বাধীনতাকে' একটু বেশী ফাঁস করিয়া দিতেছে]। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের মা এখনও এত দুর্ব্বল যে, তোমাদের সকলকে ভরাপেট খাদ্য দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাহার জন্য তোমরা কেহ হতাশ হইবে না। ইহা সাময়িক দুর্ব্বলতামাত্র।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে সন্তানদের ক্ষুধা শুধু এইটুকু সান্ত্বনায় সন্তুষ্ট হইবে কি? মুন্সীগঞ্জে সেদিনও স্কুলের ছাত্র অনাহারে মরিয়াছে। তাই সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা না করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেব বলিয়াছেন: রোম নগর একদিনে তৈরী হয় নাই। রোম নগর নির্ম্মাণের পশ্চাতে বহু যুগের অশ্রু, ব্যথা, বেদনা ও রক্ত-সঞ্চিত রহিয়াছে।

'রোম নগর' তৈরীর জন্যে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের অনেক অশ্রুপাত করিতে হইবে, অনেক ব্যথা পাইতে হইবে, অনেক রক্ত-ক্ষয় করিতে হইবে। ১৫ই আগস্টে এবার একথা আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু। ঠিক হিটলার-চার্চ্চিলের কায়দায় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন: আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই এখন প্রধান কাজ। হিংসা ও উশৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে।

১৫ই আগস্টের উপযুক্ত বাণী। রাজাজীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা ১৭টি রেডিও স্টেশনের মারফৎ আরও বলিষ্ঠ হোক, কাটজুর নিজের ছেলেমেয়েরা যাহাতে রাজভোগ খাইতে পারে তাহার জন্যে কাটজুর দেশমাতা পশ্চিম বাংলার আশ্রয়প্রার্থী শিশুদের আরো যতদিন খুশী অনাহারে রাখুন, নুরুল আমীনের রোম নগর তৈরীর জন্যে গরীবের আরও অশ্রু ও রক্তপাত হোক এবং নেহরুজীর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুলিসের হিংসা ও উশৃঙ্খলতা দীর্ঘজীবী হোক!

* * *

এতদিন পণ্ডিত নেহরুরা প্রচার করিতেছিলেন, পুলিস শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই গুলি করে। ২৭শে এপ্রিল বিনা-বিচারে বন্দী ভাই-বোনদের অনশনে উদ্বিগ্ন হইয়া কলিকাতার মা-বোনেরা বহুবাজার ষ্ট্রীটে যখন শোভাযাত্রা বাহির করেন তখন সেই শোভাযাত্রার উপর গুলিবর্ষণের সময়ও ঐ কথাই প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি করোনারের তদন্তের রায়ে দেখা গিয়াছে উহা কতখানি মিথ্যা। জুরীরা পরিষ্কারই মন্তব্য করিয়াছেন যে, পুলিস এতখানি বিপন্ন হয় নাই যাহার জন্যে মেয়েদের উপর গুলি চালানোর প্রয়োজন হইতেপারে; লতিকা প্রভৃতিকে খুন করার কোন যুক্তিই তাঁহারা দেখিতে পান নাই।

কিন্তু ইহা কোন নূতন ব্যাপার নয়। টেগার্ট সাহেবরাও যখন বলিতেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই আমাদের প্রধান কাজ—তখন গুলি চালাইবার জন্যে কোন যুক্তির প্রয়োজন হইত না, পুলিসের হিংসা ও উশৃঙ্খলতার জন্যে কোন বাধা ছিল না।

বিনা বিচারে আটক বন্দীদের উপর গুলি চালনায় মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী শাসকরা বিধান-মন্ত্রিসভাকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে চারজন বন্দী নিহত হইয়াছেন, শতাধিক আহত হইয়াছেন। বহুবাজার ষ্ট্রীটে নারীহত্যার সময় কংগ্রেসী শাসকরা যে যুক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন মাদ্রাজ বা সবরমতিতে কি তাহা হইতে কোন ভিন্ন যুক্তি দেওয়া হইতেছে?

মাদ্রাজে গুলিচালনার কৈফিয়ৎ হিসাবে প্রথমে গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রচার করা হয় যে, বন্দীরা পুলিসকে আক্রমণ করিবার জন্যে আগে হইতে প্রস্তুত ছিলেন, বাহির হইতে শত শত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্য হইতে প্রশ্ন উঠিল, আটক অবস্থায় এত অস্ত্র আমদানী করা সম্ভব হয় কি করিয়া? গবর্নমেণ্ট বিব্রত হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, উহা ঠিক নয়। বন্দীরা বাহির হইতে কোন অস্ত্র আমদানী করেন নাই।

* * *

কিন্তু পণ্ডিতজীকে তবু ঘোষণা করিতে হইবে; আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই এখন তাঁহাদের প্রধান কাজ। কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাই দাবী করিতেছে। মার্কিন ডলারের শোষণকে নিরাপদ করার জন্যেই ভারতের শ্রমিক-কৃষক-নওজোয়ানদের বিনাবিচারে আটক রাখিতে হইবে। ভারতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ঘাঁটিকে নিরাপদ করার জন্যেই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকে সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে।

গত মার্চ্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতের বৈদেশিক নীতি এখনো সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে নাই, উহা ধীরে ধীরে রূপ লইতেছে। কমনওয়েলথ সম্মেলনের সময়েও এই ঘোষণার পূর্ণ তাৎপর্য্য যাহাদের চোখে পড়ে নাই, তাহারা এবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনের দিকে তাঁকান। এবারকার সম্মেলনের উদ্যোক্তা স্বয়ং ট্রুম্যান সাহেব। মার্কিন দালাল চিয়াং-কাই-শেক, ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট কুইরিনো, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট রী প্রভৃতি এই সম্মেলনের প্রাথমিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছেন; বেভিন-ক্রীপস সাহেবরা উহার অর্থনৈতিক দিক আলোচনার জন্যে ওয়াশিংটন যাইতেছেন। বর্ম্মার বৈদেশিক মন্ত্রী মার্কিন প্রভুদের নিকট ইতিমধ্যেই রিপোর্ট লইয়া হাজির হইয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ার বিশ্বাসঘাতক হাতার দল ইতিমধ্যেই আত্মসর্পণের দলিলে শেষ স্বাক্ষর লাগাইবার জন্যে ডাচ রাজধানীতে গিয়াছেন। এবার অপেক্ষা শুধু পণ্ডিতজীর জন্যে। কারণ, ট্রুম্যান সাহেবরা এসিয়ার জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে এখন তাঁহাকেই 'নেতা' হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন।

'নিরপেক্ষ' নেহরু আগামী ৭ই অক্টোবর ট্রুম্যান সন্দর্শনে যাত্রা করিতেছেন। গত ১৪ই আগস্ট 'স্বাধীনতা দিবসে'র প্রকালে তিনি তাঁহার কয়েকজন মার্কিন বন্ধু প্রশ্নের উত্তরে [মার্কিন দূত লয় হেণ্ডারসনের উপস্থিতিতে] মন্তব্য করিয়াছেন: এসিয়ার জন্যে আমেরিকা যদি কোন মার্শাল প্ল্যান গ্রহণ করে তবে তো খুব ভালোই হইবে।

মার্শাল প্ল্যান ধনতান্ত্রিক ইউরোপের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বেকার করিয়াছে, উহাকে মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করিয়াছে, উহাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছে। এই মার্কিন যুদ্ধ প্ল্যানের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপের বিক্ষোভ বাড়িতেছে; ইয়োরোপে শোষণের সুযোগ কমিতেছে বলিয়াই মার্কিন প্রভুরা যখন এসিয়ার অনগ্রসর এলাকাগুলির দিকে এখন নজর দিয়াছে, কৃষি প্রধান কাঁচা মালের দেশ হিসাবে উহাকে শোষণ করিবার জন্যে, উহাকে বিপ্লববিরোধী ও সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্যে নূতন প্ল্যান তৈরী করিতেছে। পণ্ডিতজী তাহাকে অভিনন্দন জানাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই সত্য, কিন্তু দেশবাসী এখনই উহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছেন। প্রায় ৭০টি গণসংগঠনের প্রতিনিধি কলিকাতায় সমবেত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন: তাহারা ভারতবর্ষকে মার্কিন যুদ্ধ-ঘাঁটিতে পরিণত হইতে দিবেন না, মার্কিন উপনিবেশে পরিণত হইতে দিবেন না। জনগণের চোখে এই ক্রোধের আগুন দেখিবার পর প্রাধানমন্ত্রী 'আইন ও শৃঙ্খলা' ছাড়া আর কি ভাবিতে পারেন, চীয়াং-কাই-শেক ছাড়া আর কাহার সহিত হাত মিলাইতে পারেন?

* * *

'নিরপেক্ষ' নেহরুজী এখন যেভাবে ট্রুম্যানের ফাঁসকে ভারতের গলায় জড়াইবার জন্যে ওয়াশিংটন ছুটিয়াছেন, 'নিরপেক্ষ' জয়প্রকাশের রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনও এখন তেমনি রেল শ্রমিকদের নেহরু সরকারের ফাঁস গলায় পরাইবার জন্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

৯ই মার্চ্চের রেলধর্ম্মঘটের সময়ে জয়প্রকাশের দল বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস সরকার আপোষে তোমাদের দাবী মানিয়া লইবে, তাহাদের সময় দাও। সেদিন পাটনা ও কলিকতার বক্তৃতায় জয়প্রকাশ পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে, গবর্নমেণ্ট তোমাদের কোন দাবী মানিবে না, তাহারা কথার ফিলাপ করিয়াছে। এখন রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী গুরুস্বামী সেকেন্দ্রাবাদের এক সভায় ঘোষণা করিয়াছেন,: দেশ এখন স্বাধীন, রেলের মালিক গবর্নমেণ্ট, কাজেই ধর্ম্মঘট তো দূরের কথা এমন কি মজুরি প্রভৃতি লইয়া দর কষাকষিও করা চলিবে না, প্রাণপণে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এতদিন এইসকল কংগ্রেসী দালাল 'তৃতীয় পক্ষ' এবং 'নিরপেক্ষ' বলিয়া আত্মগোপন করিতেছিল। এবার ইহাদের সেই ছদ্মবেশ রাখাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

ম্যানাজারের জরুরী নোটিস

গত দুই মাসে 'মজিলে'র এজেণ্টদের কাছে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল ছাড়াই প্রায় ২ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে।

এমন অনেক এজেণ্ট আছেন যাঁহারা টাকা তো পাঠানই নাই, কাগজ রীতিমত পৌঁছিতেছে কি না সে সংবাদটি পর্য্যন্ত জানান নাই।

পাঠক ও পত্রিকার স্থায়িত্ব উভয় প্রয়োজনেই এই গড়িমসী অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। ৩ সপ্তাহ পত্রিকা প্রেরণের পরও কোন চিঠি ও টাকা না পাঠাইলে এখন হইতে পত্রিকা একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

* * * * *

পত্রিকা পাঠক ও দরদী সকলের নিকট হইতেই আমরা রীতিমত চিঠিপত্র ও রিপোর্ট চাই। কারখানার খবর, গ্রামে গ্রামে শোষকদের বিরুদ্ধে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের লড়াই—সবই আমরা চাই, প্রত্যেকটি সংগ্রাম ও তাহার অভিজ্ঞতাই পত্রিকাকে সর্ব্বাঙ্গীন করিবার জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

মজিল

ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে যুদ্ধ চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার আছি

নেহরুর পরপদলেহী নীতি ও কমনওয়েলথ চুক্তির বিরুদ্ধে

বাংলার শান্তিকামীদের ঘোষণা

[বাংলার শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত ঘোষণাপত্রটি প্রচারিত হইয়াছে। এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সর্ব্বভারতীয় শান্তিসম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে কলিকাতায় শান্তিসম্মেলন হইবে।]

দ্বিতীয় মহাসমরের পর চার বছর অতীত না হতেই পুনরায় জগতে যুদ্ধের ডাক শোনা যাচ্ছে। বাংলার শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ খুব ভাল করেই জানেন, কারা দিচ্ছে এবং কেন দেওয়া হচ্ছে এই যুদ্ধের ডাক। বাংলার জনগণের তরফ থেকে আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, আমরা ঘুমিয়ে নেই, আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ হুঁশিয়ার আছি।

জনতাকে শুকিয়ে মারার ফন্দী

আমরা বুঝতে পেরেছি, যুদ্ধের মহড়া শুধু জনসাধারণকে শুকিয়ে মারবার একটা জঘন্য ফন্দী। ভারতে একদিকে যুদ্ধের খরচ হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে জনসাধারণের পেটে অন্ন নেই, পরণে বস্ত্র নেই। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত আজ ছাঁটাই হয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পথে দাঁড়াইয়াছেন। শিল্পের ও কৃষির উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের জন্য ভারত সরকারের হাতে পয়সা নেই, এই রব ওঠে, অথচ যুদ্ধের তোড়জোড় করার জন্য তাঁদের টাকার অভাব ঘটছে না। এটা আমাদের চোখ এড়ায়নি যে ভারতের ধনিকদের ও তাঁদের শাসক-গোষ্ঠী কংগ্রেস সরকারের কাছে আজ এই মানুষ মারার ব্যবসাটাই একমাত্র লাভজনক ব্যবসায়।

সাম্রাজ্যবাদের দোসর নেহরু

আমরা জানি, কাশ্মীরে যুদ্ধ বেধেছে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে। কাশ্মীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ ও আমেরিকা ভারতের সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেওয়ার জন্যই কাশ্মীর যুদ্ধ, তারই জন্য ট্যাক্সের বোঝা বইছে ভারতের জনসাধারণ, প্রাণ দিচ্ছে ভারতের সৈনিক। ইংরেজ বণিক ও ভারতীয় জমিদার ও চেট্টিয়ারদের স্বার্থে নেহরু সরকার এটলি-বেভিন-থাকিনমুর সঙ্গে একজোট হয়ে বর্মায় যুদ্ধ চালাচ্ছেন বর্মী জনগণের বিরুদ্ধে। মালয়ের মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরি কেটে রবার ও টিনের বাজার একচেটিয়া করার জন্য ইংরেজ কোটিপতিরা হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে মালয়ের জনসাধারণের বিরুদ্ধে। এই বর্ব্বর আক্রমণেও অংশগ্রহণ করছে ভারতের ধনিকরা ও কংগ্রেস সরকার। ইন্দোনেশিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে, স্বাধীন ভিয়েটনামের বিরুদ্ধে, ঠিক এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই করছে।

এসিয়ার শান্তি সংগ্রাম

তাই আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যুদ্ধনীতির লক্ষ্য হলো বল-প্রয়োগের দ্বারা জনসাধারণকে শুকিয়ে মারা, ঔপনিবেশিক অতি মুনাফার পথ প্রশস্ত করা, শ্রমিক, কৃষক, জনগণের জীবিকার উপর আক্রমণ করা, এসিয়ার জাতিগুলির স্বাধীনতা অপহরণ করা, এসিয়ার জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়া দেওয়া। বর্মা, মালয়, ভিয়েটনাম ও ইন্দোনেশিয়ার বীর জনগণ সাম্রাজ্যবাদী বদ্ধনীতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করছেন, আমরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা স্পষ্ট ঘোষণা করছি, জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এসিয়া ও সমগ্র জগত চিরস্থায়ী শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের পথে এগিয়ে চলেছে। আমরা আরো ঘোষণা করছি, তাঁদের মুক্তি সংগ্রাম ভারতের জনগণকেও মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মজুরি, চাকুরী, জমি ও জীবিকার জন্যে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতকারী জনগণ যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তা শান্তির সংগ্রাম থেকে অভিন্ন

আমরা জানি, কমনওয়েলথ চুক্তির একমাত্র অর্থ হলো এসিয়ার জনগণের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও থাকিন সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র সিপাহী হিসাবে ভারতকে ব্যবহার করা। আমরা এই হীন আত্মসমর্পণ ও ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করি। আমরা দাবী করি, কমনওয়েলথ চুক্তি ছিঁড়ে ফেলতে হবে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় জনগণের বিরুদ্ধে কোনোরূপ আক্রমণ ও হস্তক্ষেপ ভারতের জনসাধারণ কিছুতেই সহ্য করবে না।

চীনের শান্তির জয়যাত্রা

আমরা গর্বের ও আনন্দের সহিত লক্ষ্য করছি, চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে মাও-সে-তুঙয়ের নেতৃত্বে চীনা মুক্তি-বাহিনী দুই তৃতীয়াংশ চীনকে ইতিমধ্যেই মুক্ত করেছে এবং সমগ্র চীনকে শীঘ্রই মুক্ত করবে। নানকিং-সাংহাই-ক্যাণ্টনের পথেই চিরস্থায়ী শান্তির জন্য পৃথিবীর জনগণের অভিযান জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে। আমরা শান্তিকামী বাংলার জনসাধারণ এই জয়যাত্রাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শান্তি ও মুক্তির সংগ্রাম অভিন্ন

শান্তির জন্য ও গণতন্ত্রের জন্য চীন, ভারত, ভিয়েটনাম, বর্ম্মা ও মালয়ের জনগণ যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, তা শুধু এসিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম নয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির জন্য জগতের সর্ব্বত্র যে অভিযান চলেছে তার থেকে এসিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে আলাদা ক'রে দেখা যায় না। আমরা জানি, শান্তির জন্য পৃথিবীর গণ-শিবিরে যে লড়াই চলেছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার অবিসংবাদিত নেতা। আমরা ঘোষণা করছি, সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তিনীতির প্রতি ভারতের জনসাধারণ পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

শান্তিফ্রন্টের নেতা সোভিয়েট

সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তিনীতির মূল কথা হলো, বিভিন্ন জাতির পূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতার অধিকার, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্যের ও সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির ও রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ পাশাপাশি অবস্থান। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আইন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত ক'রে মানবসমাজকে পশুসুলভ হিংসার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র পথ এই সোভিয়েট শান্তিনীতি। তাই এই শান্তিনীতির পিছনে সমগ্র পৃথিবীর জনগণ, সকল শান্তিপ্রেমিক ও মানবহিতৈষী জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। মানবসভ্যতার পক্ষে এটা একটা অতি বড় আশার কথা।

যুদ্ধ-প্রস্তুতির পথে

আমরা জানি, যারা সভ্যতার, মানবতার, মানবসংস্কৃতির শত্রু তারা প্রতিপদে সোভিয়েট শান্তিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে। ইয়াল্টা ও পটাস্‌ডাম চুক্তিকে পায়ে মাড়িয়ে তারা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে, জোর যার মুলুক তার, এই বন্যপশুর নীতি অবলম্বন ক'রে এসেছে। ইউ-এন্-ওকে ধ্বংস করার জন্য তারা পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অতলান্তিক চুক্তি ইত্যাদি রচনা ক'রে সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধ শিবির রচনা করছে। মেডিটেরেনিয়ন চুক্তি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি ইত্যাদি পরিকল্পনার সাহায্যে তারা এসিয়ার জনগণকে যুদ্ধের মধ্যে জোর ক'রে টেনে নিয়ে কামানের খাদ্যরূপে ব্যবহার করতে চায়। সোভিয়েট রুশিয়ার সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব, এটম বোমার স্তূপ ধ্বংস করার প্রস্তাব, আণবিক শক্তিকে জনসাধারণের মঙ্গলকর, শান্তিপূর্ণ উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করার প্রস্তাব তারা বড়যন্ত্র করে বাতিল করে দিয়েছে। ইউ-এন্-ওর নিরাপত্তা পরিষদে ভিটোর অধিকার যে বিভিন্ন জাতির সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার ও আন্তর্জ্জাতিক শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি এই সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে ভিটোর বিরুদ্ধে নানারূপ বিকৃত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ব ইউরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন ক'র দিয়ে মার্শাল প্ল্যানের আক্রমণের দ্বারা ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবন ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। পশ্চিম জার্ম্মানির ও জাপানের ফ্যাসিস্তদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে পৃথিবীর জনগণের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করার কাজে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

যুদ্ধফ্রন্টের নেতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের গণতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পৃথিবীর যুদ্ধকামীরা যে তৃতীয় মহাসমরের মহড়ায় নেমেছেন, আমরা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ আছি। এই চক্রান্তের লক্ষ্য শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের স্বাধীন জনগণকে শৃংখলাবদ্ধ করা নয়, ভারতের, চীনের ও দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতা, জীবিকা ও জাতীয় সংস্কৃতিও এর দ্বারা বিপন্ন। সমগ্র পৃথিবীতে তাঁবেদার ধনিকদের সাহায্যে একচ্ছত্র মার্কিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই এই যুদ্ধ চক্রান্তের মূল লক্ষ্য। তাই আমরা এই যুদ্ধ চক্রান্ত সম্বন্ধে সকলকে হুঁশিয়ার করতে চাই। এই যুদ্ধচক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'শান্তিনীতি মানিতে বাধ্য করব'

আমরা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করছি, পৃথিবীর সকল ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছে, সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধে তারা অংশ গ্রহণ করবে না এবং বিজয়ী লালফৌজকে তারা অভ্যর্থনা জানাবে। সম্প্রতি প্যারিসে ও প্রাগে ৭২টি দেশের ৬০ কোটি সংঘটিত নর-নারী নিজেদের শান্তি সংগ্রামের সৈনিক বলে ঘোষণা করেছেন।

শুধু শান্তির কথা বললেই শান্তি রক্ষিত হবে না। শান্তির জন্য চাই সদা জাগ্রত দৃষ্টি, শান্তি রক্ষার জন্য ব্যাপক গণসংগঠন ও যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে সবল প্রতিরোধ ও অভিযান। আমরা ঘোষণা করছি, যুদ্ধ চক্রান্তকারীদের শান্তিনীতি মেনে নিতে আমরা বাধ্য করবো।

শান্তি-শিবিরের শক্তি বেশী

জনগণের শান্তি শিবির আজ মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থে গঠিত যুদ্ধ শিবিরের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। জনগণের শান্তি অভিযান যুদ্ধ চক্রান্তকে ব্যর্থ ক'রে দেবে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। যুদ্ধের ত্রাস সৃষ্টি ক'রে জনগণকে বিমূঢ় ও দুর্ব্বল করার হীন প্রচেষ্টাকে আমরা শান্তি প্রচারের দ্বারা নিশ্চয়ই প্রতিহত করবো।

শান্তি-সংগ্রামে অগ্রসর হও

জনগণের ব্যাপক শান্তি অভিযান পৃথিবীকে রক্তপাতের কলঙ্ক থেকে চিরতরে উদ্ধার করবে, সত্যের সিংহাসনকে সুদৃঢ় করবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তার ও স্বাধীন চিন্তার পথে সমস্ত বাধা বিনষ্ট করবে, বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণের কাজে নিযুক্ত করবে, মানবের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অভাবনীয় বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতের জনগণ চিরদিনই শান্তির পথকে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ বলে মেনে নিয়েছে। সেই মহৎ ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখে আমরা বিশ্ব শান্তিকে চোখের তারার মতো সযত্নে পাহারা দেবো এবং তাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করবো। এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে, আমরা শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত, বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিল্পী, মানব হিতৈষী, দেশপ্রেমিক, শান্তিপ্রেমিক, গণতন্ত্রের সমর্থক, সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

৩

২১শে আগস্ট

বাঁচার মত বেতনের দাবীতে

শিক্ষক সম্মেলনে নভেম্বরে 'নমুনা-ধর্ম্মঘট' ও ফেব্রুয়ারীতে 'সাধারণ-ধর্ম্মঘটে'র সিদ্ধান্ত

২৫০০০ মাধ্যমিক শিক্ষকদের পক্ষ হইতে ১৩০০ প্রতিনিধির শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী

৩১শে অক্টোবরের মধ্যে সরকার যদি দাবি পূরণ না করেন তবে স্কুল শিক্ষকেরা সাধারণ ধর্ম্মঘট করিবেন।

গত ১৩ই ও ১৪ই আগস্ট কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের যে বিরাট সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে বাংলার ২৫,০০০ শিক্ষকদের পক্ষ হইতে ১৩০০ প্রতিনিধি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতি হিসাবে আগামী ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষকগণ প্রতীক ধর্ম্মঘট পালন করিবেন এবং "এই প্রতীক ধর্ম্মঘটেও যদি সরকারের চৈতন্যোদয় না হয়" তবে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে দাবী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান জানানো হইয়াছে।

সম্মেলনে শিক্ষকেরা নিম্নতম বেতন দাবি করেন, ১০০৲ হইতে ২০০৲ গ্রাজুয়েটদের জন্য, ২২৫৲ হইতে ২৫০৲ ট্রেইণ্ড শিক্ষকদের জন্য, ১৫০৲ হইতে ৩৫০৲ এবং শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষদের জন্য ২০০৲ হইতে ৪০০৲।

ইহা ছাড়া সরকারী মাগগীভাতা হার অনুযায়ী মাগগীভাতা দিতে হইবে।

বাংলায় প্রায় ২৫,০০০ মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বমূলক এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুই বৎসরের কংগ্রেস শাসনের অভিজ্ঞতা বাংলার দরিদ্র শিক্ষক সাধারণকেও আজ বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। স্বাধীন শিক্ষা, দেশ সেবা, ও জাতিগঠনের যে সকল মহান আদর্শ লইয়া বাংলার শিক্ষকেরা এতদিন দারিদ্র্য সহিয়াছেন, কংগ্রেস শাসনে তাহার প্রত্যেকটিকে বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে। শাসকেরা শুধু শ্রমিক কৃষকের বিরুদ্ধে হত্যাভিযান চালাইতেছেন তাই না, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের জীবনধারণের দাবিকেও পদদলিত করিতে সুরু করিয়াছেন। সরকারে এই শিক্ষা সংকোচ নীতির ফল হইতেছে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল। এই বিল শিক্ষকদের জন্য বেতন পরিবর্ত্তে এই মন্ত্রিসভা নিয়ম করিয়াছেন, ৭০০ ছাত্রের বেশি ছাত্র না হইলে সরকারী গ্রাণ্ট মিলিবে না।

এই শর্ত্তের অর্থ ছোট ছোট বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে গ্রাণ্টের অভাবে উঠাইয়া দেওয়া।

শিক্ষা সম্পর্কে এই সরকারের সবচেয়ে জঘন্য শর্ত্ত হইতেছে, সরকারী গ্রাণ্ট পাইতে হইলে ম্যাট্রিক ছাত্রদের বেতন বাড়াইয়া ৬ টাকা করিতে হইবে।

ইহার অর্থ অধিকাংশ দরিদ্র ছাত্রদের জন্য শিক্ষায়তনের দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। পঃ বঃ সরকারের এই বর্ব্বরসুলভ শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া শিক্ষকেরা দাবী করেন—শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে শিক্ষকেরা উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রস্তাবের পেছনে সমর্থন জানান।

শিক্ষকদের মধ্যে এইরূপ উদ্দীপনা ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি এবং কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০০ শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে স্থানাভাবে দলে দলে শিক্ষককে ফিরিয়া যাইতে হয়। হলের সম্মুখস্থ রাস্তা জনসমাবেশে পূর্ণ হইয়া যায়।

সম্মেলনে শিক্ষকদের প্রতি সমর্থন জানাইয়া বিভিন্ন সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্ররা বক্তৃতা করেন।

ছাত্রদের মাহিনা বাড়ানো প্রতিরোধ ও ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। শিক্ষা আন্দোলনের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষক সকলকে একযোগে আন্দোলনে অগ্রসর হইবার জন্য সম্মেলন হইতে ব্যাপক আহ্বান জানান হয়।

শিক্ষকদের মধ্যে এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী উদ্যোগের সামনে প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলি এবার বিশেষ মুখ খুলিতে পারে নাই। শিক্ষক আন্দোলনকে এতদিন ধরিয়া তাঁহারা নিজেদের কায়েমীস্বার্থের পেছনে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে তাঁহারা নিজেদের মৌরসীপাট্টা বানাইয়া রাখিতেছিলেন।

গত বছর হইতে তাহাদের প্রভাব কমিতে থাকে। গত বৎসর সরকারের মুষ্টি ভিক্ষা মাগগীভাতা প্রত্যাখ্যান করিয়া শিক্ষকেরা ৯ই সেপ্টেম্বর যে প্রতীক ধর্ম্মঘট করেন এই প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, রায়সাহেব হরিদাস গোস্বামী প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন।

সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে এবার তাঁহারা কেহই ঠাঁই পান নাই।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় রায় সম্পাদক এবং শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

২৫শে আগষ্ট 'নিখিল ভারত ছাত্র-দাবী দিবস' পালন করুন

শিক্ষা-সংকোচন ও ফ্যাসিষ্ট শাসনের অবসান চাই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্রী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে:

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র-ফেডারেশনের সম্মেলনে গৃহীত এক আমাদের আবেদন: এই দিন শহরে গ্রামে প্রত্যেক স্কুল-কলেজ সাধারণ ধর্ম্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া নেহরু-প্যাটেল ধনিক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। গণতান্ত্রিক শিক্ষার সমস্ত দাবী আদায়ের জন্য সারা ভারতে ছাত্রদের মিলিত সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য আগাইয়া আসুন।

গত দুই বছরে নেহরু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির আসল চেহারা জানিতে আর বাকী নাই। এই নীতির মূল কথা: "দেশে যে সামান্য শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তাহা হইতেও শ্রমজীবী জনতার সন্তানদের বঞ্চিত কর আর শিক্ষাকে কেবল বড়লোকের মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েদের একচেটিয়া অধিকারে রাখ। আর এই নীতি যাহারা মুখ বুজিয়া মানিয়া লইবে না প্রতিবাদের "দুঃসাহস" দেখাইবে তাহাদের উপর ফ্যাসিস্ট দমননীতির বর্ব্বর অত্যাচার চালাও।"

এই নীতি চালু করিবার জন্যই নেহরু সরকারের পরিচালনায় ভারতের সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসীমন্ত্রীরা ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়াইয়াছে। বোম্বাই শহরে এমন কি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্ররাও এই বেতন বৃদ্ধি হইতে রেহাই পায় নাই। অথচ শিক্ষকদের জীবিকানির্ব্বাহের মত বেতন দিতে কোন প্রাদেশিক সরকারই রাজী নয়। বরং 'রাজনীতি' করার অজুহাতে এক মালাবারেই দুই হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে ছাঁটাই করা হইয়াছে।

টেষ্ট পরীক্ষার নামে হাজার হাজার ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও হাজার হাজার ছাত্রকে জোর করিয়া ফেল করান হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই আই-এস-সি পরীক্ষাতে এবার শতকরা ৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ফেল করান হইয়াছে।

অতিসহজেই কেবলমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী যাহাতে শিক্ষালাভ না করিতে পারে তাহার জন্য অধিকাংশ প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার এবং সর্ব্বত্র উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষা এখনো বজায় আছে, তাহার উপর বাঙ্গালী, মারাঠী, উড়িয়া ও আসামী প্রভৃতি সমস্ত ভাষাভাষীদের উপর জোর করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দী ভাষা চাপানর আয়োজনও নেহরু সরকার সুরু করিয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মুখে কুঠারাঘাত করার ষড়যন্ত্র করা হইতেছে।

পশ্চিম বাংলায় প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভার আমল হইতে সুরু করিয়া শিক্ষা ও ছাত্র-জীবনের উপর নিত্যনূতন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ চলিতেছে। এই বছরের নূতন সেসনে শুধু কলিকাতাতেই যাদবপুর কলেজের সিট ৬০০ হইতে কমাইয়া

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিল

পূর্ব্ববাংলায়

২৫শে আগস্ট 'ছাত্রদাবী দিবস পালন করুন'

পূর্ব্ব বাংলা ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার ছাত্রদের শিক্ষা ও আর্থিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আক্রমণের পর আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে। হিটলারী কায়দায় ছাত্র বহিষ্কার করিয়া, শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করিয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক-একটি কয়েদখানায় পরিণত করিয়াছে। বড়লোকদের স্বার্থের খাতিরে শতকরা ৫০ ভাগ প্রাথমিক স্কুল তুলিয়া দিয়াছে, ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছে, শিক্ষকদের অভুক্ত রাখিয়াছে। পরীক্ষার পাশের হার কমাইয়া লীগ সরকার শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। ভাত কাপড় না দিয়া এবং উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে গুলি চালাইয়া লীগ সরকার দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করিতেছে।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে এখনই তীব্রভাবে রুখিয়া দাঁড়াইয়া সংগ্রাম চালানো দরকার, শিক্ষা ভাত-কাপড় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী লইয়া সমগ্র ছাত্র সমাজ আগাইয়া আসুন। সারা পূর্ব্ব বংলায় ২৫শে আগস্ট স্কুল-কলেজ ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রা করিয়া আওয়াজ তুলুন—ইস্পাহানী-দাদা-হানিফদের দালাল সুরুল আমীন মন্ত্রিসভার কুশাসনের অবসান চাই।

ধার্য্য করিয়াছে মাত্র ৫০।৮০ টাকা অথচ একই সঙ্গে শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য হেড মাস্টারদের তুলনায় অনেক বেশি বেতন দিতেছেন ১৫০-৪০০ টাকা।

শিক্ষাকে সাধারণের করায়ত্ত করার প্রস্তাবে আগামী ২৫শে আগস্ট বৃহস্পতিবার সাধারণ ধর্ম্মঘটের মধ্য দিয়া "নিখিল ভারত ছাত্র দাবী দিবস" পালনের জন্য আহ্বান জানান হইয়াছে।

বাংলার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে

জাতীয় স্বাধীনতার শত্রু কংগ্রেস ও নেহরু সরকার

১৫ই আগষ্টে ক্রমবর্দ্ধমান মোহমুক্তি ও বিক্ষোভ

শ্রমিক, ছাত্র, বাস্তত্যাগী ও ব্যাপক জনসাধারণের এক বিরাট অংশ গত ১৫ই আগস্ট 'স্বাধীনতা' দিবসকে ধিক্কার দিয়া সমাবেশ ও মিছিল বাহির করেন।

খাস কলিকাতার উপরে বি-পি-টি-ইউ-সি, ছাত্র, বাস্তত্যাগী এবং বিভিন্ন বামপন্থী জমায়েতে যত লোক এই দিন প্রতিবাদ ঘোষণা করেন, তাহাদের সংখ্যা ২৫।৩০ হাজার ছাড়াইয়া যাইবে।

কংগ্রেস এবং সরকার এই সকল জমায়েত সহ্য করিতে পারেন নাই। 'নেশনের' এক সংবাদে প্রকাশ, বজবজের সন্নিকটস্থ বুরুল গ্রামে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করিয়া সরকার ১৫ই আগস্টের 'মর্য্যাদা' অক্ষুণ্ণ রাখেন।

কিন্তু গুলি ও গুণ্ডামী অস্বীকার করিয়া এই ২৫।৩০ হাজার মানুষ কংগ্রেসকে ও নেহরু সরকারকে ধিক্কার দিয়াছেন জাতীয় স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া।

যত খারাপই হউক কংগ্রেস নেতারা 'জাতীয় স্বাধীনতা' অন্তত আনিয়াছেন, এই মোহও জনসাধারণের মন হইতে দ্রুত কাটিতে সুরু করিয়াছে।

তাই একদিকে যেমন কংগ্রেস, মিল মালিক এবং সরকার পক্ষ হইতে প্রভাত ফেরী, মিলিটারী প্যারেড ও জাঁকজমকের মহড়া চলিয়াছে ঠিক তখন অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ জনতার কণ্ঠে ধ্বনি উঠিতেছিল—এ আজাদী ঝুটা হায়, কমনওয়েলথ ফাঁস ছিঁড়িয়া ফেল।

দুই বৎসরের কংগ্রেসী স্বাধীনতার পরখ করার ফলে দ্বিধাগ্রস্ত গৃহস্থেরা যখন নিরানন্দ ভাবে গৃহে পতাকা উত্তোলন করিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন, তখন অন্যদিকে হঠাৎ মিছিল বাহির হইতেছিল লালঝাণ্ডা লইয়া, সংগ্রামের ঘোষণা লইয়া।

সকাল হইতেই এই বিক্ষোভেরই প্রকাশ দেখা যায় বিভিন্ন স্কুলে ও কলেজে, চারুচন্দ্র কলেজে তেরঙ্গা পতাকা তুলিতে গিয়া ছাত্রদের আপত্তিতে অধ্যাপককে নিরস্ত হইতে হয়। মহামানব স্কুলের ছাত্ররা তোলেন ছাত্র পতাকা। যাদবপুর কলেজে, সিটি কলেজ হোস্টেলে কৃষ্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। আর হঠাৎ দেখা যায় রাসবিহারী এভিনিউর ল্যাম্প পোস্টগুলি লালঝাণ্ডায় ছাইয়া গিয়াছে। শহরের দেয়ালগুলি অসংখ্য প্রতিবাদী পোস্টারে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সকাল হইতেই কলনওয়েলথ ফাঁস ছিঁড়িয়া ফেল—এই ধ্বনিতে কালো পতাকা লইয়া ছাত্রছাত্রীর মিছিল সুরু হয় যাদবপুরে, বেহালায়, উত্তর কলিকাতায়, প্রত্যেকটি অঞ্চলেই মিছিলের দুইপাশে জনতা ভিড় করিয়া আসে। সায় দেয় মিছিলের সংগ্রামী ধ্বনিতে। বুঝিতে চাহে—কংগ্রেসী সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী এবং জাতীর স্বাধীনতার শত্রু হইয়া পড়িয়াছে কেমন করিয়া।

শ্রমিক এলাকায়

শুধু কলিকাতা নয়, বিক্ষোভ জাগিতেছিল শ্রমিক অঞ্চলেও। 'স্বাধীনতা' দিবসের প্রাক্কালেই কলিকাতাএবং শহরতলীতে ধর্ম্মঘট চালাইতে ছিলেন অন্ততঃ ২০,০০০ শ্রমিক।

গৌরীপুর হাজিনগরে একটি বিরাট শ্রমিক মিছিল লালঝাণ্ডা লইয়া সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

শিবপুরের কয়েকটি গৃহে কৃষ্ণ পতাকা উড়িতে দেখা যায়। ছাত্র ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে শ্রমিক-ছাত্র-নাগরিকের একটি বিরাট মিছিল শিবপুরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে ও মোড়ে মোড়ে কয়েকটি পথ সভা করে।

যাদবপুর, বেলেঘাটা, ইছাপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলেও সভা ও মিছিল বাহির হয়। কাঁকিনাড়া চটকল অঞ্চলে যে প্রচার দল বাহির হয় তাহাতে সমস্ত এলাকায় সাড়া পড়িয়া যায়।

মহম্মদ আলী পার্কে

মনুমেন্টের ময়দানে কংগ্রেস এক বিরাট সমাবেশ করিতে সক্ষম হয় সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে ঐদিন বিকালে কলিকাতায় এমন একটি পার্ক ছিল না যেখানে দলে দলে সংগ্রামী মানুষ জমায়েৎ না হইয়াছেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, দেশপ্রিয় পার্ক, হাজরা পার্ক, পার্কসার্কাস ময়দান—প্রত্যেকটি পার্কেই কোন না কোন বামপন্থী, বাস্তত্যাগী বা কংগ্রেস বিরোধীদের উদ্যোগে স্বাধীনতাকামী গণতান্ত্রিক জনসাধারণ প্রতিবাদ জানাইতে গিয়াছেন; তাঁহাদের মোট সংখ্যা ২৫।৩০ হাজারকেও ছাড়াইয়া যাইবে।

এই বিভিন্ন সমাবেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে মহম্মদ আলী পার্কের জমায়েৎ।

বি-পি-টি-ইউ-সি, ছাত্রফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে এখানে শ্রমিক, ছাত্র, মহিলা ও কৃষক জনসাধারণের এক বিপুল সমাবেশ হয়। সভায় আসেন সোনারপুর, ভাঙ্গর প্রভৃতি এলাকা হইতে সংগ্রামী কৃষকদের একটি বাহিনী। কলিকাতার বস্তী অঞ্চল হইতে আসেন শ্রমিক নওযোয়ান লীগের মিছিল। টালিগঞ্জ এলাকা হইতে আসে ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিকেল প্রভৃতি শ্রমিকদের একটি বড় মোর্চ্চা।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক-নেতা রহিম

ছাত্রনেতা অজয় ঘোষণা করেন, কংগ্রেস নেতারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শত্রু। কমনওয়েলথ চুক্তি করিয়া তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের গোলাম বানাইয়াছেন, আমেরিকার যুদ্ধবাদীদের কাছে তাঁহারা ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গিয়াছেন। প্যাসিফিক চুক্তির চক্রান্ত মারফৎ তাঁহারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া ও ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনকে দমন ও সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

সভায় শিবপুর ও মেটিয়াবুরুজের শ্রমিকেরা বক্তৃতা করেন।

দেশের জনতার পক্ষে ১৫ই আগস্ট যে গুলিবর্ষণ, অনাহার, বেকারী ও দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া জনৈক বক্তা ঘোষণা করেন, আজ এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠার দিন আসিয়াছে যেখানে ছাঁটাই বেকারী দুর্ভিক্ষ নির্য্যাতন থাকিবে না।

সভাশেষে লালঝাণ্ডা লইয়া আধ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট শোভাযাত্রা রাস্তার হাজার হাজার মানুষের নিকট এই সংগ্রামী ঘোষণা পৌঁছাইয়া দিতে থাকেন। মিছিল হইতে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠে 'কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করো' 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' 'কমনওয়েলথ ফাঁস ছিঁড়ে ফেল' 'নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা ধ্বংস হোক!'

ভারতীয় পরাধীনতার একটি প্রতীক মূর্ত্তি, চার্চ্চিলের কোলে কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহরু—বিরাট উৎসাহ সহকারে দাহ করা হয়।

দুই পাশে রাস্তার লোক বারেবারে মিছিলটিকে অভিনন্দন জানাইতে থাকে। ঝাণ্ডা লইয়া স্বাধীনতা দিবস পালন করিতে বাহির হইয়াছেন এইরূপ লোকেও সরকারবিরোধী ধ্বনিতে সাড়া দিতে থাকেন।

বৌবাজার, শিয়ালদহ, হ্যারিসন রোড, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া মিছিলটি আজাদ হিন্দ বাগে শেষ হয়।

কৃষক অঞ্চলে

১৫ই আগস্ট উপলক্ষে কৃষক অঞ্চলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়।

বুরুলে দুই শতাধিক ছাত্র-কৃষকের একটি মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

হাওড়ার মুগকল্যাণ এবং বর্দ্ধমান হইতেও বিক্ষোভ যাত্রার সংবাদ আসিয়াছে। বাগনান থানার সম্মুখে কালো পতাকা উড়ে। মুগকল্যাণের মিছিলে ধ্বনি উঠে, কৃষকদের হাতে জমি চাই।

পুলিস ও কংগ্রেসীদের গুণ্ডামী

স্বাধীনতাকামী গণতান্ত্রিক জনসাধারণের এই বিক্ষোভ সরকার ও কংগ্রেস সহ্য করিতে পারে নাই।

বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিস ও কংগ্রেসীদের নেতৃত্বে গুণ্ডামীর খবর পাওয়া যাইতেছে।

সবচেয়ে নৃশংস আক্রমণ হয় বুরুলে। কৃষক ও ছাত্র বিক্ষোভের জন্য এই অঞ্চলটি পূর্ব্ব হইতেই পুলিসজুলুমের একটি লক্ষ্যস্থল, এই দিনের মিছিলের উপর পুলিস গুলিবর্ষণ করে। জনতা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে থাকেন।

গুলিবর্ষণের ফলে কতজন হতাহত তাহার সংবাদ এখনো পাওয়া যায় নাই।

হাওড়া ময়দানে ছাত্র কংগ্রেসের একটি সম্মেলনের উপর জাতীয় টি-ইউর পক্ষ হইতে হামলা করা হয়। পুলিস আসিয়া জাতীয় টি-ইউর লোকদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্ত্তে সম্মেলনকে নিবিদ্ধ করেন। মহম্মদ আলী পার্কের নিকট হইতে জনৈক পত্রিকা বিক্রেতাকে পুলিস গ্রেপ্তার করে।

বেলেঘাটায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া মিছিল বাহির হইলে কংগ্রেস অফিস হইতে একদল গুণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করে ও বোমা ছোড়ে।

ইছাপুরে জাতীয় টি-ইউর পক্ষ হইতে বিক্ষোভকারীদের উপর হামলার চেষ্টা হয়।

মুগকল্যাণে ছাত্র-মহিলাদের মিছিল কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ পরিচালিত সেবাদলের গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণের ফলে প্রগতিলেখক শচীকান্ত ঘোষ, গণনাট্য সঙ্ঘের মৃণাল ঘোষ, ছাত্রী লীলা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গুরুতরভাবে আহত হন। আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া শোভাযাত্রাটি বাজার ও ৮।১০ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে, কৃষক এলাকায় যায় ও সভা করে।

সমাজবিরোধী শক্তিগুলিকে শায়েস্তা করার ভার 'জনসাধারণকে' লইতে হইবে, এই কথার আড়ালে পণ্ডিত নেহরু গত ময়দানে যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, এই ভাবেই তাহা কংগ্রেস, পুলিস ও সেবাদলের সংগঠিত গুণ্ডামীর রূপ লইয়াছে।

কমিউনিস্ট জমায়েত তো বটেই অন্যান্য বামপন্থী ও কংগ্রেসবিরোধী জমায়েতও তাহাদের আক্রমণ হইতে বাদ যাইতেছে না।

অন্য উপায়ে জনতাকে টানিতে না পারিয়া তাহারা প্রাদেশিকতা উস্কাইবার চেষ্টা করিতেছে।

মনুমেন্টের নীচে কংগ্রেস সমাবেশে শহরের ও শিল্পাঞ্চলের প্রচুর অসংগঠিত সাধারণ শ্রমিক গিয়াছিলেন। তাঁহারাও ছাঁটাই হইতেছেন বেতন কমিতেছে বাসস্থান পাইতেছেন না।

কিন্তু ১৫ই আগস্টের দিন দেখিলেন পরিচিত জুলুমবাজ মিল মালিকেরাই আজ ছুটি দিতেছেন, ট্রাকের বন্দোবস্ত করিতেছেন। দেখিলেন চেনা দালালরাই হাতের মুঠে টাকা লুকাইয়া মাতব্বরী করিতেছে।

নেতারা যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে ভাতকাপড় মিলাইবার প্রতিশ্রুতির বদলে আহ্বান শুনিলেন বিভেদের ও গুণ্ডামীর।

ইহা তাহাদের মোহ মুক্ত করিতেই সাহায্য করিবে।

এই বিভেদ ও গুণ্ডামী প্রতিরোধ করিয়া জনসাধারণের সংগ্রামী শিবির শক্তিশালী করিবার সঙ্কল্প ১৫ই আগস্ট দিকে দিকে ঘোষিত হইয়াছে।

২১শে আগস্ট

৫০ হাজার সরকারী কর্ম্মচারীর উপর ছাঁটাইর উদ্যত খড়্গ

নেহরু সরকার কর্ত্তৃক হাজার রকমের বেতন কাটা ও শ্রমচুরির অকথ্য অত্যাচার

নেহরু সরকার সম্প্রতি শাসন বিভাগের "সংস্কারে" হাত দিয়াছেন। তাহাদের নিযুক্ত একটি কমিটি রায় দিয়াছেন যে শাসন বিভাগের খরচ কমাইতে হইবে এবং যোগ্যতা বাড়াইতে হইবে।

খরচ কমানোর জন্য কি রাজাগোপালাচারী কিম্বা বিদেশী দূতাবাসগুলির অনর্থক খরচ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে? যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য কি অপদার্থ আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটানোর প্রস্তাব করা হইয়াছে? মোটেই নয়।

খরচ কমাও এবং যোগ্যতা বাড়াও এই বুলির আড়ালে সরকার ৫০ হাজার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করিয়া অনশন ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিবার জন্য নেহরু সরকার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।

ইতিমধ্যেই অর্ডন্যান্স ডিপোর মোট দশ হাজার কর্ম্মচারীর ছাঁটাইয়ের হুকুম লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্ডন্যান্স ডিপোর এই ব্যবস্থা শীঘ্রই যে অন্য সমস্ত অফিসে চালু করার চেষ্টা হইবে—তাহা সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন।

কলিকাতার আয়রন স্টীল কণ্ট্রোল অফিসে মোট ৭ শত কর্ম্মচারীর মধ্যে প্রায় দুই শত জনের এবং সেণ্ট্রাল স্টেশনারী অফিসের এক হাজার কর্ম্মচারীর একটা বিরাট অংশকে ছাঁটাই পরিকল্পনা তৈরী।

কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং স্টাটাস্টিকস্-এর পুরা ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টটাই তুলিয়া দিবার শলাপরামর্শ চলিতেছে।

ঘুরাইয়া ছাঁটাই

ছাঁটাই করার নানারকম ফন্দীও আবিষ্কৃত হইতেছে।

টী কণ্ট্রোল অফিসে ৩শত কর্ম্মচারী কাজ করেন। টী এ্যাক্সপানসন বোর্ডের সঙ্গে সরকারের যে চুক্তি তাহার মেয়াদ এই আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই ফুরাইবে। ভারত সরকার সম্ভবতঃ নূতন করিয়া আর চুক্তি করিবেন না। ফলে তিনশত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের ভাগ্যে আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যত অপেক্ষা করিতেছে।

সম্প্রতি স্টোরসের ১৬জন কর্ম্মচারীকে কলিকাতা হইতে বজবজে ডিপোতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বজবজের অস্থায়ী ডিপোটি আগামী মাসে কাজ গুটাইলে, এই ১৬ জন কর্ম্মচারীরও কাজ ফুরাইবে।

আক্রমণের প্রস্তুতি

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীরা সংঘবদ্ধভাবে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে যে গৌরবদীপ্ত সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, তাহার এবং বর্ত্তমানের দেশজোড়া বিক্ষোভের মুখে কর্ম্মচারীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ভয়ে 'পরিকল্পনা বা স্কীম' ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও সরকার ব্যাপক ছাঁটাই করিতে সাহস করিতেছে না। কিন্তু চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্ব্বে ছোট ছোট আক্রমণ করিয়া তাহারা কর্ম্মচারীদের বাজাইয়া দেখিতেছেন।

আমেরিকান সাপ্লাইজ স্টোরে প্রতি মাসেই দুই চারিজন করিয়া ছাঁটাই হইতেছে। এই আগস্ট মাসের প্রারম্ভে এই অফিসে ৬২ জন কর্ম্মচারীকে জবাব দেওয়া হইয়াছে। 'স্টোরস' এবং 'স্টোরস একাউণ্টস্এ' বয়সের কিম্বা অযোগ্যতার অজুহাত দেখাইয়া ইতিমধ্যে ৪জনকে ছাঁটাই করা হইয়াছে। 'আয়রন স্টীল অফিসে' গত মাসে ৬ জনকে ছাঁটাই করা হইয়াছে। নেহরু সরকারের এই যে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা কি এই জন্য যে অফিসে অফিসে লোক বাড়তি হইয়া গিয়াছে। বরঞ্চ ঠিক তাহার উল্টা। একটি দৃষ্টান্ত ধরুন।

'কমার্স ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীরা গত ৭।৮ মাস যাবৎ তাহাদের এরিয়ার বিল পাইতেছেন না। কারণ? অফিসে স্টাফের নিদারুন অভাব যে বিল লেখার জন্য কাহাকেও পাওয়া যাইতেছে না। সমস্ত অফিসেই প্রায় ঐ একই অবস্থা।

শ্রম-চুরির নির্লজ্জ ব্যবস্থা

স্টাফের এই অভাব কর্ম্মচারীদের এই সংখ্যাল্পতা দূর করার ব্যবস্থা হইয়াছে কি ভাবে? পুঁজিপতিদের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই পুঁজিপতিদের তাহাদের খাটুনির সময় বাড়াইয়াও সরকারের সন্তুষ্টি হইতেছে না। পুলিস ও সৈন্যদলের কোটী কোটী টাকা খরচ যোগাইতে হইবে, নেহরুর ভগ্নী এবং আত্মীয়-স্বজনকে পুষিতে হইবে। রাজা-রাজরাদের লাখ লাখ টাকা সেলামী দিতে হইবে, ডলার প্রভুদের মোটা মোটা টাকার দাবী মিটাইতে হইবে। তাই তাহারা সোজা পথ ধরিয়াছেন।

তাহারা কর্ম্মচারীদের পকেট কাটিতে সুরু করিয়াছেন। নানারকম উপায়ে কর্ম্মচারীদের মোট মাহিনার উপর তাহারা নির্লজ্জ আক্রমণ সুরু করিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি ছাড়াও, মালিক-সরকার এমন সব ফন্দীফিকির করিয়াছেন এবং করিবার ফন্দী আঁটিতেছেন, যাহার ফলে একটি বিরাট অংশের কর্ম্মচারীর মোট বেতনেও একটি অংশ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এবং শীঘ্রই আরও বেশী কমিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

পে-কমিশনের রায় অনুযায়ী নূতন পে-স্কেলে কর্ম্মচারীদের মাহিনা এমনভাবে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে কলিকাতার প্রায় ১০ হাজার কর্ম্মচারীর ইনক্রিমেণ্ট তিন হইতে দশ বৎসরের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

'একাউণ্টস' অফিসগুলিতে প্রতি টাইপিস্ট ১০ টাকা করিয়া একটি এলাওয়েন্স পাইতেন—সরকার নূতন হুকুম জারি করিয়াছেন: ঐ দশ টাকা আর দেওয়া হইবে না।

বেতন কাটার আর এক কায়দা

বাড়ী ভাড়ার রসিদ দাখিল করার নির্দ্দেশ—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সরকার কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীর সময় আরও বাড়াইয়া দিয়া, তাহাদের শ্রমশক্তিকে নির্লজ্জ-ভাবে শোষণ করিয়া এই অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

'মিলিটারী একাউণ্টস্' অফিসে গত এপ্রিল মাস হইতে কাজের সময় বিকাল ৪।টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। জুন মাস হইতে 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' অফিস ও 'একাউণ্টস্ অফিসে' ওভার টাইম খাটান হইতেছে, কিন্তু তাহার জন্য কোন বিশেষ মজুরি দেওয়া হয় না। কর্ম্মচারীদিগকে ছুটির দিনে স্লিপ পাঠাইয়া বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিয়া কাজ করান হয়।

অমুখবিসুখের ছুটি দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 'ডি, এ, জি, পি এণ্ড টি, ডিপার্টমেণ্টে' এক ভদ্রলোককে অসুস্থ অবস্থায় অফিসে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। অফিসে যোগদানের মাত্র তিন দিনের মধ্যে ভদ্রলোক মারা যান। ছুটি-ছাটার সুযোগ-সুবিধা তো দূরের কথা, অধিকারের ছুটির উপরও এইভাবে আক্রমণ সুরু হইয়াছে।

গলাকাটা সরকার

হাজার হাজার যুবককে ছাঁটাই করিয়া পক্ষ হইতে কর্ম্মচারীদের বেতন কাটার জন্য এই নূতন অস্ত্র প্রয়োগ চালু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কলিকাতায় কত কর্ম্মচারী সাব-টেনেণ্ট হিসাবে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকেন, অনেকে যৌথ পরিবারে বাস করেন তাহারা বাড়ী ভাড়ার রসিদ দাখিল করিতে পারিবেন না—সরকার ইহা জানেন। "রসিদ দাখিল করিতে পার নাই—অতএব বাড়ী ভাড়া দেও না—কাজেই বাড়ী ভাড়া বাবদ টাকাও তুমি পাইতে পার না।" নির্লজ্জ আবরণহীন এই যুক্তি তুলিয়াছেন ভারত সরকার।

নেহরু সরকারের এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের স্বরূপ হাজার হাজার কর্ম্মচারীদের মনে দিনের আলোকের মতন ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে নেহরু সরকার একবার ইহাদের ব্যাপক ছাঁটাই করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দীর্ঘ ১ মাস রক্তক্ষয়ী অপূর্ব্ব সংগ্রামের মধ্য দিয়া সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী সেদিন নেহরুর সেই আক্রমণের উত্তর দিয়াছিলেন। স্বয়ং নেহরু সরকার আজও সংগ্রামের ভয়ে ভীত দ্বিধাগ্রস্ত। এই সংগ্রামের স্মৃতি তাহার ঐতিহ্য কর্ম্মচারীরা কখনও ভুলিতে পারে না।

আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

নেহরু সরকারের ছোট ছোট এই সমস্ত আক্রমণ যে বিরাট ও সর্ব্বব্যাপী আক্রমণের পূর্ব্বাভাস তাহা কর্ম্মচারীরা বুঝিতে ভুল করেন নাই। তাই প্রত্যেকটি ছোট ছোট আক্রমণকে তাহারা সাধ্যমত বাধা দিয়াছেন তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা। অনেক ক্ষেত্রে নেহরুকে পিছনে হটিতে বাধ্য করিয়াছেন।

'অর্ডন্যান্স ডিপোর' কয়েকজন শ্রমিক ও কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে ১৭ই আগস্ট কানপুরে ৫ হাজার কর্ম্মচারী হরতাল করিয়া কাজ ছাড়িয়া আসিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের দাবী

(১) সমস্ত কেরানীদের জন্য সর্ব্বনিম্ন মূল বেতন ১২৫ টাকা. নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য সর্ব্বনিম্ন ৮০ টাকা।

(২) মূল্য-সূচী অনুযায়ী মাগগীভাতার ব্যবস্থা এবং মাসিক ৫ টাকা শিক্ষা ভাতা।

(৩) ছাঁটাই চলিবে না।

(৪) এক বৎসরের চাকুরীর পরেই স্থায়ী কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৫) ছাঁটাই এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে যাঁহাদের বরখাস্ত করা হইয়াছে, তাঁহাদের পুনর্নিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) ট্রেড ইউনিয়নের পূর্ণ অধিকার চাই।

১৯৪৮ এপ্রিলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে ৫০ হাজার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী

আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

নেহরু সরকারের ছোট ছোট এই সমস্ত আক্রমণ যে বিরাট ও সর্ব্বব্যাপী আক্রমণের পূর্ব্বাভাস তাহা কর্ম্মচারীরা বুঝিতে ভুল করেন নাই। তাই প্রত্যেকটি ছোট ছোট আক্রমণকে তাহারা সাধ্যমত বাধা দিয়াছেন তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা। অনেক ক্ষেত্রে নেহরুকে পিছনে হটিতে বাধ্য করিয়াছেন।

'অর্ডন্যান্স ডিপোর' কয়েকজন শ্রমিক ও কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে ১৭ই আগস্ট কানপুরে ৫ হাজার কর্ম্মচারী হরতাল করিয়া কাজ ছাড়িয়া আসিয়াছেন।

সারা ভারতে 'অর্ডন্যান্স ডিপোর' শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা ষ্ট্রাইক-ব্যালট নিয়া ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

এপ্রিল মাসে 'কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্টস ডিপার্টমেণ্ট' তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐ অফিসে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। তিন দিন পর পর ডিরেক্টর জেনারেলকে ঘেরাও করা হয়। ফলে ডিপার্টমেণ্ট তুলিয়া দিবার পরিকল্পনা তখনকার মত বাতিল হয়।

'স্টোরস্' এবং 'স্টোরস্ একাউণ্টস্'-এর কয়েকজনকে গত এপ্রিল মাসে ছাঁটাই করা হয়। কর্ম্মচারীরা এমন হল্লা সৃষ্টি করেন যে, ৭ জন ছাঁটাই কর্ম্মচারীকে পুনরায় কাজে বহাল করা হয়।

স্টেশনারী অফিসের 'কনটিনজেন্সী' স্টাফের লোকদের ৩০ টাকার বদলে ২৫ টাকা মাহিনা দিবার ব্যবস্থা হইলে তাঁহারা বেতন ধর্ম্মঘট করেন। ফলে তখুনি পুরা-তন মাহিনার হার চালু হয়:

সেন্ট্রাল এক্সাইজে এক 'প্রমোশন কমিটি' বসান হয়। প্রমোশনের কমিটির আসল কাজ ছিল অবশ্য যোগ্যতার অজুহাতে পদাবনতির এবং সম্ভব হইলে ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করা। সমস্ত সেন্ট্রাল

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিল

কাঁচড়াপাড়া রেল কারখানায়

বাড়তি খাটুনির বিরুদ্ধে জয়যুক্ত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ

কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কসপ....সাড়া পড়ে গেছে রেল শ্রমিকদের মধ্যে। গেটে গেটে পোস্টার পড়েছে—নতুন ধরনের পোস্টার; শ্রমিকের হাতে লেখা সংগ্রামের ডাকের পোস্টার। প্রত্যেক শপ থেকে ১০০।২০০ করে শ্রমিক এসে ভীড় ক'রে পোস্টার পড়ছেন; অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের কাছ থেকে জিগ্যেস করে নিচ্ছেন পোস্টারে কি কি লেখা আছে; সকলেই নিজেদের ভাবায় দেওয়ার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন।

পোস্টারে কি লেখা আছে?

অনেকগুলো পোস্টার। একখানায় একজন রেল শ্রমিক তাঁর স্ত্রীকে আসন্ন সংগ্রামের অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছেন—

"কর্তৃপক্ষের জুলুম চরমে পৌঁচেছে। এখন আমাদের কাছে দুটি পথ খোলা আছে—স্ত্রী আছে, আমদানী-আত্মসমর্পণ। আমি তো দাস। ....নই....তাই তুমি জেনে সুখী হবে যে আমি সংগ্রামের পথ-ই বেছে নিয়েছি........।"

এর জবাবে আর একখানা পোস্টারে স্ত্রী তার স্বামীকে লিখেছেন—

"তোমার চিঠি পেয়ে গর্ব্বে আমার বুক ভরে গিয়েছে। তোমরা যদি আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিতে তবে লজ্জায় ও দুঃখে আমি মরে যেতাম। ....সংগ্রামের সিদ্ধান্তে তোমরা অবিচলিত থাকবে এবং তোমরা জয়ী হবে। এ ছাড়া আর কি আশা করতে পারি? তোমাদের বীর হাত দালাল মেরে কলঙ্কিত ক'রো না। দালালদের নাম আমাদের কাছে পাঠিও। আমরা মেয়েরাই তাদের শায়েস্তা করবো।"

আর একখানা পোস্টারে **মা তাঁর ছেলেকে লিখেছেন**—"তোমাদের সংগ্রামের কথা জানলাম। তোমরা আমাদের বীর সন্তান—তোমাদের সিদ্ধান্ত বীরোচিত হয়েছে। বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী আমার প্রত্যেকটি সন্তানকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি—জয় অবশ্যই তোমাদের হবে। শুনলাম তোমাদের মধ্যে কেউ নাকি শনিবার ১১॥০ টায় না বেরিয়ে ১২॥০ টায় বেরুতে চায়। তা কেন? অমানুষিক খাটুনী খেটে ক্লান্ত দেহে তোমরা যখন অবসন্ন হয়ে বাড়ী ফের তখন তোমাদের দিকে তাকালে মায়ের মন যে কি রকম হয় তা বলে বুঝানো যাবে না। তোমাদেরই লিলুয়ার ভাইরা যদি ৪২॥০ ঘণ্টা কাজ করে সপ্তাহে পুরা বেতন পায় তবে তোমরাই বা কেন তা আদায় করতে পারবে না? আজ যখন একঘণ্টা কমাবার সুযোগ এসেছে তখন এক ঘণ্টাই কম খাটবার ব্যবস্থা স্থায়ী কর—৪২॥০ ঘণ্টার জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের ট্রেড ইউনিয়নের দাবীর কথা ভুলে যেও না।"

কাঁচড়াপাড়ার রেল শ্রমিকেরা তাঁদের ট্রেড ইউনিয়নের দাবীর কথা ভুলে যান নি—সংগ্রামের পথ-ই তাঁরা বেছে নিয়েছেন। তাই ১লা আগস্ট থেকে প্রতিদিন সংগ্রাম চলেছে কাঁচড়াপাড়া রেল কারখানায়। কর্তৃপক্ষের কাজের সময় পরিবর্তনের নির্দেশ তাঁরা মেনে নেন নি—দিনের পর দিন সেই নির্দেশ তাঁরা অগ্রাহ্য করে চলেছেন।

কর্তৃপক্ষের শ্রম-চুরির কৌশল

এতদিন কাঁচড়াপাড়ার রেল কারখানার লোকো এবং ক্যারেজে কাজের সময় ছিল সকাল ৬॥০ থেকে ১০॥০টা—মাঝখানে ১ ঘণ্টা ছুটি—তারপরে আবার ১১॥০ থেকে ৩॥০ টা। শনিবার কাজের সময় ছিল ৬॥০ থেকে ১২॥০ টা। মোট সপ্তাহে ৪৬ ঘণ্টা। এতদিন শ্রমিকদের বেশি খাটিয়ে জুলাই মাসে হঠাৎ রেল কর্তৃপক্ষের হুঁস হয়েছে যে শনিবার একটানা যে ৬ ঘণ্টা কাজ হচ্ছে তা ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী বে-আইনী। কারণ ফ্যাক্টরী আইনে একটানা ৫ ঘণ্টার বেশী কাজ চলা নিষিদ্ধ। শোষণের কৌশলে খাস্থ রেলকর্তৃপক্ষ নতুন পথ বের করলো। তারা শ্রমিকদের

ধনিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সন্তানদের সিদ্ধান্তে শ্রমিকমাতার আশীর্ব্বাদ

জানালো যে এখন থেকে শনিবার কাজ হবে সকাল ৬॥ থেকে ১১॥ মাঝখানে আধ ঘণ্টা ছুটি— তারপরে আবার ১২টা থেকে ১টা—মোট ৬ ঘণ্টা। শ্রমিকদের কাছ থেকে তীব্র প্রতিবাদ আসায় তারা এই পথ ছেড়ে দিয়ে নতুন এক চাল চাললো—সোমবার থেকে শুক্রবারের কাজের সময় প্রতিদিন তারা ১২মিনিট ক'রে বাড়িয়ে দিলো এবং এভাবে ৫দিন ১২মিনিট করে শনিবারের একঘণ্টা পূরণ করে নেবার ব্যবস্থা করা হ'লো। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জুলাই মাসের শেষের দিকে শ্রমিকদের জানানো হ'লো যে এখন থেকে ৩॥০টায় কারখানা ছুটি না হ'য়ে ৩টা ৪২ মিনিটে ছুটি হবে।

প্রতিরোধ

শ্রমিকেরা এই নতুন শোষণ ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ওয়ার্কস ম্যানেজার তখন ঘোষণা করতে বাধ্য হলো যে, কাজের সময়ের পরিবর্ত্তন আপাততঃ স্থগিত থাকবে—২২শে আগস্ট মিটিং করে কর্তৃপক্ষ এসম্পর্কে ফয়সালা করবে।

কিন্তু মালিকেরা কথার খেলাপ করতে ওস্তাদ। ১লা আগস্ট কারখানায় নতুন নোটিস পড়লো—৩॥০টার পর আরো ১২মিনিট কাজ চলবে। লোকোর ৩০০।৪০০ শ্রমিক এই নোটিসের প্রতিবাদ জানালেন। ৩॥০টার সময় কাজ বন্ধ করে তারা টিকিট বোর্ডে আসলেন, কিন্তু বোর্ড তখনো খোলা হয়নি—গেটও বন্ধ। বাক বিতণ্ডায় ১২ মিনিট কেটে গেলো—গেট খোলা হোলো।

২রা আগষ্ট—শ্রমিকেরা সংগঠিত হলেন। পোস্টার পড়লো গেটে গেটে, শপে শপে। লোকো এবং ক্যারেজের শপে শপে প্রচার চললো ব্যাপকভাবে—**৮ঘণ্টার বেশী এক মিনিটও খাটবো না**; লিলুয়ার ভাইরা ৪২॥০ ঘণ্টা খেটে ৪৮ঘণ্টার মজুরি পায়, এখানেও সেই ব্যবস্থা চালু করতে হবে; জামালপুরের মতন নাইট শিফ্‌টের এলাউন্স দিতে হবে।

লোকোর সমস্ত শপ থেকে এবং ক্যারেজের কয়েকটি শপ থেকে হাজার হাজার শ্রমিক ৩॥০টার সময় কাজ বন্ধ করে গেটে এসে জড় হলেন। ওয়ার্কস ম্যানেজার দৌড়ে এসে তাঁদের বললো ঃ "এটা বর্ডার এলাকা—এখানে গোলমাল হ'লে রাষ্ট্রের ক্ষতি। তোমরা ১২মিনিট বসে বিড়ি খাও—কাজ করতে হবে না।" তার সাথে কথা কাটাকাটি করতে করতে ১২মিনিট কেটে যায়—গেটও খুলে যায়।

জুলুম বরদাস্ত নয়

ঐদিনই রাত্রে মিটিং বসলো শ্রমিকদের। সংগ্রাম কমিটি গঠিত হলো। সিদ্ধান্ত হলো ঃ পরের দিন ৩॥০টায় গেট ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে।

৩রা আগষ্ট। শ্রমিকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেলো—সাড়ে তিনটার এক মিনিটও বেশী কারখানায় থাকা চলবে না। গেট ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে হবে। সংগ্রামের ডাক দিয়ে নতুন নতুন পোস্টার পড়লো নানারকমের।

কর্তৃপক্ষও হুঁসিয়ার হ'য়ে গেলো—শ্রমিকদের আটকাবার জন্য তারা দারোয়ান, গেট-সার্জ্জেন মোতায়েন করলো। কিন্তু সাড়েতিনটা বাজতে না বাজতে হাজার হাজার শ্রমিকের অভিযানের সম্মুখে কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রতিরোধ ভেসে গেলো। ভয়ে ভয়ে কর্তৃপক্ষ গেট খুলে দিলো।

তারা ঘোষণা করলো যে, আগামী কাল ওয়ার্কস ম্যানেজার শ্রমিকদের মিটিং ডেকেছে।

শ্রমিকেরা ওয়ার্কার্স ম্যানেজারের মিটিং বয়কট করার সিদ্ধান্ত করলেন। শপে শপে সংগ্রাম কমিটি এবং লোকো ও ক্যারেজের যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ

৪ঠা আগষ্ট। শ্রমিকরা অধিকতর সংঘবদ্ধ হলেন—দালালদের উপর কড়া নজর রাখা হ'লো। ৩॥০টার সময় সবাই একযোগে বেরিয়ে আসলেন—দালালরা পর্য্যন্ত ভিতরে থাকতে ভরসা পেল না। বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী শ্রমিকেরা অপূর্ব্ব ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

ওয়ার্কার্স ম্যানেজারের মিটিং আর হোলো না।

৫ই আগষ্ট। শ্রমিকেরা অন্যান্য দিনের ন্যায় ৩॥০টায়ই বেরিয়ে আসলেন। শনিবার ৫ ঘণ্টা, অর্থাৎ ১১॥০টার বেশী খাটা হবে না—এই প্রচার-ই চললো।

৬ই আগষ্ট। লোকোর শ্রমিকেরা ১১॥০টার সময়-ই বেরিয়ে আসলেন। কিন্তু ক্যারেজের একটা অংশের মধ্যে মতভেদ দেখা গেলো—তারা ১২॥০ পর্য্যন্ত কাজ করতে চাইলেন। ক্যারেজের শ্রমিকদের ঐক্য রক্ষার জন্য তখন এই শনিবারের মত ১২॥০টায় বেরুবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। কর্তৃপক্ষ ইলেকট্রিক হাউস বন্ধ করে ক'রে দিতে চাইলো—শ্রমিকদের বাধায় তা আর সম্ভব হ'লো না।

কর্তৃপক্ষ চক্রান্ত করলো গেট বন্ধ করে শ্রমিকদের আটকে রাখা হবে। শ্রমিকেরাও স্থির করলেন—গেট ভেঙ্গে বের হতে হবে। কর্তৃপক্ষ পুলিস আনালো। **পুলিসের চোখের উপরই হাজার হাজার শ্রমিক গেট খুলে বেরিয়ে গেলেন।**

রেল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ অপূর্ব্ব সংগ্রাম চললো দিনের পর দিন। আসলো মজুরি দেবার দিন।

কর্তৃপক্ষের নূতন চালও ব্যর্থ

৯ই আগষ্ট—ক্যারেজ শপে মাহিনা দেবার দিন; কয়েকটি ডিপার্টে ৩॥০টার আগেই মাহিনা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯ এবং ২২নং শপে বাড়তি ১২ মিনিট না গেলে মাহিনা দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হলো। এই হুকুমের বিরুদ্ধে ক্যারেজের আড়াই হাজার শ্রমিক একযোগে মাহিনা নিতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা জানিয়ে দিলেন—আগের মতন ৩॥০টার মধ্যে মাহিনা দিতে হবে।

শ্রমিকের ঐক্যশক্তির সামনে কর্তৃপক্ষ হার মানতে বাধ্য হলো—**পরের দিন ৩॥০ টার মধ্যেই তাদের মাহিনা দেওয়া হোলো।**

লোকোর শ্রমিকেরাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ৩॥০ টার মধ্যেই তাদের মাহিনা দিতে হবে।

কর্তৃপক্ষ এখন কাণাঘুষা করছে দুই শিফটে ৬ মিনিট করে এই বারো মিনিট যাতে বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

শ্রমিকেরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের কোনরূপ শয়তানী-ই তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।

শ্রমিকদের সংগ্রামী একতা দেখে কর্তৃপক্ষ **এখন টিকিট বোর্ড ও গেট ৩॥টায় খুলে দিচ্ছে।**

ক্যারেজের সকল শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, লোকোর ন্যায় তারাও এখন শনিবার ১১॥ টার সময় কারখানা থেকে বেরিয়ে আসবেন।

ক্যারেজ ও লোকোর মিলিতম সংগ্রাম এবার সমান গতিতে এগিয়ে চলবে। কর্তৃপক্ষের কোন জুলুম-ই তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।

২১শে আগস্ট

মার্কিন একচেটিয়াপতিদের অনুন্নত দেশগুলিকে

[লেখক—ই জুকভ ঃ

এক ভয়ানক অর্থনৈতিক সংকট আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরজায় হাজির! কত আশা ছিল যে, মার্শাল পরিকল্পনা, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা এবং ওয়াশিংটনের অন্যান্য জরুরী বিধিব্যবস্থা মিলিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই কুৎসিত রোগ সারাইয়া দিবে; কিন্তু, আলেয়ার আলোর মতই সেই মিথ্যা আশা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

দুনিয়াবিরোধী নীতি

সংকট তো হাজির। পুঁজিদারী একচেটিয়াপতিরা তাই আরও ক্ষ্যাপা হইয়া নূতন নূতন বাজার আর কাঁচামালের জন্য লাগিয়া গিয়াছে; উপনিবেশ জয় করিবার জন্য তৈয়ার হইতেছে; জুয়াড়ির আশা নিয়া যুদ্ধের তোড়জোড় করিতেছে। ওআল্ ষ্ট্রীটের প্রতিনিধিদের মনে বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে সারা দুনিয়ার উপর অধিকার কায়েম করিবার আশা। এই পাণ্ডলে দুরাশা তাহারা ছাড়িতে পারে না।

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

সংকটের চাপে তাহাদের ঠাঁট বজায় রাখিবারও তর সহিতেছে না—যুদ্ধ জোটের ভিতর নিজেদের অংশীদার আর সাকরেদদেরই টুঁটি টিপিয়া ধরিতেছে। এখনও বহু বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের অধিকারে রহিয়াছে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইহা বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বল-পরিস্থিতি বদলাইয়া গেল। তাই, দুনিয়াজোড়া দ্বিতীয় যুদ্ধের ভিতরই এবং যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই **মার্কিন একচেটিয়া পতিরা আওয়াজ তুলিল, উপনিবেশ ও "প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে" নূতন করিয়া ভাগাভাগি করিতে হইবে।**

বহুমুখী আক্রমণাত্মক নীতি

মার্শাল জালে জড়ানো "মিত্র" দেশগুলির উপনিবেশিক সাম্রাজ্যে মার্কিন প্রবেশপথ সুগম করিবার হাতিয়ার হিসাবেই মার্শাল পরিকল্পনা এবং পরে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি কাজে লাগানো হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন জোটের আক্রমণাত্মক লক্ষ্য তো কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নূতন গণতন্ত্রগুলির উপরই নহে; উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নির্ভরশীল আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও এই ইঙ্গ-মার্কিন জোটের আক্রমণের লক্ষ্য।

ইঙ্গ-মার্কিন জোটের এই আক্রমণাত্মক নীতিই আবার "যুক্ত" সামরিক ব্যবস্থাদির অজুহাতে অন্য সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে মার্কিন প্রসারের সুবিধা করিয়া দিছে, এইসব অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আর আমলদারি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাত দিবার পথ করিয়া দিতেছে।

কিন্তু, এই সবকিছুও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতে যথেষ্ট নয়। আরও ঢের বেশি ব্যাপক ঔপনিবেশিক প্রসারের পথেই তাহারা চলিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদের ফতোয়া

১৯৪৯ সালের নির্ব্বাচনের পর প্রেসিডেন্টের গদিতে বসিবার উপলক্ষ্যে গত জানুয়ারি মাসের বক্তৃতাতেই ট্রুম্যান এই কর্ম্মপন্থার ছক করিয়া দেয়। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের পরিকল্পনা তখন অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে "সাহায্য"-দানের ভাঁওতা দিয়া ঢাকা ছিল: এই "সাহায্যে"র ভাঁওতাই তো তাহারা চালু করিয়া ফেলিয়াছে।

জুন মাসের শেষে ওয়াশিংটনে ট্রুম্যানের এই নয়া ফতোয়া প্রকাশিত হয়। পিছনে পড়া দেশগুলিতে মার্কিন "সাহায্যে"র প্রয়োজন প্রমাণ করিবার জন্য এই ফতোয়ায় মার্কিন ঔপনিবেশিক প্রসারের লক্ষ্য ও কায়দা বেশ খোলাখুলিই প্রকাশ করা হইয়াছে।

মার্কিন কংগ্রেসে ট্রুম্যান একটি বিল সুপারিশ করিলেন এই বিলের দুইটি দিক আছে: (১) অনগ্রসর দেশগুলিতে শিল্প কৌশল সম্পর্কিত সাহায্য দিবার জন্য আরও বড় রকমের একটি কর্ম্মপন্থা এবং (২) এইসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুগম করিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির পুঁজি লগ্নী করিবার জন্য একটি পরীক্ষামূলক কর্ম্মপন্থা। প্রেসিডেন্ট মহাশয় তাঁহার ফতোয়াতেই উল্লেখ করেন যে, **রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দুই দিকে নজর রাখিয়াই এই প্রস্তাব তোলা হয়।**

আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ

যন্ত্রশিল্পের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; শাসনাদি ব্যাপারে আধুনিক বিধিব্যবস্থাদি লোকের কাছে ক্রমেই আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—ইহার সহিত দুনিয়াজোড়া দুইটি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা মিলিয়া উপনিবেশগুলির জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও মতামত বদলাইয়া দিয়াছে, ট্রুম্যান এ-কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উপনিবেশগুলির জনগণ জাতিসমূহের দরবারে আরও কার্য্যকরীভাবে আসন গ্রহণ করিতে চাহিতেছে; তাহাদের সে আশা যদি নিষ্ফল হয়, তাহারা যদি সে বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা "ভুল নীতির" দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে।

উপনিবেশগুলির জনগণ আর পুরানো হালে থাকিতে চাহিতেছে না; ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটিই সংকটে পড়িয়া গিয়াছে; জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বন্যা সাম্রাজ্যবাদীদের মহা-আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিতেছে, দেখা যাইতেছে, ইহাই মার্কিন ঔপনিবেশিক প্রসারের পক্ষে **ট্রুম্যানের প্রথম "যুক্তি"**। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে চাঙা করিয়া ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অগ্রগতি রুখিয়া দেওয়াই মার্কিন "মদতে"র মতলব। ইহা ট্রুম্যানের **রাজনৈতিক "যুক্তি"**।

ট্রুম্যানের দ্বিতীয় "যুক্তিটি" কী, দেখা যাক। যে সব দেশের জীবনযাত্রার মান নিচু স্তরে রহিয়াছে, যাহাদের শিল্প যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে নাই তাহাদের সহিত আমেরিকার যে বৈদেশিক বাণিজ্য আছে তাহা অপেক্ষা শিল্পে বিশেষ উন্নত দেশগুলির সহিত আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ঢের বেশি, অতএব, মার্কিন বাণিজ্যের প্রসারের জন্য দুনিয়ার পিছনে পড়া দেশগুলিকে মার্কিন কুক্ষিগত করা চাই।

সোজা অর্থটি দাঁড়ায় যে, দরজায়-হাজির সংকটের চাপে মার্কিন একচেটিয়াপতিরা বাজার চায়, এবং অনগ্রসর দেশগুলিতে মার্কিন "মদৎ" দিবার মূলে রহিয়াছে সেই বাজারের জন্য লড়াই। **ইহাই ট্রুম্যানের দ্বিতীয় যুক্তির সারমর্ম্ম।**

সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে নাই বলিয়া মার্কিন "সাহায্যের" প্রয়োজন আছে এমন সব অঞ্চলের যে পাইকারী ফিরিস্তি ট্রুম্যান দিয়াছেন তাহার ভিতর অন্যান্য দেশের সহিত রহিয়াছে আফ্রিকা, নিকট ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলি, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার "কোন কোন অঞ্চল"। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে সব অঞ্চলে মার্কিন "সাহায্য" সরাসরি বৃটেন, ফ্রান্স বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে আঘাত করিবে। মার্কিন একচেটিয়াপতিরা সেইসব অঞ্চলেই ঢুকিয়া পড়িতে যাইতেছে।

ব্যাপারটি স্পষ্ট। ট্রুম্যানের ফতোয়ায় যে নির্দ্দিষ্ট ধারাগুলি রহিয়াছে তাহাতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে মার্কিন পুঁজি খাটাইবার কথাই কেবল নয়; আরও ধারা রহিয়াছে যে, **এইসব অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থাতেও মার্কিন "মদৎ" দেওয়া হইবে।**

ট্রুম্যানের ফতোয়ায় বলা হইয়াছে—অনগ্রসর দেশগুলির সহায়সম্পদের হিসাব-নিকাশ করা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাই হইবে "সবার বেশী গুরুত্বপূর্ণ" ব্যাপার। অনগ্রসর দেশগুলিতে মার্কিন "সাহায্যে"র প্রধান লক্ষ্যটি যে কি, তাহা ইহা বেশ সহজ-সরল ভাষায় বলা যায়—সে হইল: এইসব দেশে আধিপত্য বিস্তার করা।

সাম্রাজ্যবাদীদের নিজমুখেই

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মার্কিন নীতি পরদেশ গ্রাস করিবার যে খাতে রহিয়াছে, তাহারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হইল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা। জাতিসঙ্ঘের নীতির সহিত এই মার্কিন নীতির "সামঞ্জস্য" ঘোষণা করা হইয়া থাকে; কিন্তু সে ঘোষণা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক, তাহা মিথ্যা। গত মার্চ্চ মাসে জাতিসঙ্ঘের 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে' অনুন্নত অঞ্চলে মার্কিন "সাহায্য" প্রস্তাব আলোচনায় তাহা সুস্পষ্ট হইয়া যায়।

মার্কিন প্রতিনিধি থর্প্ তখন চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে মার্কিন পরিকল্পনার উপর জাতিসঙ্ঘের ছাপটি লাগাইয়া লওয়া যায়।

কিন্তু, মার্কিন প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে থর্প সাহেবের স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ বলিতে তাহাদের শিল্পোন্নতিই যে সবচেয়ে জরুরী কাজ, এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই।

গণতন্ত্রী দুনিয়ার হুঁশিয়ারী

তখন **সোভিয়েট প্রতিনিধি প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন** যে, বেসব দেশ শিল্পে যথেষ্ট উন্নত নয়, মার্কিন পরিকল্পনা তাহাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক কিনা, তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বিদেশী পুঁজি ও মালের বন্যা হইতে এই দেশগুলির আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা যদি কাড়িয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এইসব বিদেশী পুঁজি একেবারে নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করিবে—তহাতে রাশ টানিবার কোন উপায় থাকিবে না। অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির জন্য শিল্প-প্রসারের প্রয়োজন মার্কিন প্রতিনিধি অস্বীকার করিতেছেন। ইহা হইতেই মার্কিন প্রস্তাবের মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে; জাতিসংঘের নীতির সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই মনে হয়। কারণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিল্পের উন্নতিই যে এ-সব দেশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য তাহা কে না জানে।

অনুন্নত দেশগুলিতে বৃটিশ, ফরাসী ও ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের বদলে আরও শক্তিশালী মার্কিন ডলারের শাসন কায়েম করাই মার্কিন "সাহায্য পরিকল্পনার" লক্ষ্য। সেই আলোচনায় পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি ইহা দেখাইয়া দেন।

তিনি আরও বলেন যে, এইভাবে অনুন্নত দেশগুলির বড় আকার মুক্তি ও স্বাধীনতার সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়াও মার্কিন পরিকল্পনার আরেকটি মতলব। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব নীতিকে জাতিসংঘ অনুমোদন করিতে পারে না।

মার্কিন কংগ্রেসে ট্রুম্যানের ফতোয়াই প্রমাণ করিয়াছে যে, জাতিসংঘের 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে' মার্কিন "পরিকল্পনায়" যে সমালোচনা হয় তাহা ঠিকই হইয়াছিল। মার্কিন পুঁজিপতিদের মুনাফা লুটিবার জন্যই এই পরিকল্পনা?

অবাধ শোষণের ধৃষ্টদাবী

মার্কিন "শিল্পকৌশলের সহায়তার" জন্য অনুন্নত অঞ্চলগুলির কি কি দরকার তাহা খোঁজ-খবর করিয়া বাহির করিবার জন্যই প্রথম বছরে ৪কোটি ৫০লক্ষ ডলার মার্কিন প্রস্তাবে বরাদ্দ চাওয়া হইয়াছে। এই "খোঁজ খবর" তো আসলে

মল্লিক

সর্ব্বগ্রাসী ঔপনিবেশিক ক্ষুধা

সাহায্য পরিকল্পনার স্বরূপ

[প্রাভ্‌দা' পত্রিকা হইতে]

বিদেশে মার্কিন গোয়েন্দাগিরি। এবং তাহারই জন্য যে খরচ তাহার মোটা অংশ দিতে হইবে যে-সব দেশে "খোঁজ-খবর" হইল তাহাদেরই—মার্কিন "শিল্পকৌশলের সহায়তার" যাহারা শিকার তাহারাই যে ব্যয় বহন করিবে!

অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে "পুঁজি খাটাইতে উৎসাহিত" করিবার জন্য ট্রুম্যানের ফতোয়ায় 'পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক,' 'আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক' এবং বেসরকারী পুঁজির সাহায্য নিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঐ ফতোয়ায় সোজা প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, অনুন্নত অঞ্চলে পুঁজি খাটাইতে হইলে যে-সব বিপদ-আপদের আশঙ্কা আছে, আমদানী-রপ্তানি ব্যাঙ্ক তাহার বিরুদ্ধে বেসরকারী পুঁজিকে গ্যারান্টি দিক।

কী বিপদ হইতে পারে তাহার বেশ বিশদ ব্যাখ্যাও ট্রুম্যান দিয়াছেন। **প্রথমত**—বিনা খেসারতে পুঁজি জাতীয়করণ হইতে পারে; **দ্বিতীয়ত**—"যুদ্ধ বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ফলে" লোকসান হইতে পারে; এবং **তৃতীয়ত**—এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যখন পুঁজিপতিরা তাহাদের মুনাফার অর্দ্ধেক ডলার মুদ্রায় বদলাইয়া নিতে পারিবে না। এইসব "বিপদের" বিরুদ্ধেই ট্রুম্যান গ্যারান্টি দাবী করিয়াছেন।

"অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে" মার্কিন পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যে সব "বিপজ্জনক সম্ভাবনা" ওঁৎ পাতিয়া আছে সে সম্পর্কে ট্রুম্যানের ফিরিস্তি হইতে একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির পুরানো সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের বাধা অতিক্রম করিবার ব্যাপারে মার্কিন শাসকরা ততবেশী চিন্তিত নয়,—নূতন-পুরানো সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের আশঙ্কাই তাহাদের দুশ্চিন্তার বড় কারণ।

তাই, মার্কিন "পরিকল্পনা"য় "বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের" জন্য, অর্থাৎ পুঁজিবাদী একচেটিয়াপতিদের স্বার্থে, "সরকারী" এবং আন্তর্জ্জাতিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অর্থাৎ আমদানী রপ্তানি ব্যাঙ্ক মারফৎ মার্কিন সরকার আর্থিক দায় গ্রহণ করিবে; এবং উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে মার্কিন একচেটিয়াপতিরা আর 'ট্রাস্টগুলি' যে "বেসরকারী" চক্রান্ত চালাইবে তাহার নীতিগত ও রাজনৈতিক দায়িত্ব থাকিবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের মত আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর। মার্কিন একচেটিয়াপতিদের এই ব্যবস্থাটি ট্রুম্যানের ফতোয়ায় সুন্দর নাম দেওয়া হইয়াছে: "বেসরকারী পুঁজি খাটাইতে, উৎসাহ দিবার জন্য পরীক্ষামূলক কর্ম্মসূচী!"

ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থসংঘাত

যুদ্ধের পর মার্কিন একচেটিয়াপতিদের আক্রমণাত্মক নীতির একটি বিশিষ্ট দিক হইতেছে উপনিবেশ ও "প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে" নূতন করিয়া ভাগাভাগি করিবার জন্য লড়াই। মার্কিন ঔপনিবেশিক প্রসারের যে ছক ট্রুম্যান তৈয়ারি করিয়াছেন, তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাহাই হইল মার্কিন বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান অঙ্গ।

যুদ্ধের ভিতরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর যে সুযোগ সুবিধা করিয়া নিয়াছে, তাহারা এখন চটপট পুরাপুরি তাহা কাজে লাগাইতেছে। ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের একরকম সর্ব্বত্রই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থাবা মারিতেছে।

নিকট প্রাচ্যে পেট্রল মেলে প্রচুর। এখানে কুখ্যাত আরব লীগের ভিত্তিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য যে সুকৌশলী ব্যবস্থা রহিয়াছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাহা বানচাল করিতে লাগিয়াছে। আসলে, এই আরব লীগ ইতিমধ্যেই ভাগ হইয়া গিয়াছে। **সৌদি আরব, মিসর, সিরিয়া ও লেবানন** চলিয়া গিয়াছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রসার অঞ্চলে। মার্কিন পেট্রল কোম্পানীগুলি **ইরানেও** চাবিকাঠিগুলি হস্তগত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। হালে যে **ইসরাইল** রাষ্ট্র গঠিত হইল, তাহারা এ বছর মার্কিন আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক হইতে ১০ কোটি ডলার ধার পাইবে। তাহা ছাড়াও, বেসরকারী মার্কিন ব্যাঙ্ক ও একচেটিয়া কোম্পানীগুলি ইস্রাইলে মোটা পরিমাণ পুঁজি খাটাইবে। দেখা যাইতেছে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের অন্যান্য ফলাফলের ভিতরে একটি হইল এই যে, নিকট প্রাচ্যে বৃটিশ গ্রাস দুর্ব্বল হইয়াছে, আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শক্তি লাভ করিয়াছে।

সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধ প্রস্তুতি

নিকট প্রাচ্যে এবং তুর্কী, আরবদেশগুলি, ইরান ও আফগানিস্তান সমেত মধ্য প্রাচ্যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের পিছনে একটি বড় মতলব হইতেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নূতন গণতন্ত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক সামরিক রাজনীতিক পরিকল্পনা। মার্কিন যুদ্ধবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়নের দক্ষিণ সীমান্তগুলি জুড়িয়া সামরিক ঘাঁটি ও আক্রমণের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার জন্য লাগিয়া গিয়াছে।

দস্যুদলে ছোটদের বিপদ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হালে **আফ্রিকায়** খুবই তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকা হইল প্রধানত বৃটিশ, ফরাসী, বেলজিয়ম ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক অঞ্চল। 'ইউনাইটেড স্টেট্‌স নিউস অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট' পত্রিকার মতে এই আফ্রিকা হইল আরেকটি বিরাট অঞ্চল যেখানে নাকি মার্কিন শিল্পকৌশল ও ডলারের প্রয়োজন রহিয়াছে! বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুযোগ সুবিধা বজায় রাখিবার জন্য বৃটেনের যে চেষ্টা আছে, তাহাই হইল ঐ পত্রিকাটির মতে "একমাত্র" অসুবিধার কারণ। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যেন নেহাৎ প্রসঙ্গত। কিন্তু, মার্শালী জালে জড়ানো দেশগুলি মার্কিন চাপের বিরুদ্ধে যেটুকু প্রতিরোধ করিতে পারে তাহা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ এবং নানা শর্ত্তে বাঁধা। ফ্রান্স বা বেলজিয়াম সম্পর্কে একথা আরও বেশী সত্য। যেমন বেলজিয়াম কঙ্গোতে যে বিরাট পরিমাণ খনিজ ইউরেনিয়ম ধাতু পাওয়া গিয়াছে তাহা ইতি মধ্যেই কার্য্যত মার্কিন একচেটিয়াপতিদের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে।

এসিয়ার প্রভু বদলের চক্রান্ত

দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার দেশগুলি হইতে ও পুরানো বৃটিশ, ফরাসী ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের গদিতে মার্কিন প্রভুত্ব কায়েম করিবার কাজ পুরাদমে চলিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার দেশগুলিতে প্রচুর টিন, রবার, পেট্রল, বক্সাইট ও অন্যান্য কাঁচামাল পাওয়া যায়, কিন্তু কেবল তাহারই জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নজর পড়ে নাই। মার্কিন একচেটিয়াপতিরা এই অঞ্চলটিকে এসিয়ায় নূতন গণতন্ত্রী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা বাধ-মত কিছু করিয়া তুলিতে চায়; এই সমগ্র অঞ্চলটিকে তাহারা দুনিয়াজোড়া একটি নূতন যুদ্ধের জন্য প্রকাণ্ড সামরিক ঘাঁটি করিয়া তুলিতে চায়। তাই, দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ার দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদের পুতুলগুলির পিছনে মার্কিন "উপদেষ্টা" ও "আলাপ আলোচনার জন্য লোক" দেখা যায়, কোন ক্ষেত্রেই ইহার অন্যথা দেখা যায় না।

চীনে মার্কিন পরিকল্পনার ব্যর্থতার ফলে ভারত সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "আগ্রহ" বাড়িয়া গিয়াছে। ইউনাইটেড স্টেটস নিউজ এ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট নামে মার্কিন পত্রিকাটি মনে করিতেছে যে, চীনে যে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল সেই পরিকল্পনার কর্ত্তারা এবার চীনের বদলে ভারতকেই তাহাদের পুঁজি খাটাইয়া মুনাফা লুটিবার জন্য ঠিক করিতেছে।

এসিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীতি যে ভাবে নিজেই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, এমন আর কিছুতে হয় নাই। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে কোটি কোটি মানুষ লড়াই করিতেছে তাহারা দেখিয়াছে যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমন করিবার জন্য বৃটিশ, ফরাসী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের মিত্র হইতেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ; তাহারা দেখিয়াছে, এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই গণতন্ত্রী শক্তিগুলির প্রধান শত্রু।

যাহারা ঠকিয়া শিখিয়াছে

যেগুলি খোলাখুলি মার্কিন উপনিবেশ (পুয়ের্টো রিকো, ফিলিপাইন ইত্যাদি) সে-সব দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পীড়নের ভিতর দিয়া মার্কিন "সাহায্য"-নীতির ভণ্ডামি পুরাপুরি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশই মার্কিন একচেটিয়া কারবারের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র। একথা সবাই জানে। সেগুলি হইল ডলারের পুরাপাকা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য।

এ বিষয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে: উত্তর আমেরিকার একচেটিয়াপতিদের নজর সেদিকে পড়ে বহু আগে। কাজেই, **কিউবা'র** প্রগতিশীল সংবাদপত্র 'নোটিশিয়াস ড হয়'-এর মতামত এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনুন্নত দেশগুলির জন্য মার্কিন "সাহায্য" পরিকল্পনা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রিকাটি মন্তব্য করে যে, সত্যই সাহায্য করিবার কোন পরিকল্পনা আমেরিকার নাই। তাহা হইলে ব্যাপারটি কি?

ঐ পত্রিকায় বলা হইয়াছে: "আমরা জানি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের একটি পরিকল্পনা আছে বটে। ....আমাদের জাতিগুলির উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য আরও শক্ত করিয়া তুলিবার জন্যই সে পরিকল্পনা তৈয়ারি হইয়াছে; আমাদের দেশগুলির শিল্পগুলি ধ্বংস করিবার জন্যই সে পরিকল্পনা; সে পরিকল্পনায় আমাদের দেশ ছাইয়া যাইবে মার্কিন মহলে; পরদেশ গ্রাস করিবার জন্য যে যুদ্ধের তোড়জোড় চলিয়াছে তাহার জন্য আমাদের দেশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা মালের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কায়েম করিবার হাতিয়ার হইল সে মার্কিন পরিকল্পনা।"

উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির যে জনগণ জাগিয়া উঠিতেছে তাহারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের "পরিকল্পনা"র স্বরূপ বুঝিতে পারে। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর ঘটনা ঘটিতেছে, দ্রুত সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শক্তি বাড়িতেছে। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, জনগণের গণতন্ত্রের জন্য, স্থায়ী শান্তির জন্য লড়াই ক্রমেই অধিকতর শক্তি লাভ করিতেছে। এবং ঠিক কারণেই দেশে দেশে জনগণের উপর গোলামি চাপাইয়া দিবার এই সর্ব্বশেষ "পরিকল্পনা"ও ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

—টাস

সবে বের হয়েছে

১। **লালঝাণ্ডা শ্রমিকের জয়যাত্রা**—সম্প্রতি বম্বেতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী। গত দু'বছরের বীভৎস ফ্যাসিস্ট দমননীতির মধ্যেও কিভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর বিজয়ী অভিযান এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পরিস্কার করে।

দাম—চার আনা।

২। **বাংলার চটকলে মজুরি ও মুনাফা**—বাংলার সবচেয়ে বড় শিল্প চটশিল্পের ইতিহাস বিদেশী পুঁজির নির্লজ্জ শোষণের ইতিহাস। এই শোষণকে এবং চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের দুর্ব্বলতা ও সম্ভাবনাকে খুলে দেখান হয়েছে ওই পুস্তিকায়।

দাম—দুই আনা।

বাঁকুড়া জেলায় জয়যুক্ত ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘটের জোয়ার

বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্ষেতমজুররা ধর্ম্মঘট করিয়া তাঁহাদের ন্যায্য মজুরির দাবি আদায় করিতেছেন। সর্ব্বত্রই গরীব কৃষক ও মধ্য কৃষকরা ক্ষেত মজুরদের দাবি মানিয়া দিতেছেন। ক্ষেত-মজুর, গরীব কৃষক ও মাঝারি কৃষকের ঐক্যের বিরুদ্ধে জমিদার-জোতদারদের দালালী গুণ্ডা পুলিসের সমস্ত অপচেষ্টা ও দমননীতি পরাজিত হইতেছে।

ক্ষেতমজুররা সাধারণ শ্রেণীস্বার্থের ডাকে গরীব কৃষক ও মাঝারি কৃষকদের বুঝাইয়া দিতেছেন যে, ট্যাক্স-খাজনা বন্ধের জন্য এবং ফসল ও জমি দখলের লড়াই জয়যুক্ত হইলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের সহিত মাঝারি কৃষকের স্বার্থও শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইবে।

এমনই ঐক্যবদ্ধ ধর্ম্মঘটের ফলে, বাঁকুড়া শহরের আশেপাশের দেরুয়া, রসুনকুড়, কমলা, তেঁতুলভাং প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের দৈনিক ২৲ টাকা মজুরি ও ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি স্বীকৃত হইয়াছে।

যে ২।১ জন বিড়ি শ্রমিক ও মাঝারি কৃষক দালালদের সহিত মিলিয়া ধর্ম্মঘটের বিরোধিতা করে বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন ও সমস্ত কৃষক তাহাদের একঘরে করিয়াছেন।

মুর্চ্চা, শিতলাড়ি, তাঁতকাশালি ও কুমরা প্রভৃতি অঞ্চলে ধনী চাষীদের সমস্ত অপচেষ্টা ও লরি ভর্ত্তি পুলিস ক্ষেতমজুরদের ব্যাপক ধর্ম্মঘট দুর্ব্বল করিতে পারে নাই।

সানবাঁধা অঞ্চলেও ব্যাপক ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ট্যাক্স বন্ধ এবং ফসল ও জমি দখলের লড়াইয়ের ডাকে এখানেও গরীব কৃষক ও মাঝারি কৃষকরা ক্ষেত-মজুরদের সহিত এক হইয়াছেন, তাহা-দের দাবি মানিয়া নিয়াছেন।

এই অঞ্চলে ক্ষেতমজুররা পূর্ব্বে মাত্র ৩।৪ সের ধান পাইতেন : এখন ৭।৮ সের স্থির করিয়া মিটমাট হইয়াছে।

এইসব লড়াইয়ের অঞ্চলে ক্ষেতমজুর-দের সংগ্রাম কমিটির কাছে না গেলে কেহ মজুর পায় না। সংগ্রাম কমিটিই স্থির করিয়া দেন যে, কে কোথায় কাজ করিবেন। ধনী কৃষক ও দালালদের মজুর বন্ধ হইতেছে।

সংগঠিত লড়াইগুলির খবর পাইয়া জেলার প্রায় সর্ব্বত্র বহু দূর দূর অঞ্চলের ক্ষেতমজুরেরা সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগেই ধর্ম্মঘট করিয়া মজুরি বাড়াইতেছেন; অন্যান্য দাবি আদায় করিতেছেন।

সংগঠিত ক্ষেতমজুর আন্দোলন আর সীমাবদ্ধ থাকিতেছে না। সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ক্ষেতমজুরদের মজুরি, কাজের সময় এবং কাজের স্থায়িত্ব, ভাতা, ছুটি, ইত্যাদি বিষয়ে যে দাবি স্থির করিয়া লড়াইয়ের ডাক দিয়াছেন, বাঁকুড়ার ক্ষেতমজুরদের লড়াই সেই পথেই চলিয়াছে। ক্ষেতমজুর-দের লড়াইয়ে গরীব কৃষক ও মাঝারি কৃষক সমর্থন করিতেছেন—এইভাবে লড়াই চলিয়াছে আরও উঁচু স্তরে: ট্যাক্স বন্ধের জন্য, খাদ্য ও জমি দখলের জন্য ধনী-কৃষক ও জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে আরও বড় মিলিত লড়াইও সুরু হইয়া গিয়াছে।

৩৲ নিম্নতম মজুরির দাবিতে সন্দেশখালীতে ধর্ম্মঘট

সন্দেশখালী এলাকায় বামুনিয়া লাটে ক্ষেতমজুরেরা দৈনিক তিন টাকা মজুরীর দাবীতে ১৩ই জুলাই হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন।

জোতদার, জমিদার ও তাহাদের দালালেরা মেয়ে ও পুরুষ মজুরদের পুলিসের ভয়ে ধান ধার না দিয়া তাহাদের অনাহারে মারিবার ভয় দেখাইয়াও ধর্ম্মঘটীদের দমাইতে পারে নাই—ক্ষেতমজুরেরা তাহাদের সংগ্রামে দৃঢ় রহিয়াছেন। মেয়ে মজুরেরা জমিদার-জোতদারদের সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছেন—"আমরা এতদিন তোমাদের চাষ করিয়াছি। এখন তোমাদের মেয়েরা জমিতে নামিয়া চাষ করুক" এবং কেমন মজা তা বুঝুক। মেয়ে মজুরদের সাধারণতঃ মজুরি ছিল একটাকা। জোতদার-জমিদারেরা মেয়ে-দের মজুরি দুই টাকা, পুরুষদের আড়াই টাকা পর্য্যন্ত মজুরি দিতে রাজি হইয়াও কোন মজুর পায় নাই।

জোতাদারেরা মজুরদের শাসাইয়া বলিয়াছে যে তাহাদের শায়েস্তা করা হইবে। ক্ষেতমজুর মেয়ে পুরুষেরা তাহাদের নিজস্ব ভাষায় জানাইয়া দিয়া-ছেন—তিনটাকা মজুরি না পাইলে তাহারা কিছুতেই কাজ করিবেন না।

হাওড়া জেলা ক্ষেতমজুর সম্মেলন

৩১শে জুলাই রাহাপুরে হাওড়া জেলা ক্ষেতমজুর সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ১৫টি কেন্দ্রের ক্ষেতমজুররা এই সম্মেলনে আসিয়া জমায়েৎ হন।

সমগ্র হাওড়ার জেলায়-ই সংগ্রামী ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের বিরুদ্ধে নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার ব্যাপক দমন-নীতি চলিয়াছে—গ্রামে গ্রামে পুলিস ক্যাম্প বসিয়াছে। এই দমননীতি উপেক্ষা করিয়া, প্রবল জল বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ৬০০ ক্ষেতমজুর এই সম্মেলনে যোগদান করেন। শুধু ক্ষেতমজুর নয়, সম্মেলনে আসিলেন গরীব চাষীরা আর কারখানার শ্রমিকেরা।

আন্দুলের কংগ্রেসী সেবাদলের গুণ্ডামী উপেক্ষা করিয়া একটি মিছিল সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে আসিয়া যোগ দেয়। এই মিছিলে আন্দুল এলাকার ক্ষেত-মজুর, গরীব চাষী এবং বাউড়িয়ার সংগ্রামী শ্রমিকেরা একসাথে আসেন। উত্তর ঝাপড়দহের গরীব চাষী ও মাঝারী চাষীদের সঙ্গে লইয়া ডোমজুরের কংগ্রেস ঘাট ঝাঁপড়দহ বাজারের উপর দিয়াই ক্ষেতমজুরেরা মিছিল লইয়া আসেন।

ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকার শ্রমিক প্রতিনিধিরা যোগদান করিয়া নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিলেন। বাউড়িয়া, চেঙ্গাইল, ফুলেশ্বর, শালিমার, শিবপুর, এলেনবেরী, বামারলরী এলাকার শ্রমিকেরা সম্মেলনে যোগ দিয়া সংগ্রামী ক্ষেতমজুরদের অভিনন্দন জানাইলেন। সম্মেলনে প্রকাশ্য অধিবেশনে এলেনবেরীর একজন শ্রমিক সভাপতিত্ব করিলেন।

এই সম্মেলনে নয়জনকে লইয়া জিলা ক্ষেতমজুর কমিটি গঠিত হয়।

প্রথমে শহীদ স্মরণে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া একটি মূল দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে থাকে—বাঁচার মতন মজুরি চাই (বর্ত্তমানে একবেলা খাওয়া এবং ৩৷৷০ টাকা অথবা দৈনিক ৪ টাকা) সাত ঘণ্টার বেশী খাটুনি নাই; নারী, পুরুষের একরকমের কাজ, এক রকমের মজুরি; অবৈতনিক শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা; বাসস্থানের খাজনা ও ট্যাক্স নাই; সস্তায় খাদ্য সামগ্রী চাই, বাকী বকেয়া ঋণ রেহাই; পতিত জমি আবাদের অধিকার,- জোতদার ও ধনী কৃষকদের বাড়তি জমি ক্ষেতমজুরদের জন্য বিলি করিতে হইবে; আবাদের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা চাই; খালবিলে মাছ ধরার অবাধ অধিকার; সকলের জন্য কাজ বা বেকার ভাতা; আইনের দ্বারা অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ; মূল শিল্পের জাতীয়করণ এবং ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই প্রস্তাবে ক্ষেতমজুর সমিতিকে স্বীকার করিয়া নেবার দাবী করা হয়।

সম্মেলনে সারা ভারতের সংগ্রামী শ্রমিকের গণ-প্রতিষ্ঠান সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বেই যে ক্ষেতমজুর সমিতি পরিচালিত হইবে তাহা ঘোষণা করা হয়।

মঞ্জিল

হাট-গোবিন্দপুরে পুলিস জুলুম

ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে আক্রমণ

বর্দ্ধমানের হাট-গোবিন্দপুরে ক্ষেত-মজুর ও কৃষকের ঘরে ঘরে নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার পুলিসের ব্যাপক হামলা চলিয়াছে।

গত ২৯শে জুলাই সভ্যাগ্রামে ক্ষেত-মজুরদের সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে হাট-গোবিন্দপুরের ক্ষেতমজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়া আসিয়া যোগ দেন। তাঁহাদের এই ধর্ম্মঘটে জোতদারেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য স্থানীয় কংগ্রেসনেতা ডাঃ বিমান বিশ্বাসের নেতৃত্বে জোতদারেরা গ্রামে সশস্ত্র পুলিস আনার ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। তাহারা পুলিসের নিকট এক দরখাস্ত পাঠায়।

১লা আগস্ট জেলার পুলিস সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্টের নেতৃত্বে এস, ডি, ও, আই, বি' অফিসার, হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী ৭০-৮০ জন সশস্ত্র পুলিস লইয়া গ্রামে ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের ঘরে ঘরে হানা দেয়। রাত্রিতে তাহারা বিভিন্ন পাড়ায় টহল দিয়া কৃষককর্ম্মীদের খুঁজিতে থাকে। পরের দিন ১০।১২ ঘায়গায় ব্যাপক তল্লাসী চালায়, কিন্তু কোন কর্ম্মীকেই, তাহারা খুঁজিয়া পায়না—তাহারা মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। পুলিস হামলার সময় জোতদারদের সঙ্গে লইয়া ডাঃ বিমান বিশ্বাস মজুর-কৃষকদের বাড়ী চিনাইয়া দিতে থাকে।

এখন গ্রামে একটি পুলিস ক্যাম্প বসানো হইয়াছে। বিমান ডাক্তার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া মজুর-কৃষকদের বাড়ী ঘর পুড়াইয়া দিবার, তাহাদের খুন করিবার ভয় দেখাইতেছে—কয়েকজনকে ধরিয়া নিয়া মারপিটও করিয়াছে।

সমগ্র গ্রামে ফ্যাসিস্ট জুলুম চালাইবার জন্য জোতদারেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

'ক্ষেতমজুর বিশেষ সংখ্যা'

১২ পৃষ্ঠা : দাম তিন আনা

আগামী ২৫শে—২৭শে আগস্ট পঃ বঃ টি, ইউ কংগ্রেসের আহ্বানে কলিকাতায় সারা বাংলার ক্ষেত মজুর-দের সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে ইতালী, চীন প্রভৃতি দেশের ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামের প্রবন্ধ সহ 'মঞ্জিলে'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। অবিলম্বে বেশী কপির অর্ডার দিন।

মঞ্জিলের নিয়মাবলী

(১) প্রতি রবিবার কাগজ বাহির হইবে। দাম তিন আনা।

(২) ১০ কপির কম এজেন্সী নাই। শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন।

(৩) গ্রাহকদের হার :—বার্ষিক ১০৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷৷০ টাকা।

অফিসের ঠিকানা

২৪নং নুর মহম্মদ লেন।

কলিকাতা (৯)

পটারী শ্রমিকদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ৭০ দিন পার হইল

গ্রেপ্তার ও গুণ্ডামী অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণ শ্রমিকদের জঙ্গী ঐক্য ঃ বিপিন গাঙ্গুলীর বিভেদ প্রচেষ্টা

পটারী শ্রমিকদের প্রতিরোধ সংগ্রামের ৭০টি দিন পার হইল। শ্রমিকেরা দাঁতে দাঁত চাপিয়া লড়িয়া যাইতেছেন। প্রত্যহ গেটের সম্মুখে পিকেটিং চলিতেছে।

আর প্রত্যহ পুলিসজুলুম বাড়িতেছে। গেটের সম্মুখ হইতে রাস্তার পাশ হইতে প্রত্যহ একজন, দুইজন করিয়া শ্রমিক গ্রেপ্তার হইতেছেন। এপর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা সাড়ে তিন শত ছাড়াইয়াছে।

পুলিস পাহারায় প্রত্যহ দালাল শ্রমিকদের সশস্ত্র মিছিল বাহির হইতেছে! কোম্পানীর পেটোয়া গুণ্ডা লছমীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ঝাণ্ডা উড়াইয়া লাঠি ঘাড়ে করিয়া দালাল দল কিছু শ্রমিককে কারখানায় ঢুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। পুলিস জীপ তাহাদের রক্ষা করিতেছে।

কিন্তু শ্রমিকদের টলান যায় নাই।

গুণ্ডা লছমী হইতেছে 'জাতীয়' টি-ইউর নেতা সুরেশ ব্যানার্জ্জীর লোক। কিন্তু পুলিসজুলুম এবং সুরেশবাবু ও জাতীয় টি-ইউর দালালী গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে সাধারণ লালঝাণ্ডা শ্রমিকের সঙ্গে কংগ্রেস অনুরক্ত শ্রমিকরাও একত্রে সংগ্রাম চালাইতেছেন। একত্রে পুলিসজুলুম ও লাঠি সহিতেছেন। এই জঙ্গী শ্রমিক ঐক্যের সামনে সুরেশ ব্যানর্জ্জীর বিভেদ ও গুণ্ডানীতি বানচাল হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পুলিস ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

তাই ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা উৎসবের ঠিক দুই দিন আগেই পটারীর সত্যাগ্রহী মেয়ে শ্রমিকদের উপর বর্ব্বরভাবে লাঠি চার্জ্জ করা হয়। মোট ৫০ জন গুরুতরভাবে আহত হন। এবং আহতদের মধ্যে ১০ জনই মহিলা।

সাধারণ লালঝাণ্ডা ও কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের এই জঙ্গী ঐক্য তাহাতে আরও দৃঢ় হইয়া উঠে। সুরেশ বাবু এবং তাহার অনুচর লছমী গুণ্ডা কংগ্রেসী শ্রমিকদের কাছেও নিতান্ত ঘৃণ্য হইয়া উঠিয়াছে।

তাই নূতন বিভেদপন্থার প্রয়োজন হইয়াছে। জাতীয় টি-ইউরই একটি উপদল বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে শ্রীঅমিয় দাসগুপ্ত আসরে নামিয়াছেন এবং লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের সহিত কংগ্রেসী কর্ম্মচারীদের ঐক্যের বিরোধিতা করিতেছেন।

তিনি মুখে সংগ্রামকে সমর্থন করিতেছেন কিন্তু একত্রে জঙ্গী প্রতিরোধ গড়ায় আপত্তি করিতেছেন।

সংগ্রামী শ্রমিকদের অপেক্ষা তিনি মেলামেশা করিতেছেন পুলিস ও মালিকদের সঙ্গেই।

লালঝাণ্ডা ও কংগ্রেসী কর্ম্মচারী একত্রে পুলিসের হাতে নিগৃহীত হইলেও তিনি শুধু দলীয় লোকদের জন্য তদারক করিতেছেন; জামিন না দাঁড়াইয়াও রহস্যজনক উপায়ে তাহাদের কয়েকজনকে মুক্ত করেন, বাকিদের পুলিসের হাতেই তুলিয়া দেন।

কয়েকজন লালঝাণ্ডা শ্রমিককে গ্রেপ্তার করার পিছনেও তাঁহার সায় ছিল।

১০ই আগস্ট মেয়ে শ্রমিকদের উপর বর্ব্বর লাঠি চার্জ্জ হইলেও তিনি এবং বিপিন গাঙ্গুলী প্রতিকারের কোন পথ না দেখাইয়া শান্তির নামে সহ্য করারই উপদেশ দেন।

শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে এইভাবে হীনবল ও বিচ্ছিন্ন করার আসল উদ্দেশ্য মালিকের শর্ত্তে শ্রমিকদের কাজে যাইতে বাধ্য করা। তিন সপ্তাহ যাবৎ লক আউট তুলিলেও মাসিক ২০০ দালাল ও নূতন আমদানী লোক ছাড়া একজন সাচ্চা শ্রমিকও পক্ষে পান নাই।

সম্প্রতি অমিয় দাসগুপ্ত খোলাখুলিই বলিতে সুরু করিয়াছেন, কিছু ছাঁটাই করিতে হইবে। অমিয়বাবুর দলে নাম লিখাইলে শুধু জনকয়েকের জন্য তিনি 'ব্যবস্থা' করিবেন।

রামলক্ষ্মণের ক্ষতিপূরণ চাই এবং একজনকেও ছাঁটাই চলিবে না প্রভৃতি দাবি লইয়া যে শ্রমিকেরা এতদিন ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহাদের এই বিভেদনীতিকেও পরাস্ত করিতে হইবে।

শ্রমিকদের বুঝিতে হইবে যে, ছাঁটাই পুরাপুরি বন্ধ করার একমাত্র উপায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। কোন উপদলীয় কংগ্রেস নেতাই ছাঁটাই রুখিতে পারেন না।

ক্ষেতমজুর ও ভাগ-চাষীদের মিলিত লড়াই

দিনাজপুর জেলায় জোতদারেরা বেপরোয়া আক্রমণ চালাইয়া ভাগচাষীদের জমি হইতে উচ্ছেদ চালাইতেছে। রক্ত-জল-করা মেহনত করিয়া ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীরা ফসল উৎপন্ন করে, উৎপন্ন ফসল তাহাদেরই জোতদারের বাড়ীতে বাড়ীতে বা খলিয়ানে তুলিয়া দিয়া আসিতে হইবে, তাহাই জোতদারেরা দাবি করে। মাড়াই করে ভাগচাষা। ফসল দুই সমান ভাগ হয়ঃ ভাগচাষীর ভাগ হইতে কর্জ্জার সুদ, কর্জ্জা ধান, আবওয়াব কাটিয়া লওয়া হয়। কখনও বা ভাগবাবী শূন্য হাতে বাড়ী ফেরে, কখনও বা দুমুঠো ধান নিয়া ফিরিতে পারে। ক্ষেতমজুরের মজুরি কোথাও বা আট আনা, কোথাও বা বারো আনা। দিনাজপুরের ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষী সারা বছর বেগার খাটিয়া ক্রীতদাসের অবস্থা, অমানুষিক দারিদ্র্য আর অনাহারের একটানা যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। ইহার উপর আবার চলিয়াছে জমি হইতে উচ্ছেদ, যাহার ফল হয় সারা বছর বেকারী। বাধ্য হইয়া ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীরা জমি হইতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া লড়াই চালাইতেছে।

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, গত জুলাই মাসে ফুলবাড়ী ইউনিয়নে ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীরা তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া অপরকে লাগাইয়া জমি করার যে ষড়যন্ত্র জোতদারেরা করিতেছিল তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

এখানকার ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের অধিকাংশ ছিল সাঁওতাল। তাহারা গত ফসলে তে-ভাগা আদায় করিয়াছে। জোতদারেরা এবার ইহাদের বলিয়া দেয় যে, এ বছর আর তোমাদের জমি দেওয়া হইবে না, অন্য লোক লাগাইয়া জমি তোলানো রোয়া গাড়া হইবে। ঘটনার তারিখে জোতদারেরা লোকজন লইয়া জমিতে চাষ দিবার জন্য অগ্রসর হয়; কিন্তু ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীরা মিলিয়া ঠিক করে যে তাহারা জমির দখল ছাড়িবে না।

তাহাদের সব অবস্থা বুঝাইয়া বলার পর এবং ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের দৃঢ়তা দেখিয়া, জোতদার যে সব লোকজন আনিয়াছিল তাহাদের অনেকে সরিয়া পড়ে। জোতদার তাহাতে আরও ক্ষিপ্ত হইয়া মরিয়াভাবে ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের আক্রমণ করে। সংঘর্ষের ফলে একজন জোতদার মারা যায়।

ঘটনার পর পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের পুলিস আসিয়া আক্রমণকারী জোতদার দলের কাহাকেও গ্রেপ্তার না করিয়া ভাগচাষীদের ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের ছাঁটাইয়ের প্ল্যান

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

এক্সাইজের কর্ম্মচারী এই ভুয়া 'প্রমোশন কমিটিকে' বয়কট করেন। 'প্রমোশন কমিটি' বেগতিক দেখিয়া তখনকার মতন সরিয়া পড়েন।

'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' অফিসে কাজের ঘণ্টা ৪৫ মিনিট বাড়াইলে কর্ম্মচারীরা এমন হৈ-চৈ করেন যে বাড়তি কাজের সময় অন্ততঃ ১৫ মিনিট কমিয়া যায়। এই অফিসেই সময়মত মাহিনা না দিলে, কর্ম্মচারীরা ঘেরাও করিয়া দাবির টাকা আদায় করেন।

ভবিষ্যৎ সংগ্রাম

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীরা দেখিতেছেন যে, নেহরু সরকার ক্রমেই মরিয়া হইয়া উঠিতেছেন। সারা দুনিয়ায় ক্রমেই ঘণীভূত হইয়া উঠিতেছে। এতদিন সম্ভব হইলেও 'ধীরে চলার' নীতি অবলম্বন করা আজ নেহরু সরকারের পক্ষে ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। ব্যাপক আক্রমণ আজ আর দেরী নাই শীঘ্রই সুরু হইবে, হাজার হাজার কর্ম্মচারী ছাঁটাই হইবেন, যাঁরা ছাটাই হইবেন না, তাঁহারাও কম বেতনে নির্ম্মম অত্যাচার আর শোষণের মুখে কাজ করতে বাধ্য হইবেন।

তাঁহাদের সম্মুখে আজ একমাত্র পথ **ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথ**—স্টোরস্, একাউন্টস্, অর্ডন্যান্স, স্টেশনারী, স্ট্যাটিস্টিকস্, ইনকাম ট্যাক্স, সার্ভে, এক সাইজ—কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত অফিসের সমস্ত কর্ম্মচারীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং সমাবেশের মধ্যেই নেহরু সরকারের এই আক্রমণ এবং ষড়যন্ত্রের উত্তর। অফিসে অফিসে তাই কর্ম্মচারীদের মধ্যে সমস্ত কর্ম্মচারীদের মূল দাবীগুলি নিয়া ব্যাপক আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সংগঠন তৈয়ার হইতেছে, আগামী সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় সেণ্ট্রাল গবর্নমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের নেতৃত্বে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের সম্মেলন ডাকা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের গৌরবময় সংগ্রামের পথে তাঁহারা পা বাড়াইতেছেন।

বিশেষ জরুরী বিজ্ঞপ্তি

আগের নাম-ঠিকানায় আর টাকা পাঠাইবেন না

'মঞ্জিলে'র সকল এজেণ্ট ও গ্রাহকদের জানান যাইতেছে যে, হরিনারায়ণ সাহা, ২৪ নূরমহম্মদ লেন, কলিকাতা—**এই ঠিকানায় আর কেহ টাকা পাঠাইবেন না।** যদি কেহ ইতিমধ্যে পাঠাইয়া থাকেন এবং তাহা ফেরৎ যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিয়া সেই সংবাদটি জানাইবেন। উপরোক্ত ঠিকানায় চিঠি পাঠাইতে পারেন, শুধু টাকা পাঠাইবেন না। টাকা ডেলিভারীতে পোস্ট অফিস গোলমাল করিতেছে বলিয়াই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

টাকা পাঠাইবার নাম-ঠিকানা পরের সংখ্যা পত্রিকায় জানানো হইবে।

চিঠি-পত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

[ধনিকশ্রেণীর নিত্যনূতন অভিসন্ধি ও আক্রমণ এবং উহার বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের নিত্যনূতন প্রতিরোধ, নিত্যনূতন সংগ্রাম আমাদের চারিধারে অনবরত ঘটিতেছে। 'মঞ্জিল'কে সমৃদ্ধ ও সকলের প্রিয় করিতে হইলে সেই সকল সংবাদ ও তাহার অভিজ্ঞতার কথা পাঠক ও দরদীদেরই জানাইতে হইবে।

রাজনৈতিক হালচাল, আর্থিক সংকটের চেহারা, মালিকদের ও সরকারের আক্রমণের কায়দা এবং তাহারই বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের সংকল্প ও সংগ্রামের কাহিনী পাঠাইয়া 'মঞ্জিলের' 'চিঠি-পত্র' দপ্তরকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করিয়া দিন যাহাতে ধনিক শাসকশ্রেণীর সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া যায় এবং ক্রমবর্দ্ধমান মোহমুক্ত মেহনতী জনতার অগ্রগতি বলিষ্ঠ ও দুর্ব্বার হইয়া ওঠে।

যেখানেই আপনি থাকুন, নিজে চিঠি পাঠান এবং অন্যকে পাঠাইতে বলুন।

সম্পাদক—'মঞ্জিল'

সূতাকল শ্রমিক

মহাশয়,

আমি একজন সূতাকল শ্রমিক, কাজ করি বিড়লার কেশোরাম কটন মিলে। শ্রমিকের চাকরী তাই ইতিমধ্যেই ঘুষুড়ী, পানিহাটি প্রভৃতি সূতাকল ঘুরিয়া আসিয়াছি। ছুতানাতায় এক এক জায়গা হইতে কাজ গিয়াছে। দুই মাস তিন মাস বসিয়া থাকার পর অবার অন্যত্র কাজ জুটাইয়াছি। কিন্তু এবার মনে হইতেছে কাজ আর জুটিবে না।

আমাদের কলে আবার ছাঁটাই সুরু হইয়াছে। কিছুদিন পুর্ব্বেই ২৫০ ছাঁটাই হইয়াছেন। শুনিতেছি নাইট শিফট তুলিয়া দেওয়া হইবে।

রবিবার রবিবার বন্ধু-বান্ধব এবং আপনার লোকদের নিকট খোঁজ খবর নেই—ছাঁটাই তো হইবই, দেখি আগে হইতে কোথাও কাজ পাই কিনা। ঘুষুড়ীতে রাধাশ্যাম আবার চলিতে সুরু করিয়াছে কিন্তু শ'খানেক লোক ছাঁটাই হইয়াছে। রাধাকিসনে ৪ মাস হইলে লকআউট চলিতেছে। অন্যান্য স্থানের অবস্থাও এক। মোহিনীতে প্রায়ই দুই তিন ঘণ্টা করিয়া কাজ বন্ধ থাকিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া মেজাজ খারাপ হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু খারাপ মেজাজ হইলেও মুখ খোলার উপায় নাই। আমাদের কলে প্রতি তিনজন শ্রমিকের পেছনে এক একজন দালাল রহিয়াছে। তাঁত চালাইতে চালাইতে একবার যদি বা মুখ খুলিয়াছি অমনি দেখা যায় ভালোমানুষের মত কেহ পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। রিপোর্ট হইয়া যাইবে। নেহি মাংতা বলিয়া ভাগাইয়া দিবে।

শ্রমিক হইলেও কিন্তু ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। খবরের কাগজের সংবাদগুলি পড়ার চেষ্টা করি। মনে মনে আশা থাকে দেখি আমাদের দুর্ভাগ্য শেষ হওয়ার সত্যিই কোন সম্ভাবনা আছে কিনা।

কারখানায় গুমরাইতে গুমরাইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কথাই ভাবিয়াছিলাম, এই হতভাগা মন্ত্রীদের উচ্ছেদ না করিলে কিছু হইবে না।

এখন হঠাৎ দেখিতেছি খবরের কাগজে নির্ব্বাচনের নানাকথা উঠিতেছে। অনেকেই বলিতেছেন, শরৎবাবু বা বামপন্থীরা এইবার একটা সুরাহার জন্য দাঁড়াইবেন।

কিন্তু দাঁড়াইয়া করিবেন কি? ন্যায্য নির্ব্বাচন হইলে তো? ধরুন আমাদের কারখানা। ছাঁটাইয়ের সম্পর্কেই মুখ খুলিতে পারি না তো নির্ব্বাচনে একজন সাচ্চা লোককে ভোট দাও একথা বলারই আমাদের সুযোগ কোথায়?

কেননা আমাদের কারখানার সাচ্চা লোক বলিয়া মজুরেরা যাহাদের নাম করিতে চাহিবে, তাহারা যে পুলিসের দাপটে লুকাইয়া রহিয়াছেন।

আর ভোটের ব্যাপার তো অনেক দেখিলাম। আমরা শ্রমিকেরা যদি ভোট দিই তবে কি ছাঁটাই বন্ধ হইবে? আমাদের হপ্তা যে কম হইতেছে তাহা কি বাড়িয়া যাইবে?

নির্ব্বাচনে জিতিলেও আমরা কয়জন লোককে পাঠাইতে পারিব। লাখ লাখ

কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধের দাবী বামপন্থীরা তোলেন না কেন?

শ্রমিক অথচ শ্রমিক-আসন মাত্র ৭টি। এই ৭ জন লোকের সকলেও যদি বলেন, না ছাঁটাই করা চলিবে না, কে শুনিবে? ভোট তো বড় লোকের। বাকি সমস্ত প্রতিনিধিই তো আসিবেন, বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী জমিদার, বাড়িওয়ালা এবং উপর তলার শতকরা ১৩ জনের মধ্য হইতে। এ পলিসি আমরা খুব বুঝি।

শরৎ বাবু এবং অন্যান্য দলগুলি কংগ্রেসকে হারাইবার কথা বলিতেছেন। কংগ্রেসকে হারাইলে মজুরেরা খুশীই হইবে। কিন্তু মন্ত্রীদের পলিসি ভাঙার জন্য তাঁহারা কিছুই করিতেছেন না কেন। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অনুসারে ন্যায্য আসন চাই। সমস্ত লোকের গণভোটের অধিকার চাই—এইটুকু দাবি শরৎ বাবুরা করিতেছেন না কেন। এইটুকু দাবি করিতেই যদি এত মাথা চুলকানি, তবে খুনী মন্ত্রীদের উচ্ছেদ করিবেন কেমন করিয়া। বিড়লাজীদের মজুর মারা হাতে হাতকড়া পরাইবেন কি সাহসে?

আর বন্দীদের কথা তো সকলেই ভুলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু আমরা ভুলিব কি করিয়া। এমন একদিন ছিল, যখন আমাদের কারখানার 'বাহার আও' বলা মাত্র ৮ হাজার মজুর হরতাল করিয়া বাহিরে আসিত। কিন্তু সেই লোকেরা আজ জেলে! বাকি ভালো লোক যাহারা ছিল প্রায়ই দেখি তাহাদের এক-আধ জন করিয়া গ্রেপ্তার হইতেছে। কংগ্রেসকে যদি হারাইতেই হয় তবে এই কমিউনিস্টদের না পাইলে কেমন করিয়া হারাইবেন। অথচ তাহাদের খালাস দেয়া হোক, তাহাদের পার্টিকে আইনী করা হোক, কোন বামপন্থীরা এ দাবি করিতেছেন না! করিতেছেন না কেন?

আমরা তো সোজা বুঝি এই দাবি না করা মানে কংগ্রেসকেই জোরদার করা। শরৎবাবুর কি তাহাই চাহেন?

এদিকে আগেই বলিয়াছি, কারখানায় ছাঁটাই হইতেছে। এবার আবার কোম্পানী বলিতেছেন, বোনাস দেওয়া হইবে না। মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। নির্ব্বাচনের জন্য অপেক্ষা করার সময় নাই। যত দালালই থাক, হঠাৎ বাগিয়া গিয়া ধর্ম্মঘট করার অভ্যাস আমাদের আছে। জানি এই পথেই মালিক শায়েস্তা হয়, মন্ত্রীরা শায়েস্তা হয়। নির্ব্বাচন হইলেও ছাড়িব না, না হইলেও ছাড়িব না। ভুলেও ভাবিবেন না যে রাগ আমাদের জল হইয়া যাইবে, ধর্ম্মঘটগুলি আমরা মুলতুবা রাখিব। —ইতি

কেশোরামের জনৈক শ্রমিক,
বদরতলা

বামপন্থীর চিঠি

সম্পাদক মহাশয়,

বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি নির্ব্বাচন মহড়ায় নামিয়াছে, কেহ বা বামপন্থী ঐক্যের দ্বারা নির্ব্বাচন জিতিবার কথা বলিতেছে, কেউ বা সোসালিস্ট পার্টির মত বলিতেছে, সব বামপন্থী দলগুলি মিলাইয়া একটি পার্টি গড়িয়া গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়া সমস্যার সমাধান হইবে এবং দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে আগাইয়া যাইবে। সব বামপন্থীরাই সব কথা বলিতেছে, শুধু বলিতেছে না দুইটি কথা। কেহই কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার কথা বলিতেছে না এবং কেহই নির্ব্বাচনের সুযোগে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করিতেছে না। কিন্তু শ্রেণী-সমাজের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম না করিলে বর্ত্তমান সমাজ বদলাইবে কি করিয়া? কমিউনিস্ট পার্টি দেশের এই শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র করিতেছে, মালিকশ্রেণী কর্ত্তৃক বা মালিকশ্রেণীর রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শ্রমিক বা শোষিত জনতার উপর আঘাত আসিলে তাহা রুখিবার কথা বলিতেছে এবং সেইমত কাজও করিতেছে। পুঁজিবাদী বিধান মন্ত্রিসভা কি সেইজন্যই তাহাদের বেআইনী করে নাই? বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি কেন তাহাদের আইনী করার কথা বলিয়া শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করার কথা ভাবিতেছে না? কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী-সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করিয়াছে ইহাই কি তাহাদের অপরাধ? বামপন্থী দলগুলি নিজেরা শ্রেণী-সংগ্রামে যোগ দেয় নাই, বরং নিজেদের বামপন্থী বলা সত্ত্বেও অনেক সময়েই শ্রেণী সংগ্রামে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গিয়াছে, শ্রমিক ঐক্য ধ্বংস করিয়াছে, জয়প্রকাশ তো সরাসরি তিন লক্ষ শ্রমিকের ভোটকে অগ্রাহ্য করিয়া রেল ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধতা করিয়াছে! তাঁহারা সত্যই যদি বামপন্থী হন তাহা হইলে শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী-সংগ্রামে সাহায্যের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানানো উচিত ছিল, কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণী-সংগ্রামের শিক্ষা নিজেদের গ্রহণ করা উচিত ছিল এবং সর্ব্বোপরি এতদিনের মধ্যে নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে উচ্চকণ্ঠে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবী করিয়া কংগ্রেসী গণতন্ত্রের মুখোস খুলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। সে পথ তাঁহারা কেন ধরেন নাই? কেন তাঁহারা দমননীতির বিরুদ্ধে লম্বা-চওড়া কথা বলিয়াও কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করা সম্বন্ধে নীরব আছেন? শ্রেণী-সংগ্রাম-নীতি বাদ দিয়া যে পথ তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন তাহা কি শ্রেণী-সমন্বয়ের পথ নহে? তাহা কি ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে নির্ব্বাচনে এবং অন্যান্য ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে সহযোগিতা করারই পথ নহে? সেইজন্যই কি তাহারা কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার কথা বলিতে ভয় পাইতেছেন? সেইজন্যই কি তাহারা কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়া শিবহীন যজ্ঞের কথা ভাবিতেছেন? তাঁহারা কি বুঝিতেছেন না কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, ছাত্র, মহিলা এবং জেলের বন্দীরা যে লড়াই লড়িয়াছেন, যে গুলি খাইয়াছেন, জনতার মধ্যে যে ক্রোধ জাগ্রত করিয়াছেন তাহার জন্যই লোকের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়াছে, শরৎ বাবু নির্ব্বাচনে জিতিয়াছেন এবং ধনিকশ্রেণী ঘাবড়াইয়াছে? সেইজন্যই কি নির্ব্বাচনের মলম লাগাইয়া ধনিকশ্রেণীর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা নিজেদের ঘৃণ্য ব্যাধি ঢাকিয়া নূতন করিয়া মসনদ দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে না? তা সত্ত্বেও বামপন্থী দলগুলি কেন কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার কথা বলিতেছে না? ইহা কি বামপন্থা? না, দক্ষিণপন্থা?

—জনৈক বামপন্থী

এই মুহূর্ত্তে কিনুন এবং পড়ুন

গ্রামের গরীবদের প্রতি—৲; রাষ্ট্র ও বিপ্লব—২৷৷০; ১৯০৫ সালের বিপ্লব—৷৷৵০; সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—৪৲; রুশ বিপ্লবের ইতিহাস—১৷৷০।

নিউ পাবলিশার্স—
৬নং, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১২

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জেলে জেলে রাজবন্দীদের দুঃসহ জীবন ঃ সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

সরকারী নীতিতে বন্দীরা আবার ব্যাপক অনশন ধর্ম্মঘটের মুখে

ময়মনসিংহ জেলে অচিকিৎসায় মৃত্যু ঃ আরেকজন অন্ধ ঃ রাজসাহী জেলে অনশন

মেদিনীপুর জেলে অমানুষিক ব্যবস্থা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় এক হাজার কমিউনিস্ট কর্ম্মী আজ নুরুল আমীন সরকারের ফ্যাসিস্ট জেলে বন্দী। শ্রমিক কৃষকদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জেলে পুরিয়া সেখানে আজ তাঁহাদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার চালানো হইতেছে।

কয়েকমাস আগে রাজবন্দীদের উপযুক্ত মর্য্যাদা দাবী করিয়া এবং জেল কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া রংপুর এবং ঢাকা জেলে বন্দীরা অনশন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নুরুল আমীন সরকার তখন বন্দীদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, বন্দীদের সমস্ত দাবী পূরণ করা হইবে। এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বন্দীরা সেদিন অনশন ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতে-ই নুরুল অমীন সরকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে সুরু করিয়াছে—এখন তাহারা আবার বন্দীদের অনশনের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ যে, গত ১৯ই জুলাই হইতে **রাজশাহী** সেণ্ট্রাল জেলে ৯ জন রাজবন্দী আমরণ অনশন চালাইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সকলের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

রংপুর জেলে অনশন ভঙ্গের সময় বন্দীদের যে সামান্য সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহা-ও ডেপুটি কেলারের আদেশে বাতিল করার ব্যবস্থা হইয়াছে। মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহাদের যেটুকুন সুবিধা দওয়া হইয়াছিল তাহাও কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। কথায় কথায় বন্দীদের হাতকড়ি লাগাইয়া সাজা দেওয়া হইতেছে। বন্দীদের পৃথক পৃথকভাবে কুঠরিতে বন্ধ করা হইয়াছে। এই জুলুমের প্রতিবাদে বন্দীরা অনশনের সংকল্পই ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলে বন্দীদের দুরবস্থা আজ চরমে গিয়া পৌছিয়াছে। এই জেলে বর্ত্তমানে ৬৫ জন বন্দী আছেন। ইহাদের কাহাকেও রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। বন্দীদের যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় তাহা এতই খারাপ যে বন্দীদের অধিকাংশই আমাশয় ও নানাবিধ পেটের পীড়ায় ভুগিতেছেন। জেলখানায় কোনরূপ চিকিৎসার-ই ব্যবস্থা নাই—ইহার জলন্ত প্রমাণ হইল জেলের মধ্যে নালিতাবাড়ীর কৃষক নেতা কমরেড চান্দির মৃত্যু। নুরুল আমীন সরকারের পুলিস একদিন আহত করিয়া রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষক নেতা কমরেড চান্দি, শচীন, জলধর পাল ও রবি নিয়োগীকে জেলে লইয়া আসে। তাঁহাদের দেহে পুলিসের আঘাত গুরুতর থাকা সত্ত্বেও জেলখানায় কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে, অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই **কমরেড চান্দির আঘাত বিষাক্ত হইয়া যায় এবং এবং বিনা চিকিৎসায় তিনি জেলের মধ্যেই মারা যান। কমরেড শচীনের আঘাত লাগিয়াছিল সবচেয়ে বেশি চোখে—বিনাচিকিৎসায় অল্পকয়েকদিনের মধ্যে কমরেড শচীন অন্ধ হইয়া যায়।**

ঢাকা জেলে বন্দীদের অবস্থাও অনুরূপ। অনশন ভঙ্গের সময় নুরুল আমীন সরকার রাজবন্দীদের যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহার একটিও পূরণ করা হয় নাই। পরন্তু দিনের পর দিন জেল কর্ত্তৃপক্ষের জুলুম বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এইভাবে বিভিন্ন জেলে বন্দীদের নির্য্যাতন করিয়া নুরুল আমীন সরকার আবার তাঁহাদের অনশনের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘটের সময় নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা বন্দীদের যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল আজ তাহা একটি একটি করিয়া ভঙ্গ করা হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলে ৪১ জন ডেটিনিউ এবং ২৭০ জন বিচারাধীন রাজবন্দী রহিয়াছেন। অনশন ভঙ্গের সময় সরকারের পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, সমস্ত বিচারাধীন রাজবন্দীদেরই উচ্চশ্রেণীভুক্ত করা হইবে। কিন্তু মেদিনীপুরে এই ২৭০ জনের মধ্যে মাত্র ৪৮ জনকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। নানারকম অজুহাত দেখাইয়া আর বাকী সকলকেই তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে।

দীর্ঘদিন অনশনের ফলে বন্দীদের অনেকের স্বাস্থ্যই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু জেলখানায় তাহাদের কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইতেছে না। কয়েকজন বন্দীর মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের জন্য কোনরূপ ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিতেছে না। সমস্ত রাজবন্দীদের-ই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, **অসুস্থদের জন্য কোনরূপ পৃথক পথ্যের ব্যবস্থা করা হইবে না—তাহাদের দৈনিক খাওয়া খরচ হইতে এই পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে!** ঔষধও রীতিমত দেওয়া হইতেছে না। অনশনের পর অনেকেই কঠিন রোগে ভুগিতেছেন—তাহাদের জন্য যে সমস্ত ঔষধ দরকার তাহার অধিকাংশই জেল হাসপাতালে নাই। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বাহির হইতে কোনরূপ অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ আনাইয়া দিতে অস্বীকার করিতেছে। ফলে যাহারা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন—বিশেষ করিয়া যাহাদের মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিনা ঔষধপথ্যে দিনের পর দিন মরণের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

মেদিনীপুরে বন্দীদের উপর নলিনী-বিধান সরকারের অত্যাচারের আরও একটি দিক রহিয়াছে। জানা গেলে, সম্প্রতি জেলকর্ত্তৃপক্ষ জেলের গুণ্ডাপ্রকৃতি কয়েকজন সাধারণ কয়েদীদের রাজবন্দীদের উপর হামলা করিবার জন্য লেলাইয়া দিয়াছে। একদিন এই রকম ২৫ জন সাধারণ কয়েদী রাজবন্দীদের হঠাৎ আক্রমণ করিয়া কয়েক জনকে ভীষণভাবে আহত করিয়াছে।—

এইভাবে মেদিনীপুরে রাজবন্দীদের উপর নলিনী-বিধান সরকারের অত্যাচার চলিয়াছে।

জেলে বন্দীহত্যার অভিযান

চারি দেয়ালের মাঝখানে খাঁচায় বন্ধ রাজবন্দীদের উপর ভারতের বিভিন্ন জেলে দমদম এবং আলীপুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হইতেছে, কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী নৃশংসভাবে গুলি চালাইয়া বন্দীদের খুন করা সুরু করিয়াছে।

গত ১১ই আগস্ট মাদ্রাজে কুড্ডালোর জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের উপর গুলি চালাইয়া একজন কমিউনিস্ট বন্দীকে হত্যা করা হইয়াছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে বন্দীরা সেলে ঢুকিতে অস্বীকার করায় সশস্ত্র বাহিনীসহ জেল ইনস্পেক্টর অব পুলিস, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডি, এস, পি আসিয়া বন্দীদের উপর আক্রমণ সুরু করে। বীর কমিউনিস্ট বন্দীর মৃত্যুতে আমরা লালঝাণ্ডা অবনমিত করিতেছি।

কুড্ডালোরের ঘটনার দুই দিন পরে গত ১৩ই আগস্ট সবরমতী জেলে গুলি চালাইয়া আরো দুইজন কমিউনিস্ট বন্দীকে খুন করা হইয়াছে। সবরমতী জেল হইতে জারবেদা সেনট্রাল জেলে বদলীর প্রতিবাদে কমিউনিস্টবন্দীরা সেলে ঢুকিতে অস্বীকার করায়—পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নেতৃত্বে আর্ম্মড পুলিস আসে এবং তারপর অজস্রধারায় গুলি চালনা সুরু হয়। বন্দীরা খাট, ফার্নিচার, শেলফ, ইট-কাঠ দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। দুই জন কমিউনিস্ট বন্দীকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে আরো আঠার জনকে গুরুতরভাবে আহত করা হইয়াছে। বীর বন্দীদের মৃত্যুতে আমরা লালঝাণ্ডা অবনমিত করিতেছি।

উপরোক্ত ঘটনা ছাড়া গত ৬ই আগস্ট সালেম সেনট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর লাঠিচার্জ্জ করা হয়। ৪ জন বন্দীকে গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ৩রা আগস্ট ভেলর সেনট্রাল জেলে পুলিস আক্রমণে একজন বন্দী গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে।

হাসপাতালে মেয়ে বন্দীদের প্রতি জঘন্য অত্যাচার

পশ্চিম বাংলার জেলে রাজবন্দীদের গুলি করিয়া হত্যা করিয়া নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা ফ্যাসিস্ট শাসনের ইতিহাস রচনা করিয়াছে। অনশনব্রতী বন্দিনীদের উপর ইহারা জঘন্যতম অত্যাচার চালাইয়াছে। অনশনের পরও বন্দিনীদের উপর ইহাদের অত্যাচার থামে নাই।

দীর্ঘদিন অনশনের ফলে বন্দিনীদের অনেকের স্বাস্থ্যই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কয়েকজনের অবস্থা এমন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে যে, জেল-হাসপাতালের চিকিৎসায় আর চলিতেছে না—সরকার বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বাহিরের হাসপাতালে পাঠাইয়াছে। সেইখানেও আই, বি পুলিসেরা বন্দিনীদের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করিতেছে।

১৪ই জুলাই দুই জন বন্দিনীকে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়া আসা হয়। তাঁহাদের দুই জনের ক্যাবিনের সম্মুখে আই, বি পুলিস বসানো হয়। তাহারা অভদ্রের মতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় মেয়েদের ক্যাবিনের মধ্যে উঁকি মারিতে থাকে। বন্দিনীরা এই অভদ্র ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইহার উত্তরে পুলিসের লোকেরা বলে যে, তাহাদের উপর এইভাবেই বন্দিনীদের উপর কড়া নজর রাখার হুকুম আছে। বন্দিনীরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লেখেন। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় না। ইহাতে আই, বি পুলিসদের আস্কারা বাড়িয়া যায়।

২৫শে জুলাই যখন ক্যাবিনের মধ্যে বসিয়া এই দুই জন বন্দিনী আলাপ করিতেছিলেন, তখন লালবাজার হইতে একজন পুলিস আসিয়া হঠাৎ ক্যাবিনের মধ্যে ঢুকে এবং অভদ্র আচরণ করিতে থাকে। বন্দিনীদের মধ্যে তখন একজন পায়ের জুতা খুলিয়া তাহাকে উচিত শিক্ষা দিয়া দেন।

এই ঘটনার পর জেল হইতে একজন জমাদারণীকে আনিয়া ক্যাবিনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। রাত্রিতে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করা চলিবে না এবং জমাদারণীকে ক্যাবিনের মধ্যে রাখিতে হইবে

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বোনাসের দাবীতে লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চুক্তি সম্পন্ন হইবার পর হইতে শ্রমিক-শ্রেণী মালিকের 'লাভের অংশীদার' হইবে—এরূপ একটি গুজব বাজারে চালু হয় এবং এই অংশীদারিত্বের নাম করিয়াই মালিক-সরকার 'জাতীয়' টি-ইউ ও সোশ্যালিস্ট পাপচক্র শ্রমিকশ্রেণীকে বোনাসের দাবী হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু অংশীদারিত্বের এই "পরিকল্পনা" আজ দুই বছর ধরিয়া কাগজে কলমেই রহিয়া গিয়াছে, স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইহা নিছক ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়।

* ১৯৪৮-এর ট্রাইব্যুনালের রায়ে বাংলার চট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্সটাইল শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের বোনাসের দাবী সরকার কর্তৃক অস্বীকার করা হইয়াছে, এমন কি যেখানে বোনাসপ্রথা চালু ছিল সেখান হইতেও বোনাসের সুবিধা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে।

* বোম্বাইয়ের কাপড়-কল মালিকদের অতি-মুনাফা লোটার কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইয়া পড়িলে শিল্প-আদালত বাধ্য হইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য শ্রমিকদের সাড়ে চার মাসের মজুরি ও ভাতা বোনাস হিসাবে মঞ্জুর করে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার সাত-তাড়াতাড়ি অর্ডিনান্স জারি করিয়া এই বোনাসের একাংশ 'জপ্ত' করেন,—অর্ডিনান্সের বলে তাঁহারা শ্রমিকদিগকে কাগজ টাকার বদলে সেভিং সার্টিফিকেটের আকারে বোনাসের টাকা নিতে বাধ্য করিতে চান।

* বোনাস ব্যবস্থায় টাটাদের "বদান্যতা"র খ্যাতি আছে (আসলে ইহা অতি অল্প মূল বেতনরে নগ্নরূপকে ঢাপা দিবারই একটি প্রয়াস) এই টাটারাই ১৯৪৭-৪৮ সালে শ্রমিকদের যে হারে বোনাস দিয়াছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে তাহা অপেক্ষা ১৫ লক্ষ টাকা কম দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। অথচ এই বছরে লাভের অঙ্ক আগের চেয়ে বাড়িয়াছে।

এইভাবেই ধনিকশ্রেণী আজ মরিয়া হইয়া শ্রমিকদের বোনাসের দাবিকে রুখিবার চেষ্টা করিতেছে—শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের মান এবং মজুরির উপর তাহাদের সাধারণ আক্রমণের ইহা একটি অংশ মাত্র। কিন্তু অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী আজ সারা দেশ জুড়িয়া নূতন চেতনা ও কঠিন শপথ লইয়া আগাইয়া আসিতেছেন —তিন-চার মাসের মাহিনা বোনাস হিসাবে আদায় করিতেই হইবে, ইহা আদায় করিতে পারার অর্থ পরোক্ষভাবে শতকরা ২৫ হইতে ৩৩ ভাগ বেতন বৃদ্ধি।

বাংলা দেশে বোনাসের দাবীতে লড়াইয়ে বরাবর অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন ট্রাম এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শ্রমিকরা; কিন্তু চা, চট, কয়লা, কাপড় এবং অন্যান্য শিল্পের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এখনও পিছনে পড়িয়া আছেন। এই সব শিল্পের ক্ষমতা-শালী ইংরেজ-মারোয়াড়ী মালিকরা শ্রমিকদের কেবল যে বোনাস দিতেই অস্বীকার করিতেছে তাই নয়। তাহারা চায় ভারতীয় শ্রমিকদের একাংশকে সর্ব্ব-নিম্ন মজুরি দিয়া ও চরমতম শোষণ করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে।

এ-আই-টি-ইউ-সি'র নেতৃত্বে বাংলার শ্রমিকশ্রেণী আজ মিলিত শক্তিতে আগাইয়া আসুন, এই ১৯৪৯ সালেই জঙ্গী আন্দোলনের মধ্য দিয়া বানচাল করিয়া দিন শোষকশ্রেণীর সমস্ত কারসাজী, বোনাস এবং অন্যান্য মূল দাবী আদায় করুন।

বিড়লার ওরিয়েণ্ট ফ্যানে 'সোশ্যালিস্ট' দালালদের সহযোগিতায় শ্রমিক ছাঁটাই

দুই সপ্তাহ ধরিয়া বেলেঘাটার ক্যাল-কাটা ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং (ওরিয়েণ্ট ফ্যান) কোম্পানীতে লক আউট চলিতেছে।

এই কারখানার মালিক সুরামল মোহতা বিড়লা পরিবারদেরই একজন। সংকটের অজুহাতে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে তাহারা ১৭৫ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেন।

সাধারণ শ্রমিকেরা ইহার প্রতিবাদ করার জন্য প্রস্তুত হইতে চাহেন। কিন্তু ইউনিয়নটি সোশ্যালিস্টদের। অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে তাহারা শ্রমিকদের প্রত্যেকটি দাবি ও সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে থাকে।

এই ছাঁটাইয়ের সময় ইউনিয়ন নেতা কালিবাবু কলিকাতায় ছিলেন না। সোস্যা-লিস্ট কর্ম্মীরা শ্রমিকদিগকে বোঝান যে এখন সংগ্রাম করা ঠিক নয় কালিবাবু ফিরিয়া আসুন।

মালিকেরা তো ইহাই চাহেন। তাই জুলাইয়ের শেষে আবার ১৫০ জনকে ছাঁটাইয়ের এক লিস্ট তৈয়ারী হইল। শোনা গেল কারখানার ৭০০ শ্রমিকের অধিকাংশকেই এইভাবে দফায় দফায় ছাঁটাই করা হইবে। কারখানা গুটাইয়া ছোট করিয়া আনা হইবে।

সাধারণ মজুরেরা এবার আর সোশ্যা-লিস্টদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কার-খানার ভিতরে অবস্থান ধর্ম্মঘট সুরু করিলেন। ব্যাপার দেখিয়া সোশ্যালিস্ট-পন্থীরা উপদেশ দিলেন অবস্থান ধর্ম্মঘট নয়, অনশন ধর্ম্মঘট করো।

মালিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা যখন এক হইয়া দৃঢ়তর সংগ্রামের রাস্তা লইতেছে তখন এইরূপ উল্টা-পাল্টা উপদেশের অর্থ আর কিছুই নয়, শ্রমিকদের সংগ্রামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

ফলে কিছু লোক অবস্থান ধর্ম্মঘট সুরু করিলেন। কিছু লোক অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিলেন।

মালিকও তাহাই চাহেন। সুযোগ বুঝিয়া কংগ্রেস সরকার একদল সশস্ত্র পুলিস পাঠাইল। তাহারা মজুরদের বাহির করিয়া দিয়া কারখানা দখল করিয়া রাখিল। সমস্ত শ্রমিককে ছাঁটাই করিয়া লক-আউট ঘোষণা করা হইল।

যেভাবে ইহার প্রতিরোধ করিলে মালিককে শায়েস্তা করা যাইত তাহা না করিয়া সোশালিস্ট পন্থীরা লেবার কমি-শনারের কাছে ছুটিলেন। ইউনিয়ন নেতা কালিবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি মুখই খুলিলেন না। এবং লেবার কমিশনার মালিকের কথায় সায় দিয়া গেলেন।

শ্রমিকেরা এবার গেলেন খোদ শিব-নাথ ব্যানার্জ্জীর কাছে। তিনি শ্রমিকদের নিকট না যাইয়া চিঠি পাঠাইলেন, বড়ো দেরী হইয়া গিয়াছে। আর কিছু করা যাইবে না।

এইভাবে সোশ্যালিস্টরা এই কারখানার ৭০০ শ্রমিকের লড়াইকে প্রতি পদে পলিসি করিয়া ধ্বংস করিতেছে।

শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে গরিব অংশ তাই মরীয়া হইয়া বলিতে সুরু করিয়াছেন, মালিকদের সঙ্গে লড়িতে গেলে সোশ্যালিস্ট নেতা লইয়া চলিবে না।

২৫শে আগস্ট 'নিখিল ভারত ছাত্র-দিবস'

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

২০০ করা হইয়াছে। রাবোর্ন ও বেথুন কলেজের ছাত্রীদের মাহিনা ৪৲ টাকা হইতে একেবারে ১০৲ টাকায় উঠিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সমস্ত হোস্টেলে প্রতি সীটের ভাড়া হঠাৎ আরো দুই টাকা বাড়ান হইয়াছে। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ জানাইয়াছেন: লেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের খরচ ভারত সরকার আর দিতে পারিবে না, সুতরাং উঠাইয়া দিতে হইবে।

এই সমস্ত আক্রমণকে ছাত্রসমাজ যাহাতে প্রতিরোধ না করিতে পারে তাহার জন্য চালু রহিয়াছে স্কুলে কলেজের ভিতরে ও বাহিরে ফ্যাসিস্ট দমননীতি ও বর্ব্বর অত্যাচার।

গত এক বছরে প্রায় পঞ্চাশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক-আউট ঘোষণা করা হইয়াছে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি কলেজের ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে—সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ হইতে 'রাজনীতি' না করার বণ্ড লওয়া হইয়াছে, ইহাছাড়া কথায় কথায় বিতাড়ন, জরিমানা ইত্যাদি তো দৈনন্দিন ব্যাপার।

বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা গত ৮ মাসে ৫০০ ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কংগ্রেসী পুলিসের গুলিতে ১১ জন ছাত্রের প্রাণ গিয়াছে। শতাধিক আহত হইয়াছে। কংগ্রেসী সরকারের এই ফ্যাসিস্ট শিক্ষানীতি ও বর্ব্বর অত্যাচারকে পরাস্ত করিয়া গণতান্ত্রিক শিক্ষার সমস্ত দাবী আদায়ের জন্য দেশব্যাপী আরো তীব্রতর বিপ্লবী সংগ্রাম নূতনভাবে সুরু করিতে হইবে ২৫ আগস্ট হইতে।

বাংলার সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও বিশেষ-ভাবে বিভিন্ন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমাদের আবেদন: আসুন সকলের মিলিত শক্তির জোরে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা দাবী আদায়ের সংগ্রামকে দুর্ব্বার করিয়া তুলি।

মঞ্জিল

মেয়ে বন্দীদের প্রতি জঘন্য অত্যাচার

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

বলিয়া পুলিসেরা জিদ করিতে থাকে। বন্দিনীরা ইহার প্রতিবাদ করিলে জমা-দারণী তাঁহাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয় এবং অসুস্থ বন্দিনীদের মারিতে পর্য্যন্ত যায়।

বন্দিনীরা রাত্রিবেলা ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া রাখিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে, দরজা খোলা রাখিলে তাঁহারা জাগিয়া থাকিবেন। তাঁহারা একরাত্রি জাগিয়া থাকেন ও পরের দিন এই জঘন্য ব্যবস্থার প্রতিবাদে অনশন ধর্ম্মঘট করেন।

কর্ত্তৃপক্ষের তখন টনক নড়ে। জমাদারণীকে পরের দিন সরানো হয়—শুনা যাইতেছে যে, তাহার প্রমোশন হইয়াছে। বন্দিনীরাও পরেরদিন দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমান। কিন্তু ক্যাবিনের সামনে আই, বি পুলিসের পাহারা পুরা-মাত্রায়-ই বজায় রহিয়াছে।

এই সপ্তাহে সংগ্রহ করুন

মার্কস্‌বাদী : ৪র্থ সংখ্যা—দাম ১।০

অর্থনীতি, রাজনীতি,, দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে আলোচনা। শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের অগ্রগতির পথে নতুন তথ্য ও সত্যের নিশানা দেবে "মার্কস্‌বাদী" একটি সংকলন গ্রন্থ।

"মার্কস্‌বাদীর" ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যার সামান্য কপি আছে। প্রত্যেকটি সংখ্যার দাম ১।০ করে।

১৯০৫ সালের বিপ্লব : লেনিন, দাম দশ আনা

১৯০৫ সালে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জার গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়েছিল, এর পরিণতি হল বুর্জ্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ, লেনিনের কয়েকটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতা এতে আছে।

বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা : লজোভস্কি, দাম আট আনা

সমস্যাসঙ্কুল বাংলা দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিককর্ম্মীদের পক্ষে এই বইখানি অপরিহার্য্য। ধনিকশ্রেণীর পোষাকুত্তারা আজ শ্রমিকশ্রেণী তথা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ আনবার জন্য মরিয়া হয়ে লেগেছে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যই হোল আজকের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান বিষয়।

নিউ পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২,

শান্তি ও গণতন্ত্রবিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টারই অঙ্গ—সোভিয়েটবিরোধী কুৎসা

এবছর এপ্রিল মাসে মস্কো শহরে সারা সোভিয়েট ইউনিয়নের ১০ম ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভাপতি ভ্যাসিলি কুজনেৎসভ বলেন :

"কমিউনিস্ট সমাজ গঠন প্রচেষ্টার প্রতি পদে সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়নগুলি হইয়াছে কমিউনিজম-এর স্কুল ; কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর ভিতর যোগ-সূত্র হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিই সবার বেশী গুরুত্বপূর্ণ গণ-সংগঠন....।"

যুদ্ধবাদ ও সোভিয়েটবিরোধী কুৎসা

সোভিয়েট দেশে এই কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের কাজ যতই বেশি হিম্মত লইয়া আগাইয়া চলিয়াছে, মহা সঙ্কটের সম্মুখীন পুঁজিবাদী দুনিয়া ততই আতঙ্কিত হইয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে দুনিয়াজোরা আরেকটি যুদ্ধ বাধাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি দেশের মেহনতী জনগণ ক্রমেই আরও বেশি শক্তি লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতেছে—প্রকৃত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য লড়াইয়ে প্রত্যেকটি দেশের শোষিত জনগণ সোভিয়েটের নেতৃত্বে শান্তির শিবিরে সমবেত হইতেছে। তাই, এই গণতন্ত্রী সমাবেশকে দুর্ব্বল করিবার জন্য, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মহা-ভরসাস্থল সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে বিপ্লবী জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রচেষ্টার পাশাপাশি চলিয়াছে হিটলারী দমননীতি, আর জঘন্য সোভিয়েটবিরোধী কুৎসাপ্রচার।

আমাদের দেশেও "জাতীয়তাবাদী" নামধারী ধনিকশ্রেণীর মুখপত্রগুলি মার্কিন ও বৃটিশ কর্ত্তাদের নিকট হইতে এই মিথ্যার রোগ নিয়া তাহাদের কাগজের পাতায় পাতায় সোভিয়েটবিরোধী জঘন্য পচা মালের হাট বসাইয়াছে। কোন কোন ক্ষুদে মালিকও পয়সা খরচ করিয়া "সমাচার" ছাপাইয়া শ্রমিকদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর ভরসা করিয়া লাভ নাই—সেখানে শ্রমিকদের দাস করিয়া রাখা হইয়াছে ; ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবস্থাই শ্রমিকের আদর্শ ; সেই আদর্শে খুব মনদিয়া খাটিয়া উৎপাদন বাড়াইয়া যাও !

কয়েকটি সোজা অঙ্ক

সাম্রাজ্যবাদের এই ভাড়াটিয়াদের মুখে কিছুই আটকায় না। মিথ্যা নামে মিথ্যা অঙ্ক দিয়া তাহারা "দেখাইয়া দেয়" যে সোভিয়েট ইউনিয়নে লোকে আধ পেটা খাইয়া রহিয়াছে, জামা কাপড় পরিতে পায় না, ট্রেড ইউনিয়ন নির্ব্বাচন হয় না, শ্রমিকরা একেবারে ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে !

কিন্তু, কে না জানে যে, যুদ্ধের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিতে করিতেই '৪৮ সালে তিনবার জিনিসের দাম কমিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুরির অঙ্কও বাড়িয়া সোভিয়েট ইউনিয়নে **আসল মজুরিই শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশী বাড়িয়া গিয়াছে।** কেবল মজুরি নয়। বৃদ্ধ বয়সের ব্যবস্থা, অসুস্থতার সময়কার খরচা, ইত্যাদি বাবদ ১৯৪৯ সালে সোভিয়েট দেশে মেহনতীদের **'সোশ্যাল ইন্‌স্যুরেন্স' তহবিলে ১৭০০ কোটি রুবল দেওয়া হইয়াছে** (১০ আনায় এক রুবল)। ইহার একটি পয়সাও শ্রমিকদের দিতে হয় নাই—সবটাই আসিয়াছে সরকার হইতে। এবং ইহা পুরাপুরি ট্রেড ইউনিয়নগুলির হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে 'সোশ্যালইন্‌স্যুরেন্স' সম্পর্কে যে নির্ব্বাচিত কমিটি আছে তাহারাই এই অর্থ বিলি করে। এইসব খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের ফলে শতকরা আরও ৩৮ ভাগ মজুরি বাড়িয়া গিয়াছে।

জীবনযাত্রার মান বাড়িয়াই চলিয়াছে

শতকরা ১৩৮ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি পাইয়া সোভিয়েটের মেহনতী জনগণ কী করে ? না খাইয়া থাকে ? অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া ঘোরে ? ইহার জবাবে কয়েকটি অঙ্ক আছে :

মার্চ্চ মাসে যে আর এক দফা দাম কমিল তাহার ফলে জিনিসপত্র বিক্রয় বাড়িয়া গেল—ফেব্রুয়ারি মাসে যাহা ছিল তাহার উপর মাংস ২৩% (শতকরা ২৩ ভাগ), মাখন ও ভেজিটেব্‌ল তেল ২২% ; চিনি ৭%, মাছ ও মাছের খাবার ১৬%, পশমের কাপড়চোপড় ৩৮%, রেশমী কাপড়-চোপড় ৩৬%, জুতা ৫৪%, মোজা, ইত্যাদি ৬৩%, অন্যান্য পোষাক ৫১%। এবং, এখানে তো কয়েকটি মাত্র জিনিসের হিসাব দেওয়া হইল।

এই সব জিনিস যাহারা কিনিয়াছে তাহারা না খাইয়া অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতে পারে, এ-কথা বলিতে পারে কে ? কল-কারখানায় শ্রমিকের রক্ত চোষা মালিক আর তাহাদের দালালেরা !

অথচ, কেবল খাওয়া পরাই নয়। রেডিও, গ্রামোফোন, সাইকল, মোটর-সাইকল, ঘড়ি, ইত্যাদি জিনিসও দ্বিগুণ হইতে পাঁচগুণ বেশী বিক্রয় হইতেছে।

আরও আছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, মজুরিসহ ছুটি ইত্যাদি খাতে বিরাট সরকারী ব্যয়বরাদ্দ।

সোশ্যাল ইন্‌স্যুরেন্স তহবিলে এ বছরের ১৭০০ কোটি রুবল বাড়িয়া **১৯৫০ সালে হইবে ৬১৬০ কোটি রুবল।**

এ-সব অঙ্ক আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। এই দেশী বিদেশী পুঁজির শোষণের মাঝে ইহা প্রায় অবিশ্বাস্যই মনে হয়। **কিন্তু সোভিয়েট দেশে ইহা না হইয়া উপায় নাই।** তাহাই এখানে অঙ্ক দিয়া দেখানো হইবে।

ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় আয়

জারের শাসন খতম করিয়া, উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংস করিয়া জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় আয় লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে :

এত কোটি রুবল	১৯১৩	১৯১৭	১৯২৮	১৯৩২	১৯৩৭	১৯৪০	১৯৫০ (যাহা হইতে)
	২১০০	১৬০০	২৫০০	৪৫৫০	৯৬৩০	১২৮৩০	১৭১০০
শতকরা বৃদ্ধি	১০০	৭৬·২	১৯·২	২১৬·৬	৪৫৮·৬	৬১১	৮৪২·৭

অর্থাৎ, প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯২৮-৩২) গড়পড়তা শতকরা ১৬ভাগ এবং দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় শতকরা ২৭ভাগ জাতীয় আয় বাড়িয়া যায়। **ঐ একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** জাতীয় আয় বাড়ে মাত্র ৩-৪ পারসেণ্ট এবং বৃটেন ১-৩ পারসেণ্ট।

পুঁজিবাদ ধ্বংস করিয়া জাতীয় আয় তো বাড়িয়াই গেল। ইহা নিবে কে ? পুঁজিবাদী **দেশগুলিতে তো** মুষ্টিমেয় মালিকরাই শতকরা ৫৫-৬০ ভাগ লুট করিয়া নেয় ; আর শতকরা ৭৫জন যে মেহনতী জনগণ তাহাদের ভাগ্যে জোটে মাত্র ৪০-৫০ পারসেণ্ট। সোভিয়েট দেশে তো ১৯১৭ সালের বিপ্লবেই ঐ দস্যুদের ঝাড়েমূলে উৎখাত করা হইয়াছে। এখানে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে যে জাতীয় আয়, তাহা নিবে কে ? ইহার সবটাই মেহনতী জনগণের সম্পত্তি।

তাই, এখানে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, সুযোগসুবিধা বাড়িয়া যায়, শিক্ষা, সংস্কৃতির আরও বেশি প্রসার ঘটে। তাই, বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট দেশে মেহনতী জনগণের সুখসুবিধার জন্য যে-সব সরকারী ব্যয় হয় তাহার অঙ্ক আমাদের ধারণার অতীত হইলেও, সোভিয়েট ব্যবস্থার তাহা না হইয়া উপায় নাই।

হিটলারী কুকীর্ত্তি ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা

দেউলিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মেহনতী জনগণকে কিছু দিতে তো পারেই না—বরং সহজাত কুৎসিত রোগ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও মুনাফার অঙ্ক বজায় রাখিবার জন্য মেহনতী মানুষের রক্ত আরও নিংড়াইয়া লইতেছে। আর সেই সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগঠন বিশ্ব ট্রি-ইউ ফেডারেশন যখন পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ফাশিস্ত দমননীতির বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ দিয়া তাহার অবসান দাবী করিলেন এবং জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে সোভিয়েট প্রতিনিধি যখন জাতিসংঘের মূল সনদের নীতি অনুযায়ী সেই দাবীর সমর্থনে দাঁড়াইয়া গেলেন, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অমনি তাহাদের সমস্ত ভাড়াটিয়াদের হুকুম দিয়া দিল : কুৎসা রটাও যে, "সোভিয়েট দেশের ক্যাম্পে ক্যাম্পে অসংখ্য দাস শ্রমিক রহিয়াছে।" আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়ারা সেই সুরে পোঁ ধরিয়াছে—সোভিয়েটবিরোধী কুৎসার বন্যায় তাহারা নিজেদের শ্রমিকবিরোধী ফাশিস্ত দমননীতির পাপ ঢাকিতে চাহিতেছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার ফাশিস্তপন্থী শাসক-শোষকরা চক্রান্ত করিয়াছে যে, এই-ভাবে তাহারা মার্কিন মুল্লুকে টাক্ট-হার্টলে আইনের ফাশিস্ত স্বরূপের সমালোচনাও ধামাচাপা দিবে। এই ভাবে তাহারা পশ্চিম জার্ম্মানীতে যুদ্ধবাদীদের হাতের মুঠার বাহিরে ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা ধ্বংস করিবার কুকীর্ত্তি ঢাকিতে চাহিতেছে। বাধ্যতামূলক সালিশীর যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা আজও বৃটেনে চালু রহিয়াছে, —তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করাই তাহাদের লক্ষ্য। আর্জ্জেন্টিনা, বর্ম্মা, ব্রাজিল, কিউবা, গ্রীস, মিসর, ভারত, ইরান, স্পেন, পাকিস্তান, লেবানন, পর্ত্তুগাল, চিলি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যে-সব "জরুরী" আইন-কানুন, "নিরাপত্তা" বিধি-ব্যবস্থা ও গোলাগুলির দাপটে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে পিষিয়া মারিতেছে তাহার বিরুদ্ধে দুনিয়ার জনমতের কণ্ঠরোধ করাই সোভিয়েট বিরোধী কুৎসার ফল্য।

শোষকের দুশমন সোভিয়েট

এই সব ফ্যাসিস্ত কুকীর্ত্তির বিরুদ্ধেই বিশ্ব ট্রি-ইউ ফেডারেশন অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা দাবী করিয়াছিলেন। তাহারই ভিত্তিতে সোভিয়েট প্রতিনিধি জাতিসংঘে যে প্রস্তাব তোলেন, ইঙ্গ-মার্কিন ভোটের দল তাহা বানচাল করিয়া দেয়। এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সোভিয়েটবিরোধী কুৎসার বন্যা রটাইয়া দেয়।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে সোভিয়েট প্রতিনিধি এই কুৎসার উপযুক্ত জবাব দিয়া দিয়াছেন। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সংবাদপত্রগুলি তাহা প্রকাশ করে নাই। **সোভিয়েট প্রতিনিধি জারাপ্‌কিন দেখাইয়া দেন** যে, বেকারী, মুদ্রাস্ফীতি, মজুরি হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি দমননীতি ইত্যাদির চাপে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমগ্র মেহনতী জনগণকেই ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া রাখা হইয়াছে। কোটি কোটি মানুষকে বেকার

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

রায় মন্ত্রিসভা কায়েম রাখার এই চাল ব্যর্থ করো!

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করিয়াছে। রায় মন্ত্রিসভাকে কায়েম রাখার জন্য নেহরু সরকারের এই কূট চাল।

বিড়লার অনুগত ভৃত্য বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা পশ্চিম বাংলার সমগ্র শোষিত জনসাধারণের আস্থা হারাইয়াছে। ধনিক-শ্রেণী, তাহাদের দালাল অনুচরেরা,—নেহরু-প্যাটেল কোম্পানী রায় মন্ত্রিসভাকে কেমন করিয়া কায়েম রাখিবে? যদি সকল সাবালক মেয়েপুরুষ ভোট দিতে পারেন, যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন হয়, তাহা হইলে কাহারও এমন সাধ্য নাই যে, রায় মন্ত্রিসভাকে জীয়াইয়া রাখিতে পারে। তাই প্রস্তাবিত সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় নাই। তাই নেহরু বলিয়াছেন: প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট দিয়া ভোটার তালিকা করিতে অনেক সময় লাগিবে, সুতরাং ঘৃণিত ভারত-শাসন আইনেই নির্ব্বাচন করা হইবে। তিন মাসের মধ্যে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটার তালিকা করা যায় না ইহা অবিশ্বাস্য। আসলে জনসাধারণকে ভাওতা দিয়া তাহাদের ভোট হইতে বঞ্চিত করাই নেহরুর আসল মতলব।

শোষিত জনসাধারণের মধ্যে যাহারা অগ্রণী, এই নির্ব্বাচনে তাহারাই ভোট দিতে পারিবেন না। ভারত শাসন আইনে ভোটের অধিকারের ভিত্তি সম্পত্তি ও শিক্ষা। ফলে সমাজের উপরের তলার মাত্র শতকরা ১৩ জন ভোট দিতে পারিবে। শতকরা ৮৭ জনেরই ভোটের অধিকার নাই। বিধান রায়ের পুলিস, কংগ্রেসী জমিদার-ধনীকৃষক এবং সেবাদল যাহাদের বাড়ীঘর লুট করিয়াছে ও মেয়েদের অপমান করিয়াছে, যাহাদের গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে, হাজারে হাজারে লাঠী মারিয়াছে, জেলে রাখিয়াছে তাহারা এই নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবে না। বেকার, ক্ষেতমজুর, দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামের গরীব ইহারা কেহ ভোট দিতে পারিবে না।

আইন সভার আসন ৭০।৭৫ টি; এই ভাবে সবগুলিই তো ধনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট। তাহা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় ধনিক জমিদারদের জন্য বিশেষভাবে প্রায় ২০টি আসন রাখা হইয়াছে। আর পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ মজুরের জন্য মাত্র ৮টি আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধ্বজা-ধারী নেহরু ইহারই নাম দিয়াছেন সাধারণ নির্ব্বাচন।

কিন্তু এত আটঘাট বাঁধা থাকা সত্ত্বেও ধনিকশ্রেণী নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে এই উপরতলার ১৩ জনেরই ভোট হইয়াছিল। তবুও কংগ্রেসপ্রার্থীর শোচনীয় পরাজয় হয়। নির্ব্বাচনের কয়েকদিন ১৪৪ ধারা সাময়িক তুলিয়া লওয়ায় শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে জনতার দুর্জয় বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছিল, জনসভায় কংগ্রেস নেতাদের মুখ দেখানো একেবারে অসম্ভব হইয়াছিল। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত দাবি উঠিয়াছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কর। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত কর, কালা-কানুন খতম কর, বিধান মন্ত্রিসভা ধ্বংস কর।

শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে জাগ্রত এই জনসাধারণের সাথেই নির্ব্বাচনের সময়ে কংগ্রেসপ্রার্থীদের মোকাবিলা করিতে হইবে—নেহরু-প্যাটেল তাহা ভাল করিয়াই জানে। পৌর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই সীমাবদ্ধ ভোটেও কংগ্রেসের চরম পরাজয় নিশ্চিত। তাই সাধারণ নির্ব্বাচনের ঘোষণা করিয়াও কংগ্রেসী সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নাই। তাই কমিউনিস্ট পার্টিকে আজও বৈধ ঘোষণা করা হয় নাই, শ্রমিক নেতাদের জেলে পুরিয়া রাখা হইয়াছে, ঘৃণিত কালাকানুন এখনও রদ হয় নাই। শ্রমিক-শ্রেণীর খবরের কাগজ "স্বাধীনতা" বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্ততঃ ২০ খানি জনতার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

বাস্তবিক ফ্যাসিট কায়দায় অভিনব নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এক-পার্টি শাসন, নেহরুর একনায়কত্ব ও রায় মন্ত্রিসভা কায়েম রাখার এই পন্থা গ্রহণ করিয়া নেহরু হিটলারকেও লজ্জা দিয়াছেন। জনসাধারণকে বাদ দিয়া ভূয়া সাধারণ নির্ব্বাচন ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী রাখিয়া ভোট জনসাধারণের সহিত মর্ম্মান্তিক তামাসামাত্র।

ধনিকশ্রেণীর রক্ষিতা পত্রিকাগুলিতে যখন সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা ফলাও করিয়া প্রচার করা হইতেছে, ঠিক তখনই শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ছাঁটাই, মজুরিকাটা, বোনাস বন্ধ প্রভৃতির মারফত নূতন আক্রমণ চলিতেছে, ঠিক তখনই ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের বিরুদ্ধে নূতন ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ঠিক তখনই দমননীতি তীব্রতর করায়, মিলিটারী রাজ কায়েম করার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি চলিতেছে।

তাহা সত্ত্বেও শ্রীশরৎ বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণপ্রমুখ বামপন্থী নেতারা এই সাধারণ নির্ব্বাচনের ঘোষণার পর হইতে ভোটের খুব তোড়জোড় করিতেছেন। সাধারণকে বাদ দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচনের ঘোষণার প্রতিবাদ না করিয়া, কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবী না তুলিয়া, বন্দী মুক্তির দাবী উত্থাপন না করিয়া তাহারা ভোটযুদ্ধে জিতিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহাদের এই পথ রায় মন্ত্রিসভাকেই শক্তিশালী করিবে।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের নেতৃত্বে সমগ্র শোষিত জনসাধারণ কংগ্রেসী সরকারের এই সকল চাল নিঃসন্দেহে ব্যর্থ করিয়া দিবে। সাধারণ নির্ব্বাচনের এই আওয়াজকে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের বিপ্লবী প্রয়োজনে নিজেদের কায়দায় ব্যবহার করিবে। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে এখন হইতেই জনতার আওয়াজ হইবে:

১। সমগ্র শোষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকার দিতে হইবে। তাহার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট চাই।

২। শ্রমিকশ্রেণীর পুরা মজুরি ও গণতান্ত্রিক অধিকার চাই।

৩। কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করিতে হইবে।

৪। শ্রমিক ও গরীব চাষীর বিরোধী সমস্ত আইন নাকচ করিতে হইবে।

৫। কালাকানুন রদ করিতে হইবে:

৬। শ্রমিক নেতাদের মুক্ত করিতে হইবে:

৭। রায় মন্ত্রিসভাকে খতম করিতে হইবে।

৮। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনতার গণতান্ত্রিক রাজ কায়েম করিয়া সমাজতন্ত্রের পথে আগাইতে হইবে।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমগ্র শোষিত জনগণের এই অভিযান চলিবে কারখানায় ও খামারে খেতে, শহরে ও গ্রামে, স্কুলে ও কলেজে। বামপন্থী দলসমূহের সাধারণ কর্ম্মীদের দ্বিধাহীন চিত্তে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের অধিকারের জন্য, স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনের জন্য লড়াই চালাইতে হইবে। সারা পশ্চিম বংলায় এই আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইবে: কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধকর: শ্রমিক নেতাদের মুক্ত কর: রায় মন্ত্রিসভা খতম কর।

নিখিল ভারত রেলওয়ে-মেনস্ কনভেনশন

স্থান---কলিকাতা, তারিখ ১৬ই-১৭ই সেপ্টেম্বর

কনভেনশনের আলোচ্য বিষয়:

(১) সরকার সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী রেলশ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের উপর যে বে-পরোয়া আক্রমণ সুরু করিয়াছেন—ছাঁটাই, বেতনকাটা, খাটুনির হার বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া নেওয়ার মধ্য দিয়া যাহার রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে সারা ভারতের রেল শ্রমিকদের এক ঐক্যবদ্ধ কর্ম্মসূচী গ্রহণ।

(২) সারা ভারতের রেল শ্রমিকদের একটা কেন্দ্রীয় সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান গঠন। কনভেনশনের জন্য ব্যাপক প্রচার সুরু করুন, অর্থসংগ্রহ করুন, ভলান্টিয়ার হউন, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হউন।

আহ্বায়ক: নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলদের সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

করিয়া পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণের শর্ত্তেই শ্রমিকদের অমানুষিক অবস্থার ভিতর কাজ করিতে বাধ্য করা হইতেছে।

অথচ, যে-দেশে বেকার নাই, বেকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; অর্থনৈতিক সংকট নাই, সে সংকটের পুঁজিবাদী ভিত্তি চিরতরে ধ্বংস করা হইয়াছে; সেই দেশের বিরুদ্ধে তাহারা কুৎসার বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। যেখানে মানুষের উপর মানুষের শোষণব্যবস্থা অতীত ইতিহাসের আবর্জ্জনাস্তূপে চলিয়া গিয়াছে, সেই সোভিয়েট দেশে নাকি ক্রীতদাস আছে। যে সোভিয়েট দেশে মানুষ আজ ক্ষমতানুযায়ী কাজ করিয়া কাজের মাপে ন্যায্য পাওনার গণ্ডিও ছাড়াইয়া প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে, সেই কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের দেশে নাকি ক্রীতদাস!

সোভিয়েটের চ্যালেঞ্জ

সোভিয়েট প্রতিনিধি চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন—আজ নয়, গত মার্চ্চ মাসে—এর, অনুসন্ধানের জন্য কমিটি বসানো যাক! তবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচরদের নিয়া কমিটি করা চলিবে না—সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধের তোড়জোড়ের জন্য গোপন তথ্য সংগ্রহের আশায় তাহারা তেমনি কমিটিই বসাইতে চায়। সোভিয়েট প্রতিনিধি প্রস্তাব করিয়াছেন—রাজনীতি বা ধর্ম্মমত নির্ব্বিশেষে দেশে দেশে বর্ত্তমান ট্রেড ইউনিয়নগুলি হইতে প্রতি ১০ লক্ষ সদস্য হইতে ১ জন করিয়া অনধিক ১১০-১২৫ জন সদস্য লইয়া কমিটি গঠিত হউক।

সেই কমিটি পুঁজিবাদী দেশগুলি তাহাদের উপনিবেশ ও অর্দ্ধ-উপনিবেশগুলি এবং নূতন গণতন্ত্রী দেশগুলি সোভিয়েট দেশে শ্রমিকদের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থার শ্রমিক সংক্রান্ত আইনকানুন-বিধিব্যবস্থা-বেকার সমস্যা ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া বলুক—কোথায় মেহনতী জনগণ স্বাধীন ও সুখী আর কোথায় তাহারা প্রকৃত ক্রীতদাসের জীবনযাপন করিতেছে।

কিন্তু, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাহাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই, সে সাহস তাহাদের নাই। তাই, তাহারা সোভিয়েটবিরোধী কুৎসার বন্যা বহাইয়া নিজেদের শাসন-শোষণ আর শ্রমিকবিরোধী ফাশিস্ত বিধিব্যবস্থার পাপ গোপন করিবার চক্রান্ত করিয়াছে। কোন সুস্থবুদ্ধি মেহনতী মানুষ ইহাতে বিভ্রান্ত হইবেন না।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত

ধনিক-জমিদার-জোতদারের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে

ক্ষেতমজুরদের প্রতিরোধ

প্রথম প্রাদেশিক ক্ষেতমজুর সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

পঃ বঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে বিপ্লবী সৈন্য সমাবেশ

আমাদের এই প্রথম সম্মেলনে অনেক পরিচিত মুখই আমাদের পাশে আজ দেখিতে পাইতেছি না। যাহারা গত এক বছর গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের অধিকার ও দাবী-দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, ধনিক কংগ্রেসী সরকার এবং জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষকদের প্রত্যেকটি আক্রমণ হইতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের পক্ষেই এই প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। তাঁহাদের মধ্যে সুধীর সর্দ্দার, পঞ্চানন কৈদর, সুবল মাঝির মত ক্ষেতমজুরের বীর সন্তানরা শত্রুর হাতে নিহত হইয়াছেন, শত শত ক্ষেতমজুর নেতা ও কর্মী বিনা বিচারে আটক হইয়াছেন, শত শত কর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে; কংগ্রেসী শাসকরা শত শত ক্ষেতমজুর সন্তানকে "ফেরারী" ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের পিছনে পুলিস লাগাইয়াছে। এইভাবে বিধান-মন্ত্রিসভা এই সম্মেলনে তাঁহাদের যোগদানের পথে অসংখ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

ধনিক কংগ্রেসী সরকার এবং জোতদার-জমিদার-ধনী কৃষকের সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া আজ যাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমাদের মধ্যে এখানে এমন অনেক কর্ম্মীকে দেখিতেছি শত্রুর আক্রমণে যাহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে: যাঁহাদের বাড়ীর বাসনপত্র পর্য্যন্ত লুট হইয়াছে; যাঁহাদের শিশু সন্তানের ভাতের থালা লাথি মারিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া ঘরের দরজায় কাটা-তারের বেরা লাগানো হইয়াছে; যাঁহাদের বাড়ীর পাশে পুলিস ও সেবাদলের ক্যাম্প এখনো দাঁড়াইয়া আছে।

নূতন শ্রেণী-নূতন শক্তি

কিন্তু কোন অত্যাচার, কোন বাধাই আমাদের টলাইতে পারে নাই। কারণ গত এক বছরে আমরা গ্রাম-অঞ্চলে এক নূতন মানুষ, এক নূতন শক্তি হিসাবে জন্মলাভ করিয়াছি।

ধনিক কংগ্রেসী শাসনে শহরের মত গ্রাম অঞ্চলেও ধনী আরও ধনী হইতেছে, গরীব আরও গরীবে পরিণত হইতেছে। গ্রামের যাহাকিছু জমিজমা, হালবলদ সমস্তই মুষ্টিমেয় জমিদার-জোতদার-ধনী-কৃষকের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়িতেছে। বাংলার গ্রামে একশত লোকের মধ্যে ৩৬ জন আজ একেবারেই ভূমিহীন; ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকেরা [যাহাদের বছরে কিছু সময় মজুরির উপর নির্ভর করিতে হয়] একত্রে কৃষকেরা গ্রামের শতকরা প্রায় ৮০ জন। মোট আবাদী জমির 'এগার' আনা মাত্র ১৪ জন লোকের হাতে; আর পাঁচ আনা হইল ৮৬ জনের হাতে। টাকার জোরে জোতদার ও ব্যবসায়ীরা গ্রাম অঞ্চলে তাহাদের শোষণের ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। তাহারা খোদ চাষীদের জমি আত্মসাৎ করিতেছে, গরীব কৃষককে ক্ষেতমজুরে পরিণত করিতেছে, এবং গ্রামের খাদ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি সবকিছুর উপর নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছে। ইহারা নামমাত্র মজুরি বা ফসলের বিনিময়ে ক্ষেতমজুরদের দিনরাত খাটাইতেছে এবং সেই ফসলই চোর-বাজারের দরে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের কাছে (অর্থাৎ শতকরা ৮০ জনের কাছে) বিক্রয় করিতেছে। ইহাদেরই হাতে কংগ্রেসী সরকার; কাজেই কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতি এই ধনী কৃষক, জোতদার, জমিদারদের স্বার্থরক্ষা

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

শহীদ স্মরণে

মাত্র ৩ বছরের কংগ্রেসী শাসনে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে যে সকল সংগ্রামী ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক পুলিসের গুলি বা জমিদার-জোতদারদের গুণ্ডার হাতে নিহত হইয়া শহীদ হইয়াছেন, উহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল। আহতদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

কংগ্রেসী সরকার শোষকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গ্রামে গ্রামে গুলি চালাইয়া যে গরীব মানুষদের হত্যা করিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ নারী।

তালিকাটি অসম্পূর্ণ; কারণ 'কংগ্রেস-নেহরু-গণতন্ত্র' গরীবদের হত্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, গ্রামের পর গ্রাম সশস্ত্র ফৌজের কবলে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যে 'স্বাধীন' দেশের মাটির উপর কৃষকের অধিকার নাই, কৃষক ও ক্ষেতমজুর শহীদদের পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করার মত ব্যক্তি-স্বাধীনতাও সেদেশে আশা করা বাতুলতা।

ধনিক কংগ্রেসী শাসনের বিভীষিকা অগ্রাহ্য করিয়াই গ্রামের মেহনতী মানুষ দুর্নিবারভাবে অগ্রসর হইতেছেন। এমন কোন সপ্তাহ নাই ভারতবর্ষের কোন না কোন স্থানে কৃষক ও ক্ষেতমজুর শহীদেরা রক্তদান না করিতেছেন।

জমি, জীবিকা ও স্বাধীনতার যুদ্ধে নিহত জানা-অজানা সকল কৃষক ও ক্ষেতমজুর শহীদদের স্মরণে আমরা রক্ত পতাকা অবনমিত করিতেছি।

মেদিনীপুর

১। চৈতন সামন্ত
২। সুধীর নায়েক
৩। সুধীর সর্দ্দার
৪। পঞ্চানন কৈদর
৫। ভবেশ
৬। গোলক

হুগলী

১। পুষ্পবালা
২। পাঁচুবালা
৩। দাসীবালা
৪। কালীবালা পাখিরা
৫। মুক্তকেশী মাঝি
৬। রাজকৃষ্ণের মা
৭। কার্ত্তিক ধাড়া
৮। গুইরাম মণ্ডল

হাওড়া

১। দেবেন মালিক
২। পঞ্চু বেরা
৩। গণেশ ভুঁঞা
৪। কানাই বাগ
৫। সাধন বাগ
৬। ফটিক গলুই
৭। গুইরাম মুদী
৮। মন্মথ কয়াল
৯। তারাপদ সর্দ্দার
১০। মনোরমা
১১। লক্ষ্মী
১২। বাঁশরী

২৪পরগনা

১। নীলকণ্ঠ সামন্ত
২। সুধীর ঘোড়ুই
৩। সুরেন মণ্ডল
৪। অশ্বিনী দাস
৫। গজেন ভুঁইয়া
৬। দেবেন ধর
৭। সরোজিনী দাস
৮। অহল্যা দাস
৯। উত্তমী দাস
১০। বাতাসী সিং
১১। সুরেন মিস্ত্রী
১২। অময় মণ্ডল
১৩। পূর্ণ মণ্ডল
১৪। ভবেন নস্কর
১৫। মতি ধাড়া
১৬। দাসু মণ্ডল

বীরভূম

১। সুবল মাঝি
২। কুন্দলা মাঝি
৩। হাবলা লেট
৪। পানিক লেট
৫। দাসু মাঝি

বাঁকুড়া

নারী-পুরুষ সমেত পাঁচজন ১৫ই আগষ্ট পুলিসের গুলিতে নিহত হইয়াছেন—নাম এখনো জানা যায় নাই।—

মাঙ্গল

প্রথম বর্ষ] ২৫শে আগস্ট '৪৯ : ৮ই ভাদ্র '৫৬ [দুই আনা

ক্ষেতমজুর

বিশেষ সংখ্যা

দাম—দুই আনা

বাঁচার মত মজুরির দাবীতে লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুরের ধর্ম্মঘট

করার জন্যই তৈরী হইয়াছে। তাহারা অতি অল্পদরে গরীব ও মাঝারী কৃষকের খাদ্য ক্রয় করিয়া উহা যাহাতে চোরা-বাজারে চালান দিতে পারে তাহার জন্যেই সরকারী খাদ্য-সংগ্রহের প্ল্যান তৈরী হইয়াছে। এই সরকারী খাদ্য-নীতির ফলেই গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে অধিকাংশ জেলায় এখনই ২৫।৩০ টাকা দরে খাদ্য ক্রয় করিতে হইতেছে। শুধু খাদ্যই নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিস তাহাদিগকে যুদ্ধের আগেকার তুলনায় তিন-চার গুণ বেশী দর দিয়া কিনিতে হইতেছে। ধনিকশ্রেণীর এই শোষণের মধ্য দিয়াই গ্রাম অঞ্চলে আমাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সকল ক্ষেত্রে অমানুষিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আমরা আজ এক নূতন মানুষে পরিণত হইয়াছি। কলকারখানার শ্রমিকদের মতই আমরা সর্ব্বহারা। নিজের শ্রম বিক্রয়ের উপরই আমাদের জীবনধারণ সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করে। এবং সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবেই আজ আমরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লালঝাণ্ডার তলে একত্রিত হইয়াছি।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একদিনে তৈরী হয় নাই। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রায় ৩০ বছরের জঙ্গী শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া, অসংখ্য শ্রমিক শহীদের রক্তদানের মধ্য দিয়া, ধনিকশ্রেণীর ভেদনীতিকে বারবার পরাস্ত করার মধ্যদিয়া এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আজ সারা ভারতের বিপ্লবী নেতা হিসাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে। গত ৩০ বছরে এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লাল-ঝাণ্ডার তলেই শ্রমিকশ্রেণী ছোট বড় অসংখ্য সংগ্রামে মালিকশ্রেণীকে পরাজিত করিয়াছে।

৮ লক্ষ লালঝাণ্ডা শ্রমিকের সংগঠিত শক্তি এবং আরো লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সংগ্রামী সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়াই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আজ দাবি তুলিয়াছে: **বাঁচিবার মত মজুরি চাই, ৮০ টাকা বেতন ও ৫০ টাকা ভাতা চাই। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দাবী তুলিয়াছে: দৈনিক ৭ ঘণ্টার বেশি কাজ নাই, বছরে এক মাস বেতনসহ ছুটি চাই, বেকারদের জন্যে ভাতা চাই, নতুবা কাজ চাই, একমাস বেতনসহ ছুটি চাই। এই সকল মূল দাবীর উপর তাহারা সারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করিতে ডাক দিয়াছে।**

আমরা ইহার পতাকাতলে সমবেত হইবার ফলে ধনিকশ্রেণীর বুকে আতংক সৃষ্টি হইয়াছে; গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র করার রাজনীতি এবং রণকৌশল শিক্ষা করিয়া আমরা এবার ধনিক-শ্রেণীর প্রত্যেকটি আক্রমণ ব্যর্থ করি। এই ক্ষেতমজুর সম্মেলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য এইখানে।

সংগ্রামে সকলের অগ্রণী

সর্ব্বহারা হিসাবে ক্ষেতমজুররা বরাবরই গ্রাম অঞ্চলের প্রতিটি শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িয়া আসিয়াছে। জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে, জমিদারী খাজনা বন্ধ এবং তে-ভাগার সংগ্রামে তাহারা কৃষক-সভার জঙ্গী ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করিয়াছে। ১৯৪১ সালে তে-ভাগার সংগ্রামে যাহারা 'জান দিব তো ধান দিব না' আওয়াজ তুলিয়া পুলিসের গুলির সামনে বুক-পাতিয়া দিয়াছিলেন, **ক্ষেতমজুর চিয়ারশেক** ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মাঝারী কৃষক এবং কোন কোন এলাকায় ধনী কৃষকের এক অংশের নেতৃত্বে কৃষক সমিতি সেই সকল সংগ্রামে যথেষ্ট দোমনা ভাব দেখাইয়াছেন, বারবার সংগ্রামকে আপোশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন: ক্ষেত-মজুর ও গরীব কৃষক নিজেদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত করিতে না পারায় ঐ সকল আপোষকে ঠেকাইতে পারে নাই।

১০৪৬-৪৭ সালের তুলনায় এবারকার তে-ভাগার সংগ্রামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক কৃষকসমিতির নেতৃত্বের আপোষ-পন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে অনেক বেশি দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছে। এবছর তে-ভাগার সংগ্রামের বিরুদ্ধে গ্রামের ধনী কৃষক-জমিদার-জোতদার এবং তাহাদের কংগ্রেসী সরকার বে-পরোয়া আক্রমণ চালায়। ইহাতে মাঝারি কৃষক এলাকায় ভীত হইয়া পড়ে। কোথাও তাহারা মাঠ হইতে ফসল নিজ খামারে আনিতে ভয় পায়; কোথাও নিজ খামারে ধান তুলিয়াও তাহা ঝাড়াই-মাড়াই করিতে ইতস্তত করে; শুধু গাদা আটক করিয়া রাখিয়া থাকে, কোথাও জমির দখল রাখিয়া চাষ করার জন্যে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করে না। তে-ভাগার জন্যে যে সকল এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়, সেখানেও ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকদের তাহাতে বিশেষ স্থান দেওয়া হয় না। এবং, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগ্রাম কমিটির রায় ছাড়াই মাঝারী কৃষকরা জোতদার-ধনী কৃষকের সহিত আপোষ করিয়া লইতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যেখানেই ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক কিছুটা সংগঠিত হইয়াছে, সেখানেই তাহারা মাঝারী কৃষকের এই দোমনা ভাব এবং আপোষ নীতির বিরোধিতা করিয়াছে। নিজেরা আগাইয়া যাইয়া মাঝারী কৃষকের ঘরে ধান তুলিয়াছে, তাহাদের ধান ঝাড়িয়াছে, তাহাদের জমির দখল কায়েম রাখিয়াছে, দালালের আক্রমণ ও পুলিসের গ্রেপ্তারের হাত হইতে কর্ম্মীদের রক্ষা করিয়াছে।

মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম

এই তে-ভাগার সংগ্রামই ক্ষেত-মজুরদের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রামে উৎসাহিত করিয়াছে। সমিতি ও সংগ্রাম-কমিটিতে ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করার মধ্য দিয়া ক্ষেতমজুররা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়। সমিতি এবং সংগ্রাম-কমিটির সামনে তাহারা প্রশ্ন তোলে: তে-ভাগার সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির দাবিও রাখা হোক।

যে সকল এলাকায় ক্ষেতমজুরদের এই দাবি কৃষক সমিতি এবং সংগ্রাম কমিটি নিজেদের দাবীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, ফসলের অংশ হইতে মজুরদের কিছুটা দিয়াছে, সে সকল এলাকায়ই তে-ভাগার সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে প্রচারে বিভ্রান্ত মাঝারী কৃষকের বিরোধিতার ফলে যে সকল এলাকায় ঐ দাবী লড়াইয়ের দাবীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই সেখানে, ক্ষেতমজুরদের ভলান্টিয়ার হিসাবে বেশীদিন খাটানো যায় নাই। তে-ভাগার সংগ্রাম আত্মসমর্পণের মধ্যে শেষ হইয়াছে।

এই তে-ভাগার সংগ্রামের মধ্যে এবং ইহার পাশাপাশিই ক্ষেতমজুররা নিজেদের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম সুরু করিয়াছেন। কারখানার শ্রমিকরা যে হাতিয়ার মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, বীরভূম এবং মেদিনীপুরের ক্ষেতমজুর সেই ধর্ম্মঘটের অস্ত্রই জোতদার-ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। ক্ষেতমজুররা এই সকল ধর্ম্মঘট সংগ্রামের মধ্যেই নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজন বুঝিতে পারে।

মেদিনীপুরে

ক্ষেতমজুরদের ধর্ম্মঘট সংগ্রাম সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে মেদিনীপুরে। গত দুর্ভিক্ষ, ঝড় ও বন্যার পর হইতে এই জেলায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। জমিজমা, হালবলদ কিভাবে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়াছে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:

মহিষাদল রাজ এষ্টেট—খাসের জমির পরিমাণ ৩০০০ বিঘা।

সুরেন্দ্র মাইতি—খাসের জমির পরিমাণ ৪।৫ হাজার বিঘা।

বসন্ত মণ্ডল—জমির পরিমাণ তিন হাজার বিঘা।

সাগর দাস—জমির পরিমাণ ৭।৮ হাজার বিঘা।

দেওয়ান সাহেব—খাসের জমির পরিমাণ দুই হাজার বিঘা।

হৃষিকেশ জানা—(নন্দীগ্রাম) জমির পরিমাণ তিন হাজার বিঘা।

বৈদ্যনাথ সরকার—(তমলুক) জমির পরিমাণ দুই হাজার বিঘা।

হরেকৃষ্ণ মাইতি—(ময়না) খাসের জমি হাজার বিঘার উপরে।

অটল দাস (ময়না)—জমির পরিমাণ ১২০০ বিঘা।

গোবিন্দ প্রামাণিক—জমির পরিমাণ ৫০০ বিঘা।

মাড়োয়ারী এষ্টেট (ডেবরা)—খাসের জমি ২০০০ বিঘা।

নাড়াজোল এষ্টেট (দাসপুর)—খাসের জমি ৩০০০ বিঘা।

আশু সিং (চন্দ্রকোণা)—খাসের জমি ৩০০০ বিঘা।

রামমোহন সিং (চন্দ্রকোণা)—জমির পরিমাণ ১৫০০ বিঘা।

কালী রায় (কেশপুর), বটু পাল (খড়গপুর), হরিপদ আর্য্য (খড়গপুর), ব্যারিস্টার দিণ্ডা (কাঁথি), শাসমল (কাঁথি), সতীশ জানা (কাঁথি) প্রভৃতি প্রত্যেকের হাতে হাজার হাজার বিঘা জমি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

ইহারা ক্ষেতমজুরদের মজুরি দেন কত? খড়গপুর এলাকায় এখনো মজুরি আট আনার বেশী নয়, জেলার কোন অংশেই দুই টাকার বেশী নয়; অথচ গঠরা প্রভৃতি এলাকায় চাউলের দর ইতিমধ্যেই ২৫ টাকায় উঠিয়াছে। এই সকল জমিদার-জোতদার-ধনিকগোষ্ঠির হাতেই বিধান মন্ত্রিসভা সমস্ত ধান-চাউলের ব্যবসায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পারমিট দিয়াছেন।

এই শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষেত-মজুরদের ব্যাপক ধর্ম্মঘট সুরু হয় চন্দ্রকোণা এলাকায়। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে পারুলিয়া, উগ্রঘড়া, শশাবনা, মাহবনী, আলিপাড়া, খেতুয়া, শীর্ষা, বাহানা, বিশাবেড়া—এই নয়খানা গ্রামে ক্ষেতমজুরেরা ধর্ম্মঘট করে। পরে ক্ষেতমজুরদের ধর্ম্মঘট এখানকার শতাধিক গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। পারুলিয়া গ্রামের মজুরেরাই প্রথমে দৈনিক দুই টাকা মজুরি আদায় করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের ঐ জয়ের খবর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে অন্যান্য গ্রামেও জমিদার-জোতদার-ধনী চাষীরা মজুরদের দুই টাকা মজুরি দিতে বাধ্য হয়।

ধর্ম্মঘটের শিক্ষা

এই সকল ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘটে আমাদের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জন্মে।

ধানগেছার ধনী ও মাঝারী কৃষক অধিকাংশ সদগোপ এবং ক্ষেতমজুরের অধিকাংশ বর্গক্ষত্রিয়। ধর্ম্মঘট সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী কৃষকরা মাঝারী কৃষকদের মধ্যে প্রচার করে যে, বর্গ ক্ষত্রিয়রা গ্রামে সদগোপদের সামাজিক মর্য্যাদা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষেতমজুরদের পক্ষ হইতে গরীব কৃষক এবং মাঝারী কৃষক সদ-গোপের বিভিন্ন করার জন্যেই ধনী কৃষকরা এই চাল চালে। ক্ষেতমজুরেরা বুঝিতে পারে যে, ধনী কৃষকদের এই চাল ব্যর্থ করার একমাত্র উপায় গরীব এবং ভূমিহীন সদগোপদের সংগ্রামে টানিয়া নামানো এবং গ্রাম অঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করা, সামাজিক মর্য্যাদার নাম করিয়া ধনী সদগোপ কৃষকেরা

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিল

রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

দমননীতি ও বিভেদনীতির বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে শ্রেণীসংগ্রামের জয়যাত্রা

আসলে যে গরীব সদগোপ কৃষকদের উপরেও শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে তাহা তাহাদের দেখাইয়া দেওয়া।

ধানগেছার জোতদাররা বাহির হইতে সাওতাল মজুর আমদানী করিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। ক্ষেত-মজুরেরা বুঝিতে পারে যে, ধর্ম্মঘট ভাঙ্গা দালালদের কাজ। কিন্তু পিছনে পড়া সাঁওতালরা না বুঝিয়া দালালী করিতেছে। সুতরাং তাহাদের কাজ হইতে বিরত করার জন্যে ধর্ম্মঘটী মজুরেরা শোভাযাত্রা করিয়া সাঁওতাল শ্রমিকদের কাছে যায়; তাহাদের শোভাযাত্রায় মেয়েরাও দলে দলে যোগদান করে। সাঁওতাল শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া মাঠ হইতে চলিয়া আসে। এইভাবে ধনিকদের সাঁওতাল-ক্ষেতমজুর সংঘর্ষ বাধাইবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

* * *

গ্রামের মাঝারী ও গরীব কৃষকেরা দাবী করে যে, তাহাদের জন্যে মজুরির হার কম করা হোক, তাহা হইলে ধনী কৃষক-জোতদারদের কাজের মজুরি বাড়াইবার সংগ্রামকে তাহারাও সমর্থন জানাইবে। অনেক মাঝারি কৃষক ধর্ম্ম-ঘটীদের ভয় দেখায় যে, তাহাদের মুনিষদের মজুরি খুব বেশী বাড়ানো হইলে তাহারা চাষবাসের কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। **ধর্ম্মঘটী ক্ষেতমজুরদের পক্ষ হইতে তাহাদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, গরীব কৃষকদের জন্যে দরকার হইলে তাহারা বিনা মজুরিতেও খাটিয়া দিবে।** জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাহারা গরীব ও মাঝারী কৃষকদের সমর্থন করিবে। গরীব কৃষকেরাও তখন ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করে। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকেরা বুঝিতে পারে যে, বড় বড় জোতদারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট দীর্ঘ দিন চালাইবার প্রয়োজন হয় এবং গ্রামের গরীবদের পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতা না থাকিলে উহা দীর্ঘদিন চালানো কঠিন হয়।

আর দীর্ঘদিন ধর্ম্মঘট চালাইয়া গ্রাম অঞ্চলের বড় জোতদারদের একবার মজুরি বৃদ্ধির দাবি মানিতে বাধ্য করিলে, অন্যান্য ধনী ও মাঝারী কৃষকদের দ্বারা মজুরি বৃদ্ধির দাবি মানাইয়া লওয়া মোটেই কঠিন হয় না।

এই সকল ধর্ম্মঘট সংগ্রামে ক্ষেতমজুররা দেখিয়াছে কিভাবে জোতদার-ধনী কৃষকরা মিথ্যা মামলায় তাহাদের জড়াইবার চেষ্টা করে [ডাকাতি, ধান লুট প্রভৃতির মামলা] কিভাবে কংগ্রেসী গুণ্ডা, সেবাদল ও পুলিস তাহাদের আক্রমণও গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে, কিভাবে আপোষের নামে তাহাদের সংগ্রামী মনোবল ও ঐক্য ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। ধনিকদের এই সকল ফাঁদে পা না দিয়া ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতে পারিলে মজুরি বৃদ্ধির দাবি আদায় করা যায়, মেদিনীপুরের ব্যাপক ধর্ম্মঘট সংগ্রামের মধ্য হইতে সেই অভিজ্ঞতাই লাভ করা গিয়াছে। যে সকল গ্রামে ক্ষেতমজুরের ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণরূপে জয়-যুক্ত হয় নাই সেখানেও ক্ষেতমজুরেরা ধর্ম্মঘটের মধ্যে নিজেদের বিপুল শক্তির সন্ধান পাইয়াছে।

কম হোক, বেশী হোক প্রায় প্রত্যেক জেলায় ক্ষেতমজুরেরা গত ছয় মাসে মজুরি বৃদ্ধির জন্যে সংগ্রাম করিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক সংগ্রামেই তাহাদের কিছু না কিছু মজুরি বৃদ্ধি করিতে জমিদার-জোতদার-ধনীরা বাধ্য হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত মজুরেরা নিজেদের মজুরি ডবল করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।

বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া জেলায় ক্ষেতমজুরেরা 'কুদ' ও 'সাঁজা' প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে গরীব কৃষকের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। জেলার অনেক এলাকায় জোতদাররা 'কুদ'প্রথা তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। এই সংগ্রামের পাশাপাশি ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে জয়পুর থানার জগন্নাথপুর এলাকার সমস্ত ক্ষেত-মজুর ৩ দিন মজুর দৈনিক দুই টাকা মজুরি এবং ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে ধর্ম্মঘট সুরু করে। জমিদাররা গ্রামে পুলিস আনিলে বিষ্ণুপুর ও জয়পুর থানার প্রায় ২৫খানা গ্রামের ক্ষেতমজুর ও দিনমজুরেরা ১৬ই ফাল্গুন প্রতিবাদ হরতাল পালন করে। ঐ দিন লাঙ্গল, মুনিষ, কামিনদের সকলের কাজ বন্ধ থাকে। হরতালের খবর আশে-পাশের যে গ্রামে পৌছে সেখানকার ক্ষেত-মজুরেরাই মাঠ হইতে কাজ ছাড়িয়া উঠিয়া আসে। ঐ দিন ক্ষেতমজুরদের এক বিরাট মিছিল ৭।৮খানা গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়া মিটিং করে। পুলিস ও কংগ্রেসী গুণ্ডারা কোন রকমেই ক্ষেতমজুরদের সভা-শোভাযাত্রার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

জয়পুর থানার ক্ষেতমজুরদের এই সংগ্রামের ঢেউ যাইয়া পৌছে মেদিনীপুরে গড়বেতা থানার শক্তিপুর ইউনিয়নে। [এই ইউনিয়নটি জগন্নাথপুর হইতে ৬ মাইল দূরে] ১৯শে আষাঢ় হইতে সন্ধিপুর, খড়কুওমা, বশকুণ্ডু ইউনিয়নের ১৯।২০খানা গ্রামের প্রায় ১২০০ ক্ষেতমজুর দৈনিক দুই টাকা মজুরি ও আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্ম্মঘট সুরু করে। জমিদার-জোতদাররা প্রথমে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্যে বাহির হইতে মজুর আমদানী করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাতে সফল হয় না। পরে তাহারা ধর্ম্মঘটী ক্ষেতমজুরদের শায়েস্তা করার জন্যে অর্থনৈতিক বয়কট সুরু করে, তাহাদের নিকট দোকানের চাউল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করা বন্ধ করিয়া দেয়। ক্ষেতমজুরেরা যাহাতে কোন পুকুর বা গরু চরাইবার মাঠ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে না পারে, তাহার হুকুমজারি করা হয়। কিন্তু কোনকিছুই ধর্ম্মঘটী ক্ষেতমজুরদের মনোবল ভাঙ্গিতে পারে নাই।

জমিদার-জোতদারেরা তখন গ্রামে পুলিস ডাকার জন্যে ঘড়যন্ত্র করে। নিজেরা ধনী জোতদার রাঘব সরকারের বাহিরের ঘরে আগুন লাগাইয়া পুলিসে খবর দেয়। ধনিক কংগ্রেস সরকার তখনই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য গ্রামে পুলিস পাঠায়। ২৬শে আষাঢ় পুলিস বাঁশদহ গ্রামে হানা দেয়। কিন্তু ক্ষেতমজুর ছেলে-মেয়েরা সকলেই জানাইয়া দেয় যে, তাহারা যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত। তখন জোতদাররা মিটমাটের ধাপ্পা দিয়া প্রায় ১০০ ক্ষেতমজুরকে নিজেদের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া পুলিসের হাতে তুলিয়া দেয়। এই জঘন্যতম বিশ্বাস-ঘাতকতার বিরুদ্ধে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সমস্ত গরীব প্রতিবাদ ঘোষণা করিলে পুলিস নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায়। ৫ জন ক্ষেতমজুর এবং তাহাদের নেতা সুধীর সর্দ্দার ও পঞ্চানন কৈদর সেখানে নিহত হন। তাহার পর গ্রামে পুলিস ও কংগ্রেসী গুণ্ডাদল ধর্ম্মঘটী ক্ষেতমজুরদের ঘরে ঘরে যাইয়া হানা দেয়। ক্ষেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রামে আতঙ্কিত কংগ্রেসী সরকারের এই ফ্যাসিস্ট চেহারা গ্রামের

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান

ভারতের ৮ লক্ষ কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ক্ষেতমজুর সম্মেলনে সংগ্রামী অভিনন্দন

কমরেডস্,

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আপনাদের প্রথম ক্ষেতমজুর সম্মেলনকে আন্তরিকতাপূর্ণ সৌহার্দ্যমূলক অভিনন্দন জানাইতেছে এবং সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করিতেছে।

এই সম্মেলন আহ্বান করিয়া আপনারা এক মহান ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার ক্ষেতমজুরেরা গত ৩ বৎসর ধরিয়া অকথ্য ফ্যাসিস্ট দমননীতির বিরুদ্ধে একাগ্র চিত্তে যে গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাকে সংগঠনগতভাবে সুদৃঢ় করার এই প্রচেষ্টা শুধু যে পশ্চিম বাংলার পক্ষেই গভীর সম্ভাবনাপূর্ণ তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের পক্ষে ইহার অসীম তাৎপর্য্য আছে।

ভারতের ৭ কোটী ক্ষেতমজুর বুর্জ্জোয়া-সামন্ততান্ত্রিক শাসনে অপরিসীম বর্ব্বর শোষণ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে যন্ত্রনায় গোঙরাইতেছে। ক্ষেতমজুররা কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাদ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি যেখানেই এই শোষণের প্রতিরোধ করিয়াছে, সেখানেই পুঁজিবাদী কংগ্রেসী সরকার তাঁহাদের উপর দমননীতির তাণ্ডব চালাইয়াছে। শত শত জনকে খুন করিয়াছে, তাঁহাদের মেয়েদের উপর বলাৎ-কার করিয়াছে, ঘর জ্বালাইয়াছে, যুবা-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থুঁতো করিয়া দিয়াছে এবং হাজারে হাজারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কিন্তু গত দুই বৎসরের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর মতই এবং শ্রমিক-শ্রেণীর মহান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্ষেতমজুররা অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়-ভাবে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাইয়া সংকটের প্রতিরোধ করিয়াছেন। শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দমননীতির ব্যর্থতার মতই ক্ষেতমজুরদের দেশজোড়া প্রতিরোধকেও সাক্ষাৎ ফ্যাসিস্টদমননীতি চালাইয়াও আন্দোলনের বন্যা থামানো যায় নাই।

আপনারা এই মহান সম্মেলন সংগঠিত করিবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি নূতন পথে যাত্রা সুরু করিয়াছেন, অর্থাৎ আমাদের বীরসৈনিক ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামকে সংগঠনগত দৃঢ়তা দান করিতেছেন" এবং এইভাবে ক্রমবর্দ্ধমান দমননীতি ও বিভেদকে পরাস্ত করিবার জন্য তাহাদের শক্তিকে সংহত করিতেছেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই বিশ্বাস আছে যে, অন্যান্য প্রদেশেও আপনা-দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হইবে।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আপনাদের সম্মেলনকে আন্তরিক-ভাবে অভিনন্দন জানানো এবং সাফল্য কামনা করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের এই আশ্বাস দিতেছে যে, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, তাহার প্রাদেশিক কমিটিগুলি এবং আঞ্চলিক কার্য্যকরী সমিতিগুলি আমাদের দেশের প্রত্যেক প্রদেশে ও অঞ্চলে আপনাদের সর্ব্বতো-ভাবে সাহায্য করিবে—যাহাতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী গ্রামের শ্রমিকদের সঙ্গে দৃঢ় এবং সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া ধনিকের দ্বারা গরীবের ঘাড়ে বোঝা চাপাইয়া সংকট সমাধানের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে, যাহাতে জীবনধারণের মত মজুরির জন্য নিম্নতম মূল বেতনের জন্য এবং শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দ্বারা সমাজতন্ত্র এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে এবং সংগ্রামী ঐক্যের প্রকাশ হিসাবে আমরা আপনাদের নূতন সংগঠনকে ভারতের ৮ লক্ষ কারখানা শ্রমিকের কেন্দ্রীয় সংগঠন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানাইতেছি।

পুনরায় আপনাদের সম্মেলনের সাফল্য-কামনা করিতেছি।

সৌহার্দ্যমূলক অভিনন্দন জানা-ইতেছি।

দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে খাদ্য ও জমি দখল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গরীবদের নিকট এখন স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

বাঁকুড়ার ক্ষেতমজুররা শুধু মজুরি বৃদ্ধির জন্যই সংগ্রাম করে না। তাহারা বড় চড় পুকুরে নিজেদের মাছ ধরার অধিকার কায়েম করে; খাদ্যের দর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের গরীবদের মধ্যে শত শত মণ চাউল বিলি করে, শহরের বিড়ি শ্রমিকদের সহিত একত্রে গরীব কৃষককে তাহার জমি দখলে রাখার সাহায্য করে।

নিজেদের জঙ্গী জমায়েতের জোরে তাহারা গ্রামের মধ্যে এমন ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম করতে সমর্থ হয় যে জোতদার-জমিদার-ধনী কৃষকের গুণ্ডাদের পক্ষে তাহার বিরুদ্ধে হামলা করিতে গ্রামে ঢোকা কঠিন হয়।

২৪পরগনা

গত দুর্ভিক্ষে বাংলার যে সকল এলাকায় কৃষক সবচেয়ে বেশী জমিহারা হইয়াছে ২৪পরগনা জেলার সুন্দরবন প্রভৃতি তাহার অন্যতম। এখানকার প্রায় ১৪ আনা জমি জমিদার-জোতদার-লাট দারদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এখানকার জমিদার-জোতদার-লাটদাররা সমস্ত খাদ্য কলিকাতা ও হাওড়ার চোরাবাজারে চালান করে। ফলে এখানকার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে বছরের অধিকাংশ সময় অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে কাটাইতে হয় এবং ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে হয়।

এবারকার তে-ভাগার সংগ্রামে এবং বিশেষ করিয়া জমি দখলের ব্যাপারে এ জেলায়ই ক্ষেতমজুররা সবচেয়ে অগ্রণী হয়। কাকদ্বীপের রাধানগর, চন্দ্রনগর, লয়ালগঞ্জ, বুধাখালি প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার বিঘা জমিতে ভাগচাষীরা জোতদার পুলিসের সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া তে-ভাগা কায়েম করিয়াছে।

এই সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেতমজুরদের মধ্য হইতে মজুরি বৃদ্ধির দাবি উঠিয়াছে। অধিকাংশ এলাকায় ক্ষেতমজুরদের মজুরি বাড়িয়াছে। রাজনগরে তাহারা মাঝারী ও গরীব কৃষকদের সহিত ৩০০ বিঘা জমি দখল করিয়া তাহা একত্রে চাষ করিয়াছে এবং ফসল সমানভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছে। [যদিও মাঝারী কৃষকরা এই জমি চাষের কম খাটুনী দিয়াছে]। তাহারা শত শত মন খাদ্য গ্রামের গরীবদের মধ্যে বিলি করিয়াছে। গ্রাম্য সংগ্রাম কমিটির মধ্যে ক্ষেতমজুরদের আধিপত্য অনেকখানি বাড়িয়াছে।

কিন্তু ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম শুধু কাকদ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। উহা এখন প্রায় সমগ্র জেলায় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

কংগ্রেসী মন্ত্রী হেম নস্কর প্রভৃতি জমিদারের দল হাড়োয়া থানার প্রায় ৪০ হাজার বিঘা জমিতে জল আটকাইয়া মাছের চাষ করে। জমি হারাইয়া কৃষকরা দৈনিক আট আনা মজুরিতে সেই সকল মেছো ভেরিতে মজুর হিসাবে কাজ করিতে বাধ্য হয়। তাহাতে আবার অধিকাংশ দিন কোন কাজও থাকে না। এই অবস্থায় তিউড়ির ভেরী মজুররা মজুরি বৃদ্ধির দাবি করিতে থাকে। তাহারা ঐ সকল জমিতে ফসল উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত লয়। কংগ্রেসী পুলিস তাহাদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন দমন করার জন্যে গ্রামে যায়। পুলিসের গুলিতে দাশু এবং মতি নিহত হন। ২৫০ শত সশস্ত্র পুলিস কৃষকদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া হানা দেয়।

ভাঙ্গোর এলাকায় বনগ্রাম, বাগবাড়ী, বেওতা প্রভৃতি গ্রামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকরা গ্রামের গরীবদের মধ্যে প্রায় দুইশত মণ ধান বিলি করে। এখানেও ৩৫০ জন সশস্ত্র পুলিস পাঠানো হয় এই সকল ধান জোতদারদের ঘরে ফিরাইয়া দিবার জন্যে। ধানের খোঁজে পুলিস ঘরে ঘরে হামলা করে।

সন্দেশখালিতে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা খুবই বেশী। এখানে ২রা জুন শুক-দোয়ানীর লাটে ক্ষেতমজুররা এক সভা করিয়া ঘোষণা করে যে, ক্ষেতমজুরদের দৈনিক পাঁচ সিকার স্থলে আড়াই টাকা দিতে হইবে, তিন বেলা খোরাকী দিতে হইবে। মাহিন্দারদের মাহিনা ১৮ টাকার স্থলে ৬০৲ টাকা করিতে হইবে।

মিটিং-এর পরের দিনই গোটা লাটে ধর্ম্মঘট হয়। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়, ধর্ম্মঘট নূতন নূতন এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। ৬।৭ দিনের মধ্যেই ধনীরা দৈনিক আড়াই টাকা মজুরি ও ৫০ টাকা মাহিনা দিতে স্বীকৃত হয়।

বামুনিয়া এলাকার ক্ষেতমজুররা শুক-দোয়ানীর ঐ জয়ের খবর পাইয়া ধর্ম্মঘট সুরু করে। ১০ মাইলের মধ্যে প্রায় ২৫০ শত ক্ষেতমজুর সপ্তাহকাল ধর্ম্মঘট করিয়াই দাবী আদায় করিতে সমর্থ হয়।

হাটগাছি অঞ্চলের মেয়ে মজুরেরা ১ টাকা মজুরির স্থলে পুরুষদের সমান মজুরি দাবী করে। তাহারাও দৈনিক ২ টাকা মজুরি আদায় করে।

হাওড়ায়

হাওড়া জেলায় ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে প্রায় ১২ মাসই ২৫।৩০৲ টাকা দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হয়। কাজেই এখানকার ক্ষেতমজুররা এখন দৈনিক ৪৲ টাকা দাবীর উপর আন্দোলন সুরু করিয়াছে।

এই মজুরি বৃদ্ধির দাবীর উপরেই গত ১২ই জুন ডোমজুর এলাকার প্রায় দুই হাজার ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘট করে।

জুন মাসে ইসলামপুরে চাউলের দর ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে থাকে। দুর্ভিক্ষের ঘোর সংকট সত্ত্বেও দেখা যায় যে, কংগ্রেস সম্পাদক জোতদার শচীন ঘোষের গোলায় ধান চাউল বিস্তর মজুত রহিয়াছে। ক্ষেত মজুরেরা তখন ঐ ধান-চাউল গ্রামের গরীবদের মধ্যে বিলি করিয়া দেয়। অমনি সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের দর পড়িতে থাকে। শচীন ঘোষ পুলিসের নিকট সাহায্য চায়। পুলিস ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উপর গুলি চালায়। চারজন কৃষক নিহত হন।

হুগলী জেলায়

হুগলী জেলার দ্বারবাসিনী অঞ্চলে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসেও ক্ষেতমজুরদের মজুরি ছিল দৈনিক এক সের চাউল ও আটা দশ আনা নগদ। বাঁধি কিসান ও নাগারী কিসানরা অগ্রিম টাকা লইত বলিয়া মাত্র চার আনা মজুরিতে খাটিতে বাধ্য হইত। ইহাদের ঘরের মেয়েদের প্রতি পর্য্যন্ত দাসোচিত ব্যবহার করা হইত।

ক্ষেতমজুররা অধিকাংশ বাউরী এবং সাঁওতাল ধনীদের নিকট ছোটজাত বলিয়া পরিচিত। ধনীরা এই 'ছোটজাতে'র আন্দোলনের বিরুদ্ধে মাঝারী কৃষকদের মধ্যে প্রচার করে। তবু এখানে মাত্র ১০ দিন প্রচারের ফলে ক্ষেতমজুরদের একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়; দৈনিক আড়াই টাকা মজুরির দাবি লইয়া মজুররা ১০ মাইল ঘোরে। ঠাণ্ডার বাগানে একদিন ধর্ম্মঘট করিয়া দৈনিক মজুরি ১৷৹ আনা আদায় করা হয়। প্রায় ৬।৭খানা গ্রামে ঐ ভাবেই মজুরির রেট বাড়িতে থাকে। মালঞ্চপাড়ায় ৩।৫ দিন ধর্ম্মঘট চলে। দাথড়া গ্রামে এবং রামেশ্বরপুরে ক্ষেতমজুররা জোতদারদের বয়কট করে। ধনেখালি থানারও অনেক গ্রামে [খেজুর দহ প্রভৃতি] সমিতির ইস্তাহার পাইয়াই ক্ষেতমজুররা মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করে।

জাহুয়ারী মাসে ভুবিরভেড়ী অঞ্চলে ৪।৫খানা গ্রামে তে-ভাগা কায়েম হয়। জোতদারদের সাহায্য করার জন্যে পুলিস আসে। মেয়েদের উপর গুলি চালায়। ৫জন মেয়ে শহীদ হন। এখানে ক্ষেতমজুররা সাঁওতাল; তাহাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে আন্দোলনও আলাদা সংগঠন সুরু হয়। প্রথমে ২।৩খানা গ্রামে কিসানদের দৈনিক আড়াই টাকার রেট মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু পরে কৃষকেরা জোতদারদের সহিত আপোষ ও শান্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং কিসানদের বিরুদ্ধে যায়।

মার্চ্চএ বাবনানে মুসলমান জোতদার সালিম হিন্দু ক্ষেতমজুর গৌর পাত্রকে খুন করে। বর্গ ক্ষত্রিয়দের 'জাতীয়' নেতা এবং হিন্দু-মহাসভা কংগ্রেসপন্থীরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করে। মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মিটিং ডাকে। কিন্তু ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকরা তাঁহাদের মিটিং বয়কট করিয়া চলিয়া আসে। তাহারা জোতদারদের বয়কট করে, ধর্ম্মঘট চালাইতে থাকে। পাতিপুকুরে ধনীরা দৈনিক এক টাকা মজুরি ও এক সের চাউলের দাবি মানিয়া লয়। বাগডাঙ্গা গ্রামে আন্দোলনের চাপে জোতদাররা ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের পুকুর ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ন-পাড়া গ্রামে জোতদারের হাতে একটি ক্ষেতমজুর মেয়ে নিহত হইলে জোতদাররা তাহাকে শাস্তি দেয় ও বয়কট করে। বড়া-কমলাপুরে দালালদের চার বিঘা জমি ক্ষেতমজুরদের চাষ করিতে দেওয়া হয়।

বীরভূম

ধান পাকার সময় হইতে বীরভূম জেলায় ক্ষেতমজুরেরা দৈনিক দুই টাকা মজুরির দাবীতে আন্দোলন সুরু করে। মোট ১২টি থানার মধ্যে ৮টি থানার বিভিন্ন অংশে ছোটবড় বহু ধর্ম্মঘট হয়। এই সকল ধর্ম্মঘটে গরীব কৃষকদের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

নওয়ী গ্রামে কংগ্রেসী সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেখানে ব্যাপক ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘটে যোগদান করার 'অপরাধে' ধনীরা ক্ষেতমজুর মেয়েদের জঙ্গলে পাতা কুড়াইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা

(৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

কৃষক সমস্যার আলোচনা

কয়েকখানা পড়ার মত বই

গ্রামের গরীবদের প্রতি—লেনিন, (২য় সংস্করণ) দাম এক টাকা।

লেনিনের এই বইখানির বৈপ্লবিক গুরুত্ব অনেকখানি, এই বইখানিতে শুধু গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রামেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়নি। শ্রেণীবিভক্ত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি শ্রমিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মকৌশল কি রকম হবে তার নির্দেশও পাওয়া যায়। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলেরও শ্রেণী-বিভাগ আজ চরমে উঠেছে, গ্রাম্য গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর আজ নিঃস্ব-শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। তাই গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংঘর্ষ অত্যন্ত তীব্র ও রক্তাক্ত। এই বইর গুরুত্ব তাই আজ এত বেশী।

বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ—দাম আট আনা।

বাংলার গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার বিবর্তন এবং তারই পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করছে, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর, কে কোন শিবিরে যোগ দেবে তার আলোচনা আছে।

কৃষক সমস্যার নূতন ধারা—দাম চার আনা।

গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ও সুদৃঢ় ভিত্তি দিন মজুর ও গরীব চাষী। মধ্যবিত্ত চাষীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে হবে। এই সমন্বয়ের উদ্দেশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন ও সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করা, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুট থেকে দেশকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা, শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এই বইখানি সারা ভারতের কৃষক সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা।

নিউ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ইতালীর ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘটে বিরাট সাফল্য ঃ সংগঠন ও লড়াইয়ের কায়দা

লেখক ঃ আর্তুরো কলম্বি
[ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির বোর্ডের সদস্য]

সম্প্রতি ইতালীর ফার্ম শ্রমিক ও ক্ষেতমজুরদের প্রায় ৪০ দিন ব্যাপী যে ধর্মঘট হইয়া গেল, যুদ্ধোত্তর যুগে ইতালীয় মেহনতী জনগণের সর্ব্ববৃহৎ শ্রেণী-সংগ্রামগুলির মধ্যে তাহা অন্যতম।

সারা দেশের ১৫ লক্ষেরও বেশি শ্রমজীবী মানুষ এই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল পো-উপত্যকা, এখানে অবস্থিত বড় বড় ধনতান্ত্রিক জমিদারিগুলিতে চাষ আবাদ হয় খুব কড়া চাপে। পো-উপত্যকার প্রদেশগুলির সংগঠিত ক্ষেতমজুরের সংখ্যা হইবে প্রায় ৬ লক্ষ, মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘদিনের সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্যে তাঁহারা সমৃদ্ধ।

ধর্ম্মঘট চালিত হইয়াছিল কেবল জমির বড় বড় পুঁজিবাদী মালিকদের বিরুদ্ধে এবং জমি ইজারা দেয় এমন সব জমিদারদের বিরুদ্ধে, এইসব জমিদারিগুলির জমিতে সমস্ত কাজ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; কেবল গবাদি পশুদের মাঠে চরানো হয় তাহাদের জানটুকু বাঁচাইয়া রাখার জন্য। অন্য দিকে মেহনতী জনগণের সংগঠনগুলি তাহাদের উচ্চস্তরের রাজনৈতিক চেতনাজনিত বুদ্ধির বলে ভাগচাষী ও গরীব কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত লোক পাঠায়। এইভাবে তাঁহারা গ্রামাঞ্চলের অপরাপর মেহনতী জনতার সহানুভূতি অর্জ্জন করেন এবং গ্রামাঞ্চলের বড় বড় পুঁজিপতিদের বিচ্ছিন্ন কোণঠাসা করিয়া ফেলেন।

জমিতে যাহারা মজুর খাটায় তাহাদের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করিয়া চেনার কৌশলটি আয়ত্ত হইয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী বছরগুলির তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া। ইহার প্রত্যেকটি অংশকে একই প্রতিক্রিয়াশীলদের শত্রু দলে ফেলিয়া দেখা হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ভুলভ্রান্তির ফলে কৃষিক্ষেত্রে একটি ফ্যাসিস্ট জোট গঠিত হইবার পথ সুগম হইয়াছিল এবং এই জোট তখন ফার্ম শ্রমিক-সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া সফল হইতে পারিয়াছিল। ফার্ম শ্রমিকের সংগঠনগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়।

ক্ষেতমজুরদের দাবীসমূহ

ধর্ম্মঘটীরা অনেকগুলি জরুরী দাবী উত্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দাবী হইল ঃ সারা দেশের জন্য একটি জাতীয় চুক্তি, উন্নতিমূলক কাজে শ্রমিক নিয়োগে করিতে হইবে, বেশি হারে পারিবারিক ভাতা, জীবনধারণের খরচের হার বৃদ্ধির অনুপাতে অতিরিক্ত মজুরি দিবার ব্যবস্থা, বেকার অবস্থায় সাহায্যদান, "ন্যায্য কারণ বিনা" শ্রমিককে বরখাস্ত করা নিষিদ্ধ। জাতীয় চুক্তির দাবী তোলার উদ্দেশ্য হইল—ইতিপূর্ব্বে উত্তরাঞ্চলের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি যে সব দাবী আদায় করিয়াছিলেন, দক্ষিণাঞ্চলের মেহনতী জনগণের জন্যও তাহা চালু করা। সমশ্রেণীর সমস্বার্থবোধ হইতেই এই দাবী উঠে; ইহার তাৎপর্য্য খুবই। ইহার লক্ষ্য হইল গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মেহনতী জনগণকে একই মিলিত আন্দোলনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা।

বেকারীর বিরুদ্ধে

উন্নতিমূলক কাজে শ্রমিক নিয়োগ করিবার দাবী তোলারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। কৃষিকাজে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা চালু আছে তাহার ফলে ফার্ম-শ্রমিকরা বছরের দীর্ঘ সময় বেকার অবস্থায় থাকেন। ইহার দরুণ তাঁহাদের জীবনযাত্রার মান ভয়ানকভাবে নামিয়া যায়, তাঁহাদের দারিদ্র্য ও ক্লেসের মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। গ্রামাঞ্চলের মরশুমী শ্রমিকরা বছরে গড়ে মাত্র ১৬০ দিন কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার দিনমজুরের মধ্যে শতকরা ৫০ জন ২০০ দিন কাজ করেন, শতকরা ৩৪ জন ১০০ দিন এবং শতকরা ১৬ জন ৫০ দিন মাত্র কাজ করেন! একথা সহজেই বুঝা যায় যে, মালিকদের তরফ হইতে তাঁহাদের মুনাফার এক অংশ উন্নতিমূলক কাজে শ্রমিক নিয়োগ করিতে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা থাকার অর্থ কী এবং মরশুমী শ্রমিকদের বেকার থাকা কালে সাহায্য দিবার তাৎপর্য্যই বা কতটা।

পাকা-চাকুরীর অধিকার

কেবলমাত্র 'ন্যায্য' কারণ থাকিলে তবেই বরখাস্ত করা চলিবে—এই দাবী ধনতান্ত্রিক স্টেটগুলির স্থায়ী শ্রমিকদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মালিকদের দয়ার উপর তাঁহাদের চাকুরী নির্ভর করে, মালিকের খামখেয়ালীর হুকুম তামিল করিতে অস্বীকার করিলেই যে-কোন শ্রমিক বরখাস্ত হইয়া যাইতেন, গৃহহীন হইয়া পড়িতেন। এই ধরনের বরখাস্ত করিবার ব্যবস্থাকে মালিকরা বিপজ্জনক রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে—শ্রমিক লীগের নেতাদিগকে, বামপন্থী মেয়রদিগকে, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টির শাখা সম্পাদকদিগকে এবং যে কেহ স্থানীয় বুর্জ্জোয়া বা পাদরীদের বিরাগভাজন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে লিপ্ত থাকিবেন তাঁহাকেই গ্রাম হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে পারে। বরখাস্তের জন্য "ন্যায্য কারণের" শর্ত্ত উত্থাপন করিয়া ধর্ম্মঘটীরা জমির মালিকদের হাত হইতে এই অস্ত্র কাড়িয়া নেওয়ারই সিদ্ধান্ত করিলেন।

১০ লক্ষ সংগঠিত মানুষের শক্তি

মেহনতী জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ও উৎসাহের সঙ্গে তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে সাড়া দিলেন—দশ লক্ষেরও বেশী সভ্য এই ট্রেড ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত। ধড়ের মরশুম সুরু হইবার প্রাক্কালে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়া যায়। সর্ব্বাগ্রণী সরকারী সাহায্যে উৎফুল্ল মালিকদের প্রতিষ্ঠানগুলি জানাইয়া দিল যে, তাহারা দাবি পূরণ করিতে অসমর্থ; তাহারা আপোষ আলোচনা করিতেও অস্বীকার করিল। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া ও ছলনার আশ্রয় লইয়া তাহারা চিরবেনারের দেশ পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে দলে দলে শ্রমিক সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এইসব লোকের অধিকাংশই তাঁহাদের শ্রেণী-কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন; পিকেটিং-রত ধর্ম্মঘটীদের সংস্পর্শে আসামাত্রই তাহারা ধর্ম্মঘটভঙ্গকারী হইয়া কাজ করিতে অস্বীকার করিলেন। মালিকরা তখন সশস্ত্র উস্কানিদাতা আমদানী করিল; মোটরবাহী পুঁলসবাহিনী দ্বারা সেই গুণ্ডাদের রক্ষা করিল। ইহার ফলে সংঘর্ষ সুরু হইল, গোলাগুলি চলিল। জমিদার এবং উস্কানিদাতারা ধর্ম্মঘটীদের উপর গুলি চালাইল, পুলিস তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিল লাঠি চালাইয়া, গ্রেপ্তার করিয়া এবং সাধারণ মানুষের উপরও গুলি চালাইল। যুদ্ধে নিহত জনৈক সৈন্যের বিধবা স্ত্রী সহ মোট পাঁচজন শ্রমিককে তাহারা খুন করিল,—বিধবাটি এক বিরাট পরিবারের গৃহকর্ত্রী মা। গুরুতর আহত অবস্থায় অনেককে হাসপাতালে পাঠান হইল।

ধনিক রাষ্ট্রের উন্মাদ হামলা

সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকেই মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মামুলী গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিও একের পর এক লঙ্ঘন করা হইল। ধর্ম্মঘটের সময়ে মালিকরা এবং তাহাদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা ব্যাপকভাবে হিংসামূলক আক্রমণ চালায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিনা কারণেই গুলি চালানো হইয়াছিল, আমেরিকান জীপ ও লাঠির সাহায্যে সভা-শোভাযাত্রা বর্ব্বরভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ধর্ম্মঘটকারীদিগকে এবং তাঁহাদের সমর্থক সন্দেহে অন্যান্য লোককেও পাইকারিহারে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টি অফিসের বাড়ীগুলিতে পুলিস হামলা হয়। গ্রামগুলিতে একেবারে অবরোধের অবস্থাই চালু করা হইল—রাস্তায় দল বাঁধিয়া জড়ো হওয়া নিষিদ্ধ হইয়া গেল। অনেকগুলি ফার্মকে উস্কানিদাতাদের ও মুষ্টিমেয় ধর্ম্মঘটভঙ্গকারী দালালের আশ্রয়স্থলে পরিণত করা হয়। দখলকারী জর্মানরা যেরূপ করিয়াছিল, সেই ধরনেরই অবরোধের ব্যবস্থা চালু করা হইল।

ধর্মের আফিংএ নেশা জমাইবার ব্যর্থ চাল

মালিকশ্রেণী এবং সরকার, পাদরী এবং সারাগতের চেলাচামুণ্ডারা গুলিবারুদ এবং 'আধ্যাত্মিক' অস্ত্র—গ্রামাঞ্চলের মেহনতী জনগণের দৃঢ়তা ভাঙ্গিতে সব কিছুরই একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু জনগণ প্রতিরোধ চালাইয়া গেলেন। সবসময়ে পুরোভাগে থাকিয়া মেয়েরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করিয়াছেন। বহু সহস্র মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিক পিকেটিং করিতে দাঁড়াইয়া গেলেন। চটপট একস্থান হইতে অন্যত্র গিয়া বিপজ্জনক ঘাঁটিগুলিতে সমাবেশ করিয়াছেন। এই সব দেখিয়াশুনিয়া পুলিস একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়া উঠিল; ধর্ম্মঘটীদের লড়াইয়ের ক্ষমতা ও সমাবেশের সঙ্গে তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; ধর্ম্মঘটীরা সবসময়েই লড়াইয়ে জন্য প্রস্তুত ছিলেন বলপ্রয়োগ, গ্রেপ্তার, খুন এবং গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও তাঁহারা কখনও লড়াইয়ের ময়দান ত্যাগ করেন নাই।

রাজনৈতিক মোহমুক্তি

এই বলপ্রয়োগের ফলে যে বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহাতে সরকার কিছুটা নাজেহাল হইয়া পড়িয়াছে। মেহনতী জনগণের মধ্যে এবং গণতান্ত্রিক মহলে সবচেয়ে বেশী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এইজন্য যে সরকার ও পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ এই বলপ্রয়োগকেই "স্বাভাবিক" করিয়া তুলিয়াছিল; "ন্যায্য" হিসাবে জাহির করিয়া আরও উহা বাড়াইয়া তুলিতেছিল। জমিদাররা নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করিবে ও চারিদিকে সশস্ত্র লোক মোতায়েন রাখিবে ইহাও তাহাদের কাছে "স্বাভাবিক" ব্যাপার!

মালিকশ্রেণীকে খুশী করিবার আগ্রহে এবং মেহনতী জনগণের প্রতি অন্ধ ঘৃণা বশতঃ প্রতিক্রিয়াশীল খদ্দরীরা বুঝিতেই পারে নাই যে, শ্রমিকশ্রেণীর এক বিরাট অংশকে "সমাজচ্যুত" বলিয়া সেইমত ব্যবহার করার কি পরিণাম হইতে পারে। অথচ কি ইহাদের "অপরাধ"? ইহাদের একমাত্র "অপরাধ" হইল, শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই তাঁহাদের একমাত্র "অপরাধ"।

সিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই ধর্ম্মঘটের

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পুঁজিবাদী ও পুলিসের সঙ্গী ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি সম্পর্কে ব্যাপক মোহমুক্তি

পূর্ব্ববাংলার গ্রামে ক্ষেতম

বাঁচার মত মজুরি, গরীবদের জন্য ঐতিহা

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের দৌলতে পাকিস্তানে দেশীয় ধনিক-জমিদারদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর হইতে পূর্ব্ববঙ্গের গরীব মেহনতী কৃষকদের জীবনের সংকট ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ধান-চাউলের দর ক্রমাগত বাড়িয়া এ বছর প্রতিমণ চাউল ৩৫।৪০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। চাউলের এরূপ দর বাংলার ইতিহাসে আর কোন দিনই হয় নাই।

নিত্যব্যবহার্য্য প্রতিটি জিনিসের দরও আগুনের মত। সরিষার তেল ৪ টাকা সের, নুনের সের চার আনা—একখানা লুঙ্গির দাম ৫।৬ টাকা, একখানা কাপড়ের দাম ৭।৮ টাকা।

ধান-চাউলের এই অস্বাভাবিক দাম হেতু আজ পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের ঘরে ঘরে অনাহার ও অর্দ্ধাহার। কোন কোন গ্রামে অনাহারে মৃত্যুও ঘটিয়াছে।

অপরদিকে এই ধান-চাউল মজুত করিয়াই ধনী কৃষকগণ জনগণের ক্ষুধার বিনিময়ে বিরাট মুনাফা লুটিতেছে। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা খাদ্য সংগ্রহের নামে ধনীকৃষক ও জোতদারদের ধান ছাড়িয়া দিয়া মধ্য কৃষক ও গরীব কৃষকদের ধান ফৌজ লাগাইয়া কাড়িয়া নিয়াছে। কিন্তু এই খাদ্য গ্রামের জনগণের ভিতর বিলি হয় নাই। এই খাদ্য দিয়া 'রেশনের' নামে ব্যবসা করিয়া নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা ১৯৪৮-৪৯ সালে ৬৩ লাখ টাকা লাভ করিয়াছে।

নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বাড়াইয়া গ্রামের গরীবদের কাঁধে সঙ্কটের উপর সঙ্কটের বোঝা চাপাইয়াছে।

খাদ্যের অস্বাভাবিক দাম, লীগ সরকারের 'খাদ্যনীতি', নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসের চড়া দাম, ট্যাক্সবৃদ্ধি প্রভৃতি গ্রামের মেহনতী কৃষককুলের জীবন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছে।

এই গভীর সংকটের আঘাত সবচেয়ে বেশী পড়িয়াছে গ্রামের সর্ব্বহারা ক্ষেতমজুর শ্রেণীর উপর। চাউলের মণ যখন ৩৫।৪০ টাকা, প্রতিটি জিনিসের দাম যখন ৪।৫ গুণ বাড়িয়াছে, তখন পূর্ব্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে মজুরের দল দৈনিক ১ টাকা, দেড় টাকা মজুরিতেই কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহার ফলে লীগ শাসনের আমলে ধনীকৃষক ও জোতদারদের শোষণে ও অত্যাচারে পূর্ব্ব বাঙ্গলার গ্রামের এই শ্রমজীবীশ্রেণী অতিদ্রুত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ইঁহাদের শোষণ করিয়াই অপরদিকে ধনীর দল মুনাফার পাহাড় তৈয়ার করিয়াছে।

পাট-লাইসেন্স বাতিলের লড়াই

ধনিক-জমিদার ও লীগ সরকারের এই প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামের মেহনতী মানুষ জমি, খাদ্য, বাঁচার মত মজুরির দাবী নিয়া সকল শক্তি দিয়া লড়াই চালাইয়া যাইতেছে।

বাংলার চাষীর অমূল্যসম্পদ পাট। এই পাট নিয়া পূর্ব্ব বাংলার মুষ্টিমেয় বিদেশী ব্যাপারী কৃষকগণকে ঠকাইয়া ও পশ্চিম বাংলার বিলাতী পাটকলওয়ালাগণ মজুরগণকে শোষণ করিয়া বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে। অথচ বাংলার চাষী এই পাটের ন্যায্য দাম পায় না। লীগ নেতারা চাষীকে ওয়াদা দিয়াছিল যে, তাহারা পাটের দাম বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু, সেই ওয়াদা রক্ষা করার বদলে লীগ মন্ত্রিসভা ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে পাট চাষের উপর নূতন করিয়া এক ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া চাষীর ঘাড়ে সংকটের বোঝা আরও বাড়াইয়া দিলেন।

ইহার বিরুদ্ধে সারা পূর্ব্ববঙ্গে চাষীদের বিরাট বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কৃষকগণ এই পাট লাইসেন্স করিতে অস্বীকার করিয়া দাবী তোলেন, 'পাট চাষ ট্যাক্সের প্রত্যাহার চাই।' লালঝাণ্ডার নীচে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ১৯৪৮ সনের জুন জুলাই মাসে রংপুরের ও ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের চাষীগণ এই লাইসেন্স নিতে অস্বীকার করে। লীগ মন্ত্রিসভা ভয় দেখাইয়া গ্রামে পুলিস পাঠাইয়া চাষীদের এই হক্ লড়াইকে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সরকারের দমননীতি গরীবদের লড়াইকে ভাঙ্গিতে পারে নাই। জুলুম সত্ত্বেও হাজার হাজার গরীব চাষী পাট লাইসেন্স ফি দেন নাই।

খাদ্যের আন্দোলন

১৯৪৮ সনের জুন-জুলাই মাস হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। মজুতদারদের মুনাফার লালসায় চাউলের দাম দাঁড়াইয়া যায় মণ প্রতি ৩০।৩৫ টাকা। লীগ সরকার খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই করিল না। সরকার মজুত উদ্ধার করিয়া তাহা বিতরণ করিল না।

এই পরিস্থিতিতে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, ময়মনসিংহের রাস্তায় বুভুক্ষু শতশত নরনারী বিক্ষোভ জানাইল, "সস্তা দরে খাদ্য চাই" "খাদ্য দাও নয়ত গদী ছাড়।" চট্টগ্রামে গ্রামের গরীব মেয়ে পুরুষদের এই ভুখা মিছিলকে ভাঙ্গার জন্য সরকার পাঁচশ পুলিস ও আনসার নিয়োগ করিয়া এক প্রচণ্ড সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সময়ে খাদ্যের দাবীতে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে গ্রামের গরীবদের মিছিল, সভা, শোভাযাত্রা পূর্ব্ববাংলার প্রায় সব জেলাতেই হইতে থাকে। জেলায় জেলায় শত শত কণ্ঠে ক্ষেতমজুর-গরীব-কৃষক নরনারী আওয়াজ তোলে—'খাদ্য দাও নয়ত গদি ছাড়'।

বশোহরের নড়াইল মহকুমার নড়াইল, শেনহাটি, দুর্গাপুর ইউনিয়নে এই আন্দোলন বিশেষ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে। গরীব জনতার জাগরণে ভীত, ধনীর সমর্থক লীগ মন্ত্রিসভা সশস্ত্র পুলিস পাঠাইয়া আন্দোলকে পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করে। ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীগণ সশস্ত্র পুলিসের হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। গ্রামের গরীবদের শক্তির সামনে পুলিস ২।৩ বার পরাজিত হয়। ইহার পর আরো অধিক সংখ্যক সশস্ত্র পুলিস আসিয়া গ্রামে গ্রামে অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে থাকে।

এই সময়েই খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার গরীব চাষীগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ধানলীজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন। লীগ মন্ত্রিসভা সশস্ত্র পুলিস আনসার দ্বারা বীভৎস দমননীতি চালাইতে থাকে। শোভনা এলাকায় আনসার ও পুলিসের অত্যাচার চরমে ওঠে। তবুও আন্দোলন চলিতেই থাকে।

আগস্ট মাসেই রাজশাহীর মান্দা থানায় চাকরান প্রজাগণ লড়াই করিয়া যুগ-যুগের বেগারপ্রথা বন্ধ রাখিয়া দেন।

মাদারশার লড়াই

২৯শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মাদারশার গরীব চাষী ও ক্ষেত মজুরগণ বানের জল হইতে নিজেদের ঘরবাড়ী রক্ষা করার জন্য নদীর 'টেক' কাটার লড়াইএ আগুয়ান হন। নদীর 'টেক' কাটিয়া দিলে বানের জল বাহির হইয়া মুষ্টিমেয় ধনীর মাছের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া লীগ সরকার 'টেক' কাটিতে অস্বীকার করে। ধনীর মাছের ব্যবসার ক্ষেত্র পাহারা দেওয়ার জন্য লীগ সরকার মাদারশার 'টেকে' সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করে।

কিন্তু মাদারশার গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরের দল লীগ সরকারের পুলিসের বন্দুক তুচ্ছ করিয়াই ২৯শে সেপ্টেম্বর 'টেক' কাটিতে অগ্রসর হয়। পুলিস তখন নিরস্ত্র জনতার উপর বে-পরোয়া গুলি চালায়। সেই স্থানেই ১৭ জন বালক, যুবা, বৃদ্ধ নিহত হন। মাদারশার নদীর কালো জল গরীবের খুনে লাল হইয়া যায়। এই হত্যাকাণ্ডে চট্টগ্রামে ও সারা পূর্ব্ববঙ্গে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। সেদিন চট্টগ্রামের জনসাধারণ সারা জেলায় হরতাল করিয়া এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জবাব দেয়।

এই সব সংগঠিত লড়াই ছাড়াও পূর্ব্ব বঙ্গের বহুস্থানেই গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরগণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই খাদ্যের জন্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে থাকেন। সিলেট, রংপুর, বরিশাল, খুলনা চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া চোরাকারবারীদের ধান ধরিয়া তাহা দখল করিয়া নেন।

বিভিন্ন জেলায় লীগ সরকারের 'সীমান্ত রক্ষী দলের' জুলুম, ঘুষ আদায়, মারপিট প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বহু স্থানেই গ্রামের গরীবগণ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রংপুর, বগুড়া ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানেই এই অত্যাচারী 'সীমান্ত রক্ষী দল'কে গ্রামের গরীবগণ উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন।

আধি ও টংকপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই

জনগণের খাদ্যের দাবী ও তাহার বিরুদ্ধে লীগ মন্ত্রিসভার দমননীতি, মাদারশায় ক্ষেতমজুর ও গরীব-কৃষকদের উপর সরকারের পুলিসের বে-পরোয়া গুলি বর্ষণ ও গুলিতে ১৭ জনের মরণ প্রভৃতি ঘটনা ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক ও গ্রাম্য মেহনতী জনতাকে বুঝাইয়া দিল যে, লীগ মন্ত্রিসভা ধনী কৃষক জমিদার জোতদারের মন্ত্রিসভা।

এই সময়েই লীগ সরকার গণ-জাগরণে ভীত হইয়া জমিদারী ক্রয় বিল দ্বারা কৃষক জনসাধারণকে আবার ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করে যে, তাহারা এবার জমিদারী তুলিয়া দিয়া চাষীকে জমি দিবে।

কৃষক সমিতি ইস্তাহার, পুস্তিকা, সভা প্রভৃতি মারফত জনগণের নিকট সরকারের এই ধাপ্পা প্রকাশ করিয়া দিতে থাকে।

জনগণও নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারে যে, নিজেদের খাদ্য-জমি ও বাঁচার মত মজুরি প্রভৃতি দাবি লড়াই করিয়াই কায়েম করিতে হইবে। কাজেই সরকারের দমননীতি তুচ্ছ করিয়াই ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করিতে থাকে।

১৯৪৮ সনের শেষ ভাগ হইতে খুলনা, যশোহর, রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে লালঝাণ্ডার হক নেতৃত্বে লাখ লাখ গরীব জনগণ নিজেদের দাবী ঘোষণা করেন, "খোদ চাষীর হাতে জমি

= বেকারীর অভিশাপ রুখি

চাই" "জমিদারীপ্রথা খতম কর"। "আধিপ্রথা খতম কর" "টংকপ্রথা খতম কর" 'জান দিব তবু ধান দিব না।'

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে সারা পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার লাখ লাখ গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর নরনারী বর্ব্বর শোষণ, আধি প্রথা ও টংকপ্রথা খতমের প্রত্যক্ষ লড়াইএ নামিয়া পড়েন। গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের শ্রমজাত ধান নিজেদের বাড়ীতে আনার জন্য লড়াই সুরু করিল। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভাও আরো কঠোর ভাবে দমননীতি চালাইয়া দেয়। গ্রামে গ্রামে ধনী-কৃষক, জোতদার, জমিদারদের বর্ব্বর শোষণ বজায় রাখার জন্য শত শত পুলিস ফৌজের ক্যাম্প বসিয়া গেল। সুরু হইল ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের উপর অত্যাচার, অনাচার, গুলিবর্ষণ, গ্রেপ্তার মারপিট। তবুও আধিপ্রথা ও টংকপ্রথার শোষণের বিরুদ্ধে খাদ্যের জন্য লড়াই জেলা হইতে জেলায় ছড়াইয়া পড়িল।

আগস্ট মাস হইতে অনবরত চার মাস পাশবিক অত্যাচারের পরও নভেম্বর মাসে নড়াইলের আধিয়ারগণ ধান কাটিয়া নিজ খোলানে তুলিয়া নিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, অত্যাচারে জনতার মনোবল আজ ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

সমস্ত দমননীতি তুচ্ছ করিয়াই ডিসেম্বর মাসে খুলনা জেলার নমঃশূদ্র ও মুসলমান আধিয়ারগণ আধিপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই

জুর ও গরীব কৃষকের লড়াই

ট্যাক্স মকুব এবং কৃষি-বিপ্লবের

সিক অভ্যুত্থান

সুরু করেন। লড়াই প্রথম আরম্ভ হয় দাকোপ থানায়। দেখিতে দেখিতে সেই লড়াই রামপাল ও পাইকগাছা থানার হাজার হাজার আধিয়ারদের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। মাঠ হইতে যখন আধিয়ারগণ ধান নিজ বাড়ীতে নিয়া যান তখন জয়মুনির ঘোলে পুলিস আধিয়ারদের উপর গুলি চালাইয়াছে। পুলিসের গুলি তুচ্ছ করিয়াই শত শত আধিয়ার নিজ বাড়ীতে ধান নিয়া যান।

ময়মনসিংহ জেলার হাজং অঞ্চল ১৯৪৬-৪৭ সালে টংকপ্রথার বিরুদ্ধে এক গৌরবময় লড়াই চালাইয়াছিলেন। তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফৌজ সেখানে চালাইয়াছিল নির্মম অত্যাচার।

সেই হাজং এলাকায় সুসং, কমলাকান্দা, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী এই চারিটি থানায় হাজার হাজার গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর ১৯৪৯ সনের জানুয়ারীতে আবার টংকপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই সুরু করেন।

শত শত সভা-মিছিলে আওয়াজ ওঠে: 'জান দিব তবুও টংক ধান দিব না।' জনতার শক্তি দেখিয়া শোষক-জমিদারদের শোষক নায়েবগণ টংক আদায় ছাড়িয়া গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতে থাকে।

দিনের পর দিন গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর স্ত্রী-পুরুষ গ্রামে গ্রামে ধনীদের টংক প্রভৃতি ৩১ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক নরনারী নিজেদের অধিকারের জন্য গুলির মুখে অকুতোভয়ে নিজেদের প্রাণ বিলাইয়া দিয়াছেন। এত অত্যাচার সত্ত্বেও সেই এলাকার আন্দোলন গত ৭ মাস যাবৎ অবিরতভাবেই চলিয়াছে। এবার জমিদারগণ সেই এলাকা হইতে ট্যাক্স আদায় করিতে পারে নাই। জনগণের দৃঢ়তা ও একতার নিকট লীগ সরকারের বীভৎস দমননীতি ব্যর্থ হইতেছে।

বহু সংগ্রামের অভিজ্ঞতাপূর্ণ রংপুর জেলার আধিয়ারগণও ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে 'আধিপ্রথা খতম কর' আওয়াজ নিয়া লড়াইয়ে আগুয়ান হন। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা এখানেও ধনীকৃষক ও জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র পুলিস পাঠাইয়া দেয়। হরিপুর বাজারে ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষকগণ 'আধিপ্রথা খতম কর' 'খাদ্য চাই' ও 'দমননীতি প্রত্যাহার কর' দাবী নিয়া মিছিল করিলে পুলিস গুলিবর্ষণ করে। সেই গুলিতে বালক কছির নিহত হয়।

কিন্তু পুলিসের গুলি সত্ত্বেও আন্দোলন চলে জোয়ারের মত। ডোমারের হরিণচরা ইউনিয়নের সব আধিয়ারগণ মাঠ হইতে ধান কাটিয়া নিজেদের ঘরে নিয়া যান।

য়া নূতন জীবনের পথে =

ধান বোঝাই গাড়ীর ধান জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিয়া দেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে এই আন্দোলন শুধু মাত্র হাজং এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার মুসলমান এলাকাতেও ছড়াইয়া পড়ে। সরকার কর্তৃক কন্ট্রোল দরে জোর করিয়া গরীবের ধান 'কেনার' বিরুদ্ধে গরীব মুসলমানদের বিক্ষোভ জাগিয়া ওঠে। হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী, নাজিরপুর প্রভৃতি বাজারে গরীবদের ধান জোর করিয়া 'কন্ট্রোল' দরে কিনিতে আসিয়া লীগ সরকারের পুলিস বার বার নাজেহাল হইয়াছে।

বর্বর টংকপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা সেই এলাকায় প্রায় এক হাজার পাঠান ফৌজ ও আনসার পাঠাইয়াছে। ইহারা গরীবদের উপর সকল রকমের বীভৎস অত্যাচার চালাইয়াছে। সমস্ত এলাকাকে ফৌজের বন্দুকের দ্বারা ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। লীগ সরকারের এই দমননীতিকে সাহায্য করিবার জন্য আসামের কংগ্রেস সরকারও গাড়ো পাহাড়ের সীমান্তে পাঠাইয়াছে ফৌজ। সেই এলাকায় গত ৭ মাসে লীগ সরকারের ফৌজ কমসে কম ১৬ বার বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছে। তবু জনতা নিজেদের আন্দোলন ছাড়েন নাই। গুলির সামনেও জনতা বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেবতী, শঙ্খমনি, তপেন্দ্র, হুবরাজ নেহালীর আধিয়ারগণও নিজেদের শ্রমজাত ধান মাঠ হইতে নিজেদের বাড়ী নিয়া যান।

দিনাজপুর জেলার ২০টি থানার লাখ লাখ আধিয়ারগণ তে-ভাগার দাবীতে অভূতপূর্ব লড়াই চালাইয়াছিলেন। সেই আন্দোলনে বেরাজ শিবরাম সমিরুদ্দিনের ও গাঁপুরে ২১ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের জীবন দান সেদিন সারা বাংলার কৃষক আন্দোলনে নূতন ঐতিহ্য স্থাপন করিয়াছিল। সেই দিনাজপুরে গত ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে আধিয়ারগণ জোতদারদের গুণ্ডাদের বাধা ও পুলিসের দমননীতি উপেক্ষা করিয়াই সাত হাজার বিঘার জমির ধান নিজ খোলানে তুলিয়া নেন।

রাজশাহীর মন্দা থানায় ও বগুড়ার ধলাহার ইউনিয়নের আধিয়ারগণও দমননীতি সত্ত্বেও মাঠ হইতে ধান নিজ খোলানে নিয়া যান।

সিলেটের নানকার এলাকায় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গত ২ বছর যাবত সশস্ত্র পুলিসের পাকাপোক্ত ঘাঁটি বসিয়াছে। পুলিসের বন্দুকের সামনা দিয়াই নওগাঁ-মেহরী এলাকার নানকার স্ত্রী-পুরুষ মাঠ হইতে ধান নিজেদের ঘরে তুলিয়া নেন।

চট্টগ্রামের কেলিশহরে জোতদারদের গুণ্ডা ও তার সঙ্গে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার সশস্ত্র পুলিস গরীব আধিয়ারদের হক দাবীকে ঠেকাইতে পারে নাই। সব দমননীতি তুচ্ছ করিয়াই আধিয়ারগণ ধান নিজ খোলানে নিয়া যান।

এই ভাব সারা পূর্ববঙ্গে ক্ষেতমজুর ও মেহনতী কৃষকগণ আধি, টংকপ্রথার যুগ যুগের শোষণের হাত হইতে নিজেদের খাদ্য রক্ষার জন্য লড়াই চালাইতে থাকেন। জমিদার জোতদার ধনীকৃষক সরকারের জোটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে ছোট-বড় শত লড়াই-এর মধ্য দিয়া তাঁহারা অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত নিজেদের শ্রমজাত ধান ঘরে তুলিতে থাকেন।

এই সময়ে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা 'খাদ্য সংগ্রহের' নামে গরীব কৃষক ও মধ্য-কৃষকদের উপর নূতন আক্রমণ করে। লীগ সরকারের 'খাদ্য সংগ্রহ বিভাগ' গ্রামে গ্রামে ফৌজের সাহায্যে মেহনতী কৃষকদের ঘর হইতে ধান কাড়িয়া নিতে লাগিল। অথচ, ভূমির উপর একচেটিয়া অধিকার বলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের শোষণের বিনিময়ে ধনী কৃষক ও জোতদারদের গোলায় যে বিরাট খাদ্য মজুত হয় —লীগ সরকার সেই মজুত 'সংগ্রহ' করে নাই।

খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর জেলার মেহনতী কৃষকসমাজ নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার এই 'খাদ্য সংগ্রহের' আক্রমণকেও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করিতে থাকেন। জনতার প্রতিরোধে বহু স্থানেই লীগ সরকারের এই বিকট 'খাদ্য নীতি' ব্যর্থ হয়।

অপর দিকে, ধনী কৃষক ও জোতদারগণ মহাউল্লাসে খাদ্যের দাম বাড়াইয়া প্রচুর মুনাফা করিতে থাকে। ফেব্রুয়ারী মাস হইতে খাদ্যের দাম বাড়িতে বাড়িতে প্রতি মণ চালের দাম ৩০।৪০ টাকায় দাঁড়ায়। বাংলার ইতিহাসে খাদ্যের এরূপ দাম আর কোন দিন হয় নাই। এই একটি ঘটনাই লীগ শাসনের সব কদর্যতাকে উলঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়।

খাদ্যের এই সংকটে গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ—বিশেষ করিয়া ক্ষেতমজুরগণ ভীষণ অনাহারের সম্মুখীন হয়।

তখন লালঝাণ্ডার ডাকে গ্রামে গ্রামে সুরু হয় খাদ্যের ও জমির জন্য নূতন ধারায় আন্দোলন। আধি, টংক বিরোধী লড়াই খাদ্য জমি দখলের লড়াইএ উন্নীত হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী রংপুর জেলার নেহালীর ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া জোতদার কিশোরীর বাড়ীতে ধানের জন্য যান। জোতদারগণ তখন এই ভুখা জনতাকে মারপিট করার জন্য একশত লাঠিয়াল পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু গরীবদের আবেদনে বহু লাঠিয়ালই ফিরিয়া যায়। বাকী গুণ্ডারা জনতার সংঘবদ্ধ শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে। তখন কিশোরীর গোলার ২৫ মণ ধান জনসাধারণের মধ্যে বিলি হয়। ঐ সময়েই ঐ এলাকায় যে সব জমি জোতদারেরা কাড়িয়া নিয়া গিয়াছিল—সেই সব জমি কৃষক ভলান্টিয়াররা পুনর্দখল করিয়া নেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী আটিয়াবাড়ীতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদল এক জোট হইয়া জোতদারদের গুণ্ডাদের ও আনসারের আক্রমণকে হঠাইয়া দিয়া ধনী কৃষক সুধন ও নবদ্বীপের গোলার ধান জনতার ভিতর বিতরণ করিয়া দেন।

২৭শে মার্চ খুলনার বঠিয়াঘাটা থানার শত শত ক্ষেতমজুর ও গরীব জনতা খাদ্যের দাবীতে থানা ও সরকারের ধানের গোলা দখল ঘেরাও করেন। তাঁহাদের দাবী খাদ্য চাই।

থানার পুলিস ভয়ে থানার ছাদের উপর গিয়া আশ্রয় নেয়। দারোগা জোর হাতে মাপ চায় ও বলে যে, জনগণের ভিতর খাদ্য বিলি করা হইবে। ইহা বিশ্বাস করিয়া জনতা চলিয়া যায়।

সেই দিনই আর একদল ক্ষেতমজুর ও গরীব জনতা খাদ্যের দাবীতে ডুমুরিয়া থানা ও সরকারী গোলা ঘেরাও করেন। সেখানে গ্রামের মাতব্বরগণ আসিয়া আপোষ করে যে প্রতিদিন যিনি আসিবেন তাহাকেই সরকারী গোলা হইতে ৫ সের করিয়া ধান দেওয়া হইবে। কিন্তু কিছু ধান বিক্রিও হয়।

কিন্তু, এই সব আশ্বাস ও আপোষের পরই নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা বঠিয়াঘাটার গরীবদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন মাসে সশস্ত্র পুলিস ও বেলুচ ফৌজ বার বার ধানিবুনিয়া ও রাধুনিয়া এলাকায় হামলা করে। ভুখা জনগণের উপর চলে অমানুষিক অত্যাচার। বার বার গুলি বর্ষণ চলে। বীর জনগণ অসীম সাহসের সহিত নিজেদের লড়াই চালাইয়া যান। গুলির সামনে দাঁড়াইয়া খাদ্যের জন্য সতীশ, রমাকান্ত ও মাদার এই তিনজন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক বীর নিজেদের প্রাণ কোরবানি দেন।

ময়মনসিংহের উত্তর অংশে ৬ মাস যাবত বীভৎস দমন নীতি সত্ত্বেও ২৫শে জুলাই হইতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ নিজেদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা এক সপ্তাহে ধনী কৃষকদের নিকট হইতে এক হাজার মণ ধান আদায় করেন।

এবারও পাঠান ফৌজ চালাইয়াছে বেপরোয়া গুলি। এবারের গুলিবর্ষণে বীরের মত প্রাণদান করিয়াছেন এক দিনেই ৯ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক সৈনিক।

ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির ধর্মঘট ও তাঁহাদের জয়

পূর্ববঙ্গে গ্রাম্য গরীবদের খাদ্য ও জমির জন্য এই বিপুল জাগরণের প্রথম কাতারে দাঁড়াইয়া লড়াই করিতেছেন গ্রামের সর্বহারা ক্ষেতমজুরের দল। সভায়, মিছিলে, বিক্ষোভে, ধান জমি দখলে, গুলির সামনে দৃঢ়তায় তাঁহারাই সকলের আগে।

শুধু তাই নয়। নূতনশ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই গ্রাম্য মজুরশ্রেণী বাঁচিবার মত মজুরির দাবি নিয়া ধনীকৃষকদের শোষণের বিরুদ্ধে চালাইয়াছেন সংঘবদ্ধ ধর্মঘট সংগ্রাম। বাংলার গ্রামের আন্দোলনে ইহা অভূতপূর্ব।

চট্টগ্রামে মজুরি বৃদ্ধি

গত জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় ক্ষেতমজুরগণ মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে লড়াই সুরু করেন।

কুতুবদিয়া অঞ্চলের প্রায় শতকরা

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

জোতদার-জমিদার-ধনিক শোষক-শাসকগোষ্ঠীর নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া অগ্রগতি

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

৭৫ জনই ক্ষেতমজুর। ইহাদের গ্রামেই মুষ্টিমেয় বড় বড় জোতদারদের গোলায় হাজার হাজার মণ ধান জমা হয়।

লালঝাণ্ডা এই ক্ষেতমজুরদের ভিতর প্রচার করিতে থাকে বাঁচার মত মজুরির জন্য লড়াই চালাও। সেই প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া জানুয়ারী মাসে আলী আকবর ভেইলের চার হাজার ক্ষেতমজুর দৈনিক এক আড়ি ধান এই মজুরির দাবীতে ধর্ম্মঘট করেন। সেই ধর্ম্মঘট মুরালিয়া গ্রামেও ছড়াইয়া পড়ে। সেখানেও ১০০০ ক্ষেতমজুর ঐ দাবীতে ধর্ম্মঘট করেন।

যুগ যুগের অত্যাচারিত ক্ষেতমজুরদের এই জাগরণে ভীত হইয়া ধনী কৃষকগণ ভয়ে কাঁপিতে থাকে। লীগ সরকার ধনীদের সাহায্যে সশস্ত্র ফৌজ পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু ৫০০০ ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘটে অটল থাকেন। তখন ধনী-কৃষকের দল বাধ্য হইয়া তাঁহাদের দাবী মানিয়া নেয়।

রংপুরে মেয়ে-মরদের ধর্ম্মঘট

মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি রংপুরে বদরগঞ্জ থানার মধুপুর এলাকার আশেপাশের গ্রামের ক্ষেতমজুরগণ দৈনিক ১।০ স্থলে আড়াই টাকা মজুরি দাবীতে লালঝণ্ডার নেতৃত্বে ধর্ম্মঘট করেন। ২ দিনের ধর্ম্মঘটের পর ধনীরা বন্দর হইতে হিন্দুস্থানী মজুর আনিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। তৃতীয় দিন কিছু হিন্দুস্থানী মজুর কাজ করেন। কিন্তু পরের দিন হিন্দুস্থানী মজুরদের আসার পথে ধর্ম্মঘটী মজুরগণ তাহাদিগকে এই লড়াইএর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। ইহার পর হিন্দুস্থানী মজুরগণ চলিয়া যান। তখন ধনীর দল বাধ্য হইয়াই ক্ষেতমজুরদের দৈনিক আড়াই টাকা মজুরির দাবি মানিয়া নেয়।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে রাজেন্দ্রপুর অঞ্চলের দাওয়াদানারপার, জগদীশপুর প্রভৃতি গ্রামের মজুরগণ ধর্ম্মঘট করিয়া ১।০ হইতে ২॥০ আনা মজুরি আদায় করেন। কয়েকটি গ্রামে এই ধর্ম্মঘটের ফলে সমস্ত রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নের ক্ষেতমজুরদের মজুরি ১ টাকা হইতে ২ টাকা, আড়াই টাকায় বাড়িয়া গিয়াছে।

গ্রাম্য মেয়ে মজুররাও পুরুষ মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে লড়াই এ আগুয়ান হন। মধুপুর ইউনিয়নের মেয়েরা ধর্ম্মঘট করিয়া ধানভানার মজুরি মণ প্রতি আধসের চাল বেশি আদায় করিয়াছেন।

এই ধর্ম্মঘটে ঐ এলাকার সব মেয়ে মজুররা উদ্বুদ্ধ হইয়া দাবী তুলিয়াছেন, 'বাঁচার মত মজুরি চাই'।

বগুড়ায় মজুরি বৃদ্ধি

এপ্রিল মাসের শেষভাগে বগুড়া জেলার গাবতলী থানা, সদর থানা ও ফুলবাড়ী এলাকার ক্ষেতমজুরগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ৩ টাকা মজুরির দাবীতে আন্দোলন সুরু করেন। দুই শতাধিক মজুর মিছিল করিয়া দাবী তোলেন, "দৈনিক ৩ টাকা মজুরি চাই।"

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফুলবাড়ী-হাটে মজুরগণ স্কোয়াড করিয়া মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে চারিদিকে সারা পড়িয়া যায়।

গ্রামের সর্ব্বহারাদের এই নূতন জাগরণে ভীত হইয়া ধনী কৃষক ও জোতদাররা মজুরির হার দৈনিক ১।০ হইতে ২ টাকা করিয়া দেয়।

কিন্তু ইহার পর ধনীর দল মজুরদের উপর আবার আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। পরের হাটের দিন জোতদারদের দল একজন মজুরকর্ম্মীকে মারিতে চেষ্টা করে। তখনি ৩।৪ শত ক্ষেতমজুর জোতদারকে তাড়া করে। সেই জোতদার নদী সাতরাইয়া প্রাণ বাঁচায়। ইহার পর গ্রাম্য ধনীর দল মজুরির হার ২॥০ করিয়া মজুরদের সঙ্গে আপোষ করে।

উন্নততর জীবনের সংগ্রামে মোহমুক্ত নেতৃত্বের জন্ম

ফুলবাড়ী এলাকায় মজুরদের এই জয়ের খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার পর ধুপচাচিয়া থানার চামরুল ইউনিয়ন ও আদমদীঘি থানার বিভিন্ন স্থানে ক্ষেতমজুরগণ নিজেরাই সংঘবদ্ধ হইয়া মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করিয়া দাবী আদায় করেন।

ক্ষেতমজুরদের এই লড়াই তখন বিভিন্ন আকারে জেলার অন্যান্য স্থানেও ছড়াইয়া পড়ে। জুন মাসের শেষের দিকে পশ্চিম বগুড়ার চাঁদপুর, সুন্দরপুর ও বানাই গ্রামের ক্ষেতমজুরগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইয়া আয়েতুল্লা, কাজী ও বন্ধু মণ্ডল নামে তিনজন ধনীর বাড়ীর গোলা হইতে ১৭ মণ ধান দখল করেন।

দিনাজপুরে ধর্ম্মঘটের জয়

দিনাজপুর জেলার ক্ষেতমজুরগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ৯ই মার্চ্চ রেল ধর্ম্মঘটের সময়ে সভা মিছিল করিয়া বিপ্লবের নেতা শহরের মজুরশ্রেণীর সঙ্গে তাঁহাদের সহযোগিতা ঘোষণা করেন। তাঁহারা ৯ই মার্চ্চ গাড়ীও থামাইয়া দিয়াছিলেন। লালঝাণ্ডার ডাকেই দিনাজপুরের ক্ষেতমজুরগণ ১লা মেহইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত 'ক্ষেতমজুর সপ্তাহ' পালন করেন। জেলার গ্রামে গ্রামে শত শত কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে। "নগদ তিন টাকা মজুরি ও দেড়সের চাল খোরাকী চাই।" সভা, বৈঠক, ইস্তাহার মারফত ব্যাপক প্রচার চলে। সঙ্গে সঙ্গে ও দেড় সের চাল খোরাকীর দাবীতে ধর্ম্মঘট সুরু করেন।

ধনীকৃষক ও জোতদারগণ 'ইসলামের' দোহাই, 'পাকিস্তানের স্বার্থ' প্রভৃতি অনেক বুলি দিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে; কিন্তু ক্ষেত মজুরের শ্রেণীচেতনার নিকট ঐ সব পচা বুলি খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। শত শত ক্ষেতমজুর ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্ম্মঘটে অটল থাকেন।

তখন ক্ষেতমজুরদের ভয় দেখানোর জন্য ধনীর দল নিজেরা আত্মীয়-স্বজন নিয়া মাঠের কাজে নামিয়া যায়। কিন্তু পরের শ্রমের উপর ভোগবিলাস করাই যাহাদের পেষা তাহারা করিবে মাঠের কাজ? দু'দিনেই তাহাদের সে সখ শেষ হইয়া যায়। তখন রক্তশোষক ধনীরদল ক্ষেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর নিকট মাথা নত করে। তাহারা ক্ষেতমজুরদের দাবী দৈনিক ৩ টাকা মজুরি ও দেড় সের চাল খোরাকী মানিয়া নেয়।

ঢাকার গ্রামে ক্ষেতমজুরদের লড়াই

ঢাকা জেলার গ্রামে এতদিন বিশেষ কোন কৃষক আন্দোলন হয় নাই। আজ সেখানেও ক্ষেতমজুরদের ধর্ম্মঘটের জোয়ার আসিয়াছে।

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে জয়দেবপুর থানার অন্তর্গত খাইলকুর গ্রামের ৮০ ঘর মুসলমান ক্ষেতমজুর প্রতিদিন ৬ সের ধান মজুরির দাবীতে একদিনের জন্য ধর্ম্মঘট করেন। ধর্ম্মঘটীরা লালঝাণ্ডা হাতে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান।

এই ধর্ম্মঘটের ঢেউ গিয়া লাগে পাচর গ্রামে। সেই গ্রামের সব ক্ষেতমজুরও দৈনিক ৬ সের ধান মজুরির দাবীতে ধর্ম্মঘট করেন। ইহার পর ধর্ম্মঘট মৈরান গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। সেখানকার ক্ষেতমজুরগণও দৈনিক ৬ সের ধান মজুরির দাবীতে ধর্ম্মঘট করেন। গ্রামে গ্রামে নূতন জীবনের সাড়া পড়িয়া যায়। গ্রামের সর্ব্বহারাগণ আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়া ধনীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটের হাতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে।

ধর্ম্মঘট ক্রমে ক্রমে ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া ধনীরদল আতঙ্কিত হইয়া দৈনিক মজুরির হার চার সের ধানে বাড়াইয়া দেয়।

যশোরে-মৈমনসিংহে ধর্ম্মঘট

যে যশোহর জেলায় গত এক বৎসর যাবৎ এক নিষ্ঠুর দমননীতি চলিতেছে, সেখানেও ক্ষেতমজুরগণ জুন মাসের প্রথম ভাগে নিজেদের মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট সংগ্রাম সুরু করেন। কেশবপুর ও মনিরামপুর থানার ডোঙ্গাঘাটা, গড়ভাঙ্গা, শ্যামনগর, হরিণা, মাগুরখালী, ঘাগা প্রভৃতি গ্রামের ক্ষেতমজুরগণ মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করিয়া দৈনিক মজুরি ১।০ হইতে ২৷৷০ টাকায় এবং কোন কোন স্থানে ৫ টাকা পর্য্যন্ত মজুরি বাড়াইয়া নেন। এই সময়েই ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার, সরমসিয়া ইউনিয়নের তিন চারিটি গ্রামে ক্ষেতমজুরগণ মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করেন। ধনী কৃষকগণ মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির নিকট পরাজয় মানিয়া দৈনিক মজুরির হার ১।০ হইতে ২৷৷০ আনায় বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হয়।

* * *

বাঁচার মত মজুরি, খাদ্য ও জমির একটানা রক্তাক্ত লড়াই-এর ভিতর দিয়া আজ পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে নূতন মানুষ। শত দমননীতিতে আজ আর তাঁহারা পিছু হটেন না—বরং প্রতিদিন তাঁহারা আরও প্রবলবেগে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আগাইয়া চলিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে আজ দুর্জ্জয় শক্তিতে গ্রামের মজুর। শহরের মজুরের নেতৃত্বে এই গ্রামের মজুরের পরিচালনায় গ্রামের মেহনতী কৃষক ভূমি বিপ্লব সমাধা করিবে।

পূর্ব্ববঙ্গের দিকে দিকে আজ তারই নিশানা।

মঞ্জিল

ক্ষেতমজুরদের ধর্ম্মঘটে মজুরি বৃদ্ধি আদায়

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

করে। কিন্তু মেয়েরা সেই অধিকার কায়েম রাখেন।

রামপুরহাট থানার কাঠগড়া ইউনিয়নের সোয়াসা এবং তেলডা গ্রামের মজুর, মাহিন্দার এবং কৃষকেরা ৯ই মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট করে। তাহাদের দাবী ছিল, দুই টাকা দিন মজুরি, খাওয়াপরা বাদে ৩০ টাকা মাস মাহিনা, এবং কৃসানদের জন্যে ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ [কৃসানদের জোতদার ও ধনী কৃষকরা জমি, হাল-বলদ, বীজধান সরবরাহ করে] ফয়েকদিন ধর্ম্মঘট চালাইবার পরই জোতদাররা দিনমজুরদের দাবী মানিয়া লয়।

২২শে জুন মামুদবাজার থানার গণপুর ইউনিয়নের ডামরা গ্রামে, রামপুর হাট থানার মশরা ও কাঠগড়া ইউনিয়নের, ভারকাটা ইউনিয়নের এবং ময়ূরেশ্বর থানার মল্লারপুর ইউনিয়নের প্রায় ৬০।৭০ খানা গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের এক জমায়েত হয়। এখান হইতে হাজার লোকের এক মিছিল বাহির হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করেঃ দুই টাকা মজুরি চাই, মাহিন্দারদের বেতন ৩০৲ চাই, ৮ ঘণ্টা খাটুনী ও সপ্তাহে একদিন ছুট চাই, কিসানদের আধাভাগ ও ভাগ-চাষীর তে-ভাগা চাই, খাদ্য ও ধানের সুদ নাই ইত্যাদি।

পরদিন হইতে ব্যাপক এলাকা জুড়িয়া ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। ক্ষেতমজুররা এমন কি জমিদারের ঝি-চাকর পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেয়। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্যে জোতদার-ধনীরা গ্রামে পুলিস ডাকিয়া আনে। পুলিস গুলি চালায়। চারজন ক্ষেতমজুর নিহত হন।

বীরভূমে ধানকলের হাজার হাজার শ্রমিকের মধ্যেও এখন মজুরি বৃদ্ধির দাবী ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেখানকার মেয়ে-মজুররা পুরুষের সমান মজুরি দাবী করিতেছে।

মালদহে

মালদহে ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম সুরু হয় জলায় মাছ ধরার অধিকার কায়েম করার মধ্য দিয়া। ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকরা কতকগুলি জলায় বহুদিন হইতে বিনা বাধায় মাছ ধরিয়া যাইত। এখন চাচোলারাজ উহা ধনীদের বন্দোবস্ত দিতে সুরু করিয়াছে। ২৯শে জানুয়ারী প্রথমে ৬০ জন দিনমজুর ও গরীব কৃষক একটি জলায় মাছ ধরার অধিকার কায়েম করে। পরে তাহাদের ২।৩ হাজার দিনমজুর ও গরীব কৃষকের এক একটি জমায়েত যাইয়া আরও ৮।৯টি বিল ও জলায় মাছ ধরে।

৪ঠা মার্চ্চ হইতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শারি থানার কাজী গ্রাম, অমৃতি ও মিল্কী ইউনিয়নের ক্ষেতমজুরেরা এক সপ্তাহের জন্যে ধর্ম্মঘট করেন। এই সময়ে চোরা-কারবারীদের জন্যে গ্রামের গরীবরা কাপড়-কেরোসিন কিছুই পাইত না। ধর্ম্মঘটী মজুরেরা স্থানীয় চোরাকারবারীর হাত হইতে প্রচুর কাপড়, কেরোসিন প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া গরীবদের মধ্যে বিলি করে।

বর্দ্ধমানে

বর্দ্ধমান জেলার রায়না ও হাটগোবিন্দপুরে ক্ষেতমজুর ও মাহিন্দারদের ছোট ও বড় অনেক ধর্ম্মঘট হয়। প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ম্মঘটে ধনীরা মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হয়। হাটগোবিন্দপুরে প্রথমে তাহারা মাঝারী কৃষকদের ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে; কংগ্রেস ও মহাসভার নেতারা পুলিস লইয়া কৃষকদের বাড়ী বাড়ী যায়। কিন্তু তাহাদের ভেদনীতি মজুররা ব্যর্থ করে। গরীব ও মাঝারী কৃষকদের অধিকাংশ ধর্ম্মঘটীদের সমর্থন জানায়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক গণ-চেতনা

এইভাবে গত ৬ মাসে বাঁচার মত মজুরির দাবীতে সারা বাংলায় লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘট করিয়াছে, : গ্রাম অঞ্চলে এক নূতন গণ-জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সকল সংগ্রামের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, ক্ষেতমজুরদের কত কম মজুরিতে খাটানো হয়। **যেখানেই এই কম মজুরির বিরুদ্ধে সামান্য আন্দোলন করা গিয়াছে ধনীরা মজুরি বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছে।** এই সকল সংগ্রামের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, একই জেলার মধ্যে ধনীরা এখনও কোথাও কম এবং কোথাও বেশী মজুরি দিতেছে, নাবালক ও মেয়ে মজুরদের পুরুষদের তুলনায় অনেক কম মজুরি দেওয়া হইতেছে। এ জন্যেই ক্ষেতমজুর নওজোয়ান ও মেয়েরা সকলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল সংগ্রামের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, যাহারা 'ক্ষেতমজুর নাই' বলিয়া ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করিতে চাহিতেছিল না, তাহারা কতখানি অন্ধ। যেখানেই ক্ষেতমজুরদের দাবী তোলা হইয়াছে, সেখানেই দলে দলে ক্ষেতমজুর আসিয়া সংগ্রামে যোগ দিয়াছে। ধনিকদের শোষণের ফলে প্রতিদিন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়াই আজ যাহারা গরীব কৃষক তাহারাও এই সকল সংগ্রামকে সমর্থন জানাইয়াছে। ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাদের মাসে ১০।১৫ দিন কাজ জুটিতেছে না—তাহার জন্যই তাহারা সংগঠিত হইবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি, যখনই ক্ষেতমজুরদের কোন স্থানীয় ধর্ম্মঘট হইয়াছে, তাহারা তাহাকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়াইবার জন্যে প্রচার স্কোয়াডে পাঠাইয়াছে। এক দিনের জেলা-ব্যাপী ধর্ম্মঘট হইতে তাহারা সাধারণ ধর্ম্মঘটের দিকে অগ্রসর হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, এই সকল ধর্ম্মঘট ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়া ক্ষেতমজুরদের মধ্যে এক নূতন সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছে।

এতদিন গ্রামে তাহারা ছিল, 'নীচজাত', তাহারা ছিল, ধনীদের ক্রীতদাস, এমন কি অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা [বিবাহ প্রভৃতির ব্যাপারে] হইতেও বঞ্চিত। তাহাদের উপর ধনীরা মারপিট পর্য্যন্ত করিত, কথায় কথায় জবাব দিত। এই সকল সংগ্রামের মধ্য দিয়া অনেক সামাজিক অত্যাচার বন্ধ হইয়াছে; মানুষের অধিকার পাইবার জন্যে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে সংগ্রামী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষেতমজুরেরা প্রতিটি সংগ্রামে অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, বর্ব্বর দমননীতি তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের সংগ্রামী চেতনাকে আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কংগ্রেসী সরকার সম্পর্কে তাহাদের মোহ দ্রুত কাটিতেছে। তাহারা দেখিতে পাইতেছে যে, কংগ্রেসী সরকার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধনীদের পক্ষ হইতেছে। তাহারা **গ্রাম-অঞ্চলে এখনও সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে** বাহির হইয়া আসিতেছে। ৯ই মার্চ্চের রেল ধর্ম্মঘটের সমর্থনে মেদিনীপুর কেশপুর প্রভৃতি এলাকায় ক্ষেতমজুররা ধর্ম্মঘট করে, হাওড়া ডোমজুর এলাকার তাহারা গ্রাম হইতে রেললাইনের উপরে আসিয়া দাঁড়ায়, কাকদ্বীপ, হুগলী প্রভৃতি এলাকায় তাহারা সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া সংগ্রামী ঐক্যের পরিচয় দেয়। রেলের সাধারণ ধর্ম্মঘটের জয়ে তাহাদের বাঁচার মত মজুরির সংগ্রাম শক্তিশালী হইবে ইহা তাহারা উপলব্ধি করে।

মেদিনীপুর, ২৪পরগনা প্রভৃতি এলাকার ক্ষেতমজুররা যে দিবসে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া শত্রুর প্রাণে আতংক সৃষ্টি করে; মাঝারী ও গরীব কৃষকদের জমির উপর দখল রাখার সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন জানায়। **অনশন বন্দীদের মুক্তির সংগ্রামে হাওড়া, মালদহ, ২৪পরগনা প্রভৃতি এলাকার ক্ষেতমজুররা গণ-বিক্ষোভ সংগঠিত, মেদিনীপুরের ক্ষেতমজুররা নানকিং বিজয় উৎসব পালন করে। 'এই স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতা' এই আওয়াজের উপর বাঁকুড়া ও অন্যান্য জেলার ক্ষেতমজুররা ধনিক কংগ্রেসী সরকারের প্রতি বিপ্লবী কায়দায় অনাস্থা প্রকাশ করে।** ৫ জন ক্ষেতমজুর পুলিসের গুলিতে নিহত হন। 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতা ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জী মালদহে গেলে সেখানকার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা তাহাকে বিরূপ সম্বর্দ্ধনা জানায়। বাঁকুড়ার ক্ষেতমজুররা জমিদার-জোতদারদের হিন্দু-মহাসভা সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। এইভাবে বাংলার ক্ষেতমজুর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সহিত আগাইয়া চলিয়াছে।

সংগঠন দুর্ব্বল কেন?

কিন্তু এত ধর্ম্মঘট, এত সংগ্রাম ও আন্দোলন পরিচালনা করা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষেতমজুরদের নিজস্ব স্বাধীন সংগঠন যতখানি গড়িয়া তোলা সম্ভব ছিল তাহা তোলা হয় নাই। অধিকাংশ জেলায় ক্ষেতমজুরদের আলাদা করিয়া ইউনিয়ন গঠন করার প্রয়োজন, তাহাদের ইউনিয়নের সভ্য করার প্রয়োজন শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় নাই। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি উপলক্ষেই প্রথম জেলায় জেলায় স্বতন্ত্র ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন তৈরী করার কাজ সুরু হইয়াছে, ইউনিয়নের সভ্য সংগ্রহের কাজ কিছু কিছু সুরু হইয়াছে।

এতদিন স্বতন্ত্র সংগঠন গড়িবার কাজকে অবহেলা করা হইয়াছে কেন? কারণ গ্রাম অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষককর্ম্মী ছিলেন মাঝারী কৃষক [এবং কিছু কিছু কর্ম্মী ছিলেন ধনী কৃষকেরও মুখাপেক্ষী] তাঁহারা বরাবরই এই কথা বলিতেন যে, এখন মজুরি বৃদ্ধির দাবী তুলিলে বা ক্ষেত মজুরদের স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিলে "কৃষক ঐক্যে" ভাঙ্গন ধরিবে, মাঝারী কৃষকরা বিরুদ্ধে চলিয়া যাইবে। তাহাদের আশংকা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। **জমিদার এবং জোতদারের মত ধনী কৃষকও কংগ্রেসী সরকারের অংশ, তাহারা কৃষকের সংগ্রামে ভেদ সৃষ্টি করে এবং দমননীতিকে সাহায্য করে সক্রিয়ভাবে। কাজেই তাহাদের লইয়া 'কৃষক ঐক্য' হয় না, গত ছয় মাসে তাহা একেবারেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।** ক্ষেতমজুররা সংগঠিত না থাকিলে মাঝারী কৃষকের ভয় ও দোমনাভাব কাটে না—তে-ভাগা প্রভৃতির সংগ্রামে তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। ক্ষেতমজুরদের স্বতন্ত্র সংগঠন তৈরী করায় এখনো যে কোন স্থানে যে কোন বাধাই আসুক না কেন তাহা দৃঢ়তার সহিত অতিক্রম করিতে হইবে। গরীব কৃষকদের সহিত ঐক্যকে দৃঢ় করিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই, সংগঠনের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠা যাইবে, গ্রাম অঞ্চলের সংগ্রামে ক্ষেতমজুরদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। ক্ষেত মজুরদের নেতৃত্বে গ্রামের নির্ব্বাচিত সংগ্রাম কমিটির মধ্যে কৃষক সমিতি এবং অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল নির্ব্বাচিত সংগ্রাম-কমিটিকে গ্রাম অঞ্চলে সংগ্রামী জনতার জনপ্রিয় নেতা করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার নেতৃত্বে সভা, শোভাযাত্রা, গণ-বিক্ষোভ সংগঠিত করিতে হইবে; ইহার নেতৃত্বে সংগ্রাম চালাইয়া বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে এবং জমিদার ও জোতদারদের জমি গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিলি করিতে হইবে। তাহাদের অগ্রণী হইতে হইবে প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে।

ধনিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর

ধনিক কংগ্রেসের শাসনে শুধু ক্ষেতমজুরই নয়, সমগ্র মজুরশ্রেণীর শোষণই দিন দিন বাড়িতেছে। খাদ্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর বাড়িতেছে। টাটা-বিড়লা ধনিকদের মুনাফা ঠিক রাখার জন্যে কারখানায় কারখানায় ব্যাপক মজুর ছাঁটাই চলিয়াছে, মজুরি কমানো হইতেছে, কাজ বাড়ানো হইতেছে, ধর্ম্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইতেছে, কালাকানুন ও ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইতেছে, মজুরদের নিজস্ব পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু এত বাধা, এত দমননীতি সত্ত্বেও কারখানা

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করা ও বন্দিমুক্তির দাবী তুলিয়া নেহরুর নির্ব্বাচনী চাল ব্যর্থ করিব

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট দিন দিনই বাড়িতেছে, ধনিকশ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা অতুলনীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতেছে।

টাটা-বিড়লার স্বার্থে নেহরু সরকার মার্কিন মূলধন আমদানী করিতেছেন। ঐ মূলধন রেল এবং কৃষিতে খাটানো হইবে। ক্ষেতমজুররা এতদিন শুধু ভারতীয় ধনীদের গোলাম ছিল, এখন শীঘ্রই মার্কিন ও ভারতীয় উভয় মনিবের গোলামে পরিণত হইবে। মার্কিন মনিবরা নীলকরদের মত তাহাদের উপর যাহাতে অবাধ শোষণ চালাইতে পারে নেহরু সরকার তাহারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

ভারতবর্ষ এখন মার্কিন উপনিবেশে পরিণত হইবে। এখানে দাঁড়াইয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এসিয়ার মুক্তি-সেনা বিপ্লবী চীন ও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে। তাহার জন্যেই কংগ্রেসী শাসকরা এখন মার্কিন প্রভুদের হুকুমে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করিতেছে।

বিধান মন্ত্রিসভার রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করিয়াই জনগণ কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও বর্ম্মা-চীনের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। আমরা এই ক্ষেতমজুর সম্মেলন হইতে সেই লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মঘটী শ্রমিক ও ছাত্রদের অভিনন্দন জানাইতেছি; তাহাদের প্রত্যেকটি সংগ্রামের সহিত ঐক্য প্রকাশ করিতেছি।

যুদ্ধ ধনীদের নিকট লাভজনক ব্যাপার। গত যুদ্ধে তাহারা আমাদের অনাহারে রাখিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। আবার এই দেশে আমরা সেই অবস্থা ঘটিতে দিব না—সম্মেলন হইতে সেই সিদ্ধান্তই জানাইয়া দিতেছি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্যে নেহরু সরকার বাজেটে সামরিক ব্যয় বাড়াইয়াছে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়-প্রার্থীদের বাসস্থান প্রভৃতির জন্যে অর্থ ব্যয় না করিয়া সৈন্যদের খরচ বাড়াইতেছে। এই সম্মেলন হইতে আমরা তাহার বিরোধিতা করি। আমরা বিনা পয়সায় শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দাবী করি, আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্বসতি দাবী করি।

বিড়লা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দসই বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা ধনী-জমিদারদের স্বার্থে বার বার মজুর-কৃষক-জনগণের উপর গুলি চালাইয়াছে। ক্ষেতমজুর বাঁচার মত দৈনিক মজুরি দাবি করিলে যাহারা গ্রামে পুলিস পাঠাইতেছে তাহারা নিজেরা গরীবের পকেট হইতে দৈনিক হাজার হাজার টাকা লুট করিতেছে। এই লুটের বখরা লইয়া কংগ্রেসীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগায় এখন মন্ত্রীদের অনেক কথাই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় দুর্নীতির অভিযোগ আসিয়াছে : তাহারা কাপড়ের ব্যাপারে, পারমিট ও রেশনশপের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে, আত্মীয়-স্বজনকে চাকুরী ও ঠিকাদারী দেওয়ার ব্যাপারে, সরকারী টাকায় নিজেদের ব্যবসায় জমাইবার ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করিতেছে। আশ্রয়প্রার্থী শিশু যখন রাস্তার জলে ভিজিতেছে, মন্ত্রীরা তখন নিজামপ্রাসাদ দখল করিয়া তাহা ভোগ করিতেছেন।

এই সকল দুর্নীতি, দমননীতির বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ বারবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিনা বিচারে আটক শ্রমিক-কৃষক বন্দীদের যাহারা গুলি করিয়া খুন করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থীর পরাজয়ে। এই পরাজয় প্রমাণ করিয়াছে যে, বাঙ্গলার গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকরা ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের মা-বোন ও নওজোয়ান ছেলেদের উপর গুলিচালনা সমর্থন করে না। এই পরাজয় প্রমাণ করিয়া দিল যে, মন্ত্রিসভার পিছনে জনগণের সমর্থন নাই, জনগণের সমর্থন আছে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাঁচার মত মজুরির দাবীর পিছনে!

কংগ্রেস নেতারা জনগণের ঐ রায় মানেন নাই। বরং ঐ রায় মন্ত্রিসভার পক্ষে জনমত গঠনের আশায় তাহারা বৃটিশ আমলের ভারত শাসন আইন অনুসারে জনগণের শতকরা মাত্র ১৩ জনের ভোটে [যাহাদের মধ্যে ক্ষেতমজুর একজনও থাকিবে না] সাধারণ নির্ব্বাচন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ঐ ভাবে বাংলায় রায় মন্ত্রিসভাকে স্থায়ী করার কৌশল বাহির করিয়াছেন।

এই সম্মেলন হইতে আমরা জানাইয়া দিতেছি, পণ্ডিত নেহরুর ঐ চাল আমরা ব্যর্থ করিব। নির্ব্বাচনকে আমরা রায় মন্ত্রিসভাকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করিব। কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবী, সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী, বিনা-বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির উপর দাবিকে ভিত্তি করিয়া আন্দোলন সুরু করিলেই কংগ্রেসীদের "স্বাধীন নির্ব্বাচনের" ধাপ্পাবাজি সকলের নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

সমগ্র প্রদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর আজ আমাদের এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের দিকে তাকাইয়া আছে। এই সম্মেলন হইতে তাহাদের আমরা আহ্বান জানাইতেছি : আসুন আমরা ধনী জমিদার-জোতদারদের প্রত্যেকটি আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করি। বাঁচার মত মজুরির দাবীতে, ৭ ঘণ্টা কাজের দাবীতে, কাজ অথবা বেকার ভাতার দাবীতে, বিনা খেসারতে জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ, জমি জাতীয়করণ এবং জমি দখলের দাবীতে, তে-ভাগা এবং সাজা-কুদ বন্ধের দাবীতে গ্রাম-অঞ্চলে এক ব্যাপক সাধারণ ধর্ম্মঘটের পথে অগ্রসর হই। আসুন, কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করি, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর আক্রমণকে ব্যর্থ করি, ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করিয়া সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হই। আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ইতালী ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘটের বিপুল জয়

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ভিতর দিয়া শ্রমিকরা ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টির একচেটিয়া ক্ষমতাকে ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, দেশের গণতন্ত্রী করণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে।

শ্রেণী-সংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রকৃতি

ইহা খুবই স্পষ্ট যে, মালিকশ্রেণী ও পুলিসের এইসব কাজের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের হিংসায় প্ররোচিত করা, পরে যাহাতে তাহারা আরও বর্ব্বর দমননীতি চালাইবার একটি অজুহাত পায়। কিন্তু তাহাদের আশার মুখে ছাই পড়ে। মেহনতী জনগণ অতি উচ্চস্তরের শৃঙ্খলা ও গভীর দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন।

এই ধর্ম্মঘট সংখ্যায় বিপুল এক বিশেষ শ্রেণীর **শ্রমজীবী মানুষের** মামুলী আন্দোলন মাত্র নয়, ইহার তাৎপর্য্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

এই ধর্ম্মঘট একটি বড় রকমের শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নিয়াছিল। আইনসঙ্গত এবং ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াই অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব বেশী। ইহা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করার লড়াই সংগঠনের স্বাধীনতা সভাসমিতি ও ধর্ম্মঘটের স্বাধীনতা এবং অনুরূপ অন্যান্য স্বাধীনতা গবর্নমেণ্ট বার বার লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহাদের দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে মালিকশ্রেণীর সেবায় ছাড়িয়া দিয়া সরকার রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করিয়াছে।

সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও শহরের সমগ্র মেহনতী জনগণ ইহা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়াছেন এবং ফার্ম শ্রমিকদের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সক্রিয় ভ্রাতৃত্ববোধ দেখাইয়াছেন। বোলোগনা, মোডেনা, ফেরারা, ফরলি, মিলান এবং অন্যান্য বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে ফার্মশ্রমিকদের সমর্থনে ধর্ম্মঘট হয়। প্রত্যেক জায়গায় সহানুভূতিসূচক ও প্রতিবাদমূলক সভা ও মিছিল হয়। মালিক ও পুলিসের গুলিতে নিহত শহীদের শব যাত্রায় অসংখ্য মানুষ পতাকা ও ফুল হাতে যোগ দেন। যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারের প্রতি গভীরতর আত্মীয়তা দেখানো হয়।

সংগ্রামী ঐক্যশক্তির জোয়ার

শেষের দিকে ধর্ম্মঘটীদের ঘরে ঘরে অনাহারের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসে। কিন্তু তখনই ইহাদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিযান সুরু হইয়া যায় শহরের সমগ্র সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে। যে সমস্ত জায়গায় আন্দোলন বিশেষ রকমের জোরালো ভাবে চলিতেছিল, জেনোয়ার শ্রমিকরা সে সমস্ত অঞ্চলে ট্রাক ভরিয়া ভরিয়া খাদ্য পাঠান। কো-অপারেটিভ দোকানগুলি ধর্ম্মঘটীদের পরিবারগুলিকে ধারে জিনিসপত্র দেয়।

ধর্ম্মঘটীদিগকে খাওয়াইবার জন্য সর্ব্বত্র ক্যান্টিন খোলা হয়। ঐক্যের আহ্বানে এবং ধর্ম্মঘটীদের শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য ইতালীয় মহিলা লীগ আশ্চর্য্য-রকমের উদ্যোগের পরিচয় দেন। ধনতান্ত্রিক বৈরাচারের হাতে নিগৃহীত হাজার হাজার মানুষ পরিচর্য্যা লাভ করেন শহরের শ্রমিক ও গরীব কৃষকদের ঘরে।

ফার্ম-শ্রমিকরা সংগ্রামে জয়ী হইয়াছেন। এই জয় শুধু মাত্র অর্থনৈতিক জয় নয়, ইহার বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্য্য আছে। ধর্ম্মঘটীদের জয়ী না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য ধর্ম্মঘটীদের দৃঢ়তার সামনে মালিক ও সরকারের জুলুম ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই দৃঢ়তার মুখোমুখী হইয়া জনমতের কাছে এক বাক্যে ঘৃণিত হইয়া ও জনতার দ্বারা কোনঠাসা হইয়া জমিদারদের শ্রেণী ও গবর্নমেণ্ট পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। বলিতে গেলে, ধর্ম্মঘটীদের সমস্ত দাবীই স্বীকৃত হইয়াছে কিভাবে সেগুলি কার্য্যকরী করা হইবে তাহা প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনা ও আইন পরিষদের বিধান মারফৎ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাখ্যা করা হইবে। মেহনতী জনগণ জানে যে, স্বীকৃত দাবীগুলি যাহাতে সমস্ত প্রদেশে এবং সারা দেশব্যাপী ভিত্তিতে প্রযুক্ত হয় তাহার জন্য তাহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃষি মালিকদের ফেডারেশন কো ফেডারেশন-অব র‍্যাগ্রারিয়ান্স-এর উপর খুব আস্থা স্থাপন করার কোনও কারণ নাই, গবর্নমেণ্টের উপর তো নয়ই। কারণ ইহারা কেবল বল প্রয়োগের ভাষাটিই বুঝিতে পারে।

সংগ্রামের তীব্রতা মেহনতী জনগণের এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীদের ও পার্টি কর্ম্মীদের দৃঢ়তাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছে; তাঁহাদিগকে নূতন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা বিফলে যাইবার নয়। আগামী দিনের নূতন নূতন সংগ্রামে ইহার প্রয়োগ হইবে।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৬-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধীনে নবজাগ্রত ক্ষেতমজুর সমিতি গঠন

পশ্চিম বাংলায় ক্ষেতমজুরদের প্রথম ঐতিহাসিক সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

বাঁচার মত মজুরি ও জমির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ ক্ষেতমজুর আছেন। নানা জেলা হইতে তাঁহাদের প্রায় আড়াই শত প্রতিনিধি কলিকাতায় নিজেদের এক সম্মেলন করিলেন। এমন সম্মেলন আর হয় নাই। সারা ভারতবর্ষে ইহাই ক্ষেতমজুরদের প্রথম সম্মেলন।

কলিকাতার কল-কারখানার শ্রমিকেরা ভীষণ লড়াই করিতেছেন। তাঁহাদের লালঝাণ্ডা সংগঠনের নাম 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। কলিকাতার কল-কারখানার শ্রমিকেরা নানা দাবি তুলিয়াছেন। তাঁহাদের একটি প্রধান দাবি হইতেছে, "বাঁচিবার মত মজুরি চাই"। তাঁহারা বলিয়াছেন, মাসে কমসে কম ৮০ টাকা মজুরি চাই। জিনিসপত্রের দর যত বাড়িয়াছে তাহা পূরণ করার মত মাগ্‌গীভাতা চাই। ঘর ভাড়ার দরুণ আরো ২০ টাকা চাই। ইহা না হইলে আজিকার বাজারে কোন মজুরই বাঁচিতে পারে না।

ইহা আদায় করার জন্য কল-কারখানার লাখ লাখ মজুর এখনই ভীষণ লড়াই করিতেছেন। ইহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর লড়াই করিবার জন্য সারা ভারতবর্ষে সাধারণ ধর্ম্মঘট করার জন্য তাঁহারা তৈরী হইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, দাবি পূরণ করিতে না পারিলে ধনীদের হাত হইতে তাঁহারা কল-কারখানা কাড়িয়া লইবেন। তাই কলিকাতায় নানা কারখানায় যেমনি ধর্ম্মঘট হইতেছে অমনি সরকার গুলি চালাইতেছেন। দলে দলে কারখানার মজুরকে জেলে পুরিতেছেন, কিন্তু কারখানার মজুর আর তাঁহাদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখার শক্তি কাহারো নাই। কংগ্রেসী সরকার তাঁহাদের শক্তিতে কাঁপিয়া উঠিতেছেন।

কারখানার মজুরদের প্রচণ্ড শক্তির সহিত এবার হাত মিলাইলেন গাঁয়ের ক্ষেত-মজুরেরা। সম্মেলনে তাঁহারা প্রস্তাব লইলেন—কারখানা মজুরদের মতই তাঁহারা বাঁচিবার মত মজুরি চান। দৈনিক হিসাবেই হউক আর বৎসরের হিসাবেই হউক, এমন মজুরি তাহা-দের দিতে হইবে; যাহাতে মাসে ৮০ টাকার কম উপার্জ্জন না হয়। ইহা ছাড়াও মাগ্‌গীভাতা দিতে হইবে। ঘর তুলিয়া দিতে হইবে। সমস্ত জুলুম, বেগারে খাটান বন্ধ করিতে হইবে।

সারা বছর কাজ, বেকার ভাতা, ছুটি প্রভৃতি প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দাবী দিতে হইবে। গরু চরাইবার মাঠ

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

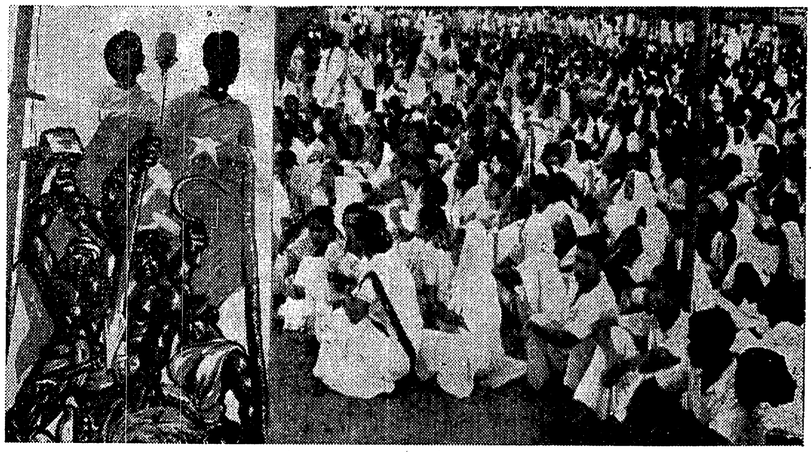

ছবির পরিচয়

উপরে—ক্ষেতমজুর প্রতিনিধি সম্মেলনের সময় তাঁহাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাইবার জন্য ছাত্রদের মিছিল। সম্মেলনের সভাপতি ছাত্রদের রক্তপতাকা উপহার দিতেছেন।

নীচে—মনুমেণ্টের নীচে ক্ষেতমজুর সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের ২০ হাজার মানুষের জমায়েত। হাওড়া হইতে ক্ষেতমজুরদের মিছিল আসার সময় পুলিস বাধা দিয়া লাঠি চালায়। হাওড়ার 'মা' এই ঘটনার বর্ণনা করিতেছেন।

এই মুহূর্ত্তে কিনুন এবং পড়ুন

বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ—দাম আট আনা।

বাংলার গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার বিবর্ত্তন এবং তারই পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করছে, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর, কে কোন শিবিরে যোগ দেবে তার আলোচনা আছে।

নিউ পাবলিশার্স—৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মাঙ্গল

প্রথম বর্ষ ঃ ১১ সংখ্যা] ২৮শে আগস্ট '৪৯ : ১১ই ভাদ্র '৫৬ [তিন আনা

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, করাচী চুক্তিতে কাশ্মীরের যে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা টানা হইয়াছে তাহার ফলেও কার্য্যতঃ কাশ্মীরকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, কাশ্মীরবাসীদের মধ্যে বিভেদকে স্থায়ী করিয়া কাশ্মীরকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-ঘাঁটিতে পরিণত করা হইল।

আমাদের সেই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার এতদিন প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন যে, কাশ্মীর যুদ্ধে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই। এখন তাঁহারা আজাদ কাশ্মীর ফৌজ ভাঙ্গিয়া দিতে অস্বীকার করিতেছে। ভারত সরকার এতদিন বলিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা যতশীঘ্র সম্ভব গণভোট চান্। এখন সেই গণভোট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রহিল।

গত দুইবছর ধরিয়া ভারত ও পাকিস্তানের জনগণ যখনই কোন কিছু সুখ-সুবিধা দাবী করিয়াছে নেহরু ও লিয়াকত আলি সরকার বলিয়াছেন: কাশ্মীর যুদ্ধের জন্যে সব টাকা খরচ হইয়া যাইতেছে, কাজেই এখন জনগণকে কাশ্মীরের আজাদীর জন্যেই সব স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। জনসাধারণ এখন নিজ নিজ শাসকশ্রেণীর নিকট ইহার কৈফিয়ৎ তলব করুন। জনসাধারণের এত অর্থ খরচ করিয়া যাহারা কাশ্মীর জাতিকে এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করিলেন, সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধের জন্যে যাহারা ভূস্বর্গ কাশ্মীরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক পর্য্যবেক্ষক ডাকিয়া আনিলেন, এখন যাহারা সালিশী করিবার জন্যে মার্কিন সমরনায়ক এডমিরাল নিমিৎসকে ডাকিতেছে, সেই বিশ্বাসঘাতকদের সহিত একমাত্র উমিচাঁদদেরই তুলনা চলে।

* * *

এতদিনে নেহরুজীর মার্কিন মুরুব্বিরা সু-প্রসন্ন হইয়াছেন। ভারত সরকার মার্কিন পরিচালিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট ৪ কোটি ডলার ঋণের দরখাস্ত করিয়াছিলেন; প্রভুরা কিঞ্চিদধিক এক কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

কিন্তু এই সকল অর্থ বিনা শর্ত্তে ঋণ দেওয়া হয় নাই। শর্ত্ত করা হইয়াছে যে, উহা রেল এবং কৃষির কাজে ছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করা যাইবে না।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এ দেশে যখন প্রথম মূলধন খাটায় তখনও তাহারা রেলকেই বাছিয়া লইয়াছিল। কারণ ভারতকে কৃষি প্রধান উপনিবেশ হিসাবে রাখিয়া এখান হইতে সস্তায় কাঁচা মাল পাইতে হইলে রেলের প্রয়োজন। মার্কিন প্রভুরা নূতন হইলেও বৃটিশের নিকট হইতে এই জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া, মুক্ত চীন ও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে যুদ্ধ-ঘাঁটি হিসাবে তৈরী করিতে হইলেও এখানে রেলের উন্নতি করা প্রয়োজন মার্কিন প্রভুদের এই অভিজ্ঞতাও আছে। চীনে রেলের ব্যবস্থা ভাল না থাকায় তাহাদের অনেক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

মার্কিন প্রভুরা যেটুকু ডলার মঞ্জুর করিলেন তাহা খরচ করিয়া মার্কিন শিল্পপতিদের নিকট হইতেই ইঞ্জিন ও কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইবে। কাজেই সেখানেও মুনাফার বেশ একটা মোটা ব্যবস্থা থাকিবে। এইভাবে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রেল এবং কৃষির উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করা এবং উপনিবেশ শোষণের সাধু উদ্দেশ্য লইয়া মার্কিন প্রভুরা যে বদান্যতা দেখাইলেন তাহাতে কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতক মহলে ধন্য ধন্য রব পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দুই বছর আগে ইকাভে সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি নভিকভ মার্কিন-ঋণের এই চেহারাই ভারতবাসীর নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলন, মার্কিন প্রভুরা যে ভারতে কোন মূল শিল্পের উন্নতি চাহে না ইহাই তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। নেহরু সরকার মার্কিন ডলারকে অবাধ শোষণের সুযোগ দিয়াছেন, শ্রমিক আন্দোলন দমন

মতামত

* মার্কিন যুদ্ধ-দানবদের হাতে কাশ্মীর অর্পণ
* ভাষা ও সংস্কৃতির উপরেও বিড়লা-ওয়াকারের কর্তৃত্ব
* কংগ্রেসম্যানদের কেলেঙ্কারীর আত্মকথা
* 'সমাজতন্ত্রী' জয়প্রকাশকে লক্ষপতিদের টাকার তোড়া

করিয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তবু মার্কিন প্রভুরা রেল বা কৃষি ছাড়া অন্য কোন শিল্পের জন্যে ডলার মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত নন। বৃটিশের উপনিবেশ হইতে ভারত এখন মার্কিনের উপনিবেশে পরিণত হইবে এবং সেই জন্যেই নেহরুজী ওয়াশিংটন যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন।

* * *

ভারতের পুলিসমন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত সাক্ষাত করিবার পর আর-এস-এস নেতা গোলওয়ালকার দিল্লীতে আসিয়াছেন। দিল্লীতে ১৪৪ ধারার শাসন এতই করা যে শ্রমিকরা আইনসঙ্গত ধর্ম্মঘট করিলেও তাহাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের আইনে গ্রেপ্তার করা হয়; আশ্রয়প্রার্থীরা বৃষ্টির সময়ে শিশু-সন্তানদের জন্য মাথা গুঁজিবার ঠাঁই চাহিলে ১৪৪ ধারা অমান্যের অজুহাতে তাহাদের উপর লাঠি চালানো হয়। কিন্তু সর্দ্দারজীর নূতন বন্ধু গোলেল কারের জন্য ১৪৪ ধারা নাই। স্টেশনে আর-এম-এস দল জমায়েত হইল, শোভাযাত্রা বাহির করিল, ময়দানে সভা করিল—কোথাও কোন বাধা নাই। এমনকি সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত সরকারী পোষাক পরিয়া আর-এস-এস র‍্যালীতে যোগদান করিলেন। বাংলায় যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী আইনসঙ্গত ইউনিয়ন গঠন করিবার সময় "রাজনৈতিক কার্য্য কলাপের" অভিযোগে বরখাস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দিল্লীর সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীদের দিকে তাকাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিবেন।

কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের কোন কারণ নাই। কংগ্রেসী রাজনীতি ছাড়া আর কোন কিছুই সরকারী অভিধানে 'রাজনীতি' নয়। তাই আর-এস-এস নেতার র‍্যালীতে অথবা পণ্ডিত নেহরুর সভায় যাইতে তাহাদের কোন বাধা নাই।

'অরাজনৈতিক' সংগ্রাম আর-এস-এস নেতা তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিলেন তাহা কি? হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে সারা দেশের উপর চাপাইতে হইবে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করা চলিবে না ইত্যাদি। বিড়লা-প্যাটেলের ট্রেনিংএ আর-এস-এস নেতা কি রকম "অরাজনৈতিক" ভূমিকা গ্রহণ করিতে যাইতেছেন দিল্লীর বক্তৃতায় তাহার সামান্য আভাষ পাওয়া গিয়াছে।

* * *

বিড়লা-ওয়াকার 'স্বাধীন' ভারতে শুধু সমস্ত কল-কারখানার উপরেই নিজেদের মিলিত কর্তৃত্ব কায়েম করে নাই, এখন সংস্কৃতির উপরেও উহা পাকা করিয়া ফেলিতেছে। কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বিড়লাজীর দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হিন্দী ভাষা এবং ওয়াকার সাহেবদের ইংরাজী ভাষাই ভারতের সর্ব্বত্র নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিবে, রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গণ্য হইবে। ১৫ বছর পরে হিন্দী ভাষা যাহাতে ইংরাজী ভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য হিন্দী ভাষাকে লালন পালন করা হইবে।

একথা সকলেই জানেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু টাকার সাহায্যে ভারতকে শোষণ করে নাই। তাহারা ভাষার সাহায্যেও ভারতকে শোষণ করিয়াছে, ভারতের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিয়াছে। এখন ভারতের প্রধান ধনিক-গোষ্ঠী বিড়লা-ডালমিয়ার দলও বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের উপর নিজেদের অর্থনৈতিক আধিপত্যকে স্থায়ী করার জন্য ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উপর এই আক্রমণ সুরু করিয়াছে। নেহরু সরকার এবং কংগ্রেসী শাসকরা সারা ভারতে এই ধনিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার জন্যেই হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

* * *

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতারা সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হইবার পথ খুঁজিতেছেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি যাহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দখল করিয়াছেন তাহারা বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অসংখ্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা এমন সব তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন যাহা সরকারী দপ্তর হইতে ছাড়া সংগ্রহ করা অসম্ভব।

এদিকে বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার সমর্থকরা হাওড়া টাউনে সভা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন যে, 'যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মী ১৯৪২ সাল হইতে (?) এ পর্য্যন্ত যুদ্ধের কনট্রাক্ট, কাল বাজারী, ব্যবসায় ও অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কার্য্যের সহিত লিপ্ত ছিল বা আছে তাহাদের সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উহাদের সকল নির্ব্বাচিত পথ হইতে অপসারিত করা হইবে।'

কিন্তু অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নলিনী সরকার যে কথা বলিয়াছেন, তাহার পর আর কোন 'তদন্তের' প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিয়াছেন, অন্য কোন প্রদেশের কংগ্রেসী শাসন অপেক্ষা পশ্চিম বাংলায় বেশী কু-শাসন চলিয়াছে একথা কেহ বলিতে পারিবে না।

নলিনীবাবুর এই যুক্তির সমর্থনে তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন আনন্দ বাজার পত্রিকা। তাঁহারা ২৪শে আগস্টের পত্রিকায় বিহারের কংগ্রেসী শাসনের দুর্নীতির এক চমৎকার চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন। বিহার মন্ত্রিসভার রাজস্ব সচিব শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় তাঁহার গুরুদেব সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট এক গোপন লিপিতে জানাইয়াছেন যে, বিহারের যে সকল কংগ্রেস নেতা তাঁহাদের 'ঝোলাগুড়ের কেলেঙ্কারী' লইয়া এত হৈ-চৈ করিতেছেন তাঁহারা নিজেরা কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া নিজেদের জন্যে জমি সংগ্রহ করিতেছেন। দ্বারভাঙ্গা রাজ; রামনগর রাজ; রায়গড় রাজ; বোরিয়া রাজ; এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে জন সেবার নাম করিয়া কংগ্রেসী নেতারা প্রচুর জমি হাত করিতেছেন।

এই ধরনের জনসেবায় পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতারা বিহার কংগ্রেসের সমকক্ষ, কি এখনো পেছনে পড়িয়া আছেন সেই বিচার কে করিবে?

* * *

কলিকাতার প্রায় সমস্ত সভা-সমিতিতে সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ জনসাধারণকে এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কমিউনিস্টরা "গঠনমূলক" পথ পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা 'কমিউনিস্ট নিধন' কার্য্যে কংগ্রেসী পুলিসকে সাহায্য করিতেছেন, কংগ্রেসী পুলিস মালাবারে ও কলিকাতায় যখন নিরস্ত্র মেয়েদের উপর গুলি চালায় তখন তাহাকে পর্য্যন্ত তাঁহারা সমর্থন জানাইয়াছেন।

এই "গঠনমূলক" পথটা কি তাহা দেখা গিয়াছিল ৯ই মার্চ্চের রেল ধর্ম্মঘটে আরও স্পষ্টভাবে তাহা দেখা গেল, পর্দ্দার আড়ালে সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ যে সকল বৈঠক করিয়াছেন সেখানে ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে চটকল ও কয়লার খনিতে অসন্তোষ ফাটিয়া পড়িতেছে। তাহাকে "গঠনমূলক" পথে পরিচালিত করার জন্যে চটকল সমিতি, খনি মালিক সমিতি এবং শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের মালিকরা জয়প্রকাশের সহিত শলা-পরামর্শ করিয়াছেন। এ-কে-বসুর বাড়ীতে এই গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোয়েম্বাটুরে ৩০ হাজার সুতাকল শ্রমিক যখন ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করেন, সেই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ সেই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার কাজে মালিকদের সাহায্য করার জন্যে পুরস্কৃত হন। এবার

(১১পৃষ্ঠায় দেখুন)

মল্লিল

কংগ্রেসী ফ্যাসিস্ট শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে

২৫শে আগষ্ট পশ্চিম বাংলার স্কুল-কলেজে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ধর্ম্মঘট

২৫শে আগস্ট নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ধনিক কংগ্রেসী সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী স্কুল-কলেজে একদিনের সাধারণ ধর্ম্মঘটের যে আহ্বান দেন তাহাতে সাড়া দিয়া কলিকাতার ৪০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ধর্ম্মঘট করেন; ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সারাদিন ব্যাপী ছোট বড় মিছিল ও জমায়েতের ভিতর দিয়া প্রায় ১০,০০০ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার উপর ধনিক সরকারের আক্রমণ ও শিক্ষাকেন্দ্রে পুলিসী জুলুমের বিরুদ্ধে 'আওয়াজ' তোলেন।

হাওড়া, হুগলী, ২৪পরগনা পশ্চিম বাংলার সর্ব্বত্র ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে এই 'আওয়াজে'র পিছনে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর বিরাট জমায়েতের সৃষ্টি হয়।

এক আওয়াজ

২৫শে আগস্ট ভারতের সর্ব্বত্র শহর ও গ্রামে স্কুলে, কলেজে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ধর্ম্মঘট ও মিছিলে একসাথে আওয়াজ তুলিয়াছেন, "মালাবার অথবা বোম্বাই 'আসাম অথবা কর্ণাটক' পশ্চিম বাংলার অখ্যাত পল্লী অথবা রাজধানী নগরী—গরীব ছাত্রদের উপর এই ধনিক সরকারের আক্রমণ যেখানেই যে ভাবে আসুক না কেন তাহারই বিরুদ্ধে সারা ভারতের সংগ্রামী ছাত্র এক হইয়া সে আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবে।"

তাই সুদূর ঝাঁসী শহরের যে ছেলে পরীক্ষার বেতন দিতে না পারায় আত্মহত্যা করিয়াছে, ২৫শে আগস্ট তাহার নামে শপথ নিয়াছে কলকাতার স্কুল-কলেজের ছাত্র; শপথ নিয়া ময়দানে সামিল হইয়াছে—হাওড়ার আন্দুল, ২৪পরগনার অখ্যাত কালিকাপুরের গ্রামের গরীব স্কুল ছাত্র। মিছিলে আওয়াজ তুলিয়াছে—"ঝাঁসীর ছাত্রর আত্মহত্যার জন্য দায়ী ধনিক সরকার ধ্বংস হোক"; "স্কুল-কলেজের বেতন কমাতে হবে।"

ফ্যাসিষ্ট শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে

নৈহাটিতে বর্দ্ধিত হারে বেতন দিতে না পারিয়া ১৫০ জন ছাত্রী শিক্ষা জীবন হইতে চোখের জলে বিদায় নিয়াছে; মালাবারে স্কুলে টিফিন বন্ধ করিয়া দিয়া মাদ্রাজ সরকার কয়েক হাজার গরীব শিশুকে স্কুল হইতে বিদায় নিতে বাধ্য করিয়াছে; উত্তর কলিকাতার ভারতী স্কুলের একটি ছাত্র অর্থাভাবে স্কুল ছাড়িয়া দিয়া পরে আত্মহত্যা করিয়াছে; বোম্বাই-এ কর্পোরেশন স্কুলের বেতন শতকরা ২০০ ভাগ বাড়াইয়া দিয়া আরও কয়েক হাজার গরীব ছেলেকে শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

ইহারই প্রতিবাদে ছাত্র-সমাজ যখন কণ্ঠ তুলিয়া বলিয়াছে—"নেহরু-প্যাটেল-বিধান সরকার তোমরা আমাদের বঞ্চনা করিয়াছ," তখনই স্কুল কলেজের ভিতর পুলিস ঢুকিয়া গিয়াছে।

—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছাত্র হত্যা করা হইয়াছে—মাদুরায় হোস্টেলের ভিতর ১৪৪ ধারাজারি হইয়াছে। মাদ্রাজ ও আসামে—স্কুল-কলেজের ভিতর রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

দুই বৎসরের ধনিক কংগ্রেসী শাসনের অধীনে ছাত্রসমাজের এই তীব্র অভিজ্ঞতা নিয়া ছাত্রফেডারেশন হাজির হইয়াছেন সাধারণ ছাত্রদের কাছে ২৫শে আগস্ট।

তাই কলিকাতায় খিদিরপুর হইতে বেলেঘাটা, টালিগঞ্জ হইতে শ্যামবাজার সমস্ত এলাকার প্রায় ২০,০০০ স্কুল ছাত্র ছাত্রফেডারেশনের সামান্যতম প্রচারে ধর্ম্মঘট করিয়া হাজির হইয়া আসেন। মার্চ্চেন্ট অভিসের কেরানী, মুহুরী অথবা দরিদ্র স্কুল শিক্ষকের এই ছেলেদের জীবন আর্থিক সঙ্কটের মুখে দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মঘট।

ধর্ম্মঘট করিয়াছেন স্কুল-কলেজের ৫,০০০ ছাত্রী। সমাজ ও পরিবারের বাধার মুখে যে শিক্ষাটুকু তাহারা লাভ করিতেছেন তাহাও এই ধনিক সরকার কাড়িয়া নিতে উদ্যত। তাহারই বিরুদ্ধে এই ধর্ম্মঘট।

২৫শে আগস্ট ধনিক সরকারের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে আগাইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছেন দুপুরে কেরানী রাত্রি বেলার ৫,০০০ কমার্স ছাত্র।

ক্যাম্পবেলের ১৩০০ মেডিকেল স্কুল ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। তাহাদের উচ্চ শিক্ষার দাবী সরকার উপেক্ষা করিয়াছে! যাদবপুরের ১৫০০ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। বিভিন্ন কলেজের আরও কয়েক হাজার ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়া আসন্ন বেকারীর বিরুদ্ধে শিক্ষাকেন্দ্রের ভিতর পুলিসী হামলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রসর হইয়াছেন।

আর ধর্ম্মঘট করিয়াছেন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের আরও হাজার হাজার গরীব ঘরের ছেলেমেয়ে। ধর্ম্মঘট করিয়াছেন ২৪পরগনার গ্রাম গ্রামান্তরের ১৫,০০০ ছাত্রছাত্রী, হাওড়ার ৭,০০০ ছাত্রছাত্রী। বেলঘরিয়ার ৭০০ ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়া ৭০০ ছাত্রই মিছিলে বাহির হইয়াছেন।

বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে এই দিবসকে বানচাল করার জন্য সরকারী বেসরকারী তরফ হইতে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে ২৫শে আগস্টের দুইদিন আগেই পুলিস ট্রাক পাহারা বসিয়া যায়; ছাত্রফেডারেশনের প্রকাশিত ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রেসের উপর হামলা চলে, হাওড়া পুলিস অফিসাররা স্কুলে স্কুলে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে শাসাইয়া আসে। অন্যদিকে চলে বে-সরকারী আক্রমণ। দক্ষিণ কলিকাতার ১,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর মিছিলের উপর সোডার বোতল ছুঁড়িয়া আক্রমণ করা হয়। আশুতোষ কলেজে ধর্ম্মঘটকামী সাধারণ ছাত্রদের উপর বাহির হইতে গুণ্ডা আনিয়া আক্রমণ করা হয়। প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজেই এই ধরনের বাধা দিবার চেষ্টা হয়। স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু ২৫শে আগস্ট এবার স্কুল শিক্ষকেরা ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে ছাত্রদের অন্যান্যবারের মত উপদেশ দেন নাই; কংগ্রেসী সরকারের শিক্ষানীতি শিক্ষক সমাজকেও ধর্ম্মঘটের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাই মুখে সমর্থন জানাইতে না পারিলেও এই অর্দ্ধভুক্ত শিক্ষকরা ছাত্রদের এই অভিযানকে অন্তরের শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন।

ধনীর দুলাল ও তাদের দালালেরা

২৫শে আগস্টের ধর্ম্মঘটকে বাধা দিবার জন্য স্কুল কলেজের ধনীর দুলালেরাই আগাইয়া আসে আব্দির পাঞ্জাবী পরা, ঘড়ি হাতে, পার্কার ৫১ পকেটে এই ছেলেরা কোথাও পিকেটরত ছাত্রদের মাড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করে, কোথাও বাহির হইতে গুণ্ডা নিয়া হামলা করার চেষ্টা করে।

ইহাদেরই সমর্থনে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে কিছু "সমাজতন্ত্রী" ছাত্র সংগঠন নির্লজ্জ ভাবে আগাইয়া আসে। ছাত্রফেডারেশন ২৫শে আগস্ট পালন করার জন্যে প্রত্যেকটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানায়। ইহাতে তাহারা কর্ণপাত না করিয়া যেখানে তাহাদের সামান্যতম শক্তি আছে সেখানেই বাধা দিয়াছে; রুইকর পন্থী ফরওয়ার্ডব্লক ছাত্ররা ভারতী স্কুলের ধর্ম্মঘট গায়ের জোরে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, এই স্কুলেরই একটি ছাত্র অর্থাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছিল। কমার্সের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার চেষ্টায় সংগঠন হিসাবে আর, এস, পি; ছাত্র কংগ্রেস নেতৃত্ব নেয়—অথচ ইহারাই আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর একই দাবী নিয়া "ছাত্র দিবস" আহ্বান করিয়াছে। আর, এস, এস ও জাতীয় রক্ষী গুণ্ডাবাহিনী ইহাদের সাথে মিশিয়া বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছে।

এই ধরনের সমস্ত বাধা ও আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়া কলিকাতার স্কুল কলেজের ৪০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ধর্ম্মঘট করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বৃষ্টি সত্ত্বেও ময়দানে ৪,০০০ ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত হন ছাত্র ফেডারেশনে ডাকে।

সভায় বক্তৃতা করেন স্কুলের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী, "আমরা, এই সরকারের অধীনে খেতে পাই না—পড়তে পাই না; এখন আমাদের স্কুলের বেতন বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের মত গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের এই বড়লোকের সরকার স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। আমরা এ সহ্য কোরব না। অত্যন্ত সহজ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন এই ছেলে মেয়েরা।

বক্তৃতা করেন বস্তীর এক নওজোয়ান, "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমলে আমাদের কোনও লেখা পড়া শেখানো হয় নি; এখন আমরা পড়াশুনা জানি না, আমরা বিড়ি পাকাই, লেফাপা বানাই—কোনমতে আমাদের পেট চালাই, আমাদের যে সরকার অন্ধ রেখেছে, ভুখা রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তোমাদের বিদ্যার্থীদের সাথে আমরা ও নওজোয়ানেরা সামিল হব"

ক্ষেতমজুর সম্মেলনের এক প্রতিনিধি ছাত্র সমাবেশকে অভিনন্দন জানান। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হামলার বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি ও বুরুলের ছাত্র বহিষ্কারের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ ও আসামে সরকারী সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব লওয়া হয়।

সভার সভাপতি সুখেন্দু মজুমদার ঘোষণা করেন, "সারা ভারতব্যাপী ধনিক সরকার শিক্ষা জীবনের উপর যে আক্রমণ হানিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মহড়া এই ২৫শে আগস্ট"—সমস্ত স্কুল কলেজে সংগ্রাম কমিটি গঠন করিয়া সরকারী আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হইতে তিনি আহ্বান জানান।

সভা শেষে ছাত্রপতাকা পুরোভাগে নিয়া ফেস্টুন ও পোস্টারে সুসজ্জিত ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর এক মিছিল বাহির হয়। রাজপথে মিছিলে আওয়াজ ওঠে: "শিক্ষার ব্যয় বাড়াও, পুলিসের ব্যয় কমাও" "ছাত্রদের ফি কমাও" "শিক্ষকের বেতন বাড়াও"।

কর্পোরেশন ষ্ট্রীট ধরিয়া মিছিল অগ্রসর হইল মুসলিম ইনষ্টিটিউটের দিকে। সারা বাংলার নির্য্যাতিত ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামী প্রতিনিধিরা সেখানে পেটের দাবীতে লড়াইয়ে সামিল হইয়াছেন ট্রেড ইউনিয়নের নীচে।

মুসলিম ইনষ্টিটিউটের কাছে আসিয়া মিছিল আওয়াজ তুলিল: "ক্ষেতমজুর আন্দোলন জিন্দাবাদ"।

"ক্ষেতমজুরের লড়াই আমাদের লড়াই" "সকলের জন্য শিক্ষা চাই" সম্মেলনের কাজ বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়ার গ্রাম গ্রামান্তরের এই ক্ষেতমজুর প্রতিনিধিরা। কলিকাতার ছাত্রদের লড়াইএর কথা তাহারা শুনিয়াছেন, সেই ছেলেমেদের চোখে দেখিয়া খুসী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা আওয়াজ তুলিলেন, "ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ" এই ছাত্ররা তাদের নিরক্ষর সন্তানদের শিক্ষার জন্য লড়াই করিতেছে।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রমিক নেতা কুঞ্জবিহারী শ্রমিক ও কৃষকের রক্তে-রাঙ্গা লালঝাণ্ডা তুলিয়া দিলেন ছাত্র নেতার হাতে।

খুসীতে ঝলমল করিয়া উঠিল এই দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মুখ। উল্লাসে তাহারা আওয়াজ তুলিল "লালঝাণ্ডা কী জয়" "শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র এক হও"

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

৩

২৮শে আগস্ট

লালঝাণ্ডা চটকল শ্রমিক সম্মেলন

ছাঁটাই বন্ধের দাবিতে সাধারণ সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ার আহ্বান

গত ২১শে আগস্ট মুসলিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বাঙ্গলা চটকল মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে বাংলার সমস্ত লালঝাণ্ডা চটকল শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। ছাঁটাই বন্ধ, পুরা সপ্তাহ কাজ, মূল বেতন ৮০ টাকা, মাগ্‌গীভাতা প্রভৃতির দাবিতে সম্মেলনে সমস্ত চটকল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের আহ্বান জানান হয়।

সোস্যালিষ্ট ও 'জাতীয়' টি-ইউর সংগঠনের শ্রমিকদের প্রতি বিশেষ আহ্বানে বলা হয়, চটকল শ্রমিকদের উপর এই আক্রমণকে আপনারা ভালো করিয়া বুঝুন এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আগাইয়া আসুন।

সম্মেলনে বাংলা চটকল মজদুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইউনিয়নকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সরাসরি অন্য ইউনিয়নের শ্রমিকদের নিকট যাও এবং প্রত্যেক মিলে প্রত্যেক ডিপার্টে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট ও কমিটি গড়িয়া তোল।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চটকল শ্রমিক নারায়ণপ্রসাদ। ব্যারাকপুর, হাওড়া, বজবজ প্রভৃতি প্রত্যেকটি চটকল এলাকা হইতে শতাধিক শ্রমিক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। বিভিন্ন এলাকায় অনবরত তাহাদেরই স্বগোত্রীয় শোষক "ফ্যাবরিক সিপার্স এ্যাসোসিয়েশন" চটকল মালিকদের মিথ্যা অজুহাতের মুখোস খুলিয়া দিয়াছে।

আসল কারণ লইল এই যে, মার্কিন অথবা পুরা মাহিনা ও মাগ্‌গীভাতা দিতে হইবে।

(২) অবিলম্বে সমস্ত তাঁত চালু করিতে হইবে, কোনো তাঁত বন্ধ রাখা চলিবে না।

(৩) সমস্ত ছাঁটাই শ্রমিককে চাকুরী দিতে হইবে।

(৪) কমপক্ষে ৮০ টাকা মূল বেতন, মূল্যমান হিসাবে মাগ্‌গীভাতা (অবিলম্বে ৫০ টাকা মাগ্‌গীভাতা) চাই।

(৫) উপযুক্ত বাড়ী অথবা বাড়ীভাড়া বাবদ ২০ টাকা দিতে হইবে।

(৬) চাকুরীর নিরাপত্তা, চাকুরী রেকর্ড খারাপ করা চলিবে না।

(৭) বোনাস হিসাবে ৩ মাসের মাহিনা দিতে হইবে।

(৯) উৎপাদনের উপর শ্রমিকদের কণ্ট্রোল চাই।

(১০) সমস্ত জুটমিলকে জাতীয়করণ করিতে হইবে।

সভায় চটকল মজদুর ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনে তাঁহাদেরই গ্রহণ করা হইয়াছে যাঁহারা শক্তিশালী আন্দোলন এবং বৃহত্তম গণসংগঠন সৃষ্টি করিবার কাজে অগ্রণী। কমরেড চতুর আলীকে সভাপতি এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

সভায় ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে চটকল শ্রমিকদের সমস্ত সংগ্রামে টানিয়া আনার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং শ্রমিকদের আগামী শান্তি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে মারোয়াড়ী বাঙ্গালী মালিকদের শ্রমিক ঐক্য ভাঙ্গার নূতন চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁসিয়ারী করা হয়: মালিকেরা শ্রমিক ছাঁটাই এবং বেকারী সৃষ্টির জন্য বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী ঝগড়া বাধাইয়া শ্রমিকের ঐক্য এবং মনোবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। শ্রমিকশ্রেণীকে এই নূতন ষড়যন্ত্র বানচাল করিয়া দিতে

মারোয়াড়ী-বাঙ্গালী মালিকদের স্বার্থে সৃষ্ট প্রাদেশিকতার বিষ সম্পর্কে হুঁসিয়ারী

পুলিস জুলুম, গ্রেপ্তার এবং জাতীয় টি-ইউ ও সোস্যালিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে পুনরায় বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত হয়।

স্থির হয় অবিলম্বে ইউনিয়নের সদস্য বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং এই বৎসরের মধ্যে ৫০,০০০ সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

মালিকদের চক্রান্ত

দাবি সম্পর্কে যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে চটকল মালিকদের চক্রান্ত ফাঁস করিয়া বলা হয়—

"ইণ্ডিয়ান জুট মিল এ্যাসোসিয়েশন অদূর ভবিষ্যতে বহু সহস্র চটকল শ্রমিককে ছাঁটাই করার দৃঢ়সংকল্প লইয়া কারখানাগুলিতে মাসে এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখিতেছে। কংগ্রেস নেতারা তাহাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে গবর্নমেণ্টের মাথায় বসিয়া সাহায্য করিতেছে। চটকল মালিকেরা "পাটের স্বল্পতা"র মিথ্যা অজুহাত তুলিয়া নিজেদের চক্রান্ত ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু পুঁজিপতিরা রপ্তানী বাড়াইয়া এবং আমদানি কমাইয়া অন্যদেশের লোকের ঘাড়ে বোঝা চাপাইয়া নিজেদের সংকট ঠেকাইবার যে চেষ্টা করিতেছে চটকল মালিকরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া নিজেদের সমস্যা সমাধান করিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং শ্রমিকদের খাটুনী বাড়াইয়া ও ছাঁটাই করিয়া 'উৎপাদনের খরচ কমাইবার' পথ ধরিয়াছে।

বলা হয় যে, মালিকরা আই-এন-টি-ইউ-সি এবং সোস্যালিস্ট নেতাদের দালালী মারফত নিজেদের নীতি সফল করার চেষ্টা করিতেছে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়, পুঁজিবাদীরা এবং তাহাদের পোষা কুকুরের দল এক নূতন ট্রাইব্যুনালের ধ্বনি তুলিয়া শ্রমিকদের ধোঁকা দিতে এবং মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।

গত দুই মাসের অভিজ্ঞতা হইতে শ্রমিকেরা বুঝিতে পারিতেছে যে, মালিকদের আক্রমণ দলমত নির্ব্বিশেষে সকলকেই আঘাত করিতেছে। মালিক, গবর্নমেণ্ট এবং দালালদের আক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র পথ সম্মিলিত সাধারণ সংগ্রাম। সাধারণ শ্রমিক এবং বিশেষ করিয়া কংগ্রেস বা সোস্যালিস্ট দলীয় শ্রমিককে আজ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য একত্র হইতে হইবে। এই ঐক্য গড়িবার কাজে চটকল মজদুর ইউনিয়নের শ্রমিকদেরই অগ্রণী হইতে।

ন্যূনতম দাবি

সেইজন্যেই চটকল মজদুর ইউনিয়ন এবং টি-ইউ-সি নিম্নোক্ত দাবীর ভিত্তিতে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে সংযুক্ত মোর্চ্চা এবং কমিটি গঠনের আহ্বান জানাইয়াছে:

(১) এক সপ্তাহ মিল বন্ধ রাখা চলিবে না, হয় মিল চালু করিতে হইবে

(৮) সমস্ত "বদলীকে" স্থায়ী করিতে হইবে।

হইবে। তাহাদের সে শক্তি আছে, কারণ তাহারা সকলের আত্মনিয়ন্ত্রণ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের লড়াই করিতেছে।

বাংলার চটকলের মজুরি ও মুনাফা—বাংলার সবচেয়ে বড় শিল্প চটশিল্পের ইতিহাস বিদেশী পুঁজির নির্লজ্জ শোষণের ইতিহাস। এই শোষণকে এবং চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের দুর্বলতা ও সম্ভাবনাকে খুলে দেখান হয়েছে ওই পুস্তিকায়।

দাম—দুই আনা।

বাংলা ব্যাপী ছাত্র ধর্ম্মঘট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যাহারা নিপীড়িত হইয়াছে, ধনিক কংগ্রেসী শাসনে যাহারা বঞ্চিত হইয়াছে, সেই, হাজার হাজার বঞ্চিত, নিপীড়িত কিশোর ও তরুণের কাছে লালঝাণ্ডার অঙ্গীকার, ভবিষ্যৎ সুখী জীবনের অঙ্গীকার।

ছাত্র পতাকার সাথে লালঝাণ্ডা বাঁধিয়া দিয়া স্কুল ও কলেজের গ্রামের ও শহরের ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর এই দৃপ্ত মিছিল ভারতের লক্ষ লক্ষ ছাত্রের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া ২৫শে আগস্ট আওয়াজ তুলিল "ধনিক কংগ্রেস সরকারের ফ্যাসিস্ট শিক্ষানীতি ধ্বংস হোক।"

বাস্তুহারা মিছিল কর্ত্তৃক এস-ডি-ও ঘেরাও

অক্টোবর মাসের মধ্যে বাস্তুহারাদের সম্পর্কে সকল দায়িত্ব ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য পণ্ডিত নেহরুর ঘোষিত সরকারী নীতি ক্রমে ক্রমে কার্য্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার গরীব নরনারীর জীবন চূড়ান্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

রাণাঘাটে প্রায় ৮ শত বাস্তুহারা একমাস যাবৎ স্টেশনে আশ্রয় লইয়াছেন। পুরাতন আশ্রয় শিবিরগুলি যখন তুলিয়া দিবার সরকারী পরিকল্পনা স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন নূতন করিয়া বাস্তুহারাদের কোন ক্যাম্পে নিবার প্রশ্নও অবান্তর। তাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-শিশু সহ এই সকল অনাহারী নিরাশ্রয়ীদের কাছে মৃত্যুই নেহরুর সরকারী রায়।

রাণাঘাট স্টেশনের 'বসতি'তে গত মাসে ৪ জন বাস্তুহারা অনাহারে মারা গিয়াছেন। আরও প্রায় ১২ জন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গণিতেছেন।

এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিবাদেই গত ২৩শে আগস্ট পাঁচ শতাধিক বাস্তুহারা নরনারী এস-ডি-ও'র বাড়ী ঘেরাও করেন। আগের দিন একটি প্রতিনিধিদল এস-ডি-ও'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, পরের দিন নিশ্চয়ই সাহায্য করা হইবে। সেই সামান্য প্রতিশ্রুতিটুকুও ভঙ্গ করার প্রতিবাদে শোভাযাত্রা এস-ডি-ও'র বাংলোতে পৌঁছিলে ক্রোধান্বিত মহকুমা হাকিম গাড়ী-গাড়ী পুলিস আনিয়া লাঠি চালাইবার হুকুম দেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত জনতার উপর লাঠি চালাইবার এই আদেশ পুলিসেরা অমান্য করে।

রাণাঘাটে বাস্তুহারাদের প্রতিনিধিদল স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের কাছেও গিয়াছিলেন। সরকারী 'হিজ মাস্টারস ভয়েস' কংগ্রেস অফিস স্পষ্ট জবাব দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারে সরকারের এত 'টাকা নাই'। কংগ্রেস নেতারা অবশ্য পরামর্শ দিয়াছেন যে, 'বাস্তুহারাদের উচিৎ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করা।'

রাণাঘাটের দরিদ্র বাস্তুহারারাও রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু ভিক্ষার জন্য নহে, অনিবার্য্য মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া মৃত্যুর দূতদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য।

মঞ্জিল

ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রকৃত বন্ধু সোভিয়েট ইউনিয়ন

রুশ ভাষায় তুলসীদাসের 'রামায়ণ' অনুবাদ

'রামায়ণে'র প্রকৃত তাৎপর্য্য

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যাপক বারান্নিকভ রুশ ভাষায় তুলসীদাসের 'রামায়ণ' অনুবাদ করিয়াছেন। অধ্যাপক বারান্নিকভ আশা রাখেন যে, **"বইখানি এই দুই দেশের ভিতর ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে।"**

নেহরু-প্যাটেলের সরকারী ভারতে—

এদিকে নেহরু-প্যাটেল সরকার কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের ফ্যাশিস্তবিরোধী ফিল্ম নিষিদ্ধ করিয়া দিতেছে; সারা ভারতের প্রগতিশীল লেখকদের সম্মেলনে সোভিয়েটের ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিদের আসা বন্ধ করিল; বক্তৃতায়, বিবৃতিতে রক্ষিতা পত্রিকাগুলিতে কংগ্রেস ও তাহার সরকার অসংখ্য সোভিয়েটবিরোধী কুৎসা রটাইতেছে; সাম্রাজ্যবাদী জোটে যোগ দিয়া ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুদের জন্য সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধ ঘাঁটি করিয়া তুলিতেছে।

আজ জনগণের ভারত—

কিন্তু, জনগণের ভারত সোভিয়েটদেশকে মিত্র বলিয়াই জানে। এবং সোভিয়েট পণ্ডিত এই জনগণেরই কবি তুলসীদাসের 'রামায়ণের মারফৎ' জনগণের ভারতের সহিত সোভিয়েট দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন।

আমাদের দেশের মারোয়াড়ী, গুজরাটী, বাঙালী, অবাঙালী শোষকরা যতই অসভ্য বর্ব্বর হউক না কেন, সোভিয়েট-এর বিরুদ্ধে, দেশের বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সহস্র কুৎসার ভিতর তাহারা বলিয়া থাকে যে, কমিউনিজম আসিলে ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সব ধ্বংস হইয়া যাইবে!

কিন্তু, "মধ্যযুগীয় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, ভারতের সমগ্র সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি" তুলসীদাসের যোগ্য সমাদর করিয়া সোভিয়েট দেশ ঐ বর্ব্বর শোষকদের মুখে "সংস্কৃতি" ও "ঐতিহ্যে"র বুলির অসারতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, কুৎসারটনাকারীর মুখে কড়া চাবুক মারিয়া দিয়াছেন।

ঐতিহ্য বরণের পদ্ধতি

আমাদের দেশের প্রগতিশীল জনগণ ইহা হইতেও মার্কস্‌বাদ ও কমিউনিজম-এর একটি মস্ত বড় শিক্ষা বুঝিতে পারিবেন। সে হইল এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নূতন সংস্কৃতি ভিন্ন দেশের অতীত ও বর্ত্তমান ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া বাছিয়া সেরা বস্তুগুলি লইয়া আরও মুখর আরও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু নির্ব্বিচারে সব তুলিয়া লয় না:—বাছাই করিয়া নেয়।

এই বাছাই করিবার কৌশলটি কি? কী সে বস্তু যাহা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেয়? কী সে বস্তু যাহা গণতন্ত্রসম্মত ধারার সমর্থক, যাহা অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়? কী সে বস্তু যাহা বিভেদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগাইয়া নিয়া যায়?—এই নিরিখে বিচার করিয়াই মার্কস্‌বাদ কোন বস্তুকে বর্জ্জন করে, কোন বস্তুকে গ্রহণ করে।

সোভিয়েট দেশে তুলসীদাসের 'রামায়ণকে' এই নিরিখেই বিচার করা হইয়াছে।

জনগণের ভাষাই তুলসীদাসের ভাষা

১৬ শতকে, তুলসীদাসের কালে, ভারতের আধুনিক ভাষাগুলি গড়িয়া উঠিতেছিল। আজিকার দিনের মারোয়াড়ী, গুজরাটী শাসকচক্র যেমন শাসন-শোষণের সুবিধার জন্য এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর ভিতর বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্য অন্যান্য ভাষা দমন করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দিতেছে, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সংস্কৃত চাপাইয়া ভাষাকে দুর্ব্বোধ্য আড়ষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে—তুলসীদাসের কালে সনাতনীরাও তেমনি জনগণের বোধগম্য কথ্য ভাষাকে ঘৃণা করিত, "অশুদ্ধ" বলিয়া অবজ্ঞা করিত, আর বলিত যে, সংস্কৃত ভাষায় ছাড়া কাব্য রচনা হইতে পারে না! বাতিল সংস্কৃত ভাষার এই আক্রমণের বিরুদ্ধে তুলসীদাস জনগণের নিজস্ব **'অবধী'** ভাষাকে দাঁড় করাইয়াছেন, এই ভাষারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা রচনা করিয়া জনগণের গণতন্ত্রসম্মত অধিকারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—অধ্যাপক করান্নিকভ তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:

"জনগণের ভাষার অধিকার রক্ষায় তুলসীদাসের গণতন্ত্রী মনের পরিচয় রহিয়াছে। সেই গণতন্ত্রী ধারাই তাঁহার সমগ্র কবিতায় বর্ত্তমান।"

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, সোভিয়েট সংস্কৃতির দৃষ্টিতেও তুলসীদাস যে আজ আদরণীয়, তাহার একটি কারণ হইতেছে—তুলসীদাসের এই গণতন্ত্রী মন। তিনি ছিলেন জনগণের পক্ষভুক্ত, জনগণের কবি।

জনগণের স্বার্থই কাব্যবিচারের নিরিখ

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জনগণের মঙ্গলের জন্যই সৃষ্টি করিতে হইবে—ইহাই বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের দাবী। জনগণের অধিকার, জনগণের লড়াইয়ে যে শিল্প, যে কাব্য আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে তাহাই সার্থক সৃষ্টি, অথচ, ইহার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আক্রমণের সীমাপরিসীমা নাই। যাহারা ভারতের "নিজস্ব সংস্কৃতি," "বিশিষ্ট ঐতিহ্য," ইত্যাদি বুলি আওড়াইয়া জনগণের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটায় তাহাদের মুখ ভোঁতা করিয়া দিয়াছেন অধ্যাপক বারান্নিকভ। এবং, ভারতেরই গণতন্ত্রী ঐতিহ্য উদ্ধার করিয়া বারান্নিকভ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের জবাব দিয়াছেন। 'রামায়ণেই' **তুলসীদাস লিখিয়াছেন:**

"কাব্য, যশ, সম্পদ যখন গঙ্গা নদীর মত সবার মঙ্গলসাধন করে তবেই তাহা ভাল (সুরসরি সম সবকঁহ্ হিত হোই)।"

যাহারা লক্ষ লক্ষখানি 'রামায়ণ' বিক্রয় করিয়া মুনাফা লুটিতেছে তাহারা কখনও রামায়ণের এই তাৎপর্য্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে না। তাহাদেরই মুনাফার উচ্ছিষ্ট খাইয়া "জাতীয়তাবাদী" শিল্প-সাহিত্যিক সমালোচকরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করে। তাহাদেরই সরকার জনগণের পত্র-পত্রিকা, গান-নাটকের কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়। তাহারা সবাই মিলিয়া সোভিয়েটবিরোধী কুৎসা রটায়। আর, সেই সোভিয়েট সংস্কৃতিই এই প্রথম ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডার হইতে এই মূল্যবান সম্পদ আবিষ্কার করিলেন—'রামায়ণের' প্রকৃত গণতন্ত্রী ধারাটিকে তুলিয়া ধরিলেন।

ঐক্য ও সংগ্রামের বাণী

অধ্যাপক বারান্নিকভ আরও একটি দিক হইতে 'রামায়ণের' তাৎপর্য্য তুলিয়া ধরিয়াছেন:

"মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল; এই সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রয়োজন" তুলসীদাস বুঝিয়াছিলেন। "ষোল শতকে লেখা এই বইখানির তাৎপর্য্য জনগণের দৃষ্টিতে কমিয়া যাওয়া দূরের কথা বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া দারিদ্র্যের মাঝে, জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইহার তাৎপর্য্য আরও বেশি।"

ভারতের যে প্রেস ও সংবাদপত্র মালিকরা সোভিয়েটবিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসায় তাহাদের ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের সুরে পোঁ ধরিতেছে, দেশে সোভিয়েট ব্যবস্থা আসিলে কমিউনিজম আসিলে ভারতের সংস্কৃতি ধ্বংস হইবে বলিয়া গলা ফাটাইতেছে, তাহারা কিন্তু রামায়ণের ব্যবসাই করিয়াছে।

এবং সেই সোভিয়েট দেশ এবং সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টিই 'রামায়ণের' প্রকৃত তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছে।

ফ্যাসিস্তবিরোধী যুদ্ধেরই অঙ্গ

কী নিদারুণ অবস্থার ভিতর তাঁহারা এই কাজ করিয়াছেন! হিটলারের দস্যুবাহিনী যখন লেনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ করিয়া বিজ্ঞান পরিষদের উপরে পর্য্যন্ত বোমা ফেলিতেছে, তখনও বারান্নিকভ সেই পরিষদের বাড়িতে বসিয়া এই কাজ চালাইয়াছেন। সোভিয়েট দেশ ও তাহার কমিউনিস্ট পার্টি শেষ পর্য্যন্ত অর্থব্যয় করিয়া বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া বারান্নিকভকে কাজাকস্তানে পাঠাইয়া দেন—ভারতের সংস্কৃতির এই সম্পদ উদ্ধারের কাজ যাহাতে কোন মতে বাধা না পায়।

মানবতার প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি কতখানি কত গভীর মমতা ও আস্থা থাকিলে তবে ভিন্ন দেশের সংস্কৃতির প্রতিও এতবড় গুরুত্ব দেওয়া যায়, এত দরদ দেখানো যায়! প্রত্যেকটি কাণাকড়ি, প্রত্যেকের সমস্ত শক্তি যখন ফ্যাসিস্তবিরোধী যুদ্ধের জন্য অপরিহার্য্য সেই চূড়ান্ত সংকটময় মুহূর্ত্তেই সোভিয়েট দেশ ও তাহার কমিউনিস্ট পার্টি তুলসীদাসকে রক্ষা করিয়াছেন, ভারতের ঐতিহ্যের তাৎপর্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণও যে ফ্যাসিস্তবিরোধী যুদ্ধের অঙ্গ।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগের দুই পথ— সোভিয়েটের ও পুঁজিবাদীদের

ভারতের সরকারী "সংস্কৃতির" পথ

এদিকে ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়া মওলানা আজাদের প্রচেষ্টায় "এসিয়ার দেশগুলির সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ" স্থাপন করিতেছেন। কিন্তু, যে কাজাকস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রী সরকার তুলসীদাসের রামায়ণ রুশ ভাষার অনুবাদের সুযোগসুবিধা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সুন্দর পথ তৈয়ারি করিয়া দিলেন। সেই কাজাকস্তানের প্রতিনিধি নাই মওলানা আজাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্মেলনে কিংবা কাউন্সিলে। সোভিয়েট মধ্য এসিয়ার কোন দেশকে ডাকা হইয়াছে বলিয়া কেহ শোনে নাই। কাহাকে ডাকা হইয়াছে? **মওলানা আজাদের এসিয়ার "সাংস্কৃতিক যোগাযোগ" কাউন্সিলে কে আছে?**—আছে মার্কিন ভৃত্য চীনের জনগণের ঘৃণিত পরাজিত শত্রু চিয়াং-এর প্রতিনিধি; আছে বর্মী জনগণের বিরুদ্ধে খুনী অভিযানের নেতা ন্যু-সরকারের প্রতিনিধি; আছে মার্কিন উপনিবেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধি; আছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর তুর্কী, আফগানিস্তান ও মিসর সরকারের প্রতিনিধি।

এই দূষিত চক্রে-সংস্কৃতি?

এখানে যোগাযোগ হইতেছে বটে; কিন্তু তাহা সাংস্কৃতিক হইতে পারে না। এখানে এসিয়ারই সাতটি দেশের সরকারী প্রতিনিধি আছে বটে; কিন্তু সে এসিয়া জনগণের এসিয়া নহে। ইরাক, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহলের সরকারী প্রতিনিধি ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে; কিন্তু সেখানকার জনগণ ইহাতে সায় দিবে না। বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর সাকরেদ নেহরু-প্যাটেলের সরকারী ভারতের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার সরকারী এসিয়ার এই যোগাযোগে আর যাহাই

(১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

পাকিস্তানে 'শিল্পোন্নতি'র

হারুন-ইস্পাহানী-দাদার স্বার্থে ইঙ্গ-মার্কিন

মজুরের বেকারী ও

পাকিস্তানে লীগ শাসনের প্রথম দিন হইতেই লীগ নেতারা জনগণকে বড় বড় কথা শুনাইতেছেন যে, তাহারা অচিরেই দেশকে নানাবিধ কল-কারখানায় উন্নত করিয়া দিবেন। প্রায়ই কাগজপত্রে বড় বড় পরিকল্পনার কথা বাহির করা হয়। কিন্তু লীগ শাসনের দুই বছর শেষ হইয়া যাওয়ার পরও পূর্ব্ববঙ্গে তথা সারা পাকিস্তানে শিল্পের কোন উন্নতিই হয় নাই।

'শিল্পোন্নতির' নাম করিয়া লীগ সরকার কিরূপ নীতি অবলম্বন করিতেছেন ?

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে লীগ সরকার শিল্প সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করেন তাহাতে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিপতিগণকে পাকিস্তানে আসিয়া 'ব্যবসা' করার জন্য আহ্বান জানান হয়। বিদেশী পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য লীগ সরকার ঘোষণা করেন যে, ট্যাক্সের হার কমাইয়া কলকব্জার ক্ষতিপূরণ পোষাইয়া দেওয়া হইবে; বিদেশী পুঁজিপতিগণ তাহাদের লাভের একটা 'ন্যায়সঙ্গত' অংশ নিজদেশে পাঠাইতে পারিবে এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, জলবিদ্যুৎ ও রেল ওয়াগন তৈরী ছাড়া আর কোন শিল্পই জাতীয়করণ হইবে না। ঐ তিনটি ছাড়া আর সব শিল্পেই ব্যক্তিগত মুনাফা চলিতে পরিবে।

তবে কোন কোন শিল্পে মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ ও কোন শিল্পে মূলধনের ৩০ ভাগ দেশীয় ধনিকদের দিতে হইবে।

বিদেশী পুঁজিপতিদের শোষণের এই অবাধ অধিকার দানের কৈফিয়তে লীগ নেতারা বলিয়া থাকেন যে, পাকিস্তান সরকারের টাকা নাই। কাজেই বিদেশী মূলধনের 'সাহায্য' প্রয়োজন।

কিন্তু এই যুক্তি একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র।

আসলে, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের পর হারুন-ইস্পাহানী-হাসেম-কাসেম-দাদাপ্রমুখ ধনিকগোষ্ঠীই পাকিস্তানের প্রকৃত মালিক হইয়াছে। তাহারা আশা করিতেছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিপতিদের সাহায্যে ও তাহাদের ছোট হিস্সাদার হইয়া তাহারা দেশের জনগণকে শোষণ করিয়া মুনাফা লুটিবে। এই মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থের জন্যই ধনীর দালাল লীগ সরকার পাকিস্তানে বিদেশী মূলধনের অবাধ শোষণের সুবিধা করিয়া দিতেছে।

ঘৃণ্য আত্মসমর্পণ

লীগ সরকার এইভাবে বিদেশী মূলধনের শোষণের সুবিধা দিবার পরও মার্কিন ধনকুবেরগণ আরও আত্মসমর্পণের জন্য চাল দিতে থাকে। মার্কিন পুঁজিপতিদের কাগজে লেখা হইতে লাগিল যে, লীগ সরকার যেসব সুবিধা ঘোষণা করিয়াছে তাহা যথেষ্ট নয়। বিশেষ করিয়া বিদেশী পুঁজিপতিগণ নিজের দেশে মুনাফার 'ন্যায়সঙ্গত অংশ' পাঠাইতে পারিবে বলিয়া যে শর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রহণ যোগ্য নয়।

তখন হারুন-ইস্পাহানী-দাদার নির্দ্দেশে লীগ সরকার তাড়াতাড়ি ঘোষণা করেন যে, বিদেশী পুঁজিপতিগণ পাকিস্তানে কোন কারখানা খুলিলে তাদের মুনাফা তাহারা অবাধে নিজদেশে পাঠাইতে পারিবে। লীগ সরকার নির্লজ্জের মত ইহাও বলেন যে, বিদেশী পুঁজিপতিগণকে পাকিস্তানবাসীদের মূলধনের একটা অংশ দিতে হইবে বলিয়া যে শর্ত্ত দেওয়া হইয়াছিল—তাহাও সব সময় কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগ করা হইবে না। "শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশী সাহায্য চাই"—এই যুক্তি দ্বারা বিদেশী ধনকুবেরদের পায়ে এই ঘৃণ্য আত্মসমর্পণকেও লীগ নেতারা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন।

পাকিস্তানের সম্পদে বিদেশীদের কর্ত্তৃত্ব

লিয়াকত আলির সরকারের "শিল্পোন্নতি"র আমলে পাকিস্তানের ধন-সম্পদের উপর ইঙ্গ মার্কিন কর্ত্তৃত্ব জাকিয়া বসিতেছে।

চট্টগ্রামে তেলখনির কাজের ভার পাইয়াছে কুখ্যাত বিলাতী পুঁজিপতি বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী। পাকিস্তানের নোট ছাপাইবার অধিকার পাইয়াছে সরকারের অংশীদার হিসাবে বিলাতী টমাস-কুলা-রু কোম্পানী। করাচীতে একটি রবার টায়ার কোম্পানী খুলিবার পারমিট পাইয়াছে একটি আমেরিকান কোম্পানী।

যে জলবিদ্যুত পরিকল্পনা নিয়া লিয়াকত আলির লীগ সরকার এত হৈ-চৈ করিতেছেন, সেই জলবিদ্যুত কারখানা গড়ার কাজে লীগ সরকারকে 'সাহায্য' ও 'পরামর্শ' দিবার ভার পাইয়াছে মার্জ-রেণ্ডেল-ভাটেন নামক একটি বিদেশী যুক্ত কোম্পানী।

এমোনিয়াম সালফেটের কারখানার পরিকল্পনা তৈয়ারীর জন্য লীগ সরকার বিলাতের পাওয়ার গ্যাস কর্পোরেশন ও আমেরিকার কেমিক্যাল কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর 'সাহায্য' নিয়াছেন।

ইস্পাতের কারখানা তৈয়ারী করা সম্ভব কি না সেই 'তদন্তের' ভার পাইয়াছে বিলাতের টমাস-ফার্থ-জান-ব্রাউন কোম্পানী।

পশ্চিম পাকিস্তানে ও চট্টগ্রামে, জলবিদ্যুত কারখানা তৈয়ারী হওয়ার পর সেই সব অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির কাজে সরকারকে 'পরামর্শ' দিবার জন্য লিয়াকত আলি মন্ত্রিসভা আমেরিকার নিকট একজন 'বিশেষজ্ঞ' চাহিয়াছেন।

এই সব তথ্যের উপর কোন মন্তব্য নিষ্প্রোয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি কারখানা করিয়া বা কোন কোন ক্ষেত্রে 'সাহায্য' ও 'পরামর্শের' নামে পাকিস্তানের সব ঐশ্বর্য্যের উপর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। হারুন-ইস্পাহানী-দাদার মুনাফার জন্য লিয়াকত আলি সরকার এইভাবে দেশের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন।

আমেরিকার দানবীয় ষড়যন্ত্র

তবুও যদি কেহ মনে করেন যে মার্কিন ধনকুবেরদের এখন সুযোগ দিয়াও পাকিস্তান শিল্পে উন্নত হইলেও ভাল—তবে তাহার সে আশায়ও ছাই পড়িবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বিষম অর্থনৈতিক সংকটে জর্জ্জরিত। তাহার শিল্পের উৎপাদন কমিতেছে। এই সংকটের আবর্ত্তে পড়িয়া আমেরিকার ধনকুবেরগণ মতলব করে যে, অন্যান্য দেশের শিল্প নষ্ট করিয়া সেই সব দেশে তাহাদের মাল বিক্রয় করিয়া তাহারা নিজেদের সংকট সমাধা করিবে। অন্য দেশের কাঁধে সংকটের বোঝা চাপাইয়া নিজের মুনাফা করার এই জঘন্য ষড়যন্ত্রকেই মার্কিনগোষ্ঠী শোভনী 'মার্শাল সাহায্য' নামে দুনিয়ার কাছে উপস্থিত করে। এই 'সাহায্যের' আর এক উদ্দেশ্য হইল দেশে দেশে সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধের ঘাঁটি তৈয়ারী করা।

আমেরিকার ধনকুবেরগণের এই বিকট 'সাহায্যের' আঘাতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির শিল্পও আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সে সব দেশ আমেরিকার অর্দ্ধ-দাসে পরিণত হইয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপের জনগণ এখন এই শয়তানী 'সাহায্যের' বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতেছে। জনতার শক্তির নিকট ট্রুম্যানের এই প্ল্যান আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইরূপ 'সাহায্যে'র নাম করিয়াই আমেরিকার ধনকুবেরগণ সৌদি আরব, মিসর, সিরিয়া, লেবানন, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশ হইতে বৃটিশকে উঠাইয়া সেখানকার তৈল প্রভৃতি সম্পদ নিজের কুক্ষিগত করিয়াছে। সেই সব দেশকে নিজেদের গোলামে পরিণত করিয়াছে এবং সেই সব দেশে সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধের ঘাঁটি তৈয়ার করিতেছে।

ময়মনসিংহের উত্তর অঞ্চলে—

গভীর রাত্রে ঘুমন্ত মানুষের

৯ জন নিহত—ও

জনতার খাদ্যের আন্দোলনের বিরুদ্ধে

গত ৮ মাস যাবত ময়মনসিংহের উত্তর অঞ্চলে গরীব জনসাধারণের খাদ্যের আন্দোলনের উপর লীগের নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা যে দমননীতি চালাইয়াছে তাহার নৃশংসতা ৩১শে জুলাইর একটি ঘটনা হইতে উলঙ্গভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

গত ৩১শে জুলাই রাত্রে ময়মনসিংহের কলমাকান্দা থানার জাগীরপাড়া গ্রামে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার ফৌজ হামলা করিয়া নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত গ্রামবাসীর উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণে নিহত হইয়াছেন ২ জন নারী সহ ৯ জন গরীব কৃষক। সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছেন ৩ বছরের একটি শিশু, এক জন কৃষক নারী ও দুইজন গরীব কৃষক। জাগীরপাড়া গ্রামটিকে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফৌজের দল গ্রামবাসীদের গরু-বাছুর-ধান-চাউল সব কিছু নিয়া গিয়াছে।

গত ৮ মাস যাবত কমলাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী এই চারিটি থানার গরীব জনসাধারণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে খাদ্য ও টংকপ্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন চালাইতেছেন। সেই আন্দোলনকে দমাইবার জন্য নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার শত শত ফৌজ গত ৮ মাসের মধ্যে ১৬ বার গুলি চালাইয়াছে। সেই গুলিতে ৩১শে জুলাইএর আগেই নিহত হইয়াছেন ২ জন নারীসহ ৩৩ জন গরীব কৃষক। গ্রামে গ্রামে ফৌজের হামলায় শত শত কৃষক সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন।

চেরাখালি গ্রাম ভস্মীভূত

তবুও আন্দোলন চলিয়াছে। জনগণ দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন চালাইয়াছেন। দমননীতি এখন জঘন্য হিংস্রতায় পরিণত হইয়াছে।

১৮ই জুলাই লীগ সরকারের ফৌজ দুর্গাপুর থানার চেরাখালি গ্রামে হামলা করিয়া গুলিবর্ষণ করে। সেই গুলিতে সেই স্থানে ৯ জন নিহত হন। চেরাখালি গ্রামখানির ৪।৫ শত লোকের ঘরবাড়ী আগুনে পুড়াইয়া দেওয়া হয়। ফৌজ সেই গ্রাম হইতে ১০০ গরু মহিষ নিয়া গিয়াছে।

৩১শে জুলাইর ঘটনা

ইহার ১২ দিন পর ৩১শে জুলাই জাগীরপাড়া গ্রামের বুভুক্ষ গ্রামবাসী সারা

দমনীতির তীব্র

পূর্ব্ব পাকিস্তান

"ময়মনসিংহের উত্তর অঞ্চলে লীগের নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা গত ৮ মাস যাবত যে দমননীতি চালাইয়াছেন তাহা দিন দিন বীভৎস হইতে বীভৎসতর রূপ ধারণ করিতেছে।

"গত ৩১শে জুলাই রাত্রে লীগ সরকারের ফৌজের দল কলমাকান্দা থানার জাগীর পাড়া গ্রামে হানা দিয়া নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের উপর গুলি চালায়। ইহাতে ৯ জন নরনারী মারা গিয়াছেন। সমস্ত গ্রামটিকে পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে ১৮ই জুলাই তারিখেও চেরাখালি গ্রাম এইভাবে বিধ্বস্ত হয়। সেখানেও গুলিতে ৯ জন মারা যান। গত ৮ মাসে গুলিতে মারা গিয়াছেন মোট ৪২ জন নরনারী।

গরীবের খাদ্য ও টংকপ্রথা বিরোধ

মাঙ্গল

...নামে আমেরিকার দাসত্ব

...পুঁজিপতিদের হাতে সব সম্পদ অর্পণ

...ধনিকের মুনাফা

সম্প্রতি ট্রুম্যান সাহেব দুনিয়ার 'অনগ্রসর' দেশগুলিকে 'সাহায্য' করিবার আর এক প্ল্যান বাৎলাইয়াছেন। এই 'সাহায্যের' অর্থ ট্রুম্যানের বক্তৃতা হইতেই পাওয়া যায়। ট্রুম্যানের 'সাহায্যের' একটি যুক্তি হইল যে, ঐ সব 'অনগ্রসর দেশের জনগণ আজ বেহাড়া হইয়া 'ভুল নীতির' দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ 'অনগ্রসর' দেশগুলির জনগণ আজ মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম করিতেছে তাহাকে ঠাণ্ডা করার জন্য 'সাহয্য' দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার বাণিজ্য প্রসারের জন্য এই 'সাহায্য' পাঠানো হইবে। ট্রুম্যানের চেলা থর্প সাহেব জাতি সংঘে ট্রুম্যানের এই 'সাহায্য' নীতির ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই 'সাহায্য' যে অনগ্রসর দেশগুলির শিল্পের উন্নতির জন্যই নিয়োগ করা হইবে এমন কোন কথা নাই।

কাজেই, দেখা যাইতেছে যে দুনিয়ার অনগ্রসর দেশগুলির (যেমন পাকিস্তান) গণ-আন্দোলনকে পিষিয়া সেই সব দেশকে আমেরিকার উপনিবেশ ও সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধের ঘাঁটি তৈয়ার করাই ট্রুম্যানের এই নয়া প্ল্যানের মতলব।

ভারতে আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব দূত গ্রেডী সাহেবও গত বছর পাকিস্তান ও ভারতকে উপদেশ দিয়াছিল যে, কৃষির উন্নতি কর ও হাল্কা শিল্প বানাও। বড় বড় শিল্প তৈয়ার করিও না। অর্থাৎ কৃষিপ্রধান দেশ হইয়া আমেরিকার উপনিবেশ হইয়া থাক।

আমেরিকার দাসত্ব

জাতিসংঘে সোভিয়েট প্রতিনিধি ট্রুম্যানের এই নয়া সাহায্যের বিষম বিপদ সম্পর্কে দুনিয়াকে হুসিয়ারও করিয়াছিলেন।

কিন্তু, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। লীগ সরকার কিন্তু আমেরিকার প্রভুদের হুকুমই মাথা পাতিয়া নিয়াছেন। ১৩ই আগস্ট এক বক্তৃতায় পাক শিল্প মন্ত্রী ফজলুর রহমান এই সাহায্যের প্ল্যানের জন্য ট্রুম্যানকে ধন্যবাদ জনাইয়াছেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শিল্পোন্নতির পরামর্শ দাতা বোর্ডের প্রথম সভায় বক্তৃতায় জনাব লিয়াকত আলি বলেন যে, এখানকার কাজ হইল পাকিস্তানে কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা করিয়া তাহাকে কাজে লাগানো।

গত সেপ্টেম্বর মাসে জনাব ফজলুর রহমান শিল্পোন্নতির যে পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন বা জনাব লিয়াকত আলি ঐ বক্তৃতায় যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন তাহাতে আছে শুধু জুটপ্রেস, চিনি, তুলা, চামড়া প্রভৃতি হাল্কা শিল্পের কথা। ইস্পাত প্রভৃতি ভারী শিল্প যাহা হইল দেশের উন্নতির মূল, সেই সব শিল্প তাঁহাদের পরিকল্পনায় স্থান পায় নাই।

১৭ই জুলাই 'আজাদে' খবর বাহির হইয়াছে যে, পাকিস্তান উন্নয়ন বোর্ড 'জাতিগঠনের' ৫৩টি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছে। ইহাতে ৫ বছরে ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ের সুপারিশ করা হইয়াছে।

এই টাকা ব্যয় হইবে কি ভাবে? "আগামী ৫ বছরের মধ্যে ১ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুত পরিকল্পনা নির্ম্মাণের জন্যই ৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৪০ লক্ষ একর জমি আবাদ হইবে।

"এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ১৪ কোটি টাকা খরচ হইবে। পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অনুরূপ অর্থবরাদ্দ করা হইয়াছে।"

(আজাদ ১৭ই জুলাই)

অর্থাৎ, ৪৮ কোটি টাকার ভিতর ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে কৃষির তথাকথিত উন্নতি ও যোগাযোগের জন্য। লৌহশিল্প প্রভৃতির কোন কথাই নাই।

কাজেই, জনাব ফজলুর রহমানের 'সাতশালা' পরিকল্পনা, কিংবা জনাব লিয়াকত আলির 'দশশালা' পরিকল্পনা কিংবা উন্নয়ন বোর্ডের 'পাঁচশালা' পরিকল্পনা এই সব 'শিল্পোন্নতি' পরিকল্পনা একই রাস্তায় চলিয়াছে। ইহা হইল, পাকিস্তানকে অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে মার্কিন ধনকুবেরদের উপনিবেশ করিয়া রাখা।

হারুন-ইস্পাহানী-দাদার স্বার্থে লীগ সরকারের আমেরিকার ধনকুবেরদের নিকট আত্মসমর্পণের ইহাই হইল জঘন্য পরিণতি। পাকিস্তানের ধনিকগোষ্ঠী আশা করিতেছে—আমেরিকার সাহায্যে তাহারা কৃষিতে মূলধন নিয়োগ করিয়া মুনাফা করিবে।

ধনীর স্বার্থে জনগণকে কোরবানি

ইঙ্গ-মার্কিন ধনকুবেরদের 'সাহায্যে' এখানকার হারুন-ইস্পাহানী-দাদা প্রভৃতি ধনিকগণ যদিও বা দু'চারটি হাল্কা শিল্প গড়িয়া তোলে তাহা হইলেও জনগণের দুঃখের কোন আসান হইবে না। লীগ সরকারের নীতি অনুসারে শিল্প জাতীয় করণ হইবে না। ব্যক্তিগত মুনাফার খাতিরে মজুরের অকথ্য শোষণ চলিতেই থাকিবে। মুদ্রাস্ফীতিও চলিতেই থাকিবে। মালিকের মুনাফার জন্য পণ্যের দামও কমিবে না। জনগণের ভাগ্যে কম পয়সায় জিনিস জুটিবে না। জনগণকে লুট করিয়া মুষ্টিমেয় ধনিকই হইবে আরো ধনিক।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, পাকিস্তান সরকার 'কৃষির উন্নতির' যে প্ল্যান করিয়াছে, তাহাতে ত দেশের উন্নতি হইবে। লোকে খাদ্য পাইবে

এই আশাও মিথ্যা। কৃষির আসল উন্নতি করিয়া দেশের লোককে খাদ্য দেওয়ার কোন ইচ্ছাই যে লীগ সরকারের নাই তাহা সরকারের 'জমিদারী ক্রয় বিল' হইতেই প্রমাণিত হয়। কৃষির উন্নতির ও খাদ্য পাওয়ার মূল কথা হইল—খোদ চাষীর হাতে জমি। কিন্তু জমিদারী ক্রয় বিলে ধনীদের স্বার্থে গরীব কৃষক সমাজকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

লীগ সরকারের 'কৃষি উন্নতির' পরিকল্পনা যদি কোনদিন কার্য্যে পরিণত হয়ও, তাহা হইলেও ধনীদের ব্যক্তিগত মালিকানাতেই সেই 'উন্নতি' করা হইবে। 'উন্নতির' ফলস্বরূপ ধনী কৃষক ও জোতদারদের গোলার ধান বাড়িবে, আরও লাখ লাখ কৃষক ক্ষেতমজুর হইবে বা ধান-চাউলের দাম চড়া থাকিয়া লোকের অনাহার বৃদ্ধি পাইবে।

শিল্পের উন্নতির বদলে অবনতি

সর্ব্বশেষে, লীগ শাসনের আমলে ধনিক জমিদারদের শোষণে ও অত্যাচারে আজ পূর্ব্ববঙ্গের ও সারা পাকিস্তানের জনগণের ক্রয় শক্তি যে ভাবে কমিয়া গিয়াছে তাহাতে এখানে দু'চারটা হাল্কা শিল্প গড়িয়া উঠিলেও তাহার পণ্য চড়া দামের জন্য বাজারে কাটতি হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গে যে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে—এই বস্ত্র সংকটের সময়েও তাহার উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। কাপড়েরু চড়া দামের জন্য কাপড় গুদামে জমা হইতেছে। তখন উৎপাদন কমানোর জন্য মালিকগণ তাঁত বন্ধ করিয়া মজুর ছাঁটাই করিতেছে। এই ভাবেই ঢাকেশ্বরী ১নং মিলে ৭১২খানা তাঁতের ভিতর এখন ১৫০ হইতে ২০০ তাঁত বন্ধ থাকে। ২নং মিলে ৫০০ তাঁতের ভিতর প্রায়ই অর্দ্ধেক তাঁত বন্ধ থাকে। ঢাকা কটন মিলের কর্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছে যে, তাহারা বয়ন বিভাগ তুলিয়াই দিবে এবং তাহারা আমেরিকা হইতে আমদানী সূতা ব্যবহার করিবে। কেন না, আমেরিকার সূতার দাম কম। এই ভাবেই, পাকিস্তানে শিল্পের উন্নতির বদলে শিল্পের অবনতি ঘটিতেছে। তাহার ফলে মজুর ছাঁটাই হইতেছে। গত দুই বছরে সূতাকলগুলিতে

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

...উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ

...গ্রাম ভস্মীভূত

নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার দমননীতি

...দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর নিজেদের ভাঙ্গা কুড়ে ঘরে অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন। এই অবস্থায় লালঝাণ্ডার হাত হইতে "পাকিস্তানকে রক্ষা করার" জন্য রাইফেল ব্রেনগানে সজ্জিত লীগ সরকারের ফৌজ সেই ঘুমন্ত গ্রামখানিতে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া বেপরোয়া গুলি চালাইতে চালাইতে হামলা করে। অবিরত গুলির শব্দে গরীব জনসাধারণের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকে। মাতা নিজের শিশুকে বুকে করিয়া সেই উন্মত্ত ফৌজের গুলি হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। গুলি চলিতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টির মত।

সেই ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা যান দুইজন নারী সহ :

১। নীলমণি
২। জার্মানী
৩। রবীন্দ্র সরকার
৪। মহেন্দ্র সরকার
৫। কার্ত্তিক সরকার

ইহারা সবাই পাশের গ্রাম বটতলার অধিবাসী। জানুয়ারী মাসে বটতলা গ্রামে ফৌজের হামলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া ইহারা জাগীরতলা গ্রামে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া এবার গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছেন। আরও মারা যান জাগীরপাড়া গ্রামের—

৬। অনন্ত সরকার
৭। আমীন সরকার
৮। রামেশ্বর সরকার
৯। বৈদ্যনাথ সরকার।

গুলিতে আহত হইয়াছেন—

(১) সতাই মনি—তাঁহার পিঠে গুলি লাগিয়া বুক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বামী-পুত্র অনন্ত হাজং ও আমীন হাজং ঘটনাস্থলেই মারা গিয়াছেন।

(২) কালীমনি ৩ বছরের ছেলে গায়ে গুলিবিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) ঈশ্বর সরকার—তাঁহার গলায় গুলি লাগিয়াছে।

(৪) রামন হাজং—মাথায় ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হইয়াছেন।

কয়েকজন কৃষক নারীকে শিশু-পুত্র সহ গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে। গ্রামটিকে আগুনে পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতিবাদ করুন

কৃষক সভার বিবৃতি

...আন্দোলনের উপর নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার এই নৃশংস দমননীতির বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র সভা, শোভাযাত্রা, ধর্ম্মঘট ইত্যাদি দ্বারা তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমরা পূর্ব্ব বঙ্গের কৃষক সমিতির সব ইউনিটকে, কৃষক সমাজকে এবং মজুর ভাইগণকে ও সব গণতান্ত্রিক জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছি। দাবী করুন যে, ময়মনসিংহের উত্তর অঞ্চলের কৃষকদের দাবী পূরণ করা হউক, সেখান হইতে সব ফৌজ ও সশস্ত্র পুলিস অপসারণ করা হউক, যাহারা ঐসব হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাহাদের শাস্তি বিধান করা হউক, ফৌজের হামলাতে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক। সব ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হউক এবং নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করুক।

২৮শে আগস্ট

রেল ও ডাক কর্ম্মচারীদের কাছে সোস্যালিষ্ট জয়প্রকাশ নাজেহাল হইয়া পলাতক

দাবি ও আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লড়াই

৯ই মার্চ্চের রেল এবং ডাক-তার ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার শ্রেষ্ঠ দালাল সোস্যালিস্ট জয়প্রকাশ এবার কলিকাতায় রেল এবং ডাক তার কর্ম্মচারীদের হাতে বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব পাইয়াছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণকে ২২শে আগস্ট ই-আই-আর রেলের কেন্দ্রীয় দপ্তর ফেয়ার্লি প্লেসের এবং ১৮ই আগস্ট ডাক-তার কর্ম্মচারীদের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মিটিং হইতে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। দু'জায়গাতেই রেল ও ডাক-তার কর্ম্মচারীরা জয়প্রকাশের বিশ্বাসঘাতকতার মুখোস টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং আওয়াজ তোলে, "জয়প্রকাশ দালাল হায়।"

২২শে আগস্ট সোমবার ১টার সময় জয়প্রকাশ ফেয়ারলি প্লেসের রেল কর্ম্মচারীদের মিটিং ডাকেন। দোতলায় জেনারেল ম্যানেজারের ঘরের সামনে মাইক বসানো হয়, হিটলারী কায়দার উপর হইতে জয়প্রকাশ বক্তৃতা করিবেন আর নীচে হইতে কর্ম্মচারীরা সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিবে! যাই হোক, নীচে এক হাজার কর্ম্মচারী অপেক্ষা করিতে থাকে, কিন্তু জয়প্রকাশের দেখা নাই। কারণ জয়প্রকাশ জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে 'লাঞ্চ' খাইতে গিয়াছেন। কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ বাড়িতে থাকে। অবশেষে জয়প্রকাশ উদিত হইলেন। উপর তলার সঙ্গে নীচের তলার সংঘর্ষ সুরু হইল। উপর হইতে উপরওয়ালাদের দালালরা মাইক যোগে স্লোগান দিতে লাগিল, "এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।" আর নীচের জনতা ইহার প্রত্যুত্তরে আওয়াজ তুলিল, "এ-আই-আর-এফ মুর্দ্দাবাদ।"

এটাওটা বলার পরে জয়প্রকাশ বলিলেন, "আমাদের অনেক দাবীদাওয়াই মিটে নাই, তবে কিছু কিছু মিটেছে...."

নীচে হইতে প্রশ্ন উঠিল, "কী মিটেছে বলুন।" জয়প্রকাশ এড়াইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি এখন তার কিছুই বলতে পারব না। তবে আমার রেলের ম্যানেজারের সঙ্গে সন্তোষজনক (!) আলোচনা হয়েছে।

"কি আলোচনা হয়েছে বলুন।"

"সে আমি বলতে পারব না, তোমাদের যা খুশী আমাকে বলতে পারো। এক সঙ্গে সব দাবী পাওয়া যাবে না, এ-জন্য এক সঙ্গে চেষ্টাও করা যাবে না। আস্তে আস্তে দাবী মিটবে।"

জয়প্রকাশের এম্বিধি কথায় কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ বাড়িতে থাকে। তখন জয়প্রকাশ রাগের চোটে হিন্দী ছাড়িয়া ইংরেজী ঝাড়িতে সুরু করেন, বলেন, "তোমরা খুশী হলে এ-আই-আর-এফের বিরুদ্ধে আলাদা সংগঠন করতে পারো।"

অমনি নীচে হইতে বিক্ষুব্ধ কর্ম্মচারীরা উত্তর দেয়, "উই স্যাল আকসেট ইয়োর চ্যালেঞ্জ—আমরা তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলাম।

জয়প্রকাশ দেখিলেন তিনি একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই নরম সুরে এবার আরম্ভ করিলেন, "দেখো, এ-আই-আর-এফ এতদিনের পুরানো সংগঠন, শীঘ্রই তার সিলভার জুবিলি হইবে...."

একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী চিৎকার করিয়া বলেন, "জয়প্রকাশ দালাল হায়।"

জয়প্রকাশ আর বেশী কথা না বলিয়া বিক্ষুব্ধ কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে (অর্থাৎ দোতলায় মাইকের সামনে হইতে) সরিয়া পড়েন।

রেল কর্ম্মচারীরা জয়প্রকাশের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছেন। সংগ্রামবিরোধী এ-আই আর-এফের স্বরূপ চিনিতে আর তাঁহাদের বাকী নাই, তাহারা সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় রেল কনভেনশনে নূতন সংগ্রামী নিখিল ভারত রেল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবেন।

* * *

অনেক সলাপরামর্শের পর জয়প্রকাশ গত ১৮ই আগস্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ডাক-তার শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভা ডাকেন। এই সভায় আসিয়াছিলেন, গত ৫ মাস ধরিয়া যে পোস্টম্যান, প্যাকার প্রভৃতি শ্রমিকেরা "রিলিফ-প্রথা" মারফত ছাঁটাই হইয়াছেন, যে ঝাড়ুদার ভাইদের নিম্নতম বেতন এবং মাগ্‌গীভাতা হইতেও (৬৫ টাকা) ১১৲ টাকা করিয়া কাটা হইয়াছে, যে বীর শ্রমিকেরা বেতন, ভাতা, পাকা চাকুরী, কাজের ঘণ্টা হ্রাস প্রভৃতি দাবী লইয়া ৯ই মার্চ্চ হরতালের ডাক দেওয়ার ফলে কারাভোগ করিয়াছেন, সাসপেণ্ড-ছাঁটাই হইয়াছেন তাঁহারাও আসিয়াছেন।

দালাল জয়প্রকাশ এই সংগ্রামী শ্রমিকদের সামনে দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য হরতালের কথা উল্লেখ করিলেন না। তিনি ডাক-তার শ্রমিকের সংগ্রামী একতা ভাঙ্গার বর্ত্তমান সরকারী প্ল্যানকেই সমর্থন করিলেন। নেহরু সরকার নোটিস দিয়াছে, সারা ভারতে ডাক-তার শ্রমিকদের মধ্যে যে তথাকথিত ১৮টি সংগঠন আছে (সুবিধাবাদী নেতাদের আড্ডাখানা) তাহাদের মধ্যে হইতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া সরকার বাহাদুর নিজে একটা অর্গানাইজিং কমিটি করিয়া দিবে এবং সেই সরকারী অর্গানাইজিং কমিটি একটি তথাকথিত ফেডারেশন গঠন করিবে। সরকার নিজের সৃষ্ট সেই দালাল ফেডারেশনের সঙ্গে ডাক-তার শ্রমিকদের দাবী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবেন। সরকার ইহার নাম দিয়াছে, 'রি-আলায়েনমেণ্ট স্কীম।' ইহা স্পষ্টতই হিটলারী লেবার ফণ্ট গঠনের চেষ্টা। জয়প্রকাশ এই সরকারী স্কীমকেই সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, "সরকার আমাদের বিভেদ দেখিয়া বড়ই দুঃখ পাইতেছেন, সুতরাং রি-আলায়েনমেণ্ট স্কীম মারফত একটি সংগঠনে "ঐক্যবদ্ধ" হও! ইহাতে সরকারের অনুমোদিত নেতারা ৩ মাস ৬ মাস অন্তর আলাপ-আলোচনা করিয়া আমাদের দুঃখ দূর করিবে। তা ছাড়া, তোমরা কো-অপারেটিভ গঠন কর, এক টাকার জিনিস পাঁচ আনায় পাইবে। সকল সময় লড়াই করা যায় না, আপোষে দাবী আদায় করিতে হয়।"

জয়প্রকাশের এই নির্লজ্জ ধাপ্পাবাজীতে সভার সাধারণ কর্ম্মচারীরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। জয়প্রকাশের নিজের পোস্টম্যান ইউনিয়নের একজন ছাঁটাই নেতা কিছু বলিতে চাহিলে তাহাকে কয়েকজন দালাল ঘাড়ে ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করে। এই গোলমালের মধ্যে জয়প্রকাশ নাজেহাল হইয়া পলায়ন করিলেন। সভার উদ্যোক্তারাও সভা ভঙ্গ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। দালালরা মার খাইল। সাধারণ কর্ম্মচারীরা 'জয়প্রকাশ দালাল হায়' 'দালালকো হালাল কর' ধ্বনি দিতে দিতে ফিরিলেন।

রেল এবং ডাক-তার কর্ম্মচারী দালাল জয়প্রকাশের সমুচিত জবাব দিয়াছে, তাহারা শক্তি-সংগ্রামী সংগঠন গড়ার পথে জয়প্রকাশমার্কা দালাল সংগঠনকে নিঃশ্চিহ্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

ময়মনসিংহে জনগণের উপর গুলিবর্ষণ

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

ফৌজের দল কৃষকদের গরু-বাছুর সব কিছু নিয়া গিয়াছে।

* * *

নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার দমননীতি আজ হিটলারী পাশবিকতাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। নিরস্ত্র ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের উপর এই সশস্ত্র হামলা ও ৯ জন নরনারীর জীবননাশের ভিতর দিয়া লীগ শাসনের সব কদর্য্যতাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই নৃশংস ঘটনাতে চারিদিকে বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। খাজনার আন্দোলন এখন আরও ছড়াইয়া পড়িতেছে।

পাকিস্তানে 'শিল্পোন্নতি'র নামে আমেরিকার দাসত্ব

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

প্রায় ৩ হাজার মজুর ছাঁটাই হইয়াছে। লীগ সরকারের 'শিল্পোন্নতি' ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ইহাতে ধনবাদী শিক্ষপ্রথার ক্রমবর্দ্ধমান সংকট আজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই সংকটের বিষচক্র হইতে লীগ সরকারের ধনবাদী শিল্পনীতির রেহাই নাই। ইহা ব্যর্থ। ইহাতে কোন শিল্পোন্নতি না হইয়া সংকট আরও বৃদ্ধি পাইবে।

আমেরিকার নিকট বিশ্বস্ততা প্রমাণ

লীগ সরকার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের হাতে দেশের ঐশ্বর্য্য সম্পিয়া ও ধনিকদের ব্যক্তিগত মুনাফা করার অবাধ সুযোগ দিয়া ধনবাদী প্রথায় যে 'শিল্পোন্নতির' পথ ধরিয়াছেন—দেশের শিল্পের আসল উন্নতির সব পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মজুরের ভাগ্যে জুটিতেছে বেকারী ও জনগণের ভাগ্যে জুটিতেছে সীমাহীন দুঃখ ও গোলামী।

এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার নামকরণ হইয়াছে 'পাকিস্তান গড়া'। এই ঘৃণ্য ধনবাদী ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্যই আজ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনের উপর কঠোর দমননীতি চালনা করা হইতেছে। দমননীতি দ্বারা দেশে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া লীগ সরকার আমেরিকার প্রভুদের নিকট তাহাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করিতেছে। এই বিশ্বস্ততার প্রমাণ স্বরূপেই জনাব ফজলুর রহমান ১৩ই আগস্ট করাচীতে মার্কিন 'পর্য্যটকদের' এই সভায় বলিয়াছেন "যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিগণ যে ধরনের আবহাওয়া চান আমরা পাকিস্তানে প্রকৃত পক্ষে তাহাই সৃষ্টি করিয়াছি.....।"

[ইত্তেহাদ-১৪ই আগস্ট]

সমাজ তন্ত্রই শিল্পোন্নতির পথ

কিন্তু, ধনীর স্বার্থরক্ষক লীগ শাসকশ্রেণী ট্রুম্যানের নিকট তাহাদের বিশ্বস্ততার যত প্রমাণই দিক না কেন, তাহারা যত দমননীতিই চালু করুক না কেন, তাহাদের 'শিল্পনীতির' চূড়ান্ত ব্যর্থতা আজ জনগণের চোখে উলঙ্গভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। দুনিয়ার ধনবাদের সংকটও আজ জনগণের চোখে ফুটিয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে পূর্ব্ববঙ্গের জনগণ আজ মহান সোভিয়েটের সমাজতন্ত্র হইতে সাম্যবাদের পথে শিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা দেখিতেছে যে, পূর্ব্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলি ধনবাদকে চুরমার করিয়া সোভিয়েটের সাহায্যে দ্রুতগতিতে দেশকে শিল্পে উন্নত করিতেছে। তাহারা দেখিতেছে যে, চীনে আমেরিকার দালাল আজ ধরাশায়ী। সারা দুনিয়াতেই আজ ধনবাদী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ধনবাদী শোষণের অবসান করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্রের পথেই পাকিস্তানের শিল্পোন্নতি সম্ভব।

এই আদর্শে আজ পূর্ব্ববঙ্গের জনগণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারাই লীগ সরকারের আমেরিকার দাসত্বের নীতি ব্যর্থ করিয়া দিবে!

মঞ্জিল

১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ

১৫ই আগস্ট—নেহরু সরকারের 'স্বাধীনতা দিবসকে' সারাপশ্চিম বাংলার শ্রমিক ও অশ্রমিক মেহনতকারী জনতা, এমনকি কংগ্রেসী অন্ধকারায় বন্দীরা পর্য্যন্ত কংগ্রেসী ধনিক নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে জঙ্গী প্রতিবাদ দিবস রূপে প্রতিপালন করিয়াছে। ঐ দিবসে কলিকাতা ও শহরতলীতে গণবিক্ষোভের সংবাদ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পরে প্রাপ্ত সংবাদ দেখা যায় যে, ঐদিন বাঁকুড়ার বাহাদুর খনি শ্রমিকদের নেতৃত্বে শহরে সমস্ত শ্রমিকের সাধারণ ধর্ম্মঘট হয়। বর্দ্ধমানে রিক্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৬০০০ জনতার সভা ও শোভাযাত্রা হয়। শিবপুরে শ্রমিকরা, ছাত্র ও অন্যান্যদের সহিত মিলিয়া বিক্ষোভ মিছিল করেন।

নেহরু সরকার ডাক দিয়াছিল 'উপযুক্ত শৃংখলা ও গাম্ভীর্য্যে'র সহিত ১৫ই আগস্ট পালন কর। বিধান মন্ত্রিসভার সশস্ত্র বাহিনী ঐদিন বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে কৃষক রমণীদের উপর গুলি চালাইয়া তিন জন কৃষক রমণীর প্রাণ নিয়া, বুড়ুলে শোভাযাত্রীদের উপর গুলি চালাইয়া 'উপযুক্ত শৃংখলা' রক্ষার উদাহরণ দেখাইয়াছে। কংগ্রেসের সভায় কেহ আসিতেছে না বুঝিয়া, আসানসোলের কংগ্রেসীরা ১৫ই আগস্ট বাইজিনাচের ব্যবস্থা করিয়া 'উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের' আবহাওয়া সৃষ্ট করিয়াছে।

১৫ই আগস্টের কয়েকদিন পূর্ব্বেই পণ্ডিত নেহরু সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন—পশ্চিম বাংলার অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে, জনসাধারণই সেখানে শান্তিরক্ষার ভার হাতে তুলিয়া লইয়াছে। ১৫ই আগস্ট হাওড়ার মুগকল্যাণে শোভাযাত্রীদের উপর লোহার ডাণ্ডা চালাইয়া একজন মহিলাসহ কয়েকজনকে গুরুতরভাবে আহত করিয়া, বাগনান মাল্লিকপুর, আসানসোল প্রভৃতি একাধিক স্থানে শোভাযাত্রীদের উপর হামলা করিয়া কংগ্রেসী গুণ্ডারা পণ্ডিতজীর মুখ রক্ষা করিয়াছে। আর-এস-পি দলের নেতারা ৯ই আগস্টের পর, কংগ্রেসীদের সহিত গলামিলাইয়া 'কমিউনিস্ট গুণ্ডামী' সম্পর্কে প্রাণপণ প্রচার চালাইতেছিলেন, ১৫ই আগস্ট হাওড়া ময়দানে তাহাদের ছাত্রসভাও কংগ্রেসী আই-এন-টি-ইউ-সি'র গুণ্ডারা সদলবলে আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, কয়েকজনকে আহত করিয়াছে।

বাঁকুড়া শহরে সাধারণ শ্রমিক ধর্ম্মঘট

১৩ই আগস্ট হইতে প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং শহরের তিনদিকে নদীতে বান হওয়া সত্ত্বেও ১৪ই আগস্ট তিনশত মজুরের জঙ্গী শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং ৫ শত জনতার সমাবেশে পরদিন সাধারণ ধর্ম্মঘটের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৫ই আগস্ট বিড়ি কারখানাগুলি সম্পূর্ণ ধর্ম্মঘট করে, রিক্সা, তেলকল, গাড়োয়ান, মুটে, কামিন প্রভৃতি মজুররাও ধর্ম্মঘট করেন। বেলা ৫টায় শ্রমিকদের শোভাযাত্রা সারা শহর ঘুরিয়া কালীতলা ময়দানে সভা করে এবং কংগ্রেসী বিধান মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করার সংকল্প লইয়া এক সভা হয়।

কংগ্রেসের 'উৎসব' হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়। সারা শহরে মাত্র কয়েকটি বড় বড় ধনী ও চোরাকারবারীদের গৃহে এবং জেলা হাকিম ও সরকারী কুঠিতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িতে দেখা যায়। সকালে ও বিকালে দুইবার কংগ্রেসীরা ১০।১২ বছরের ১০।১৫ জন বালককে জুটাইয়া 'শোভাযাত্রা' করার চেটায় শহরে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। জনপ্রিয় কংগ্রেসীরা প্রকাশ্যে কোন সভা করিতে ভরসা না পাইয়া স্থানীয় ধর্ম্মশালার ভিতর কয়েকজনকে লইয়া বৈঠক করে।

তবে কংগ্রেসীরা না পারিলেও, কংগ্রেসী পুলিসের দল লরীতে করিয়া সারাদিন শহর টহল দিয়া 'স্বাধীনতা'র স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছে।

বর্দ্ধমানে শ্রমিক-ছাত্রের সভায় ৬ হাজার, কংগ্রেসের সভায় ১০জন

১৪ই আগস্ট জেলাছাত্র ফেডারেশনের তিনজন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া কংগ্রেসী-সরকার 'স্বাধীনতা' উৎসবের বোধন করে। কিন্তু পরদিনই জনতা তাহার প্রত্যুত্তর দেয় সারাদিন লাবঝাণ্ডা সজ্জিত গাড়ী হইতে মাইকযোগে শহরে কমনওয়েলথ মার্কা 'স্বাধীনতা'র স্বরূপ প্রকাশ করিয়া প্রচার চালান হয় বিকাল পাঁচটায় টাউনহলে জনসভা। হলে'র বাহিরে ময়দানে রিক্স ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রী সংঘ, ছাত্র কংগ্রেস, ফরোয়ার্ডব্লক প্রভৃতির উদ্যোগে বিরাট সভায় ৬০০০ জনতার সমাবেশ। বর্দ্ধমানে এত বড় সভা সম্প্রতি আর হয় নাই। হলের মধ্যে কংগ্রেসীদের সভায় ১০ জনও লোক হয় নাই। ময়দানে সভা চলিতে থাকা কালে জেলা কংগ্রেস সম্পাদকের অপপ্রচার এবং কয়েকজন কংগ্রেসী দালালের অপচেষ্টা সত্ত্বেও জনতা অটল থাকে। সভার বিভিন্ন প্রস্তাবে ভারতকে কমনওয়েলথের সহিত জড়িত করার প্রতিবাদ, ছাত্রফেডারেশন কর্ম্মীদের মুক্তি দাবী, পনাগড় ডিপো'র হাঁটাই শ্রমিকদের সমর্থন এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ দাবী করা হয়। সভাশেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা কংগ্রেস অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অফিসের বীরপুত্ররা অফিস ছাড়িয়া পলায়ন করে। শোভাযাত্রা কংগ্রেস বিরোধী ধ্বনি দিয়া সারা শহর প্রদক্ষিণ করে।

বুড়ুলে ক্ষেতমজুর শোভাযাত্রার উপর গুলি

বজবজ থানার বুড়ুল ও তাহার আশেপাশের ব্যাপক অঞ্চলে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের জোয়ার জাগিয়াছে। জমিদার-ধনী কৃষকদের দ্বারা শোষণের 'স্বাধীনতা' রক্ষা করার জন্য ১৫ই আগস্টের কিছুদিন আগে হইতেই সেখানে কংগ্রেসী পুলিসের ক্যাম্প বসিয়াছে এবং 'যথাযথ' কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। তবুও ছোটলোক ক্ষেতমজুর-গরীবের দল দমেও না, আজাদীর মহিমাও বোঝে না! ১৫ই আগস্ট তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা ও মানুষের মত বাঁচিবার অধিকারের দাবীতে ৫০০।৬০০ লোকের এক শোভাযাত্রা লইয়া বুড়ুল হাটের দিকে অগ্রসর হয়। পুলিস আসিয়া বাধা দেয় এবং মিছিল ভাঙ্গিয়া দিতে হুকুম দেয়। মিছিলের আগে ছিলেন লালঝাণ্ডা হাতে ৫০ বছরের প্রৌঢ়া কৃষক নেত্রী রেবতী দাসী। তিনি গত ১৪ই জুলাই পুলিসের সহিত হাঙ্গামার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। জামিনে ছাড়া পাইয়াই আসিয়াছেন গরীব কৃষক ভাইদের কংগ্রেসী স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝাইতে। পুলিস তাঁহাকে বলিল—আবার এসেছিস বুড়ি, যা ফিরে যা। রেবতী দাসী উত্তর দেন—ফিরে কোথায় যাব? আমার ঘর ভেঙ্গেছে, জিনিসপত্র তছনছ করেছে, যা দুমুঠো খাবার ছিল তাও মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। আজ তোমরা জয়ঢাক বাজিয়ে স্বাধীনতা করছো; আর আমরা আমাদের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ব্যক্ত করছি।

পুলিস রেবতী দাসীকে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে শোভাযাত্রাকারীদের আরও ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং জনতা প্রতিবাদ করিলে তাহাদের উপর গুলি ছোঁড়া হয়।

পুলিসের এই কার্য্যকলাপের ফলে স্থানীয় কংগ্রেসীদের মনে উৎসাহ সঞ্চার হয়। সকালে তাহারা ক্ষেতমজুর-কৃষকদের মিছিলের আওয়াজ পাইয়াই গৃহের উপর, হইতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নামাইয়া ফেলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর তাহারা জয়ঢাক বাজাইয়া, লাঠি, বল্লম, শড়কী লইয়া বোধ হয় নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিচালনার আনন্দ উৎসব করিবার জন্যই মিছিল বাহির করে। কিন্তু কিছুদূর না যাইতেই কৃষক নওজোয়ানদের আওয়াজ শুনিয়া তাড়াতাড়ি জয়ঢাক বাজান বন্ধ করিয়া চুপিচুপি সরিয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে ১৫০ জন সশস্ত্র পুলিস সমগ্র এলাকা গ্রামে গ্রামে, বাড়িতে বাড়ীতে কংগ্রেসী স্বাধীনতার 'বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

কংগ্রেসী সভা জনতার দখলে

ডায়মণ্ডহারবার খাদিপন্থী কংগ্রেসের প্রাচীন ও শক্ত ঘাঁটি বলিয়া পরিচিত। সেখানে সিনেমা হলে কংগ্রেসীদের ১৫ই আগস্টের সভা। সভার মধ্য হইতে ছাত্রফেডারেশনের একজন কর্ম্মী উঠিয়া কিছু বলিতে চায় এবং সভাপতি মুখ রক্ষার জন্য অনুমতি দেন। ছাত্রটি বক্তৃতা সুরু করা মাত্র কংগ্রেসীদের একদল 'কমিউনিস্ট' 'কমিউনিস্ট' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে এবং একদল ছাত্র কর্ম্মীটিকে আক্রমণ করে। কিন্তু সভার শ্রোতারা পাল্টা চীৎকার করিতে থাকেন—ওকে বলতে দিতে হবে। বেগতিক দেখিয়া কংগ্রেসী সভাপতি মহাশয় সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া সরিয়া পড়েন। কিন্তু সভা ভাঙ্গে না, শ্রোতারা আধঘণ্টা পর্য্যন্ত ছাত্রকর্ম্মীটির বক্তৃতা শোনে। তারপর সেই সভাস্থল হইতেই এক শোভাযাত্রা বিভিন্ন কংগ্রেসবিরোধী ধ্বনি দিয়া শহরের রাস্তা ঘোরে এবং থানার সম্মুখ পর্য্যন্ত যায়।

বসিরহাটে ঃ কংগ্রেস কমিটির ডাকা সভারও অনুরূপ রূপান্তর ঘটে। সভাপতির বক্তৃতার পর ছাত্রীসংঘের একজন কর্ম্মী বক্তৃতা করার দাবী করে এবং সেই দাবী আদায় করে। ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতার স্বরূপ এবং কংগ্রেসী কুশাসনের বর্ণনা দিয়া ছাত্রটির বক্তৃতায় সভায় বারবার করতালি শোনা যায়। তাহার পর একজন কংগ্রেস নেতা বক্তৃতা করিতে উঠিলে জনতার ধিক্কারে তিনি বসিয়া পড়িতে বাধ্য হন। সভাপতি মহাশয় অগত্যা সভা ভঙ্গ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন।

কমনওয়েলথ গোলামীর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও ছাত্র ধর্ম্মঘট

কংগ্রেসী অন্ধকারায়ও

প্রেসিডেন্সী জেলে—শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-কর্ম্মচারী আন্দোলনের বন্দী নেতারা ১৫ই আগস্ট সকালে জেলের মধ্যেই সভা করেন এবং সেখানে কংগ্রেসী ঝাণ্ডা পুড়াইয়া লালঝাণ্ডা উড়াইয়া দেন।

আর তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ায় প্রথম ডিভিসন কয়েদীরা অর্থাৎ বড়লোক বদমায়েসরা। তাহাদের উত্তরে **সাধারণ** ৩য় শ্রেণীর কয়েদীদের একটা ব্যারাকের জানলা হইতে কৃষ্ণ পতাকা উড়িতে দেখা যায়। বিকালে রাজনৈতিক বন্দীরা আবার সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

দমদম জেলে—রাজনৈতিক বন্দীরা ঐদিন সকালে কৃষ্ণপতাকা লইয়া মিছিল এবং সভা করেন। জেল কর্তৃপক্ষ সাধারণ কয়েদীদের একাংশকে প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় নাই।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ১৫ই আগস্ট সরকার-বিরোধী সভা করার 'অপরাধে' পরদিন হইতে প্রেসিডেন্সী

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতিবাদী সভা ও শোভাযাত্রার উপর কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হামলা

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের খবরের কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও কাড়িয়া লইবার সম্ভাবনা আছে।

আসানসোল ও বার্নপুর

বার্নপুরের লোহাকারখানা আই-এন-টি-ইউ-সি'র জঁাদরেল ঘাঁটি, কংগ্রেসীদের 'দুর্গ' বলিয়া প্রচার শোনা যায়। গত বৎসরও' ১৫ই আগস্ট সাধারণ স্টাফ নিজেরা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়া 'স্বাধীনতা' উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার কংগ্রেসীরা চাঁদা চাহিতে গেলে প্রবল বাধা পায়। তখন তাহারা **কোম্পানীর অফিসার ও দালালদের সামনে** সাধারণ সভায় ভোট নেয়, অর্থাৎ হয় আজাদীর চাঁদা দাও নয়ত চাকুরী বলি দাও। এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত শ্রমিকের প্রায় অর্দ্ধেক চাঁদা দেওয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়। অফিসারদের ভয়ে যাহারা সভায় ভোটও দেয়, তাহাদেরও অনেকে পরে চাঁদা দেয় না। ওয়াগন কারখানার এক দালাল শ্রমিকদের এই 'বেয়াদবীতে' চটিয়া গিয়া জবরদস্তি চাঁদা আদায়ের ভয় দেখায়, তৎক্ষণাৎ সমস্ত শ্রমিক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া জবরদস্তি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করে।

তবে কোম্পানীর সাহেবরা সমস্ত অফিসে, খনিতে এবং নিজেদের কুঠিতে নিষ্ঠাসহকারে পতাকা উত্তোলন করে।

বার্নপুরের কারখানার ভিতর 'স্বাধীনতা' দিবস উপলক্ষে বাইজি নাচের ব্যবস্থা করিয়া লোক আকর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আসানসোলের রেলপারেও বাইজি নাচের ব্যবস্থা হয়।

বহুদিন পর, ১৫ই আগস্ট কয়লাখনি অঞ্চলে লালঝাণ্ডার শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রমিক শোভাযাত্রা বিভিন্ন কোলিয়ারী ঘুরিয়া ৭।৮ নং-এ পৌঁছিলে জাতীয় টি-ই'উর দালালরা হামলা করার চেষ্টা করে, কিন্তু শোভাযাত্রা রুখিতে পারে না।

রেল-পথের ইউনিয়ন অফিস, অণ্ডাল প্রভৃতি স্থানেও কংগ্রেসী গুণ্ডারা শ্রমিক সভার উপর হামলা করে।

শিবপুরে বিরাট শ্রমিক-ছাত্র-নাগরিক শোভাযাত্রা

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এক বিরাট শোভাযাত্রা বিধান-মন্ত্রিসভাবিরোধী ধ্বনি দিয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে এবং পথসভা করে। শহরের বহু গৃহে কৃষ্ণপতাকা উড়িতে দেখা যায়।

বাগনানে—থানার নিকট রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝাঁটা, জুতা ঝুলিতে দেখা যায়। পরে একটি শোভাযাত্রা কৃষ্ণপতাকা লইয়া সারা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। এই সময় একদল কংগ্রেসী গুণ্ডা শোভাযাত্রীদের উপর আক্রমণ করে, ফলে দুই জন গুরুতররূপে আহত হয়। আশেপাশের একাধিক গ্রামেও ঐদিন কংগ্রেস-বিরোধী বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা ও সভা হয়।

২৪পরগনা

যাদবপুরে—ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সকালে মিত্রিপাড়া মাঠে শ্রমিক-ছাত্র-বাস্তহারা ও জনসাধারণের এক সভায় লালঝাণ্ডা তোলা হয় এবং পরে কংগ্রেসী কুশাসনের প্রতিবাদস্বরূপ কৃষ্ণপতাকা লইয়া শোভাযাত্রা যাদবপুর, গরচা ও গড়িয়াহাটা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। সভায় কমনওয়েলথ চুক্তির বিরুদ্ধে, বন্দীমুক্তি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বারুইপুর—গত ১৫ই আগস্ট বারুইপুর থানা এলাকায় কৃষক সমিতি কর্তৃক কমনওয়েলথ বিরোধী দিবস প্রতিপালিত হয়। অতি প্রত্যূষে ১ শত কৃষক ও স্থানীয় জনসাধারণের একটি মিছিল বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে গ্রামের সমস্ত রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে।

জয়নগর-মজিলপুর—গত ১৫ই আগস্ট সকাল ৭টায় জয়নগর থানা ও মন্দির বাজার থানায় ক্ষেতমজুর সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও গণনাট্য সঙ্ঘের যুক্ত উদ্যোগে আড়াই শতাধিক ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, রিক্সা-চালক, ছাত্র ও শিল্পীদের এক শোভাযাত্রা দীর্ঘ ছয় মাইল পথ পরিভ্রমণ করে। শোভাযাত্রাটী সাউথ বিষ্ণুপুর হইতে বাহির হইয়া জয়নগর-মজিলপুর হইয়া বহরু গ্রামের প্রান্তে সমাপ্ত হয়। এই শোভাযাত্রাকে জনসাধারণ বিপুল উৎসাহের সহিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। শোভাযাত্রার অন্যান্য ধ্বনির সহিত "রাজবন্দীদের মুক্তি" দাবী করা হয়।

বেহালা—ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্রী সঙ্ঘের উদ্যোগে ১৫ই আগস্টের ভুয়া স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সকালে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ও মজুর কালো পতাকা সহকারে সমগ্র বেহালা ও সাপুর এলাকা পরিভ্রমণ করে। মিছিলের পর সাপুর বাস্তহারা ক্যাম্পে একটি সভা হয়। বৈকালে একটি মজুর ও ছাত্রের মিছিল রক্তপতাকা সহকারে মহম্মদ আলী পার্কে বি, পি, টি, ইউ, সি'এর সভায় যোগদান করে।

মল্লিকপুর—গত ১৫ই আগস্ট তারিখে স্থানীয় গণনাট্য সংঘ ও ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক কমনওয়েলথবিরোধী দিবস প্রতিপালিত হয়। দেড়শত ছাত্র-ছাত্রী ও গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যগণ যখন একটি শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামের সমস্ত রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করিয়া সভাস্থলের দিকে আসিতেছিল তখন হঠাৎ কয়েকজন খদ্দরের টুপি পরিহিত ব্যক্তি অতর্কিতে শোভাযাত্রাকারীদের উপর আক্রমণ চোলায় এবং তাহাদের হাত হইতে কালো ফ্লাগগুলি ছিনাইয়া লয়। এই সময় স্থানীয় হরিহরপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, সভাপতি ও গভ্যগণকে পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘরে পলায়ন করিতে দেখা যায়। সমস্ত শোভাযাত্রাকারীদের দৃঢ়তা দেখিয়া গুণ্ডারা পলায়ন করে।

অতঃপর শোভাযাত্রাকারীরা পুনরায় "কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কর" "কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ" ধ্বনি সহকারে গ্রামের সমস্ত রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করার পর স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যায়।

১৫ই আগস্ট **ভাটপাড়া** পাঁচমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্তা সরস্বতী দেবীর সভানেত্রীত্বে মাহিলা ও ছাত্রীদের একটি প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় প্রায় শতাধিক মহিলা ও ছাত্রী উপস্থিত ছিল; সভার শেষে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতা। টাটা-বিড়লার স্বাধীনতা ছাত্র-ছাত্রীদের মাহিনা বাড়ান চলিবেনা, ভাত কাপড় শিক্ষা দাও, নইলে গদী ছেড়ে দাও, ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রাটি সমস্ত এলাকা পরিভ্রমণ করে।

কয়েকখানা মূল গ্রন্থ—

* কমিউনিষ্ট ইশতেহার—মার্কস্ ও এঙ্গেলস্, দাম বার আনা।
* পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি—
  এঙ্গেলস্, দাম আড়াই টাকা।
* রাষ্ট্র ও বিপ্লব— লেনিন, দাম আড়াই টাকা।
* কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা লেনিন, দাম আট আনা।
* গ্রামের গীরবদের প্রতি লেনিন, দাম এক টাকা।
* ১৯০৫ সালের বিপ্লব লেনিন, দাম দশ আনা।
* সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস— দাম চার টাকা।
* অক্টোবর বিপ্লব— ষ্টালিন, দাম আট আনা।

* * * *

বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা

লজোভস্কি—দাম আট আনা

আজ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা, যখন বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে, বুর্জোয়া-সরকার শ্রমিকের বাঁচার লড়াইকে রাইফেলের মুখে মোকাবিলা করছে, যখন বুর্জোয়ার দালাল পোষাকুত্তারা শ্রমিকের ঐক্যকে ভেঙ্গে চুরমার করতে চাইছে, সেই অবস্থায় এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

নিউ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

ভারতীয় সংস্কৃতির বন্ধু সোভিয়েট

হউক এসিয়ার জনগণের সাংস্কৃতিক স্বার্থ থাকিতে পারে না।

জনগণের এসিয়া জাগিয়াছে

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এইসব তাঁবেদারদের বিরুদ্ধেই জনগণের এসিয়া চীনে, ভিয়েৎনামে, বর্ম্মায়, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায় সশস্ত্র লড়াইয়ের ময়দান হইতে নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতেছে; এসিয়ার অন্যান্য দেশের জনগণও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী সামন্তশোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভিতর দিয়া নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতেছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশী পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের ভিতর দিয়া সারা এসিয়ার জনগণের মৈত্রী ও ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিতেছে। সে লড়াইয়ে, সেই নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টির পথে, সোভিয়েট দেশই এসিয়ার জনগণের শ্রেষ্ঠ মিত্র। শোষণমুক্ত সমাজে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত সোভিয়েট দেশই সারা এসিয়ার আদর্শস্থল।

শোষণ মুক্তির ভিতর দিয়াই সেই সোভিয়েট দেশের নেতৃত্বে জনগণের এসিয়ার প্রকৃত ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, হইতেছে।

মঞ্জিলের নিয়মাবলী

(১) প্রতি রবিবার কাগজ বাহির হইবে। দাম তিন আনা।

(২) ১০ কপির কম এজেন্সী নাই। শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন।

(৩) গ্রাহকদের হার :—বার্ষিক ১০৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷৷০ টাকা।

অফিসের ঠিকানা

২৪নং নূর মহম্মদ লেন।
কলিকাতা (৯)

মঞ্জিল

ক্ষেতমজুর সম্মেলন উপলক্ষে ২০,০০০ মজুর-কৃষক-ছাত্র নাগরিকের জমায়েত

(১ম পৃষ্ঠায় পর)

দিতে হইবে, পুকুরে মাছ ধরা আর জঙ্গলে কাঠ কাটার অধিকার দিতে হইবে। পূজার কাপড় দিতে হইবে। তাহাদের যত দাবি আছে সব দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বলিলেন **—জমি লাভের সংগ্রাম তাহাদেরও সংগ্রাম। জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া সমস্ত শোষিত জনসাধারণের হাতে জমির মালিকানা দিতে হইবে।**

সম্মেলনে তাঁহারা প্রস্তাব লইলেন—

কারখানা শ্রমিকদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এখন হইতে তাঁহাদেরও সংগঠন হইল। এখন হইতে তাঁহাদের উভয়ের লড়াই একযোগে চলিবে।

কারখানা শ্রমিকদের উদ্যোগ

এমন সম্মেলন কেহ কখনো দেখে নাই। কলিকাতার নানা কারখানা হইতে হিন্দুস্থানী-বাঙালী সর্ব্বপ্রকার জঙ্গী বাহাদুর মজুরদের প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন ক্ষেতমজুরদের অভিনন্দন জানাইতে, সাহায্য করিতে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের শ্রীকুঞ্জবিহারী সিং হইলেন সম্মেলনের সভাপতি। তিনি নিজে শুধু একজন কারখানার শ্রমিকই নন, শ্রমিকদের নেতাও বটেন।

ক্ষেতমজুদের এই সম্মেলন যাহাতে ভালো হয় তার জন্য সবচেয়ে আগাইয়া-আসেন কলকারখানার শ্রমিকেরা। সম্মেলন পাহারা দিবার জন্য তাঁহারা দলে দলে ভলান্টিয়ার পাঠান। সম্মেলনের জন্য প্রায় এক হাজার টাকা উঠিয়াছে। এই টাকার অধিকাংশই শ্রমিক এলাকায় এক আনা দুই পয়সা করিয়া জোগাড় হইয়াছে, মোট গড় হিসাবে বলা যায় প্রায় ১৬০০০ হাজার শ্রমিক এইভাবে টাকা দিয়াছেন।

তাজা রক্তের ছাপ

তাঁহারা যাঁহাদের অভিনন্দন জানাইলেন, সেই ক্ষেতমজুরও কম শক্তিমান নন। গ্রামে গ্রামে জোতদার-জমিদার-মহাজন-ধনীরা তাঁহাদের দাপটে কাঁপিতে সুরু করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে শোষণ আর জুলুমের বাঁধন ছিঁড়িতে সুরু করিয়াছে। মরণের আগে কুকুর ক্ষেপিয়া যায়—তেমনি ক্ষেপিয়া গিয়া ধনীরা, জমিদাররা, কংগ্রেসীরা গাঁয়ে গাঁয়ে গুলির পর গুলি চালাইতেছে।

গুলি চলে নাই এমন জেলা নাই। এমন মাস যায় না, যখন গুলিতে কোথাও না কোথাও ক্ষেতমজুর আর গরীব চাষী প্রাণ না দিতেছেন।

২৫শে আগস্ট হইতে ২৭শে আগস্ট এই তিন দিন সম্মেলন চলে। সম্মেলন চলার মধ্যেই খবর আসিল মালদহে আর হাওড়ায় গুলি চলিয়াছে। মালদহে ক্ষেতমজুর সম্মেলন হইতেছিল। সম্মেলনের উপরেই পুলিস বন্দুক তোলে। হাওড়ার জলায় ক্ষেতমজুরেরা মাছ ধরিতে গিয়াছিল। পুলিস তাহাদের উপরেও রাইফেল চালাইয়াছে।

প্রতিনিধি যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা আসিয়াছেন খাস রণক্ষেত্র হইতে। তাঁহাদের অনেক সাথী এখনো পুলিস তাণ্ডবের বিরুদ্ধে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রতিরোধ ঘোষণা করিতেছেন। অনেক সাথী গাঁয়ের মাটিতে নিজ দেহের রক্ত ঢালিয়াছেন।

পুলিস ক্যাম্পের ফাঁদ এড়াইয়া, পুলিস সেবাদলের আক্রমণ ঠেকাইয়া, হাঁটিয়া আসিয়াছেন কাকদ্বীপের বীর প্রতিনিধিরা। অন্তস্বত্বা অহল্যার রক্তের ঝাঁঝ এখনো তাহাদের চোখে। কিন্তু হার সহিত জমিতে স্বত্ব আর দখল কায়েম রাখিতে চলিয়াছেন।

প্রতিনিধি আসিয়াছেন বাঁকুড়া হইতে। সাঁওতাল, লায়েক, বর্গক্ষত্রিয় ক্ষেতমজুরদের মধ্যে এখানে নূতন এক জমানা সুরু হইয়াছে। গড়বেতা আর বিষ্ণুপুরের লাল জংলা মাটিতে গরিব মেয়ে মরদেরা রক্ত দিতেছেন। কিন্তু দাবি ছাড়েন নাই, অধিকার ছাড়েন নাই। গাঁয়ে গাঁয়ে জোতদার, জমিদার, লাটদারেরা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

হুগলী, হাওড়া, বীরভূম মালদহ, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রত্যেকটি জেলা হইতে ধর্ম্মঘট গুলি আর পুলিস জুলুমের কাহিনী লইয়া আসিয়াছেন ক্ষেত আর দাঙ্গার সর্ব্বহারারা।

তাঁহাদের দেখিতে, তাহাদের অভিনন্দন জানাইতে প্রতিনিধি আসিয়াছেন পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে। পশ্চিম বাংলার মতই এখানকার কৃষকেরা দলে দলে লীগ সরকারের গুলিতে প্রাণ দিতেছেন। প্রতিনিধি আসিয়াছেন বিহার হইতে। বহু দূরের দেশ মধ্যভারত ইন্দোর হইতে, যুক্তপ্রদেশ হইতে। সারা ভারতবর্ষে যে লড়াই চলিতেছে, ইহারা তাহারই খবর লইয়া আসিয়াছেন।

সম্মেলনে তাঁহারা নিজেদের লড়াইয়ের কাহিনী বলিলেন। আর এই সমস্ত কাহিনী হইতে একটা নূতন কথা বোঝা গেল। বোঝা গেল, গ্রামে গ্রামে জমিদার, জোতদার, চোরাকারবারী, মহাজন, ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে এক নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিতেছে। **সে শক্তি হইতেছে ক্ষেতমজুরশ্রেণী। সে শক্তি হইতেছে তাহাদের সংগঠন ক্ষেতমজুর সমিতি।**

হাজার গুলি চালাইয়াও তাহাদের রোখা যাইতে ছিল না। আজ কারখানা শ্রমিকদের সহিত একত্র হওয়ায় তাঁহাদের বল দশগুণ বাড়িয়া যাইবে।

নির্ব্বাচনের ধোঁকা

এই বিপুল শক্তি দেখিয়া নেহরু সরকার প্রমাদ গণিয়াছেন। তাই তাঁহারা পশ্চিম বাংলার ১৩ জনের ভোটে এক সাধারণ নির্ব্বাচনের ধূয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গায়ে গায়ে বাকি ৮৭ জন যে লড়াই করিতেছেন, তাঁহারা আর ঠকিবেন না, তাঁহারা এই কথা ঠকিয়া শিখিয়াছেন—যে জমির জন্য দাবির জন্য প্রাণ দিতে হইতেছে—ভোটের বাক্সে তাহা আদায় হয় না। তাই তাহারা প্রস্তাব লইলেন—সকলের ভোটের অধিকার চাই, সাথী ও বন্দীদের মুক্তি চাই, নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ চাই।

বিপুল সমর্থন ও ঐক্য

এই প্রবল শক্তিকে অন্যান্য লোকরাও সমর্থন করিতেছেন। ক্ষেতমজুর প্রতি-

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

ক্ষেতমজুর সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

বাঁচার মত মজুরি—

"মাসে ৮০ টাকা-নিম্নতম মজুরি, জীবনধারণের মান অনুসারে মাগ্‌গীভাতা এবং ২০ টাকা ঘরভাড়া। ন্যায্য মজুরির এই নিম্নতম হার আদায় না করা পর্য্যন্ত ক্ষেতমজুরেরা অনমনীয় সংগ্রাম চালাইবে।"

ইহা ছাড়া অন্যান্য নানা দাবির সহিত ক্রীতদাসত্বের অবসান চাই, বেগার খাটানো বে-আইনী, সম্বৎসরের কাজের গ্যারান্টি, বেকার ভাতা, ৭ ঘণ্টার বেশী কাজ নাই, অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় করো, মাহিন্দারদের পুরা বেতন সহ ছুটি, মেয়ে পুরুষের সমান মজুরি, নাবালকদের বিনা খরচায় শিক্ষা, জলা ও জঙ্গলের অধিকার প্রভৃতি দাবি করা হইয়াছে।

জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের জন্য কৃষকদের সংগ্রামে পূর্ণ সহযোগিতা ঘোষণা করিয়া প্রস্তাবে বলা হয়—"গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের জন্য জমি চাই; জমিদারী-জোতদারীপ্রথার আমূল উচ্ছেদ করিয়া জমির মালিকানা শোষিত জনসাধারণকে দিতে হইবে। জমি বণ্টনের ভার দিতে হইবে গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের প্রতিনিধিমূলক কমিটির হাতে।"

নির্ব্বাচন

প্রস্তাবিত সাধারণ নির্ব্বাচনকে অগণতান্ত্রিক ঘোষণা করিয়া এক প্রস্তাবে ইহার প্রতিবাদ করা হয় ও দাবি করা হয় সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার চাই। (খ) রায় মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। (গ) কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে। (ঘ) শ্রমিক ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে। (ঙ) কালা-কানুন রদ করিয়া পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হইবে।

ভোটের বাক্স মারফত কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না এই হুঁসিয়ারী করিয়া উপরোক্ত দাবিতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া মুক্ত চীন ও তেলেঙ্গানাকে অভিনন্দন, সোভিয়েটের শান্তি নীতিকে সমর্থন, হায়দরাবাদে ফাঁসির প্রতিবাদ এবং দমননীতি ও শহীদের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মতামত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাহার ঝরিয়া সফরের সময় কয়লার খনির মালিকরা কয়েক হাজার টাকার তোড়া উপহার দিবার আয়োজন করিতেছেন।

বিড়লা-ওয়াকারদের শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রমিকদের "গঠনমূলক" পথে পরিচালিত করার জন্যেই সমাজতন্ত্রী নেতারা এত কমিউনিস্টবিরোধী। বিড়লা-ওয়াকারদের কল-কারখানায় শ্রমিকের অশান্তি যত বেশী বাড়িবে, জয়প্রকাশদের কমিউনিস্ট-বিরোধিতাও তত উগ্র হইবে। দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের এই চরিত্র সর্ব্বত্রই উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।

* * *

৫ই আগস্টের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন দমননীতি অপেক্ষা জনগণের সহযোগিতার উপরে বেশী নির্ভর করিতেছেন। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় স্পেশাল কোর্ট গঠনের জন্যে যে অর্ডিনান্স জারি হইয়াছে তাহাতে আর একবার তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে এবং বিপ্লবী যুব আন্দোলনের সময়ে এণ্ডারসনের দল এই স্পেশাল কোর্ট বসাইবার আইন জারি করিয়াছিল। এই আইনে কোন মামলার বিচারের জন্যে কোন সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হইত না। বৃটিশ শাসকরা যাহাকে খুশী গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিত। স্বাধীন নির্ব্বাচনের আওয়াজ যে কতবড় ধাপ্পাবাজি এই নূতন অর্ডিনান্সে তাহাই আর একবার প্রমাণিত হইল।

কারখানার ও ক্ষেতের মজুরদের শত্রু এক, লড়াই এক

(১১ পৃষ্ঠার পর)

নিধিদের সঙ্গে গরিব আর মধ্যবিত্ত কৃষকেরাও আসিয়াছেন একত্রে কৃষক সম্মেলন করার জন্য। ২৪পরগনা, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান সর্ব্বত্র তে-ভাগা, জমিদারী উচ্ছেদ ও খাজনা বন্ধের দাবিতে গরিব আর মাঝারি কৃষকেরা যে সংগ্রাম করিয়াছেন, জান দিয়া এই ক্ষেতমজুররা তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। সম্মেলনে এই সকল কৃষক প্রতিনিধিরা বলিলেন, গ্রামে ক্ষেতমজুরেরাই এখন সংগ্রামের নেতা। ক্ষেতমজুরদের দাবিতে তাঁহারাও জান কবুল করিবেন।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং প্রায় শতাধিক শ্রমিক ইউনিয়ন তো বটেই, শহরের ভদ্রলোকেরাও কম সমর্থন জানান নাই। অফিসে কাজ করেন এমনি নানা কর্ম্মচারীদের সংগঠন—ইউ, পি, টি, ডবলিউ ; সেন্ট্রাল গবর্নমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন প্রভৃতিরা অভিনন্দন প্রেরণ করেন। লেখাপড়া জানা ভালো লোকদের পক্ষ থেকে বিখ্যাত লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন। ডাক্তার, ব্যারিস্টারদের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক তাহারা জানান কিভাবে তাঁহারা ক্ষেতমজুরদের সাহায্য করিতে পারেন। ভদ্রলোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সমর্থন জানান কলিকাতার ছাত্ররা।

২৫শে আগস্ট সম্মেলন সুরু হয়। সেই দিনই কলিকাতার ৪০,০০০ ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। কংগ্রেসী সরকার তাহাদের স্কুলের বেতন বাড়াইয়া দিতেছেন, লেখাপড়ার সুযোগ কম করিয়া দিতেছেন, সেই জন্যই তাহারা প্রতিবাদ করেন।

ধর্ম্মঘটের পর ছাত্ররা এক বিরাট মিছিল করিয়া আসেন ক্ষেতমজুরদের কাছে। তাঁহারা ধ্বনি দেন—"ক্ষেতমজুর সম্মেলন জিন্দাবাদ," "ক্ষেতমজুরদের দাবি মানতে হবে।"

ক্ষেতমজুর সম্মেলনের সভাপতি শ্রীকুঞ্জ বিহারী ক্ষেতমজুর শ্রমিকদের সংগ্রামের লালঝাণ্ডা উপহার দেন ছাত্রদের। ছাত্ররা নিজেদের ছাত্র পতাকার সহিত লালঝাণ্ডার গিট বাঁধিয়া চিৎকার করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। ক্ষেতমজুর প্রতিনিধি আর ছাত্ররা একসঙ্গে ধ্বনি দেন—"ছাত্র মজুর ঐক্য জিন্দাবাদ।"

২০,০০০ মানুষের সমাবেশ : পুলিসের লাঠিচার্জ্জ

২৫শে, ২৬শে, ২৭শে আগস্ট তিন দিন নানা আলোচনার পর প্রতিনিধিরা যে সকল প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত লইলেন, ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে এক বিরাট জমায়েতের সামনে তাহা ঘোষণা করা হয়।

এতবড়ো জমায়েতও অনেকে দেখেন নাই। যে সকল শ্রমিক ক্ষেতমজুর সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, কারখানা ছুটির পর তাহারা দলে দলে মিছিল করিয়া আসিতে লাগিলেন। বিরাট মিছিল আসিল মেটিয়াবুরুজের লোহাকল আর চটকল হইতে। ব্যারাকপুর মহকুমার বহু কারখানা হইতে চটকল ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরা এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা আনিলেন। সরকারী কর্ম্মচারীরা, অফিস আদালতের পিয়ন দারোয়ান প্রভৃতি অল্প বেতনের শ্রমিকেরা, খিদিরপুরের জাহাজ মিস্ত্রীরা, টালিগঞ্জের লোহা আর কেমিকেল মজুর—দিক দিক হইতে হিন্দুস্থানী-বাঙালী-ওড়িয়া সবরকম মজুর আর কর্ম্মচারী আসিয়া জুটিলেন। অসংখ্য ছাত্র, মমিলা এবং সাধারণ ভদ্রলোকও আসিলেন ময়দানের মিটিংএ। ক্ষেতমজুরদের মতই তাহারাও শোষণের অবসান চান। আর আসিল কৃষক। ডোঙ্গাজোড়া, বড়াকমলাপুর, সোনারপুর, মাহেশ, কলিকাতার আশেপাশের নানা গ্রাম হইতে মোর্চ্চা করিয়া দলে দলে কৃষকেরা আসিয়া হাজির হইলেন।

দেখিতে দেখিতে ২০,০০০ মানুষে ময়দান ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সরকার এই জমায়েত সহ্য করিতে পারেন নাই। খবর আসিল হাওড়া স্টেশনে কৃষকদের একটি মিছিলের উপর পুলিস লাঠি চার্জ্জ করিয়াছে। ৩জন মহিলা গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। বেহালায় একটি কৃষক মোর্চ্চা পুলিস রুখিয়া দিয়াছে।

কিন্তু সম্মেলন তাহারা পণ্ড করিতে পারিল না। শত শত শহীদের স্মৃতিতে রক্তাক্ত লালঝাণ্ডা তুলিলেন মেদিনীপুরের একজন ক্ষেতমজুর। কংগ্রেসী পুলিসের অত্যাচারের কাহিনী তাঁহার মনে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি, পুলিস এবং কংগ্রেসী সেবাদল আমার গাঁয়ের ক্ষেতমজুরকে হত্যা করিয়াছে, তাঁহার মৃতদেহের উপর প্রস্রাব করিয়া দিয়াছে। এই ফ্যাসিস্ট ডাকাতদের আমি পদাঘাত করি। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শিশু নারী হত্যাকারীদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্য্যন্ত লড়াই চালাইয়া যাইব।"

"নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা নিপাত যাক" এই ধ্বনি দিয়া ২০,০০০ মানুষ ক্রোধে চিৎকার করিয়া তাহার সমর্থন করিতে থাকে।

নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ চাই

সভাপতি কুঞ্জবিহারী সম্মেলনের প্রধান কথাটি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—"জমি লাঙ্গল লুটিয়া লইয়া জমিদার-জোতদারেরা যাঁহাদের সর্ব্বহারায় পরিণত করিয়াছে, সেই ক্ষেতমজুররা সংগ্রামের ময়দানে সৈনিকের মত দাঁড়াইয়াছে। কারখানার শ্রমিক আর মেহনতী শ্রমিক আজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নিচে দাঁড়াইয়া সমস্ত সংগ্রাম শোষণের অবসান ঘোষণা করিতেছে।"

ক্ষেতমজুরেরা বাঁচার মত মজুরি দাবি করিয়াছেন। এই দাবি ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষেতমজুর কমরেড হরিশচন্দ্র বলেন—

"আমরা গ্রামের ক্ষেতমজুর দিনমজুর। দুর্ভিক্ষে আমাদেরই ৩৫ লাখ আত্মীয়-স্বজন মরিয়াছেন। আর জমিদার-মহাজনেরা কোটী কোটী টাকা মুনাফা করিয়াছেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন উপাস করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয়, তখন জমিদারের বাড়ীতে ভোজ চলে, মদ আর মেয়ে লইয়া উৎসব হয়।"

আর আমরা মরিব না। কারখানা শ্রমিকদের মতই আমরা দাবি করি মাসে ৮০ টাকা এবং উপযুক্ত মাগ্‌গীভাতার কম আমাদের চলিবে না।

কংগ্রেসী ও সোস্যালিস্টরা আজ ক্ষেতমজুর সমিতি গড়ার কথা বলিতেছেন। বাঁচার মত মজুরির দাবি করিয়া আমরা গুলি খাইতেছি। সোস্যালিস্ট ও 'জাতীয়' টি-ইউ যদি সত্যই আমাদের ভালো চান তবে এই গুলির সামনে তাঁহারা দাঁড়ান। এই পরীক্ষা না দিলে তাঁহাদের দালালীতে ক্ষেতমজুররা ভুলিবে না।

তাহারা যে ভুলিবেন না তাহারই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল কাকদ্বীপ প্রতিনিধির কথায়। খাঁটি সৈনিকের মত অল্পকথায় ঘোষণা করিলেন—"আমাদের এলাকায় ১৮ জন শহীদ হইয়াছেন। কিন্তু ২০,০০০ বিঘা জমি আমরা দখল করিয়া চাষ করিয়াছি।"

নবনির্ব্বাচিত কৃষক সভার সভাপতি রাধাবল্লভ ঘোষণা করেন—"আমরা শ্রেণী শক্তির নূতন এক ঘানি তৈয়ারি করিয়াছি। সেই ঘানির একদিকে শ্রমিক আর একদিকে কৃষক। ক্ষেতমজুররা সেই ঘানির সংযোগ দণ্ড। এই বিরাট ঘানির পেষণ হইতে কোন শোষণকারীরই আর নিস্তার নাই।"

শ্রমিক নেতা, রহিম বলেন "যে ধনিকরাজের বিরুদ্ধে কারখানার শ্রমিকেরা লড়িতেছেন, তাহার বিরুদ্ধেই ক্ষেতমজুরদের লড়াই। আমাদের শত্রু এক। আমাদের সামনে যে রাস্তা তাহা চীনের রাস্তা, সোভিয়েটের রাস্তা, কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠার রাস্তা।"

পুলিস জুলুম ধ্বংস হোক, ক্ষেতমজুরদের দাবী মানতে হবে, নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা খতম করো—এমনি নানা দাবিতে বিরাট জমায়েত অনবরত মুখরিত হইতে থাকে।

নূতন মানুষের মিছিল

সম্মেলনের শেষে সুরু হইল এক বিরাট মিছিল। ক্ষেতমজুর-কৃষক-শ্রমিক আর ছাত্রের এক বিপুল জনস্রোত আগাইয়া চলিল কলিকাতার ট্রামবাস ভরা রাস্তা জুড়িয়া।

এ এক নূতন মিছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার রাস্তায় একদিন মিছিল হইয়াছিল। গ্রাম হইতে দলে দলে পোঁটলা পুঁটলী বাঁধিয়া কৃষকেরা আসিয়াছিলেন। ১৫ই আগস্টের পর নূতন কংগ্রেসী মন্ত্রী হইয়াছে। তাহাদের নিকট দাবি জানাইতে আসিয়াছিলেন—'জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়া হোক।'

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সে মিছিলের উপর পুলিস লেলাইয়া দিয়াছিলেন। টিয়ার গ্যাস চালাইয়াছিলেন। টিয়ার গ্যাস খাইয়া কৃষকেরা গ্রামে ফিরিয়াছিলেন। মন্ত্রীদের দিকে আর চাহেন নাই।

আর দুই বৎসর ধরিয়া গ্রামে গ্রামে হত্যাকাণ্ডের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। জোতদার-জমিদার আর কংগ্রেসী সেবাদলের নরক তৈরী করিতেছে। দুই বৎসরে ১৩৫ বার গুলি চলিয়াছে। শুধু গরীব কৃষক আর ক্ষেতমজুর নিহতের সংখ্যা ৬০।৭০ জন।

দুই বৎসর পরে আবার তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন। আসিয়াছেন অনুরোধ জানাইতে নয়—হত্যাকাণ্ডের জবাব দাবি করার জন্য মন্ত্রীদের উচ্ছেদ করার ঘোষণা শুনাইতে।

আসিয়াছেন একলা নয় গ্রামে ক্ষেতমজুরদের পিছনে, কারখানার মজুরদের নেতৃত্বে।

বিধান মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ, গণভোটাধিকার ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধের দাবি

তিনটি বড়ো বড়ো লালঝাণ্ডার পিছনে এই নূতন মিছিল চলিল নূতন দাবি ও নূতন ঘোষণা লইয়া। এক মাইল দীর্ঘ জনস্রোত পোস্টার লইয়া চলিয়াছে—'বাঁচার মত মজুরি চাই' 'চাষীর হাতে জমি চাই' "নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা ধ্বংস হোক" 'কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করো' ধ্বনি উঠিতেছে—ক্ষেতমজুর সম্মেলন জিন্দাবাদ। ছাত্র-মজুর-কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জিন্দাবাদ!

রাস্তার দুপাশে মানুষ ভিড় করিয়া আসেন মিছিল দেখিতে। বড়োলোক মানুষ নয়, গরীব মানুষ—রিক্সাওয়ালা, কুলী, মজুর, দোকান কর্ম্মচারী। সাগ্রহে তাঁহারা মিছিলকে অভিনন্দন জানান। মিছিলের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে থাকেন।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, বৌবাজার, শিয়ালদহ, হ্যারিসন রোড ধরিয়া মহম্মদ আলী পার্কে আসিয়া মিছিল শেষ হয়।

মিছিল শেষ হইল। কিন্তু সুরু হইল নূতন একটি জিনিস। সুরু হইল বাংলার ও ভারতবর্ষের ক্ষেতমজুর আন্দোলনের এক নূতন পর্য্যায়।

এক মাইল মিছিলের দাবী— কৃষক হত্যার জবাব চাই

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।

জনসাধারণকে বাদ দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন রায় মন্ত্রি-সভাকে গদীতে রাখার কৌশল মাত্র

গণসংগ্রাম তীব্রতর কর ঃ গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের জন্য লড়াই কর ঃ নির্ব্বাচনের অস্ত্রকে ঘুরাইয়া প্রয়োগ কর

লালঝাণ্ডার শ্রমিকদের ডাক

পশ্চিম বাংলার সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে কলিকাতার কয়েকটি লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের পক্ষ হইতে এক বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম ঃ

মাস ছয়েক পরে পশ্চিম বাংলায় "সাধারণ নির্ব্বাচন" করিবার যে প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি লইয়াছেন তাহা প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। দেশবাসী বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভাকে আজই বিতাড়িত করিতে চায়, ইহা হইল তাহাকে আরও কমপক্ষে ছয়মাস গদীতে রাখার সুচতুর কৌশল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই ঘোষণা যে কতবড় জুয়াচুরি তাহা ঢাকিয়া রাখার উপায় নাই। এই সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, নির্ব্বাচন সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে না, সাম্রাজ্যবাদের রচিত পুরানো শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে হইবে। ঐ শাসনতন্ত্রে দেশের শতকরা ১৩ জনের অর্থাৎ প্রধানত বড়লোকদেরই ভোট আছে। বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা থাকিবে, কি তাহাকে লাথি মারিয়া বিদায় দেওয়া হইবে—এই প্রশ্ন লইয়া জনতার সম্মুখীন হওয়ার মত সাহস কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নাই। সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন করার সাহস তাঁহাদের নাই। কারণ তাহারা জানেন যে এই দস্যু মন্ত্রিসভার অপকর্ম্মই ভোটে দেওয়া হইতেছে।

দেশবাসী কখনও ভুলিবে না

২৭শে এপ্রিলের নারী হত্যা, তিনটি জেলে বিনা-বিচারে বন্দী কমিউনিস্ট, কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়নকর্ম্মীদের উপর নির্ম্মম গুলিচালনা, পটারী ও এলেন বেরীর শ্রমিকদের উপর গুলিচালনা, জমি ও খাদ্যের জন্যে কৃষক যে আন্দোলন করিতেছে তাহা দমন করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র গুণ্ডাদল প্রেরণ এবং গুলি ও লুণ্ঠন চালানো—দেশবাসী কখনো ভুলিবে না। চটকল মালিকদের হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মাসে এক হপ্তা কাজ বন্ধ রাখিয়া মজুরি কাটার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিধান-মন্ত্রিসভার আমলে পুলিস অন্তত একশতবার গুলি চালাইয়াছে, শ্রমিক-কৃষকের ২৫খানা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়াছে; ক্ষুব্ধ মেহনতকারী জনতা লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে অপরাজেয় আওয়াজ তুলিয়াছে ঃ রায় মন্ত্রিসভার অবসান চাই।

রায়-মন্ত্রিসভার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে জনতার যে প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়াই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়া কংগ্রেসী বড় কর্ত্তারা দেখাইতে চায় যেন, দেশবাসী কংগ্রেসী নীতি চায়, না কমিউনিস্ট নীতি চায়—এই প্রশ্নেই তাঁহারা জনতার রায় নিতে প্রস্তুত। কিন্তু জনগণ এই ধাপ্পায় কখনই ভুলিবে না। কি অবস্থায় নির্ব্বাচন হইবে? জনসাধারণের অধিকাংশের ভোট থাকিবে না, কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধভাবে থাকিবে, কমিউনিস্ট বন্দীরা কংগ্রেসী জেলে আটক থাকিবে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার পত্রিকার কণ্ঠ রুদ্ধ থাকিবে, পুলিসের হাতে থাকিবে নিরাপত্তা আইনের হাতিয়ার। কংগ্রেসী বড় কর্ত্তারা জানে যে আজ যদি স্বাধীন নির্ব্বাচন হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি যদি খোলখুলিভাবে এবং আইনসঙ্গতভাবে জনগণকে জমায়েত করার সুযোগ পায় তবে, এই সাধারণ নির্ব্বাচনে রায় মন্ত্রি-সভার শ্মশানযাত্রায় পরিণত হইবে। কংগ্রেসের মুখে চুনকালি পড়িবে।

ইঙ্গ-মার্কিন-মারোয়াড়ী প্রভুদের স্বার্থ বিপন্ন হইতে দেওয়া যায় না

কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার বৃটিশ অনুচরদের সহিত যত জাতীয়তা-বিরোধী পরিকল্পনা করিয়াছে ভোটের ফল রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গেলে তাহা সবই বানচাল হইয়া যাইবে। সেই জন্যেই কমিউনিস্ট পার্টিকে আইন সঙ্গত করিয়া, নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন নির্ব্বাচনের ঝুঁকি

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে

অপরাজেয় পটারী শ্রমিক!

এখনো কি এমন কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী আছেন যিনি মনে করেন নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে কোন ধর্ম্মঘটকেই দীর্ঘদিন চালানো যায় না? যদি থেকে থাকেন তিনি একবার পটারীর ধর্ম্মঘটের দিকে তাকান।

এমন কি অত্যাচার আছে যা তাঁদের উপর চলেনি। তাঁদের বস্তীতে আগুন লাগানো হয়েছে, লালঝাণ্ডার অফিসে আগুন লাগানো হয়েছে। তাঁদের দু'শ শ্রমিককে জেলে আটক করা হয়েছে, মেয়েদের উপর লাঠি চালানো হয়েছে। তাঁদের উপর তিন ঘণ্টা ধরে গুলি চালানো হয়েছে, জখম করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের দিয়ে 'বণ্ড' লিখিয়ে নেবার জন্যে কোথাও প্রলোভন দেখানো হয়েছে, কোথাও গুণ্ডার ডাণ্ডা দেখানো হয়েছে। তাঁদের পিকেট লাইনে কংগ্রেসী পুলিস আর কংগ্রেসী গুণ্ডা একসঙ্গে হামলা করেছে, একসঙ্গে সভাসমিতির অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ফ্যাসিজম্ আর কাকে বলে?

কিন্তু তবু পটারী শ্রমিকের ধর্ম্মঘট খতম হলো না কেন, তাঁদের সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরানো যায় না কেন? একদিন দুদিন নয়, একমাস দু'মাসও নয়—তিন মাস তাঁরা এ আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়ছেন কি করে?

যদি কেউ বলেন, ওরা এক আলাদা ধরনের শ্রমিক, তবে তাঁকে ভুল বলা যায় না। সত্যি সত্যি ওরা আলাদা ধরনের শ্রমিক। কিন্তু কিসে আলাদা? পটারীর বস্তীতে যখন ভোর হয়, তখন পটারী শ্রমিকের শিশু ছেলেমেয়েরা কি ক্ষুধার জ্বালায় একবারও কেঁদে উঠে না? তখনো কি পটারী শ্রমিকের পাষাণ-বুক একবারও ভেঙ্গে পড়ে না? তাঁদের মনগুলিকে এমন আলাদা করে তৈরী করে তুলেছে কে, তাঁদের শপথকে এমন অটল করে তুলেছে কে?

লালঝাণ্ডা। লালঝাণ্ডার লাল আলোতে যাঁরা সকলের আগে কংগ্রেসীদের ধনিক চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন, পটারী শ্রমিক তাঁদেরই একজন।

১৯৪৬-এর সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসীরা এসেছিল হাজার রকমের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তাদের "জয়হিন্দ" আওয়াজে তারা চেয়েছিল মজুরের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু লালঝাণ্ডা সেদিন পটারী শ্রমিককে বলেছিল ঃ ওদের ভোট দিলে মালিকদের শোষণ-রাজ ধনিকশ্রেণীর ফ্যাসিস্ট-রাজই কায়েম হবে।

পটারী শ্রমিক 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালাল ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জীকে ভোট দেয়নি; কংগ্রেসীদের প্রত্যক্ষ কাজকর্ম্ম দেখবার পর তাঁদের কোন প্রতিশ্রুতিতে তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। মালিকের মোটরে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা দেখে তাকে সেলাম করতে ঘৃণা বোধ করেছে। মালিকের গুণ্ডার মুখে "জয়হিন্দ" শুনে তার সাথে কণ্ঠ মিলাতে অস্বীকার করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে তাঁদের উপর কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর ক্রোধ।

ধনিকরা যে গুণ্ডাদের এতদিন নিযুক্ত করেছিল মুসলিম নিধনের কাজে, তাদের এবার লাগানো হলো শ্রমিকদের ভিটে-ছাড়া করবার পবিত্র কাজে। তারপর তাদের ফ্যাসিস্ট তাণ্ডব চললো স্বদেশী পুলিস-পল্টনের আশ্রয়ে। কংগ্রেসী "গণতন্ত্র" সম্পর্কে পটারী শ্রমিকের মোহমুক্তি ঘটলো রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

তারপর এলো ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের "বিশুদ্ধ" কংগ্রেসী-রাজ। নেহাত ভাল মানুষ সেজে তাঁরা নিয়ে এলেন কালা-কানুন। এ আইনে মজুর কৃষকদের আন্দোলন দমন করা হবে না—প্রস্তাবে বার বার হলপ্ করে বল্লেন ঃ এ আইন তৈরী হচ্ছে শুধু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দমন করার জন্যে।

সেদিনও লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের হুসিয়ার করে দিল; এ বে-আইনী আইন রুখবার জন্য তারাই সাধারণ ধর্ম্মঘটের ডাক দিল! এবারও পটারী শ্রমিক থাকলো সেই দেড় লক্ষ লালঝাণ্ডা শ্রমিকের সাধারণ ধর্ম্মঘটের পুরোভাগে।

আবার পটারী বস্তীতে জ্বলে উঠলো কংগ্রেসী আগুন; পটারীর কারখানা এবার জেলখানায় পরিণত হলো; লালঝাণ্ডা নেতাদের বেছে বেছে ছাঁটাই করা হলো; সভা-সমিতির সামান্য অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হলো।

দেখতে দেখতে খুলে পড়লো কংগ্রেসী ভালমানুষীর মুখোস্! লালঝাণ্ডার শ্রেষ্ঠ নেতারা বিনা বিচারে আটক হলেন, লালঝাণ্ডার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলো; সাম্প্রদায়িক নেতা আর-এস-এসদের মুক্ত করে জেল ভর্ত্তি করা হলো বাছাই করা শ্রমিক-ছাত্র-কৃষক ভাইবোনদের দিয়ে। যাঁরা কালা-কানুন পাশ করবার জন্যে এত কাঠখড় পুড়িয়েছিলেন, তাঁরা বাঁচার মত মজুরী,

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মাঙ্গল

প্রথম বর্ষ ঃ ১২ সংখ্যা] ৪ঠা সেপ্টেম্বর '৪৯ ঃ ১৮ই ভাদ্র '৫৬ [তিন আনা

নির্ব্বাচনের ধোঁকাবাজীর সম্মুখে বামপন্থী কর্ম্মীদের অগ্নিপরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লইবার মত সাহস তাঁহাদের নাই। শুধু মারোয়াড়ী মুনাফালোভীদের স্বার্থে নয়, বিদেশী মূলধনের জন্যে কলিকাতাকে নিরাপদ রাখার জন্যেও বিধান মন্ত্রিসভাকে কায়েম রাখা হইতেছে। ট্রুম্যানের নিকট নেহরু যে দাসখত লিখিয়া দিয়াছেন, শিল্প-জাতীয়করণ সম্পর্কে কংগ্রেসী নীতি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, মূল শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে। এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ডাইভার এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত গ্রাডীর ধমক খাইয়া এবং মার্কিন ঋণ লাভের শর্ত্ত হিসাবে নেহরুজী এখন ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১০ বছর পরেও কোন শিল্প জাতীয়করণ হইবে না। সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধ ষড়যন্ত্রে এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার বিভিন্ন দেশে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার জন্যে ভারতের সম্পদকে ব্যবহার করার কাজে নেহরু সরকার স্বেচ্ছায় মার্কিন এজেন্টে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর যে দমননীতি চলিয়াছে তাহা এই মার্কিন স্বার্থরক্ষার ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আজ এক মার্কিন দলে পরিণত হইয়াছে।

"সাধারণ নির্ব্বাচনের" পিছনে আসল মতলব

ছয় মাস পরে সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়া কংগ্রেসী বড়কর্ত্তারা কিভাবে লাভবান হইবেন বলিয়া আশা করেন? তাঁহারা আশা করেন যে, জনসাধারণের হাত হইতে কিছু সময়ের জন্য রেহাই পাইবেন। নিজেদের শক্তিকে আবার একত্রিত করিয়া জনসাধারণের উপর আক্রমণ করিয়া নির্ব্বাচনের আগেই তাহাদের পরাজিত করিতে পারিবেন। কংগ্রেসী বড় কর্ত্তারা আশা করেন যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের অসন্তোষের মুখ নির্ব্বাচনের দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া যাইবে; নির্ব্বাচনের ফাঁদে পড়িয়া মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর এক ব্যাপক অংশ সক্রিয় প্রতিরোধের পথ ছাড়িয়া শুধু নির্ব্বচনের প্রস্তুতিতেই মাতিয়া যাইবে, এইভাবে জনসাধারণের ঐক্যে ফাটল ধরিবে। তাঁহারা আশা করেন যে, নির্ব্বাচনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাহারা শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণ আরও সফলভাবে চালাইতে পারিবেন। তাঁহারা একদিকে মুখে গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের কথা বলিতেছেন, অপরদিকে হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করার ব্যাপারে ইংরেজ ও অন্যান্য মালিকদের সাহায্য করিতেছেন, হাজার হাজার শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত যুবককে বেকার করিয়া দিতেছেন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্যেই তাঁহারা ছয়মাস সময় চাহিতেছেন। কলিকাতার শ্রমিকদের, বিশেষতঃ হিন্দীভাষী শ্রমিকদের লালঝাণ্ডা এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিতেছে যে, নির্ব্বাচনের মধ্যবর্ত্তী কালে কংগ্রেসী বড় কর্ত্তা এবং পুঁজিপতিদের দালালরা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করিবে। গত জুলাই মাসে পণ্ডিত নেহরুর সভার পর কলিকাতার এখানে ওখানে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। ধনিকদের অনুচর, কংগ্রেসী ও 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালরা সুপরিকল্পিতভাবে এইগুলি সংগঠিত করিতেছে। কারণ তাহারা ঐক্যবদ্ধ জনতাকে ভয় করে। চটকলে ছাঁটাই অভিযান, অন্যান্য শিল্পে কারখানা বন্ধ, মজুরীর উপর হামলা—এই সবের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সফল প্রতিরোধ অচল করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল দাঙ্গা সংগঠিত করা হইতেছে। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সমস্ত শ্রমিককে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা সকলে একই শ্রেণী, সকলেই শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর লোক; তাহাদের শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য না থাকিলে সকলকেই ছাঁটাই ও মজুরী কাটার মুখে পড়িতে হইবে। বাংলার শ্রমিক, কৃষক, জনসাধারণ নিজেদের ছাঁটাই-বিরোধী সংগ্রাম, বাঁচার মত মজুরি ও অন্যান্য দাবির সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়াই কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের এই চাল ব্যর্থ করিবে। ঘৃণিত রায় মন্ত্রিসভাকে অবিলম্বে এবং চিরদিনের জন্য গদিছাড়া করার লড়াইয়ে মূল এবং প্রধান শক্তি এইখানে।

শোষিত জনতার রায় জাহির করিতে হইবে

সঙ্গে সঙ্গে যে নির্ব্বাচনে শতকরা ৮৭ জনের ভোট নাই এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ মানুষের পক্ষে লড়াই করার স্বাধীনতা নাই—সেই নির্ব্বাচন প্রহসনের বিরুদ্ধেও বাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র জনগণের বিক্ষোভ প্রকাশ পাওয়া চাই। দাবি তুলিতে হইবে: সকলের জন্য ভোট চাই, কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার চাই, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই এবং পূর্ণ নাগরিক অধিকার চাই—এইভাবেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন সম্ভব।

যে কোন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের প্রাথমিক শর্ত্ত স্বীকার করার সৎ সাহস যদি কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের থাকে, তবে লালঝাণ্ডা শ্রমিকশ্রেণী ও বাংলার জনসাধারণ কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে এবং নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ করার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। কংগ্রেসী বড় কর্ত্তারা নিশ্চয়ই এই শর্ত্ত মানিয়া লইবেন না। বাংলার জনসাধারণকে এখন হইতেই জানাইয়া দিতে হইবে যে, সরকার যে সিদ্ধান্তই করুক না কেন, তাহারা কখনই নিজেদের ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নিজেদের রায় প্রকাশ করার অধিকার কায়েম করার পথে কোন বাধাই জনসাধারণ স্বীকার করিবে না। জনসাধারণ যখন তাহাদের রায় দিবার সিদ্ধান্ত করিবে তখন বেয়নেট, পুলিস ফৌজ বা মিলিটারীর বহর—কিছুই কোন কাজে আসিবে না। সরকার যদি দশজনের কথা শুনতে অস্বীকার করে, তবে বাংলার মেহনতকারী জনতা দলে দলে ভোট কেন্দ্রের দিকে অভিযান করিবে। সরকারের ভোটের তালিকা অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ভোটের অধিকার কায়েম করিবে। এইভাবে বিপ্লবী কায়দায় নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য লালঝাণ্ডা দেশবাসীকে ডাক দিতেছে।

এই ইচ্ছা প্রকাশ করার ব্যাপারে যাহারা গণতান্ত্রিক দাবীর সমর্থক এবং যাহারা সত্যসত্যই চায় যে কংগ্রেস সম্পূর্ণ ভিন্ননীতি অনুসরণ করুন, তাহাদের সকলকেই জনগণ স্বভাবতই সমর্থন করিবে। কংগ্রেসেরও ধনিক-নীতির বিরুদ্ধে সত্যই লড়াই করিতে চায় এমন সমস্ত প্রকৃত বামপন্থী দল ও ব্যক্তিদের লালঝাণ্ডা সমর্থন করিবে।

*** শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফ্রন্টে জয়প্রকাশ-শরৎবসু**

*** গণভোটাধিকার, বন্দীমুক্তি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধের দাবীতে আগুয়ান শ্রমিকশ্রেণী**

বামপন্থীদের অগ্নি-পরীক্ষা

কিন্তু যে সব তথাকথিত বামপন্থী উপদল ও ব্যক্তি এক "বামপন্থী সমন্বয় কমিটি" খাড়া করার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা নির্ব্বাচন সম্পর্কে মোহই সৃষ্টি করিতেছেন এবং প্রকৃত পক্ষে গণ-সংগ্রামকে বাদ দিয়া নির্ব্বাচনী দ্বন্দ্বের কথা বলিতেছেন এবং এইভাবে পরোক্ষে কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের কাজই হাসিল করিতেছেন। ইহারা কংগ্রেসকে পরাজিত করিবেন না, ইহারা কেবল জনগণের ঐক্যেই ভাঙ্গন ধরাইবেন। প্রকৃত বামপন্থীদের লালঝাণ্ডা আহ্বান জানাইতেছে। সর্ব্বপ্রথম গণ-সংগ্রামগুলিকে সমর্থন করুন, কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবী; সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী, বন্দী মুক্তির দাবী, পূর্ণ নাগরিক অধিকারের দাবী সমর্থন করুন। ইহাই কষ্টি পাথর। কোন প্রকৃত বামপন্থীর পক্ষে এগুলি এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে হইলে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবী অপরিহার্য্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বর্ত্তমান বাধানিষেধ হইতে মুক্ত হইলে নির্ব্বাচনে হাজার হাজার লোককে প্রভাবিত করিতে পারিবে, এবং তাহাতে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। যাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, কিন্তু এই দাবী সমর্থন করে না তাহারা কংগ্রেসবিরোধী ফ্রন্টে, ধনিকবিরোধী ফ্রন্টে বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী।

শরৎ বসু বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন

শরৎ বসু কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবী, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী, সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে রায় মন্ত্রিসভা থাকিয়া গেল ইহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই। দক্ষিণ কলিকাতা নির্ব্বাচনে যে জনগণ তাঁহাকে ভোট দিয়াছেন, সেই জনসাধারণের বিশ্বাস তিনি ভঙ্গ করিয়াছেন। লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে কংগ্রেসী সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করিয়া জনগণ তাহাদের নাগরিক অধিকার কায়েম করিয়াছিল, জেলখানার বন্দীরা এবং পটারী-এলেনবেরীর শ্রমিকরা, বহুবাজার ষ্ট্রীটে সংগ্রামী মেয়েরা নিজেদের জীবন দিয়া জনগণের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল বলিয়াই দক্ষিণ কলিকাতায় কংগ্রেসের পরাজয় হইয়াছে। শরৎ বসু ভাবিলেন উহা তাঁহার ব্যক্তিগত জয়। কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই তিনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন, বিশ্বাসঘাতক সোস্যালিস্ট নেতাদের সহিত এক সম্মিলিত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের জন্যে আলোচনা সুরু করিলেন, মিলিত সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলেও নির্ব্বাচনে লড়িবার জন্যে সোস্যালিস্ট পার্টির সহিত যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করিতেছেন।

বামপন্থী যুক্ত ফ্রন্ট, না শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফ্রন্ট

সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার দল ছাড়া কিছুই নয় তাহার সহিত যুক্ত ফ্রন্ট প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকশ্রেণী ও তাহার সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার ফ্রন্ট ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। সোস্যালিস্ট নেতারা ট্রেড ইউনিয়নে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া, সরকার সৃষ্ট 'জাতীয়' টি-ইউর সহিত ধর্ম্মঘটবিরোধী মিতালী করিয়া ধনিকদেরই সেবা করিতেছেন। তাহারা কথা গোপন করেন না যে, তাহারা যত না কংগ্রেসবিরোধী, তাহা আপেক্ষা বেশ কমিউনিস্টবিরোধী, তাঁহাদের কংগ্রেসবিরোধিতা পারিবারিক কলহ মাত্র। শরৎ বসু কমিউনিস্টদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই সোস্যালিস্ট নেতাদেরই অলিঙ্গন করিতেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে সকল নেতা পালাইয়া গিয়াছেন শরৎ বসু তাঁহাদের লইয়া যুক্ত ফ্রন্ট করিতেছেন। এই সকল বাবু সোস্যালিস্টরা ফ্যাসিস্ট নৃশংসতার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিরোধকে "হঠকারিতা" বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। সহজেই বুঝা যায়, এই ফ্রন্ট অনেক বিষয়েই রায় মন্ত্রিসভা এবং নেহরু সরকারের সহিত একমত। নেহরুজীর মতই সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও গণ শিবিরের মধ্যে ইহারা "নিরপেক্ষতার" সমর্থক। ইহারা সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারী বলিয়া নিন্দা করে, যদিও ইহারা জানে যে, নেহরু সর-

(৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পশ্চিম বাংলায় মারোয়াড়ী-গুজরাটি বাণিয়া-গোষ্ঠীর-অবাধ শোষণের পথে পণ্ডিত নেহরুর ওকালতি

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পশ্চিম বাংলার নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার কুকর্ম্মের সমর্থনে এক লম্বা বিবৃতি জাহির করিয়াছেন।

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী গত দুই বছর অসংখ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়া পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার দুঃশাসনের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতার উপ-নির্ব্বাচনে সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিক এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ফলে কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর মধ্যে উপদলীয় কলহ তীব্র হইয়াছে। কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রিত্বের গদী হইতে বঞ্চিত তাঁহারা এখন ভাল মানুষ সাজিয়া এই সুযোগে মন্ত্রিসভা দখল করার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আছেন পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং ভূতপূর্ব্ব প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রভৃতি। পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় আসিলে তাঁহারা ডাঃ রায়, নলিনী সরকার, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি মন্ত্রিসভার বড় চাঁইদের বিরুদ্ধে ১৭ দফা দুর্নীতির অভিযোগ পণ্ডিতজীর নিকট পেশ করেন। অভিযোগের অধিকাংশই সরকারী দপ্তরের কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া তৈরী করা হয়।

ধনিকশ্রেণী অনেক সময়ে উপদলীয় স্বার্থে নিজেদের ঘরের সামান্য সামান্য তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই সামান্য তথ্য হইতেই জনসাধারণ আন্দাজ করিতে পারেন পর্দার আড়ালে সরকারী দপ্তরে, ব্যবসায়ীদের অফিসে আর বড় বড় হোটেল ও চায়ের মজলিসে কি ঘটিতেছে।

এসম্পর্কে পশ্চিম বাংলার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নলিনীবাবু খুব বুদ্ধিমানের মত কথা বলিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, অভিযোগকারী অর্থাৎ ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনকার দুর্নীতি সম্পর্কেও তাঁহার হাতে "সুনির্দ্দিষ্ট এবং অকাট্য প্রমাণ" আছে; কিন্তু তিনি উহা প্রকাশ করিবেন না। কারণ তাহাতে "নারকীয়" অবস্থার সৃষ্টি হইবে, অর্থাৎ যাহা এখনো গোপন আছে তাহাও ফাঁস হইয়া যাইবে। এই জন্যই তিনি "চুপ" করিয়া "জনসেবা" করিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কংগ্রেসী "জনসেবার" চেহারা

কিন্তু এই "জনসেবার" যতটুকুর উপর আলোকপাত হইয়াছে তাহাতে কি দেখা যায়? কংগ্রেসী ধনিকশ্রেণী দিনরাত শ্রমিকদের উপদেশ দেন: পেটে পাথর বাঁধিয়া উৎপাদন বাড়াও; কৃষকদের তাঁহারা উপদেশ দেন: অনাহারে থাকিয়া ফসল বাড়াও; দোকানদার ও নাগরিকদের উপদেশ দেন: 'জাতীয়' সরকারের জন্যে আরো বেশী ট্যাক্স দাও। তারপর সেই সমস্ত পণ্য, সমস্ত ফসল, সমস্ত অর্থ তাঁহারা মুষ্টিমেয় লোক লুট করেন, ভোগ করেন, নিজেদের নিকট আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিলি বণ্টন করেন।

ইহা পশ্চিম বাংলার কোন বিশেষ চিত্র নয়; প্রত্যেক প্রদেশে কংগ্রেসী ধনিক শাসনের এই একই চেহারা। নয়াদিল্লীতে গত দুই বছরের মধ্যে কমপক্ষে দুইবার কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর কেলেঙ্কারী ধরা পড়িয়াছে। ভাবা-বদ্মুখম চেট্টি মন্ত্রিদ্বয়কে সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে উহাদের কুকীর্ত্তির সমর্থনেও অনেক "যুক্তি" উপস্থিত করিতে হইয়াছিল।

কে কাহার বিচার করে

সুতরাং, আসামী যেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, অভিযোগকারী যেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বলোভীরা এবং বিচারক যেখানে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নিজে সেখানে "বিচারের" ফলাফল সম্পর্কে কাহারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই "বিচারের" মধ্য দিয়া আসামী, অভিযোগকারী এবং বিচারকের স্বরূপ যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই মত প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রত্যেকটি অভিযোগ এবং তাহার উপরে নেহরুজীর প্রত্যেকটি মন্তব্য হইতেই নাগরিকরা নিজ নিজ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন।

প্রথম অভিযোগটি কি? মারোয়াড়ী "প্রিয়পাত্র" জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এবং কালী বসু সম্পর্কে। অনেকেই হয়ত ভাবিবেন, অভিযোগটি অল ইণ্ডিয়া এক্সিবিশন সম্পর্কে। না, তাহা নয়। সেই টাকার হিসাব কেহ আজও চাহে নাই। প্রশ্ন উঠিয়াছে, কালী বসু লবণের পারমিট এবং ওয়াগনের পারমিট পাইলেন কি করিয়া? পুলিস তদন্তে প্রকাশ পায়, ডাঃ রায় নিজে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডাঃ মাথাইর নিকট হইতে ঐ সুবিধা আদায় করিয়া দিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, আজকালকার দিনে ওয়াগন পাইবার জন্যে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা কত টাকা খরচ করেন। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পর্কে নেহরুজী কি রায় দিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন: **যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।** কারখানার কোন শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি দাবী করিলে তাঁহাকে যাহাতে সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই সাজা দেওয়া যায় তাহার জন্যে পশ্চিম বাংলায় স্পেশাল কোর্ট অর্ডিনান্স পাশ হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু নেহরুজীর 'সাক্ষ্য প্রমাণের' প্রতি এত ভক্তি দেখা যায় না!

শ্রমিক ও আশ্রয়প্রার্থীর বাসস্থান জোটে না কেন?

কিন্তু 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' সংগৃহীত হইলে কি হয় দেখুন। [৩নং অভিযোগ] সিমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ডালমিয়ার ব্যবসায়ী মেসার্স রাম কুমার শিব রায় আসামে কাপড় চালান দিতেন। তাঁহারা এমন ব্যবস্থা করেন যাহাতে কিছু মাল কলিকাতায় "খালাস"। করা হইত এবং পরে পশ্চিম বঙ্গের "মজুত" মাল হইতে আসামে প্রেরণ করা হইত।

এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে কালোবাজারের অভিযোগ আসিলে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন পুলিস অফিসার "তদন্তে আসেন" প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়ের হস্তক্ষেপের ফলে তাহার পক্ষে ঐ কোম্পানীর অফিসে খানাতল্লাসী করা সম্ভব হয় নাই, বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন যোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর সহিত কথাবার্ত্তা বলেন এবং পরে পুলিস অফিসারটিকে জানান যে, ডাঃ মুখার্জ্জী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

এই অভিযোগ সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন: **গবর্নমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে ইহার মধ্যে অসাধুতা কিছু নাই।** আসামে যাহারা কাপড়ের অভাবে নিজেদের মা-বোনের লজ্জা নিবারণ করিতে পারেন না তাঁহারা নিশ্চয়ই পণ্ডিত নেহরুর এই রায়ে খুশী হইবেন!

দ্বিতীয় অভিযোগটি হইল, ডাঃ রায়ের কর্ম্মচারীরা ধরা পড়েনা। কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় বে-সামরিক সরবরাহ মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সম্মতিক্রমে মামলা স্থগিত রাখেন এবং যাঁহারা কর্ম্মচারীদের গ্রেপ্তার করেন তাঁহাদের তিরস্কার করেন।

এত 'সাক্ষ্য প্রমাণ' সত্ত্বেও নেহরুজী এই অভিযোগে রায় দিলেন: **ইহা অসাধুতার জন্যে হয় নাই; ইহা একটু ভুল হইয়াছে।**

সিমেণ্টের অভাব বলিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইবুনাল মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, শ্রমিকদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সিমেণ্ট কোথায় যায় তাহার আরও সন্ধান মিলিয়াছে ৭নং অভিযোগে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সিনেমা-গৃহ নির্ম্মানের জন্য প্রচুর সিমেণ্ট ও ইস্পাতের পারমিট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর মতে, **ইহাতে অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু নাই।** কলিকাতার গরীব বাসিন্দা ফুটপাতে ঘুমন্ত অবস্থায় গাড়ী চাপা পড়ে পড়ুক কিন্তু কংগ্রেসী যুক্তিতে তাহা অস্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ নাই।

সরকারী টাকা কি হাওয়া হয়?

চতুর্থ এবং পঞ্চম অভিযোগ আনা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় বিমান ক্রয় ও বিমান রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে। এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়া প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায়ের একটি কারবার। এই কোম্পানী হইতে সরকারী তহবিলের ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একখানা বিমান ক্রয় করা হয় এবং বিমান রক্ষণাবেক্ষণের নামে ঐ কোম্পানীকে মাসে আরও ৮ হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হয়।

সরকারী তহবিলে টাকা নাই বলিয়া ইহারাই আঠার টাকা বেতনের পিওনদের মাসিক বেতন বিশ টাকা করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত নন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ইহার মধ্যে কোন 'অন্যায় দেখিতে পান না'। তিনি বরং উহার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন: **আসাম এবং অন্যান্য কংগ্রেসী সরকারও তাঁহাদের বিমান রক্ষণাবেক্ষণের ভার এয়ার ওয়েজ ইণ্ডিয়ার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।** আসামের মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা ডাঃ বিধান রায়ের অনুগ্রহে পুলিসের হাত হইতে যদি ছাড়া পান, তবে আসাম সরকার ডাঃ রায়ের কোম্পানীকে এতটুকু অনুগ্রহ করিবেন না, আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে এতখানি অকৃতজ্ঞ মনে করার কি কারণ আছে?

৬নং অভিযোগটি স্টেট বাস সম্পর্কে। অনেকে হয়ত ভাবিবেন, উহার ক্রয় সম্পর্কে; কিন্তু তাহা নয়। সে ব্যাপারে অভিযোগকারীরাও অংশীদার বলিয়াই সম্ভবত চুপ করিয়া গিয়াছেন। অভিযোগ করা হইয়াছে যে, স্টেট বাসের জন্যে গ্যারেজ প্রভৃতি তৈয়ারীর নাম করিয়া বাদবপুরে এক মারোয়াড়ী কোম্পানী মারফৎ ১০ লক্ষ টাকায় ১০০ বিঘা জমি ক্রয় করার ব্যবস্থা হয়। চলতি দর অপেক্ষা উহা অনেক বেশী বলিয়াই যেখানে ৩০ বিঘা জমির প্রয়োজন সেখানে ১০০ বিঘা ক্রয় করিয়া মোটা টাকা মারিবার ব্যবস্থা হয়। এখানেও পণ্ডিত নেহরু "অযৌক্তিক বা অন্যায়" কিছুই দেখিতে পান নাই।

৮নং অভিযোগে দেখা যায়, বেলেঘাটার ভিজিয়ানাগ্রাম প্রাসাদটি আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে ক্রয় করার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার "টাকার অভাবে" উহা ক্রয় করেন না। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার উহা ক্রয় করিয়াছেন। নিজাম প্রাসাদটি মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারকে দেওয়া হইয়াছে; এই প্রাসাদটি কাহার ভাগ্যে জুটিবে তাহা লইয়া এখনো জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের শিশু-সন্তান বৃষ্টির জলে ভিজিয়া মরুক, কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর নিকট এই ধরনের অভিযোগ **"বড়ই অস্পষ্ট" বোধ হইতেছে।**

আগস্ট বিপ্লবীর দপ্তরে 'বিপ্লব'!

৯নং ও ১০নং অভিযোগ কিন্তু 'আগস্ট বিপ্লবী' মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন সম্পর্কে। এই ভদ্রলোক তাঁহার প্রত্যেক রেডিও বক্তৃতা ও বিবৃতিতে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে,

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার দুর্নীতির নির্লজ্জ সমর্থন

লুটের নেশাই কমিউনিষ্ট বিদ্বেষের উৎস

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেশের লোক সবই দুর্নীতিপরায়ণ, সবই চোরাকারবারী।

সিভিল সাপ্লাই সম্পর্কে অভিযোগ এই যে, তাঁহারা পারমিট বিলি, রেশন শপ বিলি প্রভৃতির ব্যাপারে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন [অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অথবা সেবাদল গুণ্ডাদের মধ্যে উহা বিলি করিয়াছেন]। প্রফুল্ল সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হুগলীর সুকুমার দত্ত। এই ভদ্রলোক গত যুদ্ধের সময় সুতার "কারবার" করেন। এবার তিনি আইন সভা হইতে পদত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল সেনকে আইন সভায় আসিবার সুযোগ দেন। তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে প্রোকিওরমেন্ট এবং হ্যাণ্ডলিং কো-অপারেটিভ-এর চেয়ারম্যান করা হয় এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের হাতে পশ্চিম বাংলার সমস্ত কাপড়ের ভার দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রফুল্ল সেনের বন্ধুদের গোপনে গোপনে "ক্রেতা" মনোনীত করা হয়। এই ক্রেতাদের মধ্যে আছেন, এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার মিঃ আগরওয়ালা, 'ন্যাশন্যাল টেক্সটাইলস্' [সম্পূর্ণ নূতন নাম], রাম কুমার শিবচাঁদ রায় [ইহাকে কাপড়ের পারমিট দিবার জন্য ডাঃ রায় নিজে টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট পত্র লিখেন], কংগ্রেসী চীফ হুইপ পরিচালিত হুগলী ট্রাষ্ট; বিড়লা মিলের বস্ত্র বিলি ব্যবস্থার জন্য বসন্তলাল মুরারকা; প্রভুদয়াল হিম্মত সিংকা ও রামকিশোর তুয়ালকাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই বিড়লাজীর ঘনিষ্ঠ সেবক।

এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে নেহরুজী মন্তব্য করিয়াছেনঃ **ভাসা ভাসা অভিযোগ সম্পর্কে বিবেচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।** যাহাদের বিরুদ্ধে "ভাসাভাসা" অভিযোগও দাঁড় করানো যায় না পণ্ডিত নেহরু বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিনা বিচারে আটক করেন, তখন কিন্তু একবারও "ন্যায়" বা "যুক্তির" কথা উঠে না।

গুলি ও তদন্ত একসঙ্গে চলিবে

শুধু আটক করা নয়, তাহাদের উপর গুলিচালনা করাও পণ্ডিতজীর নিকট অযৌক্তিক মনে হয় না। তাই ১৩নং অভিযোগে যখন কলিকাতার রাজপথে নিরস্ত্র মেয়েদের হত্যা করার কথা তোলা হয়, আলীপুর ও দমদম জেলে বন্দীদের হত্যা করার কথা তোলা হয়—তখন পণ্ডিতজী মন্তব্য করেনঃ ইহার জন্যে মন্ত্রিসভাকে কোন প্রকারেই দায়ী করা চলে না। করোনারের রায়ে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পুলিস আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায় নাই; পুলিসের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য গুলিচালনার কোন যুক্তিই ছিল না। পণ্ডিতজীরা পুলিসকে হুকুম দিয়াছেন ঃ "হত্যা করার জন্যে গুলি কর"। সুতরাং তাহার পর তাঁহারা এখন কাহাকে দায়ী করিবেন ?

তবে, প্রধানমন্ত্রী এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা শুধু গুলিই চালাইবেন না, গুলিচালনা এবং সরকারী তদন্ত—দুইই একসঙ্গে চালাইবেন!

১৪নং এবং ১৫নং অভিযোগের বিষয়-বস্তু হইল, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বড় বড় সরকারী চাকুরী বণ্টন। ঠিক এই কাজটি বিনা বাধায় করার জন্যেই রায় মন্ত্রিসভা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের নিয়মকানুন পর্য্যন্ত সংশোধন করিয়াছেন। ওয়াকফ কমিশনার, এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল, ডাইরেক্টর অব পাব্লিক রিলেশনস, স্পেশাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার, ডাইরেক্টর অব পাব্লিসিটি, ডাইরেক্টর অব ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি মোটা বেতনের চাকুরীগুলি নিজেদের খাতিরের লোকদের দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে বাঁকুড়ার কংগ্রেস নেতা কমল রায়ের নিয়োগটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভদ্রলোককে বিধান বাবু আইন সভা হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তাঁহার আসনে টাকীর জমিদার এবং ডাঃ রায়ের বন্ধু হরেন রায় চৌধুরীকে দাঁড় করানো হয় এবং তাঁহাকে শিক্ষা-মন্ত্রী করা হয়। কমল রায়কে প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এবং পরে পশ্চিম বাংলার পাব্লিক রিলেশনস্ অফিসারের পদে নিযুক্ত করা হয়। **বিধানবাবুর বন্ধু সি-সি বিশ্বাসের জন্যে** আর কিছু না জুটাইতে পারিয়া কর্পোরেশন তদন্তের ব্যবস্থা করেন। এই সকল নিয়োগ সম্পর্কে নেহরুজী মন্তব্য করিয়াছেন ঃ **অভিযোগের আদৌ কিছু কারণ দেখিতেছি না।** লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন ও ভাতা সহ যে ব্যক্তি নিজের বোনকে বড় চাকুরীতে বসাইয়াছে, দিল্লীর দপ্তরকে যাঁহারা নেহরু-প্যাটেলে ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এ ক্ষেত্রে অভিযোগের কোন কারণ দেখা নিশ্চয়ই খুব শক্ত।

টাকার অজুহাতে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে গরীবের ভাত বন্ধ করা হইতেছে, আর বিধান রায় কলিকাতার ভূগর্ভে রেলের অনুসন্ধানের জন্য তিনলক্ষ হইতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন; এবং ঐ সম্পর্কে আরো বেশী জ্ঞান লাভের জন্য বিধান রায়কে মন্ত্রিসভা আরও ১০০০০, টাকা দিয়াছেন। নেহরুজী এই অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন ঃ ইহা মোটেই আপত্তিকর নয়, বিধানবাবু নিশ্চয়ই টাকার হিসাব দাখিল করিবেন। টাকা খরচ করিতে আপত্তি নাই, শুধু সরকারী দপ্তরে তাহার হিসাব চাই!

১১নং অভিযোগটি আনা হইয়াছে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মিঃ সরকার সম্পর্কে। সিমেন্ট ব্যবসায়ী মিঃ তালুকদারের পক্ষে তিনি এক ব্যাঙ্কে ৫০ লক্ষ টাকার জন্যে জামীনদার ছিলেন। শিল্প বিভাগের ডাইরেকটর [যিনি এক সময়ে নলিনীবাবুর কর্ম্মচারী ছিলেন] এন-আর সরকার কোম্পানীকে কাঁচের পারমিটের জন্যে সুপারিশ করিয়াছেন। এই অভিযোগ নাকচ করার প্রধান যুক্তি নেহরুজী দিয়াছেন ঃ নলিনী সরকার নিজে উহা অস্বীকার করিয়াছেন।

একথা মনে করা ভুল হইবে যে, অভিযোগকারীরা মন্ত্রিসভার সমস্ত দুর্নীতিই তাঁহাদের অভিযোগে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা তাঁহারা করেন নাই। এমন কি আইনসভায় মন্ত্রী নীহারেন্দু দত্তমজুমদার সম্পর্কে যে অভিযোগ প্রকাশ্যে আলোচিত হইয়াছে তাহাও এখানে লিপিবদ্ধ হয় নাই! মন্ত্রিসভার মধ্যে যাঁহারা গোপনে ডাঃ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাঁহাদের দুর্নীতি সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় নাই।

কিন্তু যতটুকু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জিনিস চোখে পড়ে।

কমিউনিষ্ট বিরোধিতার আসল কারণ

প্রথমেই চোখে পড়ে, বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার সহিত মাড়োয়ারী, গুজরাটী, বাণিয়া প্রভুদের ঘনিষ্ঠতা। যেখানেই মাড়োয়ারী-গুজরাটী প্রভুদের উপর সামান্য 'বিপদ' আসিয়াছে, ডাঃ রায় নিজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বিড়লার অনুচর বসন্তলাল মুরারকা হইতে সুরু করিয়া বড়বাজারের সমস্ত বেণিয়ার জন্যে বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা কতখানি মুক্তহস্ত পশ্চিম বাংলার নরনারী তাহা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি চোখে পড়ে তাহা হইল বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার এত উৎকট কমিউনিস্ট-বিরোধিতার আসল কারণ। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মধ্যে যে যত বেশী মারোয়াড়ী-গুজরাটী বানিয়াদের দালাল, যত বেশী দুর্নীতিপরায়ণ, সে তত বেশী "কমিউনিস্ট-বিরোধী।" কমিউনিস্টরা তাহাদের দুর্নীতি ফাঁস করিয়া দেয়, তাহার বিরুদ্ধে লড়ে; কমিউনিস্ট পত্রিকা "স্বাধীনতা"য় সবচেয়ে বেশী কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কেলেঙ্কারী প্রকাশ পায়—তাহার জন্যেই তাহারা কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাঁহাদের পত্রিকা 'স্বাধীনতা'কে এত ভয় করে, তাহাকে বে-আইনী ঘোষণা করে!

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু নিজে এই মাড়োয়ারী-গুজরাটী বানিয়াদের নেতা। এই জন্যেই পশ্চিম বাংলায় বিড়লাজীরা 'বিপদে' পড়িলে নয়াদিল্লীর কর্ত্তারা টেলিফোনে তাহাকে উদ্ধার করেন! নয়াদিল্লী দখল করিয়াই বিড়লাজী-ডালমিয়াজী আজ পশ্চিম বাংলার উপর তাঁহাদের অবাধ শোষণ চালু রাখিতেছেন। বিড়লাজীরা দাবী তুলিতেছেন ঃ পশ্চিম বাংলাকে, যত ক্ষয়ক্ষতিই হোক না কেন, হাতে রাখিতেই হইবে। হাতে রাখার পক্ষে বিধান-নলিনীর মত দালালদের সাহায্য অত্যাবশ্যক। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার রায়ে বিড়লাজীদের দাবীই রক্ষা করিয়াছেন; বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলার জাগ্রত জনগণ পণ্ডিত নেহরুর এই রায়ের কি জবাব দিবেন? দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে সেই জবাবের সামান্য আভাষ মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

ইছাপুরে শতকরা ৯৬ জন শ্রমিকই ধর্ম্মঘটের পক্ষে

ছাঁটাই বন্ধের দাবিতে অর্ডন্যান্স এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের পক্ষ হইতে ১৭ই ও ১৮ই আগষ্ট যে স্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ করা হয়, তাহাতে ইছাপুরের রাইফেল ও মেটাল ফ্যাক্টরীর হিন্দুস্থানী, বাঙালী শ্রমিকেরা বিপুলভাবে সাধারণ ধর্ম্মঘটের পক্ষে রায় দিয়াছেন।

শ্রমিকদের মধ্যে ৯৬% জন এবং অফিস কর্ম্মচারীদের মধ্যে ৬৭% জন ধর্ম্মঘট দাবি করিয়াছেন।

বিভিন্ন অর্ডন্যান্স ডিপো হইতে ১০,০০০ শ্রমিক ছাঁটাই করার যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার করিয়াছেন তাহারই প্রতিবাদে ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব উঠে। গত জুলাই মাসে ইছাপুরে অর্ডন্যান্স কর্ম্মচারী ফেডারেশনের সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বিপুল ভোটাধিক্যে স্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল।

সম্মেলনে 'জাতীয়' টি ইউর শ্রীমৈত্রেয়ী বসু স্ট্রাইক ব্যালট সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

এখন সমস্ত শ্রমিক এক রায় হইয়া ধর্ম্মঘটের পক্ষে রায় দেওয়ার পর হইতে তাঁহার অনুগামীরা শ্রমিকের এ রায় মানা দূরে থাক নূতন করিয়া বিভেদ ও আপোষের কথা প্রচার করিতেছেন।

ধর্ম্মঘট ব্যালটের পূর্ব্বে সরকার দাবি করিয়াছিলেন, বাড়ী ভাড়া ভাতা পাইতে হইলে সমস্ত শ্রমিককে রসিদ দেখাইতে হইবে। কিন্তু ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়া সরকার 'রসিদ দাখিল করার' শর্ত প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

'জাতীয়' টি-ইউর লোকেরা ঐ সুযোগে বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, একটা দাবি যখন সরকার মানিয়াছেন তখন ধর্ম্মঘট করিয়া লাভ কি? লালঝাণ্ডার মিছিলকে আক্রমণ করার জন্য তাহারা প্রাদেশিকতা উস্কাইবারও চেষ্টা করিতেছে।

অথচ বিভিন্ন ডিপোতে ইতিমধ্যেই ছাঁটাই সুরু হইয়া গিয়াছে। ইছাপুর কারখানাতেও ছাঁটাই হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। সোজাসুজি ছাঁটাই করিতে না পারিয়া কৌশলে মেডিকেল কারণের অজুহাতে এখনই প্রায় ৩০।৪০ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তদুপরি বেতন হ্রাস সুরু হইয়াছে। ওভার টাইম খাটিয়া ইতিপূর্ব্বে শ্রমিকেরা ঘাটতি আয় পূরণ করার চেষ্টা করিতেন। বর্ত্তমানে ওভার-টাইম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে শ্রমিকদের প্রায় ২৫।৩০ টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে।

ইছাপুর শ্রমিকেরা বুঝিতেছেন, দালালদের কোণঠাসা না করিয়া ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে বানচাল হইতে দিলে সরকারী আক্রমণ আরো ভয়ানক হইয়া উঠিবে।

মল্লিক

বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গায় শ্রমিকশ্রেণীকে জড়াইবার চেষ্টা ব্যর্থ কর!

শিয়ালদহ স্টেশনের পর হাওড়ার শিবপুর এলাকা এবং শিবপুর এলাকার পর হুগলীর ভদ্রেশ্বর এলাকায় বাঙ্গালী অবাঙ্গালী দাঙ্গা বাধানো হইয়াছে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রত্যেকক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণীকে দাঙ্গায় জড়াইবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চলিয়াছে; শিয়ালদহে রেল-শ্রমিক এবং শিবপুর ও ভদ্রেশ্বরে প্রধানত চটকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রমিকশ্রেণীকেই বাছিয়া লওয়া হইল কেন? কারণ ধনিকরা এখন দলে দলে শ্রমিক ছাঁটাই করিতেছে, শ্রমিকদের মজুরী কাটিতে সুরু করিয়াছে। গত দুই মাসে চটকলের মালিকরা ১০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করিয়াছে; মাসে এক হপ্তা কাজ বন্ধ করিয়া তাহারা চটকল শ্রমিকদের আসল মজুরী কাটিতেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মালিকরা বোনাস হইতে শ্রমিকদের বঞ্চিত করিতেছে।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী "শান্তিপূর্ণভাবে" এই আক্রমণ মানিয়া লইতে পারিতেছে না। 'জাতীয়' টি-ইউ-সি ও সোস্যালিস্ট দালালদের পক্ষে "শিল্পে-শান্তি" শান্তি রক্ষা করা আর সম্ভব হইতেছে না। গত জুলাই মাসে সারা ভারতে শ্রমিকদের মোট যত সংগ্রাম হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে পশ্চিম বাংলায়। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক নূতন সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা বাধাইয়া এই সংগ্রামী ঐক্যকে ধ্বংস করিবার জন্যেই মালিকরা এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

পুলিস মন্ত্রী এবং প্রাক্তন 'জাতীয়' টি-ইউ-সি নেতা কালীপদ মুখার্জ্জী নিজেও তাঁহার রেডিও বক্তৃতায় একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: এখন প্রয়োজন শান্তির। কাজেই যাহারা এই আজাদী 'ঝুটা হ্যায়' বলিবে, যাহারা এই সরকারকে ধনিক সরকার বলিবে, যাহারা এই সরকারের দুর্নীতির কথা মুখে আনিবে তাহারাই শান্তির দুশমন [২৪ আগস্টের বক্তৃতা]। সুতরাং? সুতরাং কালীপদবাবু এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গরা এখন "শান্তি-রক্ষা" করার নূতন পথ খুঁজিতেছেন, সরকার-বিরোধীদের ঠাণ্ডা করার জন্যে নূতন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সুরু করিয়াছেন। [শিয়ালদহ স্টেশনের দাঙ্গার ব্যাপারে 'সহযোগিতা' করার জন্যে এই ভদ্রলোক হিন্দুমহাসভাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন কেন এখন তাহা বুঝা যাইতেছে]।

দাঙ্গার ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে দেখুন। শিবপুরে শ্রমিকদের ক্রোধে 'জাতীয়' টি-ইউ-সির অফিস পুড়িয়া ছাই হইতেছিল, চটকল-লোহাকলের শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি করিতেছিল, এখন সেখানে ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে। পুলিস মন্ত্রীর পক্ষে "শান্তি-রক্ষার" নূতন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ভদ্রেশ্বরে অবশ্য পুলিস মন্ত্রী শুধু ১৪৪ ধারায় সন্তুষ্ট থাকেন নাই। এখানে সান্ধ্য আইন জারি করা হইয়াছে, শ্রমিকদের পক্ষে এমন কি ঘরের বাহির হওয়া পর্য্যন্ত অসম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছে।

এই "শান্তিপূর্ণ অবস্থা" সৃষ্টি করা হইয়াছে চটকলের বড় সাহেবদের মুনাফার জন্যে। তাই দেখা গেল, দাঙ্গার ৫ দিন যাইতে না যাইতে ভদ্রেশ্বর এঙ্গাস জুটমিলের ম্যানেজার নোটিস দিলেন যে, সান্ধ্য আইন জারির ফলে কল বন্ধ থাকার দরুন তাহাদের চট উৎপাদনের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্যে মজুরদের বেশী খাটিয়া দিতে হইবে। কাজেই দুপুরে বিশ্রামের জন্যে যে ২॥ ঘণ্টা সময় থাকে তাহা কাটিয়া দেড় ঘণ্টা করা হইবে।

কিন্তু পুলিসমন্ত্রী এবং চটকলের বড় সাহেবরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের ঐ নূতন অস্ত্রও এখন আর কার্য্যকরী হইবার নয়। ১৯৪৬ আর ১৯৪৯এ পার্থক্য অনেকখানি। সেদিন যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শ্রমিকদের বিপ্লবী ঐক্য ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিল শ্রমিকশ্রেণী আজ তাহাদের আসল চেহারা দেখিতে পাইতেছেন। তাহাদের অধিকাংশ হয় তাঁহাদের নিজস্ব কায়দায় শ্রমিকদের কাজ করিতে বাধ্য করেন। দাঙ্গা কাহারা বাধায়, কাহার স্বার্থে বাধায়—শ্রমিকদের নিকট তাহা আর একবার সাফ্ হইয়া গেল।

* * *

দাঙ্গার মধ্যে দাঁড়াইয়া, ১৪৪ ধারা এবং অন্যান্য বাধা-নিষেধের মধ্যে দাঁড়াইয়া এঙ্গাসের শ্রমিকরা দেখাইয়াছেন কিভাবে দাঙ্গাবাজদের পরাস্ত করিতে হয়, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী একত্রে মালিক ও পুলিসের আক্রমণকে রুখিতে হয়। আর ইহার সহিত তুলনা করুন ধনিক কংগ্রেসী সরকারের 'দাঙ্গা-বিরোধী' কার্য্যকলাপের।

২১শে আগস্ট ভদ্রেশ্বরে দাঙ্গা লাগে। দাঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কে শোনা যায়, একটি সিনেমা হলের মালিকানা লইয়া একজন বাঙ্গালী এবং একজন অবাঙ্গালীর মধ্যে বিরোধ ছিল। ভদ্রেশ্বর থানার দারোগা ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উভয় মালিককে তাঁহার 'সদুপদেশ' দিয়া যান। তাহার পরে কি একটা ঘটনা লইয়া রটিয়া যায় যে, বাঙ্গালীরা একজন অবাঙ্গালীকে মারিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের গুজব শ্রমিকদের মধ্যে ছড়ানো হয়। সিনেমা মালিকদের একজন নিজে চটকলের সর্দার। সুতরাং শুধু সেই সভায় উপস্থিত হইবার 'সৌভাগ্য' হইল না। এবং সেই সভায় উপস্থিত 'নেতা'দের লইয়াই "শান্তি-কমিটি" গঠিত হইল।

এই "শান্তি-কমিটির" কাজ কি হইবে পুলিস মন্ত্রী তাঁহার রেডিও বক্তৃতায়ই তাহা বলিয়া দিয়াছেন। এই শান্তি কমিটির কাজ হইতেছে, কংগ্রেস-বিরোধী, সরকারবিরোধী, মালিক-বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো, যাহারা শ্রমিকদের মধ্যে লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন তৈরী করিতেছেন, তাঁহাদের পুলিসের হাতে অর্পণ করা; দাঙ্গার বিরুদ্ধে লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন যে সকল পোস্টার দিয়াছে, "শান্তি কমিটির" লোকেরা তাহা নষ্ট করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছে। যে 'জাতীয়' টি ইউ-সি এতদিন শ্রমিকদের নিকট মুখ দেখাইতে সাহস করে নাই, এখন তাহারা "শান্তি কমিটির" নেতা সাজিয়া নূতনভাবে আসর জমাইতে চাহিতেছে। এদিকে মালিকদের মধ্যে শলাপরামর্শ চলিতেছে, দাঙ্গাকে উপলক্ষ করিয়া আরও কিছু শ্রমিক কিভাবে ছাঁটাই করা যায়।

শুধু ভদ্রেশ্বর নয়, সারা বাংলার শ্রমিকশ্রেণীকেই এই নূতন আক্রমণ

কংগ্রেস-বিরোধীদের বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণীর নূতন অস্ত্র প্রয়োগ

ভারত, নতুবা পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায়। কিন্তু সেদিন তাহাদের উস্কানীতে যাহাদের বাড়ীঘর জ্বলিয়াছিল, তাঁহারা এখনো স্ত্রী-পুত্র লইয়া গাছতলায় দিন কাটাইতেছেন। সেদিন লালঝাণ্ডাই মালিকদের এই দাঙ্গা-নীতি সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, আজ শ্রমিকরা দেখিতেছে সেই সাবধানবাণী কতখানি সত্য।

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর এই চেতনা আজ কতখানি বাড়িয়াছে তাহাও দেখা গেল ভদ্রেশ্বরে। দাঙ্গার নামে পুলিস মন্ত্রী যতই ১৪৪ ধারা এবং সান্ধ্য আইন জারী করুন না কেন, শ্রমিকরা সহজে বেশী খাটিতে রাজি হইলেন না। তাঁহারা স্পিনিং বিভাগের প্রতিনিধি ছবিলালের নেতৃত্বে ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া নোটিস প্রত্যাহার দাবী জানাইলেন। তাঁহারা ম্যানেজারকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে, দাঙ্গার সমস্ত দায়িত্ব পুলিস এবং মালিকদের। ক্ষতি যাহা কিছু হইয়াছে তাহা শ্রমিকদের। সুতরাং, ক্ষতিপূরণ মালিক এবং পুলিসকেই করিতে হইবে। এত দাঙ্গার পরও বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী শ্রমিকদের এই ধরনের জঙ্গী ঘেরাও এবং কড়া মন্তব্য সাহেব আশা করেন নাই। তিনি তখন ছবিলালকে ছাঁটাই করিলেন।

প্রায় এক হাজার বিক্ষুব্ধ শ্রমিক আবার ম্যানেজারকে ঘেরাও করিলেন। এবার মহকুমা হাকিম ও পুলিস সাহেবরা পুলিস নয়, চটকল মালিকদেরও সে আজ্ঞাবহ। কাজেই দাঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কে কোন কিছু অনুমান করাই শক্ত নয়।

দাঙ্গার খবর শুনিয়া যাহারা অপর পক্ষকে সংগঠিত করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন বহুদিনের নাম করা গুণ্ডা; কলিকাতার একটি ডাকাতি সম্পর্কে সেই লোকটি একবার গ্রেপ্তারও হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের তদ্বিরের ফলে মুক্তি পাইয়াছে। এবারও প্রথমে গুজব রটানো হয় যে, [সম্ভবত তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের উত্তেজিত করার জন্যেই] তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার পরে শোনা গেল, একজন মন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাকে মুক্ত করেন। পুলিসের চোখের উপর দাঙ্গা ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত হয়।

তিন দিন দাঙ্গা চলিবার পর কংগ্রেসী গবর্নর ভদ্রেশ্বরে পদার্পণ করেন। ১৪৪ ধারা এবং সান্ধ্য আইনের মধ্যেই তিনি থানার মাঠে 'বিরাট' সভা ডাকিলেন। চটকলের লেবার অফিসার, সর্দার, 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতা, কংগ্রেসী পাণ্ডা, সিনেমার সেই মালিক, মহকুমা ও জেলা হাকিম এবং পুলিসের বড় কর্ত্তারা এবং বিড়লার দালাল বসন্তলাল মুরারকা প্রভৃতি কংগ্রেসী পাণ্ডারা ছাড়া আর কাহারো সম্পর্কে হুসিয়ার থাকিতে হইবে। ধনিক-শ্রেণীর রক্ষিতা পত্রিকাগুলি, ধনিকশ্রেণীর দালাল 'জাতীয়' টি-ইউ-সি এবং সমাজতন্ত্রী মজুর পঞ্চায়েত এবং ধনিক কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী লালঝাণ্ডার সংগ্রামী ঐক্যকে ভাঙ্গিবার জন্যে শেষ অস্ত্র হিসাবে এখন দাঙ্গার উস্কানী দিতেছে। বিড়লার সুতাকল অথবা নলিনী সরকারের পটারী কারখানার যখন মজুর ছাঁটাই হয় তখন কিন্তু তাহারা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিচার করে না। পণ্ডিত নেহরুর গবর্নমেণ্ট যখন দমননীতি চালান তখনও তাঁহারা বাংলা, যুক্তপ্রদেশ বা মাদ্রাজের মধ্যে কোন বাছ বিচার করে না। যদি কোন বাঙ্গালী শ্রমিক অবাঙ্গালী শ্রমিকের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় যোগ দেয় তাহাতে বিড়লা-নলিনী সরকার-নেহরু সরকারের শোষণ, এবং জুলুমই আরো স্থায়ী হইবে। বাঙ্গালীর যাহা কিছু দাবি, অবাঙ্গালীর যাহা কিছু অভিযোগ—এই ধনিক সরকার খতম না করিতে পারিলে তাহার মীমাংসা হইবে না। একমাত্র শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করিয়াই তাহা করা সম্ভব, অন্য কোন পথ নাই।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

৩

অপরাজেয় পটারী শ্রমিক!

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাতা বা চাকুরীর জন্যে কিন্তু একটা আইনও পাশ করতে এগোলেন না। আর্থিক সংকটের বোঝা শ্রমিকের উপর চাপাতে তারা যখন ব্যস্ত, তখন নূতন নূতন শ্রমিক সে সংকটের ধাক্কা খেয়ে লালঝাণ্ডার তলে এসে দাঁড়ালো।

তারপর পটারী শ্রমিক দেখতে পেলো তাদেরই কারখানা মালিকের প্রত্যক্ষ ডিক্টেটরী শাসন। ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার বদলে কায়েম হলো ডাঃ রায়ের সংকট কালীন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা। বিধান রায়ের মন্ত্রিসভায় পটারীর মালিক নলিনী সরকার হলেন যোগ্য সহচর। দারোগা পঞ্চানন ঘোষালের হাতে এবার এলো পটারী শ্রমিকের দণ্ডমুণ্ড বিধানের ভার। এবার কংগ্রেসী শাসকরা আওয়াজ তুললেন: কম মজুরী দিয়ে বেশী খাটুনী আদায় করতে হবে। তার জন্যে প্রত্যহ ছাঁটাইএর নয়া নয়া পথও আবিষ্কার করা হলো।

ঠিক এমনি এক ছাঁটাইয়ে লালঝাণ্ডাই পটারীর শ্রমিকদের ডাক দিয়ে বললো: রুখে দাঁড়াও। আজ তোমাদের নেতা রামধনিয়াকে যারা ছাঁটাই করেছে, কাল তারা তোমাকেও ছাঁটাই করবে। পিছে হট্‌বার কোন পথ নেই, রুখে দাঁড়াও।

রুখে দাঁড়ান পটারীর দেড় হাজার সৈনিক। বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা কারখানাকে নয়া জালিয়ানওয়ালাবাগে পরিণত করলো। কিন্তু তাঁরা কি ভুলে গিয়েছিল, কিভাবে এই জালিয়ানওয়ালাবাগই বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিয়াছিল?

পটারী শ্রমিকের সাথেই রুখে দাঁড়ালো সারা কলিকাতা, সারা বাংলা। বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার প্রার্থী পরাজিত হলেন দক্ষিণ কলিকাতায়। কলকাতার নাগরিক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন: তাঁরা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ফ্যাসিস্ট শাসনকে সমর্থন করেন না। তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভারই বিরুদ্ধে। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নেহরু এসেছিলেন দুনিয়ার হত্যাকারীদের পক্ষ হয়ে ওকালতি করতে। কিন্তু তাঁরা কেউ বিক্ষুব্ধ জনগণকে ফিরাতে পারেন নি।

পুলিস-দালাল-গুণ্ডা ও কংগ্রেসী ভালমানুষেরা সকলে একত্র হয়েও পটারীর শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ভাঙতে পারেননি, তাঁদের কাজে ফেরাতে পারেনি। রামধনীর পুনর্নিয়োগ না হলে, বন্দী শ্রমিকদের মুক্তি না হলে, বেতন বৃদ্ধির দাবী পূরণ না হলে, দুনিয়ার ক্ষতিপূরণ না হলে পটারীর শ্রমিক কারখানায় ফিরতে পারে না—দিনের পর দিন সে ঘোষণা আরও স্পষ্ট হলো।

কংগ্রেসী দালাল অমিয় দাশগুপ্তের দল এতদিন পুলিস ও আগুনের উপর নির্ভর করে এদের কারখানায় ঢুকাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আজ কংগ্রেসভক্ত শ্রমিকও মাথা নীচু করে মালিকের দাসখতে নাম লিখতে রাজী নয়; প্রতিদিন এত শ্রমিক তো বেকার হচ্ছে, তারা কেউ পটারীর ধর্ম্মঘটে ব্ল্যাকলেগ হতে রাজী নয়। তাই কংগ্রেসী দালালদের নূতন কৌশল হয়েছে 'সত্যাগ্রহী' আর 'ধর্ম্মঘটী' ভোল নিয়ে লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের থেকে কংগ্রেসী শ্রমিকদের আলাদা করা।

পণ্ডিত নেহরু সাধারণ নির্ব্বাচনের চাল দিয়ে যেভাবে পশ্চিম বাংলার জনগণকে ধাপ্‌পা দিচ্ছেন, অমিয় দাশগুপ্তের দলের ধাপ্পাবাজি তার থেকে কম সুচতুর নয়। নেহরুজী নির্ব্বাচনের চাল চেলেছেন কমিউনিস্টদের জেলখানায় রেখে; আর অমিয় দাশগুপ্তের দল 'সংগ্রামের' শর্ত্ত রাখছেন: লালঝাণ্ডাকে বাদ দিতে হবে। কমিউনিস্টদের জেলে রেখে নির্ব্বাচন চালানোর উদ্দেশ্যে যেমন, বিধান মন্ত্রিসভাকে কায়েম রাখা; তেমনি লালঝাণ্ডাকে বাদ দিয়ে "সংগ্রামে"র সাধু উদ্দেশ্য হলো খিরকীর দরজা দিয়ে মালিকের নিকট আত্মসমর্পণ। বন্দুক যখন ব্যর্থ হয়, তখন এরকম চালই ধনিকরা চালে।

কংগ্রেসী দালালরা বলে: লালঝাণ্ডা ছেড়ে দাও, তোমাদের সব দাবী আদায় করে দিচ্ছি। পটারী শ্রমিক তার জবাব দেয়: যদি তোমাদের উদ্দেশ্যে এতই সাধু, তবে সেখানকার লালঝাণ্ডা নেতাদের তোমরা জেলে পুরেছ, সেখানকার শ্রমিকদের আজ এ অবস্থা কেন? সেখানকার শ্রমিকদের উপর তোমাদের কংগ্রেসী মালিকরা আরো হাজার গুণ বেশী আক্রমণ চালাচ্ছে কেন?

কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর আক্রমণে লালঝাণ্ডা দুর্ব্বল চটকলে। সেখানে দু' মাসে ১০ হাজার মজুর ছাঁটাই হয়েছে; এখন আসল মজুরী কাটবার জন্যেই হপ্তাবন্দী চলেছে। লালঝাণ্ডা দুর্ব্বল ভদ্রেশ্বরে। তাই সেখানে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গায় চটকল শ্রমিকদের সর্ব্বস্বান্ত করে ফেলা হচ্ছে। দাঙ্গার নামে তাদের সকল অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তার সাথে তুলনা কর পটারী কারখানার। এখানে রামধনী চাকুরীর জন্যে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়ছে। এখানে লালঝাণ্ডার ডাকে শ্রমিকরা লড়েছে বলেই 'জাতীয়' টি-ইউ-সি সমাজতন্ত্রী দালালদের ভেদনীতি বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। লালঝাণ্ডার লাল আলোতে এখানে শ্রমিকরা কংগ্রেসী শাসকদের কালো চেহারা দেখছে বলেই কংগ্রেসী রাজের বিরুদ্ধে এমন বাহাদুরের মত লড়তে পারছে। ধর্ম্মঘট—তা ছাঁটাই নিয়েই সুরু হোক, আর বাঁচার মত মজুরীর দাবীতেই সুরু হোক—তা নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ নিচ্ছে।

ঠিক এজন্যেই পটারী শ্রমিক অন্যান্য কারখানার শ্রমিক থেকে আলাদা। এরা শত্রুকে চিনতে পেরেছে। তাই এরা যখন শোনে গ্রাম থেকে সংগ্রামের ক্ষেত্রে উঠে এসেছে ক্ষেতমজুর, নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে লড়বে বলে, এরা ছুটে যায় ময়দানের সমাবেশে; ক্ষেতমজুরকে জড়িয়ে ধরে অতি পরিচিত বন্ধুর মত অতি নিকট সহযোদ্ধার আন্তরিকতা নিয়ে। তারপর তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তোলে: নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা ধ্বংস হোক। ক্ষেতমজুর সম্মেলনকে সফল করার জন্যে পটারীর মেয়ে মজুর তার শেষ পয়সাটি দিয়ে মন্তব্য করে: গরীবের একতার জয় হবেই।

জয় তাদের হবেই। গত তিন মাস তারা তারই প্রমাণ পেয়েছে চারিপাশে। কংগ্রেসী শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের ফেটেপড়া বিক্ষোভ দেখতে পেয়েছে তারা ১৫ই আগস্টে, দেখতে পেয়েছে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে, স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে, কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে।

জয় তাদের হবেই। শুধু পূর্ব্ব কলকাতায় ছোট ছোট কারখানায় নয়, সারা শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে তারা দেখতে পেয়েছে সেই জয়ের হাতিয়ার—সাধারণ ধর্ম্মঘটের আকাঙ্ক্ষা। ২৮শে আগস্টে 'পটারী দিবস' পালনের মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়েছে। কিন্তু তারা দেখতে পাচ্ছে সেদিন দূরে নয়, যখন আবার ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই ফিরে আসবে। লালঝাণ্ডার তলে সারা ভারতের মজুর ধর্ম্মঘট করে আওয়াজ তুলবে: কংগ্রেসী ধনিক শাসন ধ্বংস হোক। কংগ্রেসী শাসনকে ধ্বংস করার শক্তি তারা দেখতে পেয়েছে, নিজেদের কারখানায় গত তিন মাসের অপূর্ব্ব প্রতিরোধের মধ্যে, নিজেদের পিকেট লাইনে, নিজেদের বস্তীর দুর্গগুলিতে।

যারা বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে এখনো হাওয়ার সাথে কুস্তি লড়ছেন, লালঝাণ্ডাকে বাদ দিয়ে 'বামপন্থী ঐক্য' গড়বার দিবাস্বপ্ন দেখছেন, তাঁরা একবার চলুন ঐ পটারী কারখানায়। তাঁদের কলিকাতার প্রাসাদ-বাড়ীর বৈঠকখানা থেকে তা বেশী দূরে নয়। দেখে আসুন ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে লড়ছে কারা [সংবাদপত্রে নতুবা বিবৃতি দিয়ে 'সহানুভূতি' নাই জানালেন]; একবার যাচাই করে আসুন নিজেদের "বামপন্থী নীতি"কে সেই কঠিন শ্রেণী-সংগ্রামের কষ্টিপাথরে। দেখে আসুন কিভাবে তৈরী হচ্ছে পটারী শ্রমিকের চারপাশে গরীব বাসিন্দাদের এক লৌহ-দৃঢ় বামপন্থী ঐক্য। পটারীর ধর্ম্মঘট তাদের কাছে সাধারণ মামুলী ধর্ম্মঘট নয়, সীমান্তের যুদ্ধ। যারা এতদিন শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে এসেছিল, নিজেদের দুঃখে-গড়া ছোট ছোট সংসারগুলিকে শত্রুর হাতে তছনছ হতে দেখে এসেছিল, সংকটে ছিটকে পড়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা এবার বুঝতে পারছে, ব্যাপক প্রতি আক্রমণের সময় এসেছে। তারই জন্যে তারা সীমান্তের অগ্রণী সিপাহীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, রসদ যোগাচ্ছে, সমর্থন যোগাচ্ছে।

পটারীর দেড় হাজার সৈনিকের পিছনে তৈরী হচ্ছে, অগণিত সৈনিকের জঙ্গী মিছিল। পটারীর শ্রমিকের পথই তাদের সকলের বাঁচার পথ, মুক্তির পথ।

পটারী দিবসে ৫ হাজার শ্রমিকের জমায়েত

গত ২৭শে আগস্ট বি-পি-টি ইউ-সি'র আহ্বানে 'পটারী শ্রমিক দিবস' প্রতিপালিত হয়। ময়দানে বিকালে বিভিন্ন কলকারখানার ৫ হাজার শ্রমিক পটারীর সমর্থনে সভা করেন। শ্রমিক নেতা বাচান সভাপতিত্ব করেন। টেক্সম্যাকো, এলেনবেরির শ্রমিক, শহীদ প্রতিভা গাঙ্গুলীর ভগ্নি, জনৈক পটারী শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী প্রভৃতি পটারী শ্রমিকদের সংগ্রাম সম্পর্কে বলেন, পটারীর শ্রমিকদের লড়াই জোরের সঙ্গেই চলিবে, পটারীতে লালঝাণ্ডার জয়যাত্রা কেহই ঠেকাইতে পারিবে না। সভার শেষে একটি মিছিল পটারী অঞ্চল ভ্রমণ করে। ধ্বনি ওঠে, "অমিয় দাশগুপ্তের দালালী চলিবে না।"

"পটারী দিবসে বস্তিতে বস্তিতে এবং রাস্তায় গরীবদের নিকট হইতে ভলান্টিয়ারগণ দুই চার পয়সা করিয়া ১০৪৲ টাকা তোলেন। ক্ষেতমজুর সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ শ্রমিক ভাইদের এক মণ চাউল দিয়া গিয়াছেন। হিলারি ইনষ্টিটিউটে গণনাট্য সঙ্ঘ তাহাদের অনুষ্ঠানে পটারী সমর্থনে অর্থ সাহায্যের আবেদন করিয়া টাকা তোলেন। হিলারি ইনষ্টিটিউটে যখন নাটক হইতেছিল তখন পুলিশ আসিয়া শো ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু দর্শক ও গণনাট্য সঙ্ঘের কর্ম্মীরা প্রতোরোধ করেন এবং আক্রমণ স্বত্বেও নাটক চালাইয়া যান।

প্রত্যেকদিনই পটারী শ্রমিকেরা ৪০।৫০ জনের মিছিল বাহির করিয়া সারা অঞ্চলে সংগ্রামী ঐক্যকে দৃঢ় করিতেছেন। সংগ্রামকে আরও সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য ২৭ জন শ্রমিক প্রতিনিধি লইয়া ধর্ম্মঘট কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি ধর্ম্মঘট পরিচালনার ব্যাপারে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মঘট কমিটিতে খাতুন, উমা, বাচিয়া, ধনঞ্জয় প্রভৃতি সাচ্চা সংগ্রামী শ্রমিক নেতা আছেন।

কোম্পানী শত চেষ্টাতেও কাজ চালু করিতে পারে নাই। যে আড়াই শত দালাল কারখানায় ঢুকিতেছিল তাহাদের সংখ্যা কমিয়া এক শ'তে দাঁড়াইয়াছে। কোম্পানী সম্প্রতি ক্লার্ড ব্রেকার নামে এক নূতন মেসিন আনাড়িদের দিয়া চালু করার চেষ্টা করায় মেসিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সারা কারখানায় ইলেকট্রিক ব্যবস্থা বিগড়াইয়া গিয়াছে।

বি-পি-টি-ইউ-সি পটারী শ্রমিকদের মরিয়া লড়াইকে আরো জোরদার করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন করিয়াছে। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা: বি-পি-টি-ইউ-সি অফিস, ২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মঞ্জিল

দমদম কাগজ কলগুলিতে সাধারণ ধর্ম্মঘট

এসিয়াটিক পেপার বোর্ডে ছাঁটাই ও লক-আউটের প্রতিবাদ

২৯শে জুলাইয়ের পর হইতে দমদমের এসিয়াটিক পেপার বোর্ড কারখানায় ছাঁটাই বন্ধ ও বেতন বৃদ্ধির দাবীতে লক-আউটের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। এই কারখানায় শ্রমিকদের প্রতি সংগ্রামী সমর্থন জানাইয়া এই এলাকার তিনটি কার্ডবোর্ড কারখানা লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে সাধারণ ধর্ম্মঘট পালন করেন, এবং ৮০০ হিন্দুস্থানী, বাঙালী, ওড়িয়া শ্রমিকের এক বিরাট মিছিল বাহির করেন।

কারখানার শ্রমিকদের বেতন নিতান্ত কম। ন্যূনতম বেতন ২৬৲ টাকা। শ্রমিকেরা দাবি করিয়াছেন, কমপক্ষে ৬০ টাকা মূল বেতন এবং ১০ টাকা মাগ্‌গী-ভাতা চাই; ইউনিয়নকে মানিয়া লইতে হইবে।

শ্রমিকদের এই দাবিতে ক্ষিপ্ত হইয়া মালিক কতকগুলি গুণ্ডা নিয়োগ করে এবং মহিলা শ্রমিকদের অপমান করার চেষ্টা করে। গুণ্ডাগুলি উচিত শিক্ষা পায়। তখন মালিক ১৮ জন মহিলা শ্রমিককে ছাঁটাই করে। শ্রমিকেরা প্রতিবাদে অবস্থান ধর্ম্মঘট সুরু করিলে মালিক লক-আউট ঘোষণা করে, এবং পুলিস লইয়া কারখানা দখল করে।

ইউনিয়নের নেতা হইতেছেন রুইকর-পন্থী। তাঁহারা শ্রমিকদের সংগ্রামে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে মালিকদের সহিত ঘোরাঘুরি করিতেছেন, এবং হতাশা প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রমিকেরা এই নেতার বিভেদনীতিতে বিরক্ত হইয়া লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে নূতন ধর্ম্মঘট কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং লড়াই জারী রাখিয়াছেন।

টালিগঞ্জ ইষ্ট ইণ্ডিয়া লক-আউটে

প্রতিরোধ ধর্ম্মঘটের জোরে ছাঁটাই শ্রমিক পুনর্ব্বহাল

টালিগঞ্জ ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মেসিউটিকেলের মালিক পক্ষ অত্যন্ত তুচ্ছ এক অছিলায় ৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করিয়া ও ১২ দিন ধরিয়া পুলিস ও গুণ্ডার সাহায্যে কারখানায় লক-আউট জারি রাখিয়া ২৫০ জন শ্রমিকের প্রতিরোধ ধর্ম্মঘটের সামনে অবশেষে পিছু হটিয়াছে। গত ২২শে আগস্ট লক-আউট প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। ৩ জন ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্ব্বহাল ও লক-আউটের সময়কার বেতনের দাবী মালিক মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে।

১৭ জন পিয়নের দোয়াত ধোয়া বাবদ মোট **৫টি টাকা** দিতে মালিক অস্বীকার করায় উক্ত শ্রমিকেরা দোয়াত ধোয়া বন্ধ করেন। মালিক এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া গত ১০ই আগস্ট তিনজন পিয়নকে ছাঁটাই ও পরে কারখানায় লক-আউট জারি করে। লক-আউট কার্য্যকরী করার জন্যে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ও বেসরকারী গুণ্ডাদের নিয়োগ করা হয়। ১৭ জন শ্রমিকের প্রাপ্য মোট ৫টি টাকা দিতে অস্বীকার করার অছিলায় সমস্ত শ্রমিকের উপর এইভাবে আঘাত হানিয়া মালিক ইস্ট ইণ্ডিয়ার লালঝাণ্ডার মজবুত ইউনিয়নকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করে।

লক-আউট জারি থাকা কালীন কারখানার কিছু বাবু-স্টাফের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া মালিকের কয়েকজন পেটোয়া লোক একটি পাণ্টা কর্য্যকরী সমিতি গঠন করে এবং আপোষ-নিষ্পত্তির নাম করিয়া শ্রমিকদের দিয়া মালিকের কাছে 'আত্ম-সমর্পণ' করানোর চেষ্টা করিতে থাকে।

এই সমস্ত অপচেষ্টার বিরুদ্ধে পিওন, বেয়ারার প্রভৃতি সাধারণ শ্রমিকদের নেতৃত্বে কারখানার অধিকাংশ কর্ম্মচারী মালিকের এই জুলুমের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট করিয়া দৃঢ় থাকেন।

গত ২২শে আগস্ট মালিক পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত লালঝাণ্ডা শ্রমিক প্রতিনিধির কাছে আপোষ প্রস্তাব পাঠাইতে বাধ্য হয়। ১। লক-আউট প্রত্যাহার ২। লক-আউট সময়কার বেতন ৩। ৩ জন ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্বহাল ৪। কোন শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা চলবে না—এই চারটি মূল দাবি মানিয়া নিবার ফলে শ্রমিকেরা কাজে ফিরিয়া গিয়াছেন। মলিকের চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। লড়াইএর ভিতর দিয়া লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের প্রতি সাধারণ শ্রমিকের আনুগত্য আরও দৃঢ় হইয়াছে। ইতিমধ্যেই লালঝাণ্ডার দুইটি সাধারণ সমাবেশে ইস্ট ইণ্ডিয়ার সাধারণ শ্রমিকেরা মিছিল করিয়া যোগ দিয়াছেন।

জনগণ নিজস্ব ভোটাধিকার কায়েম করিবে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কারের অনুচরেরা যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তখন একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। সাম্রাজ্য-বাদের হাতের পুতুল বাও-দাই, হাত্তা প্রভৃতির সহিত "এসিয়া ব্লক" গঠনের কথা মুখে আনিতে ইহাদের লজ্জাবোধ হয় না। সোস্যালিস্ট পার্টি এবং সোস্যালিস্ট পার্টির সহিত চুক্তিবদ্ধ এমন কাহাকেও লালঝাণ্ডা কখনো সমর্থন করিতে পারে না, কারণ কংগ্রেসের শ্রমিকবিরোধী গণ-বিরোধী নীতিই সোস্যালিস্ট পার্টিরও নীতি। শরৎ বসু পুনরায় দক্ষিণ কলিকাতার ভোটারদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের রায় প্রার্থনা করুন। জনমতের কষ্টিপাথরে তাহার সদুদ্দেশ্যের আর একবার পরীক্ষা হোক। লালঝাণ্ডা জনগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, তথাকথিত বাম-পন্থী ফ্রন্ট গদীতে বসিলেও জনসাধারণের জীবনে বা অবস্থার কোন পরিবর্তন আনিতে পারিবে না। এ, আই, টি, ইউ, সির মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের ভিত্তিতে এবং ধনিকদের আক্র-মণের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের পথেই শুধু প্রকৃত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তোলা সম্ভব। শরৎ বসু-জয়প্রকাশ নির্ব্বাচনী চুক্তি রায় মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারিবে না, এমন কি নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকেও পরাজিত করিতে পারিবে না। সমস্ত কমিউনিস্ট বিরোধিতার পথেরই পরিণতি ফ্যাসিবাদের জয়ে।

জনগণের নিজস্ব কায়দায় ভোটের অধিকার কায়েম কর

দক্ষিণ কলিকাতার নির্ব্বাচনের রায়ে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। সেখানে জনসাধারণ দাবী করিয়াছিল, দুর্নীতি-পরায়ণ রায় মন্ত্রিসভাকে এখনই গদী ছাড়িতে হইবে, পূর্ণনাগরিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে, বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে, হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে হইবে, ধর্ম্মঘটের অধিকার সুরক্ষিত করিতে হইব, সাধারণ নির্ব্বাচন জনগণের এই রায় হইতে পালাইবার ফন্দী। তাহারা জনগণের নিকট হইতে জোর করিয়া পুলিসের কর্য্যকলাপ, ছাঁটাই ও মজুরী কাটাইয়ের পক্ষে রায় আদায় করিতে চায়।

শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনতাকে সতর্ক ও সুদৃঢ় থাকিতে হইবে। মারোয়াড়ী বাণিয়া এবং তাহাদের মুখপত্রদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে হইবে। নিজেদের মত প্রকাশের অধিকার কিছুতেই ছাড়া হইবে না। জনগণের নিজস্ব কায়দায় সকলের ভোটের অধিকার জোর করিয়া কায়েম করিতে হইবে। সকলের জন্যে ভোট এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার জন্যে জনগণের যে দাবী তাহা অস্বীকার করিয়া যদি নির্ব্বাচন হয় তবে জনসাধারণ নিজস্ব কায়দায় তাহাদের রায় প্রকাশ করিবে। ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে সকল রকম লড়াইয়ের কায়দা একত্র করিয়া হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবে। জনগণকে নিজেদের ভোটের অধিকার কায়েম করিতে হইবে, ভোটকেন্দ্রগুলিকে জনতার শিবিরে পরিণত করিতে হইবে, নির্ব্বাচনের অস্ত্রকে ঘুরাইয়া রায় মন্ত্রিসভা এবং তাহাদের মনিবদের বিরুদ্ধে প্রয়োগে করিতে হইবে। যে কোনও অবস্থায় জনগণের যে কোন সংগ্রামে লালঝাণ্ডা তাহাদের পাশে আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে।

নতুন বের হয়েছে—এখনই কিনুন

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ—

পি ফেডোসিয়েভ—দাম তিন আনা।

লেখক সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক মুখপত্র 'বলশেভিক'-এর প্রধান সম্পাদক। এই প্রবন্ধটি 'বলশেভিক' কাগজ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামে, এবং শ্রেণী-বিহীন সমাজ সম্পর্কে অত্যন্ত সরল ব্যাখ্যা। আজকের শ্রেণী-সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকার গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা অত্যন্ত পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বর্ম্মার গণ-অভ্যুত্থান—

দাম দশ পয়সা।

বিপ্লবী গণশক্তির আঘাতে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিপ্লবী জনশক্তিই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে থাকিন-ন্যু সরকারকে উচ্ছেদ করছে। বর্ম্মার এই বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, ভারতের ও পাকিস্তানের সরকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী লেবর সরকারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই চক্রান্তের প্রকৃত রূপ এবং বর্ম্মার বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের গতি এই পুস্তিকাখানিতে পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নিউ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ক্ষেতমজুরদের বাঁচার মত মজুরি

সারা ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রস্তাব করিয়াছে যে, জীবনধারণের উপযুক্ত ন্যায্য মজুরির নিম্নতম হার প্রতি-মাসে ৮০্ টাকা মজুরি, ৫০্ টাকা মাগ্‌গীভাতা এবং ২০্ টাকা বাড়ী ভাড়া আদায় করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে, যতক্ষণ না ন্যায্য মজুরির এই নিম্নতম হার আদায় হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষেতমজুরেরা অনমনীয় সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেতমজুরেরা বাঁচার মত মজুরির নিম্নতম হার হইতেও বঞ্চিত। ধনী ভূস্বামীরা নামমাত্র মজুরিতে মজুর খাটাইয়া ফসল বেচিয়া কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটিতেছে এবং সেই মুনাফার জোরে গ্রামাঞ্চলে টাকার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে জোতদার এবং ব্যাপারীরা ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার পর তাহাদের বাৎসরিক গড় মুনাফার মাত্রা প্রায় সমানই রহিয়াছে; কারণ চাউলের দর প্রতিমণ ২০ টাকা হইতে ৩০ টাকার নীচে কখনও নামে না। অথচ ক্ষেতমজুরের মজুরির হার দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধে মাত্র পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়, কিন্তু দৈনিক মেহনতের সময়ের কোন সীমা নাই। ভূস্বামীদের অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ করিলে চাউলের দর না বাড়াইয়াও ক্ষেতমজুরদের খোরাকীসহ দৈনিক ৪ টাকা মজুরি দেওয়া যায়। এই মজুরি পাওয়া তো দূরের কথা দৈনিক ২৷৷০ টাকা ৩্ টাকা মজুরির জন্যও ক্ষেতমজুরদের বিপুল সংগ্রাম করিতে হইতেছে। বিনা সংগ্রামে ১ সিকা মজুরি বৃদ্ধিও আদায় করা যায় না।

৩০ বছরের ধর্ম্মঘট এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সংগ্রাম চালাইয়া কারখানা মজুরেরা যে সামান্য দাবী আদায় করিতে পারিয়াছে তাহার কিছুই ক্ষেতমজুরেরা আদায় করিতে পারে নাই। কারণ ক্ষেতমজুরের নিজস্ব সংগঠন এবং স্বতন্ত্র সংগ্রাম গড়িয়া উঠে নাই। এই জন্যই ক্ষেতমজুরদের শুধু যে নাম মাত্র মজুরি দেওয়া হয় তাই নয়, তাহাদের খাটুনীর দৈনিক সময় নির্দ্দিষ্ট নাই, অতিরিক্ত মেহনতের জন্য অতিরিক্ত মজুরির ব্যবস্থা নাই, বেতন সহ ছুটির কোন রেওয়াজ নাই, সর্ব্বোপরি—ক্ষেতমজুরদের ইউনিয়ন এবং ধর্ম্মঘটের অধিকার স্বীকৃত হয় না।

ইহার উপরও ক্রীতদাস প্রথার মত বর্ব্বর শোষণ অনেক জায়গায় চালু আছে। ক্ষেতমজুরদের অনেকে মাস মাহিনার কাজ করেন। তাঁহাদের মাহিন্দার বলা হয়। মাহিন্দারদের বছরে ২০্ টাকা হইতে উর্দ্ধে ১২০ টাকা পর্য্যন্ত মজুরী দেওয়া হইয়া থাকে। মাহিন্দারদের মেহনতের কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। ভৃত্যের মত যে কোন সময় যে কোন কাজ তাঁহাদের দিয়া করানো হয়, প্রহার, নির্য্যাতন এবং নানাবিধ অত্যাচার তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

ক্ষেতমজুরদের অনেক অংশকে সমাজে "অস্পৃশ্য" করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লোক-দেখানো আন্দোলন আজ ভণ্ডামি বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, কার্য্যতঃ ক্ষেতমজুরদের সামাজিক অধিকার কিছুই অর্জ্জিত হয় নাই।

ক্ষেতমজুরদের আর এক অংশ বর্গা বা কৃষাণীপ্রথায় ফসলের ভাগ চুক্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। ফসলের অর্দ্ধেকের বেশী তাঁহারা কোথাও পান না। তে-ভাগা সংগ্রামের জবাবে প্রধান মন্ত্রী বিধান রায় যে বিধান জারি করিবেন বলিয়াছেন, তাহাতে ক্ষেতমজুরেরা ফসলের ৩ ভাগের ১ ভাগের বেশী কোথাও পাইবেন না। এই প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছে।

বেগার খাটানোর মত বর্ব্বরপ্রথা এখনও এই সমাজে চালু আছে; দারিদ্র ও দেনার সুযোগ লইয়া বেগার খাটাইয়া মুনাফা অর্জ্জনের ঘৃণ্য ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিতে হইবে।

বেকার সমস্যা ক্ষেতমজুরদের জীবনধারণ অনিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যে সমাজে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদন চালানো হয় এবং জমির উপর ভূ-স্বামীদের একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠিত, বেকার সমস্যা সে সমাজের নিত্যকার ব্যাধি। ধনিক ব্যবস্থা মজুরদের কেবল অন্যায় ভাবে অল্প মজুরির দাসত্বে বাঁধিয়াই থামে নাই, উপরন্তু তাহাদের বেকার-জীবনের নিষ্ঠুরতার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দুর্ভিক্ষের সহজ শিকার করিয়া রাখিয়াছে।

ক্ষেতমজুরেরা আজ এই সমস্ত শোষণ, অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে। সংগ্রামের বিপুল বন্যায় তাঁহাদের মধ্যে নবজীবনের সাড়া জাগিয়াছে। বাঁচার মত মজুরি চাই, ক্রীতদাসত্বের অবসান চাই, বেকার খাটানো বে-আইনী করিয়া দিতে হইবে, সম্বৎসর কাজের গ্যারান্টি চাই, পুরা মজুরী ও ৭ ঘণ্টার বেশী কাজ নাই, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি চাই—এই সমস্ত দাবি লইয়া সারা বাংলায় ক্ষেতমজুরেরা বীরের মত লড়িতেছে। ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন সংগ্রামী মজুরদের অভিনন্দন জানাইয়া ঘোষণা করিতেছে যে সারা ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অংশ হিসাবে পশ্চিম বাংলা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন গড়িয়া তোলা হউক। এই ইউনিয়ন হইবে সংগ্রামী ক্ষেতমজুরদের প্রতিনিধিমূলক গণ-প্রতিষ্ঠান। ইহার লক্ষ্য হইবে ক্ষেতমজুরদের উল্লিখিত দাবীসমূহ আদায় করিবার জন্য—জয়লব্ধ সংগ্রাম। এই সম্মেলন আরও দাবী করিতেছে যে, মেয়েদেরও পুরুষের মত সমান খাটুনীর জন্য সমান মজুরি, চাই নাবালকদের বিনা খরচায় শিক্ষার ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা আইনতঃ দণ্ডনীয় করা, মাহিন্দারদের পুরাবেতনসহ এক-মাসের ছুটি, অসুখের সময় পুরা মজুরিসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা, ভূস্বামীদের খরচায় ক্ষেতমজুরদের জন্য ছাতা ও কম্বল, সরকারী খরচায় বেকারদের জন্য ভাতা কিম্বা মাসোহারা। এই সমস্তই হইল ক্ষেতমজুরদের গণতান্ত্রিক অধিকার।

ক্ষেত-মজুরদের সংগ্রামী উৎসাহে ভীত হইয়া কংগ্রেসী সরকার ও তাহার দালাল "জাতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস" ক্ষেতমজুর সংগঠন সৃষ্টি করিবার কল্পনা ঘোষণা করিয়াছে। ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ সম্পর্কে কংগ্রেসী সরকারের মনোভাব আজ আর অস্পষ্ট কিছুই নাই। বিধান রায়ের মন্ত্রিসভা ফৌজ পাঠাইয়া গুলি চালাইয়া ক্ষেত-মজুর ও গরীব কৃষকদের বিরুদ্ধে বর্ব্বর অত্যাচার চালাইতেছে। তাহাদের সামান্যতম দাবীর সাধারণতম সংগ্রামকেও রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দেওয়া হইতেছে। শতশত শহীদের রক্তে ভেজা মাটিতে ক্ষেতমজুরদের যে সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে, গুলি জেল এবং দালালী ভেদ-নীতিতে তাহাকে হারানো যাইবে না—ঐকথা এই সম্মেলন কংগ্রেসী সরকারকে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিতেছে। সেই

প্রাদেশিক
সম্মেলনে

সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন ক্ষেতমজুরদের স্মরণ করাইয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মজুরদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এই সংগঠনের পতাকা-তলে দাঁড়াইয়াই ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামী ঐক্য শক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ধর্ম্মঘট সংগ্রাম এবং সংগ্রামী ঐক্য ছাড়া বাঁচার মত মজুরি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করিবার জন্য কোন রাস্তা নাই। এই ঐক্য ভাঙিবার জন্য কংগ্রেসের "জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" এবং সোশ্যালিস্ট পার্টির "হিন্দ মজদুর সংঘ" প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। ক্ষেতমজুরেরা এই ভেদ-নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ চালাইয়া মজুরের ঐক্য রক্ষা করিবে। বিনা ক্ষতি-পূরণে জমিদারী—প্রথা উচ্ছেদের জন্য এই সম্মেলন কৃষকদের সংগ্রামে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ঘোষণা করিতেছে। জমির-লাভের সংগ্রাম ক্ষেতমজুরদেরও সংগ্রাম। জমিদার এবং জোতদারেরা গরীব কৃষকদের জমি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ক্ষেতমজুরে পরিণত করিয়াছে। ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন দাবী করিতেছে, গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরের জন্য জমি চাই, জমিদারী এবং জোতদারীপ্রথার আমুল উচ্ছেদ করিয়া জমির মালিকানা শোষিত জনসাধারণকে দিতে হইবে, জমি বণ্টনের ভার দিতে হইবে গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের প্রতিনিধিমূলক কমিটির হাতে।

এই সমস্ত দাবী আদায়ের জন্য গ্রামে গ্রামে ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন গঠন করুন,

মঞ্জিল

রাজশাহী-রংপুর জেলে অনশন ধর্ম্মঘটী রাজবন্দীদের চরম অবস্থা

লীগ শাসকশ্রেণীর অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বন্দীদের চ্যালেঞ্জ

পূর্ব্ববাংলার রাজশাহী ও রংপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট চরম উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে।

রাজশাহী জেলের ৯জন রাজবন্দীর ধর্ম্মঘট দেড় মাস পার হইল।

রংপুর জেলের অনশনও ৩ সপ্তাহ পার হইয়া চতুর্থ সপ্তাহে পড়িয়াছে। কৃষক নেতা আব্দুল জব্বারের ওজন ভীষণ কমিয়া গিয়াছে। রেল-শ্রমিক নেতা কুট্টি আমাশয়ে ভুগিতেছেন। শান্তির জনডিস হইয়াছে। বৃদ্ধ কমরেড কালীর অবস্থা খুবই খারাপ—প্রত্যহ ৩।৪ ডিগ্রি জ্বর উঠিতেছে।

যাঁহারা ধর্ম্মঘট করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বন্দী নারায়ণ ব্যানার্জ্জি অন্যতম। যে অমানুষিক অবস্থা ও ব্যবহারের প্রতিবাদে পূর্ব্ব বাংলার জেলে জেলে অনশন ধর্ম্মঘট করিতে বন্দীরা বাধ্য হইতেছেন তাহা অবর্ণনীয়। রংপুরের বন্দীদের একটি দাবী—নারায়ণ ব্যানার্জ্জির সুচিকিৎসা অথবা মুক্তি চাই। এই মানবোচিত দাবী-টুকু পর্য্যন্ত আমরণ ধর্ম্মঘট করা ছাড়া আদায়ের উপায় নাই।

জোর করিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার জন্য কর্তৃপক্ষ বন্দীদের স্নানের জলও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

রংপুর জেলে এই সকল বন্দীদেরই ৩০ দিনের অনশন ধর্ম্মঘট মাত্র ২১শে জুন সরকারী কতগুলি প্রতিশ্রুতির আশ্বাস পাইয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। শর্ত্ত ছিল—বন্দীদের সাধারণ কয়েদী হইতে আলাদা ওয়ার্ডে একত্র রাখার ব্যবস্থা হইবে। এই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করিয়া এখন তাঁহাদের পৃথক পৃথক সেলে আটক করা হইয়াছে। আলাদা রান্না ও মেসিং, সকালে চা-রুটি, সরকারী খরচে একখানি দৈনিক পত্রিকা, তেল, সাবান প্রভৃতি কোন শর্ত্তই পালন করা হয় নাই।

মুসলিম লীগ শাসকশ্রেণীর ধনিক-তোষণ রাজনীতির সহিত যাঁহারাই এক মত নন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেই পাক-সরকার এই অমানুষিক নীতি প্রচলিত বিনাবিচারে জেলে আটক করিয়া, রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য চিরপ্রচলিত সুবিধাও অস্বীকার করিয়া অনিবার্য্য মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া ফেলাই এই নীতির একমাত্র চেহারা।

রংপুর ও রাজশাহী জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের আমরণ অনশন ধর্ম্মঘট মুসলিম লীগ শাসকশ্রেণীর অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই মৃত্যুভয়হীন চ্যালেঞ্জ।

ও মূলদাবী

একজন ক্ষেতমজুরও এই ইউনিয়নের বাহিরে থাকিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে প্রস্তাব

পশ্চিম বঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ক্ষেতমজুর ও জনসাধারণকে এই বলিয়া সতর্ক দেওয়া হইয়াছে যে, "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবিত সাধারণ নির্ব্বাচন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য একটি চালবাজী মাত্র।"

জনসাধারণকে বাদ দিয়া এই "সাধারণ নির্ব্বাচনের" স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়া প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে, "কংগ্রেসী ধনিকরাজ সুকৌশলে সমগ্র ক্ষেতমজুর শ্রেণীকেই একেবারে ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সম্পত্তি ও শিক্ষাই হইতেছে ভোটাধিকারের ভিত্তি। অধিকাংশ ক্ষেতমজুরের এককণাও জমি জমা নাই। জমিদার এবং জোতদার ও অন্যান্য ধনীকেরাই গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ভিত্তি, তাহারাই এই সব ক্ষেতমজুরের সর্ব্বস্ব ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লইয়াছে। কতক ক্ষেতমজুরের নামমাত্র জমি আছে। তাহাদেরও ভোট নাই। গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও

ক্ষেতমজুর র প্রস্তাব

বেশী ক্ষেতমজুর অথবা তাহাদের এক জনও রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বা কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারিবে না, ভোট দিবে জমিদার ও ধনী কৃষকেরা। সুতরাং এই ভোট হইতে ক্ষেতমজুরদের কোন দাবীই পূর্ণ হইবে না।

"শুধু ক্ষেতমজুর নয়, গ্রামের ও শহরের গরীবদেরও ভোট নাই।.... শোষিত জনসাধারণেরই বিক্ষোভ রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ফাটিয়া পড়িতেছে। তাহাদেরই ভয়ে কংগ্রেস এইভাবে ৮৭ জনকে বাদ দিয়া, মাত্র ১৩ জনের ভোটে ঘরোয়া নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছে।"

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ধনিকশ্রেণীর নেহরু সরকারের মনোনীত; বিড়লা ও মার্কিন পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত অনুচর বিধানচন্দ্রিনী মন্ত্রিসভার স্বৈরাচার, দমননীতি ও কালাকানুন রাজের ফলে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, 'দক্ষিণ-কলিকাতার উপনির্ব্বাচনের সময় এবং তাহার পরে দেখা গিয়াছে যে রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ চূড়ান্ত এবং তীব্রতম হইয়াছে, জনতার বিরামহীন দাবি হইয়াছে—রায় মন্ত্রিসভাকে খতম কর'।

"এই চরম সংকটের মধ্যে উপায়ান্তর না দেখিয়াই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বাধ্য হইয়া একদিকে এই সাধারণ নির্ব্বাচন ঘোষণা করিয়াছেন ও সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার হরণ করিয়াছেন এবং অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী রাখিয়াছেন, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক ও শ্রমিকদের এবং শ্রমিক নেতাদের জেলে রাখিয়াছেন, কালাকানুন কায়েম রাখিয়াছেন এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার লুপ্ত করিয়াছেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

সম্মেলন তাই ক্ষেতমজুরদের সতর্ক করিয়া দিয়াছে, "কংগ্রেসী সরকার একদিকে এই সাধারণ নির্ব্বাচন ঘোষণা করিয়া ভোটের বাক্স মারফৎ সকল সমস্যার সমাধান হইবে এই মোহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে; অপরদিকে চাউলের দর বাড়াইয়া, মজুরি কমাইয়া ক্ষেতমজুরদের বিরুদ্ধে ও সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নূতন তীব্রতর আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই সম্মেলন ক্ষেতমজুরদের সতর্ক করিয়া দিতেছে যে কংগ্রেসী সরকারের এই অপকৌশল সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে এবং **এই সাধারণ নির্ব্বাচনকে জনতার বিপ্লবী হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।**"

প্রস্তাবে সমস্ত ক্ষেতমজুরদিগকে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার, কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, শ্রমিকনেতা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সারা ভারত রেল শ্রমিক সম্মেলন

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে আগামী ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় সারা ভারত রেল শ্রমিকের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

বিভিন্ন রেলওয়েতে এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রচুর সাড়া পাওয়া যাইতেছে। প্রায় তিন শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন।

সম্মেলন নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন—

(১) রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার ও রেল বোর্ডের আক্রমণ রেল শ্রমিকদের দাবি এবং সংগ্রামের পন্থা সম্পর্কে আলোচনা।

(২) সারা ভারত রেল শ্রমিকদের জন্য একটি নূতন সংগঠন সৃষ্টি।

স্থান—মুসলিম ইনষ্টিটিউট হল

কর্ম্মসূচী—প্রতিনিধি সম্মেলন—

১৬ই সেপ্টেম্বর (সকাল ৮টা হইতে ১২টা এবং ২টা হইতে ৮টা)।

১৭ই " সকাল ৮টা হইতে ১২টা।

প্রকাশ্য সম্মেলন বেলা দুইটায় ময়দানে

১৮ই সেপ্টেম্বর—ই-আই-রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলন।

বাঁকুড়ায় মজুর-কৃষকের উপর পুলিসের গুলি

কমনওয়েলথ-গোলামীর বিরুদ্ধে ৭ হাজার জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শন

১জন নারী ও ১জন পুরুষ নিহত

১৮ই আগস্ট বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এলাকার বাঁধগাবা গ্রামে হামলা করিয়া নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার সশস্ত্র পুলিসের দল মজুর-কৃষকদের উপর ৭।৮ শত রাউণ্ড গুলি চালাইয়াছে। এই গুলি চালানোর ফলে একজন মেয়ে মজুর ও একজন ছেলে মজুর নিহত হইয়াছেন এবং ছয়জন মজুর ও কৃষক আহত হইয়াছেন। গুলি বৃষ্টির মুখে মজুর-কৃষকেরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পুলিসের বে-পরোয়া গুলি বর্ষণের ফলে জঙ্গলের গাছের ডালপাতা পর্য্যন্ত ঝরিয়া পড়ে।

বিষ্ণুপুরেরর আশেপাশের গ্রামের মজুর-কৃষকেরা এবার শহরে আসিয়া কংগ্রেস সরকারের ১৫ই আগস্টের কমনওয়েলথ-মার্কা 'স্বাধীনতা' দিবসকে কমনওয়েলথ-বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করিয়াছেন বলিয়া নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা তাহাদের উপর গুলি চালাইয়া কংগ্রেসী শাসনের ক্ষমতা দেখাইয়াছে।

১৫ই আগস্ট বিষ্ণুপুর শহরে কংগ্রেসী নেতারা, ধান কল মালিকেরা সরকারী কর্ম্মচারীদের লইয়া খুব জাঁকজমক করিয়া কংগ্রেসী 'স্বাধীনতা' দিবস পালনের জন্য উৎসবের আয়োজন করে। অন্যদিকে ১৫ই আগস্টকে কমনওয়েলথ-বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করার জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে ৬।৭ হাজার ক্ষেতমজুর, গরীব ও ভাগচাষী শহরের একপ্রান্তে আসিয়া জড়ো হন। সেখান হইতে তাঁহারা মিছিল করিয়া শহর অভিমুখে রওনা হন। কমনওয়েলথ-মার্কা স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার উচ্ছেদের দাবী করিয়া নানারূপ স্লোগান দিতে দিতে মজুর-কৃষকের এই বিরাট মিছিল শহরে আসিয়া প্রবেশ করে। সারা শহরে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়—কংগ্রেসী নেতাদের "স্বাধীনতা" উৎসবের জমকালো আসর ভাঙিয়া যায়।

এতবড় মিছিল দেখিয়াই এস-ডি-ও, কংগ্রেস নেতারা, ধানকলের মালিকেরা শহরছাড়িয়া পালাইয়া যায়। কিন্তু শহরের সমস্ত মধ্যবিত্ত ও গরীব মেয়ে পুরুষেরা রাস্তার নামিয়া আসেন—তাঁহারা মজুর-কৃষকদের এই মিছিলকে অভিনন্দন জানান।

মিছিলটি কংগ্রেস অফিসে যাইয়া সেখানকার তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা নামাইয়া দেয়। রাস্তায় যে সমস্ত বাস ও লরী তে-রাঙ্গা ঝাণ্ডা উড়াইয়া যাইতেছিল মিছিলের জনতা তাহাদের দাঁড় করাইয়া তে-রাঙ্গা ঝাণ্ডা সরাইয়া ফেলেন এবং লালঝাণ্ডা লাগাইয়া দেন। কয়েকজন বাস চালকেরা নিজেরাই মজুর কৃষকদের নিকট হইতে লালঝাণ্ডা চাহিয়া নিয়া বাসে বাসে উড়াইয়া দেন।

সেদিন শহরে প্রবল বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু সেই বৃষ্টির মধ্যেও মজুর-কৃষকদের এই মিছিল সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করিয়া শহরের প্রান্তে আসিয়া সভা করেন। সভায় ইঙ্গ-মার্কিন গোলামির বিরুদ্ধে, ধনিকদের কমনওয়েলথ-মার্কা 'স্বাধীনতা'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

মিছিল চলিয়া গেলে কংগ্রেসী নেতারা ও ধনিকেরা শহরে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই গোপনে বৈঠক করে। তাহারা স্থির করে যে, অবিলম্বে শহরের পাশের গ্রামে হামলা করিয়া মজুর-কৃষকের শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করিতে হইবে। এই অভিযান পরিচালিত করার নেতৃত্ব গ্রহণ করে ধানকলের ধনী মালিক অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য।

১৬ই আগষ্ট অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য ১০।১২ সশস্ত্র পুলিস আনাইয়া তাহার ধানকলে বসায়। এই ধানকল শহরের প্রান্তে এবং মজুরের গ্রাম বাঁধগবার পাশে অবস্থিত।

অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য কলে পুলিস আনাইয়াছে এই খবর গ্রামে ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনকলের সম্মুখে তিন হাজার মজুর কৃষক আসিয়া পুলিস উঠাইয়া নিবার দাবী জানান। অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য তখন পুলিস উঠাইয়া নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু পরের দিন মেদিনীপুর হইতে একশত সশস্ত্র পুলিস আনাইয়া আবার ধানকলে মোতায়েন করা হয়। ১৮ই আগষ্ট অতি ভোরে অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে এই পুলিস দল বাঁধগাবা গ্রামে হানা দেয়। কিন্তু মজুর কৃষকদের প্রতিরোধের সম্মুখে পুলিসদলকে পিছু হটিয়া ধানকলে আসিয়া আশ্রয় নিতে হয়। আট শত মজুর-কৃষকের এক জনতা ধানকলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে পুলিস প্রথমে তাহাদের উপর কাঁদুনে বোমা ছাড়ে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা বে-পরোয়া গুলি চালাইতে সুরু করে—তাহারা মোট ৭।৮ শত রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলি চালনার ফলে একজন মেয়ে মজুর ও একজন ছেলে মজুর নিহত হন। মজুর কৃষকেরা জঙ্গলে যাইয়া আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং সেখানে হাতের কাছে যাহা পাইয়াছেন তাহা লইয়াই তাঁহারা প্রতিরোধ করিতে থাকেন। তাঁহাদের প্রতিরোধের ফলে তিনজন পুলিসের জীবন শেষ হইয়া যায়। গুলিবর্ষণের ফলে জঙ্গলের গাছের ডালপাতা পর্য্যন্ত ঝরিয়া পড়ে।

গুলি চালাইবার পর পুলিস বাঁধগাবা গ্রামে যাইয়া ২ জন পুলিস ও শিশুপুত্রসহ দুইজন মেয়েকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

বাঁকুড়ার মজুর কৃষকেরা বৃটিশ কমনওয়েলথের গোলামীর বিরুদ্ধে ১৫ই আগষ্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। তাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী সরকারের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে লীগ সরকারের জমিদারী-উচ্ছেদের ভাঁওতা

বিশেষ কমিটির রিপোর্টে ৪৯ বৎসর ধরিয়া জমিদারী দখল করার ঘোষণা

আবার রব উঠিয়াছে : সেপ্টেম্বর মাসেই নাকি পূর্ব্ববঙ্গে জমিদারি-উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, চাষীকে জমি দেওয়া হইবে!

সতের মাস আগে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গের আইন-সভায় 'পূর্ব্ববঙ্গ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক দখল ও প্রজাসত্ব বিল' (East Bengal Stast Acquisition and Tenancy Bill) নামে একটি বিল পেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বহু শতাব্দীর ভারে ভগ্ন ও ন্যুব্জ-দেহ চাষীকে তাহার চাষের জমির মালিক করিয়া দিয়া দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই বিল প্রকৃত বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে।" এই বাগাড়ম্বরের পর ৪৫ জন আইন সভার সদস্য লইয়া এক স্পেশ্যাল কমিটি গড়িয়া তাহাদের হাতে ঐ বিলটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাছা বাছা ৪৫ জন জমিদার, ধনিক, জোতদার লইয়া এই কমিটিটিকে গঠিত করা হয়। এতদিন আর এই কমিটির উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই। আজ যখন লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ ও সংগ্রাম ফাটিয়া পড়িতেছে, যখন টাঙাইলের উপ-নির্ব্বাচনে লীগ-প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে, যখন চারিদিকে আওয়াজ উঠিতেছে, 'নুরুল আমিন মন্ত্রি-সভার অবসান চাই' তখন বিক্ষুব্ধ জনতার ভয়ে লীগ সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁর মুখে পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচনের বুলি ফুটিয়াছে, আর ঠিক সেই সময়ে আবার জমিদারি-উচ্ছেদের ভোজ-বাজির কথা শোনা যাইতেছে! এত দিন পরে খোস-খবর বাহির হইতেছে যে, স্পেশ্যাল কমিটি নাকি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্ট জনসাধারণের কাছে প্রচার হয় নাই; প্রধান মন্ত্রী নুরুল আমিন ও রাজস্বমন্ত্রী তোফাজ্জেল আলি রিপোর্টের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

'আজাদ' হইতেছে পূর্ব্ববঙ্গের লীগ-সরকারের বে-সরকারী মুখপত্র। আজাদে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতেই আলোচনা করা যাক : "পূর্ব্ব-পাকিস্তানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক জমিদারদিগকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা মুনাফা দিতে হইবে। অপর দিকে সম্পূর্ণ ভূমি সরকারের অধিকারে আসিলে উহা হইতে প্রাদেশিক রাজস্বখাতে বর্ষিক ২ কোটি ৪১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা অত্যধিক আয় হইবে।" পূর্ব্ব-পাকিস্তানে জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ বিল পর্য্যালোচনার জন্য নিযুক্ত বিশেষ কমিটি উপরোক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া গতকল্য পূর্ব্ব-বঙ্গ সেক্রেটারীয়েটে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব-সচিব জনাব তফাজ্জল আলী ঘোষণা করেন। কমিটির সোপারেশসহ সংশোধিত আকারে বিলটি আলোচনার জন্য আগামী মাসের প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে,—আজাদ ৪ঠা আগস্ট। আজাদ আরও লিখিয়াছেন যে ধনী কৃষক বা জোতদারকে ১০০ বিঘা পর্য্যন্ত খাস জমি এবং পরিবারে দশ জনের বেশী লোক থাকিলে মাথাপিছু দশ বিঘা খাস জমি রাখিতে দেওয়া হইবে। এইভাবে জমিদারি খরিদ করিতে ৪৯ বৎসর সময় লাগিবে।

নুরুল আমিনের মন্ত্রিসভার কাছে, জমিদার-জোতদারের 'বিশেষ কমিটির কাছে জমিদারী উচ্ছেদের অর্থ কি, তাহা 'আজাদের' ঐ কয়েকটি ছত্রে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জমিদারি উচ্ছেদের ফলে লাভ হইবে শুধু জমিদারদের ও ধনিকশ্রেণীর। বাংলার শোষিত নির্য্যাতিত কোটি কোটি চাষীর এই জমিদারি উচ্ছেদে কিছুমাত্র লাভ হইবে না। জমিদারদের ৩০ কোটি টাকা দিয়া ৪৯ বৎসর ধরিয়া জমিদারি দখলের জন্য বিশেষ কমিটির এই রিপোর্ট জমিদারি উচ্ছেদের বিধান নয়, চাষীর বিরুদ্ধে শয়তানির বড়যন্ত্র।

দীর্ঘকাল ধরিয়া বৎসরের পর বৎসর যে একটি আওয়াজ বাংলার নব্বুই হাজার গ্রাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, তাহা হইতেছে : বিনা খেসারতে জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদ চাই; খোদ চাষীর হাতে জমি চাই। শোষিত জনসাধারণের দাবি : (ক) জমিদার-জোতদারের খাসজমি বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত করিয়া গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের কমিটির হাতে দিতে হইবে; সেই কমিটি ঐ জমি চাষের জন্য ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। মধ্যস্বত্ব ও সকল খাজনা-ভোগী স্বত্ব বিলোপ করিতে হইবে।

(খ) ভাগচাষীরা যে জমি চাষ করেন তাহাতে ভাগচাষী সত্ববান হইবেন। ধনী কৃষকের খাস জমি রাখার অধিকার ১০ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। কৃষি-কার্য্যে মজুরদের কর্ত্তৃত্ব কায়েম করিতে হইবে। এই ভাবে মজুর-চাষীর নেতৃত্বে জমি জাতীয় করণ করিতে হইবে।

(গ) খাজনা-প্রথা রহিত করিয়া ভূমি-আয়কর চালু করিতে হইবে। যাহার সংসার-চলার-মতো জমি (ইকনমিক হোলডিং) নাই, তাহাকে ঐ ভূমি-আয়কর হইতে রেহাই দিতে হইবে। ইকনমিক হোলডিং যাহাদের আছে তাহাদের হইতে সুরু করিয়া যাহার যত বেশী জমি তাহার উপর ততবেশী হারে ভূমি-আয়কর ধরিতে হইবে। (ঘ) চাষীকে তাহার আবাদী জমি হইতে উচ্ছেদ করা চলিবে না। (ঙ) চাষীর বকেয়া খাজনা ও সমস্ত দেনা মকুব করিতে হইবে। (চ) টংক, গুলা, ধানুয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা খতম করিয়া তাহাদের খাজনার ও ব'কেয়া খাজনার দায় হইতে রেহাই দিতে হইবে এবং উপরোক্ত নিয়মে ভূমি আয়কর ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে। যাহাদের জমির পরিমাণ সংসার চলার মতো নয়, তাহাদের খাজনা বা আয়কর দিতে হইবে না। (ছ) নানকার-প্রথা ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় জুলুম খতম করিতে হইবে। নানকার প্রজাগণ তাহাদের জমিতে স্বত্ববান হইবেন। সংসার-চলার মত জমি না থাকিলে তাহাদেরও খাজনা বা ভূমি আয়কর দিতে হইবে না। (জ) ক্ষেতমজুরদের বাঁচার মতো মজুরি দিতে হইবে।

হামিদুল হক চৌধুরীর মূল বিলে অথবা বিশেষ কমিটির এই রিপোর্টে ইহার একটি দাবিও স্বীকৃত হয় নাই। এই বিল আর আসল জমিদারী উচ্ছেদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এমন কি লীগ সরকারও তাহাদের আইনের খাতায় এই বিলকে জমিদারী উচ্ছেদ বিল বলিতে পারে নাই। তবুও জনতাকে ধোঁকা দিবার জন্য নুরুল আমিন মন্ত্রি-সভা এই বিলকেই জমিদারী উচ্ছেদ বিল বলিয়া প্রচার করিতেছে। গত বার ভোটের আগে লীগের নেতারা দিয়াছিলেন বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি। তাহার চার বছর পরে, আজ আবার ভোটের আগে লীগনেতারা দিতেছেন জমিদারি উচ্ছেদের ভাঁওতা!

* * *

জমিদারী উচ্ছেদের নামে কেন এই প্রহসন চালানো হইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের শ্রেণী-চরিত্র ভাল করিয়া বিচার করা দরকার। মুসলিম লীগ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় না ইহা বলা বাহুল্য; মুসলিম লীগের আক্রমণ-ই তো শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে। তাহা হইলে কি মুসলিম লীগ পরিচালিত হয় মধ্যযুগীয় জমিদারশ্রেণীর নেতৃত্বে, না, আধুনিক ধনিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে?

মুসলিম লীগের নেতৃত্বের মধ্যে ভূস্বামীদের প্রভাব আছে সন্দেহ নাই! ঢাকার নবাব-পরিবার পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম লীগের এক প্রধান স্তম্ভ। শ্রীহট্টের তালুকদার-মিরাশদারগণ সরকারের উপর যথেষ্ট প্রভাব চালাইয়া থাকেন। মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী নোয়াখালির ছোট একটি জমিদার পরিবারের লোক। কিন্তু তাহা হইলেও মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ধনিক-শ্রেণীর হাতে, মধ্যযুগীয় ভূস্বামীদের হাতে নয়।

মার্কিন ও বৃটিশ পুঁজিপতিদের তুলনায় ভারতের টাটা-বিড়লা যেমন নগণ্য, তেমনই টাটা-বিড়লার তুলনায় ইস্পাহানী, আমিন ব্রাদার্স, হাসেম-কাসেম-দাদা প্রভৃতি ছোট ধনিক সন্দেহ নাই; তবুও মুসলিম লীগ এই ধনিকশ্রেণীরই পার্টি; ইহাদেরই অঙ্গুলি-হেলনে পূর্ব্ববঙ্গের লীগ সরকার পরিচালিত হয়।

এক ঢাকার নবাব-পরিবার ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত বড়ো জমিদারই হিন্দু। লীগের ধনিক-শ্রেণী তাহারই সুযোগে একদিকে তাহাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালাইতে পারিয়াছে, অপরদিকে জমিদারী-উচ্ছেদের আওয়াজ তুলিয়া গরীব জনসাধারণের সমর্থন জয় করিয়াছে। লীগের এই ধনিক-শ্রেণীর মধ্যে আছে একদিকে ধনিক-ব্যবসায়ী, অপর দিকে ধনিক-ভূস্বামী।

আজ পূর্ব্ববঙ্গে কি দেখা যায়? অন্যতম ব্যবসায়ী হানিফ সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের কাপড়ের একচেটিয়া সরবরাহকারক। হোসেন-কাসেম-দাদা লবণ আমদানির তামাক ও সুপারি রপ্তানীর একচেটিয়া অধিকারী। পাট-রপ্তানী কারবারের বেশ বড়ো অংশ আমিন ব্রাদার্স-এর দখলে। লীগ সভাপতি মওলানা আক্রম খাঁ স্বয়ং একজন ধনিক, এক বিরাট প্রেসের মালিক।

অপরদিকে ধনিক-ভূস্বামীও লীগের নেতৃত্বের মধ্যে রহিয়াছেন। দিনাজপুরের মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী দেড় হাজার বিঘা খাস জমির মালিক, মস্ত বড় জোতদার। তিনি প্রাদেশিক লীগের সহকারী সভাপতি। মোহন মিঞা ফরিদপুরের প্রভাবশীল ভূস্বামী; তিনি প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক। এমনি আরও রহিয়াছে।

এই ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ও আদর্শেই নুরুল আমিন মন্ত্রি-সভা কাজ করিয়া থাকে।

শুধু পূর্ব্ববঙ্গে নয়, কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বও ধনিকশ্রেণীর হাতে। মিঃ জিন্না স্বয়ং আজীবন ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করিয়াছেন। ইস্পাহানী সেই জন্যই পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ ভাবে ধনিকশ্রেণীর মুঠার মধ্যে। আগে তো পাকিস্তান সরকারের রেলের সমস্ত আয়ের পরিমাণ অনেক কোটি টাকা আমিন ব্রাদার্স সংগ্রহ করিতেন এবং তাহারাই রেলকর্ম্মচারীদের মাহিনা দিতেন ও রেলওয়ে চালাইবার খরচ বহন করিতেন। পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তাহার বিক্রিত শেয়ার এই মুষ্টিমেয় ধনিকগণই খরিদ করিয়াছেন। **মুসলিম লীগ নিঃসন্দেহে ধনিক-শ্রেণীর পার্টি; কেন্দ্রে ও প্রদেশে ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও নির্দ্দেশেই লীগ সরকার পরিচালিত হয়।**

* * *

এই ধনিকদের শ্রেণীস্বার্থ ও নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নুরুল আমিন মন্ত্রি-সভার এই বিশেষ কমিটি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, গণ-বিক্ষোভ দমন করিয়া ধনিকশ্রেণীর হাতে শাসন-ক্ষমতা রাখিতে হইলে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারশ্রেণীর সাথে মিতালী রাখিতে-ই হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, তাহারা দেখিতেছেন যে, লীগ সরকার যেরূপ দ্রুত জনসাধারণের বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার পাত্র হইতেছে, তাহাতে লীগ সরকারের সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত করিতে না পারিলে টেঁকা যাইবে না, গণ-সংগ্রাম বিধ্বস্ত করা যাইবে না। ধনিকশ্রেণীর মুনাফা ও শোষণ কায়েম রাখিয়া লীগ সরকারের সামাজিক ভিত্তি প্রসারের একমাত্র উপায় ধনী কৃষকের জমি, ফসল ও মুনাফা লুণ্ঠনের অবাধ একচেটিয়া অধিকার দান। ধনিকশ্রেণীর

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিল

ইয়ে "আজাদি" ঝুটি হ্যায়—১৪ই আগষ্ট পূর্ব্ববঙ্গে জনগণের আওয়াজ

এবার ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের ঝুটি আজাদির আসর পূর্ব্ববঙ্গে মোটেই জমে নাই। লীগ সরকারের খাস ঘাঁটি ঢাকায়, ময়মনসিংহে, রংপুরে—শহরে-গ্রামাঞ্চলে—সরকারী রোশনাইকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে মজুর-চাষী-মধ্যবিত্তের আসল আজাদির জন্য জঙ্গী আওয়াজ।

ইয়ে ঝুটি "আজাদি" হ্যায়

কমনওয়েলথ্-এর গোলামির বিরুদ্ধে, খুনচোষা মালিক-জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে সেই আওয়াজ তুলিয়া ময়মনসিংহের আদালতে পর্য্যন্ত ও ঢাকা শহরের সর্ব্বত্র কালোঝাণ্ডা উড়াইয়া দিয়াছে; সেই আওয়াজে রংপুরে হাজার মানুষ জমায়েৎ হইয়াছে, ঝুটি আজাদির পয়গম্বরদের সভা জনগণের দখলে চলিয়া গিয়াছে; ঢাকার ঘোড়দৌড়ের মাঠে মাত্র হাজার পাঁচেক লোকের জমায়েতে উজিরে-আজম আমিন সাহেবের মিষ্টি বুলির পর লোকে বেকারি আর ৪০৲ মণ চাউলের কথা বলিতে বলিতেই ফিরিয়াছে—পুরানো বুলি ছাড়া আমিন-ওয়জারৎ কিছুই দিতে পারে না দেখিয়া লোকে নূতন করিয়া বুঝিয়াছে ইয়ে "আজাদি" ঝুটি হ্যায়!

ময়মনসিংহে

লালঝাণ্ডা হাতে মজুর-চাষীর ইনক্লাবী খেয়াল আর লড়াই দেখিয়া আমিন-ওয়জারৎ ভয় পাইয়া গিয়াছে। তাই, ১৪ই আগস্ট আমলা-ফয়লাদের একটু চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য ময়মনসিংহ শহরের সার্কিট হাউস ময়দানে আনসার পল্টনকে দুই ভাগ করিয়া এক দেখনাই লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়। একদলের হাতে থাকে লালঝাণ্ডা,—সেই হইল জনগণের গেরিলা ফৌজ; আরেক দল সাজিল লীগের ফৌজ। এই দেখনাই লড়াইয়ে লীগের ফৌজ গেরিলা ফৌজের লালঝাণ্ডা কাড়িয়া নিয়া তাহাদের ৮ জন খতম করিয়া দিল।

কিন্তু, আমলা-ফয়লা ও লীগ সরকার হাজংদের লড়াইয়ের ময়দানে দেখিয়াছে—৬ জন চাষীকে গুলি করিয়া খুন করিয়াও লালঝাণ্ডা কাড়া যায় না, লালঝাণ্ডার তাকত বড়িয়াই চলে। আসল গোলাগুলি যখন চাষী-মজুরের হিম্মৎ দাবাইতে পারে নাই, এই দেখনাই লড়াইয়ের তামাসাও তাহাদের ভিতর কমজোরি পয়দা করিতে পারিবে না।

দমননীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ

ময়মনসিংহ শহরের আদালতে, জেলা-স্কুলে, সর্ব্বত্র কালোঝাণ্ডার মেলা তাহা প্রমাণ করিয়াছে। ১৪ই আগস্ট মুসলিম ইনস্টিটিউট ময়দানে লীগনেতা পাঠান সাহেব যে বলিলেন, কেবল পুলিসপল্টন দিয়া কমিউনিস্টদের, অর্থাৎ মজুর-চাষী-মধ্যবিত্ত জনগণকে দমন করা যায় না, সে কথা লোকে আগেই জানিত। কিন্তু, যখন কমিউনিস্ট খতম করিবার জন্য সাধারণ মানুষের মদতের জন্য তিনি ভোট চাহিলেন, তখন একখানিও হাত উঠিল না। কারণ, যাহারা আজও লড়াইয়ের ময়দানে নামে নাই, তাহারাও জঙ্গী জনগণের বিরুদ্ধে হাত তুলিতে নারাজ।

ঢাকায়

পাঠান সাহেবের পক্ষে তাঁহাদের হাত উঠিল না—ইহাই দমননীতির বিরুদ্ধে জনগণের ভোট।

৮ই আগস্ট হইতে কমনওয়েলথ গোলামি-বিরোধী সপ্তাহ সুরু হয়। ৯ই আগস্ট ঢাকা শহরে নবাবপুরের কাছাকাছি জয়াগায় ছাত্র ও শ্রমিকদের একটি প্রচারদল হইতে পুলিস একজনকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করে। টানাটানি করিয়া গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া পুলিস কমিউনিস্টদের পাকিস্তানের দুশমন বলিয়া জমায়েত জনতার মদৎ চায়; কিন্তু, কেহই পুলিসকে মদৎ করে না; বরং "ধর না মিঞা, দেখি তোমার তাকত কেমন" বলিয়া পুলিসকে চ্যালেঞ্জ করে। পুলিস বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়ে—গ্রেপ্তার করা আর হইল না শহরের সাধারণ মানুষ পুলিসের জুলুমবাজীতে মদৎ করিতে নারাজ।

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বর্ম্মার জনগণের বিরুদ্ধে খুনী সরকারকে মদৎ বন্ধ করিবার দাবিতে ১৪ই ছিল 'বর্ম্মা দিবস'। ঢাকা শহরে চকবাজারে একটি প্রচার দল যখন বক্তৃতা করিতে ছিল তখন পুলিস ও গুণ্ডাদের মিলিত আক্রমণে ৫।৭ জন ভয়ানক জখম হন, ২ জনকে তাহারা জখম অবস্থায় গ্রেপ্তার করে। মূল বক্তাকে কয়েকজন দোকানী আশ্রয় দেন। ওদিকে প্রায় ৩ শত মানুষ চক দাঁড়িতে জমায়েৎ হইয়া ২ জনের গ্রেপ্তারে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মিল-কারখানা ও রেলমজুর এলাকাগুলিতে বহু কালোঝাণ্ডা ও অসংখ্য পোস্টার ঝুটি আজাদি ও কমনওয়েলথ্এর গোলামির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেয়।

ঢাকা জেলের সমস্ত রাজবন্দী ১৪ই ভুখা থাকিয়া ঝুটি আজাদির বিরুদ্ধে জেলের মধ্যেও লড়াই জারি রাখেন।

গ্রামাঞ্চলে

খাদ্য ও মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি ঢাকার পীড়পুর গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও অন্যান্য গরীব মানুষের ঘরে ঘরে সেদিন লালঝাণ্ডা উড়ে। জোতদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও তাহাদের দালালেরা জঙ্গী চাষীদের বিরুদ্ধে টু শব্দ করিতে পারে না। শেষ পর্য্যন্তও তাহারা পুলিস ও আনসার ফৌজ আনাইয়া গ্রামে কুচকাওয়াজ করায় কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও ঝুটি আজাদি ও পুলিস হামলার বিরুদ্ধে রাত্রে মিছিল বাহির হয়।

জানি এ কেমন 'আজাদি'

শতকরা ৯০ জনই ক্ষেতমজুর আর গরীব চাষীর গ্রাম ঢাকা শহরের কাছেই জয়দেবপুর থানার খাইলকুর গ্রামে এবং পাশাপাশি বড়বাজারে, টঙ্গীর বাড়ি. রেলস্টেশনে, সর্ব্বত্র ঝুটি "আজাদির" দিনে কমনওয়েলথ-এর গোলামিবিরোধী ব্যাপক প্রচার চলে। এবং তাহার সহিত ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীর মূল দাবির ভিত্তিতে জঙ্গী আওয়াজ উঠে। বিক্ষোভের কালোঝাণ্ডায় চারিদিক ছাইয়া গেল। দূর দূর অঞ্চল হইতে মেয়েরাও পায়ে হাঁটিয়া, নৌকায় করিয়া আসিয়া সভায় যোগ দিলেন। একজন রেলশ্রমিকের মায়ের কথাতেই অসংখ্য মানুষের বিক্ষোভ প্রকাশ পাইল: "জানি এ কেমন 'আজাদি'! এখন-তো রেশনও বন্ধ।"

কিন্তু আজাদির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেদিন রাত্রে ঢাকায় গবর্নমেণ্ট হাউসে পুঁজিপতি-জমিদার-ব্যবসায়ী-বড় আমলা আর তাহাদের বাড়ীর মেয়েদের খানাপিনা এবং আমোদপ্রমোদে—এবং তাহা সরকারী, অর্থাৎ জনগণের খরচে, ইহাদের 'আজাদি' আসিয়াছে বটে।

রংপুরে

ইহাদের আজাদি, ইহাদের জালিম শাসন-শোষণ জনগণ বরদাস্ত করিতেছে না। রংপুর শহরে পাবলিক লাইব্রেরীর ময়দানে প্রায় হাজার মানুষের সভা হইতে সেদিন ইহাদের গোলাগুলি, লুটতরাজ ও দমননীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে। ১৫ই আগস্ট ব্যবসায়ী সমিতি এই শোষকদের আজাদীর জয় গাহিবার জন্য মিউনিসিপ্যাল ময়দানে যে সভা ডাকে, জনগণ তাহা দখল করিয়া নেয়। ব্যবসায়ীদের সভার সভাপতি পালাইয়া যায়—জনগণের সভাপতিই সে সভা চালাইয়া যান।

আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে—শিল্পে-বাণিজ্যে, কলকারখানায়, ক্ষেতখামারে—সারা দেশের শাসনেও এইভাবে জনগণের দখল কায়েম হইবে।

হাওড়ায়—

বিচারাধীন রাজবন্দীদের উপর নৃশংস লাঠিচার্জ্জ

৫ জন বন্দী গুরুতরভাবে আহত: প্রতিবাদে দমদম জেলে একদিন অনশন ধর্ম্মঘট

গত ২৪শে আগস্ট হাওড়া জেলে 'প্রিজনভ্যানের' মধ্যে ৬৭ জন বিচারাধীন বন্দীর উপর এমন নিদারুণভাবে লাঠি চার্জ্জ করা হয় যে প্রায় প্রত্যেকটি বন্দীই তাহার ফলে আহত হন। ইহার মধ্যে ৫ জনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। এই বন্দীদের দমদম জেলে নিয়া যাওয়া হইলে পরদিন ২৫শে আগস্ট দমদম জেলের সমস্ত রাজবন্দী ও বিচারাধীন বন্দীগণ একদিন অনশন ধর্ম্মঘট করিয়া নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানান।

জানা গেল যে, দমদম জেলের সমস্ত রাজবন্দী ও বিচারাধীন বন্দীরা একত্রে এই ঘটনা এবং সাধারণভাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার উপর একটি স্মারকলিপি সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, হাওড়া কোর্টে যাইবার নাম করিয়া এই সমস্ত বন্দীদের হাওড়া জেলে নিয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে সনাক্তকরণ প্যারেডে দাঁড়াইবার হুকুম দেওয়া হয়।

সনাক্তকরণের সাধারণ নিয়ম হইল, বন্দীদের মত একই রকমের পোষাক পরা অন্যান্য সাধারণ লোকদের মধ্য হইতে বন্দীদের সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে জেলের পোষাক পরা সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে বিচারাধীন বন্দীদের একই সারিতে দাঁড়াইবার কথা বলা হয়।

তাহা ছাড়াও, এই বন্দীরা ছিলেন দমদম জেলে। কাজেই ইহাদের সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করিতে হইলে, করিতে হইবে হয় দমদম জেলে নতুবা হাওড়া কোর্টে।

প্রচলিত সমস্ত নিয়মকানুন ভাঙ্গিয়া বন্দীদের এই বে-আইনী প্যারেডে দাঁড়াইবার হুকুম দেওয়া হইলে, তাঁহারা স্বভাবতই অস্বীকার করেন এবং তাহার ফলেই প্রিজনভ্যানের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁহাদের উপর নৃশংসভাবে লাঠি চার্জ্জ করা হয়।

রাজনৈতিক বন্দীগণ বহুদিন হইতেই হাওড়া কোর্টে তাঁহাদের সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করা হইতেছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা সরকারের নিকট দাবী করিয়াছেন:

(ক) বিচারাধীন বন্দীদের জন্য কোর্টে স্বতন্ত্র থাকিবার ব্যবস্থা চাই।

(খ) অন্যান্য কোর্টের মতন হাওড়া কোর্টেও টিফিন এলাওয়েন্স দিতে হইবে।

(গ) জেল হইতে কোর্টে আসা যাওয়ার জন্য পৃথক যানবাহনের ব্যবস্থা চাই।

(ঘ) পুলিস এবং কোর্টের অফিসারদের বন্দীদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে হইবে।

দাবী না মানিয়া টেক্সম্যাকো কারখানা চালু করা চলিবে না

বেলঘরিয়ায় বীর শ্রমিকদের অনমনীয় প্রতিরোধ ধর্ম্মঘট

সুবোধ সরকারের ঘাতকদের চক্রান্ত বানচাল

গত ৩১শে আগস্ট বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকো কারখানায় সিটি দিয়া মিল চালু করার চেষ্টা হয়। কিন্তু শ্রমিকরা প্রতিরোধ ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতেছেন। কারখানারর হত্যাকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে।

সীয়ারাম নামক জনৈক দালাল কোম্পানীর জন্য লোক জোগাড় করিয়া বেড়াইতেছে। মালিক ভর্ত্তি লোকদের জন্য একটি বণ্ড বাহির করিয়াছেন। কিন্তু বণ্ড সহি করিয়া কেহই ভিতরে যাইতেছেন না।

সীয়ারাম বহু চেষ্টা করিয়া ৩১শে আগস্ট দূর দূর এলাকা হইতে মাত্র ৩৮ জনকে ভুলাইয়া ট্রাকে করিয়া কারখানার ভিতরে ঢুকাইবার চেষ্টা করেন। কারখানার পুলিস পাহারা সমানে চলিতেছে। বাহিরেও পুলিস ক্যাম্প রহিয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গা যায় নাই।

প্রত্যহ ১০০ জন বাঙালী-বেহারী শ্রমিক পিকেটিং চালাইতেছেন। ১লা সেপ্টেম্বর স্থানীয় হাইস্কুলের ছাত্ররাও শ্রমিকদের সমর্থনে আগাইয়া আসেন। প্রতিরোধের ফলে কয়েকজন দালাল আহত হয়।

মালিক প্রথমে শ্রমিকদের আপোষ আলোচনার পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। ইউনিয়ন সম্পাদক সুবোধ সরকারকে আলাপ-আলোচনার জন্য ডাকিয়া আনিয়া গুলি চালাইয়া হত্যা করার পর পুলিস এবং মালিক ভাবিয়াছিল শ্রমিকদের মনোবল ভাঙা যাইবে। কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড **মনোবল ভাঙ্গার পরিবর্ত্তে শ্রমিকদের আপোষহীন সংগ্রামের পথেই ঠেলিয়া দিয়াছে।**

শ্রমিকেরা দাবি তুলিয়াছেন—(১) বেতন কাটা চলিবে না, কমসেকম ৮০ টাকা বেতন এবং ৪০ টাকা মাগগীভাতা দিতে হইবে (২) সুবোধ সরকার এবং অন্যান্য আহতের পুরা ক্ষতিপূরণ চাই (৩) ধৃত শ্রমিকদের ছাড়িয়া দিতে হইবে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলিয়া লইতে হইবে (৪) সুবোধ সরকারের হত্যাকারীদের শাস্তি চাই।

গুলি চালাইয়াও শ্রমিকদের মনোবল ভাঙে নাই দেখিয়া 'জাতীয়' টি-ইউ-এর বিপিন গাঙ্গুলী, নীহার দেবরত্ন প্রভৃতি ঘোরাঘুরি সুরু করেন। মুখে তাঁহারা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। কিন্তু দাবি আদায় করার জন্য যেই সংগ্রাম চালাইবার কথা ওঠে তখন চুপ করিয়া থাকেন। মালিক চাহিতেছিলেন, লক-আউট তুলিয়া লই, শ্রমিকেরা বিনাশর্ত্তে কাজে আসুক। তাঁহারাও মালিকের সুরে সুর মিলাইয়া বলার চেষ্টা করেন—'লক-আউট তোলা হউক' কিন্তু দাবি আদায়ের কথা চাপিয়া যান।

এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন

ইতিমধ্যে আগরপাড়া, পানিহাটি, বেলঘরিয়া সমস্ত এলাকাতে শ্রমিকেরা টেক্সম্যাকো শ্রমিকদের সমর্থনের জন্য আগাইয়া আসিতে চাহেন। পানিহাটিতে টেক্সম্যাকো, ভেনেস্তা, ভারত গ্লাস, ম্যালিয়েবল, বাসন্তী, আগরপাড়া জুট প্রভৃতি বিভিন্ন কারখানার ২৫০০ শ্রমিকের এক সভা হয়। সভায় নীহার বেদরত্নের মুখের উপর শ্রমিকেরা সরকারকে সমালোচনা করিতে থাকেন এবং ধ্বনি তোলেন—"ম্যানেজার রাজঘড়িয়ার প্রাণদণ্ড চাই, কংগ্রেসী পুলিসের জুলুম ধ্বংস হোক!" উপায়ন্তর না দেখিয়া নীহারবাবু বলেন কংগ্রেস বেলঘরিয়ার শ্রমিকদের জন্য লড়িবে। শ্রমিকেরা প্রস্তাব করেন, একদিন সাধারণ ধর্ম্মঘট হোক। সমস্ত সভা ইহাকে সমর্থন করেন।

এই সব কংগ্রেসীদের মুখে বড়ো বড়ো বাত কিন্তু আসলে কাজ দালালী তাই—ঐক্য ও সাধারণ সংগ্রামের এই স্পষ্ট দাবীতে তাঁহারা পিছাইয়া যান; এবং তাহার পর হইতে আর শ্রমিকদের সামনে আসিতেছেন না। কংগ্রেসীরা যে হত্যাকারী মালিকের স্বার্থেই শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরাইতে আসিয়াছিলেন সে সম্পর্কে শ্রমিকদের আর কোন সন্দেহই নাই। গুলিচালনা এবং কংগ্রেসের বিভেদ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মালিক এখন পুনরায় প্রাদেশিকতার বিষের উস্কাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু টেক্সম্যাকোর হিন্দুস্থানী-বাঙালী শ্রমিকের নিকট বিড়লা পরিবারের এই চাল উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। মিলিতভাবে পিকেটিং চালাইয়া তাঁহারা সংগ্রামের লালঝাণ্ডা উঁচা রাখিয়া চলিয়াছেন।

নেতা গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ

গত ২০শে আগস্ট বেলঘরিয়ার দ্বিতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা ম্যালিয়েবল কাস্টিং-এর শ্রমিক নেতা সতীশচন্দ্র মাইতিকে পুলিস রাত্রে গৃহ হইতে গ্রেপ্তার করে।

ইহার প্রতিবাদে পরদিন শ্রমিকেরা কারখানার কাজ একরকম বন্ধ রাখেন। ৮ ঘণ্টায় যেখানে ৬টি ঢালাই হইত সেখানে মাত্র দুইটি ঢালাই হয়। ছুটির পর শ্রমিকেরা বিরাট মিছিল করিয়া সতীশ মাইতির মুক্তি দাবি করেন।

পুলিস জুলুমের বিরুদ্ধে হকারদের শোভাযাত্রা

বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থের যুপকাষ্ঠে গরীবদের বলি করার প্রতিবাদ

কলিকাতায় প্রত্যেক দিন হকারদের বিরুদ্ধে এক হাজার হইতে দেড় হাজার 'কেস' হইতেছে অর্থাৎ প্রত্যেক দিন প্রায় এক হাজার দেড় হাজার হকার গ্রেপ্তার হইতেছে। 'পেটি কেসে' দু'চার টাকা 'ফাইন' করিয়া ছাড়িতেছে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে হকারদের মালপত্রের অনেকটাই খোয়া যাইতেছে। হাতিবাগান, শিয়ালদহে হামলা করিয়া লরী বোঝাই করিয়া গ্রেপ্তার করিতেছে। ইহার প্রতিবাদে গত ১লা সেপ্টেম্বর শিয়ালদহের তিন শত হকার মিছিল করিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যাইয়া মিটিং করে। এবং তারপর হাতিবাগানে শোভাযাত্রা করিয়া যায়। আসন্ন পূজার বাজারে বড় বড় দোকানদারেরা নিজেদের বিক্রি বাড়াইবার জন্য বিশেষ করিয়া হকারদের উপর সরকারী আক্রমণ সংগঠিত করার জন্য টাকা খরচ করিতেছে। হকারেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রতিরোধ করার সংকল্প করিয়াছে। কলিকাতায় মোট ৫০ হাজার হকার আছে। ৩টি হকার সমিতি একত্র করিয়া একটি অল-বেঙ্গল হকারর্স ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে।

সিলেটের গ্রামে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার ফৌজের গুলিবর্ষণ

৫ জন ক্ষেতমজুর ও কৃষক নিহত ঃ মেয়েদের উপর নৃশংস অত্যাচার

সিলেটের ক্ষেতমজুরদের বাঁচার মতন মজুরির লড়াইকে এবং ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের খাদ্যের আন্দোলনকে দমাইবার জন্য নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার ফৌজ গত ১৮ই আগস্ট সানেশ্বর গ্রাম চড়াও করিয়া নৃশংসভাবে গুলি চালাইয়াছে। তাহারা গুলি করিয়া ৫ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে নিহত করিয়াছে—৬ জন মেয়ে ও ৮ জন পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার চালাইয়াছে।

এই হত্যাকাণ্ডের সত্যঘটনা জনসাধারণের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখার জন্য নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার লোকেরা নানারকম আজগুবি গল্প বানাইয়া চারিদিকে ছড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথমে তাহারা প্রচার করিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামাইবার জন্য সানেশ্বরে গুলি চালনা করা হইয়াছে। এই গল্প যখন টিলিল না, তখন তাহারা বলিতে সুরু করিল যে, কমিউনিস্টরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুলিস ক্যাম্প আক্রমণ করিয়াছিল এবং সেজন্য গুলি চালানো হইয়াছে।

আসল ঘটনা কি

কিন্তু আসলে ঘটনাটিকি?

সানেশ্বরের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা অনেকদিন হইল বাঁচার মতন মজুরি, খাদ্য ও জমির জন্য আন্দোলন করিতেছেন। গত ১২ই আগস্ট সানেশ্বর বাজারে বহু ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষক এক সভা করেন। সেই সভায় তাঁহারা আওয়াজ তোলেন: ক্ষেতমজুরের তিন টাকা মজুরি চাই; খোদ চাষীর হাতে জমি চাই; বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ কর; কৃষক কর্ম্মী রজনী দাসের হত্যার তদন্ত চাই; এবং হত্যাকারীর শাস্তি চাই ইত্যাদি।

এই সভা ভাঙ্গার জন্য বিয়ানীবাজারের দারোগা সভাস্থলে ফৌজ লইয়া আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মজুর-কৃষকদের শক্তি দেখিয়া তাহারা পিছু হঁটিতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনার পর দারোগা ও জোতদার-জমিদারেরা একত্র হইয়া প্রচার করিতে থাকে—"এখনই সানেশ্বর গ্রামের মজুর-কৃষকদের ঠাণ্ডা করিতে হইবে। পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য সেখানে কমিউনিস্টরা ঘাঁটি করিয়াছে, তাহাদের উৎখাত করিতে হইবে।"

সানেশ্বর গ্রামে হামলা করার জন্য তাহারা উপরওয়ালাদের কাছে আরো বেশি ফৌজ চাহিয়া পাঠায়। জমিদার-জোতদারদের চাহিদা মিটাইতে নুরুল আমীন সরকার একটুও দেরী করিলেন না।

পাঠান ফৌজের অভিযান

২৮ই আগস্ট ভোর বেলা ৩।৪ শত পাঠান ফৌজ লইয়া স্বয়ং সিলেটের এ-ডি এম ও পুলিস সাহেব সানেশ্বর গ্রামের উপর হামলা সুরু করেন। পাঠান ফৌজেরা কৃষকদের ঘরদুয়ার ভাঙ্গিয়া, লুঠতরাজ করিয়া মেয়েদের উপর অত্যাচার চালাইতে থাকে। মেয়েদের চীৎকার শুনিয়া আশেপাশের গ্রামের কৃষকেরা আসিয়া জড় হইতে থাকেন। সেই

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিল

সোভিয়েটে কয়েদীর জন্য ব্যবস্থাও এ-দেশের মেহনতী জনগণ অপেক্ষা উন্নত

মানুষের এমন মর্য্যাদা, মানুষের এত স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য এমন সুন্দর বিধিব্যবস্থা—শুধু কাগজে-কলমে নয়, কার্য্যক্ষেত্রে—সোভিয়েট দেশে যেমন আছে তেমনটি নাই দুনিয়ার আর কোথাও। মানুষের জন্য সব কিছু,—প্রকৃত সোশ্যালিসম-কমিউনিজম-এর মূল কথাটিই এই এবং শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যও এই। মানুষ····কত গর্ব্বের, কত গরিমাময় এই কথাটিই! এবং একমাত্র সোভিয়েট দেশেই মানুষকে বাস্তবে সেই গর্ব্ব, সেই শ্রেষ্ঠত্ব, সেই প্রকৃত মানুষের আসনে বসানো হইয়াছে।

মানুষের অপমান সেখানে ঘৃণার্হ

জেলখানায় পর্য্যন্ত কোনক্রমে কোন অবস্থায় সোভিয়েট দেশের মানুষ মানুষের হীনতা, মানুষের অপমান সহ্য করিতে পারে না—কুৎসিত গ্লানিময় বলিয়া ঘৃণা করে! জেলখানায় পর্য্যন্ত সোভিয়েট দেশের নাগরিককে হীনতা বা অপমান হইতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা হয়।

প্রকৃত সংশোধনী ব্যবস্থা

সোভিয়েট দেশে—জেলখানা তো নয়, অপরাধ সংশোধনের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার ৭ নম্বর ধারায় আইন রহিয়াছে: কাজের ভিতর দিয়া, শ্রমের ভিতর দিয়া, অপরাধীকে সংশোধন করা হইবে; কিন্তু "দৈহিক কষ্ট বা মানুষের মর্য্যাদাহানিকর কোন কিছু ঘটিতে পারিবে না।"

সোভিয়েট দেশে যাহারা আইন ভঙ্গ করে তাহাদের অপরাধের জন্য সাজা দিবার লক্ষ্য হইল তিনটি:

(১) সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য দেখিতে হইবে যে, একবার যে অপরাধ করিয়াছে, সে যেন আবারও সেই পথে না যায়।

এই উদ্দেশ্যে—আদালতের রায় অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অপরাধীকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়।

(২) সমাজে আরও যদি কোন অপরাধপ্রবণ লোক থাকে— অপরাধীর সাজা তাহাকে হুশিয়ার করিয়া দেয়। এই জন্য সোভিয়েট দেশে বিচার হয় প্রকাশ্যেই; আদালতের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়; অনেক বিচার হয় বেশ বড় রকমের জনতার সামনেই।

(৩) অপরাধীকে সংশোধন করা—সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সমাজে সে যাহাতে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে। সংশোধনী শ্রমের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অপরাধীদের সৎ জীবন যাপন করিবার জন্য নূতন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার সংশোধনী শ্রম-সংক্রান্ত আইনে ব্যবস্থা আছে—অপরাধীর কাজের অভ্যাস অনুযায়ী তাহাকে কোন একটি সংশোধনী শ্রম-কেন্দ্রে রাখা হয়। শিল্প ও কৃষি-কাজ—এই দুই রকমের সংশোধনী শ্রম-কেন্দ্র আছে।

সাজা-পাওয়া অপরাধীদের সৎ মানুষ হিসাবে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সোভিয়েট দেশে কাজ বা শ্রমই প্রধান ব্যবস্থা।

শ্রম—পুঁজিবাদী দেশে····

পুঁজিবাদী সমাজে কাজ বা শ্রম হইল মেহনতী জনগণের পিঠে মহাকষ্টকর বোঝা। শ্রমিকের রক্ত-জল-করা শ্রম শোষণ করিয়াই পুঁজিপতির মুনাফা। পুঁজিবাদী দেশের অসংখ্য মানুষ বেকার। এই বেকারির সুযোগে পুঁজিবাদী শাসকরা কাজে-নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরী কাটে। প্রত্যেকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়াইয়া দেয় ভীষণভাবে। পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক বা কৃষক যাহা আয় করেন তাহাতে পেট চলে না।

তাই, পুঁজিবাদী দেশে কল-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে, অফিস-আদালতে শ্রমিক-কৃষক-কর্ম্মচারী যে শ্রম করেন তাহাই অপরাধীর সাজার মতো পীড়ন করে, মানুষকে নিত্য হীনতায়—অপমানে ডুবাইয়া রাখে, নিছক ভাত-কাপড়-আশ্রয়ের অভাবের গ্লানিতে মানুষকে অমানুষ করিয়া তুলিতে চায়; পুঁজিবাদী দেশের কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার আর অফিস-আদালতই অসংখ্য মেহনতী মানুষের জেলখানা।

····আর, সোভিয়েট দেশে

সোশ্যালিস্ট সোভিয়েট ইউনিয়নে সামাজিক-প্রয়োজনীয় যে-কোন শ্রম শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার বস্তু। কাজ বা শ্রম সেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব কাড়িয়া নেয় না। বরং, ঠিক উল্টা। শ্রম হইল যে-কোন সুস্থ কর্ম্মক্ষম মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য; শ্রম সেখানে প্রত্যেকেরই মহা আদরের অবশ্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তাগিদ। সোভিয়েট দেশের মানুষ শ্রম বা কাজ ছাড়া জীবন—কল্পনাই করিতে পারে না। শ্রম সেখানে যেমন প্রত্যেকরই খাওয়াপরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষাসংস্কৃতির অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে; তেমনি সে-শ্রম সমস্ত মানুষের সাধারণ সম্পদ যে সোশ্যালিস্ট সমাজ তাহাকে দ্রুত পূর্ণ কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তরিত করিতেছে। সেখানে শ্রম বা কাজ বিনা মানুষ নিজেকে সমাজের উপর অন্যায় বোঝা বলিয়া মনে করে। তেমন নিষ্কর্মা, অপদার্থ মানুষ সোভিয়েট দেশে নাই। এ-শ্রমের প্রকৃতিই অন্যরকম।

তাই, সোভিয়েট দেশে অপরাধীদের সংশোধন করিবার জন্য সর্ব্বাধিক কার্য্যকরী উপায় হইতেছে—শ্রম।

পুঁজিবাদের জেলখানায় আসল ক্রীতদাসের জীবন

বহু দেশেই অপরাধীদের কাজ করানো হয়: সশ্রম কারাদণ্ড। যেমন বৃটেনে—১৮৯৯ সালের আইন অনুযায়ী সাজা পাওয়া অপরাধীদের শ্রমসাধ্য কাজ করানো হয়। এই আইনে বহু রকমের কয়েদীকে দিনে ১০ ঘণ্টা খাটানো হয়। মেয়েদেরও এই একই ১০ ঘণ্টা খাটাইবার ব্যবস্থা আছে। যাহাদের সশ্রম কারাদণ্ড হয় তাহাদের দৈনিক ১০ ঘণ্টাই খাটিতে হয়। কোন কোন অপরাধে, যেমন খুন করিলে, যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডও হইতে পারে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কয়েদীদের এই শ্রম মানুষকে নিংড়াইয়া অবসন্ন করিয়া দেয়। মানুষকে নীচতায় হীনতায় বিকৃত করিয়া তোলে। এমনও বহু কুৎসিৎ ব্যবস্থার কথা জানা আছে যাহাতে বিনা প্রয়োজনে এক জায়গা হইতে আরেক জায়গায় পাথর, বালি, ইত্যাদি টানিয়া নিয়া যাইতে কয়েদীদের বাধ্য করা হয়; কয়েদীদের দিয়া পাথরের দেয়াল তৈয়ারি করাইয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে বলা হয়; অপ্রয়োজনে কাজ করানো হয়। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এইরূপ নিষ্ফল শ্রমের বর্ব্বর জবরদস্তি মানুষকে দেহে মনে ভাঙিয়া চুরিয়া পিষিয়া ফেলে। তাহার উপর আবার, সে জবরদস্তি-শ্রমের কোন মজুরি নাই; থাকিলেও তাহা নগণ্য। ইহাকেই বলে দাস-শ্রম; ইহাকেই বলে গোলামি। অবশ্য পুঁজিবাদী দেশের কয়েদখানায় ইহাই স্বাভাবিক। কেন না, সেখানকার খাস কয়েদখানার বাহিরেই তো সমস্ত মেহনতী জনগণ গোলামের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।

সোভিয়েট দেশে অবস্থা একেবারে অন্য রকম—ইহার সহিত তাহার কোনই মিল নাই।

সোভিয়েট দেশের সংশোধনী শ্রমকেন্দ্রগুলির বিধি-ব্যবস্থার ২ নম্বর ধারার আইন অনুযায়ী অপরাধীদের শ্রম বা কাজও কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপারে লাগানো চাই। সে কাজের ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয় যাহাতে অপরাধী কাজ করে একরকম স্বেচ্ছাতেই।

সোভিয়েট দেশে—কয়েদীদের ভিতরও রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজ চালানো হয়। কাজের প্রতিযোগিতায় কয়েদীরাও যোগ দেয়। সংশোধনী শ্রম-সংক্রান্ত আইনের ৪ নম্বর ধারায় আছে—

"····কয়েদীরা যাহাতে কাজে ও সংঘবদ্ধ শ্রমের জীবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে, কয়েদীরা যাহাতে সোশ্যালিস্ট সমাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেইভাবে তাহাদের নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, সেই দিকে নজর রাখিয়াই কয়েদীদের কাজ করানো হয়, তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।"

মানুষ গড়ার ব্যবস্থা

নিয়মমতো কাজ করিতে অনভ্যস্ত হইয়া আছে এমন কোন অপরাধী সংশোধনী শ্রমকেন্দ্রে প্রথমে নিতান্ত কর্ত্তব্যের দায়ে বাধ্য হইয়াই কাজ করে, কিন্তু, তাহার ভিতরও ক্রমে শ্রমের স্বাভাবিক তাগিদ দেখা দেয়। কারণ, সে তাহার শ্রমের প্রয়োজন বুঝিতে পারে; কাজের ফল দেখিয়া খুশী হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সেও শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক গঠনে একজন অংশীদার, সমগ্র সমাজেরই প্রয়োজনে গিয়া লাগিতেছে তাহারও হাতের কাজ—নিজের শ্রমের এই সার্থকতা দেখিয়া সেও শ্রমের মর্য্যাদায় গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। সে-ও সোশ্যালিস্ট সমাজের স্বাভাবিক মানুষ হইয়া ওঠে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বাহিরে যাহার কোন কাজে দক্ষতা থাকে, কয়েদখানার জীবনে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। **যেমন বৃটেনের পার্কহুর্ষ্ট জেলখানায়**—কয়েদীর পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা যাহাই হউক না কেন,

সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসার জবাবে—

সোভিয়েট দেশে—কয়েদীদের কাজ দেওয়া হয় সম্পূর্ণ অন্য নীতি অনুযায়ী।

সোভিয়েট দেশে সংশোধনী শ্রম-সংক্রান্ত আইনের ৭০ ধারায় আছে:

"যাহাদের কয়েদী করা হইবে তাহাদের কাজের ব্যবস্থা এমন করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের দক্ষতা বজায় থাকে ও বাড়িয়া যায়; এবং যাহাদের কোন দক্ষতা নাই তাহারা যাহাতে দক্ষ হইয়া ওঠে।"

এবং কার্যক্ষেত্রেও ইহাই হইয়া থাকে। কোনদিন কোন কাজে যাহার কোন দক্ষতা ছিল না, এমন লোকও একটি কিছু কাজ শিখিয়া সংশোধনী শ্রমকেন্দ্র হইতে বাহির হয়। এবং বাহিরে আসিয়া সহজেই কাজ পায়। কারণ, সোভিয়েট দেশে বেকার সমস্যা বলিয়া কিছু নাই—সেখানে কাজই শ্রমিককে খোঁজে।

প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশেই— কয়েদীদের কেবলই মানুষ হিসাবে আরও ছোট করিয়া দেওয়া হয়, মানুষ হিসাবে তাহাদের মর্য্যাদাটুকু পায়ে মাড়াইয়া দেওয়া হয়—তাহাদের জীবনই এক বিড়ম্বনা হইয়া ওঠে। আজও পর্য্যন্ত বৃটেনের জেলে বেত মারা হয়। আমাদের দেশের মত অর্দ্ধ উপনিবেশ ও উপনিবেশগুলিতে আরও তো সহস্র বর্ব্বরতা

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

পূজা বোনাস না দিলে সাধারণ ধর্ম্মঘট

সূতাকল শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে মাহেশে সূতাকল শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত

অবিলম্বে ৪ মাসের পূজা বোনাস এবং প্রতি শ্রমিককে ৫ গজ ধুতি, ৫ গজ শাড়ী এবং ২০ গজ শার্টিং না দিলে সূতাকল শ্রমিকেরা ১৫ দিনের নোটিস দিয়া সাধারণ ধর্ম্মঘট করিবেন।

গত ২১শে আগস্ট হুগলী জেলার মাসিরবাড়ী মাঠে এলাকার সহস্রাধিক সূতাকল শ্রমিকের সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বোনাস দেওয়া হইবে কিনা তাহা জানাইয়া দিবার জন্য মালিকদের সাত দিন সময় দেওয়া হইয়াছে।

বন্দী সূতাকল শ্রমিক হরেন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। বেঙ্গল বেল্টিং, বঙ্গলক্ষ্মী, রামপুরিয়া, বঙ্গেশ্বরী, হিন্দুস্থান বেল্টিং, ইণ্ডিয়ান বেল্টিং প্রভৃতি প্রত্যেকটি সূতাকল হইতে হিন্দুস্থানী, বাঙালী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া সকল প্রকার শ্রমিকেরাই জমায়েত হন।

এ, আই, টি, ইউ, সির সূতাকল শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ হইতে ভদ্রেশ্বরে অনুষ্ঠিত বাঙালী, হিন্দুস্থানী দাঙ্গার নিন্দা করিয়া সূতাকল শ্রমিকদের একযোগে দাবি আদায় করার জন্য আহ্বান জানান হয়।

গত বৎসর ট্রাইব্যুনালে যে সকল মজুরির রায় বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম হইতেছে সূতাকল শ্রমিকদের। মাসিক মাত্র মজুরি ২০ কংগ্রেস সরকার বরাদ্দ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক সংকটের বোঝাও সূতাকল শ্রমিকদের উপরেই আগে চাপান হইতেছে। মুনাফা বজায় রাজার জন্য মালিকেরা এখানে দলে দলে শ্রমিক ছাঁটাই সুরু করিয়াছেন। কোন কোন মিল ছুতা করিয়া বন্ধ রাখা হইতেছে। ফলে বাংলার সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে।

মাহেশের বঙ্গলক্ষ্মী সূতাকল আজ দুই মাস যাবৎ বন্ধ। মুনাফার বখরা লইয়া ম্যানেজার সেলিং এজেন্টের সঙ্গে যে কলহ হয় তাহাতে ইচ্ছা করিয়া আগুন লাগানো হয়। শ্রমিকেরা আগুন নিভাইতে গেলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের আটকাইয়া রাখেন। দমকলে পর্য্যন্ত একঘণ্টা দেরী করিয়া খবর যায়। ইহার ফলে এখানকার ৩০০০ শ্রমিক বেকার। পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বদলে কোম্পানী তাহাদের মাত্র ৩০ টাকা করিয়া মাগগীভাতা দিতেছেন।

সভা হইতে দাবি করা হয়, বঙ্গেশ্বরী শ্রমিকদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

চিঠিপত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়]

সম্পাদক মহাশয়,

আমার স্বামী একজন চটকল মজুর। তিনটি ছেলে মেয়ে আর স্বামী নিয়ে আমার সংসার। স্বামী হপ্তা পান ১৪টি টাকা। কোম্পানীর রেশন পাই ৭ সের। সংসারে চালের খরচ আমার ১৫ সের, বাকী চাল আমাকে ১২।১৩ আনা দামে কালোবাজার থেকে কিনে খেতে হয়। চাল কিনতেই আমার চলে যায় অর্দ্ধেক টাকা। বাকী টাকায় জ্বালানী কিনলে তেল হয় না, তেল কিনলে নুন হয় না। মাছ খাওয়াতো গরীবের আজ বিলাসিতা, বাঙ্গালীর মেয়ে হয়েও মাছের কথা আর মুখেও আনিনা।

পয়সার অভাবে ছেলে মেয়েকে স্কুলে দিতে পারি না। ১০।১১ বছর বয়স হলে যে ছেলেকে হাতুড়ী পিটতে হবে তার আবার লেখাপড়ার দরকার কি? গরীবের ৮।৯ বছরের ছেলেকে উলঙ্গ রাখলে কোন লজ্জা নেই, তাই কাপড়-জামার খরচটা বেঁচে যায়। নিজেও পুকুরবা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে এক ফালি কানি পরে কোনমতে ইজ্জত বাঁচাই। স্বামীর তো কথাই নেই, তিনি পুরুষ মানুষ ঘরে একখানা গামছা পরে থাকেন আর কলে যাবার সময় 'আস্ত' গামছাখানা কোমরে জড়িয়ে নেন। শুনতে পাই কোথায় নাকি কলেতে অনেক কামড় জমা হয়েছে বলে আর কাপড় বানাবে না এবং সেখানকার মজুরদের ছাঁটাই করে দেবে। বড় লোকরা বোধ হয় মনে করেন যে, গরীবের মেয়ের আবার অত লজ্জা নিবারণের সখ কেন? তাই কাপড় জমে পচে গেলেও আমাদের ভাগ্যে তা জোটে না, ছেঁড়া কানি দিয়েই ইজ্জতটা বাঁচাতে হয়।

তার উপর কোম্পানী আইন করেছে তাদের লোকসান বাচ্ছে বলে মাসে এক সপ্তাহ মজুরদের আধা হপ্তা দিয়ে কল বন্ধ করে রাখবে। পুরো হপ্তা পেয়েও আধপেটা খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। আর আধ হপ্তা নিয়ে শুনছি সামনের হপ্তায় তাও দেবে না। কি করে সংসার চালাই আপনারা একটা উপায় বলে দিতে পারেন? আবার শুনছি দরকার নেই বলে মালিকরা নাকি অনেক মজুরকে ছাঁটাই করে দেবে। এখানে মালিকের এই সব অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো বলে সরকারের সিপাহী এসে মালিকদের হয়ে কজন মজুরকে জেলে নিয়ে গেছে।

কোথায় যেন শুনেছিলাম জহরলাল সাহেবের ভগ্নীর ঘর সাজাবার জিনিস কেনবার জন্য হাজার হাজার টাকা সরকার থেকে মঞ্জুর হয়। আর আমার মত শত অভাগিনী মেয়ের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য স্বামী সন্তান নিয়ে ডুমুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকার কথা বলতে গেলেই জহরলালের পুলিস আর মালিকের গুণ্ডা এসে তাদের জেলে পুরে দেয়।

পর্দানশীন ঘরের মেয়ে আমি। কখনো বাড়ীর ওঠোন ছেড়ে পাকা রাস্তায় যাইনি। পেটের জ্বালা সইতে না পেরে আমার এই ২৫ বছরের জীবনে পাকা রাস্তা দিয়ে কলকাতায় গেলাম জহরলালের মিটিং শুনতে, ভাবলাম একটা ব্যবস্থা এবার হবেই—এত দুঃখ কষ্ট কি তিনি আমাদের দেবেন; কিন্তু মিটিংয়ে গিয়ে কি শুনলাম? ভাত না, কাপড় না, ছাঁটাই বন্ধ না, মজুরি বাড়ানোও না; কি তিনি দিলেন। ভোট! ছ'মাসের মধ্যে ভোটের দাওয়াই খেলে নাকি আমাদের পেটের জ্বালা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ভোটটা দেবে কে? ঐ মালিকের দালালরাই তো? যারা ছাঁটাই করে আমার সন্তানকে না খাইয়ে রাখার ব্যবস্থা করে? এতে আমাদের পেট ভরবে না। যে লালঝাণ্ডার মানুষগুলো গরীবের হ'য়ে কথা বলে, গরীবের হ'য়ে লড়াই করে তাদের ছেড়ে না দিলে আমাদের কোন দাওয়াইতেই আর পেট ভরবে না। তাই পথে যখন বেরিয়েছি তখন জহরলালের ঐ হাকিমী দাওয়াইতে আর আমরা ভুলছি না। —ইতি

লায়লা খাতুন

মানুষের মর্য্যাদা—পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে

(১১ পৃষ্ঠার পর)

রহিয়াছে। বৃটেনে ৬৯ বছরের কম বয়সের কয়েদীদের প্রথম কয়েক সপ্তাহের জন্য তোষক দেওয়া হয় না, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের জেলে নির্জ্জন কামরায় শাস্তির পর কয়েদীদের মুখোস পরাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে চেহারা হয় ভাঁড়ের মতো; কয়েদীদের নাম থাকে না, তাহারা একেকটি নম্বর হইয়া যায়—কয়েদীদের মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

সোভিয়েট দেশে—মানুষের এমন দশা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না।

মার্কিন মুল্লুকের জেলখানায়

আমাদের দেশের বহু সরকারী ধুরন্ধরের "স্বর্গ," তাহাদের "সভ্যতার আদর্শ" আমেরিকার জেলগুলিতে.... কয়েদীরা খাটিয়া যাহা আয় করে তাহা হইতেই তাহাদের খাওয়াপরা ইত্যাদি খরচ-খরচা কাটিয়া লওয়া হয়। আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায় ২৭৬২ নম্বরের আইনে কোন পলাতক কয়েদীকে গ্রেপ্তার করিবার যে পুরস্কার (২০০ ডলার), তাহাও কয়েদীর আয় হইতে কাটিয়া লওয়া হয়।

আমেরিকার নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে রাস্তা মেরামত ও রাস্তা তৈয়ারির মত কাজে দৈনিক এক ডলারের বেশি আর হয় না; কিন্তু এখানকার ১৮০ নম্বরের আইন অনুযায়ী—কয়েদীদের কাজে যে পাহারাদার থাকে তাহার বেতনও কয়েদীদের ঠেথাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট তহবিল হইতে কাটিয়া লওয়া হয়।

এইসব 'কাটের' ফলে কয়েদীরা শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের যে মজুরি পায় তাহা নিতান্ত নগণ্য।

জীবনের পথে প্রতিষ্ঠা

সোভিয়েট দেশে---কয়েদী যাহা উপার্জ্জন করে তাহার সবটাই জমা থাকে। কয়েদীদের খাওয়াপরা, চিকিৎসা, শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি সব খরচ পুরাপুরি সরকার হইতে দেওয়া হয়।

সংশোধনী শ্রমসংক্রান্ত আইনের ৭১ ধারায় এই ব্যবস্থা আছে। কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুসারেই কয়েদীদের মজুরি দেওয়া হয়। আয়ের একাংশ তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই পায়; বাকিটা পায় ছাড়া পাইবার সময়। এইভাবে—যে কোন অপরাধী নিয়মমতো কাজ করিলে ছাড়া পাইবার সময় যে জমানো অর্থ পায় তাহাতে বাহিরে আসিয়া খুবই সুবিধা হয়।

সোভিয়েট দেশের সংশোধনী শ্রম-সংক্রান্ত আইনের ৭৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে-সব অপরাধী উৎপাদনে কিংবা অন্য কোন কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায় তাহাদের উৎসাহ দিবার অনেক ব্যবস্থা আছে। যে-সব অপরাধী সামাজিক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ দেখায় কিংবা উৎপাদন বাড়াইবার নূতন কৌশল চালু করিতে পারে তাহাকেও যোগ্য পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করা হয়। উৎসাহ দেওয়া হয় নানা উপায়ে; প্রকাশ্যে প্রশংসা করিয়া, অর্থ বা অন্য জিনিস পুরস্কার দিয়া, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ছুটি, এমনকি মেয়াদ শেষ হইবার আগে মুক্তিও দেওয়া হয়।

সোভিয়েট দেশে—সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় যৌথ কাজের মধ্যে থাকিয়া অপরাধীরা ক্রমে ক্রমে কাজ করিবার অভ্যাস গড়িয়া তোলে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কয়েদীরা মুক্তি পাইবার পর সমাজের বাহির হইয়াই থাকিতে বাধ্য হয়, সবচেয়ে খারাপ কম মজুরির কাজই তাহারা পায় কিংবা বেকার সমস্যার মধ্যে তাহাও পায় না। কিন্তু, সোভিয়েট দেশে মুক্ত অপরাধীরা নিতান্ত সহজেই কাজ পায়। যে-অপরাধী সৎ কাজের ভিতর দিয়া সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে, সমাজে তাহাকে অতীত গ্লানির খোঁচা দেওয়া হয় না; সে-ও সোশ্যালিস্ট সমাজের মানুষ হিসাবে স্থান পায়। অতীত কলঙ্কের কথা ভুলিয়া যাইবার সুযোগ সেখানে আছে। সৎ-ভাবে কাজ করিয়া গেলে সে-ও অন্য যে কোন মানুষের মতো স্বাভাবিক ব্যবহার, পায় নিজের মর্য্যাদা ফিরিয়া পায়।

সোভিয়েট দেশে নাকি কয়েদীদের ক্রীতদাসের মতো দুঃসহ জীবনযাপন করিতে বাধ্য করা হয়। অথচ, যে-সব শাসকশোষকরা এই কুৎসা রটায় তাহারা সমগ্র মেহনতী জনগণকেই ক্রীতদাসের অবস্থায় জীবন কাটাইতে বাধ্য করে; জেলখানার বাহিরেও শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তকে তাহারা সোভিয়েট দেশের অপরাধীদের জীবনের সিকি অংশ সুযোগ সুবিধা দিতে পারে না।

পূর্ব্ববঙ্গের জমি ও খাদ্যের উপর মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন, কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন যাহাতে আরও অনেক সস্তায় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা। সেজন্য খোদ চাষীদের আরও তীব্র শোষণ করিতে হয়, জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া সমস্ত আবাদী জমির একচেটিয়া মালিকানা ধনী কৃষকদের হাতে দিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, ইহার সাথে সাথেই শহরের মজুর, গরীব চাষী ও গণতান্ত্রিক জনগণকে স্তোক দেওয়া দরকার যে লীগ সরকার জমিদারী উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছে, শীঘ্রই জমিদারী-উচ্ছেদ হইয়া যাইতেছে।

এই সুস্পষ্ট তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া বিশেষ কমিটির রিপোর্টটি তৈয়ার হইয়াছে।

সেই জন্যই বিশেষ কমিটির রিপোর্টে জমিদার ও খাজনাভোগীদের জন্য ৩০ কোটি টাকা খেসারত বরাদ্দ করা হইয়াছে। অনেকে বলিবেন মূল বিলে ৪০ কোটি টাকা খেসারত দিবার প্রস্তাব ছিল; বিশেষ কমিটি তো তাহা খুব কমাইয়া দিয়াছেন! এই যুক্তি ধনিকশ্রেণীর দালালদেরই যুক্তি। খোদ চাষীগণ বিনা খেসারতে জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়াও জমিদারের নিকট হইতে এতকাল তাহারা যে মুনাফা লুটিয়াছে সে বাবদ কোটি কোটি টাকা খেসারত দাবি করিতে পারে। সে ক্ষেত্রে গরীবের রক্ত-জল করা ৩০ কোটি টাকা বা এক পয়সাও কেন এই জমিদারদের দেওয়া হইবে? ইহাই মূল প্রশ্ন। জমিদারদের এই ৩০ কোটি টাকা খেসারত দিতে গিয়া জনসাধারণের উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করা হইতেছে। রাজস্বের খাতে পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান আয় মাত্র ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। এ অবস্থায় খেসারত দেওয়ার জন্য এই ৩০ কোটি টাকা যে ভাবেই উঠানো হউক তাহা সমগ্র জনসাধারণকে দেনায় ডুবাইয়া রাখিবে এবং এই ঋণের ফলে গরীবের উপর ট্যাক্স বাড়িবে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িবে দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ব্যাহত হইবে। খেসারত দিবার জন্য এই টাকা দিতে যাইয়া এমনকি খাদ্যশস্যের উৎপাদন পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

কেহ হয়ত বলিবেন, খেসারতের টাকা তো নগদ দেওয়া হইবে না, দীর্ঘ মেয়াদী বণ্ডে দেওয়া হইবে; সুতরাং ক্ষতি হইবে না। এ যুক্তি একেবারেই ভুল। বণ্ডে ৩০ কোটি টাকা দিতে হইলে বৎসরে প্রায় ১ কোটি টাকা সুদ দিতে হইবে। এই সুদ দিয়া ও কর্ম্মচারীর মাহিনা দিয়া রাজস্ব বিভাগের আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী হইবে, ঘাটতির ফলে দেশের অর্থনীতি বানচাল হইয়া যাইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি অত্যন্ত বেশী। মাত্র কয়েক মাস আগে, গত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের হাতে এখন স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার পরিমাণ মোট ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। অথচ এই কয় মাসে নোট ইস্যু হইয়াছে ১৭০ কোটি ২৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকার। [আজাদ ১৪ই আগস্ট] জমিদারদের এই খেসারত দিতে গিয়া মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়িবে, মজুরি আরও কমিবে, চাউল ও জিনিসপত্রের দাম আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই খেসারত দিতে হইলে মজুর ও শোষিত জনসাধারণ একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবেন।

গণ-সংগ্রামের অগ্রগতিতে ভীত হইয়াও ধনিকশ্রেণীর চাপে, পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারেরা আজ নিজেরাই কখনও কখনও জমিদারীর বদলে খেসারতের দাবি উত্থাপন করিতেছেন। জমিদারেরা নাকি সভা করিয়াই বলিয়াছেন যে "সেস বাকির জন্য জমিদারী নীলাম বন্ধ রাখিয়া রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ভূমিস্বত্ব দখল হইলে যথোপযুক্ত হারে খেসারত দেওয়া হউক।" [আজাদ ৩০শে আগস্ট]

ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে, জমিদারের সহিত মিতালির খাতিরে লীগ সরকার সেই ব্যবস্থাই করিয়াছে।

* * *

মজুর, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও বুদ্ধিজীবী—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহাদের রক্তশোষণ করিয়া জমিদারদের ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কিন্তু জমি কোথায় যাইবে? ভাগচাষী যে জমি চাষ করে, সে জমিতে তাহার স্বত্ব হইবে না। উঠবন্দী প্রজাদের তাহাদের বাস্তুভিটা হইতেও তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। দুর্ভিক্ষের বছরে বা তার পরে যে জমি কাড়িয়া লইয়া গরীব চাষীকে ক্ষেতমজুরে পরিণত করা হইয়াছে, সে জমিও তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, ওঠবন্দী চাষীকে অমানুষিক ভাবে খাটাইয়া জমি হইতে বিরাট মুনাফা করে সেই ধনী-কৃষক-জোতদারগণই জমির মালিক থাকিবে। ভাগচাষী প্রভৃতি চাষীও উচ্ছেদ হইয়া যাইবে।

মূল বিলে ছিল একটি পরিবার ২০০ বিঘার বেশী খাস জমি রাখিতে পারিবে না। বিশেষ কমিটি ২০০ হইতে কমাইয়া ১০০ বিঘা করিয়াছেন। তবে কমিটিও বলিয়াছেন যে, পরিবারে ১০ জনের বেশী লোক থাকিলে মাথা পিছু ১০ বিঘা খাস জমি রাখিতে পারিবে। বিশেষ কমিটি অবশ্য বলিয়াছেন ইহার অতিরিক্ত খাস জমি কাহারও থাকিলে তাহা গরীব চাষী প্রভৃতির মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহা শুধুই ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়। ১০০ বিঘার বেশী অথচ ২০০ বিঘার মধ্যে খাস জমি আছে, এরূপ পরিবার একরূপ নাই বলিলেই চলে। আমাদের দেশের আইনে অনেক অংশীদার হয়। কাজেই এক এক জনের এক এক পরিবার ধরিলে এই বিধানের ফলে ধনীকৃষকদের কিছুই অসুবিধা হইবে না। বস্তুতঃ মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী স্বীকারই করিয়াছিলেন যে ২০০ বিঘা বা তাহার বেশী জমি আছে এরূপ পরিবার পূর্ব্ববঙ্গে ৩ হাজার মাত্র। ১০০ বিঘা উর্দ্ধ সীমা ধরিলেও এই পরিবার সংখ্যা বিশেষ বাড়িবে না। ইহার উপর আবার কো-অপারেটিভের বিধান আছে। কাজেই ক্ষেতমজুর বা গরীব চাষীকে বিলি করিবার মত এক বিঘাও জমি মিলিবে না।

সরকারী হিসাবে দেখা গিয়াছে, এখনই বাংলা দেশে শতকরা ১৪ জন গ্রামের লোক ধনীকৃষক-জোতদার দুই-তৃতীয়াংশ আবাদী জমি দখল করে। এই আইন পাশ হইলে পুরা বোল আনা আবাদী জমিই ধনীকৃষক-জমিদার-জোতদারদের হাতে আসিবে, খোদ চাষীর দখলে এককণাও জমি থাকিবে না। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত গরীব গৃহস্ত খোদচাষীকে ভূমিহীন, সম্বলহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত করিতে হইবে—এই চক্রান্তই বিশেষ কমিটির রিপোর্টের মধ্যে রহিয়াছে।

এই মতলব আছে বলিয়াই মন্ত্রীরা হামেশা বলিয়া থাকেন: ছোট চাষীরা চাষের উন্নতি করিতে পারিতেছে না বলিয়াই খাদ্য-সংকট। শীঘ্রই কলের লাঙ্গল আনিয়া খাদ্য উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে! চাষীর হাতে জমির জন্য মজুর-চাষী একান্ত ব্যগ্র। কিন্তু সরকারের সেজন্য মাথাব্যথা নাই। তাহাদের একমাত্র চিন্তা দুর্ভিক্ষপীড়িত মজুর-চাষীগণ একটা গণবিপ্লব করিয়া তাহাদের সরকারকে ভূমিসাৎ না করে। ধনিকশ্রেণী দেখে মজুরের মজুরি আরও কমাইতে না পারিলে উৎপাদনের খরচা আরও কমানো যায় না, মুনাফা আরও বাড়ানো যায় না। তাহারা দেখিতেছে, বর্ত্তমান জমিদারীপ্রথা ও আইন বদলাইতে না পারিলে ধনতান্ত্রিক উপায়ে বড় বড় কৃষি ফার্ম্ম গড়িয়া তোলা যায় না।

তাই পূর্ব্ববঙ্গের লীগ সরকার এই আইন করিয়া বিধান করিতেছেন যে, সমস্ত আবাদী জমি মুষ্টিমেয় ধনীকৃষকের খাস জমিতে পরিণত করা হইবে; এক এক শরিকের ১০০ বিঘা জমি থাকিবে। একমাঠে যাহাদের জমি সেই সকল ধনী কৃষক লইয়া কো-অপারেটিভ করা হইবে। যাহারা খোদ চাষী তাহাদের এক কাঠাও জমি থাকিবে না। তাহারা শুধু এই ধনী-কৃষকদের অধীনে সস্তায় মজুরি করিয়া কোন রকমে বাঁচিবে, অকালে মরিবে।

ভূমি, কৃষি ও খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য এই পরিকল্পনা শুধু লীগ সরকারের নয়; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানেরও ইহাই হুকুক। পাকিস্তান সরকার ডলার ঋণ চাহিয়াছেন। ট্রুম্যান ঋণ দিতে সম্মত; কিন্তু তাহার শর্ত্ত সেই ঋণের টাকা কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে হইবে, বড়ো বড়ো কল কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সে টাকা ব্যয় চলিবে না। ইহার সোজা অর্থ; মার্কিন ডলার খাটাইয়া ধানের খেতে ফসল হইবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব্ববঙ্গের জমি ও খাদ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব কায়েম করিবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইহা কেন করিতে চায়, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিজেই তাহা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইহার "রাজনৈতিক" কারণ আছে। সে কারণ হইতেছে প্রথমতঃ এদেশকে মার্কিন

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

সিলেটে বর্ব্বরতার অভিযান

(১২ পৃষ্ঠার পর)

জনতার উপর পাঠান ফৌজেরা নির্ব্বিচারে গুলি চালাইতে থাকে। ফলে ৪ জন কৃষক সেখানেই মারা যান; আর একজন পরে হাসপাতালে মারা যান। বহু কৃষক আহত হন।

কিন্তু গুলি চালাইয়াও পাঠান ফৌজের তাণ্ডব থামে নাই। কৃষক জনতার মধ্য হইতে ছয়জন মেয়েকে ধরিয়া আনিয়া ফৌজেরা বন্দুকের কুঁদা দিয়া মারিতে মারিতে তাহাদের দেহ মাটিতে লুটাইয়া দেয় এবং পরে সেই দেহগুলি টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিকটবর্ত্তী এক বাজারে লইয়া যায়।

একজন বন্দী মেয়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার মুখ বন্ধ করার জন্য তাহার মুখের মধ্যে খড় বিচালী গুজিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলা হয়।

মেয়েরা ছাড়া আরো আটজন কৃষককে ধরিয়া আনিয়া মারপিট করা হয়।

নারী-পুরুষ সমেত এই ১৪ জনকে এখন সিলেট জেলে আটক রাখা হইয়াছে—তাহাদের অনেকের অবস্থা-ই আশঙ্কাজনক।

ডিক্রগড়ে মজুর-কৃষকদের উপর গুলি চালাইয়া, বে-পরোয়া দমননীতি চালাইয়া আসামের কংগ্রেসী সরকার ইতিহাস রচনা করিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে সিলেটে নুরুল আমীন সরকার আসামের কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে এখন পাল্লা দিয়া চলিয়াছেন।

সুতাকলে বিক্ষোভ

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

রামপুরিয়া, বঙ্গেশ্বরী, বেঙ্গল বেন্টিং প্রত্যেকটি মিলেই ছাঁটাইয়ের কথা শোনা যাইতেছে।

এই অবস্থায় পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। সুতাকলগুলি প্রত্যেক বৎসরই শ্রমিকদের কিছু কিছু বোনাস দিয়া ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু গত বৎসর হইতে তাঁহারা তাহাও বন্ধ করার চেষ্টা করেন।

ইহার প্রতিবাদে তুমুল আন্দোলন সুরু হয়। আন্দোলনের ফলে বঙ্গলক্ষ্মী, রামপুরিয়া প্রভৃতি মিলগুলি কিছু কিছু বোনাস দিতে বাধ্য হয়।

এবারও বোনাসের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগিতেছে। বেকারী, কম হপ্তা ইত্যাদির জন্য শ্রমিকরা যে ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা পরিশোধের জন্য কমসে কম ৪ মাসের বোনাস আদায় করিতে হইবে। এই দাবিতে মাহেশের সুতাকল শ্রমিকেরা আগাইয়া চলিয়াছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথই জমিদারী উচ্ছেদের আসল পথ

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

উপনিবেশে পরিণত করিয়া মজুর-চাষীকে শোষণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে এসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে এদেশকে ব্যবহার করা। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে মজুর, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষীকে শোষণ করা হইতেছে, সমস্ত খোদচাষীর জমি কাড়িয়া তাহাদের ক্ষেতমজুর করা হইতেছে।

দ্রুত বর্দ্ধমান গণ-সংগ্রামের ভয়ে কম্পমান নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা দেখিতেছে, গদিতে টিকিয়া থাকার একমাত্র ভরসা ধনীকৃষকের পুরা সমর্থন লাভ। জমি, ফসল ও মুনাফার একচেটিয়া অধিকার দিলে তবে ধনী-কৃষকের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাইবে; অথচ তাহাদের সমর্থন আদায়ের জন্য জমিদারদের উচ্ছেদ করা যাইবে না। **তাই বিশেষ কমিটি জমিদারের জন্য খেসারত আর ধনীকৃষকের জন্য জমি** এই ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন।

বিশেষ কমিটি অবশ্য তাহাদের রিপোর্টে লিখিয়াছেন, নানকার প্রজারা তাহাদের নানকার জমিতে স্বত্ব পাইবে এবং যাহারা ধানী খাজনা দেয়, ধানের বদলে তাহাদের জন্য টাকায় খাজনার ব্যবস্থা করা হইবে।

কিন্তু বিশেষ কমিটি ভুলিয়া গিয়াছেন এই সব চাষীর দাবি; বকেয়া খাজানা দেনা মকুব করিতে হইবে। যাহাদের সংসার চলার মতো জমি নাই, তাহাদের ভূমি-আয়-কর বা খাজানা হইতে রেহাই দিতে হইবে, খাজনাপ্রথা অবসান করিতে হইবে।

বিশেষ কমিটি ইহার একটি ব্যবস্থাও করেন নাই। তাহারা যে ভাবে ধানী খাজনার বদলে টাকায় খাজনার ব্যবস্থা করিতেছেন; তাহাতে সংগ্রামী ক্ষেতমজুর ও চাষীদের কিছুই সুবিধা হইবে না; তাহারা যে নানকার জমিতে স্বত্বের কথা বলিতেছেন তাহাতেও গরীব নানকার প্রজাদের স্বার্থ হইবে না।

কিন্তু সব চেয়ে প্রধান কথা লীগ-সরকার যে পরিবর্ত্তন আনিতে চাহিতেছেন, তাহা হইবে কবে? কত দিনে?

বিশেষ কমিটি দেখাইয়াছেন যে, জমিদারদের এই ৩০ কোটি টাকা খেসারত দিবে ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীরা; তাহাদের অবশ্য কোন লাভ হইবে না। তবে জমিদারি দখল সম্পূর্ণ হইলে সরকারের ২ কোটি ৪১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা আয় বাড়িবে। কিন্তু কবে? মন্ত্রী তফাজ্জল আলী বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ জমি হস্তগত করিতে ৪০ বৎসর এবং রেকর্ড সংশোধন করিতে আরও ৯ বৎসর—এই মোট ৪৯ বৎসর পর পূর্ব্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ জমিদারের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।"

[আজাদ ৪ঠা আগস্ট]

এই কথাটির মধ্য দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের মজুর-চাষী ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে লীগ সরকারের হীন ষড়যন্ত্র আলগা হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ধনী কৃষকেরা জমিদারদের সাথে মিলিয়া ক্ষেতমজুর গরীব চাষীর উপর যে নির্ম্মম নিষ্পেষণ চালাইতেছে, যে ভাবে খাদ্যের দর বাড়াইতেছে, জমি ছিনাইয়া লইতেছে, তাহাতে এই ৪৯ বৎসরের মেয়াদ তাহারা কোন মতেই সহ্য করিবে না।

সরকারের আয় বাড়িবে—২ কোটি ৪১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা রাজস্ব বাড়িবে। ইহা দেখাইয়া বিশেষ কমিটি জনগণের সমর্থন দাবি করিয়াছেন।

কিন্তু ধনিকশ্রেণীর সরকারের আয় বাড়িলে শ্রমিকশ্রেণীর বা শোষিত চাষীর কি লাভ? লাভ তো নাই-ই; বরং ধনিক সরকারের আয় বাড়িলে মজুর-চাষীর উপর অত্যাচার ও জুলুম আরও বাড়িবে। তামাক, সুপারি, পাট সব জিনিসের উপর ট্যাক্স বসাইয়া সরকার অনেক টাকা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সে টাকা দিয়া কি হইয়াছে? গোটা বাংলার পুলিস বিভাগের জন্য যত টাকা খরচ হইবে, এখন পূর্ব্ববঙ্গে তাহা অপেক্ষা বেশী ব্যয় হইতেছে। মজুর-চাষীর দেওয়া টাকায় পুলিস-আনসার-মিলিটারী পুষিয়া মজুর-চাষীকে গুলি করিয়া হত্যা করা, মারা, গ্রেপ্তার করা হইতেছে। রাজস্বের খাতে আরও আড়াই কোটি টাকা আয় বাড়িলে আরও পুলিস-আনসার-মিলিটারী আসিবে, মজুর-চাষীর উপর আরও বেশী গুলি চলিবে। গত এক বছরে প্রায় ৮০ জন মজুর-চাষী গুলিতে মরিয়াছে, এবার তাহার ডবল মরিবে। সরকারী ক্ষমতা মজুর শ্রেণীর হাতে থাকিলে মাত্র তবেই সরকারের আয় বাড়িলে মজুর-চাষীর সুবিধা হয়।

এই অবস্থায় দেখা যাইতেছে বিশেষ কমিটির রিপোর্ট মজুর-চাষীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা ভাবিয়াছে, এই বিল ও বিশেষ কমিটির রিপোর্ট দ্বারা তাহারা মজুর-চাষীকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে। তাহাদের সে আশায় ছাই পড়িবে ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের মজুর-চাষী ও শোষিত জনসাধারণ আজ লীগ নেতৃত্বকে—নুরুল আমিন মন্ত্রিসভাকে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করিয়াছে। আরও ৪৯ বৎসর জমিদারী প্রথাকে তাহারা ধ্বংস করিবে না এই ঘোষণা করিয়া নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়াছে।

মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়া আর একটি রাজনৈতিক দল আজ আসর গরম করার চেষ্টা করিতেছে। সে দল হইতেছে 'জনগণের মুসলিম লীগ'—আওয়ামে লীগ। লীগ সরকার ও নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন এরূপ অনেকে হয়তো সত্য সত্য ভরসা করেন, এই জনগণের লীগ ও ভাসানীর মওলানা সত্যই বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করিবেন; নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা যাহা করিতে পারিতেছে না ভাসানীর মওলানা তাহা করিতে পারিবেন।

কিন্তু ভাসানীর মওলানা কাহাদের লইয়া দল গড়িতেছেন? যাহারা শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ আনিতেছে সেই ফয়েজ আহমদ এর সহিত ভাসানীর মওলানা দল করিতেছেন। রেল মজুরদের আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য যে সব দালাল ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই সাথে ভাসানীর মওলানা ওঠা-বসা করিতেছেন। নির্ব্বাচনের দুস্তর সাগর পার হইবার জন্য ধনী কৃষকদের উপরেই ভাসানীর মওলানা ভরসা করিয়া আছেন। নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা যে অগণিত মেয়ে-পুরুষকে গুলি করিয়া হত্যা করিতেছে। মওলানার নিজের জেলা ময়মনসিংহে ৪০ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষী লীগ সরকারের গুলিতে মরিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আওয়ামে লীগ একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করেন নাই। ই, বি, রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পূর্ব্ববঙ্গ কৃষক সমিতি প্রভৃতি গণ-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গুণ্ডামী ও হামলা চলিতেছে। সারা প্রদেশে ১৪৪ ধারা ও বুলেটরাজ চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে জনগণের লীগের কণ্ঠধ্বনি শোনা যায় না। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে লীগ সরকার কার্য্যতঃ বে-আইনী করিয়া রাখিয়াছে। প্রগতিশীল মত প্রকাশ করার জন্য নুরুল আমিন সরকার কয়েকটি সাপ্তাহিকের পূর্ব্ববঙ্গে প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছে—এসব জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার লইয়া গণতান্ত্রিক লীগের মাথাব্যথা নাই! আসলে মুসলিম লীগের আওয়াজই ধনিকশ্রেণীর আওয়াজ। নুরুল আমিনই হউন আর ভাসানীর মওলানাই হউন, ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের একটি সমস্যার সমাধান হইবে না, হইতে পারে না। জনগণের মুসলিম লীগ আসলে সোনার পাথরবাটি! কমিউনিস্ট-বিরোধিতা চালাইয়া জনগণের মুসলিম লীগের আওয়াজ তুলিয়া ভাসানীর মওলানা আসলে ধনিকশ্রেণীর হইয়া কাজ করিতেছেন। যে লীগ সরকারের প্রতি জনগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাহাকেই সাহায্য করিতেছেন। কাজেই আওয়ামে লীগের পথে জমিদারী-উচ্ছেদ হইবে না, খোদচাষী জমি পাইবে না।

শ্রমিক শ্রেণীর পথ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ জমিদারি উচ্ছেদের আসল পথ। বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদের লড়াই সেই পথেই দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। আজ সারা পূর্ব্ববঙ্গে জমিদারি-প্রথার বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুর ও গরীব-চাষীদের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতেছে, কৃষি বিপ্লবের অগ্নি-শিখা দ্রুত গতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আবি ও টংক প্রথার বিরুদ্ধে নানকার গোলামীর বিরুদ্ধে, জমি হইতে চাষীর উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, ক্ষেতমজুরের মজুরি-বৃদ্ধির জন্য গত এক বছরে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলায়, বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ, সীলেট, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় আন্দোলনের তীব্রতা ও শহীদের রক্তস্রোত নুরুল আমিন মন্ত্রিসভাকে আতংকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

এবারকার আন্দোলনের একটি প্রধান বিশেষত্ব গ্রামের মজুরশ্রেণীর ও ক্ষেতমজুরদের ভূমিকা। একদিকে যেমন জমি ও ফসলের জন্য জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছেন, তেমনই অপর দিকে তাহারা নিজেদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য, বাঁচার মতো মজুরির জন্য দিনাজপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় বারবার ধর্ম্মঘট সংগ্রাম করিয়াছেন, অনেক স্থানেই শতকরা একশত ভাগ মজুরি বৃদ্ধি আদায় করিয়াছেন। গ্রামের এই লড়াইতে নূতন প্রেরণা জোগাইয়াছে রেল ও সুতাকলে মজুরের লড়াই। রেল মজুরের ৯ই মার্চ্চ গোটা পূর্ব্ববঙ্গের হাজার হাজার গ্রামে নূতন বিদ্যুতের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছে, সেই সময় হইতেই বেশী করিয়া ও সচেতনভাবে ক্ষেতমজুরদের ধর্ম্মঘট সংগ্রাম সুরু হইয়াছে, গ্রামের লড়াইয়ের মোড় ঘুরিয়া নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্র, মহিলা ও গণতান্ত্রিক জনসাধারণের মধ্যে বিনা খেসারতে জমিদারী-উচ্ছেদের দাবিতে, খোদ-চাষীর হাতে জমির দাবিতে আন্দোলন উঠিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই অপরাজেয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার তলার বনিয়াদ ধসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের কাছে আজ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে যে, সরকারী মুসলিম লীগ বা বে-সরকারী মুসলিম লীগ—আওয়ামে লীগ—ইহাদের পথে বা ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জমিদারি উচ্ছেদ বা জনগণের একটি সমস্যারও সমাধান হইবে না। আজ বুঝা যাইতেছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে-ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদের লড়াইকে, খোদ চাষীর হাতে জমি আনার লড়াইকে চূড়ান্ত মোক্ষম লড়াইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করিয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য আগাইতে হইবে—ইহাই আজ শোষিত জনগণের সামনে একমাত্র পথ।

সারা পূর্ব্ববঙ্গের মজুরকে, প্রত্যেক গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষী, মাঝারি কৃষককে আজ লীগ সরকারের হীন ষড়যন্ত্রের কথা জানাইয়া দিতে হইবে; নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা মজুর-চাষীর রক্ত শোষণ করিয়া জমিদারদের ৩০ কোটি টাকা খেসারত দিতে চায়; আরও ৪৯ বৎসর জমিদারি-প্রথা কায়েম রাখিতে চায়; গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরের দুশমন ধনী কৃষক জোতদারদের হাতে সমস্ত জমি তুলিয়া দিতে চায়, ভাগচাষী ও অন্যান্য সকল গরীব চাষীকে ক্ষেতমজুরে পরিণত করিতে চায়; খাজনা না কমাইয়া খাজনা বাড়াইতে চায়, সার্টিফিকেট যোগে বাকী-বকেয়া গরীবের নিকট হইতে আদায় করিতে চায়। সারা পূর্ব্ববঙ্গে জনগণের আওয়াজ উঠিতেছে:

—নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার অবসান চাই,
—এখনই বিনা খেসারতে জমিদারি-উচ্ছেদ চাই,—খোদ চাষীর হাতে জমি চাই,
—গণতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত

মাঙ্গল

প্রথম বর্ষ ঃ ১৩ সংখ্যা] ১১ই সেপ্টেম্বর '৪৯ ঃ ২৫শে ভাদ্র '৫৬ [তিন আনা

কাশ্মীর ব্যবচ্ছেদের জন্য ট্রুম্যান-এটলির পরোয়ানা

স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বর্ব্বর আক্রমণ

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের নামে ট্রুম্যান-এটলি নেহরু ও লিয়াকত আলির নিকট এ্যাডমিরাল নিমিৎসকে নিরপেক্ষ সালিশ নিযুক্ত করার জন্য নির্দ্দেশ পাঠাইয়াছেন। ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানে সত্যকার আজাদী ও সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই বলিয়া নেহরু-লিয়াকত আলি এতদিন ডঙ্কা বাজাইয়া জনগণের মনে যে ধুম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ট্রুম্যান-এটলির রূঢ় আঘাতে তাহা একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সাম্রাজ্যবাদের সহিত সমঝোতার পথে, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথে যে ভুয়া আজাদী ব্যতীত আর কিছু আসিতে পারে না, বিক্ষুব্ধ জনগণের চোখের সামনে আজ তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল! ধনিক শ্রেণী, কংগ্রেস ও লীগের নেতারা সব জানিয়া শুনিয়াই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, অথচ জনসাধারণের নিকট এতদিন ছলনা করিয়া আসিয়াছেন।

নেহরু আজ ন্যাকা সাজিয়া বলিয়াছেন, "ট্রুম্যান-এটলির হস্তক্ষেপে আমি বিস্মিত হইয়াছি।" এই বিষয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরুল্লা খাঁর উক্তি ও সে সম্পর্কে নেহরুর নীরবতা লক্ষ্য করার বিষয়। জাফরুল্লা খাঁ বলিয়াছেন ঃ সে কি! নেহরু এখন আশ্চর্য্য হইতেছেন কেন? তিনিই তো সেদিন বলিলেন, ট্রুম্যান-এটলির হস্তক্ষেপেরই দরকার দেখিতেছি! নেহরু এখনও জাফরুল্লা খাঁর এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; জনসাধারণ বুঝিতেছে, নেহরুর এই বিস্ময় কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

লিয়াকত আলীর জানাশুনা ব্যাপার

লিয়াকত আলীকে ভাল বলিতে হয় তিনি বিস্ময়ও প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ অনেকটা নিশ্চিন্তে লেজ নাড়িতেছেন, ধীরে সুস্থে ভাবিয়া দেখিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদের রোয়েদাদেই তো ভারত-বিভাগ হইয়াছে, পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের জন্ম হইয়াছে! সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী সালিশে তাঁহার চিন্তা কি?

বিপ্লবী সম্ভাবনার পরম মুহূর্ত্তে গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর পিছন হইতে ছুরি মারিয়া নেহরু-লিয়াকত মাউন্ট ব্যাটেন দম্পতির পিছন পিছন ছুটিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। আত্মবিক্রয়ের সেই ঢালু পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে নেহরু-লিয়াকত উঠিতে বসিতে সাম্রাজ্যবাদকে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ধর্ম্মঘটী কমার্স ছাত্রদের উপর পুলিসের আক্রমণ

গত ৯ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতার ৪,০০০ কমার্স ছাত্র মিছিল করিয়া তাহাদের শিক্ষা সংক্রান্ত বহুদিনের দাবী নিয়া ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ ব্যানার্জ্জীর নিকট উপস্থিত হন। ইহার জবাবে ফোন যোগে কংগ্রেসী সরকারের পুলিস বাহিনী ডাকাইয়া আনিয়া এই দাবীরত ছাত্রদের উপর লেলাইয়া দেওয়া হয়।

ছাত্রদের সাথে ভাইসচ্যান্সেলার দেখা করিতে অস্বীকার করার পর দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর দরজা জানালা-বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; আলো নিভাইয়া দেওয়া হয়; তারপর রাত্রির অন্ধকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিস বাহিনী ঢুকিয়া পড়িয়া দাবীরত ছাত্রাদর উপর প্রথমে কাঁদুনে গ্যাস পরে নৃশংসভাবে লাঠি চালনা করে। ১৫ জন ছাত্রকে জখম করা হয়। ১৭৫র উপর ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শিক্ষা কেন্দ্রের মর্য্যাদা পায়ে মাড়াইয়া কংগ্রেসী সরকারের পুলিসবাহিনী এই তৃতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ঢুকিয়া ছাত্রদের উপর আক্রমণ করে।

৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার ১০,০০০ কমার্স ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের বহুদিনের দাবীগুলি লইয়া এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম সুরু করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পুলিস বাহিনীর এই আক্রমণের পর সে সিদ্ধান্ত নিয়া তাহারা আরও দৃঢ়তার সাথে ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতেছেন।

এই কমার্স ছাত্রদের অধিকাংশই গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, দিনের বেলা সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিয়া রাত্রি বেলা কলেজ করেন। তাহাদের দাবী ছিল ঃ

(১) রাত্রিবেলা এম, কম, পড়ার সুযোগ দেওয়া হোক (২) ক্লাসে প্রয়োজনীয় উপস্থিতির পার্সেন্টেজ ৭৫ হইতে ৬০ করা হোক, (৩) কলেজের বেতন কমানো হোক, (৪) কমার্সের জন্য আলাদা শিক্ষাবোর্ড বা ফ্যাকাল্টি চাই, (৫) অন্যান্য বিভাগের মত বি-কমে পাশের নম্বর ৪০ হইতে ৩৬ করা হোক।

নির্ব্বাচিত 'সংগ্রাম পরিষদের' নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া গত ৯ই সেপ্টেম্বর ৪০০০ ছাত্র তাহাদের দাবী নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হাজির হন। জবাবে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করিয়া লাঠির আঘাতে জখম করিয়া প্রায় ১৭৫ জন ছাত্রকে প্রিজন ভ্যানে তুলিয়া লওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ পুলিসে ফোন করিয়া দেন; আট গাড়ী সশস্ত্র পুলিস বাহিনী তখনই আসিয়া পড়িয়া ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিতে বলে। ছাত্ররা এই উদ্ধত হুকুম অগ্রাহ্য করিলে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িতে উদ্যত হয়। প্রায় পাঁচশত

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিধান মন্ত্রিসভার পুলিসের গুলিতে পুনরায় ৭জন নারী নিহত

ক্ষেতমজুরদের বাঁচার মত মজুরি, পুরা কাজ ও খাদ্যের দাবির উপর নৃশংস আক্রমণ

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত হাটাল গ্রামে নিরস্ত্র মেয়েদের উপর গুলি চালাইয়া গত ৯ই সেপ্টেম্বর ৭জন ক্ষুধার্ত্ত নারী, শিশু ও বালিকাকে নিহত করা হইয়াছে। প্রায় ১৮ জন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। হতাহত সকলেই নারী।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর এই ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হয় তাহা সর্ব্বৈব বিকৃত। আবার নিরস্ত্র মেয়েদের উপর গুলি চালান হইয়াছে, এই পৈশাচিক ঘটনাকে চাপিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশিত সংবাদে বোঝাইবার চেষ্টা হয় যে পুলিসদল আক্রান্ত হইয়াছিল; ইহাও সর্ব্বৈব মিথ্যা। একজন পুলিসও আহত হয় নাই।

আসল ঘটনা হইতেছে এই ঃ জোতদার-জমিদার-চোরাকারবারী এবং সরকারী খাদ্যনীতির জুলুমে হাওড়া জেলার সর্ব্বত্র এক দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে—এই অঞ্চলে চালের দর ৩৬ টাকা ৩৮ টাকা।

হাটাল গ্রামে প্রায় ৪৫০ ঘর লোকের অধিকাংশের ঘরে খাদ্য নাই। তাঁহাদের অধিকাংশই আবার ক্ষেতমজুর! বর্ত্তমানে তাঁহারা কোথাও কাজ পাইতেছেন না। কদাচিত কাজ পাইলেও মজুরি মাত্র ২৸০। অথচ ইহারই পাশে পাশে গ্রামের কয়েকঘর জমিদার, জোতদার ধনী-কৃষক এবং চোরাকারবারীরা শত শত মণ ধান মুনাফার জন্য ঘরে জমাইয়া রাখিয়াছেন। ক্ষেতমজুররা দাবী করেন, পুরা কাজ চাই, ও বাঁচিবার মত মজুরি চাই। বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষাবস্থার খাইয়া বাঁচিয়া থাকার জন্য তাঁহারা দাবি করেন—বিনা সুদে চোরাকারবারী-ধনীদের উদ্বৃত্ত ধান রুজ্জও দিতে হইবে।

এই দাবিতে হাওড়া জেলার ব্যাপক অঞ্চলে এক বিপুল গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। বহু গ্রামে ক্ষেতমজুররা বিপ্লবী উপায়ে তাঁহাদের এই দাবি আদায় করিতেছেন।

কিন্তু বিধান মন্ত্রিসভা এই দাবিকে সহ্য করিতে পারেন নাই। ৯ই সেপ্টেম্বর হাটালের চোরাকারবারী ও ধনী কৃষকদের অনুরোধে সরকারি সশস্ত্র পুলিস পাঠান।

ক্ষেতমজুরের গ্রাম। ঘরের পুরুষরা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন। এমন সময় তাহারা হানা দিল। ক্ষেতমজুর ঘরের মেয়েরা একত্রে আসিয়া জোটেন এবং পুলিস জুলুমের প্রতিবাদ ঘোষণা করেন।

কিন্তু, পুলিস কোন প্ররোচনার অপেক্ষা না করিয়াই আক্রমণ সুরু করে। রাইফেলের কুঁদার বাড়ি খাইয়া বালিকা খুন হয়। মুহুর্মুহু গুলি চলিতে থাকে। সাত জন নিহত ও ১৮ জন আহত নারীর সকলেই বুলেটে আহত।

'৪২ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মেদিনীপুরে যে বীভৎস অত্যাচার চালাইয়াছিল, চিত্রে তাহা সামান্যই বর্ণনা করা সম্ভব। কিন্তু 'আগস্ট-বিপ্লবী' কংগ্রেসী প্রভুরা সেই সামান্য বর্ণনাও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

'৪২-এর নিষিদ্ধ ছায়াচিত্রের ডাইরেক্টর তাঁহার বিবৃতিতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন: সেন্সর বোর্ডে মিলিটারী হইতে যে দুইজন প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ছবিটি দুই তিন মিনিট দেখিতে না দেখিতে বাহির হইয়া যান। তাহার পর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বাহির হয়, ছবিটি 'অশ্লীল'। 'আগস্ট-বিপ্লবী'রা একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তাঁহাদেরই তদন্ত কমিটির রিপোর্টে মেদিনীপুরের মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচারের অসংখ্য কাহিনী ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু সেদিন তাহা 'অশ্লীল' বলিয়া গণ্য হয় নাই, দেশময় তাহা বিক্ষোভের আগুনই জ্বালিয়াছে। কিন্তু এখন উহা কেন 'অশ্লীল' বলিয়া গণ্য হয় তাহা বুঝিতে হইলে নয়াদিল্লীর দিকে তাকান। গত ৩১শে আগস্ট সেখানে ভারতের জঙ্গীলাট কারিয়াপ্পাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "লিজয়ন অব মেরিট" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। জেনারেল কারিয়াপ্পা কখন কিভাবে এই উপাধি লাভ করার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাও মার্কিন প্রভুরা বলিতে ভুল করেন নাই। যুদ্ধের সময়ে এবং বিশেষ করিয়া ১৯৪৫ হইতে ১৯৪৯ সালের মধ্যে তিনি ভারতীয় সৈন্যদলকে যে 'নেতৃত্ব' দিয়াছেন তাহার জন্যই এই পুরস্কার।

'৪২-এ ভারতীয় সৈন্যদলকে যাহারা 'সুযোগ্য নেতৃত্ব' দিয়াছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট তাঁহাদের আজ মূল্য অনেকখানি। কাজেই তাঁহাদের 'সুনামের' সামান্য ক্ষতি হইতে পারে এমন কোন ছবিই যে তাঁহারা মঞ্জুর করিতে পারেন না ইহা বোঝা এমন কি শক্ত!

* * *

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সত্যি সত্যি এখন আর কোন ঝক্কিই লইতে প্রস্তুত নন। কারণ, ভারত ও পাকিস্তানের উপর দাঁড়াইয়াই তাঁহাদের সাম্রাজ্যরক্ষার অধিকাংশ প্ল্যান কার্য্যকরী করিতে হইতেছে। পিপিং রেডিও হইতে ফাঁস করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিভাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নেহরু সরকারের সাহায্যে তিব্বতকে নিজেদের ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছে।

দীর্ঘদিনের চুক্তি অনুসারে এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক কারণে তিব্বত চীনের অংশ। চীনে শ্রমিক-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তিব্বতের প্রতিক্রিয়া শক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করে; চিয়াং-কাই-শেকের দালালরা ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব অনুসারে তিব্বত ত্যাগ করিতে রাজী হয়। নেহরু সরকার তাহাদের ভারতে আসিবার জন্য পথ দেন। তিব্বত হইতে অধিকাংশ চীনা বহিষ্কৃত হয়। সেখানে কার্য্যত ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব কায়েম হয়। সেখানকার সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে নির্ম্মমহস্তে দমন করা হয়। ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করায় যাহাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তাহার জন্যে নেহরু সরকার সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন, সেখানে ভারতীয় সৈন্যদল প্রেরণ করেন, এমন কি নিজের এজেন্টকেও তিব্বতে পাঠান।

ইহা হইল সাম্রাজ্যবাদীদের একটি গোপন যুদ্ধ-ঘাঁটি। কিন্তু বর্ম্মার শ্রমিক-কৃষকরাজের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে নেহরু-লিয়াকত সরকার এতখানি গোপনীয়তা রাখারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমেরিকা ও লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বর্ম্মার পররাষ্ট্র সচিব করাচী ও নয়াদিল্লীতে দর্শন দিয়াছেন। ভারত ও পাকিস্তান হইতে বর্ম্মায় অস্ত্র পাঠাইবার জন্যে তিনি এখানকার সরকারকে যথেষ্ট তাগিদ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের একমাত্র বন্দর চট্টগ্রামে খাদ্য-বস্ত্র আনা-নেওয়ার জন্যে জাহাজ মিলে না, কিন্তু বর্ম্মায় অস্ত্র পাঠাইবার জন্যে জলযানের অভাব নাই; তেমনি দার্জ্জিলিং-কুচবিহারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পাঠানোর যানবাহন

—মতামত—

* সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি রক্ষায় মার্কিনী পুরস্কার।

* কংগ্রেসী 'গণতন্ত্রে' শ্রমিক ক্রীতদাস।

* আর-এস-এস নেতা কলিকাতায় কেন?

না জুটিলেও বর্ম্মারোডে অস্ত্র পাঠানোর জন্যে ট্রাকের অভাব হয় না। শোনা যাইতেছে, বর্ম্মার মুক্তি সেনাদের বিরুদ্ধে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই নেহরু সরকার কুচবিহারকে নিজেদের হাতে রাখিয়া দিতেছেন।

ইহা হইল এসিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ফ্রন্ট তৈরী হইতেছে সোভিয়েট সীমান্ত কাশ্মীরে [অন্যত্র প্রবন্ধ দেখুন]। সেখানে মার্কিন সমর নায়ক নিমিৎস নিজে আসিয়া ঘাঁটি করিয়া বসিতেছেন।

কিন্তু এই সকল যুদ্ধ ঘাঁটি তৈরী করার জন্যে অর্থ যোগাইতে হইবে নিরন্ন ভারতবাসীকেই। এবারকার বাজেটে প্রায় ৯০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। তাহার একটি প্রধান কারণ সামরিক বিভাগের খরচ বাড়িয়াছে; কাশ্মীর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হায়দরাবাদের সংকট শেষ হইয়াছে, তবু সামরিক ব্যয় বাড়িতেছে কেন? কারণ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছে।

এবং, এই বাজেট-ঘাটতি মিটাইবার জন্যেই এখন আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য বন্ধ করা হইতেছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় কমানো হইতেছে, সরকারী দপ্তরে, রেলে, পোস্ট অফিসে গরীব শ্রমিক-কেরানীদের ছাঁটাই করা হইতেছে।

* * *

শুধু সাম্রাজ্যবাদী সেনাপতিদের পুরস্কৃত করিলে চলিবে না, সাম্রাজ্যবাদী আইনগুলিকে আরো বে-পরোয়াভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে—ইহাই মার্কিন প্রভুদের হুকুম।

নেহরু সাহেবরা এই হুকুম পালনে এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসী সরকারের বন্দী নির্য্যাতন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিবার অপরাধে লাল-ঝাণ্ডার মুখপত্র "সপ্তাহ" পত্রিকার এক হাজার টাকা জমানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহার রায়ে জামানত বাজেয়াপ্ত করা অনুমোদন করেন। কিন্তু তাঁহার রায় হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কংগ্রেসী শাসনে কংগ্রেসের যে কোন সমালোচনাই রাজদ্রোহ। পণ্ডিত নেহরু আজকাল প্রায়ই বলেন যে, যাহারা কংগ্রেসের বিরোধী তাঁহারা 'গণতান্ত্রিক' উপায়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি তাঁহার রায়ে দেখাইয়াছেন যে, কংগ্রেসের হাতে যেহেতু এখন সরকারী ক্ষমতা, সুতরাং তাহার যে কোন কুকর্ম্মের সমালোচনা করিলে তাহাতে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করা হইবে, সুতরাং ভারতীয় প্রেস আইন ও রাজদ্রোহের আইনে তাহা দণ্ডনীয় হইবে। অর্থাৎ, কংগ্রেস নেতারা ঠিকেদারী, জাল জুয়াচ্চোরী যাহাই করুক না কেন—তাঁহাদের কোন কাহিনী কাগজে ছাপা যাইবে না, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মেয়ে ও শিশুদের উপরে যত গুলি চালনাই করুক না কেন তাহার কোন বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবে না। এই ভাবেই বৃটিশ আমলের প্রেস আইন ও রাজদ্রোহের আইনের সাহায্যে কংগ্রেস নেতারা নিজেদের ডিক্টেটরী শাসন কায়েম রাখিতেছেন। ১৮৯০ সালের যে ঘৃণিত আইনে একদিন বাংলার জনকবি মুকুন্দ দাসকে জেলে যাইতে হইয়াছিল, আজ তাহাকেই উদ্ধার করা হইতেছে, জনমত ও জননাট্যের বিরুদ্ধে আঘাত করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেসী শাসকরা কোন আইনেরই যে ধার ধারেন না, সম্প্রতি বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চাগলার একটি রায়ে তাহাও দেখা গেল। কাজে হাজির না হওয়ার জন্যে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী সরকার কর্পোরেশনের একজন ধাঙ্গরকে আদালতে অভিযুক্ত করেন। কংগ্রেসী এডভোকেট জেনারেল গর্ব্ব করিয়া বলেন যে, তাঁহারা যেকোন ধর্ম্মঘটকে যেকোন সময় বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারেন। ইহার জবাবে বিচারপতি চাগলা বলেন: বোম্বাই আইন-সভা শ্রমিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে, এডভোকেট জেনারেল কি সত্যি একথা বলিতেছেন?

বিচারপতি চাগলা ইহাতে বিস্ময়-বোধ করিতে পারেন, কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কংগ্রেসীরা শ্রমিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করিতেছে কিনা তাহা জানার জন্যে বেশী দূরে যাইতে হইবে না। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী নোনাপুকুরের শ্রমিকদের নিকট হইতে লিখিত শর্ত আদায় করিয়াছেন যে, তাহারা যেকোন সময়ে যেকোন শ্রমিককে ছাঁটাই করিতে পারিবেন। ইহা ক্রীতদাসের অবস্থা ছাড়া কি? এবং ঐ শর্ত্ত অমান্য করিলেই কংগ্রেসী পুলিস কারখানায় যাইয়া হাজির হইবে, ধর্ম্মঘট বে-আইনী হইবে। কংগ্রেস 'মজুর-কৃষক-রাজত্বে' মজুরশ্রেণী ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করিতে পারে?

কিন্তু নিজেদের খুশী মত আইন মানা-না-মানা শুধু বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী শাসকদের চরিত্র নয়। পশ্চিম বাংলায় প্রত্যহ একই ব্যাপার ঘটিতেছে। মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমা হাকিম কৃষকদের হয়রানি করার পর কলিকাতা হাইকোর্ট তাহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন: হাকিমটি আগাগোড়া বে-আইনী কাজ করিয়াছেন। একজন মহকুমা হাকিম যে কি করিয়া এইভাবে কাজ করেন তাহা ভাবিয়া পাই না। ভাবিয়া না পাইলেও প্রত্যহ এমন ব্যাপারই ঘটিতেছে!

* * *

কংগ্রেসী শাসকরা ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়াছেন—একমাত্র গান্ধীজীর হত্যাকারীদের। আর-এস-এসরা শুধু মুক্তি লাভই করে নাই। তাহাদের জন্যে ১৪৪ ধারা নাই, সভা-সমিতি, বক্তৃতার কোন বাধা নিষেধ নাই। বরং লক্ষ্ণৌ ও কাশীতে ছাত্ররা আর, এস, এসদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিলে পুলিস শত শত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে, তাহাদের উপর লাঠি চালায়।

আর, এস, এসদের সভা-সমিতিতে দেখিয়া বিড়লাজী খুব খুশী হইয়াছেন। তাঁহাদের 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' পত্রিকা লিখিতেছে যে, ভারতে নেহরু-প্যাটেলের পরেই গোলেলকারের জনপ্রিয়তা। গোলেলকার সাহেব ঝড়ের মত দেশের এক কোন হইতে অপর কোনে টহল দিয়া বেড়াইতেছেন—এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক ভাষার হিটলারী বাণী প্রচার করিয়া যাইতেছেন। কংগ্রেসী মিউনিসিপ্যালিটি হইতে মানপত্রও পাইতেছেন [কাশী]।

নেহরু-প্যাটেলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াই যে তিনি নিজের শফর তালিকা তৈরী করিতেছেন পশ্চিম বাংলায় আগমন হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী প্রভুরা আর, এস, এসদের লইয়া 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' তৈরী করিয়াছেন, তাহাদের সশস্ত্র করিয়াছেন। নলিনী সরকার-বিড়লা-ডালমিয়ার কারখানায় বড় সাহেবরা আর, এস, এস দল গঠনের ভার লইয়াছে; কারখানায় কারখানায় বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা বাধানোর কাজে উহাদের ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার জাগ্রত শ্রমিকের ক্রোধ হইতে আর, এস, এস বাহিনী তাহাদের রক্ষা করিতে পারিবে না—পটারী, এলেনবেরী, টেক্সম্যাকোর ধর্ম্মঘট তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

মঞ্জিল

যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে মিছিল ও জনসভা

শান্তির নেতা হিসাবে সোভিয়েটকে অভিনন্দন

গত সপ্তাহে পশ্চিম বাংলার আগামী শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতিতে কলিকাতার শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও নাগরিকের ৩টি সভা হয়। কপোত-চিহ্নিত বিশ্বশান্তির পতাকা ও লালঝাণ্ডা নিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তি সংগ্রাম ও কমনওয়েলথ-বিরোধী আওয়াজ তুলিয়া মিছিল বাহির হয়। শান্তি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীরা এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন।

যুদ্ধকামীদের সমস্ত রকম যুদ্ধবাদী প্রচার ও কাজের বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি কমিটি সমস্ত দেশের মানুষকে ডাক দিয়াছেন। এই ডাকে সাড়া দিয়া পশ্চিম বাংলার মানুষের প্রতিনিধিরা, শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা আগামী অক্টোবর মাসে পশ্চিম বাংলায় এক শান্তি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে এই সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ৩টি জনসভা হয়। এই বিভিন্ন জনসভায় শ্রমিক-ছাত্র ও মধ্যবিত্ত এবং অধ্যাপক, সাহিত্যিক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী উপস্থিত হইয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহাতে বলা হয়ঃ

"যে শোষক-শ্রেণী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে সে শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি নেহরু-প্যাটেল-বিধান সরকার "নিরপেক্ষতার" আড়ালে পুরাপুরি যুদ্ধবাদী শিবিরে যোগদান করিয়াছে। যুদ্ধবাদীদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান কমনওয়েলথের সাথে নেহরু সরকার ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া দিয়াছে। বর্ম্মা, মালয় তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামকে গ্রীসের কায়দায় রক্তের বন্যায় ডুবাইবার চেষ্টায় মার্কিন ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা নেহরু সরকারকে ব্যবহার করিতেছে"।

যুদ্ধ শিবিরে ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া দিবার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারী করিয়া প্রস্তাবে শ্রমিক ও কৃষকের অধিকারের দেশ, সুখ ও শান্তির দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধবিরোধী প্রতিটি প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানানো হয়।

> শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানকর্ম্মী ও বুদ্ধিবীজীদের শান্তি সমাবেশ। সময় ৮টা—মুস্‌লিম ইন্‌ষ্টিটিউট হল।

শান্তির পতাকার নীচে সামিল হইয়া যুদ্ধবাদীদের পরাস্ত ও উচ্ছেদ করার জন্য শান্তিপ্রিয় সংগ্রামী জনগণকে, মজুর, কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীকে আহ্বান জানানো হয়।

খিদিরপুর অঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক জয়া ও টালীগঞ্জের শ্রমিক, ছাত্র, বাস্তুহারা মহিলা, অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা এই সকল সভায় উদ্যোগী অংশ গ্রহণ করেন। হাজরা পার্কের সভায় একজন শ্রমিক নেতা বলেন

"মালিক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে, মজুরি কাট, ছাঁটাই প্রভৃতি নিত্য নূতন জুলুমের বিরুদ্ধে আমরা কারখানায় যে রক্তাক্ত লড়াই করিতেছি সে লড়াই আর শান্তির লড়াই কিছু আলাদা নহে। আমরা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সাথে হাত মিলাইয়া মালিকশ্রেণীর যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করিব"।

একটি সভায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতে একজন মহিলা বলেন, "গত যুদ্ধে মুনাফাখোরদের কবলে আমরা এই বাংলাদেশেই ৩৫ লক্ষ ছেলেমেয়েকে হারাইয়াছি। লোভী মজুতদারের মুখে আমরা আমাদের সন্তানকে তুলিয়া দিয়াছি—আমাদের কত মেয়ে তাদের ইজ্জৎ লুটাইয়া দিয়াছে। এই মালিক ও মুনাফাখোরের নেতারাই আবার যুদ্ধ বাধাইতে চায়! আমরা মায়েরা এই যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইব।"

বিভিন্ন সভায় শ্রমিক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী বক্তারা পৃথিবীর শান্তির লড়াইএ অংশ গ্রহণ কারার শপথ গ্রহণ করেন।

প্রত্যেকটি সভা হইতে শান্তি কপোত চিহ্নিত নীল পতাকা ও লালঝাণ্ডা নিয়া যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামের ধ্বনি তুলিয়া মিছিল বাহির হয়। মিছিলে ধ্বনি ওঠে—"যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই" "কমনওয়েলথ চুক্তি হো বরবাদ, সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ"।

আগামী শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতিতে এই জনসভা ছাড়াও যুদ্ধ চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে শান্তির স্মারকপত্রে কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী ও বিজ্ঞানকর্ম্মীদের সহি সংগ্রহ করা হয়। শান্তির জন্য সংগ্রামের ডাক দিয়া শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির তরফ হইতে বাংলায় ও হিন্দীতে ইস্তাহার দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে ১৫ই আগষ্ট

"আজাদি" দিবস নয়—মজুর-কৃষক আন্দোলনের উপর আমক্রণের দিবস

১৪ই আগস্টের 'আজাদী' দিবস পালন করার আগে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার পুলিস সারা পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় লালঝাণ্ডা কর্ম্মীদের খোঁজে ব্যাপক হামলা চালায়। এই হামলাতে এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ৫০ জনেরও অধিক মজুর-কৃষক-ছাত্র ও মহিলা আন্দোলনের কর্ম্মীকে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা জেলে আবদ্ধ করিয়াছে। বহু কর্ম্মীকে ধরিয়া অকথ্য নির্য্যাতনও করা হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের লীগের ধনিক শাসকশ্রেণী তাদের 'আজাদী' দিবসকে মজুর-কৃষক আন্দোলনের উপর জঘন্য আক্রমণের দিবস হিসাবে পালন করিয়াছে।

যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন (১) দিনাজপুরের বিখ্যাত লালঝাণ্ডা কর্ম্মী কমরেড সুশীল সেন, ঢাকার ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মী (২) নাসির আহমদ (৩) মুজিবর রহমান (৪) ঢাকার ছাত্রী নেত্রী নাদেরা বেগম, (৫) পূর্ব্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির কর্ম্মী পাবনার লিলি চক্রবর্ত্তী, (৬) ঢাকার রেলওয়ে ইউনিয়নের কর্ম্মী সুকুমার চক্রবর্ত্তী, (৭) ঢাকার সুতাকল শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ননী চৌধুরী, (৮) খুলনার ডাঃ কাঞ্জিলাল, (৯) ময়মনসিংহের যুবক কর্মী ওয়াহেদ ও (১০) সতু রায়, (১১) যশোরের অনন্ত মিত্র, (১২) যশোরের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী আফছার প্রভৃতি।

গণ-আন্দোলনের ভয়ে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা যে কিরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছে, ১৪ই আগস্টের সময়ে এই সব গ্রেপ্তারই তাহার প্রমাণ।

টেক্সম্যাকোতে কংগ্রেসী ও 'অদলীয়' নেতাদের বেইমানী

সাধারণ শ্রমিকগণের সংগ্রাম অব্যাহত

বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকো কারখানার শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি 'জাতীয়' টি-ইউ ও কয়েকজন 'অদলীয়' নেতারা বেইমানী সুরু করিয়াছেন।

জানা গেল জাতীয় টি-ইউর দালাল কালি বিশী, সরোজ মাইতি প্রভৃতি মালিক বিড়লার নিকট হইতে প্রায় ৫০০০ টাকা পাইয়াছেন।

ইউনিয়নের ভিতরে যাঁহারা ছিলেন তাহাদের মধ্যেও বিমল বসু, পাঁচু মল্লিক, রামসিং প্রভৃতি 'অদলীয়' শ্রমিক নেতারা মালিকের পক্ষ লইয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গা কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। এখানকার লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের মধ্যে ইহারা অনেকেই নিহত সুবোধ সরকারের সহিত একত্রে নিজেদের 'স্বাধীন' ও 'অদলীয়' বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কিন্তু সংগ্রাম তীব্রতর হওয়া মাত্র তাঁহারা তাঁহাদেরই বন্ধু শহীদ সুবোধ সরকারের রক্তের প্রতিও বেইমানী সুরু করিয়াছে। বিড়লাজীর টাকা খাইয়া কোম্পানীর মোটরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের মনোবল ইহাতে ভাঙ্গা যায় নাই। যে ধর্ম্মঘটের জন্য লালঝাণ্ডার শান্তি সর্দার এবং ইউনিয়ন সম্পাদক সুবোধ সরকার প্রাণ দিয়াছেন তাহাকে জারি রাখার জন্য তাঁহারা কৃতসংকল্প।

প্রতিরোধ সংগ্রাম সমানে চলিতেছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রতিরোধে কয়েকজন দালাল গ্রহৃত হয়। মালিক প্রায় ৫০০ জনকে হাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করিয়াছে। দালালীতে ভুল করিয়া প্রায় ৫০০ শ্রমিক কাজে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভিতরে গিয়া তাঁহারা দাবি তুলিয়াছেন—অবিলম্বে বোনাস দিতে হইবে এবং কোন ছাঁটাই সহ্য করা হইবে না। সরকার প্রায় ৫৬ জনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিয়াছেন। কিন্তু বাহিরে প্রায় ১২০০ শ্রমিক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর

বাটাতে ছাঁটাই সুরু

বিক্ষোভ দমনের চেষ্টায় পুলিস মোতায়েন

গত ৩১শে আগষ্ট বাটা কারখানায় নানা অজুহাতে ৯ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই পুরানো শ্রমিক।

প্রতিটি কারখানার মত বাটার জুতা কারখানার মালিকেরাও ব্যাপক ছাঁটাইএর ষড়যন্ত্র করিতেছে। প্রতিটি বাজারের মত জুতার বাজারেও মন্দা দেখা দিয়াছে। সেই অজুহাতে মালিক জুতা শ্রমিকদের এক বড় অংশকে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা করিতেছে। মালিকের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তরফ হইতে কোম্পানীকে লিখিত ভাবে জানানো হইয়াছে একবারে ৫০ জনের ছাঁটাই হইলে তাহারাও কিছু বলিবে না—অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে তাহারা অবস্থা সামলাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতায় মালিকের এই ছাঁটাই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিমধ্যেই দুইটি সভা করিয়া ও শোভাযাত্রা বাহির করিয়া শ্রমিকেরা মালিকের এই আক্রমণ নীতির প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। মালিক ভীত হইয়া গেটের সামনে পুলিসবাহিনীকে মজুত রাখিয়াছে। ৯ জন জঙ্গীশ্রমিককে ছাঁটাই করিয়াছে।

সাধারণ শ্রমিকের ক্রোধ ইহাতে আরও বাড়িয়াছে। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের নির্লজ্জ দালালীর বিরুদ্ধে তাহাদের ঘৃণা আরও তীব্র হইয়াছে।

সোভিয়েটবিরোধী ঘাঁটির জন্য কাশ্মীর বিক্রয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সালিশ মানিয়াছেন। মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের পর র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ; তাহার পর কাশ্মীর সমস্যা ও হায়দারাবাদ সমস্যা যথাক্রমে নেহরু ও লিয়াকত ইউ, এন, ওর মারফত মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট হাজির করিলেন। তারপর পাঞ্জাবের তিনটি নদীর জল ব্যবহার লইয়া বিরোধ, কাশ্মে রিজভীর বিচার সমস্যা, পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্ত সমস্যা সবই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দরবারে হাজির করা হইতেছে। প্রতিটি ওজুহাতের সুযোগে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদিগকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতেছে, কমনওয়েলথ দাসত্ব ইহারই পরিণতি। সামরিক পরামর্শদাতা বৃটিশ জেনারেল ডেলভয় যে কাশ্মীরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছেন, তাহা ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল।

বিস্ময়ের ভান কপটতা

ট্রুম্যান-এটলির এই আকস্মিক হস্তক্ষেপে জনসাধারণ বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছেন; তাই নেহরু-লিয়াকত আজ বিস্ময় ও চিন্তার ছলনা করিয়াছেন। কিন্তু পর্দ্দার অন্তরালে ইহাই তো অনেক দিন হইতে ঠিক-ঠাক হইয়া আছে! তাহা না হইলে চল্লিশকোটি মজুর-চাষী জনসাধারণকে এই নিদারুণ অপমান করিবার উদ্ধত স্পর্দ্ধা ট্রুম্যান-এটলির কোথা হইতে আসিল?

বিড়লা-টাটা-ইস্পাহানী-দাদা কোম্পানী প্রভৃতি এদেশের ধনিকশ্রেণী আগে হইতেই ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিপতিদের সহিত সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ-জোটের সাকরেদ

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাশ্মীরের প্রতি শ্যেন দৃষ্টি কেন? শিল্পে অনগ্রসর দরিদ্র কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের জন্য নয়; ইহার আসল কারণ কাশ্মীর সোভিয়েটের সীমান্তে অবস্থিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ সোভিয়েটকে ঘিরিয়া গোটা দুনিয়ায় শত শত বিমানঘাঁটি ও সামরিক ঘাঁটি তৈয়ার করিতেছে। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও যুদ্ধের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাশ্মীরকে চাই-ই। এদেশের ধনিকশ্রেণীর মার্কিন পুঁজিপতিগণ ক্ষুদ্র বখরা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিনিময়ে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যোগ দিতে হইবে, শিল্প জাতীয়করণ বা বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠা চলিবে না, ধনতান্ত্রিক কৃষি, যাতায়াত ও যানবাহন ইহাতে মার্কিন ডলার খাটাইতে হইবে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দেশরক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে একেবারে মিশিয়া যাইতে হইবে, কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করিতে হইবে, কাশ্মীরকে ভাগ করিতে হইবে, সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃত্ব কায়েম করিতে হইবে।

মুনাফার বখরা পাইয়া এদেশের ধনিক শ্রেণী এই ঘৃণিত প্রস্তাবেই সম্মত। তাই ধনিক শ্রেণীর দাবি: ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুম তামিল করিতেই হইবে। এপ্রিল-মে মাসে কাশ্মীর কমিশন ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের সরকারের নিকট কমিশনের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চরমপত্র দেন। কিন্তু জনমতের তীব্র বিরোধিতা দেখিয়া তখন সাহস করিয়া কোন সরকার ঐ চরমপত্র গ্রহণ করেন না। ইহাতে বিড়লার মুখপত্র ইস্টার্ন ইকনমিস্ট ক্রুদ্ধ হইয়া ৬ই মে তারিখে লেখেন, "ইউনাইটেড নেশনস কমিশনই একমাত্র যন্ত্র যাহার দ্বারা দুই ডমিনিয়নের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবধান দূর করা যাইতে পারে। এই কমিশনের ১৩ই আগস্ট (১৯৪৮) এর প্রস্তাবের বাহিরে মীমাংসার চেষ্টা কোন বাস্তব রাজনীতি নয়।"

"দুই ডমিনিয়নের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস যত বেশী, দুই ডমিনিয়নের দৃঢ়তর ভাবে কাশ্মীর কমিশনকে সাহায্য করার প্রয়োজন আরও তত বেশী।" ইহার অর্থ সুস্পষ্ট, **কাশ্মীর কমিশনের হুকুম মানিতেই হইবে।**

চক্রান্তের কুটিল পথ

কাশ্মীরের পরিস্থিতি কেমন করিয়া ধাপে ধাপে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল? প্রথমে কাশ্মীরে গণ্ডগোল বাধাইবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানী জো-হুকুমদের উপর নির্ভর করিল। হরি সিং যখন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়া কাশ্মীরী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সেখ আবদুল্লাকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া গবর্নমেণ্ট গঠিত হওয়াতে সম্মত হইল, তখন ইঙ্গ-মার্কিন উস্কানীতে, ইঙ্গ-মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত, ইঙ্গ-মার্কিন সেনাপতিদের দ্বারা শিক্ষিত হানাদারগণ কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে হানা দিল। লিয়াকত আলি সরকার তখন ন্যাকা সাজিলেন; বলিলেন, আমরা কিছু জানি না। ১৯৪৮ সালের মে মাসের পর তাহাদের এই ন্যাকামির অবসান হইল; তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা কাশ্মীরে হানা দিয়াছে। কাশ্মীরের জন্য ভারতীয় ইউনিয়নের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য, দেশ রক্ষার জন্য সৈন্য চাই, সামরিক ব্যয় চাই—এই প্রচার চলিল পাকিস্তানে, আর কাশ্মীর রক্ষার জন্য, পাকিস্তানের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য চাই—এই প্রচার চলিল ভারতীয় ইউনিয়নে। এই অজুহাতে পাকিস্তান বাজেটের শতকরা ৫৫ ভাগ আর ভারতীয় ইউনিয়নের বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় হইয়াছে। বিরাট সৈন্য বাহিনী তৈয়ার হইয়াছে।

এখন বিড়লার মুখপত্র ইস্টার্ন ইকনমিস্ট ধুয়া তুলিয়াছেন: সামরিক খাতে এত বেশী ব্যয় হওয়ায় দেশের বড়ো ক্ষতি হইতেছে। ব্যাপার কি? ভূতের মুখে রাম নাম কেন? আসল কথা: বিড়লা বলিতে চান **"কমনওয়েলথ দেশরক্ষা পরিকল্পনায়"** এদেশের সরকার একেবারে মিশিয়া যাক, সৈন্য ও সামরিক বিভাগ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হোক, আটলান্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের সহিত মিলিতভাবে যুক্ত যুদ্ধ ব্যবস্থা করা হোক, বর্ম্মা, মালয়ে সৈন্য ও অস্ত্র পাঠানো হোক—তাহা হইলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে। বিড়লার এই অর্থনৈতিক উন্নতির অর্থ ধনিকশ্রেণীর মুনাফা। ধনিকশ্রেণীর মুনাফার জন্য, সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধের জন্য দেশের স্বাধীনতা, সার্ব্বভৌমত্ব ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে, কাশ্মীর বিভাগের জন্য সাম্রাজ্যবাদী 'সালিশী' মানিতে হইবে—ইহাই বিড়লার দাবি, মারওয়াড়ী-গুজরাটী ধনিক-গোষ্ঠির দাবী।

সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন ট্রুম্যানের এই বার্ত্তা এদেশে পৌঁছিবার আগে ইস্পাহানী অল্পক্ষণের জন্য ডীন একিশনের সাথে দেখা করেন। আজ বোঝা যাইতেছে পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে ইস্পাহানী (পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত) ট্রুম্যানের এই ঘৃণিত প্রস্তাবে আগেই সম্মতি দিয়াছেন।

সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে কাশ্মীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডমাত্র। কাশ্মীরের জনগণ কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্যাশনাল কনফারেন্স, শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে জম্মু কাশ্মীরের গবর্নমেণ্ট ট্রুম্যান-এটলির চোখে ও চেতনায় ইহাদের কোন স্থান নাই। বৃটিশ ও হরি সিং-এর ফৌজের বিরুদ্ধে জমি ও আজাদীর জন্য কাশ্মীরী জনগণ অমর প্রতিরোধ চালাইয়াছিলেন। ডালহুসির স্বচ্ছ জল কাশ্মীরী নরনারীর তাজারক্তস্রোতে লাল ও লবনাক্ত হইয়া গিয়াছিল। ট্রুম্যান-এটলির সে সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে কাশ্মীরকে ভাগ করিতেই হইবে, ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে।

বানরের পিঠা ভাগের খপ্পরে পড়িয়া কাশ্মীরী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা, কাশ্মীর ও জম্মু সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা আপোষের নীতি অনুসরণ করিতে যাইয়া আজ বৃথাই নেহরুর পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কাশ্মীরী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ আজ তিনি মানিয়া লইতেছেন।

ইতিমধ্যেই সামরিক পরামর্শ-দাতা মার্কিন জেনারেল ডেলভয় কাশ্মীরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিয়াছেন। পি-টি-আই-য়ের সংবাদে প্রকাশ, "উভয়পক্ষ যদি ইউ, এন পর্য্যবেক্ষকদের রায়ের সহিত একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে বিষয়টি সামরিক পরামর্শদাতা জেনারেল ডেলওয়ের নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।"

(নেশন ৩রা সেপ্টেম্বর)

আর বিভক্ত কাশ্মীরের অপর অংশে আজাদ কাশ্মীর সরকার নামে যাহারা আছেন, তাহারা তো পুতুল মাত্র। গিলগিট ও তাহার নিকটস্থ সমস্ত জায়গা তো সামরিক পর্য্যবেক্ষকদের হাতে; আজাদ কাশ্মীর সরকারের সেখানে প্রবেশেরও হুকুম নাই। অথচ এমনই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত যে অশান্তি ও গৃহযুদ্ধ লাগিয়া-ই আছে; কাশ্মীরী জনগণের জমি আজাদী ও গণতন্ত্রের আশা লুপ্ত করার ষড়যন্ত্র চলিয়াছে।

ভারতীয় ইউনিয়ন, পাকিস্তান ও কাশ্মীরের জনগণকে আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে: এই ভাগ্যের জন্যই কি শেখ আবদুল্লা নেহরুর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন? ইহারই জন্য কি কাশ্মীরী জনতা রক্ত-মোক্ষণ করিয়াছেন? ইহারই জন্য কি ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান ৪০০ কোটি টাকা দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করিয়াছেন, সৈন্যগণ প্রাণ দিয়াছেন, কাশ্মীরী জনগণের বাড়ীঘর, জীবন, জমি গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে? কেন এমন হইল?

অভিশপ্ত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যোগদান করিয়া আজ আর ইহা ছাড়া আর কোন পরিণতি হইতে পারে না; ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে আজ আর কোন সমাধান বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। সোভিয়েট বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী ব্লকে যোগ দিয়া নেহরু-লিয়াকত-শেখ আবদুল্লা এই ব্যর্থতা ও সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন, স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব বিলোপের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু যেমন সোভিয়েটবিরোধী চক্রান্ত, তেমনই ভারতীয় ইউনিয়ন, পাকিস্তান ও কাশ্মীর—গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শিবির বিধ্বস্ত করার চক্রান্ত সফল হইবে না, হইতে পারে না। শ্রমিক-শ্রেণী এবং তাহাদের নেতৃত্বে সমগ্র শোষিত জনতা ট্রুম্যান-এটলির এই হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবে না। কাশ্মীর ব্যবচ্ছেদ ও কাশ্মীরে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব কায়েমের চক্রান্ত কাশ্মীরের জনতা ব্যর্থ করিবে। কাশ্মীরের মাটিতে দাঁড়াইয়া ট্রুম্যান-এটলির ভাড়া করা ঘাতকেরা সোভিয়েট মজুর-চাষীর সমাজতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য মারণাস্ত্র হানিবে, কাশ্মীরী জনতা ও সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী তাহা সহ্য করিবে না।

স্বাধীনতা, সার্ব্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক কাশ্মীরের জন্য শ্রমিকশ্রেণী অপরাজেয় লড়াই চালাইবে। চল্লিশ কোটি মজুর-চাষী ট্রুম্যান-এটলির এই রূঢ় আঘাত ক্ষমা করিবে না। এই পথে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইবে।

ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ্জ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র গেটের সামনে বসিয়া পড়িয়া আওয়াজ তোলেন, "শিক্ষাকেন্দ্রের ভিতর পুলিস ঢুকতে দেব না।"

কাঁদুনে গ্যাস চালাইয়া, এলোপাথারি লাঠি চালাইয়া নেহাৎ পাশবিক শক্তির জোরে শতাধিক সশস্ত্র পুলিস ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর হইতে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর সাহায্যে এই ভাবে ছাত্রদের দাবীর জবাব দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য লক-আউট ঘোষণা করিয়া ভাইসচ্যান্সেলার প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, বিচারপতি সি, সি, বিশ্বাস, অধ্যক্ষ জে, কে, চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষামালিকেরা গাড়ী করিয়া নিরাপদে বাড়ী ফিরিয়া যান।

সাধারণ স্কুল কলেজের ছাত্ররা ইহার পাল্টা জবাবে ১০ই সেপ্টেম্বর ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেন, নয়টি কলেজে ২০,০০০ ছাত্রের পূর্ণ ধর্ম্মঘট হয়। ছাত্র ও শ্রমিকদের একটি বিরাট মিছিল ভাইসচ্যান্সেলারের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলে গুণ্ডারা বোমা ফেলে এবং পুলিস গুলি চালায়।

মঞ্জিল

বরিশালে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিসের বে-পরোয়া লাঠি চালনা

প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট ও ১৪৪ ধারা ভাঙ্গিয়া মিছিল

গত ১৮ই আগস্ট নুরুল-আমীন মন্ত্রিসভার পুলিসেরা বরিশালে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ্জ করিয়াছে—বন্দুকের কুঁদা দিয়া তাহারা ছাত্র-ছাত্রীদের উপর মারপিট চালাইয়াছে। ৬।৭ বছরের ছোট ছেলে, নিরীহ পথচারী, স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রী—কেহই পুলিসের এই হামলা হইতে রেহাই পায় নাই। রাস্তার দুপাশের দোকানে এবং বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পর্য্যন্ত পুলিস হামলা করিয়াছে। ইহারা একজন বিড়ি শ্রমিককে মারিতে মারিতে উলঙ্গ করিয়া ফেলে এবং পরে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। ঘটনাস্থল হইতে ১৫ জন ছাত্রী ও ১০ জন ছাত্রকে পুলিস গ্রেপ্তার করে।

১৪ই আগস্টের "ঝুটা আজাদীর" উৎসবের ঢাকঢোল থামিতে না থামিতে-ই একটি ছোট্ট ঘটনাকে উপলক্ষ্যে করিয়া বরিশালের কুখ্যাত ম্যাজিষ্ট্রেট ফারোক্কী সাহেব ছাত্র সমাজের উপর হামলা সুরু করে। গণতন্ত্রপ্রিয় ছাত্রসমাজ এই হামলার বিরুদ্ধে সারা শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচার

১৬ই আগস্ট বৈকালে ম্যাজিষ্ট্রেট ফারোক্কী সাহেব তাহার বাড়ীর সামনের পুকুরে "আজাদী" উৎসব উপলক্ষে বাইচ খেলার আয়োজনে রত মুকুল ফৌজের দুইটি ছোট্ট ছেলেকে ধরিয়া নিয়া নিজহাতে বেদম প্রহার করে। এই সময় টাউনহলে মন্ত্রিসভার সমর্থক ছাত্রলীগের উদ্যোগে "আজাদী" সভা হইতেছিল। মুকুল ফৌজের ছোট ছেলেদের উপর ম্যাজিষ্ট্রেটের আক্রমণের খবর এই সভায় পৌছান মাত্র ছাত্রলীগের সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সাধারণ ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ সভা বন্ধ করিয়া দিয়া মিছিল করিয়া রাস্তায় বাহির হন। মিছিলে আরো ছাত্র আসিয়া যোগ দেন। তিনশত ছাত্রের এই মিছিল "অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার চাই" এই ধ্বনি তুলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন সশস্ত্র পুলিস আমদানী করে এবং আলোচনার জন্য জিলা ছাত্রলীগের সম্পাদকসহ পাঁচজন ছাত্রকে ভিতরে ডাকিয়া নিয়া গ্রেপ্তার করে। বাইরে সমবেত জনতা নেতৃত্বহীন অবস্থায় তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট

পরদিন ছাত্রলীগ সমস্ত স্কুল কলেজে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে। ঐ দিন জিলা স্কুল আর সদর বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া আর কোন স্কুল-ই খোলা ছিল না। ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীরা উদ্যোগী হইয়া ছাত্রলীগের এই ধর্ম্মঘটের আহ্বানকে সফল করিয়া তোলেন—জিলা স্কুল ও সদর বালিকা বিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্ম্মঘট হয়। কিন্তু ধর্ম্মঘটের পর ছাত্রলীগ নেতারা ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী চলিয়া যাইতে বলায় এইদিন কোন মিছিল হয় না।

ছাত্রলীগনেতাদের বেইমানী

ইহার পর-ই ছাত্রলীগ নেতাদের আসল রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতে থাকে। তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেট ফারোক্কীর সাথে আপোষ করে। ফলে বন্দী ছাত্ররা মুক্তি পান। প্রথম হইতে এই ছাত্রলীগ নেতারা নুরুল আমীন সরকারকে আড়াল করিয়া ব্যক্তিগতভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে এবং "মুকুল ভাইদের" উপর অত্যাচারের মধ্যে সাধারণ ছাত্রদের বিক্ষোভকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া প্রথম সুযোগেই আপোষ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা দিবার রাস্তা খুজিতেছিল। কিন্তু এই বেইমানী আপোষ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভকে থামাইতে পারিল না। ইহার-ই প্রমাণ মিলিল পরদিন—১৮ই আগস্ট।

১৪৪ ধারা ভাঙ্গিয়া মিছিল

ছাত্রলীগ নেতাদের বেইমানী এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রবল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া ১৮ই আগস্ট বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট করিল। ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়া সদর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা-ই সকলের আগে মিছিল বাহির করিল। সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট করিয়া আসিয়া তাহাদের সাথে যোগ দিল। ছাত্রীদের এই মিছিলের সঙ্গে আসিয়া মিশিল বি, এম ও বাণীপিট স্কুলের ছাত্রদের মিছিল। ৬।৭ শত ছাত্র-ছাত্রীর এই বিরাট মিছিল "অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেটের শাস্তি চাই," "অত্যাচারী ফারোক্কী বরিশাল ছাড়," "১৪৪ ধারা মানবো না," "সভাসমিতির অধিকার চাই," "দমননীতি সইব না।" "বন্দীদের মুক্তি চাই," "ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ" প্রভৃতি আওয়াজ তুলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বিনাবিচারে আটক বরিশালের ছাত্র ফেডারেশনের জনপ্রিয় নেতা গোলাম কিব্রিয়া এবং অন্যান্য ছাত্র বন্দীদের মুক্তির দাবী উঠিল।

পুলিস তাণ্ডব

মিছিল যখন কালীবাড়ী রোড ও সদর রোডের মোড়ে আসিয়া পৌছায় তখন এক বিরাট পুলিসবাহিনী মিছিলের পথ রোধ করে। ছাত্রলীগের বেইমান নেতারা পুলিসের ভ্যানে করিয়া আসিয়া বলিতে থাকে যে, আপোষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর কোনরূপ মিছিলের প্রয়োজন নাই। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বেইমান নেতাদের কথা শুনিল না—তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ পুলিস বে-পরোয়া লাঠি চালাইতে সুরু করে—বন্দুকের কুঁদা দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মারপিট করিতে থাকে; আশেপাশের বাড়ীতে ও দোকানে ঢুকিয়া তাহারা অত্যাচার চালায়। একজন বিড়ি শ্রমিককে মারিতে মারিতে উলঙ্গ করিয়া ফেলে এবং ধরিয়া লইয়া যায়। আধঘণ্টা ধরিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা এই পুলিস-হামলা রুখেন। ১৫ জন ছাত্রী ও ১০ জন ছাত্রকে পুলিস গ্রেপ্তার করে।

দমননীতির বিরুদ্ধে ঘৃণা

এই ঘটনার পর লীগ নেতৃত্ব ও সরকারী মহলে খুব আতংক দেখা যায়। ছাত্র-সমাজের বিক্ষোভকে চাপা দেবার জন্য ২২শে আগস্ট জনৈক প্রাদেশিক লীগ নেতা বরিশালে আসিয়া জনসভা করিয়া এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। যে বেইমান ছাত্রলীগ নেতারা পুলিস ভ্যানে চড়িয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল ভাঙ্গিতে আসিয়াছিল তাহারা এই সভায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আচরণ ও পুলিসের লাঠি চার্জ্জের বিরুদ্ধে বড় বড় বক্তৃতা দেয়। কিন্তু তাহাদের বক্তৃতায় ছাত্র-সমাজ আর ভুলিতেছে না—তাহাদের মুখোস এবার খুলিয়া গিয়াছে।

একদিকে ফারোক্কী সাহেবের বদলির কথা শোনা যাইতেছে; অন্যদিকে বিভিন্ন স্কুলের তাঁবেদার কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপ দিয়া ভবিষ্যতে "ভালো ব্যবহারের" প্রতিশ্রুতিমূলক বণ্ড আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা ঘৃণার সহিত কোনরূপ বণ্ড দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

সকলরকম দমননীতি ও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টাকে তুচ্ছ করিয়া এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়া বরিশালের সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রী নূতন করিয়া আবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

পূর্ব্বপাকিস্তানে রণদা সাহার কারখানায় শ্রমিকের লড়াই

ঈদ-বোনাসের টাকা কাটিয়া লওয়ার বিরুদ্ধে, কারখানা বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে শ্রমিকের সুস্পষ্ট ঘোষণা

নারায়ণগঞ্জে রণদা সাহার কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের লোহা কারখানার শ্রমিকেরা এবার সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছেন—নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়া তাঁহারা দালাল ফয়েজ আহমদকে ভালো ভাবে চিনিয়াছেন।

এক বৎসর আগে দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য এই কারখানার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিলে পাকিস্তানের তথাকথিত শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহমদ মধ্যস্থতা করিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দেয় এবং পাকিস্তান সরকার ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এক বৎসর পার হইতে চলিল, ট্রাইব্যুনালের রায়ের কিছুই হইতেছে না। শ্রমিকেরা এদিকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছেন, অন্যদিকে তথাকথিত শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহমদ সরকারী খরচায় জেনেভা আর করাচী ঘুরিয়া ফূর্ত্তি করিতেছে।

দিনের পর দিন শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়া উঠিতেছে। ঈদের বোনাস লইয়াই ইহার প্রথম অভিব্যক্তি দেখা গেল। ঈদের পূর্ব্বে শ্রমিকেরা ঈদের বোনাসের দাবী তোলেন। অবস্থা বুঝিয়া কোম্পানী তখন প্রত্যেক শ্রমিককে ৪০৲ টাকা অগ্রিম দেয়। কিন্তু আগস্ট মাসের বিল হইতে কোম্পানী যখন এই অগ্রিম টাকার একটি অংশ কাটিয়া রাখার চেষ্টা করে তখন ৩০০ শ্রমিক কারখানার ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া বলেন যে, যদি তাহাদের মাহিনা হইতে অগ্রিম টাকার কোন অংশ কাটা হয় তবে তাঁহারা মাহিনা নেবেন না। শ্রমিকদের একতার সম্মুখে ম্যানেজারকে হার মানিতে হয়। ম্যানেজার প্রত্যেক শ্রমিকেরই পুরা মাহিনা দিয়া দেয়। কিন্তু ম্যানেজার এখন আবার সামনের মাসের মাহিনা হইতে অগ্রিম টাকার একটি অংশ কাটিকার ফন্দী আটিতেছে। শ্রমিকেরাও ম্যানেজারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঈদের বোনাস হিসাবে যে টাকা তাহাদের অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি পয়সাও তাহারা ছাড়িবেন না।

তাঁহারা ম্যানেজারকে নোটিস দিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, ট্রাইব্যুনালের রায়ের আশায় তাহারা আর অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বসিয়া থাকিবেন না। অবিলম্বে যদি তাহাদের দাবীদাওয়া পূরণ না করা হয় তবে তাঁহারা শীঘ্রই ধর্ম্মঘট সুরু করিয়া দিবেন।

* * *

নারায়ণগঞ্জে রণদা সাহার জুতার কারখানার অধিকাংশ শেয়ারের মালিক এখন আমীন ব্রাদার্স, পুলিসের বড়কর্ত্তা সামসুদ্দোহা প্রভৃতি। এই কারখানাটি মালিকের খুশী মতন মাঝে মাঝে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই বন্ধের সময়ে শ্রমিকদের কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। কারখানা বন্ধের সময় শ্রমিকদের অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাটাইতে হয়।

এবার অনেক দিন ধরিয়াই কারখানা বন্ধ ছিল। পূর্ব্ব নোটিস অনুযায়ী ১১ই আগস্ট ছিল কারখানা খোলার দিন। কিন্তু ১০ই আগস্ট শ্রমিকেরা আসিয়া জানিলেন যে, কারখানা আরও কিছুদিনের

(১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

জুলুমের বিরুদ্ধে আসানসোলের খনি শ্রমিক

মালিকদের রেশন কাটা ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত ব্যর্থ

১৫ই আগষ্টে কমনওয়েলথ গোলামীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

আসানসোলের কয়লা খনির শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামের জোয়ার জাগিতেছে। লালঝাণ্ডা উড়াইয়া খনি শ্রমিকেরা এবার ১৫ই আগস্ট কমনওয়েলথ বিরোধী দিবস পালন করিয়াছেন। খাদে খাদে তাঁহারা মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন। মালিকের রেশন কাটা, শ্রমিক ছাঁটাইর চক্রান্ত তাঁহারা ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন।

১৫ই আগস্ট শ্রমিক বিক্ষোভ

কমনওয়েলথের গোলামীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সাতপুকুরিয়ার কয়লাখনির ২৫ জন খনি শ্রমিক একটি মিছিল বাহির করেন। লালঝাণ্ডা উড়াইয়া, কমনওয়েলবিরোধী এবং যুদ্ধ-বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে এই মিছিলটি বিভিন্ন গ্রাম ঘুরিয়া অ্যাডজয় সেকেণ্ড খনিটির সম্মুখ দিয়া ৭নং এবং ৮নং বাঁকশিমুলিয়া খনিতে আসিয়া পৌঁছায়। মিছিলে শ্রমিকের সংখ্যা তখন ২৫ হইতে ৬০ জনে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

অ্যাডজয় সেকেণ্ড খনির সম্মুখ দিয়া যখন মিছিলটি যাইতেছিল তখন খনির গোমস্তা মিছিলটি জোর করিয়া ভাঙিয়া দিবার কথা ভাবিতে থাকে এবং গরীব কেরাণীদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করিতে যায়। গরীব কেরাণীরা গোমস্তাকে বলেন যে, মিছিলের উপর হামলা করা ঠিক হইবে না, কারণ তাহার ফল ভালো হইবে না! গোমস্তা তখন আস্ফালন করিয়া মিছিলের শ্রমিকদের শাসাইয়া বলিতে থাকে যে, ৭নং এবং ৮নং খাদে তাহাদের মিছিল ভাঙিয়া দেওয়া হইবে।

মিছিলের উপর হামলার চেষ্টা ব্যর্থ

৭নং এবং ৮নং খাদের সম্মুখে মিছিল আসিলে গোমস্তা কয়েকজন চাপরাসী ও কয়েকজন দালাল লইয়া মিছিলের উপর হামলা করিতে আগাইয়া আসে। মিছিলের নেতা তখন চাপরাসীদের উদ্দেশ করিয়া ছোট্ট একটি বক্তৃতা দেন—লালঝাণ্ডা কাহাদের জন্য এবং কিসের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ১৫ই আগস্টের কমনওয়েলথ মার্কা "স্বাধীনতা" শ্রমিক, কৃষক, গরীব মানুষদের জীবনে কি আনিয়া দিয়াছে ইত্যাদি বুঝাইয়া বলেন। চাপরাসীরা তখন মিছিলের উপর হামলা করিতে অস্বীকার করেন। লালঝাণ্ডার মিছিল গোমস্তা আক্রমণ করিয়াছে এই খবর ইতিমধ্যে আশেপাশের খাদে ছড়াইয়া পড়ায় ৫০০ খনি শ্রমিক আসিয়া মিছিল রক্ষা করার জন্য জমায়েৎ হন। লালঝাণ্ডা উঁচু করিয়া শ্রমিকেরা ঘোষণা করেন: **"কে বা কাহারা লালঝাণ্ডার অসম্মান করিতে সাহস করে আজ তাহাই আমরা দেখিতে চাই।"**

গোমস্তার পাত্তা আর পাওয়া গেল না—শ্রমিক জনতাকে আসিতে দেখিয়াই সে দালালদের লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

খনি শ্রমিকদের এই বিরাট মিছিল তখন লালঝাণ্ডা উড়াইয়া বিভিন্ন খাদে খাদে ঘুরিয়া বেড়ায়। সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে নূতন সাড়া জাগিয়া উঠে—দীর্ঘদিন পরে প্রকাশ্যে আবার লালঝাণ্ডার মিছিল বাহির হইয়াছে তাহাদের এলাকায়।

নূতন সংগ্রামী চেতনা

নূতন সংগ্রামী চেতনাও জাগিয়া উঠিয়াছে খনি শ্রমিকদের মধ্যে। ছোট্ট কয়েকটি ঘটনাই তার আভাষ জানায়।

রেশন কাটা চলবে না

১৫ই আগস্টের এই ঘটনার পর মালিকেরা গ্রিমেট খনির শ্রমিকদের রেশন কার্ড কাড়িয়া নেয়। এক মৌখিক আদেশে শ্রমিকদের জানানো হয় যে, খনির এক মাইলের বাহিরে যে সমস্ত শ্রমিকেরা বাস করে তাহাদের কোন রেশন কার্ড দেওয়া হইবে না এবং প্রত্যেক শ্রমিকেরই রেশনের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই আদেশ শুনিবা মাত্র শ্রমিকেরা দলে দলে আসিয়া রেশন-ক্লার্ককে ঘেরাও করিতে থাকেন—তাঁহারা রেশন-ক্লার্ককে জানাইয়া দেন যে, যে মুহূর্তে তাহাদের রেশন বন্ধ বা কমানো হইবে সেই মুহূর্তেই তাঁহারা "যথাযথ" ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। শ্রমিকদের জঙ্গী মনোভাব দেখিয়া ম্যানেজার তাহার আদেশ বাতিল করিয়া দেয়—শ্রমিকদের রেশন কার্ড ফিরাইয়া দেওয়া হয়; বর্তমানে শ্রমিকেরা পুরা রেশনই পাইতেছেন।

শ্রমিক ছাঁটাইর প্ল্যান বানচাল

সাতপুকুরিয়া খনির একটি অকেজো খাদ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় কয়েকজন শ্রমিকের কাজের সমস্যা দেখা দেয়। মালিকেরা অস্থায়ী শ্রমিকদের ছাঁটাই করিয়া তাহাদের বায়গায় ইহাদের নিয়োগ করিতে চায়। অস্থায়ী শ্রমিকদের ছাঁটাই করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিকেরা রুখিয়া দাঁড়ান। মালিকেরা তখন পিছু হটে—তাহাদের শ্রমিক ছাঁটাইর সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যায়।

এই খনিতেই আর একটি ঘটনায় শ্রমিকেরা নিজেদের একতার জোরে মালিকদের পরাস্ত করেন। এই খনিরই একজন শ্রমিক তার এক আত্মীয়ের ন্যায্য প্রাপ্য বোনাসের জন্য ম্যানেজারের নিকট বারে বারে দাবী জানান, কিন্তু ম্যানেজার তাঁহাকে প্রত্যেক বারই বিভিন্ন রকম অজুহাত দিয়া খালি হাতে ফিরাইয়া দেয়। শ্রমিকটির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়, ম্যানেজারের মুখের উপরই তিনি বলিয়া দেন—"জানি, আমাদের বোনাসের টাকা লুটিয়াই তোমরা স্ফূর্তি কর।" শ্রমিকের মুখে এই অপ্রিয় সত্য কথা শুনিয়া ম্যানেজারের রক্ত গরম হইয়া উঠে। পরের দিন এই শ্রমিকটিকে ছাঁটাই করা হয়। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকেরা এই ছাঁটাই মানিয়া নিতে অস্বীকার করেন।

ছাঁটাই-শ্রমিক ভাইকে লইয়া কাজ সুরু

২৯শে আগস্ট কাজ সুরু হইবার পূর্বে সমস্ত শ্রমিকেরা একজোট হইয়া ম্যানেজারের অফিসের সম্মুখে আসিয়া সমবেত হন—তাঁহারা দাবী করেন যে, তাঁহাদের ছাঁটাই ভাইকে কাজে নিতে হইবে। ম্যানেজার কোন কিছুই বলিতেছে না দেখিয়া শ্রমিকেরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ছাঁটাই শ্রমিক ভাইকে লইয়া মিছিল করিয়া খাদে ঢুকিয়া কাজ সুরু করিয়া দেন। প্রকৃত পক্ষে ম্যানেজারের ছাঁটাইর আদেশ শ্রমিকেরা বাতিল করিয়া দেন। সেই শ্রমিকটি এখন রীতিমত কাজ করিয়া যাইতেছেন—তাহার ছাঁটাই সম্বন্ধে ম্যানেজার আর কোন কথাই বলিতেছে না।

ম্যানেজারের ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব

২রা সেপ্টেম্বর আর একটি ঘটনা ঘটে বাঁকসিমুলিয়ার ৭নং এবং ৮নং খাদে। সেখানে ম্যানেজার একজন চাপরাসীকে তাহার থাকার ঘর ম্যানেজারের সুবিধার জন্য ছাড়িয়া দেবার হুকুম দেয়। এই ঘরে এই চাপরাসী দীর্ঘদিন ধরিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া কোন রকমে মাথা গুজিয়া রহিয়াছেন। ম্যানেজার এখন তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরিয়া রাস্তায় নামিয়া যাইবার হুকুম দিয়াছে। চাপরাসী এই হুকুম মানিতে অস্বীকার করেন। ম্যানেজার তখন ক্রুদ্ধ হইয়া চাপরাসীর কান্ ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করার চেষ্টা করে। চাপরাসী এই অপমান সহ্য করিতে অস্বীকার করেন—ম্যানেজারকে তিনি উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়া দেন।

ইহার পর খাদে কংগ্রেসী সরকারের পুলিস আসিয়াছে; "জাতীয়" টি-ইউর দালালেরা আসিয়াছে; কিন্তু খনি শ্রমিকদের জঙ্গী মনোভাব দেখিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে।

এই অঞ্চলের খনি শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের একতা ও সংগ্রামের শক্তি সম্বন্ধে নূতন চেতনা জাগিয়াছে—তাহাদের মনে বাসা বাঁধিয়াছে গভীর আত্মবিশ্বাস। লালঝাণ্ডা তাহাদের মনে নূতন সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে।

বুড়ুল অঞ্চলে পুলিসের ফ্যাসিষ্ট তাণ্ডব

এক সপ্তাহে ৬৩ জন গ্রেপ্তার

বজবজ থানার বুড়ুল ও তাহার আশে-পাশের গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা ১৫ই আগস্ট মিছিল করিয়া কমনওয়েলথের গোলামীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। নলিনী-বিধান মন্ত্রি-সভার পুলিস এই মিছিলের উপর গুলি চালায়।

গুলি চালাইয়াই পুলিসের কাজ থামে নাই—এখন তাহারা গ্রামে গ্রামে হামলা করিয়া ক্ষেতমজুর ও কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

যে রাণিয়া গ্রাম হইতে ১৫ই আগস্টের বিক্ষোভের মিছিল বাহির হইয়াছিল সেই রাণিয়া গ্রামের স্কুলেই পুলিস ক্যাম্প বসিয়াছে। স্কুলটি এখন পুলিসের দখলে—গরীব মজুর কৃষকদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে-সামান্য ব্যবস্থা ছিল তাহাও এই ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৫ই আগস্ট মিছিলে যাহারা গিয়াছিলেন পুলিসেরা তাহাদের কয়েকজনকে ধরিয়া আনিয়া বেদম প্রহার করিয়াছে। ক্ষেতমজুর কৃষকদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া পুলিসেরা তাহাদের ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করিয়াছে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের ইতর ভাষায় গালাগালি করিয়াছে।

রাণিয়ার শম্ভু কয়ালের ও অমূল্য কয়ালের বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহাদের কাহাকেও বাড়ীতে না পাইয়া পুলিসেরা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহাদের মা'কে দারোগা বলিয়াছে; এই "মাগী" তোর ছেলেরা কোথায়?

বুড়ীমা উত্তর দিয়াছেন: "আমি বুড়ী মানুষ, ছেলেরা কোথায় গিয়াছে জানিনা।" ইহার পর পুলিসেরা বুড়ীমার ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ভাঙিয়াচুরিয়া চুরমার করিয়াছে; বুড়ীমা'র গায়ে দেবার কাঁথাখানি পর্য্যন্ত টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ইহারা তল্লাসীর কাজ শেষ করিয়াছে। ইয়াসীন নামে একজন ছাত্রকে ধরিয়া আনিয়া রাণিয়ার স্কুলের বন্ধকক্ষে তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। ভবেন মণ্ডল নামে গ্রামের এক ব্যক্তিকে ধরিয়া নিয়া পুলিসেরা মারপিট চালায়।

যে যে গ্রামের ক্ষেতমজুর ও কৃষকেরা ১৫ই আগস্টের সেই বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দিয়াছিল তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া পুলিস হানা দিতেছে—ঘরে ঘরে তল্লাসী করিতেছে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিলে তাহাকে বেদম প্রহার করিতেছে। বুড়ুল, গঙ্গা, রাণিয়া, তেলাড়ী ও নস্করপুর গ্রাম হইতে প্রতিদিন তিন চার জন করিয়া গ্রেপ্তার করা হইতেছে। **এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে ৫৩ জন ক্ষেতমজুর ও কৃষককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।**

এই সমস্ত গ্রামে বিধান মন্ত্রিসভা ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম করারই ব্যবস্থা করিয়াছে।

মঞ্জিল

❋ করাচীর চিঠি ❋

❋ ভুয়া আজাদী সম্পর্কে ব্যাপক মোহমুক্তি
❋ বেইমান নেতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন
❋ পাক টি-ইউ ফেডারেশনের পতাকাতলে সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী

দুই বছর আগে লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ মানুষের রক্ত-স্রোত অতিক্রম করিয়া পাকিস্তানের রথ যখন 'কায়েদে আজম'কে লইয়া করাচিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেদিন পাকিস্তানের ধনিক শ্রেণী, মুসলিম লীগের নেতারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে পাকিস্তানের মোহ মজুর, চাষী ও শোষিত মধ্যবিত্তের মন হইতে এত তাড়াতাড়ি ঘুচিতে আরম্ভ করিবে। শুধু এই হোমরা-চোমরা নেতাদের কথাই বা বলি কেন। জনসাধারণের অনেকেই তখন বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, পাকিস্তানে সত্যই মুসলমান জনগণের আজাদী হইয়াছে! তারপর এত শীঘ্র যে স্বাধীনতার ধূম্রজাল মজুর ও গরীব চাষীদের মন হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে ধনিকশ্রেণীর পক্ষে তাহা ধারণা করা খুব শক্ত ছিল। কিন্তু কঠিন হইলেও তাহাই সত্য হইয়াছে, এবং লীগ সরকারের উলঙ্গ-নীতির ফলেই তাহা এত তাড়াতাড়ি হইয়াছে।

* * *

শ্রমিকশ্রেণার বিরুদ্ধে আক্রমণের ব্যাপারে বাস্তবিকই লীগ-সরকার কোন ঢাকাঢাকি, লজ্জা-সরমের বালাই রাখেন নাই।

পশ্চিম পাকিস্তানে রেল মজুরের সংখ্যা ৬০,০০০ আর জাহাজী মজুরের সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। সূতাকল মজুরের সংখ্যাও কয়েক হাজার। ওকারাতে বিড়লার সূতাকল তাহার হিন্দু ম্যানেজারের মারফত এখনও চালু আছে; ঐ মিলে কাজ করে ১৫০০ মজুর। ইহা ব্যতীত লায়ালপুর টেকস্টাইল, করাচীর বালিকা টেকস্টাইল, ওরিয়েণ্টাল টেকস্টাইল প্রভৃতি সূতাকল আছে; তাহা ছাড়া তেলকল, সিমেণ্ট কারখানা, পোর্ট, রবার, বিড়ি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, লোহা কারখানা, চিনিকল প্রভৃতিও আছে।

শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদ

এই সমগ্র মজুরশ্রেণীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার একেবারে পূর্ব্ব হইতে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালাইতেছেন। প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত লিয়াকত আলি রকারের বে-সরকারী মুখপত্র ডন বৃটিশ মার্কিন পুঁজিপতিদের নিকট আবেদন রিয়া চলিয়াছেন: 'তোমরা দয়া করিয়া কিস্তানে মূলধন নিয়োগ কর।' ধনিক নীর মুনাফার নিশ্চয়তার জন্য এবং ভিয়েট-বিরোধী ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ াইবার জন্য যে সব শিল্প সরকারের ত রাখা দরকার—যেমন, রেলওয়ে, -কারখানা প্রভৃতি—তা বাদে আর নও শিল্পই জাতীয়করণ করা হইবে না, াখাস মিঃ জিন্না পরিষ্কারভাবেই দিয়ান। সেই হইতে ধনিকের মুনাফার মজুরের মজুরি-কাট, ছাঁটাই, রিভার্স'ন চলিয়াছে। ইহার ফলে বার্ম্মাশেল ানী, কলিকাতাস্থ বিলাতী জাহাজী রভার ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী, ান টোবাকো কোম্পানী, এটক কোম্পানী প্রভৃতি বিলাতী ধনিকিস্তানে পুরাদমে ব্যবসায় চালারম্ভ করেন। বস্তুতঃ বৃটিশ ধনিকস্বে হিন্দু ও মুসলিম ধনিকেরা লিত হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে াপেট স্বর

মুনাফা ও শোষণের অবাধ ক্ষেত্র তৈয়ার করিতেছে; লিয়াকত আলি সরকার সরকারী নীতি নির্দ্ধারণের ভার ইহাদেরই হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। অথচ মজার বিষয়, জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ নিরন্তর তীব্রভাবে ঢোকান হইতেছে।

মালিকরাই পরামর্শদাতা

শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমিক সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ঐ কমিটিতে সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়াও ধনিক প্রতিনিধি মোট ৪৪ জন। আর মাত্র দুইজন মনোনীত হইয়াছেন শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য; তাহারাও আবার বহু ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া, বহু শ্রমিক ইউনিয়নে বিভেদ আনিয়া শ্রমিক আন্দোলনে ধনিকের দালাল হিসাবে যথেষ্ট নাম করিয়াছেন। যাক, ইহাদের পরিচয় পরে দিতে হইবে; আপাততঃ ধনিক-প্রতিনিধিদের বিবরণ একটু দেওয়া দরকার।

এই কমিটির মধ্যে আছেন, ঢাকার ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মালিক সূর্য্য বোস, রণদা সাহার চামড়ার ব্যবসায়ের অংশীদার গ্লাস ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার মিঃ চ্যাটার্জ্জী, মিঃ শোভান, করাচির লবণ ও কয়লার কারবারের মালিক মিঃ মেহতা, মরদান চিনিকলের চেয়ারম্যান মিঃ ঈশ্বর দাস ইত্যাদি।

এই কমিটিতে আছেন ইস্পাহানী, দাদা কোম্পানী, হবিব ব্যাঙ্ক ও মোহাম্মদ আলি জাহাজ কোম্পানীর মালিক মোহাম্মদ আলি হবিব, ওয়াহিদ ভাই আদমজী ইত্যাদি। মুসলিম ধনিকদের সংখ্যাই এই কমিটিতে বেশী। মোটের উপরে মারওয়াড়ী, গুজরাটী ধনিক-গোষ্ঠী পাকিস্তানেও বহাল তবিয়তে বিরাজমান রহিয়াছেন।

বিলাতী শোষকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

কিন্তু কমিটির আসল ক্ষমতা ইঙ্গ-মার্কিন ধনিকদের হাতে। বার্ম্মাশেল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ফলতন, দর্শনীর কেক্ কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ নেকাস, মণ্টগোমারী ফলের কারবারের মালিক মিঃ মিচেল, আর, এস, এন্ কোম্পানীর মিঃ হার্টজেল, পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানীর মিঃ সওার্স, পাকিস্তান চেম্বার অব কমার্সের মিঃ এ্যালান—ইহারাই পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্য জুড়িয়া বসিয়া আছেন।

অপরপক্ষে এই কমিটিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হইয়াছেন পূর্ব্ববঙ্গের ফয়েজ আহমদ, আর লাহোরের মিঃ এম্, এ, খান।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার অল্প দিন পরেই শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক সাচ্চা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয়। লাহোরের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মৃজা ইব্রাহিম ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এন্, ডব্লিউ রেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, করাচি পোর্ট ট্রাস্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ওকারা, লায়ালপুর ও অন্যান্য সূতাকল মজুর ইউনিয়ন, করাচী ও লাহোরের বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, এ্যাটক মজদুর ইউনিয়ন, করাচী রেল-মজদুর ইউনিয়ন ইত্যাদি সমস্ত সংগঠিত মজদুর ইউনিয়নগুলি এই ফেডারেশনে যোগদান করেন।

মৃজা ইব্রাহীম কারাগারে

কিন্তু পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণীর এই আসল প্রতিষ্ঠানকে লিয়াকত আলি আমল দেয়নি। পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি মৃজা ইব্রাহিমকে তাহারা বিনাবিচারে আটক রাখিয়াছে, করাচী পোর্ট মজদুর ইউনিয়ন, এন, ডব্লিউ আর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ইত্যাদি সমস্ত ইউনিয়নের অনেক নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া জেলে রাখিয়াছে। অবশিষ্ট কর্ম্মীদের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রহিয়াছে। **মজুরশ্রেণীর ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার একেবারে হরণ করা হইয়াছে।**

এই অবস্থায় এম্, এ খান-এর ডাক পড়িল। করাচী পোর্ট ট্রাস্ট মজুর ইউনিয়নের ম্যানেজিং কমিটিতে মিঃ খান কয়েকজন দালালকে ঢুকাইয়া দিয়াছে। করাচিতে রেল মজুরদের মধ্যে এম্, এ, খান একটি পাল্টা ইউনিয়ন দাঁড় করাইয়াছে। যেখানেই ধর্ম্মঘট হইতেছে সেখানেই খান যাইয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে। নানা জায়গায় কতকগুলি কাগজে ইউনিয়ন খাড়া করা হইয়াছে এবং পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার নামে কাগজে কলমে একটি পাল্টা ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইয়াছে। ইহারই ইনাম স্বরূপ এম্, এ খান উপরোক্ত সরকারী কমিটিতে মনোনীত হইয়াছে।

ফয়েজ আহমদের এই কমিটিতে আসা আরও কৌতুকজনক। পূর্ব্বপাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গ বিভাগের অল্প পরেই হইয়াছিল এবং বেঙ্গল প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের যত ইউনিয়ন ছিল, সবগুলিই উহাতে যোগদান করে। ফয়েজ আহমদ উহার সাধারণ সম্পাদক হন, কিন্তু ঐ সাচ্চা ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ সংখ্যাধিক থাকায় ফয়েজ আহমদের পক্ষে দালালি করা কঠিন হইতেছিল।

নারায়ণগঞ্জে এই প্রতিষ্ঠানের অফিস ও সাইনবোর্ড ছিল।

পূর্ব্বপাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অধিকাংশ নেতাকে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার এই অবস্থায় গ্রেপ্তার করেন। রেলে ও সূতাকলে ফয়েজ আহমদের লোকেরা পাল্টা ইউনিয়ন গঠন করে। ৯ই মার্চ্চের সাধারণ রেল ধর্ম্মঘটের সময়ে ফয়েজ আহমদ প্রকাশ্যে সরকারের দালালি করায় মজুরগণ ফয়েজ আহমদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করিতে থাকে। সম্প্রতি হঠাৎ দেখা যায়, পূর্ব্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাইনবোর্ড উল্টাইয়া অল-পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন লেখা হইয়াছে; আর সবই যেমন ছিল, ঠিক তেমন আছে। এই ফয়েজ আহমদ উপরোক্ত সরকারী কমিটিতে শ্রমিকদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি। একেবারে রতনে রতন চিনে!

কিন্তু **শ্রমিকদের আন্দোলন, তাহাদের সংগঠন পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ইহার ফলে আদৌ দুর্ব্বল হয়নি, বরং অনেক শক্তিশালী হইয়াছে।** পশ্চিম পাঞ্জাবের সমস্ত জঙ্গী মজুর ইউনিয়নের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পাঞ্জাব প্রাদেশিক মজদুর কমিটি এবং সিন্ধু প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কিছুদিন আগে পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের উদ্যোগে লাহোরে মোচি গেটে জনসভা ডাকা হইয়াছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বনাশা দাঙ্গার পর এই মজদুর বস্তীরও এলাকার বাহিরে লালঝাণ্ডা উড়ানো হইল। মজুর ও সাধারণ লোক হাজারে হাজারে জমা হইলেন। পুরানো নেতারা নাই; তরুণ মজুরগণই বক্তৃতা করিলেন। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের জমানো বিক্ষোভ এই সভায় ফাটিয়া পড়িল। আওয়াজ উঠিল: **পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীকে খতম কর।**

চীনে কমিউনিস্ট পার্টির বিজয় জনতার মনে কি গভীর দাগ কাটিয়াছে, তাহা এই সভায় দেখা গেল। মুহুর্মুহু যে ধ্বনি শোনা গেল, তাহা হইতেছে: 'আমাদেরও এখানে চীন বানাইতে হইবে। চিয়াং-এর যে দশা হইয়াছে, আমাদের শাসকশ্রেণীরও সেই দশা করিতে হইবে।

শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরির জন্য লড়াই পরিচালনা করিতেছেন পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। সমস্ত ইউনিয়নগুলি পুনর্গঠিত হইয়াছে। করাচীর ডক মজদুর, ডাক-তার বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীগণ, বিড়ি মজদুর—সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট হইয়াছে। ওকারাতে বিড়লার সূতাকলে দুইবার ধর্ম্মঘট হইয়াছে। সভা, মিছিল, ধর্ম্মঘট বানের জলের মতো সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভের ঢেউ

শ্রমিক জাগরণের এই ঢেউ সুদূর গ্রামের গরীব চাষীদের মধ্যেও পৌঁছিয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের হারিদের (সিন্ধী ভাষায় চাষীদের হারি বলা হয়) অবস্থা যে কত (১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্বাসঘাতক টিটো—সোভি
শত্রু, সাম্রাজ্যবাদের
সোভিয়েট, নয়া-গণতন্ত্র ও
বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের জয়ঢাকগুলো তারস্বরে প্রচার সুরু করেছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন নাকি 'অসহায়,' ক্ষুদ্র মেষশাবক যুগোস্লাভিয়াকে গ্রাস করার চেষ্টা সুরু করেছে, এমন কি যুগোস্লাভ সীমান্তে সোভিয়েট সৈন্য সমাবেশ পর্য্যন্ত সুরু হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে লালফৌজ যুগোস্লাভিয়ায় ঢুকে পড়তে পারে।

সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরদেশ আক্রমণের এই অভিযোগ যে মিথ্যা সে কথা বলাই বাহুল্য। এমন কি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপত্র 'টাইমস' পর্য্যন্ত সেদিন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, 'যুগোস্লাভ-হাঙ্গেরী সীমান্তে নির্ব্বিঘ্নে লোক যাতায়াত করছে। সামরিক সমাবেশের কোন প্রমাণ সেখানে নেই'। তবু, ঠিক এই সময় এই বিশেষ কুৎসা সুরু করার পিছনে গম্ভীর উদ্দেশ্য আছে।

সে উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে গেল যখন প্রকাশ পেল যে, যুগোস্লাভিয়ার পক্ষ থেকে টিটো সরকার আমেরিকান ডলারপতিদের কাছে প্রকাশ্যে ঋণ-ভিক্ষা করেছে। এবং মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব একিসন সোৎসাহে সেই ঋণ মঞ্জুর করার পক্ষে সুপারিশ করেছে।

মার্কিন ঋণের অর্থে যে ডলারপতিদের পায়ে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া সে কথা আজ ইওরোপের প্রতিটি লোক জানে। সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী ফ্যাসিস্ট টিটোর এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতাকে যুগোস্লাভিয়া তথা পৃথিবীর জনসাধারণের কাছ থেকে ঢেকে রাখার জন্যই 'সোভিয়েট' আক্রমণের এই ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়। টিটোর এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে যুগোস্লাভিয়ায় গণ-বিক্ষোভ জেগে উঠছে। টিটো-চক্র প্রকাশ্য ভাবে গণতান্ত্রিক শিবির ত্যাগ করার পর এক বছর যাবার আগেই এই বিক্ষোভ ফেটে পড়তে সুরু করে। গত মার্চ্চ মাসেই একাধিক টিটো-বিরোধী গেরিলা দল যুগোস্লাভিয়ার পাহাড় অঞ্চলে সশস্ত্র লড়াই করেছে। টিটোর খনি-মন্ত্রী সম্প্রতি এক বক্তৃতায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, "প্রতিদিনই বহু সংখ্যক খনি-শ্রমিক কাজ থেকে অনুপস্থিত থাকে।" টিটো স্বয়ং ক্রোট কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে স্বীকার করেছে যে, "গ্রামাঞ্চলে অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, জনরাষ্ট্রের (!) প্রতি খানিকটা অবিশ্বাস পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে"। এই বিক্ষোভকে দমন করার জন্য টিটোর পুলিস মন্ত্রী জল্লাদ র‍্যাংকোভিক হয়েছে হিটলারী কায়দায় যুগোস্লাভিয়ায় জেল, গুলি, হত্যার রাজত্ব কায়েম করেছে। গত এক বছরে র‍্যাংকোভিক যত যুগোস্লাভ দেশ-প্রেমিককে জেলে পুরেছে, আগের দশ বৎসর বুর্জোয়ারাজের আমলেও তত হয়নি। কিন্তু এই বর্ব্বরতাকে অগ্রাহ্য করে যুগোস্লাভিয়ার গণশক্তি টিটোকে সংগঠিত করার জন্য সংগঠিত হচ্ছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর মস্কো রেডিও জানিয়েছে যে, "সারা যুগোস্লাভিয়ার কারখানা ও গ্রামে টিটো-বিরোধী কমিউনিস্টদের বহু গোপন সংগঠন সক্রিয় হয়েছে। এই সব সংগঠনের সভ্যরা গোপন কাজের কায়দা আয়ত্ত করেছে এবং নজর এড়িয়ে কাজ করতে শিখেছে।" সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ কুকুর হিসাবে টিটোর স্বরূপ যে ভাবে যতই প্রকাশ পাচ্ছে, ততই যুগোস্লাভ জনতার বিক্ষোভ প্রকৃত যুগোস্লাভ কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তা ব্যাপক অভ্যুত্থানের রূপ নিতে বাধ্য। এই গণ-বিক্ষোভকে যাতে 'সোভিয়েটের চক্রান্ত' বলে আখ্যা দিয়ে তাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া যায়; এবং সেই সুযোগে যাতে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের ডেকে আনা যায়, তারই জন্য আজ আমেরিকা ও বৃটিশ কোটিপতিদের পদ-লেহী টিটো 'সোভিয়েট আক্রমণ' সম্পর্কে মিথ্যা আওয়াজ সুরু করেছে।

সোভিয়েট বিরোধিতারই অপর দিক দেশদ্রোহিতা

সোভিয়েট বিরোধিতা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে দেশদ্রোহিতারই মুখোশ—এই সত্যকেই টিটো আর একবার প্রমাণ করেছে। নিজের দেশের স্বাধীনতা, জাতির স্বার্থ যে সাম্রাজ্যবাদের পায়ে কানাকড়ির দামে বিকিয়ে দিতে চায় তারই গলা সবার ওপরে ওঠে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা প্রচারের সময়।

শ্লোভেন করিন্থিয়ার ব্যাপারটা তারই অপর উদাহরণ। যুগোস্লাভিয়ার লাগাও অষ্ট্রিয়ার এই অংশটিতে শ্লাভরা সংখ্যায় বেশী, জাতিগতভাবে এই অংশের যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গেই যুক্ত হওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুগোস্লাভিয়ার এই ন্যায্য দাবী সমর্থন করেছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি টিটো সরকার সোভিয়েট সরকারকে জানায় যে, তারা করিন্থিয়ার সবটা চায় না, সামান্য একটা অংশ পেলেই সন্তুষ্ট। সুতরাং সোভিয়েট যেন বৃটেন এবং আমেরিকার কাছে সেই প্রস্তাবই উপস্থিত করে। টিটোর এই নিরীহ প্রস্তাবের পিছনে ছিল এক শয়তানী চক্র। সোভিয়েট ইউনিয়নের অগোচরে সে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক গোপন মীমাংসা করে এবং তারই শর্ত্ত হিসাবে করিন্থিয়া সম্পর্কে যুগোস্লাভিয়ার ন্যায্য দাবী ছেড়ে দেয়। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ্যে দেশবাসীর কাছে বলার মত সাহস টিটো-চক্রের হয় নি। তাই তারা সোভিয়েটকে দিয়ে এই প্রস্তাব প্রকাশ্যে তোলবার চেষ্টা করে—যাতে এই বিশ্বাসঘাতকতার সমস্ত দায়িত্ব সোভিয়েটের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় এবং এইভাবে সোভিয়েটের সুনাম নষ্ট করা যায়। অবশ্য সোভিয়েট প্রতিনিধিদের চোখে ধূলো দেওয়া টিটোর কর্ম্ম নয়। সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তর এই সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী দলিলপত্র সমেত প্রকাশ করে দিয়েছেন। টিটো এখন কোন মিথ্যা দিয়েই নিজের বিশ্বাসঘাতকতাকে আর চেপে রাখতে পারছে না।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইওরোপের মুক্তি সংগ্রামের শত্রু

যুদ্ধকামী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে টিটোর সহযোগিতা যে কতখানি গভীর হয়ে উঠেছে, নিচের ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

একখানি দায়িত্বশীল ফরাসী কাগজে প্রকাশ, মার্কিন তাঁবেদার তুরস্কের প্রধান সেনাপতি মার্শাল ওমুতার্ক আমেরিকান ও বৃটিশ গবর্নমেন্টের কাছে ফ্রান্স, ইটালী, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্ককে নিয়ে এক ভূমধ্যসাগর ব্লক গড়ার প্রস্তাব পেশ করেছে। ওমুতার্ক যুগোস্লাভ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার পর অর্থাৎ টিটোর সম্মতিক্রমে এই পরিকল্পনা পেশ করেছে। রচয়িতাদের মতেই এই চুক্তির কাজ হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইওরোপে আটলান্টিক প্যাক্টের পরিপূরক হিসাবে কাজ

ডলারের লোভে দেশ বিক্রয়

করা। আমেরিকার তিন প্রধান সেনাপতি সম্প্রতি টিটোর প্রতিনিধিদের সহিত দেখা করার জন্যই যে ভিয়েনা এসেছিলেন তাও ঢাকা নেই।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, টিটো যে শুধু নিজের দেশকেই সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে তাই নয়; সে আজ দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইওরোপের মজুর-কৃষক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে গ্রীসের মুক্তি-ফৌজের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী হয়েছে।

গ্রীক মুক্তি-ফৌজ গ্রামোস অঞ্চলে রাজতন্ত্রী ফ্যাসিস্টদের দপ্তর দখল করার পর যে সব দলিল হস্তগত করে তা'থেকে দেখা যায় যে, গত ৪ঠা জুলাই গ্রীক ফ্যাসিস্টদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে টিটোর প্রতিনিধিদের এক গোপন সভা হয়েছে পোপালোভসিতে; সেই সভায় আমেরিকান এবং বৃটিশ প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল। এই সভার পরই, ৯ই জুলাই গ্রীক রাজতন্ত্রী ফৌজ যুগোস্লাভ এলাকার মধ্য দিয়ে মুক্তি-ফৌজকে আক্রমণ করে। গ্রীসের বীর মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে টিটোর এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা এখানেই শেষ নয়। গ্রীসের মুক্ত এলাকায় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য টিটো এক বিরাট সংগঠন তৈরী করেছে। এই সংগঠনের সদর দপ্তর হচ্ছে স্কপ্লজিকে, এবং এর পরিচালকের নাম ভল্যাকস্।

এই ভল্যাকস্ হাজার গোয়েন্দা পাঠিয়ে গ্রীক ম্যাসিডোনিয়ানদের উস্কানি দিচ্ছে মুক্তি-ফৌজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য, এই ভ্যালকসের লোকরা অসংখ্য গ্রীক গণতন্ত্রী নেতাকে হত্যা করেছে। গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা জারগস্ এদেরই হাতে নিহত হয়েছেন।

শুধু গ্রীসই নয়। ক্ষুদ্র এলবেনীয়ার প্রধান মন্ত্রী হোনা সম্প্রতি প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন যে, টিটোর সরকার এলবেনীয়ার মধ্যে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল লোককে দিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করেছিল, যাতে সেই গণ্ডগোল আয়ত্তে আনার নামে টিটোর সৈন্যদল এলবেনীয়া দখল করতে পারে।

এইভাবেই সোভিয়েটবিরোধী টিটো যুগোস্লাভিয়ার শত্রু, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইওরোপের মুক্তি-সংগ্রামের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সারা দুনিয়ার মুক্তি ও গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠশক্তি সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম এই হতে বাধ্য।

বিশ্বাসঘাতকতার সুদীর্ঘ ইতিহাস

সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে টিটোর এই মিতালী আজ নূতন নয়। সম্প্রতি যে সব তথ্য প্রকাশ হয়েছে তার থেকে পরিষ্কার হয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়া থেকেই টিটোর সঙ্গে চার্চ্চিল ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একথা সকলেই জানে যে, গত যুদ্ধের সময় ফরাসী গেরিলা যোদ্ধাদের কোন রকম অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে চার্চ্চিল অস্বীকার করেছিল; কারণ সেই ফরাসী গেরিলাদের নেতা ছিল ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি। অথচ যুদ্ধের গোড়া থেকেই চার্চ্চিলের লোকরা টিটোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখত, চার্চ্চিল টিটোকে বহু অস্ত্র সরবরাহ করেছে। টিটোর কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি না পেয়ে যে চার্চ্চিল এই বদান্যতা দেখিয়েছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। সহজেই বোঝা যায়, টিটোর বিশ্বাসঘাতকতার ভিত্তি সেই সময়েই স্থাপিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যুদ্ধের শেষে বৃটিশ সৈন্য যখন গ্রীসে অবতরণ করে তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন গ্রীক মুক্তি-ফৌজের হাত থেকে গ্রীসকে 'রক্ষা' করা। অথচ ঠিক সেই সময়েই, ১৯৪৪-এর অক্টোবর মাসে, সালোনিকায় টিটোর ফৌজের জন্য বৃটিশ বিমান থেকে অস্ত্র ফেলে দেওয়া হয়। সহজেই বোঝা যায় যে, গ্রীক মজিল

য়েটের শত্রু, যুগোশ্লাভিয়ার পদলেহী কুক্কুর

গ্রীসের মুক্তি আন্দোলনের ঘাঁতির পাহারাদার

মুক্তি-ফৌজের হাত থেকে 'সালোনিকা'কে রক্ষা করার দায়িত্ব চার্চ্চিল টিটোকেই সমর্পণ করেছিল এবং সে দায়িত্ব টিটো বিশ্বস্তভাবে পালন করেছিল।

আজ যুগোশ্লাভিয়ার গলায় ডলার দাসত্বের ফাঁস পরিয়ে দেবার যুক্তি হিসাবে টিটো প্রচার করছে সোভিয়েট কোন সাহায্য করছে না বলেই তাকে আমেরিকার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অথচ প্রকৃত তথ্য হচ্ছে যে, প্রায় দু'বছর আগেই, ১৯৪৭ সালেই টিটো আমেরিকার কাছে ডলার ঋণের জন্য হাজির হয়েছিল। আমেরিকা তখন রাজি হয়নি। সহজেই বোঝা যায় যে, ঋণদানের আগে শর্ত্তস্বরূপ টিটোকে যে সব কাজ করার নির্দ্দেশ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা দিয়েছিল, সেই অনুযায়ীই টিটোচক্র গত এক বছর ধরে দেশদ্রোহিতার, সোভিয়েটবিরোধিতার এই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। অনুগত ভৃত্যের কাজে প্রসন্ন হয়ে ডলার-পতিরা তাই আজ টিটোকে ডলার ভিক্ষা দিতে সম্মত হয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নয়া-গণ-পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে। আমেরিকার কাছ থেকে টিটো এই শর্ত্তে ডলার ঋণ নিচ্ছেন তার দ্বারা সীসা, তামা, দস্তা প্রভৃতি খনির জন্য যন্ত্রপাতি কিনতে হবে। অর্থাৎ এই টাকায় যুগোশ্লাভিয়ার শিল্প বিস্তার হবে না, যুগোশ্লাভিয়া যাতে মার্কিন যুদ্ধ-শিল্পের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ধাতু প্রভৃতি আরও বেশী করে উৎপন্ন করতে পারে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। এ শুধু ভবিষ্যতের কথা নয়। সারা ১৯৪৮ সালে যুগোশ্লাভিয়া যত পরিমাণ ধাতু আমেরিকায় চালান করেছিল, ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯-এর জানুয়ারী—এই দু' মাসেই করেছে তার দ্বিগুণেরও বেশী। এবং আরও প্রায় ৫০ কোটি টাকার ধাতু আমেরিকায় চালান দেবার জন্য আলোচনা চলছে।

সম্প্রতি বৃটেনের সঙ্গে টিটোর যে চুক্তি হয়েছে তাতে যুগোশ্লাভিয়ায় বৃটিশ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা দিতে রাজী হয়েছে এবং যতদিন না ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, ততদিন সেই সব সম্পত্তি ও কলকারখানার উৎপন্ন জিনিসে বৃটিশ মালিকদের অংশ দিতে স্বীকার করেছে। এই চুক্তি সম্পর্কে 'রিপাব্লিকো' কাগজটি সোল্লাসে লিখেছে : "এর ফলে বৃটিশ মূলধনীরা আবার যুগোশ্লাভিয়ার অর্থনীতিক ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করতে পারবে"। এর ওপর আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমেরিকা এবং বৃটেনের হুকুমে টিটো পশ্চিম ইওরোপের অন্যান্য মার্কিন তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি করেছে। যুগোশ্লাভ শ্রমিকেরা তাদের রেশনে প্রয়োজনের তুলনায় অর্দ্ধেক খাদ্যও পায় না। অথচ টিটো ইটালির সঙ্গে এক চুক্তি করে সেখানে গম ও খাদ্যশস্য চালান দিচ্ছে।

সোভিয়েটবিরোধী টিটো—যুগোশ্লাভ জনতারও শত্রু

মার্কিন প্রভুদের স্বার্থে দেশদ্রোহী টিটো-চক্র যুগোশ্লাভিয়ার জনসাধারণকে অনাহারে রাখছে। গত এক বছর যুগোশ্লাভিয়ায় ময়দার দাম তিনগুণ এবং মাংসের দাম চারগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে বেলগ্রেড শহরের শ্রমিকরা রেশনে মাংস, ময়দা প্রভৃতি পাচ্ছে না। টিটোর বাণিজ্য-মন্ত্রী সম্প্রতি হুকুম জারি করেছে যে, "শ্রমিকরা যদি কাজে না আসে তবে শুধু যে তাদের খাদ্য বন্ধ করে দেওয়া হবে তাই নয়, তাদের পরিবারের জন্যও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে"।

বিদেশী মনিবদের স্বার্থে কাজ করতে শ্রমিকদের বাধ্য করার জন্য যে সরকার শ্রমিকদের নির্দ্দোষ স্ত্রী এবং শিশু সন্তানদের খাবার পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারে সে যে কতবড় শয়তান তা ভাষায় প্রকাশ করাও কঠিন।

টিটো-চক্র গ্রামাঞ্চলে যে নীতি অনুসরণ করছে তার ফলেও শুধু ধনী কৃষকরাই লাভবান হচ্ছে। গরীব ও মাঝারি কৃষকদের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে যে সব কৃষি সমবায় খাড়া করা হয়েছে তার কর্ত্তৃত্ব ধনী কৃষকদের হাতে। এই সব কৃষি সমবায়ের আয় যখন ভাগ করা হয় তখন, কে কত পরিশ্রম করেছে তার হিসাব নেওয়া হয়। কার কত জমি আছে সেই হিসাবে আয়ের বখরা ঠিক হয়। ফলে এই সব তথাকথিত কৃষি সমবায় আসলে ধনী কৃষকের হাতে শোষণ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

এক কথায় বলা চলে যে, টিটো সরকার আজ যুগোশ্লাভ জনতাকে শোষণ করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্দ্ধভুক্ত যুগোশ্লাভ শ্রমিক কৃষককে শোষণ করে যা মুনাফা হচ্ছে তা যাচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পকেটে। যুগোশ্লাভিয়ার শহরের ফাটকাবাজ আর গ্রামের ধনী কৃষক এবং টিটোর সহচর পুলিস সামরিক আমলা গোষ্ঠীর পকেটে।

যুগোশ্লাভ দেশভক্তদের হত্যাকারী টিটো

যুগোশ্লাভিয়ার যে শ্রমিকশ্রেণী অস্ত্রহাতে হিটলার ফৌজের বিরুদ্ধে লড়েছে, যে যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির হাজার হাজার সদস্য হাসিমুখে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে বিদেশীর হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য, যুগোশ্লাভিয়ার যে জনসাধারণ বীর লালফৌজের দ্বারা তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত হতে দেখেছে—তারা যে কখনও এই বিশ্বাসঘাতক, সোভিয়েটবিরোধী নীতি মেনে নেবে না তা টিটো জানে। তাই তার পুলিস-মন্ত্রী র‍্যাংকোভিক সারা দেশে সন্ত্রাসের রাজ স্থাপন করেছে।

হিটলারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রকৃত সেনাপতি, সারা যুগোশ্লাভিয়ার পরম প্রিয় নেতা কর্নেল জেনারেল আর্মো জোভালোভিককে র‍্যাংকোভিকের নির্দ্দেশে খুন করা হয়েছে। খুন করা হয়েছে মাক্টিনিগ্রো কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক বোজো লজুমোভিককে, মেজর জেনারেল পেট্রিসেভিক এবং আরও অসংখ্য দেশভক্তকে।

ক্রমবর্দ্ধমান বিক্ষোভকে দমন করার জন্য সে হাজার হাজার দেশ ভক্তকে জেলে পুরেছে। স্বভাবতই তার প্রথম শিকার হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তান সেই সব যুগোশ্লাভ কমিউনিস্টরা যারা টিটোর এই বিশ্বাসঘাতকতাকে সমর্থন করতে রাজি হয় নাই। যুগোশ্লাভ-কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর সদস্য কমরেড যুগোভিচ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হেরবাকে কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে আটক করে অকথ্য নির্য্যাতন করা হচ্ছে।

বেলগ্রেডে যে রাজকীয় কারাগার ছিল সেখানে আর বন্দী ধরছে না। বেলগ্রেড শহরে একাধিক বড় বড় বাড়ীকে জেলখানায় পরিণত করা হয়েছে। তাতেও স্থান সঙ্কুলান হয় না দেখে শহরের বাইরে দুটো বিরাট কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরী করা হয়েছে। এখানে বন্দীদের নিয়মিতভাবে দৈহিক নির্য্যাতন করা হয়। নির্য্যাতনের পর অর্দ্ধমৃত বন্দীদের হাঁটুভোর জলে ভর্ত্তি কুঠরীর মধ্যে ফেলে রাখা হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইভাবে রাখা হয়। অনেকেই এই নরক থেকে জীবন নিয়ে বেরোতে

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দেশব্যাপী বর্ব্বর হিংসা

তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে একটি লোহার বল্ট্ চালান করাও আমেরিকা এবং তার মার্শালী তাঁবেদাররা বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, ঐ বল্ট্‌টা পাওয়ার ফলে সোভিয়েটের যুদ্ধ ক্ষমতা যদি বেড়ে যায়! অথচ যুগোশ্লাভিয়ায় দুটো ইস্পাত তৈরীর কারখানা করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি **ধারে** দিতে আমেরিকা রাজি হয়েছে। সহজেই বোঝা যায় যে, বলকানে মার্কিন যুদ্ধ ঘাঁটি টিটোর যুগোশ্লাভিয়ার ছোট খাট অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা করার জন্যই ডলার প্রভুদের এই বদান্যতা। নির্লজ্জ দালাল হিসাবে টিটো কতখানি বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে তাও এই একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিকট দেশ বিক্রয়

বিশ্বাসঘাতকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারী শুধু আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আভ্যন্তরীণ নীতিতেও টিটো-চক্র শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত আদর্শকে ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছে। ডলার মুষ্টি-ভিক্ষার পরিবর্ত্তে তারা যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত অর্থনীতিকে আমেরিকা ও বৃটেনের কাছে বিক্রী করে দিচ্ছে। যুগোশ্লাভিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের কাঁচামাল সরবরাহকারী উপনিবেশে পরিণত করছে এবং দেশের মধ্যে

নতুন বই—এই সপ্তাহে সংগ্রহ করুন

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতবাদ

পি ফেডোসিয়েভ—দাম তিন আনা।

লেখক সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক মুখপত্র 'বলশেভিক'-এর সম্পাদক।

দুনিয়ার দেশে দেশে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা বলে বেড়াচ্ছেন, শ্রেণী সংগ্রামের দিন শেষ হয়েছে, এটা শ্রেণী সমঝোতার যুগ, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন নেই। পুস্তিকাখানিতে এই মতের প্রচারকদের পুঁজিপতি শ্রেণীর দালালীর মুখোস অত্যন্ত নগ্নভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে। আজকের শ্রেণী-সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকার গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা অত্যন্ত পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

* **১৯০৫ সালের বিপ্লব**— লেনিন, দাম দশ আনা

* **বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা**
লজোভস্কি, দাম আট আনা

* **মার্কসবাদী**— ৪র্থ সংখ্যা, দাম পাঁচ সিকা

নিউ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী

ধর্ম্মঘট ব্যালটের সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যালিষ্ট, কংগ্রেস ও সুবিধাবাদী নেতাদের বেইমানী

নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মঘট কমিটি ও সেকশন কমিটি গঠনের আহ্বান

ছাঁটাই বন্ধ এবং পে-কমিশনের সমস্ত সুপারিশ চালু করার দাবিতে অর্ডন্যান্স কর্ম্মচারী ফেডারেশন যে ষ্ট্রাইক ব্যালট ডাকেন তাহাতে ইছাপুরের ৯৭% শ্রমিকই ধর্ম্মঘটের পক্ষে ভোট দেন।

কিন্তু ফেডারেশনের সুবিধাবাদী ও কংগ্রেসী নেতারা এই রায় না মানিয়া পিছন হইতে শ্রমিকদের ছুরি মারিতে সুরু করিয়াছেন।

অবিলম্বে ধর্ম্মঘটের জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করার পরিবর্ত্তে তাঁহারা সন্দেহজনকভাবে চুপ করিয়া আছেন এবং সরকারকে অযথা সময় দিতেছেন।

ইতিমধ্যে এই সুযোগে সরকার বাছিয়া বাছিয়া লালঝাণ্ডা শ্রমিকনেতাদের ছাঁটাই ও গ্রেপ্তার করিতে সুরু করিয়াছেন।

কানপুরে সরকার লালঝাণ্ডা শ্রমিক নেতা সেইনীকে ছাঁটাই করেন। ইহার প্রতিবাদে কানপুরের সমস্ত অর্ডন্যান্স শ্রমিক প্রতিবাদ জানান এবং ছাঁটাই প্রত্যাহার না করিলে অবিলম্বে ধর্ম্মঘটের জন্য আগাইয়া যান।

কিন্তু ফেডারেশনের সুবিধাবাদী নেতা শ্রীযুত এস এন ব্যানার্জ্জি লজ্জাজনক ভাবে শ্রমিকদের ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করেন, এবং ফেডারেশনের পক্ষ হইতে সরকারকে অযাচিতভাবে ১০ দিনের সময় দেন।

সময় পাইয়া সরকার দাবি মানা দূরে থাক নূতন আক্রমণ সুরু করেন। কমরেড সাইনীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়, এবং আত্মগোপন করিতে বাধ্য করেন।

ইছাপুরেও গত ২২শে আগস্ট একই কায়দায় সরকার লালঝাণ্ডা শ্রমিক বিন্ধ্যাচলকে কোন কারণ না দর্শাইয়া ছাঁটাই করেন। ইছাপুরের ইউনিয়ন নেতারা (কংগ্রেসী) ইহার প্রতিবাদ করা দূরে থাক চুপ করিয়া সরকারকে আক্রমণের সুযোগ করিয়া দিতেছেন।

ইছাপুরে মজদুর ইউনিয়নের কংগ্রেসী দালালরা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতা ঢাকিবার জন্য ফেডারেশনের সুবিধাবাদী নেতাদের উপর দোষারোপ করিয়া দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইছাপুর শ্রমিকেরা স্পষ্ট বুঝিতে সুরু করিয়াছেন, কংগ্রেসী মৈত্রেয়ী বসু বা এস এম ব্যানার্জ্জীর মত সুবিধাবাদী নেতারা উভয়েই শ্রমিকদের স্বার্থ ডুবাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন।

ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম সুরু না করিলে ছাঁটাই ও বেতন হ্রাস ঠেকান যাইবে না।

ইতিমধ্যে কানপুরে ১৩০০ শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের ভয়ে সরকার এতদিন বিভিন্ন ডিপোতে ছাঁটাই করিতে সাহস পান নাই। এখন সে ছাঁটাই সুরু হইবে।

ইছাপুরে ওভারটাইম এবং ওভার টাইম বোনাস কাটার ফলে প্রতি শ্রমিকের ২৫।৩০ টাকা বেতন হ্রাস হইয়াছে।

এই আক্রমণ রুখিবার জন্য, ফেডারেশনের সুবিধাবাদী কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ঠেকাইবার জন্য ইছাপুরের লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা অবিলম্বে ধর্ম্মঘট কমিটি ও সেকসন কমিটি গঠনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

লালঝাণ্ডা দাবি করিয়াছেন :

১। ছাঁটাই চলিবে না, পাকা চাকুরী চাই

২। বোনাস ও ওভার টাইম বন্ধ করা চলিবে না।

৩। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের উপর ১০০% বোনাস চাই।

৪। রেল ভাড়া কাটা চলিবে না।

৫। ৮০ টাকা নিম্নতম বেতন, ৪০ টাকা মাগগীভাতা, ও ২০ টাকা ঘর ভাড়া চাই।

৬। বন্দীদের মুক্তি চাই।

কানপুরে ৭০০০ অর্ডন্যান্স শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

ছাঁটাই বন্ধ, ছাঁটাই ভাইদের কাজ, পাকা চাকুরী এবং মাগ্‌গীভাতার দাবিতে কানপুর অর্ডন্যান্স ডিপোতে গত ১৬ই আগষ্ট ৭০০০ মজুর ধর্ম্মঘট করিয়া বাহির হইয়া আসেন। শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ঘরের মেয়েরা কারখানার গেটে গিয়া পিকেটিং করেন। পুলিস আনিয়াও শ্রমিকদের ঠেকান যায় না। কমাণ্ডাণ্ট বাধ্য হইয়া দুই দিন বেতনসহ ছুটি দেন। শ্রমিকেরা মিছিল করিতে চাহিলে ইউনিয়নের সোস্যালিস্ট নেতারা বাধা দেয়। কারখানা খুলিলে শ্রমিকেরা আবার ধর্ম্মঘট করেন। সোস্যালিস্ট নেতারা বেইমানী করে। সরকারের সহিত তাহারা কি কথাবার্ত্তা বলে। কম্যাণ্ডাণ্টের মোটরে সোস্যালিস্ট ঝাণ্ডা লাগাইয়া তাহারা প্রচার করে—কাজে ফিরিয়া যাও, হরতাল খতম হইয়া গিয়াছে। এই বেইমানীর পর শ্রমিকেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া রুজী রুটির জন্য লড়াইয়ে অগ্রসর হইতেছেন।

নারায়ণগঞ্জের বিক্ষুব্ধ শ্রমিক

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য মালিক বন্ধ রাখিবে। শ্রমিকেরা ইহাতে বিক্ষুব্ধ হন—তাঁহারা স্থির করেন যে, আগেকার মতন মালিকের আদেশ তাহারা আর মানিয়া চলিবেন না; তাহারা নিজেরা-ই কারখানা চালাইয়া দিবেন। শ্রমিকদের এই দৃঢ়-সংকল্পের কথা জানিতে পারিয়া মালিকেরা ঘাবড়াইয়া যায় এবং ১২ই আগস্ট যথারীতি কারখানা খোলে। দুই মাস পূর্ব্বে বাজে অজুহাতে এই কারখানার তিনজন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছিল। সেই তিনজন ভাইকে সম্মুখে লইয়া মিছিল করিয়া শ্রমিকেরা কারখানায় ঢোকেন। কারখানায় ঢুকিয়া-ই তাঁহারা ম্যানেজারকে জানান যে, ঐ তিন জন ছাঁটাই শ্রমিককে কাজ দিতে হইবে এবং সকল শ্রমিককে ১৫ দিন কারখানা বন্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ম্যানেজার তখন অবস্থা বুঝিয়া ঐ ছাঁটাই তিনজন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সাপ্তাহিক বিলের সাথে ঐ ১৫ দিন বন্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মজুরির চার ভাগের তিন ভাগ দেওয়া হইবে।

কোম্পানী সাময়িকভাবে হার মানিলেও শীঘ্রই যে আবার আক্রমণ চালাইবে একথা শ্রমিকেরা বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহারাও নিজেদের সংগঠনকে জোরদার করিয়া তুলিতেছেন।

হাওড়া চটকলে আধা বেকারীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

মালিকের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া তাঁত চালনা

গত ২৯শে আগস্ট শিবপুরে হাওড়া মিলের এক লাইনের পাঁচখানা তাঁতে শ্রমিকদের কাজ দিবার চেষ্টা করা হইলে, স্থায়ী এবং বদলীওয়ালা শ্রমিক উভয়ে মিলিয়া ইহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। স্থায়ী শ্রমিকেরা দৃঢ়ভাবে দাবি জানান যে, তাঁহাদের তাঁত তাঁহারাই চালাইবেন, আর বদলীওয়ালা শ্রমিকদের কাজ দিতে না পারিলে তাহাদেরও পুরা বেতন দিতে হইবে।

এই পাঁচখানা তাঁতের স্থায়ী শ্রমিকেরা তাঁত চালাইতে গেলে কোম্পানী বাধা দেয়। ফলে তাঁত ঘরের সমস্ত শ্রমিক একত্র হইয়া ৫ মিনিটের জন্যে কাজ বন্ধ করিয়া দেন।

পরদিন হইতে এই পাঁচখানা তাঁতের স্থায়ী শ্রমিকেরা কোম্পানীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আজ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যাইতেছেন। বদলীওয়ালা শ্রমিকেরা এবং এই লাইনের অন্যান্য তাঁত শ্রমিকেরাও তাঁহাদের এই লড়াইয়ে পুরাপুরি মদৎ দিতেছেন।

গত মে মাসে এই মিলের কর্ত্তৃপক্ষ শতকরা ১২খানা তাঁত বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু শ্রমিকদের তীব্র বিক্ষোভের মুখে মালিক প্রতি লাইনের বন্ধ তাঁতের শ্রমিকদের ছাঁটাই না করিয়া ঐ লাইনের স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া প্রত্যেককে এক এক সপ্তাহ বসাইয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। শ্রমিকদের মধ্যে তখন হইতেই বিক্ষোভ জমা হইতে থাকে।

ইহার পর তিন হপ্তা এক হপ্তা চালু হইবার পরে শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশকে গড়ে মাসে ২ সপ্তাহ বেকার থাকিতে হইতেছিল।

হাওড়া মিলের এই শ্রমিকদের মধ্যে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আই, এন, টি, ইউ, সির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। শ্রমিকদের অধিকাংশ হিন্দুস্থানী হওয়ায় আই, এন, টি, ইউ, সি ইঁহাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বাঙ্গালী-বিহারী বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছিল। পণ্ডিত নেহরুর কলিকাতায় আসার পর হইতেই ইহারা আরও বেশী সক্রিয় হইয়া উঠে। লালঝাণ্ডার সংগঠককর্ম্মীরা বাঙ্গালী—এই রব তুলিয়া তাহারা লালঝাণ্ডার কর্ম্মীদের উপর মারপিট এবং হামলা পর্য্যন্ত করে।

কিন্তু পর পর মালিকের আক্রমণের মুখে ইহাদের জঘন্য দালালী ক্রমেই শ্রমিকদের কাছে পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কথায় কথায় চার্জ্জশীট, টিপসই প্রভৃতি জুলুমের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক একত্র হইয়া সাহেবকে ঘেরাও করার জন্য মিলের আই, এন, টি, ইউ, সি নেতা ও ওয়ার্কস কমিটির সভ্য রামদয়ালের কাছে যায়। রমদয়াল কথা দিয়াও, ঠিক সময়মত সরিয়া পড়ে। পরের দিন সমস্ত শ্রমিক রামদয়ালকেই ঘেরাও করে।

গত বছর ট্রাইব্যুনালের খরচের নাম করিয়া এই দালালেরা এই মিলের শ্রমিকদের কাছ হইতে প্রায় ১৬ হাজার টাকা তোলে। শ্রমিকেরা এখন এই টাকার হিসাব চান। সমস্ত শ্রমিক মাত্র ২।৩ দিন আগে আই, এন, টি, ইউ, সির সম্পাদক সুভাষকে ঘেরাও করিয়া টাকার হিসাব চান। সুভাষ কোন গতিকে পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়।

এইভাবে এই মিল শ্রমিকদের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটিতেছে, তাহারা সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছেন। এই মিলের শ্রমিকেরা বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত দাবিগুলি নিয়া সংঘবদ্ধ হইতেছেন :

(১) তিন মাসের বোনাস চাই—পূজা এবং ঈদের আগেই এই বোনাস আদায় করিতে হইবে।

(২) বন্ধ হপ্তার পুরা বেতন চাই।

(৩) মাসিক ৭১৷৷০ টাকা বেতনের হার এখনই চালু কর। চটকল ট্রাইব্যুনাল পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন ইহার কমে শ্রমিকদের চলে না।

মঞ্জিল

= চিঠি-পত্র =

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

৮৭ জনকে বাদ দিয়াই সাধারণ নির্ব্বাচন !

মহাশয়,

দেশের শতকরা ৮৭ জনকে বাদ দিয়া ১৩ জনের এই "সাধারণ নির্ব্বাচন" কেন, কাহাদের স্বার্থে ?

নেহরু সরকার কি মনে করিয়াছেন যে, এই নির্ব্বাচনের ভাঁওতা দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবেন ?

জনতার সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সাহস পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী নেতাদের নাই। দেশের সংকট সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। টাটা-বিড়লা পরিচালিত এই সরকার "শিল্পে-শান্তি" রক্ষার নামে প্রত্যেকটি ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনকে নিতান্ত ফ্যাসিস্ট কায়দায় মিলিটারী ও পুলিস দ্বারা ধ্বংস করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। ফলে গণ-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিয়া চূড়ান্ত বিপ্লবের পথে দীপ্ত পদক্ষেপে আগাইয়া চলিয়াছে।

এই অগ্রগতিকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে আকৃষ্ট করাই কি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয় ?

কংগ্রেসীরা যদি সত্যই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হন তবে প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচন ঘোষণা করুন না কেন ?

জনসাধারণ আজ এই সরকারের অপসারণ চায় এবং সেইজন্য তাহারা কখনই এই সংরক্ষিত ভোটাধিকার গ্রহণ করিবে না। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্ব্বাচন করিতে সরকারকে তাহারা বাধ্য করিবে।

জনৈক কেরাণী।
বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ বসুদের বামপন্থী ফ্রন্টে নেহরু-বিধান নাই কেন ?

সম্পাদক মহাশয়,

এতদিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে যারা লড়ে তারাই বামপন্থী। এখন দেখছি যে দক্ষিণপন্থীদের হুকায় হুয়া দেওয়াই প্রকৃত"বামপন্থা"র চিহ্ন। দেশের শতকরা ৮৭ জন গরীবকে বাদ দিয়ে, রাজবন্দীদের আটক রেখে নেহরু-প্যাটেল সাধারণ নির্ব্বাচন ঘোষণা করিলেন, অমনি শরৎ বসু থেকে সুরু করে মৃণালকান্তি বসু, আর বিলেতি লেবার পার্টির আদর্শে গড়া ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল পর্য্যন্ত জনসাধারণকে বোঝাতে সুরু করেছেন যে এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

এই সব প্রকৃত 'বামপন্থীদের' নিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট গড়া হচ্ছে তাতে কমিউনিস্টদের স্বভাবতই ডাকা যায় না, কারণ তারা নিতান্ত গোঁয়ারের মত কংগ্রেসী হুকায় হুয়া দিতে রাজী হচ্ছে না!

জনসাধারণকে ভোটাধিকার না দেওয়া, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা —এইসব বড় বড় ব্যাপারগুলোয় যখন কোন মতভেদ নেই, তখন নেহরু-বিধান রায় প্রভৃতিকেও ঢুকিয়ে দিলে এই "বামপন্থী যুক্ত ফ্রন্ট" আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হোত না কি ?

রণেশ ঘোষাল
আরপুলি লেন, কলিকাতা।

এই এণ্ডারসনী নির্য্যাতনের প্রতিকার কি ?

মহাশয়,

দমদম-বসিরহাট সশস্ত্র আক্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে অন্যান্যদের মধ্যে আমার পুত্রও একজন। তদন্তের অজুহাতে গত ফেব্রুয়ারী হইতে তাহাদের মামলা বার বার মুলতুবি করা হইতেছে, অথচ জামীনও দিতে পুলিস আপত্তি করিতেছে। বর্ত্তমানে লোকচক্ষুর অন্তরালে জেলের মধ্যে কোর্ট করিয়া তাহাদের বিচার হইতেছে। বিচারকালে আসামীদের একজন করিয়া আত্মীয় উপস্থিত থাকার আবেদনও অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৮।৮।৪৯ তারিখে অভিযুক্তদের পাঁচজনকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জেলের দরজায় আবার নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এই এণ্ডারসনী নির্য্যাতনের কি কোন প্রতিকার নাই ?

এই সংবাদ লইয়া গবর্নমেণ্টের রক্ষিতা কাগজগুলির নিকট যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু যে দুইখানি ইংরাজি ও বাংলা দৈনিক নিজেদের সরকারবিরোধী বলিয়া প্রচার করেন, কেন জানি না তাঁহারা পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াও সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। আসামীদের সহিত আপনাদের মতানৈক্য থাকা সত্বেও আপনারা কংগ্রেসী সরকারের এই নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করিবেন, এই আশায় লিখিলাম। ইতি—

অন্যতম বন্দীর পিতা

বস্তী হইতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লালঝাণ্ডাই হাতিয়ার

মহাশয়,

আমি একজন বস্তীর মানুষ। ২৬শে জুলাই শ্রমিক ক্ষেত-মজুর সম্মেলনে যোগ দিয়া আমরা বস্তীবাসীরা অত্যন্ত মনোবল লাভ করিয়াছি।

কারণ আমরা জানি আজকার দিনে গ্রামে কৃষক প্রজাদের উপর ধনিক-জমিদারের বর্ব্বর অত্যাচারে তাহারা যেরূপ ক্ষেত-মজুর হইয়াছেন, আমরা শহরে ধনিক-জমিদারের বস্তী হইতে উচ্ছেদের ফলে তেমনই রাস্তায় নামিয়া ভিক্ষুক হইতেছি।

আমরা যাহারা বস্তীতে থাকি তাহাদের কথা ভাবায় প্রকাশ করা আমার সম্ভব নয়। তবু একটু বলি।

আমাদের জমিদারের পৈতৃক উপাধি সিংহ। সত্যিই তাঁহাকে 'সিংহ' বলাই উচিত। সিংহ মহাশয় ছিলেন একজন হাতুড়ে ডাক্তার। আজ তিনি একজন বিখ্যাত ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলর।

আমরা যে বস্তীতে বাস করি তার লোকসংখ্যা কম হলেও দেড় হাজার। কিন্তু কলের সংখ্যা তিনটা ও আলোর সংখ্যা শূন্য। বস্তীর গায়ে বড় রাস্তার উপর চারটা গ্যাসের আলো ছিল ; তার মধ্যে একটিরও মাথা নাই ; কারণ ঐগুলি নাকি বস্তীর মধ্যে পড়েছে। গত ছয় বছরে রাস্তাগুলি একবারও সংস্কার করা হয় নাই। আমরা এমন কি মানুষ যাদের আবার রাস্তা চাই, আলো চাই !

জমিদার বাবু বলেন, যদি থাকতে না পার চলে যাও। তাঁর মতে কলিকাতায় বস্তী রাখাই উচিত নয়।

১৯৪৫ সালে তিনি এই বস্তী উচ্ছেদের মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। সিংহ মহাশয়কে জানাই—আমরা সকলে খাজনা দিতে রাজি। তিনি জবাব দিয়াছিলেন—খাজনা চাই না, জমি খালি চাই। বড় লোকেরা বড় টাকা দিয়া বড় বাড়ী তুলিতে চায়, গরীব মানুষের কুড়ে ঘর তাই ভাঙ্গিতে হইবে।

জমিদার বাবু তখন আমাদের তুলিতে পারেন নাই, কিন্তু চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন দুই বছরের মধ্যে বস্তী উচ্ছেদ করিবেনই। আমরা তাহা গ্রহণ করি। আন্দোলন ও সংগ্রামের পথই তখন আমরা বাছিয়া লই। সভা ডাকিলাম, পোস্টার দিলাম, শোভাযাত্রা করিলাম। এমনই একদিনে হঠাৎ দেখা গেলো বস্তী ভাঙ্গার জন্য একদল গুণ্ডা চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমরাও জঙ্গীভাবে দাঁড়াইলাম।

গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় এক রাত্রিতে দেখি একটা লরী আসিয়া বস্তীর মধ্যে দাঁড়াইল। যারা এল দেখি ৮টি ড্রাম ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। খুলিয়া দেখি পেট্রল। মনে পড়িল—একটি কথা। সিংহ মহাশয় শাসাইয়াছিলেন—আর কোন রকমে না পারিলে আগুন লাগাইয়া তাড়াইলেও বস্তী সাফ করিবেন। বুঝিলাম, সোজাসুজি আগুন না লাগাইতে পারিলে ভাইয়ে-ভাইয়ে দাঙ্গার আগুনেও বড়লোকদের বড়ই সুবিধা। আমরা সে-বড়যন্ত্র ব্যর্থ করিলাম।

এইভাবেই চলিতেছে। এখন জমিদারবাবুর বস্তী উচ্ছেদের সবচেয়ে বড় কথা—বস্তীর লোক সব 'কমিউনিস্ট' হইয়া গিয়াছে। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে 'সভা' 'মিছিল' 'পোস্টার', 'জঙ্গীপনা' সবই নাকি 'কমিউনিস্ট' কাজ।

শ্রমিক-ক্ষেতমজুর সম্মেলন তাই আমাদের আশা দিয়াছে, আলো দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লালঝাণ্ডাই আমাদের হাতিয়ার। —ইতি

জনৈক বস্তীবাসী,
পণ্ডিতিয়া রোড।

মালদহে ভাদই ফসলে তে-ভাগা কায়েম

পুলিসের বিরুদ্ধে মেয়েদের প্রতিরোধ

মালদহের গ্রামে গ্রামে ভাদই ফসলের তে-ভাগা সুরু হইয়াছে। জোতগোপাল গ্রামে আধিয়াররা তে-ভাগা আদায় করিয়াছেন। কোন কোন জোতদার কৃষকদের সংঘশক্তি দেখিয়া তে-ভাগা মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু অনেক জোতদারই তে-ভাগা মানিয়া লয় নাই—তাহারা কৃষকদের আইনের ভয় দেখাইয়া শাসাইতেছে, পুলিসপণ্টন আনাইবার জন্য তোড়জোড় করিতেছে। কিন্তু কৃষকেরা তাহাতে একটুও দমেন নাই—সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহারা সমস্ত ফসলই ঘরে তুলিয়া আনিয়াছেন।

কৃষকদের এই সংগ্রামী মনোবল ভাঙিবার জন্য জোতদারেরা এখন ধনী কংগ্রেসী সরকারের পুলিসপণ্টন গ্রামে আনাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কৃষকেরা এই পুলিসের হামলাকে রুখিতেছেন।

২৮শে জুলাই সকাল বেলা জোতগোপাল গ্রামে সশস্ত্র পুলিসের হামলা সুরু হয়। স্থানীয় কংগ্রেসী দালাল রসিক মণ্ডলের নেতৃত্বে ধনিক সরকারের পুলিসের কৃষককর্ম্মী বদরু মণ্ডলের বাড়ী ঘেরাও করে। পুলিস বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া তল্লাসী করিতে চাহিলে বদরু মণ্ডলের মা ও স্ত্রী ঝাঁটা হাতে সশস্ত্র পুলিসের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। এই রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেখিয়া পুলিসের দল নিকটস্থ ক্যাম্পে খবর দিয়া আরো বেশি পুলিস আনায়। কৃষক মেয়েদের মধ্যেও পুলিস হামলার খবর ছড়াইয়া পড়ে—তাঁহারাও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য বদরু মণ্ডলের বাড়ীতে আসিয়া জমায়েত হন।

দলে ভারী হইয়া পুলিসেরা যখন ঘরে ঢুকিয়া তল্লাসী করার চেষ্টা করে তখন বদরুর মা ঘরের কপাট টানিয়া শিকল দিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। পুলিসেরা তখন ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া পড়ে। পুলিস বাহির হইয়া আসা মাত্র গ্রামের সমস্ত মহিলারা তাহাদের ঝাঁটাপিটা করিতে থাকেন—বদরুর মা দালাল রসিক মণ্ডলকে গলা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেন। মহিলাদের এই আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পুলিসেরা পলাইতে সুরু করে। মহিলারা পুলিসদের দালাল রসিকের বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া লইয়া যান।

এই ঘটনার পরে দালালদের মনে বেশ ভয় ঢুকিয়া গিয়াছে।

আন্দোলনের পথে পূর্ব্ববঙ্গ সেক্রেটারিয়েট লোয়ার ডিভিশন কেরানীগণ

১৭৫৲ মূল বেতন দাবী

লিয়াকত আলী মার্কা সোস্যালিজমে উজির-আমলাদের জন্য দুধ-ঘি কেরানীদের জন্য অনশনের বিভীষিকা

পূর্ব্ববঙ্গ সেক্রেটারিয়েটের লোয়ার ডিভিশন কেরানীদের প্রায় শতকরা এক'শ জনই সাত-আট বৎসর চাকুরীর পরেও এখনো অস্থায়ী হিসাবেই কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন। তার উপর পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুর্ম্মূল্যের বাজারে পশুর মত ব্যারাকজীবন যাপন করিয়া মাহিনার নামে যে খুদকুঁড়া পাইতেছেন তাহাতে দেশের বাড়ীতে টাকা পাঠানো প্রহসনে পরিণত হইয়াছে।

অথচ পর্দ্দার অন্য পিঠে বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং মন্ত্রীরাই বাড়ী 'রিকুইজিশন' করিয়া এবং নিজেদের পদোন্নতি বা মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া দিব্যি সুখের সংসার পাতিয়া 'পাকিস্তানের সেবা' করিতেছেন।

তাই ব্যারাকবাসী কেরানীরা অনেক ধৈর্য্যের পর চোখের ঠুলি খুলিয়া পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর সুখনিদ্রাভঙ্গের পর পথে পা বাড়াইতেছেন। তাঁহারা স্থায়ী চাকুরী এবং ১৭৫ টাকা মূল বেতন এবং মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে মাগ্‌গীভাতার দাবিতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছেন।

কিন্তু, শাসকশ্রেণী কেরানীদের স্থায়ী চাকুরী দেওয়া বা বেতন বৃদ্ধি করা তো দূরের কথা, বর্ত্তমানে ছাঁটাইয়ের কুটিল চক্রান্ত করিতেছে।

কেরানীরা স্থায়ী চাকুরীর আন্দোলন সুরু করায় ধনিক লীগ সরকার বলিতেছে, বেশত, তোমাদের প্রথমে একটা 'পরীক্ষা' লওয়া হইবে, তারপর চাকুরী স্থায়ী করা হইবে। কিন্তু কেরানীরা দেখিয়াছে এই 'পরীক্ষা' লওয়ার কৌশলে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে ছাঁটাই করা হইয়াছে। যেখানে ৩বৎসর চাকুরী করার পর চাকুরীতে স্থায়ী হইবার কথা সেখানে ৭।৮ বৎসর কেরানীগিরি করিয়া এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাজকর্ম্ম চালাইয়া কেন এখন 'পরীক্ষা' দিতে হইবে? লোয়ার ডিভিশনের কেরানীদের কি এমন হাতীঘোড়া কাজ যে এতদিন পরে তারজন্য পরীক্ষা দিতে হইবে? আসল কথা পরীক্ষার নামান্তরে হারুন-ইস্পাহানী-দাদার লীগ সরকার গরীব কেরানীদের ছাঁটাই করিয়া ভাতে মারিয়া ঝাড়ে বংশে নিপাত করিবার চক্রান্ত করিতেছে।

ইহার বিরুদ্ধে একটি স্মারক-লিপি পেশ করার অপরাধে (!) এসপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এইচ-রশিদকে আপার ডিভিশন হইতে নামাইয়া লোয়ার ডিভিশনে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

গরীবের বেলায় অস্থায়ী চাকরী, ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা, মাহিনা বৃদ্ধি বন্ধ; গরীবের দাবি-দাওয়ার কথা শুনিলেই লীগ সরকারের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু এ-কথা সকলেই জানে যে, পাকিস্তান হওয়ার পরে প্রায় প্রত্যেকটি অফিসারের পদোন্নতি হইয়াছে এবং একই চাকরীর মাহিনার হার বাড়িয়াছে। অবিভক্ত বাংলায় চীপ সেক্রেটারীর মাহিনা ছিল ১৭ শত টাকা, এখন শোষক লীগ সরকারের বড় কর্ত্তা আজিজ আহমদ পাইতেছেন ৩ হাজার টাকা, ইন্সপেক্টর জেনারেলের মাহিনা বাড়িয়াছে ১৫ শত হইতে ২৬ শতে, হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর বাড়িয়াছে ১৪ শত হইতে ২২ শতে, সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর ১৫ শত হইতে ২ হাজার। বড় অফিসারদের সুখের তরণী উজান বাহিয়া চলিয়াছে এবং ইহাই হইল পাকিস্তানী লিয়াকত আলী মার্কা সোস্যালিজমের নমুনা!

বড় কম দুঃখে ব্যারাকবাসী বুভুক্ষু কেরানীরা ক্ষেপিতেছেন না। পাকিস্তান সম্পর্কে মোহ তাঁহাদের কম ছিল না; তাঁহারা ভালো মানুষের মত বিশ্বাস করিয়াছিলেন, পার্টিশনজনিত অব্যবস্থা মিটিয়া গেলেই তাঁহারা সুব্যবস্থা পাইবেন, তাঁহারা এক সময় দেশরক্ষার ধুয়াতেও ভুলিয়াছিলেন, তাঁহারা ইসলামিক সোস্যালিজমের কথাও কম শোনেন নাই, এমন কি তাঁহারা দাবী-দাওয়া সহজে পাওয়া যাইবে ভাবিয়া সরল অন্তঃকরণে মন্ত্রী মালেককে পর্য্যন্ত নিজেদের এসোসিয়েশনের সভাপতি বানাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বাস্তবের আঘাতে তাই আজ তাঁহারা সংগ্রামের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন।

তাঁহারা সম্পাদক এইচ-রশিদের উপর সরকারী আক্রমণে রুখিয়া দাঁড়ান। তাঁহারা এর প্রতিবাদে গত ২৯শে জুলাই সেক্রেটারীয়েটের মধ্যেই সভা ডাকেন। চীপ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ সভা বে-আইনী ঘোষণা করেন। কর্ম্মচারীরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। আজিজ আহমদ বলেন, বাহিরে গিয়াও সভা করা চলিবে না, তিনি ১৪৪ ধারা জারি করিবেন। কিন্তু কর্ম্মচারীরা বলেন, দরকার হইলে আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গিয়া মিটিং করিব। দুর্দ্দান্ত আজিজ তখন গোবেচারী সাজিয়া সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে সভা করার অনুমতি দিতে বাধ্য হন।

কর্ম্মচারীদের আন্দোলন সুরু হইয়াছে নিঃসন্দেহ. কিন্তু আপার ডিভিশনের এক রকম দালাল মার্কা লোক তাঁহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পদে পদে হতাশা এবং বাধাসৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। লোয়ার ডিভিশনের কেরানীদের সব চাইতে বড় দুর্ব্বলতা হইতেছে তাঁহারা আপার ডিভিশনের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া এখনো সংগঠনগতভাবে সব চাইতে শোষিত অংশ অর্থাৎ বেহারা, আরদালি, পিয়ন, অর্ডারলিদের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। অথচ ইহারাই সংগ্রামের প্রকৃত নেতৃত্ব লইবার যোগ্য। একজন রেকর্ড সাপ্লাইয়ারের মূল বেতন ২০ হইতে ৩২ টাকা, দপ্তরীর মূল বেতন ২০ হইতে ২৭ টাকা, পিয়নের ১৩ হইতে একুশ টাকা মাত্র! ইহাতে আজকের বাজারে একটা জানোয়ার পোষাও দায়! তাই ইহাদের মধ্যে সংগঠন গড়িবার তাগিদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, বাঁচিবার জন্য ইহারা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

সেক্রেটারিয়েট কেরানীরা নিম্নোক্ত দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছেন:

(১) পরীক্ষা লওয়া চলিবে না।

(২) লোয়ার ডিভিশন কেরানীদের ১৭৫৲ টাকা মূল বেতন এবং মূল্য বৃদ্ধি অনুসারে মাগ্‌গীভাতা চাই।

(৩) আপার ডিভিশনে সরাসরি নিয়োগ বন্ধ করিতে হইবে, লোয়ার ডিভিশন হইতে সমস্ত নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) মিঃ রশীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

নুরুল আমীন সরকারের কারাগারে স্কুলের ছাত্রী

পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে মোছলেম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করায় তাহাদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। এই বিক্ষোভ আরও বেশি করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে ছাত্রী ইরা চৌধুরীর গ্রেপ্তারে।

গত ১১ই আগস্ট ছাত্রীসংঘের কর্ম্মী কামারুন্নেসা স্কুলের ছাত্রী ইরা চৌধুরী যখন মোছলেম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে সেখানকার বেতন বৃদ্ধির ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে খবর পাইয়া পুলিস আসিয়া হাজির হয় এবং কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া ইরা চৌধুরীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে।

ইরা চৌধুরীকে জেলে লইয়া গেলে সাধারণ ছাত্রীরা জেল গেটে যাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ঢাকা

মেডিকেল ছাত্রদের উপর প্রিন্সিপালের হামলা

গত ৬ই আগস্ট রাত্রিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের ব্যারাকে যাইয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র যখন কর্ম্মচারীদের ইউনিয়ন সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ টি, আহমদের পোষা কয়েকজন বেয়ারাসহ একদল গুণ্ডা হঠাৎ ছাত্রদের আক্রমণ করিয়া ভীষণ মারপিট করে এবং চারজন ছাত্রকে ধরিয়া হাসপাতালের ইমার্জেন্সী রুমে লইয়া যায়। সেখানে প্রিন্সিপালের উপস্থিতিতে ওয়ার্ড মাস্টার জোয়ারদার ছাত্র নেতা আমজাদ হোসেনকে ঘুসি ও লাথি মারিতে থাকে। এই অবস্থা দেখিয়া কলেজের দু'একজন প্রফেসর প্রতিবাদ করিলে প্রিন্সিপাল ভালো মানুষ সাজিয়া একটি বিচারের প্রহসন করিতে চান। কিন্তু ছাত্ররা তখন বাহির হইয়া চলিয়া যায়—প্রিন্সিপাল টি, আহমদের স্বরূপ তাহাদের আর অজানা নাই।

ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের হোস্টেলে প্রিন্সিপালের এই দুষ্কৃতির খবর ছড়াইয়া পড়িলে ছাত্রগণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন। প্রায় ২০০ ছাত্র আসিয়া প্রিন্সিপালের বাড়ী ঘেরাও করেন। প্রিন্সিপ্যাল তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে সম্মুখে রাখিয়া নিজে পিছন দিক দিয়া পলাইয়া যান। একদল ছাত্র ওয়ার্ড মাস্টারের বাড়ীও ঘেরাও করেন। কিন্তু সেও পিছন দিক দিয়া পালাইয়া যায়।

ইহার পর দুইদিন প্রিন্সিপাল আর কলেজে আসেন নাই। ওয়ার্ড মাস্টারকেও কয়েক দিন ধরিয়া হাসপাতালে দেখা যাইতেছে না। হাসপাতালে এখন সশস্ত্র পুলিসের পাহারা বসিয়াছে।

সার্জ্জন জেনারেল মন্টগোমারী আহত ছাত্রদের নিকট হইতে বিবৃতি নিয়া সুবিচার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু ছাত্ররা পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছেন যে, টি, আহমদ প্রিন্সিপাল থাকা পর্য্যন্ত কোন বিচারের প্রশ্ন-ই আসে না—অবিলম্বে তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে।

ঢাকার গ্রামে ক্ষেতমজুরের সংগ্রাম

ঢাকা জিলার পীরপুর এলাকায় ক্ষেতমজুরেরা নিজেদের সংগঠন গড়িয়া দাবি আদায়ের সংগ্রামে নামিয়াছেন।

এই এলাকায় এখনও চল্‌তি মজুরি দৈনিক বারো আনা হইতে এক টাকা। ক্ষেতমজুরেরা দাবি তুলিয়াছেন—"কমপক্ষে তিন টাকা মজুরি চাই।"

স্থানীয় জোতদার শরৎনাথ ক্ষেতমজুরদের বারো আনার বেশী মজুরি দিতে রাজী হয় না। ক্ষেতমজুরেরা তাহার জমিতে কাজ করিতে অস্বীকার করেন। জোতদার শরৎনাথ ভাবিয়াছিল যে, ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া সে তাহার কাজ হাসিল করিয়া নিবে; কিন্তু তাহার জমিতে কাজ করার জন্য সে একজন মজুরও পাইল না। অবশেষে ক্ষেতমজুর সংগঠনের নিকট মাথা নত করে—ক্ষেতমজুরেরা ২৷৷০ টাকা মজুরিতে এবার কাজ করিতে রাজী হন।

মঞ্জিল

ধনিকশ্রেণী ও কংগ্রেসের বিশ্বস্ত ভৃত্য গোলওয়ালকর

জনতার বিপ্লবী অভিযানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী গঠনে নেহরু-প্যাটেলের চক্রান্ত

আর, এস্, এস নেতার কলিকাতায় আসর জমানো ব্যর্থ প্রচেষ্টা

গান্ধীজীর হত্যাকারীদের 'গুরুজী' আর এস, এস সর্দ্দার গোলওয়ালকরজী সম্প্রতি কলিকাতা সফর করিয়া গেলেন।

পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দ্দার প্যাটেল সম্প্রতি এই হত্যাকারীদের সর্দ্দারকে জেল হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ইহার পর হইতেই মারোয়াড়ী-গুজরাটী ও কংগ্রেসের এই বিশ্বস্ত বাণিয়া ভৃত্যটি একটির পর একটি প্রদেশে টহল দিয়া বেড়াইতেছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক একটি প্রদেশে সফর শেষ করিয়াই এই লোকটি ছুটিতেছে তাহার মনিব সর্দ্দার প্যাটেল অথবা পণ্ডিত নেহরুর নিকট।

আসাম ভ্রমণ শেষ করিয়াই এই লোকটি দিল্লীতে যায় নেহরুর কাছে। আলোচনা এবং পরামর্শের পর পণ্ডিত নেহরুই ইহাকে কলিকাতা সফর করিতে পাঠাইয়া দেন।

রতনে রতন চেনে

গোলওয়ালকরজী যেদিন কলিকাতায় আসিলেন সেদিন হাওড়া স্টেশনে দেখা গেল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বড়বাজারের জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রামশঙ্কর ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে বড়বাজারের গোটা মারোয়াড়ী'র গুজরাটী বাণিয়ার দল স্টেশনে হাজির। কাপড়, চিনি, লোহা, সিমেণ্ট ইত্যাদির চোরাকারবার করিয়া যাহারা মুনাফার পাহাড় বানাইয়াছে, সেই জয়পুরিয়া, জালান, গিরিধারী লাল, রামনারায়ণ, মহাদেও রামকুমার, গণেশ দাস বৈজনাথ, সারোগী প্রভৃতি বাড়ীর লোকেরা মেয়েদের সাথে নিয়া ধূপ চন্দন ও ফুলের মালা দিয়া এই লোকটিকে অভ্যর্থনা জানাইল। খদ্দরের টুপি, কাল টুপি এবং হলুদ পাগড়ীর এত বেশী সংখ্যায় সমাবেশ স্টেশনে বড় দেখা যায় না। দেশবন্ধু পার্কের সভায়ও কয়েকশত মোটর গাড়ী করিয়া ইহারা ভীর জমাইল।

বিলাতী পুঁজিবাদীদের মুখপত্র স্টেটস-ম্যান, মারোয়াড়ী কাগজ সন্মার্গ, জাগৃতি, ডালমিয়ার 'সত্যযুগ', তুষারকান্তির অমৃতবাজার, সুরেশ মজুমদারের আনন্দ-বাজার, ডাঃ ঘোষের লোকসেবক প্রভৃতি কাগজের পক্ষ হইতে ফটো নেওয়ার ধুম পড়িয়া গেল। পরের দিন ফলাও করিয়া কাগজে কাগজে এই ছবি ছাপান হইল, যুগান্তর, সান্মর্গ প্রভৃতি কয়েকখানি কাগজে ছবির সঙ্গে ফলাও করিয়া 'গুরুজীর' জীবনী পরিবেশন করা হইল।

ইহাদের আর দোষ কী? বিলাতী পুঁজি-পতিদের ক্যাপিটাল আর বিড়লার পত্রিকা ইস্টার্ন ইকনমিস্ট গোলওয়াল-কর আসার আগেই লিখিয়া দিয়া-ছিল যে গোলওয়ালকরজী বর্ত্তমানে একজন সেরা "জনপ্রিয়" নেতা, ক্যাপিটাল পত্রিকা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াও দিয়াছে যে নিকট ভবিষ্যতেই এই লোকটি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একজন শক্তিমান পুরুষ হইয়া দেখা দিবে।

বিলাতী প্রভুদের এত বড় সার্টিফিকেটের পর সর্দ্দার প্যাটেলের অল ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে ঘটা করিয়া যে গোলওয়ালকরের কলিকাতা আগমণের বিবরণ প্রচার করা হইল তাহাতে কেহই আশ্চর্য্যবোধ করিবে না।

শ্রমিক, কৃষক এবং মেহনতী জনতার সমস্ত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বে-পরোয়াভাবে দমন করিতেছে যে বিধান সরকার, সে এই গুণ্ডার সর্দ্দারের জন্য সমস্ত রকম স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিয়াছিল। হাওড়া ময়দানে আজ পর্য্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি আছে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র; কোন বামপন্থী দলের সেখানে সভা করার অনুমতি নাই; কিন্তু প্রতি-ক্রিয়ার এই সর্দ্দারকে হাওড়া ময়দানে সভা করার জন্য বিশেষ অনুমতি দেওয়া হইল।

গান্ধী হত্যাকারীদের জন্য অবাধ স্বাধীনতা

শ্রমিক, কৃষক কিম্বা মেহনতীজনতার যে কোন সভা-সমিতিতে দেখা যাইবে প্রকাণ্ড পুলিস বাহিনী, কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারের দল—বেতার ভ্যান, টিয়ারগ্যাস আরও কত কি। আরও দেখা যাইবে গোয়েন্দার দল কিলবিল করিতেছে, পুলিসের ডজনখানেক রিপোর্টার বক্তৃতার রিপোর্ট টুকিতেছে।

গোলওয়ালকরের দেশবন্ধু পার্কের সভায়, অথবা হাওড়া স্টেশনে ইহাদের কাহাকেও দেখা যাইবে না, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

আর, এস, এস সর্দ্দারের প্রতি ডাঃ রায়ের সরকারের এই প্রীতি অবশ্য নতুন নয়। গান্ধীজীকে হত্যার পর দেশব্যাপী যখন আর, এস, এস, এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা গিয়াছিল, যখন মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতা আর, এস, এস অফিস জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিতেছিল, তখন কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা' জনতার এই ক্রোধকে সমর্থন করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছিল!

ডাঃ রায়ের সরকারসেই অপরাধে স্বাধীনতা পত্রিকাকে কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গান্ধীভক্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার গান্ধীজীকে হত্যার পরেও পশ্চিম বাংলায় আর, এস, এসকে যতদিন সম্ভব পুরাপুরি আইনসঙ্গতভাবে কাজ করিতে দেয়। একেবারে উপায় ছিল না যখন তখন লোক দেখানোভাবে ইহাকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। কলিকাতায় আর, এস, এস, এর যে সংগঠনগুলি আছে সেগুলিকে দলে দলে কংগ্রেসের জাতীয় রক্ষী দলে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইতেছে।

উত্তর কলিকাতায় কংগ্রেসের যে জাতীয় রক্ষীদল কংগ্রেসী মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারের নির্দ্দেশে কাজ করে, মধ্য কলিকাতার কংগ্রেসের যে জাতীয় রক্ষী দলকে স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জ্জী এবং প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় পরিচালনা করেন—তাহার অধিকাংশ সভ্যকে দেখা গেল এবারের আর, এস, এস'র সমাবেশ প্যারেডে।

হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে আর, এস, এস-এর বহু সংগঠন এবং আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে, কংগ্রেসের মন্ত্রী-সভার পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দলে তাহার বিরোধী বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি বিনয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য উভয়েই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সংগ্রামী জনতার বিরুদ্ধে

ঘৃণ্য মারোয়াড়ী, গুজরাটী, বাণিয়াকুল এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গোলওয়ালকরের এই গুণ্ডার দলকে সংগঠিত করার জন্য দেশের সর্ব্বত্র ইহাদের ছড়াইয়া দিবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করিতেছে না।

বিড়লার টেক্সম্যাকো কারখানার ম্যানেজার রাজঘরিয়ার নেতৃত্বে আর, এস, এস, দলকে গঠন করা হইতেছে।

শিবপুরে বেঙ্গল জুট মিলের মালিক সুরজমল-নাগরমলের সাহায্যে আর, এস, এস বাহিনী তৈয়ারী হইয়াছে। এই আর, এস, এস বাহিনী কংগ্রেসী উপ-মন্ত্রী সুশীল ব্যানার্জ্জীর বাড়ী পাহারা দেয়, কংগ্রেসের সভা পাহারা দেয়। মালিকের স্বার্থে গত কয়েকদিন আগে বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গার সূত্রপাতও করে এই আর, এস, এস বাহিনী!

ভদ্রেশ্বরের গত দাঙ্গায় এই আর, এস-এস বাহিনী প্রধান অংশ নিয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন।

ইছাপুরে এই আর, এস, এস-এর লোকেরা কয়েকমাস আগে বাঙ্গালী বিহারী দাঙ্গা বাধায়, সেই দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রচাররত লালঝাণ্ডার জনৈক ধাঙ্গর শ্রমিককে ইহারা খুন করে।

পশ্চিম বাংলার সর্ব্বত্র বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার অভিযানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী নেতারা এইভাবে এই হিটলারী গুণ্ডা বাহিনীকে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাদের আরও ব্যাপক এবং সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তকে পাকা করিবার জন্যই ইহাদের সর্দ্দার গোলওয়ালকরকে পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলার জনতা পণ্ডিত নেহরুর এই আশায় ছাই ফেলিয়াছে। পুঁজিপতিদের কাগজগুলির, রেডিওর এত প্রচার, প্রচুর অর্থব্যয়ে এত আয়োজন সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার গণতান্ত্রিক জনতার মধ্যে গোলওয়ালকরজী কোন উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারিল না।

নেহরুর শিশু হিটলারটি হতাশ হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য সমস্ত সফর বাতিল করিয়া অসুস্থতার দোহাই পাড়িয়া নাগপুরে চলিয়া গেল।

১১ সেপ্টেম্বর

১৩

সারা ভারত রেলশ্রমিক সম্মেলন

আগামী ১৬ই ১৭ই ১৮ই সেপ্টেম্বর মুসলিম ইন্‌স্টি-টিউট হলে রেল শ্রমিক সম্মেলন হইতেছে।

গত ৯ই মার্চ্চের পর হইতে জয়প্রকাশ, গুরুস্বামী প্রভৃতির রেল শ্রমিক ফেডারেশন একটি দালাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহারই বিরুদ্ধে ছাঁটাই বন্ধ, গ্রেনশপের পুরা সুবিধা, রেল ভদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাহার, ৮০ টাকা মূল বেতন, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতির দাবিতে রেল শ্রমিকেরা তাহাদের সংগ্রামের জন্য এক নূতন কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছেন।

এ-আই-টি-ইউ-সির নেতৃত্বে এইরূপ নূতন কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত হইবে শুনিয়া বিভিন্ন রেলওয়ের শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও সমর্থন দেখা যাইতেছে।

সাউথ ইণ্ডিয়া রেলের শ্রমিকরা এক সম্মেলনে ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

পাঞ্জাব রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সম্মেলন করিয়া সমর্থন জানান।

কাণপুরে শ্রমিকেরা ব্যাপকভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

জি-আই-পি, বি-এন্-আর আসাম, প্রভৃতি সমস্ত রেল হইতে প্রতিনিধির তালিকা আসিয়া পৌঁছিতেছে।

কনভেনশন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি রেল কেন্দ্রেও বিশেষ সাড়া জাগিয়াছে। আসানসোল, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি কেন্দ্রে স্থানীয় সম্মেলন হইতেছে। শিয়ালদহ রেল কলোনীতে প্রত্যেক দিন শ্রমিক-ছাত্রের মিছিল বাহির হইতেছে। কলিকাতার অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইতেছেন।

এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

কলিকাতায় কর্পোরেশন শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ

দেবেন সেন কর্তৃক প্রতারণা করিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা

ব্রুশ কাঁধে করিয়া, ঝাড়ু উঁচা করিয়া কলিকাতার মেথর ধাঙ্গড়েরা আবার মিছিল বাহির করিতেছেন। তাঁহারা ধ্বনি দিতেছেন: ঝাড়ু ব্রুশ বন্ধ করো, পানি বাতি বন্ধ করো। দাবি না মানিলে কলিকাতার ২০,০০০ ধাঙ্গর, মেথর, বাতিওয়ালা, জল কল শ্রমিক সংগ্রাম শুরু করিবেন।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর লালঝাণ্ডার ডাকে মনুমেণ্টের নীচে তিন হাজার কর্পোরেশন ও পটারী শ্রমিকের জমায়েত হয়। সে সভায় ডিপার্ট ডিপার্ট হইতে শ্রমিকেরা উঠিয়া বলেন, পটারী ভাইরা যেরূপ লড়াই করিতেছেন, তেমনি লড়াই করার জন্য তৈয়ার হইয়া যাও।

শীঘ্রই তাঁহারা দল বাঁধিয়া গিয়া কর্পোরেশন কর্তাদের কাছে দাবি করিবেন—"বলো দাবি মানিবে কিনা।"

কিন্তু গরীবের দাবি কর্পোরেশন কর্তারা সহজে মানে না। ২৫ বৎসর ধরিয়া শ্রমিকেরা এখানে কংগ্রেসী রাজত্বের চেহারা দেখিয়া আসিতেছেন। যে কুখ্যাত নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভা আজ বাংলার সরকার হইয়া বসিয়াছেন, দুর্নীতিতে তাহাদের হাত পাকে প্রথমে এই কর্পোরেশনে।

তাই শ্রমিকেরা জানেন, লড়াই করিতে হইবে। **এই লড়াইয়ের জন্য লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে নিচু হইতে জমাট ঐক্য গড়িয়া তুলিতে শুরু করিয়াছেন।** কংগ্রেসী ইউনিয়নের ভিতরে যে সব শ্রমিক আছেন, তাঁহারাও রাগিয়া উঠিতেছেন, লড়াইয়ের কথা বলিতেছেন। আর অমনি লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা তাঁহাদের সহিত দোস্তী আর ঐক্য প্রতিষ্ঠা শুরু করিয়াছেন। লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা হুঁসিয়ার করিতেছেন—সাবধান, কংগ্রেসী দালালদের কথায় বিশ্বাস করিও না। উহারা লড়াই ও ঐক্য ডুবাইয়া দিবে।

শ্রমিকদের দাবি

শ্রমিকদের প্রথম দাবি: এখনই ৮০ টাকা চাই। সরকারই বর্দ্ধিত হারে মাগগীভাতা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ইহাতে জানুয়ারী মাস হইতে শ্রমিকদের ১০ টাকা করিয়া বেশি পাওয়ার কথা। এই ১০ টাকা সরকারী এ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিতেছেন না। গত ৮ মাসে ৮০ টাকা এইভাবে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সরকার এমনিতে কিছু দিবেই না, উপরন্তু এই ন্যায্য পাওনাটাও চাপিয়া দিতেছে। এই দেখিয়াই শ্রমিকেরা খেপিয়া উঠিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে দাবি করিয়াছে—শুধু ঐ ১০ টাকা নহে, সর্ব্বসাকুল্যে কমসেকম ১০৫ টাকা দিতে হইবে।

এখন কর্পোরেশন শ্রমিকেরা নিম্নতম বেতন পান ২০ টাকা। সারা কলিকাতায় এত কম বেতন আর কোথাও নাই। সরকারের ধোঁকাবাজি ট্রাইব্যুনালগুলি পর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষা বেশি বেতন মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন। অত কম বেতনে বাঁচিয়া থাকা চলে না।

লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা তাই বলিয়াছেন—বাঁচার মত মজুরী চাই।

কমসেকম মূল বেতন ৫০ টাকা চাই, মাগগীভাতা চাই ৪৫ টাকা, ২০ টাকা চাই ঘর ভাড়া। তদনুযায়ী গ্রেড। কর্পোরেশন ঝাড়ুদারদের ছুটির বালাই নাই। তাঁহারা দাবি করিয়াছেন—রবিবার আর পরবের দিন ছুটি চাই, নয়ত ডবল তলব।

লাইটিং শ্রমিকেরা অধিকাংশই সস্তা রেশন পান না। সকলের জন্য সস্তা রেশন চাই।

গতবার ধর্ম্মঘটে জলকলের যে সকল শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছেন তাহাদের কাজে লইতে হইবে।

যে ৮০৲ সরকার চাপিয়া রাখিয়াছেন তাহা এখনই ফেরত দিতে হইবে। ইহার এক পয়সা কম শ্রমিকেরা লইবে না।

কংগ্রেসী দালালদের প্রতারণা

শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের ফলে দেবেন সেন প্রমুখ কংগ্রেসী দালালদের বড়োই অসুবিধা হইয়াছে। লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন ছাড়া কর্পোরেশনে ব্যাঙের ছাতার মত প্রায় ১৭টি ইউনিয়ন আছে। তাহাদের নেতাদের মধ্যে সাজো সাজো রব পড়িয়া গিয়াছে।

দেবেন সেনের লোকেরা এত দিন শ্রমিকদের বুঝাইত—ধৈর্য্য ধরো, দিল্লী হইতে টাকা আসিবে।

কিন্তু ৮ মাসেও টাকা আসিল না। বেতন বাড়িল না।

কংগ্রেসী দালাল মানিক রাম শ্রমিকদের আর বুঝাইয়া রাখিতে না পারিয়া সেদিন বলার চেষ্টা করিল—গঙ্গাজল মাথায় দিয়া তামা তুলসীরামায়ণ ছুঁইয়া বলিতেছি দালাল আমি নই। শুধু আমার পকেটে কিছু কিছু দিয়া দাও—দেখ, তোমাদের দাবি পাওয়াইয়া দিব।

কিন্তু তাহাতেও ঠেকান যায় না। কংগ্রেসী শ্রমিকেরাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত দাবি তুলিলেন: ঝাড়ু ব্রুশ বন্ধ করো। তাঁহারা লালঝাণ্ডার দিকে ঝুঁকিতে লাগিলেন।

তখন দেবেন সেনের লোকেরা বলিতে বাধ্য হইলেন—তাহারাও লড়াই করিবেন। মিটিঙে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত হইবে।

২রা সেপ্টেম্বর মিটিং ডাকা হইল। দালালদের শ্রমিকেরা চিনিয়া ফেলিয়াছে, লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের ছাড়া লড়াই হয় না, ইহা বুঝিয়াছে। তাই দালালদের মিটিঙে লোক হইবে না এ আশঙ্কা ছিল। শ্রমিকেরা লালঝাণ্ডার সহিত ঐক্য চাহিতেছিলেন। ইহাতে ধোঁকা দিয়া দেবেন সেনের লোকেরা মিথ্যা করিয়া প্রচার করেন—লালঝাণ্ডার সঙ্গে একত্রে সভা হইবে।

২রা সেপ্টেম্বর অনেক শ্রমিক শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গিয়া হাজির হন। কিন্তু দেখা গেল, লালঝাণ্ডার নাম করিয়া সভা ডাকা হইলেও লালঝাণ্ডাকে ডাকা হয় নাই। শুধু দেবেন সেন কংগ্রেসী ঝাণ্ডা লইয়া হাজির রহিয়াছেন।

শ্রমিকেরা বোঝেন—দেবেনবাবু শুধু মুখেই লড়াইয়ের কথা বলিতেছে তাই তাঁহারা জবাব দাবি করার চেষ্টা করেন, লড়াই করিব বলিতেছে, বলো দেখি কবে লড়াই হইবে?

জবাব দিতে বাধ্য হওয়ার ভয়ে দেবেনবাবু আর সভা করেন না। তাড়াতাড়ি বলেন, মিছিল বাহির করো।

মিছিলে কর্পোরেশনের সাধারণ এবং কংগ্রেসী শ্রমিকেরাও নিজেরাই লালঝাণ্ডার দাবি এবং ধ্বনি দিতে থাকেন।

ইহারই একটি ছবি স্টেট্‌সম্যান খবরের কাগজে বাহির হয়। বোঝাইবার চেষ্টা হয় যে কর্পোরেশন শ্রমিকেরা কংগ্রেসের অনুগতই আছেন।

কিন্তু কর্পোরেশনের সাধারণ শ্রমিক, লালঝাণ্ডা শ্রমিক এবং কংগ্রেসী শ্রমিক নীচের তলা হইতে যে ঐক্য গড়িয়া তুলিতেছেন এইভাবে তাহাকে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়। ২৫ বৎসর ধরিয়া শ্রমিকেরা কংগ্রেসকে চিনিয়াছেন।

তাই কয়েকদিন পরে মনুমেণ্টে লালঝাণ্ডা যে সভা ডাকে তাহাতে ৩ হাজার কর্পোরেশন শ্রমিক ও পটারী শ্রমিক জমায়েত হইয়া যান।

সভাপতি জাকীর হোসেন বলেন, "আমরা পেটভর খানা, আর পরার কাপড় চাই। আমাদের দাবী সাচ্চা। সরকার যতই গুলি চালান সাধ্য নাই আমাদের রোখে।"

পটারী মজদুর শিয়ারাম ঘোষণা করেন: "আমরা তিন ঘণ্টা লড়িয়াছিলাম। পুলিসের এমন সাধ্য ছিল না যে মজুরকে মারিয়া হটাইয়া দেয়। ইহার পর তিনমাস হইয়া গেল। মালিকের এত শক্তি নেই যে কারখানা চালু করে।"

সভা শেষে একটি বিরাট মিছিল কর্পোরেশন অফিসে গিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

কর্পোরেশনের শ্রমিকেরাও কম লড়েন নাই। গত বৎসর টালা জলকলের লালঝাণ্ডা শ্রমিকরা যে লড়াই করেন, তাহার ভয়ে সরকার আজও কাঁপিতেছে। এক বৎসর যাবৎ সেখানে পুলিস কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বসিয়াছে। দলে দলে মজুরদের ছাঁটাই করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের মনোবল ভাঙা যায় নাই।

আজ শুধু টালা শ্রমিকদের মধ্যেই নয়, সমস্ত ২০,০০০ শ্রমিক কর্ম্মচারীর মধ্যে নূতন সংগ্রামের জোয়ার শুরু হইয়াগিয়াছে।

চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি

ধর্ম্মঘটী ধাঙ্গড়দের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম

ম্যাজিস্ট্রেটের উচিৎ শিক্ষা

গত ১৭ই আগস্ট হইতে চুচুড়ার মিউনিসিপ্যালিটির প্রায় ৩শত ধাঙ্গর ও মেথর ১২ দিন পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির দাবীতে ধর্ম্মঘট করেন।

মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ধাঙ্গরদের দাবীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার ফলে এই ধর্ম্মঘট সুরু হয়।

ধর্ম্মঘটের অষ্টম দিবসে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটি বাতিল করিয়া দিয়া নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

তিনি দুইজন নেতাসহ ৪৮ জন ধাঙ্গর ধর্ম্মঘটীর বিরুদ্ধে তাহাদের এই বেতন বৃদ্ধি দাবীর অপরাধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন।

ইহার ফলে ধর্ম্মঘটী ধাঙ্গরদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গত ৩০শে আগস্ট কোর্টে যে দিন এই ৪৮ জন ধাঙ্গরকে হাজির করা হয় সেদিন সমগ্র কোর্ট প্রাঙ্গণ ধর্ম্মঘটী পুরুষ ও মেয়ে ধাঙ্গর ও তাঁদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ের ভীড়ে ভরিয়া যায়। তাঁহারা ইহাদের মুক্তি দাবী করিতে থাকেন।

এই ৪৮ জন ধর্ম্মঘটীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু জামিনদার কেহ না থাকার ফলে তাঁহাদের হাজতে চালান দিবার ব্যবস্থা হয়। যখন ইহাদের হাতে হাত কড়া লাগাইয়া কোর্ট হইতে হাজতে পাঠাইবার চেষ্টা চলিতে থাকে তখন বিক্ষুব্ধ ধাঙ্গরেরা পুলিস ভ্যানকে রুখিয়া দিয়া তাহার সামনে বসিয়া পড়েন। বন্দী ধাঙ্গরের হাতে হাতকড়া পড়িতে অস্বীকার করেন। বন্দুক, টিয়ার গ্যাসে সজ্জিত পুলিসবাহিনীকে সঙ্গে নিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জীপে করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

ইহাতে ধর্ম্মঘটী ধাঙ্গরদের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়ে। তাঁহারা বিষ্ঠাপূর্ণ বালতি নিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের জীপের সামনে নিক্ষেপ করেন। বেগতিক দেখিয়া প্রত্যেকটি বন্দী ধাঙ্গরের সঙ্গে দুইজন সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করিয়া হাজতে লইতে হয়। বন্দীদের হাতকড়া লাগাইতে পুলিস সক্ষম হয় না।

মজিল

করাচীর চিঠি

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

শোচনীয় তাহা বর্ণনা করাও কঠিন। তাহাদের আন্দোলনের ফলে একটি ভূমি-সংস্কার কমিটি নিয়োজিত হইয়াছিল। ঐ কমিটি যে সামান্য সংস্কারের সুপারিশ করিয়াছেন, লীগ সরকার তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তাহাদের জবাব হইয়াছে: জমিদারী জায়গীরদারীপ্রথা কায়েম থাকিবে। সীমান্তে, পশ্চিম পাঞ্জাবে ও বেলুচিস্তানে একই নীতি চলিতেছে।

কিন্তু ঠিক সেই পুরানো মধ্যযুগীয় জমিদারি জায়গীরদারিপ্রথা কায়েম রাখা বিষম কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লিয়াকত সরকার এক গুরুতর উভয় সমস্যায় পড়িয়াছেন। প্রথমতঃ মার্কিন পুঁজিবাদীরা দাবি করিতেছে মার্কিন সাহায্য পাইতে হইলে জমিদারি-জায়গীরদারীর রূপান্তর করিয়া কৃষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। পাকিস্তানকে ট্রুম্যান সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে চায়। সে হিসাবেও যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা একেবারে সেকেলে থাকিলে খুব অসুবিধা। তাই মার্কিন সরকার দাবি করিয়াছেন, উন্নত ধনতান্ত্রিক উপায়ে কৃষি কার্য্য করিতে হইবে তাহার জন্য মার্কিন ডলার দেওয়া হইবে; পাকিস্তানের কৃষিক্ষেত্রে মার্কিন ডলার মূলধন খাটিবে—ইহাই মার্কিন দাবী। ইহাতে পাকিস্তানের ধনিকেরাও খুশী। কিন্তু কতক পীর, জমিদার, জায়গীরদার লইয়া মুশকিল হইয়াছে; তাহারা সাবেক প্রথার কিছুমাত্র চেহারা বদলেরও বিরোধিতা করিতেছে।

ধনীদের হাতে জমি

এই উভয় সঙ্কটের সমাধানের জন্য এবং শোষিত জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার জন্য সরকার প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করার কথা বলিতেছেন। করাচিতে এইরূপ একটি প্রজাস্বত্ব-সংশোধন বিল উপস্থিত করা হইয়াছে।

বিলটি চাষীর বিরুদ্ধে একটি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। খোদ চাষীদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য জমিদারদের এই বিলে অফুরন্ত সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। জমিদার-জায়গীরদার ধনী চাষীরা পুরাদমে হারিদের উচ্ছেদ করিয়া জমি খাস করিতেছে। অপরদিকে হারিদিগকে জমিতে মৌরশী (hereditary) স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। একাদিক্রমে তিন বছর একই জমি দখল না করিলে জমিতে হারির কোন স্বত্ব হইবে না—ইহাই এই বিলের বিধান। ধনী কৃষক বা জমিদারেরা একাদিক্রমে তিন বছর কোন জমিই হারিদের হাতে চাষের জন্য দিতেছে না। সমস্ত আবাদী জমি এইভাবে মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে—হারিগণ সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হইতেছেন। **এইভাবে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিতে ধনিকদের পুঁজি, বিশেষতঃ মার্কিন ডলার খাটাইবার ও সমস্ত বাটাইদার ও চাষীর জমি কাড়িয়া লইবার চক্রান্ত হইতেছে।**

লীগ সরকারের পক্ষে ইহার ফল একেবারে মারাত্মক হইয়াছে। গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে সাড়ে তিন কোটি অধিবাসীর মধ্যে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও বাটাইদার (ভাগচাষী) এবং গরীব চাষীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৯০ জন। জমি ও আজাদী লাভের আশায় প্রতারিত হইয়া ইহাদের মধ্যে তীব্রতম বিক্ষোভের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ-বিদ্বেষ চরমে উঠিয়াছে। বৃটিশ লাট ও বড়ো অফিসারদের তাহারা দূর করিয়া দিতে চাহিতেছে। প্রদেশে ও কেন্দ্রে তাহারা নূতন গবর্নমেণ্ট দাবি করিতেছে; জমি ও বাঁচার মতো মজুরির জন্য ব্যাপক লড়াই সুরু করিয়াছে।

চাষীর লড়াই সবচেয়ে জোরদার হইয়াছে সীমান্ত প্রদেশে—পেশোয়ার ও হাজারা জিলায়। ৩০০০০ বাটাইদার গত ফসলের সময়ে জমিদারদের বাটাই দেয় নাই। পুলিস প্রথমে শতখানেক চাষীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু চাষীগণ তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন না। লীগ সরকার তখন গরীব মুসলিম কৃষকের বিরুদ্ধে জমিদার-জায়গীরদারের হুকুমে সশস্ত্র পুলিস ও ট্যাংকসহ মিলিটারী পাঠায়। তাহারা ৩০০ চাষীকে গ্রেপ্তার করে, অগণিত চাষী পরিবারকে জোর করিয়া ভিটা হইতে উৎখাত করে। চাষীরা গা-ঢাকা দিলে মুসলিম জেনানার মধ্যে ঢুকিয়া পাকিস্তানী সিপাহীরা নারীদের অপমান করে। চাষীদের ধরিয়া আনিয়া অকথ্যভাবে মারপিট করে, এবং পাঠানদের কাছে যে অপমানের চেয়ে মৃত্যুও ভাল, সেইভাবে অপমান করে—চাষীদের উলঙ্গ করিয়া ঘোরানো হয়। কিন্তু তাহাতেও ফল হয় নাই। হাজারা জেলাতেও ১৫০ চাষী গ্রেপ্তার করার পরও কেহ বাটাই দেয় নাই। বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ ও অন্যান্য জেলাতেও আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছে।

* * *

এই ভাবেই মজুর চাষীর মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযান চলিয়াছে। ধনিকশ্রেণীর ও লীগ সরকারের আক্রমণ তাহাদের এই লড়াইয়ের সংকল্পকে দৃঢ়তর করিতেছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা অগ্রণী তাহারা ধনিক-রাজ খতম করিয়া মজুর-চাষীর রাজ কায়েম করার চিন্তা করিতেছে। সোভিয়েটের কাহিনী তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেছে। বস্তুতঃ সোভিয়েটের প্রতি জনতার সশ্রদ্ধ সমর্থন আজ যত স্পষ্ট ও জোরালো হইয়াছে, পূর্ব্বে কখনও তেমন ছিল না। লাহোরে সোভিয়েট-পাক মৈত্রী সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে।

জন-জাগরণের এই দুকূল-প্লাবী জোয়ারে পাকিস্তানের বনিয়াদ কাঁপিতেছে। লিয়াকত আলি সরকার তাহার পুরানো চালের দ্বারা জনতার বিক্ষোভকে আর প্রশমিত করিতে পারিতেছে না। তাই বৃটিশ লাট-বিতাড়ণ, তাই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে পাঞ্জাবের সাধারণ নির্ব্বাচনের ঘোষণা, তাই গোলাম মহম্মদের মুখে কৃষি-বিপ্লবের আওয়াজ।

এইভাবে দায়ে পড়িয়াই জনতাকে বিভ্রান্ত করিবার মতলবে পাকিস্তান লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন: বিনা খেসারতে জায়গীরদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই। আসলে পাকিস্তান সরকার যাহা চাহিতেছেন তাহা হইতেছে জনগণের উপর নষ্ট-প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থে জমিদারী জায়গীরদারির চেহারা বদলাইয়া কৃষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্য সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধ-ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু লিয়াকত-সরকারের সকল স্বপ্ন চুরমার হইবে। লীগ শাসনের লৌহ-পর্দ্দার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনতা নিজেদের রক্তের স্বাক্ষরে এক নূতন ইতিহাস তৈয়ার করিতেছে। শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে জনতার গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে জয়যাত্রা রুখিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই।

মার্কিন-তাঁবেদার টিটো

(১০ম পৃষ্ঠায় পর)

পারে না। রোজই অন্যান্য বন্দীদের দেখিয়ে কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। যাতে বন্দীরা কোন 'গণ্ডগোল' করার সাহস না পায়।

র‍্যাংকোভিকের নির্দ্দেশে তার গুপ্ত পুলিস যে কত যুগোস্লাভ কমিউনিস্টকে হত্যা করেছে তার কোন হিসাব করাও অসম্ভব।

যুগোস্লাভবাসী সোভিয়েট নাগরিকদের পর্য্যন্ত বিনা বিচারে বন্দী করা হচ্ছে এবং তাদের কাছ থেকে সোভিয়েট বিরোধী বিবৃতি আদায় করার জন্য অমানুষিক নির্য্যাতন চালান হচ্ছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মুসোলিনি যে ভূমিকা অভিনয় করেছিল, দেশদ্রোহী টিটোও আজ দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইওরোপে সেই ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মুসোলিনির শেষ পরিণতি যা হয়েছিল, টিটোরও তাই হতে বাধ্য। মার্কিন প্রভুদের আঁচলে-আশ্রয় র‍্যাংকোভিকের পুলিস বাহিনী কোন কিছুই জনতার রোষবহ্নি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যুগোস্লাভিয়ার প্রকৃত দেশভক্তদের টিটোবিরোধী সংগ্রামে, দুনিয়ার গণতান্ত্রিক শিবিরে টিটোর প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান ঘৃণার তারই প্রতিশ্রুতি।

নিজে পড়ুন ও অন্যকে পড়ান

লালঝাণ্ডা শ্রমিকের জয়যাত্রা—দাম চার আনা।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৩তম অধিবেশন সম্প্রতি বম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই পুস্তিকাখানি তারই কার্য্যবিবরণী। আজ পুঁজিবাদী শ্রেণী ও তার সরকার শ্রমিকশ্রেণীর উপর চরম অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। ভারতের জঙ্গী শ্রমিক সমস্ত শিল্প কারখানায় মালিক শ্রেণী ও তার সরকারের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গী লড়াই চরম বৈপ্লবিক পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে।

বাংলার চটকলে মজুরি ও মুনাফা—দাম দুই আনা।

বাংলাদেশে বৃটিশ পুঁজির প্রধান ঘাঁটি হোল চটকল, দেশী পুঁজিরও একটা অংশ এই শিল্পে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর সব চেয়ে বড় অংশ এই শিল্পেই কাজ করে। নির্ম্মম শোষণ, অসহনীয় দারিদ্র্য এবং মালিকদের বর্ব্বরোচিত ব্যবহার—এই ছিল এতদিন বাংলার চটকল শ্রমিকদের অবস্থা। এদের শ্রম থেকেই বিলাতী মালিকদের ও দেশী মালিকদের মুনাফার পাহাড় জমত, এর উপর এবার চটকল শ্রমিকদের উপর নতুন আক্রমণ এসেছে। জঙ্গী চটকল শ্রমিক এই অসহনীয় শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বর্ম্মার গণ-অভ্যুত্থান—

দাম দশ পয়সা।

ভারত ডমিনিয়নের নেহরু সরকার ও পাকিস্তান ডমিনিয়নের লিয়াকত সরকার, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে "নিরপেক্ষতা" ও "তৃতীয়" শক্তির ভাঁওতা দিয়ে বেড়ায়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে নেহরু ও লিয়াকত সরকার, ভারত ও পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিতে পরিণত করেছে, বর্ম্মার বিপ্লবী জনশক্তি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে থাকিন-নু সরকারকে উচ্ছেদ করছে, বর্ম্মার এই বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, ভারতের ও পাকিস্তানের সরকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী লেবর সরকারকে, সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহ করছে, এই চক্রান্তের প্রকৃত রূপ এই পুস্তিকাখানিতে তুলে ধরা হয়েছে, বিপ্লবী গণশক্তির আঘাতে দুনিয়ার পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

পটারীতে লালঝাণ্ডা ও কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিকদের ঐক্য গঠন ও প্রতিরোধ

পটারী কারখানায় শ্রমিকদের সংগ্রামে নূতন জোয়ার আসিয়াছে। লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিকদের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং জঙ্গী প্রতিরোধ জারি করিতেছেন।

শ্রমিকদের মিলিত প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্য গত ২রা সেপ্টেম্বর পুলিস গুলি চালায়। গুলিতে কেহ হতাহত হন নাই।

পয়লা সেপ্টেম্বরের পর হইতে পটারী শ্রমিকরা নূতন সংগ্রামী প্রতিভার পরিচয় দিতে সুরু করিয়াছেন। এই দিন ৭৫জন শ্রমিকের জঙ্গী সভায় নূতন স্টাইক কমিটি ও ভলাণ্টিয়ার কমিটি গঠিত হয়। স্থির হয় যে সকল শ্রমিক এখনো অমিয় দাশগুপ্তের প্রভাবে রহিয়াছেন তাঁহাদের টানিয়া আনিয়া জঙ্গী ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ইহার পর হইতে সমস্ত এলাকায় দারুণ সাড়া পড়িয়া যায়। অমিয় দাশগুপ্তের প্রভাবাধীন ছেলেরা অমিয় বাবুর কথা অগ্রাহ্য করিয়াই প্রতিরোধ সংগ্রামে নামেন। লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের সাহত একত্রে একজন দালালকে শাস্তি দেন।

ঐ দিনই কংগ্রেসের প্রভাবাধীন ২০০ শ্রমিক জঙ্গী মিছিল বাহির করেন। অমিয় দাশগুপ্তের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াই তাঁহারা পুলিসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পুলিসের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। শ্রমিকেরাও লালঝাণ্ডা স্লোগানে সাড়া দেন।

২রা সেপ্টেম্বর কামারডাঙ্গার কংগ্রেসী প্রভাবিত ছেলেরা লালঝাণ্ডার সহিত একত্রে আগাইয়া গিয়া একটি দালালকে প্রতিরোধ করেন। পুলিস গুলি চালায়। ইহার পর হইতে সংগ্রাম উত্তরোত্তর আগাইয়া চলিয়াছে। ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জী পর পর দুই দিন সভা করার কথা ঘোষণা করিয়াও এখনো সভা করার ভরসা পান নাই।

৯ই সেপ্টেম্বর লছমী গুণ্ডার নেতৃত্বে দালালবাহিনী প্রচুর দলবল লইয়া কারখানায় ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিকদের প্রতিরোধে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সংঘর্ষে দুইটি বোমা ফাটে বলিয়া জানা যায়।

* * *

পটারীর পার্শ্ববর্ত্তী কারখানা ম্যাকফারলন শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ সুরু হইয়াছে। দুই মাসের বোনাস, ছুটি এবং ধৃত নেতা গণপৎ মুরদ-এর কাজের দাবীতে গত ৮ই সেপ্টেম্বর একদল শ্রমিক প্রতিনিধি ম্যানেজারের সহিত মোকাবিলা করেন।

এই কারখানায় কিছুদিন পূর্ব্বে ৪ জনকে কাজ নাই অজুহাতে ছাঁটাই করা হয়। তাহারা দাবি করেন সকলকে কাজ দিতে হইবে এবং ছাঁটাই চলিবে না, ম্যানেজার কোন প্রতিশ্রুতি দেন না। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে।

বাহাদুর পটারী শ্রমিকদের সংগ্রামে সাহায্য করুন

বাংলার শ্রমিক ভাইসব, পটারী শ্রমিকেরা যে লড়াই চালাইতেছেন তাহা আপনাদেরও লড়াই। এই লড়াইকে সাহায্য করুন। অপরাজেয় পটারী শ্রমিককে সাহায্য করিয়া আপনারাও অপরাজেয় হইয়া উঠুন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—
পটারী সংগ্রাম কমিটি
২৪৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট

কাটোয়া দাঁইহাটে

তোলা বন্ধের আন্দোলন

কাটোয়া থানার দাঁইহাট হাটের বে-আইনী তোলা আদায় বন্ধের জন্য ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীরা আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছেন।

গত ৯ই আগস্টে ৮।১০খানি গ্রামের ৭।৮ শত ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীরা দাঁইহাট হাটের বে-আইনী তোলা আদায় বন্ধের দাবীতে একটি শোভাযাত্রা লইয়া আসেন। ঢাক বাজাইয়া, "লালঝাণ্ডা কি জয়," "হাটের বে-আইনী তোলা বন্ধ কর" "জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর," "কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কর," "নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভার ধ্বংস চাই" প্রভৃতি স্লোগান দিতে দিতে যখন শোভাযাত্রাটি দাঁইহাটের মধ্যে প্রবেশ করে তখন হাটে সমবেত কৃষক ও জনসাধারণ আগাইয়া আসিয়া তাহাদের হাটের মধ্যে লইয়া যান। হাটতলাতে তখন এক সভা হয়—সেই সভায় কৃষক নেতারা বক্তৃতা দেন। এই অঞ্চলের কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণকে সংঘবদ্ধভাবে হাটতোলার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানে জনতার মধ্য হইতে প্রচুর সাড়া পাওয়া যায়। সভায় উপস্থিত কৃষকেরা ঘোষণা করেন যে, আগামী হাট হইতে তাঁহারা আর তোলা দেবেন না। সভার শেষে আবার শোভাযাত্রা বাহির হয়।

ঢাকায় ৬৫ জন রাজবন্দীর তৃতীয়বার অনশন

রংপুর-রাজশাহী জেলে দীর্ঘ অনশনে বন্দীদের অবস্থা আশঙ্কাজনক

বিক্ষুব্ধ জনমতের নেতৃত্বে বিভিন্ন গণ-সংগঠনের ডাক

সংবাদ পাওয়া গেল যে, ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলের ৬৫ জন রাজবন্দী কর্তৃপক্ষের অসহ্য ব্যবহারের প্রতিবাদে এবং রাজবন্দীর ন্যায্য মর্য্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার দাবিতে গত ৫ই সেপ্টেম্বর অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন।

এই তৃতীয়বার অনশন ধর্ম্মঘট

ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা আরও দুইবার অনশন ধর্ম্মঘট করেন। দুইবারই সরকারী প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অনশন শেষ হয়; কিন্তু, কর্তৃপক্ষ দুইবারই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। রাজবন্দীরা তাই এই তৃতীয়বার জান-কবুল অনশন ধর্ম্মঘট লড়াইয়ের পথে জনমতের সহযোগিতায় দাবি আদায় করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

বন্দীদের দাবি হইল : রাজবন্দীদের সাধারণ কয়েদী হইতে আলাদা করিয়া সব একত্রে রাখিতে হইবে; আলাদা রান্না ও মেসিং-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে; সরকারী খরচে জলখাবার, দৈনিক পত্রিকা, তেল, মাখন ইত্যাদি দিতে হইবে। এমনই সাধারণ দাবির জন্য বন্দীরা এই তৃতীয়বার অনশন করিতে বাধ্য হইলেন।

রংপুর ও রাজশাহী জেলে অনশন দেড় মাস পার হইল

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রংপুর ও রাজশাহী জেলেও রাজবন্দীরা যথাক্রমে এক মাস ও দেড় মাস যাবৎ অনশন ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন। তাঁহাদের অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। কেহ কেহ যক্ষ্মা, আলসার ইত্যাদি ভয়ানক রোগ লইয়াও অনশন চালাইতেছেন।

রংপুর ও রাজশাহীতেও নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা প্রতিশ্রুতি খেলাপ করিয়া বন্দীদের অনশন করিতে বাধ্য করিয়াছে। সেখানেও ঐ একই দাবী লইয়া বন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন।

রংপুর, রাজশাহীর সহিত ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দীদের অনশনের সংবাদে সারা পূর্ব্ববঙ্গের গণতন্ত্রী জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে এবং বন্দীদের দাবীর সমর্থনে জনমত জাগিয়া উঠিয়াছে। ই-বি রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পূর্ব্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা সমিতি বন্দীদের দাবীর সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছেন।

তাঁহারা আহ্বান জানাইয়াছেন—সর্ব্বত্র সভা-মিছিল ও হরতাল করিয়া শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণ রাজবন্দীদের দাবী মানিবার জন্য লীগ সরকারকে বাধ্য করিবে।

আলীপুর জেলে রাজবন্দীরা আবার অনশনের মুখে

আলিপুর জেলে বিচারাধীন রাজবন্দীদের আবার অনশন ধর্ম্মঘটের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ যে, আলিপুর জেলের ২০০ বিচারাধীন রাজবন্দীদের মধ্যে ১০০ অনশন ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর বাকী ১০০ জনও শীঘ্রই এই অনশন ধর্ম্মঘটে যোগ দিবেন।

এই সমস্ত বন্দীদের অধিকাংশই শ্রমিক এবং কৃষক। দীর্ঘদিন ধরিয়া ইঁহাদের বিচারাধীন হিসাবে ঝুলাইয়া রাখা হইতেছে—কবে যে ইঁহাদের বিচার হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। ইঁহাদের সকলকেই তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে।

জুন মাসে বাংলার বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের অনশন ভঙ্গের সময় বিধান-মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, সমস্ত বিচারাধীন রাজবন্দীদেরই উচ্চশ্রেণীভুক্ত করা হইবে। কিন্তু দুইমাস কাটিয়া গেলো, এখন পর্য্যন্তও সেই প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরী করার কোনরূপ ব্যবস্থা হইতেছে না—নানারকম অজুহাত দেখাইয়া বন্দীদের তৃতীয়শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে।

ইহার-ই প্রতিবাদে আলিপুর জেলের বিচারাধীন রাজবন্দীরা আবার অনশন সুরু করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলেও অনুরূপ ব্যবস্থা। সেখানে ২৭০ জন বিচারাধীন বন্দীর মধ্যে মাত্র ৪৮ জনকে দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, আর সকলকেই তৃতীয়-শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে। এ জেলে সাধারণ কয়েদীদের দিয়া রাজবন্দীদের উপর মারপিটের ব্যবস্থাও জেল কর্তৃপক্ষ করিয়াছে। অন্যান্য জেলেরও একই অবস্থা। নলিনী-বিধান সরকারের কারাগারে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আজ অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত হইতেছেন।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত

মঞ্জিল

বিশেষ রেল সংখ্যা] ১৪ই সেপ্টেম্বর '৪৯ : ২৮শে ভাদ্র '৫৬ [ছয় পয়সা

'জাতীয় সম্পত্তির' ধোঁকা দিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা শিকারের পাকা বন্দোবস্ত

সরকারী রেল বোর্ডের আসল স্বরূপ

শ্রমিক, যাত্রী ও জনসাধারণকে দোহনের বিজাতীয় চক্রান্ত

গবর্নমেণ্ট ও তাদের জোহুকুম রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের নেতারা অনবরত প্রচার করেন যে, ভারতের রেলপথ জাতীয় সম্পত্তি, কোন মুনাফার স্বার্থে তা পরিচালিত হয় না। সুতরাং রেল শ্রমিকেরা কোন লড়াই বা ধর্মঘট করলে তা হবে সমস্ত জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে। দেশের লোককে ধোঁকা দিয়ে রেল ব্যবসায় মুনাফাখোরী পাকাপোক্ত করাই এই প্রচারের উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের রেলওয়ে ব্যবস্থার গোড়ার কথাই হ'ল লুঠ ও শোষণ। এই উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে রেল বসিয়েছিল। তাদের মতলব ছিল দুটি—প্রথমতঃ, বৃটিশ পুঁজির জন্য যত বেশী সম্ভব মুনাফা কামানো এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতে বৃটিশ শাসন পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করা। যাতায়াতের সুব্যবস্থা না হ'লে তাদের পক্ষে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সৈন্য পাঠিয়ে দেশের মুক্তি আন্দোলন দমন করা সম্ভব নয়। রেলপথের বিস্তার ছাড়া ভারতের কাঁচামাল লুণ্ঠন বা বিলাতি মালে এদেশের বাজার ছেয়ে ফেলাও যায় না। আর এত বড় দেশে রেলপথ খোলা মানেই তো মুনাফার পুরা গ্যারাণ্টি সহ বিদেশী পুঁজি খাটানোর বিরাট সুবিধা! তাই সাম্রাজ্যবাদ এদেশে রেলপথ বসালো।

এই রেল ব্যবসার মারফৎ তারা এত খোলাখুলি নির্লজ্জভাবে লুণ্ঠন চালিয়েছে যে, ভারত সরকারের একজন ঝানু রাজস্ব সচিব মিঃ ম্যাসি পর্য্যন্ত ১৮৭২ সালে পার্লামেণ্টারী কমিটির সামনে বলতে বাধ্য হয়েছেন; "আমার ধারণা, এ পর্য্যন্ত যত কাজে হাত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রেলওয়েতেই অপব্যয়ের চূড়ান্ত হয়েছে।" ১৫ই আগস্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ইউনিয়ন জ্যাক মার্কা বিলাতি রেলব্যবসায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা মার্কা খাঁটি জাতীয় রেল ব্যবসায় পরিণত

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি ও মালিকশ্রেণীর দালাল জয়প্রকাশকে চিনিয়া রাখুন

উপরের ছবিখানায় জয়প্রকাশ নারায়ণকে দেখিতে পাইতেছেন? দুই সারির মাঝখানে অত্যন্ত 'কৃতার্থ' হইয়াছেন এই ভাবে যে ভদ্রলোকটি দাঁড়াইয়া আছেন তিনিই দক্ষিণপন্থী সোস্তালিস্টদের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ।

কলিকাতার একটি সান্ধ্য-মজলিসের খানাপিনার পর জয়প্রকাশজীকে কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিতে দেখা যাইতেছে।

জয়প্রকাশজী এত হাসি হাসি মুখ লইয়া কাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন?

(১) কলিকাতাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল মিঃ বেরী। 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক' মারফৎ মার্কিন মূলধন খাটাইয়া ভারতের রেল ও জমি দখল করার ষড়যন্ত্র যখন পাকিয়া উঠিয়াছে তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেই ধুরন্ধর প্রতিনিধির সম্পর্কে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

(২) মিঃ ওয়াকার—বিলাতী পুঁজিবাদীদের পালের গোদা। ভারতীয় চটকল মালিক সমিতির সভাপতি। এই মিঃ ওয়াকারের নেতৃত্বে চটকল মালিকেরা সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় ৩ লক্ষ চটকল মজুরের শতকরা ১২॥ ভাগকে ছাঁটাই করিয়াছেন, বাকী সকলের জন্য মাসে এক সপ্তাহ বেকারীর এবং উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, শ্রমিকদের পকেট কাটিয়া মাসে ২৪ লক্ষ টাকা বাড়তি মুনাফা লুটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কামারহাটিতে, বজবজে, শিবপুরে এবং সমস্ত চটকল এলাকায় যে লক্ষ লক্ষ চটকল মজুর এই ছাঁটাই এবং বেকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত। তাহারা এই খবর শুনিয়া কি বলিবেন?

(৩) মিঃ ডেট্র—কলিকাতাস্থ ফরাসী সরকারের কনসাল জেনারেল। ভিয়েৎ-নামের যে বিপ্লবী জনসাধারণ খাস ফরাসী দেশের লক্ষ লক্ষ মজুর-কৃষক সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী সরকারের উচ্ছেদ এবং ধ্বংসের জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করিতেছেন, ফ্রান্সের সেই ঘৃণ্য দক্ষিণপন্থী সোস্তালিস্ট সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধির সহিত জয়প্রকাশজীর কি এত দহরম-মহরম?

(৪) স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি—মার্টিন, বার্ন, কুলটি প্রভৃতি কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কোটিপতি

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

দিনের বেলায় কণ্ঠীধারী বোষ্টম, রাতে পেখম-তোলা বেগম

জয়প্রকাশের গোপন আসর.

মুনাফাশিকারই ভারতীয় রেলপথ পরিচালনার মূলমন্ত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে, কিন্তু লুণ্ঠন ও শোষণ অব্যাহতই থেকে গেছে, এমন কি তার ধরনটি পর্য্যন্ত এক চুল বদলায়নি।

আমাদের জাতীয় ধনিকশ্রেণীর এই জাতীয় রেল ব্যবসায় কিভাবে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন খাতে অসম্ভব রকম মুনাফা কমানো হচ্ছে তার কয়েকটা উদাহরণ নীচে দিচ্ছিঃ

ভারতের রেলপথে মোট লগ্নী পুঁজি বা মূলধনের পরিমাণ ৮০৭ কোটি টাকা। এই মোট টাকার একটা বড় অংশ ফাঁপানো মূলধন, অর্থাৎ হিসেবের নানা-রকম জোচ্চুরি করে যাকে বাড়ানো হয়েছে। রেল তৈরী, লাইন বসানো প্রভৃতি বাবদ খরচা ছাড়াও ইংরেজ ঠিকাদারদের সমস্তরকম অপব্যয় ও লোকসানগুলিকেও ঐ মোট লগ্নী পুঁজির মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আসলে যে পুঁজি খাটানো হয়েছিল তার চেয়ে মোট লগ্নী বলে যে পুঁজি ধরা হয় তা' অনেক বেশী। তার মানে, পুঁজির যে মোটা অংশের আসলে কোন অস্তিত্ব নেই তার দরুণও বছর বছর সুদ গোণা হয়ে থাকে! বৃটিশ আমলের এই জোচ্চুরী আমাদের জাতীয় মালিকরাও দেওয়া হয়েছে মোট ৬৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট লগ্নী মূলধন ৮০৭ কোটি টাকার ৭৯॥ ভাগ। এর সঙ্গে ১৯২৩ সালের আগেকার হিসাব যোগ দিলে সুদের পরিমাণ দাঁড়াবে মোট লগ্নী মূলধনের কমপক্ষে দেড়গুণ। ফাঁপানো পুঁজির উপর দেড়গুণ সুদ উশুল হবার পরেও 'চুক্তি পবিত্রতা'র নাম করে মালিকরা বছর বছর ২৭ কোটি টাকা করে সুদ লুটছে। এবং একেই তারা নাম দিয়েছে মুনাফা-উদ্দেশ্য বর্জ্জিত জাতীয় সম্পত্তি!

সুদটা অবশ্য মুনাফার প্রধান অঙ্গ, কিন্তু একমাত্র অঙ্গ নয়, সুদ ছাড়াও নানা ছল নামে মুনাফা কমানোর ব্যবস্থা চলতি আছে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হ'লো ক্ষয়ক্ষতিপূরণ তহবিল। এই তহবিলে রেলমালিকরা প্রতি বছর গড়ে শত কোটি টাকা জমা রাখে, অথচ ক্ষতক্ষতিপূরণের জন্য খরচা হয় তার অনেক কম। আর যা খরচা হয় তার অধিকাংশই আবার মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমেরিকা ও কানাডা থেকে ইঞ্জিন কেনার কাহিনী। এই তহবিলের টাকা ভেঙ্গে মার্কিন প্রভুদের উপরে তারা নির্ভরশীল। যদি ভারতীয় অর্থনীতির গলায় ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোলামীর ফাঁস শক্ত হয়ে এঁটে না বসে তবে এই প্রভুরা ভারতীয় শিল্পের উপর মনোযোগ দেবেন কেন।

রেলে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব

এহেন অবস্থায় ভারতীয় মালিকরা বৃটেন ও আমেরিকা থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্বভাবতই পেতে পারে না এবং পাচ্ছেও না। ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের কাছে তারা ৮৬৩টি ইঞ্জিনের অর্ডার দিয়েছিল, কিন্তু পেয়েছে ১৬খানি ব্রডগেজ ও ৩৩খানি মিটার গেজ ইঞ্জিন এবং তাও আবার যুদ্ধপূর্ব্ব সময়কার চেয়ে ১৫গুণ বেশী দামে। সাম্রাজ্যবাদী মনিবদের সাহায্যে মিহিজামে ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা বসাবার চেষ্টাও এখন পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতির পর্য্যায়েই রয়ে গেছে।

একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে এইসব যন্ত্রপাতি পাওয়া সম্ভব। কারণ তাদের কোন মুনাফা-খোরী উদ্দেশ্য নেই এবং কোন দেশকে গোলামীর শৃঙ্খলেও তাঁরা বাঁধতে চায় না। কিন্তু, ভারত সরকার যোগ দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে। দুনিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার নীতির প্রধান অঙ্গ। তাই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধব্লকের লেজ ধরে তাকে চলতে হচ্ছে এবং আর ভারতের রেলপথকে চালাতে হচ্ছে ধনবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্ল্যান মাফিক।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বাদুরঝোলা

সুতরাং এই ব্যবস্থায় ভারতের রেল পথের উন্নতির কোন আশা নেই, যাত্রীর সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে, কিন্তু গাড়ী বাড়ছে না। যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার যেসব গাড়ী যুদ্ধের কাজে নিয়েছিল তাও এখন পর্য্যন্ত সব ফেরৎ দেয়নি।

রেলের প্রধান আয় হয় থার্ড ক্লাস যাত্রীদের কাছ থেকে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফার্ষ্ট ক্লাস সীট প্রতি আয় হয়েছে ১২৪০৲ আর থার্ড ক্লাসে সীট প্রতি ৮৪৭০৲। অথচ ফার্ষ্ট ক্লাস যাত্রীর জন্য যা খরচ করা হয় থার্ড ক্লাস যাত্রীর জন্য তার ১০ ভাগের ১ ভাগও খরচ করা হয় না। তার উপরে আবার নূতন সরকারী নিয়মে ইণ্টার ক্লাস তুলে দিয়ে ইণ্টার ক্লাস যাত্রীদের অধিকাংশকেই থার্ড ক্লাসে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। অথচ থার্ড ক্লাসের সীট বাড়েনি। অর্থাৎ এই বিধানে থার্ড ক্লাস যাত্রীকে ভাড়া দিতে হবে বেশী, কিন্তু জায়গা পাবে আরও কম।

ধনিকশ্রেণীর সুবিধা ও আরাম অবশ্য এই নূতন নিয়মে আরও বাড়বে। ব্যবসায়ীরা নামমাত্র ডেমারেজ দিয়ে মালগাড়ী-গুলিকেই গুদামেরমত ব্যবহার করে, গুদাম খরচ যাতে বাঁচাতে পারে তার ব্যবস্থা অটুট আছে। মোট হাজার কুড়ি কোচিং ইউনিটের মধ্যে জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য দেওয়া হয়েছে ১৪ হাজার আর বাকী ৬ হাজার গাড়ী রিজার্ভ রাখা হবে বড়লোকদের বিলাস ভ্রমণের জন্য। এবং সর্ব্বোপরি এই নূতন নিয়মে ১ম ও ২য় শ্রেণীর ভাড়া কমিয়ে বড়লোকদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করা হবে।

রেল চলাচল বাড়িয়াছে দর কমে না কেন?

এইভাবে গরীব থার্ড ক্লাস যাত্রীদের পকেট কেটে রেলের আসল মালিক বড়লোকদের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে।

মালিকরা বলে থাকে রেল চলাচল বাড়লে দেশের উন্নতি হবে, জিনিসপত্রের দাম কমবে ইত্যাদি। গত একবছর যাবৎ রেল চলাচল একটানাভাবে বেড়েই চলেছে, গত বাজেট বক্তৃতায় রেল মন্ত্রী এনিয়ে বিশেষ সন্তোষও প্রকাশ করেছেন। গত জুলাই মাসে শুধু জি-আই-পি ও বি-বি-সি-আই রেলে ব্রডগেজে আগের বছরের জুলাই মাসের তুলনায় মাল চলাচল বেড়েছে শতকরা ৫৩ ভাগ। স্বাভাবিক রেল চলাচল ছাড়াও শুধু জুলাই মাসে এই দুই রেল পথে ২৫০খানা স্পেশাল গাড়ী চলেছে। কিন্তু রেল চলাচলের এই বিরাট উন্নতিতে দাম কমেছে কতটা? আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আগের মাসের তুলনায় সারা ভারতে পাইকারী দরের মান শতকরা ২·১ ভাগ চড়েছে এবং শুধু বোম্বাইতে

গরীবের পকেট কাটিয়া বড়লোকের আরামের আয়োজন

সমানে চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই করে শ্রমিক ও জনসাধারণের পেট ও পকেট কেটে প্রতি বছর গড়ে ২৭ কোটি টাকা ঠগী মুনাফা-খোর বণ্ডহোল্ডারদের পেটে যাচ্ছে। যতবড় বিপর্য্যয়ই হোক না কেন এই মুনাফার গায়ে তারা আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগতে দিচ্ছে না। এবছর আর্থিক অনটনের দোহাই দিয়ে গবর্নমেণ্ট রেল ওয়ার্কশপের ৫০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করার প্ল্যান নিয়েছে, কিন্তু তাই বলে বণ্ডহোল্ডারদের মুনাফা কমেনি—কড়কড়ে ২০ কোটি টাকা সুদ তারা দেশের লোকের রক্ত নিংড়ে আদায় করেছে। ১৯৩০-৩৪ সালেও একবার বৃটিশ সরকার আর্থিক মন্দার দরুণ ১০ হাজার রেল শ্রমিককে ছাঁটাই করে বণ্ডহোল্ডারদের ২১ কোটি টাকা সুদ দিয়েছিল। আমাদের 'জাতীয় সম্পত্তি' ভারতীয় রেলপথের বর্ত্তমান মালিকরাও হুবহু একই কায়দায় চলছেন। সাধে পণ্ডিত নেহরু কমনওয়েলথ সম্মেলনে বৃটিশ ও ভারত সরকারের "আদর্শ ও কর্ম্ম-পন্থার অপূর্ব্ব ঐক্য" ঘোষণা করে এসেছেন!

সুদে আসলে

এযাবৎ কত সুদ দেওয়া হয়েছে? ১৯২৩-২৪ সালের আগেকার হিসাব পাবার উপায় নেই, রেলবোর্ডের হিসাব মতই বছরে গড়ে ২৭·৫৪ কোটি টাকা করে সুদ দেওয়া, হচ্ছে। এই হিসাব অনুসারে ১৯২৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত সুদ খুসী করার জন্য সেদেশ থেকে যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়কার চেয়ে ১৫ গুণ বেশী দামে কয়েকটা ইঞ্জিন কেনা হয়েছে! এই ভাবে হিসাবের কারচুপি করে তারা ১৯৪৯-৫০ সাল পর্য্যন্ত এই তহবিলে জমিয়াছে ৭৪·২৮ কোটি টাকা।

মুনাফার বহর

এইভাবে নানা কায়দা করে ভারতের রেল ব্যবসায় যে বিরাট মুনাফা লোটা হচ্ছে তার একটা হিসেব নীচে দিলাম।

১৯২৫ থেকে ১৯৪৯-৫০ সাল পর্য্যন্ত রেলের নীট লাভ হয়েছে ২৯৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। এর সঙ্গে যোগ দিন সুদ বাবদ দেওয়া ৬৪০ কোটি এবং ক্ষয়ক্ষতিপূরণ রিজার্ভ ৭৪·২৮ কোটি টাকা। তা'হলে গত ২৫ বছরের মোট মুনাফা দাঁড়ালো ১০০৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, অর্থাৎ বছরে প্রায় ৪০॥০ কোটি টাকা নীট মুনাফা!

এইভাবে বেপরওয়া মুনাফা শিকারই হলো ভারতবর্ষে রেলপথ পরিচালনার মূলমন্ত্র। তাই এদেশে রেলওয়ের কোন উন্নতি হচ্ছেনা, বরং বাদুর-ঝোলা যাত্রীদের কপালে লাঞ্ছনার মাত্রা প্রতিদিনই বাড়ছে।

ভারতের মালিকশ্রেণী ও তাদের প্রতি-নিধি কংগ্রেসী সরকার শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দয়ার

শ্রমিকদের উপর নির্লজ্জ শোষণ

এই জাতীয় রেল ব্যবসার সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে রেল শ্রমিকরা।

১৯২৯ সাল থেকে এখন পর্য্যন্ত তিনবার তাদের মজুরি কাটা হয়েছে। তার উপরে মূল্য বৃদ্ধির দরুণ তারা যে মজুরি পাচ্ছে তার আসল দামও প্রতিদিন কমে যাচ্ছে।

সরকারী হিসাবমতই শ্রমিকদের

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

মজিল

রেল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

রেল শ্রমিকের উপর ধনিক কংগ্রেস সরকারের আক্রমণ

রেল তদন্ত কমিটির রিপোর্টের অধিকাংশ সুপারিশই কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। সোস্যালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশন এবং সামরিক ফৌজের সাহায্যে ৯ই মার্চ্চের সাধারণ ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দেবার পর-ই কংগ্রেস সরকার তাহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কংগ্রেস সরকার এ কথা জানিতেন যে, যদি তাহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা আগে ঘোষণা করা হইত তবে রেল শ্রমিক কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়াই তাহাদের এই ঘোষণার জবাব দিতেন।

তদন্ত কমিটিতে কাহারা ছিলেন

রেল তদন্ত কমিটিতে ছিলেন পণ্ডিত-হৃদয়নাথ কুঞ্জরু (বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকারের ইনি একজন কড়া সমর্থক); সভাপতি, মহম্মদ ইয়াসিন খাঁ (ইনি একজন কোটিপতি); মিঃ জর্জ্জ কাফ বি-বি-সি-আই রেলের জেনারেল ম্যানেজার); জে-এ নন্দা (নিজাম স্টেট রেলের জেনারেল ম্যানেজার), মিঃ কে-রামা আয়ার (রেলওয়ে ফিনান্স কমিশনার), মিঃ এম এন, চক্রবর্ত্তী (নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের ট্রান্সপোর্টেশন অফিসার) এবং এস, গুরুস্বামী (অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক)।

অর্থাৎ মোটা মাহিনার রেল অফিসার এবং কংগ্রেস সরকারের এজেন্টদের লইয়া-ই তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ধনিক সরকার ও রেলওয়ে বোর্ড যে দায়িত্ব মিঃ এস, গুরুস্বামীর উপর দিয়াছিলেন তিনি তাহা পুরাপুরিভাবে পালন করিতে কোথাও কার্পণ্য করেন নাই; তাহাদের বিশ্বাস তিনি অটুট রাখিয়াছেন —রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের আন্দোলনের মধ্যে তিনি তাঁহাদের পঞ্চমবাহিনী হিসাবে-ই কাজ করিয়াছেন।

তদন্ত কমিটির কাজ

কমিটিকে কাজের যে দায়িত্ব দেওয়া হইল তাহার ভিতরও কোনরূপ ফাঁক রাখা হইল না। কি কি উপায়ে খরচ কমানো যায় কমিটিকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বলা হইল। এই খরচ কমানোর জন্যই প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক কর্ম্মচারী কত আছে তাহা ঠিক করার এবং তাহাদের কি ভাবে রেল সার্ভিসে নিযুক্ত রাখা যায় তাহার পথ বাহির করার দায়িত্বও কমিটির উপর দেওয়া হইল। শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট, তাহাদের দুঃসহ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার কোন কাজই কমিটির দায়িত্বের মধ্যে পড়িল না। ইহার কারণ কমিটির মূল লক্ষ্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। শ্রমিকদের আরো বেশী করিয়া শোষণ করার এবং কম সংখ্যক শ্রমিক খাটাইয়া বেশি কাজ আদায় করার ফন্দি বাহির করাই হইল এই কমিটির মূল লক্ষ্য।

কংগ্রেস সরকারের বিশ্বস্ত এজেন্ট হিসাবে কমিটির সভ্যরা সুপারিশ করিয়াছেন যে, খরচ কমানোর জন্য শ্রমিকদের মাথাপিছু কাজের চাপ বাড়াইতে হইবে, কম সংখ্যক লোক দিয়া বেশি কাজ আদায় করিতে হইবে, কাজে ঢিলামির অজুহাতে শ্রমিকদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সকল রকম জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দাবাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের আজগুবি হিসাবের ভিত্তিতে কমিটির সভ্যরা বাড়তি শ্রমিক-কর্ম্মচারীর সংখ্যাও জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কি ভাবে এই বাড়তি শ্রমিক কর্ম্মচারীদের কাজে নিয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে কোন বাস্তব নির্দ্দেশ-ই তাহারা দেন নাই।

কি ভাবে তদন্ত করা হইয়াছে

সরকারী খরচায় বিলাস-ভ্রমণের মধ্য দিয়া এবং অফিসারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াই কমিটির সভ্যরা তাহাদের তদন্ত কার্য্য চালাইয়াছেন। কমিটির সভ্যরা কোথাও রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের ইউনিয়নের সঙ্গে বা সাধারণ রেল-শ্রমিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করিতে সাহস করেন নাই। কারণ অর্দ্ধাহারে এবং অতিরিক্ত খাটুনিতে জর্জ্জরিত শ্রমিকেরা তাহাদের তদন্তের কি জবাব দিবেন তাহা কমিটির সভ্যরা ভালোভাবেই জানিতেন।

সুপারিশগুলি কি কি

কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে সারা ওয়াগণ রিপেয়ার শপের ৪০,৫৬৪ জনের মধ্যে ১৭৬০৩ জন বাড়তি শ্রমিক। রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ৮২,৯০৩ জন দক্ষ ও অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে ২২১৯৪ জন দক্ষ এবং ১০,৫৯৬ জন অদক্ষ শ্রমিকও বাড়তি শ্রমিকের কোঠায় পড়িয়াছেন।

মোটের উপর কমিটি যে অভিমত দিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় ইউনিয়নের রেল সার্ভিসে ৫০ হাজারের উপর বাড়তি লোক। কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টেই এই সমস্ত বাড়তি লোকের কাজ বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক করিতে হইবে যে, ইহাদের কাজে রাখা হইবে কি না।

ইয়ার্ড-স্টাফদের বিরুদ্ধে কমিটি কাজে ঢিলামির অভিযোগ আনিয়াছেন।

কমিটির পিছনে রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন

রেল তদন্ত কমিটির এই সমস্ত অভিমত এবং রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে তাহাদের কুৎসা প্রচারের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। ইহার সমস্তই মিথ্যা এবং অর্দ্ধ-সত্য কাহিনীর উপরই ইহা রচিত। রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের পক্ষ হইতে শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই গুরুস্বামী কমিটির এই মিথ্যায় ভরা রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

জয়প্রকাশ এণ্ড কোম্পানী এই ঘটনাটি এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে তাহাদেরও যে হাত রহিয়াছে সে কথা আজিও তাহারা গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

কাজের পটুতা কমে যাওয়া সম্পর্কে কমিটি

শ্রমিকদের কাজের পটুতা কমিয়া যাওয়ার যে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে কমিটি তাহার কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের মতে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের কাজের পটুতা কমিয়া যাইবার কারণের মধ্যে কয়েকটি হইল—

(১) মুদ্রাস্ফীতি চলিতে থাকার ফলে অসন্তোষ, আয় বাড়া সত্ত্বেও কাপড় ও খাদ্যের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িবার ফলে জীবন যাত্রার মানের অবনতি।

(২) বর্ত্তমান কাজ আরও কম লোকে করিতে পারে এই কথা প্রমাণ হইয়া গেলে ছাঁটাই হইবে, এই ভয়ে কাজে ঢিলা দেওয়া। কয়েক বছর ধরিয়া যাহারা অস্থায়ী রহিয়া গিয়াছে তাহাদের স্থায়ী করিতে দেরী দেখিয়া ঐ ভয় আরও বাড়িয়া যায়।

(৩) ধ্বংসমূলক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি; বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কান ঘুষা প্রচার কার্য্য।

সমাধান সম্পর্কে কমিটির মত

যে-সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে কমিটি তাহার সমাধানের জন্য যে সব ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন তাহার সহিত সমস্যাগুলির আসল কারণের কোনই সম্পর্ক নাই। কমিটির মতে সমাধান কি? শ্রমের তীব্রতা বাড়াইয়া দাও, ক্রীতদাসের মতন শ্রমিকদের খাটাইয়া নাও; আর কমিটি যাহাদের "অনুপযুক্ত" মনে করে তাঁহাদের নামাইয়া দাও। "একিশিয়েন্সি বার"টাকে এমন করিয়া তোলা যাহাতে কিছুতেই-ই আর কোন "প্রমোশন" না হয়, শ্রমিকদের যাহাতে একেবারে স্থায়ী ভাবে যথাসম্ভব কম মজুরীতে বাঁধিয়া রাখা যায়। ধ্বংসমূলক কাজের যাহারা সমর্থক তাহাদের অপসারিত করা ইত্যাদি। কমিটির মতে এডজুডিকেটরের রায়ে কাজের ঘণ্টা ও ছুটি সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা চালু করার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ রায় চালু করিতে গেলে ১৫ কোটি টাকা খরচ হইবে। অন্যদিকে কমিটি ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ডে প্রতি বৎসর আরো ২২ কোটি টাকা জমা দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটির মতে ইহাই হইল সমাধানের প্রকৃত পথ।

শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করার সম্পর্কে কিছুই নাই

রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীদের জীবন যাত্রা এবং কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য অর্থ-ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা-ও কমিটির রিপোর্টে নাই। কমিটির সুপারিশে কি ভাবে ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ড বাড়ানো যায় তাহার-ই নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এ জন্য রেল-বিভাগের আয় হইতে কিভাবে আরো বেশি টাকা ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ডে আনা যায়; কি ভাবে এডজুডিকেটরের রায় কার্য্যকরী করা বন্ধ রাখিয়া খরচ কমানো যায়, কমিটির রিপোর্টে তাহার-ই নির্দ্দেশ রহিয়াছে। প্রতি বৎসর সুদ হিসাবে যে কুড়ি কোটি টাকা দেওয়া হয় তাহা বন্ধ করারও কোন সুপারিশ কমিটি করেন নাই।—

কমিটি কি কি গোপন করিয়াছে

রেলের অনেক যন্ত্রপাতি-ই যে অকেজো হইয়া গিয়াছে, অনেক ডিপার্টমেণ্টে-ই যে যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য যে অতিদ্রুতগতিতে খারাপ হইয়া যাইতেছে প্রভৃতি বিষয়গুলি-ই কংগ্রেস সরকারের এই সমস্ত বড়লোক এজেন্টরা গোপন করিয়া গিয়াছে। আসলে রেলে এমন অনেক ডিপার্টমেণ্ট আছে যেখানে শ্রমিকদের অতিরিক্ত খাটানো হয়। সম্প্রতি ই-আই-আরের কর্ম্মকর্ত্তারা কাজের যে নিয়ম চালু করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, লোয়ারগ্রেডের রানিং-স্টাফের প্রত্যেককে মাসে ২৪৪ ঘণ্টা হইতে ৩০০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়। কাজের ঘণ্টা এইভাবে বাড়াইয়া

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারী কুৎসায় গুরুস্বামীর স্বাক্ষর

পূর্ব্ববঙ্গের রেল মজুরদের অপরাজেয় লড়াই

বেতন হ্রাস, রেশন বন্ধ ও ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র বিক্ষোভ

পাকিস্তান সরকার সুরু হইতেই রেল মজুরদের উপর ক্রমাগত তীব্র হইতে তীব্রতর আক্রমণ চালাইয়াছে। ছাঁটাই, রেশন কাটা, বিভারসন প্রভৃতি আক্রমণ দ্বারা লীগ সরকার রেল মজুরদের ঘাড়ে ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতর সংকটের বোঝা চাপাইয়া ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে।

সরকারের এই আক্রমণের ভিতর দিয়াই রেল মজুরগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আজ নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তি দ্বারাই, সরকারের আক্রমণকে রুখিয়াই তাঁহাদের বাঁচার মত মজুরি প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করিতে হইবে। এই আত্ম-বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়াই পূর্ব্ববঙ্গের রেল মজুরগণ গত ২ বছর যাবত সরকারী হামলার বিরুদ্ধে চালাইয়াছেন একটানা শ্রেণী-সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম ক্রমেই ব্যাপকতর হইতেছে—ক্রমেই তাহা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতেছে।

রেলমজুরদের প্রতি বেইমানী

লীগ নেতারা অনেক সুখ-সুবিধার কথা দ্বারা ভুলাইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৬৫ হাজার রেল মজুরকে পূর্ব্ববঙ্গে ভীড় করায়।

কিন্তু, কার্য্যতঃ হাজার হাজার রেল-মজুরকে আলোবাতাসহীন ওয়াগানে বাল-বাচ্চা নিয়া থাকিতে দেওয়া হইল। 'পাকি-স্তানের টাকা নাই—পাকিস্তান রাষ্ট্র গরীব' —এই বুলির আড়ালে মজুরদের মাহিনা এক পয়সাও বাড়ানো হইল না। এমন কি, জনাব লিয়াকত আলি দেশবিভাগের পূর্ব্বে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী থাকাকালে যে 'পে-কমিশনের' রায় চালু করার কথা দিয়াছিলেন—পাকিস্তান হওয়ার পর সেই কথা তিনি ঘুরাইয়া ফেলিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, 'পাকিস্তান গরীব রাষ্ট্র —টাকা নাই, কাজেই ঐ পে-কমিশন চালু করা যাইবে না।' অথচ ঠিক এই সময়েই পাকিস্তানের নূতন মন্ত্রীরা হাজার হাজার টাকা মাহিনা নিতে লাগিল। মাসে হাজার হাজার টাকা মাহিনা দিয়া পাকিস্তানের তিনটি প্রদেশের জন্য বিলাতী বড়লাট নিয়োগ করা হইল।

অন্যদিকে, 'সরকারের তহবিলে টাকা নাই' এই অজুহাতে রেল মজুরদের রেশ-নের পরিমাণও কমাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। লীগ সরকার আর এক ধুয়া তুলিল যে, রেল মজুর বাড়তি হইয়াছে—কাজেই ছাঁটাই করিতে হইবে। অথচ রেল বিভাগ হইতে লিয়াকত আলি সরকার প্রায় এক কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। অর্থাৎ রেল মজুরদের ঘাড়ে সংকটের বোঝা চাপাইয়া ধনিকের স্বার্থ রক্ষাই হইল লিয়াকত আলি সরকারের মূল নীতি।

এমপ্লয়ীজ লীগের দালাল নেতা চেরাগ খাঁ, মহবুল হক প্রভৃতি লীগ সরকারের এই মজুর-বিরোধী নীতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া রেল মজুরগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে, 'পাকিস্তানের খেদমতের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া কাজ কর।' অথচ এমপ্লয়ীজ লীগের এই দালালগুলির প্রত্যেকেরই মাহিনা পাকিস্তান হওয়ার পর বাড়িয়াছে—প্রত্যেক দালালেরই পদের উন্নতি হইয়াছে। এইভাবে সরকারের ও রেল কর্তৃপক্ষের ঘুষ খাইয়া দালাল এমপ্লয়ীজ লীগের নেতারা রেল মজুরদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল।

রেল মজুরদের লড়াইয়ের লহর

কিন্তু আজ জমানা বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের রেলমজুরগণ নিজ শক্তি দ্বারাই সরকার ও দালালদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর হইতেই রেল মজুরগণ নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম সুরু করেন। সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা শহরে একজন ডি, টি, এস একজন গ্যাংম্যানকে প্রহার করে। এই জুলুমের কথা প্রচার হওয়া মাত্র সব মজুর তৎ-ক্ষণাৎ একযোগে কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। মজুরদের সংঘবদ্ধ শক্তির আঘাতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজধানীর রেল চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। তখন কর্তৃপক্ষ আপোষ করে।

ঢাকা শহরের রেল মজুরগণ পাকি-স্তান হওয়ার এক মাসের মধ্যেই যে লড়াই সুরু করিলেন ক্রমে ক্রমে তাহা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল সারা লাইনে।

ঈশ্বরদি, শান্তাহার, লালমনিরহাট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, পার্ব্বতীপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্টেশনে স্টেশনে রেলমজুরগণ ঘেরাও বিক্ষোভ, হরতাল দ্বারা লীগ সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল।

১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে রেশন কম দেওয়ার বিরুদ্ধে সৈয়দপুরের রেলমজুর-গণ রেশন শপ ঘেরাও করিয়া জঙ্গী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। 'আজাদ পাকি-স্তানের' রেলকর্তৃপক্ষ তখন রেলমজুর-গণের উপর সশস্ত্র পুলিস লেলাইয়া দেয়। পুলিস আসিয়া গুলি করে। সেখানে ই, বি, রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক সুধীন ধর ও অন্যান্য মজুর কর্ম্মীকে গ্রেপ্তারও করা হয়। রেলমজুর-গণ চাহিয়াছিল রুটি—তাঁহারা লীগ সরকারের নিকট হইতে পাইল বুলেট। কিন্তু মজুরদের জঙ্গী মনোভাব দেখিয়া কর্তৃপক্ষ রেশনের পরিমাণও বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ঈশ্বরদি ও শান্তাহারে কয়েকজন মজুরকে ছাঁটাই করা হইলে মজুরগণ লাইনের উপর দাঁড়াইয়া রেল বন্ধ করিয়া ছাঁটাই মজুরদের পুনর্নিয়োগ দাবী করে। সেখানে এমপ্লয়ীজ লীগের দালালগণ 'লালঝাণ্ডা ইসলাম বিরোধী' এই দোহাই পাড়িয়া মজুরগণকে কাজে যাইতে অনুরোধ করে। কিন্তু, ধর্ম্মের নামে মজুরদের হক লড়াইকে বানচাল করা চলিল না। মজুরগণ সেই দালালকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেয়।

ইহার কিছুদিন পরই ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সৈয়দপুরের ১২ হাজার রেল মজুর রেশনের দাবীতে হরতাল করে। মার্চ্চ মাসে লীগ সরকার যে মজুরদের উপর গুলি চালাইয়াছিল—ডিসেম্বর মাসে সেই মজুরগণই হরতাল করিয়া কার-খানা বন্ধ করিয়া দেয়। পুরানো দিনের মত দমননীতিতে মজুরদের শক্তি আজ আর ভাঙ্গিয়া পড়ে না বরং আরো জোরে মজুরগণ আগাইয়া যায়। পাঁচদিন এই ধর্ম্মঘট চলে। মজুরদের সংঘবদ্ধ লড়াই-এর সামনে কর্তৃপক্ষ মাথা নত করিতে বাধ্য হয়। পাঁচদিন পর কর্তৃপক্ষ পুরা পরিমাণ রেশন দেওয়ার কথা দিলে মজুরগণ কাজে যোগদান করে।

সৈয়দপুরের এই লড়াইয়ের জয়লাভের পরই জানুয়ারীমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লালমণির হাটে লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতৃত্বে রেল মজুরদের সংগ্রাম উচ্চ বৈপ্ল-বিক রূপ ধারণ করে। রেল মজুরগণ পুরা রেশনের দাবীতে এক উচ্চপদস্থ রেল অফিসারকে ৭ ঘণ্টা কয়েদ করিয়া রাখে। কর্তৃপক্ষ যখন প্রাণভয়ে সশস্ত্র পুলিস আনয়ন করে তখন মজুরগণ টেলিফোন অফিস, রেলইঞ্জিন প্রভৃতি দখল করিয়া জঙ্গী লড়াইএর জন্য প্রস্তুত হইয়া দেখা-ইয়া দেয় যে মজুরগণ আজ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য নূতন শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রাইফেল-ধারী পুলিসের সামনেও মজুরদের এই নয়া জঙ্গীভাব দেখিয়া কর্তৃপক্ষ ভয়ে মজুরদের দাবী মানিয়া নেয়। অফিসার লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, পুরা রেশন দেওয়া হইবে।

এই গৌরবময় সংগ্রামের দুই সপ্তাহ পর জানুয়ারী মাসের শেষে ঢাকার ৩ হাজার রেল মজুর কয়েকজন মজুরের উপর হইতে ছাঁটাই নোটিস প্রত্যাহার করার দাবিতে ধর্ম্মঘট করে। ছাঁটাইএর বিরুদ্ধে লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের লড়াইএর ডাকে লালঝাণ্ডা পন্থী, লীগপন্থী সব মজুর একযোগে হরতাল করিয়া গাড়ী বন্ধ করিয়া দেয়। এমপ্লয়ীজ লীগের দালাল নেতারা 'ইসলামের' ও 'পাকি-স্তানের' দোহাই দিয়া ধর্ম্মঘটী মজুরদের ভিতর বিভেদ আনিতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র পুলিস আমদানী করে।

কিন্তু, সাধারণ জঙ্গী মজুরগণ আজ আর পুলিসের ভয়ে ভীত নয়। তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া লড়াইএ অটল থাকেন। তখন কর্তৃপক্ষ ছাঁটাইএর নোটিশ প্রত্যাহার করে।

এইভাবে ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী মাসের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের ৬৫ হাজার রেল মজুরদের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার মজুর বিভিন্ন কেন্দ্রে হরতাল করেন। যেখানেই লালঝাণ্ডা লড়াইএর নেতৃত্ব দিয়াছে সেখানেই লড়াইএর ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছে সাধারণ মজুরদের জঙ্গী একতা। যেখানেই মজুরগণ একতাবদ্ধ হইয়া লড়াইএ নামিয়াছেন, সেখানেই তাঁহারা সরকারের ছাঁটাই ও রেশন কাটার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়াছেন।

সরকারের বীভৎস দমননীতি

রেল মজুরগণের জঙ্গী লড়াইএ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা রেল মজুর আন্দোলনের নেতা লালঝাণ্ডা ইউনি-য়নের উপর চালাইতে থাকে ব্যাপক হামলা। ইউনিয়নের সম্পাদক ডাঃ মারুফ হোসেন বিনা বিচারে বন্দী হইলেন। ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল লতিফ, সহঃ-সম্পাদক বীরেন দাশগুপ্ত ও আবদুস সত্তারের নামে বাহির হইল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের সংগঠক ধরণী রায়, মহাদেব সান্যাল, সত্য মৈত্র প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হইল।

লালমনির হাটে রেল মজুরগণ জঙ্গী লড়াই চালাইয়াছিলেন। সেখানে সরকারের দমননীতি হইল অত্যন্ত পাশবিক। সেখানকার রেল মজুরদের প্রিয় নেতা জব্বার ও কুট্টি মহম্মদকে বিনা-বিচারে গ্রেপ্তার করা হইল। সেখানে রেল মজুরদের কলোনী সশস্ত্র পুলিস দ্বারা ঘেরাও করিয়া বহু মজুরের উপর অকথ্য অত্যাচার চালান হইল।

সৈয়দপুর, লালমনিরহাট চট্টগ্রাম প্রভৃতি বড় বড় রেল কেন্দ্রে লীগ সরকার ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। কার্য্যতঃ রেল মজুরদের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা কাড়িয়া নিতে লাগিল।

রেল মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো-লন করার অধিকারকে দমন করিয়া লীগ সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ মজুরদের উপর আর এক বিরাট আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে লীগ সরকার হাজার হাজার রেল মজুরকে ছাঁটাই করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করে। এমপ্লয়ীজ লীগ ও চট্টগ্রামের এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের বেইমান নেতারাও এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে সরকারের সঙ্গে যোগ দেয়। চট্টগ্রামে রেল কর্তৃপক্ষ, এমপ্লয়ীজ লীগ ও এসোসিয়েশনের এক বৈঠকে লীগ ও এসোসিয়েশনের দালালগণ লিখিত

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

নেতাদের জেলে পুরিয়া আন্দোলন দমনের ব্যর্থ চেষ্টা

দালাল নেতাদের স্বরূপ ছিঁড়িয়া সংগ্রামী অগ্রগতি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাহারা এই ছাঁটাইএ সাহায্য করিবে।

৯ই মার্চ্চ

তখন নয়া চেতনায় উদ্বুদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গের রেল মজুরগণ লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একযোগে রুখিয়া দাঁড়ায়। ভারতের রেল মজুরদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া পূর্ব্ব বঙ্গের রেল মজুরগণ বাঁচিবার মত মজুরি, পুরা রেশন, ছাঁটাই বন্ধ, উপযুক্ত বাসস্থান প্রভৃতি অধিকার দাবি করিয়া ৯ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহাদের ঐতিহাসিক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেন। রেল মজুরদের এই ঘোষণা সমস্ত পূর্ব্ব বঙ্গের নিপীড়িত মানুষের প্রাণে জাগাইয়া দিল নূতন বৈপ্লবিক প্রেরণা। জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন লীগ সরকার এই লড়াইএর ডাকে নিজের মরণের ডাক শুনিয়া রেল মজুরদের বিরুদ্ধে সামরিক সন্ত্রাস চালায়। সারা লাইনে রেল মজুরদের বিরুদ্ধে ৬০০০ ফৌজ ও সশস্ত্র পুলিস নিয়োগ করা হয়। রেলের ষ্টেশনগুলিকে লীগ সরকার প্রকৃত পক্ষে এক একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের বহু মজুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। দালাল মহবুল হক, চেরাগ খাঁ, পূর্ব্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ফয়েজ আহমদ প্রভৃতি ধনিকশ্রেণীর সব পোষা দালালগণও রেল মজুরদের এই গৌরবময় সংগ্রামের বিরুদ্ধে বেইমানীতে লাগিয়া যায়। পত্রিকা, রেডিও মারফত এই দালালের দল মজুরদের নিকট কাকুতি মিনতি জানাইতে থাকে যে, রেল মজুরগণ যেন হরতাল না করে—সরকার তাঁহাদের দাবি মানিয়া নিবে।

কাজ	বর্ত্তমান বেতন	পে-কমিশনের রায়
(১) অ-দক্ষ শ্রমিক	১৪৲, ১৫৲, ১৬৲	২৮-॥০-৩২৲
(২) অ-দক্ষ শ্রমিক যাহাদিগকে শারীরিক শ্রম করিতে হয় অথবা বহুদূর হাঁটিতে হয়—	১৪৲, ১৫৲, ১৬৲	৩৩৲-॥০-৩৭৲
(৩) পিয়ন	১৪৲, ১৫৲ ১৬৲	২৮৲-॥০-৩২৲
(৪) অর্দ্ধদক্ষ দপ্তরী ইত্যাদি	১৫৲-॥০-২০৲-১৲-৩০৲	৩৮৲-১৲-৪৫৲
(৫) জমাদার	২২৲-২৬৲	২৮৲-॥০-৩২৲ স্পেশাল—৫৲
(৬) যে সকল কাজে ইংরাজী জানা দরকার—রেকর্ড সর্টার ইত্যাদি	ট্রিয়ার ২০৲- রেল-মজার	৪০৲-২৲-৬০৲
(৭) দক্ষ কারিগর, মোটর ড্রাইভার এবং শিক্ষিত অ-ম্যাট্রিক	৪৫৲	৬০৲-২৲-৮০৲
(৮) বিশেষ দক্ষ—এখন কিছু ঠিক নাই		৭৫৲-৫৲-১৮০৲ এ, বার—১০০৲
(৯) আপার সব-অর্ডিনেট অর্থাৎ ম্যাট্রিক পাশ করিয়া যাহারা ২৷৩ বৎসর টেক্নিক্যাল স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ দক্ষ শ্রমিক	৭০৲-৫৲-১৫০৲-১০৲-২০০৲	(ক) ১২৫৲-২৫৲।২৲-৩৫০৲ (খ) ১২৫৲-১০৲-২২৫৲
(১০) গ্রাজুয়েট কেরানী	৬০৲-৫৲-১০০৲-১০৲-২০৲	৮৫৲-৬৲-১১৫৲-১৫।২-১৭৫৲ ই, বি-১০৲-২২৫৲

উপরোক্ত স্কেলগুলি হইতেছে মূল স্কেল। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে বর্ত্তমানে অসংখ্য প্রকার যে সকল গ্রেড আছে তাহাদিগকে এই মূল স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

মাগ্‌গীভাতা :—

যাহারা ৫০৲ কম বেতন পাইবে— যাহারা রেলের কোয়ার্টারে থাকে না তাহাদিগকে ২৬৲ অন্যান্যকে ২৪৲

যাহারা ৫০৲ হইতে ১০০৲ পাইবে—৩০৲

" ১০০৲ হইতে ১৭৫৲ " —বেতনের ২৭% অথবা সর্ব্বনিম্ন ৩০৲

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রেল-কর্ম্মচারীদিগকে আলাদা মাসিক ৬৲ মাগ্‌গীভাতা দেওয়া হইবে :

ঘরভাড়া :—

করাচী, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সৈদপুরে যাহাদিগকে সরকার কোয়ার্টার দিতে পারিবে না তাহাদিগকে নিম্নলিখিত হারে ঘর ভাড়া ভাতা দেওয়া হইবে।

যাহারা ৫৫৲ নীচে বেতন পায়— ৬৲

" ৫৫৲ হইতে ১০০৲ মধ্যে বেতন পায়—৮৲

" ১০১৲ " ২৫০৲ " " " ১০৲

ক্লাস iv ভুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বিনা ভাড়ায় কোয়ার্টার দেওয়া হইবে। কোয়ার্টার দিতে না পারিলে করাচী, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ও সৈয়দপুরে মাসিক ৫৲ ভাতা দেওয়া হইবে। যাহাদিগকে ২৬৲ মাগ্‌গীভাতা দেওয়া হইবে তাহাদিগকে আর মাত্র ৩৲ বাড়ী ভাড়া বাবদ দেওয়া হইবে।

এই পে-কমিশনের রায় চালু হওয়ার সাথে সাথে সস্তাদরে রেশন ও রেলের গ্রেইন শপগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

এত সৈন্য সামন্ত, এত দালাল নিয়োগ করিয়াও ভীত লীগ সরকার রেল মজুরদের হরতাল বানচাল করা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারিল না। রেলমজুরদের জঙ্গী শক্তি ও রেল মজুরদের সঙ্গে জনতার সমর্থন দেখিয়া লীগ সরকার ৩রা মার্চ্চ নূতন পে-কমিশনের ধাপ্পা জারি করে। সরকার ঘোষণা করে যে, রেলমজুরদের মাহিনা বাড়ানো হইল।

নূতন পে-কমিশনের ধাপ্পা

এই নূতন পে-কমিশনের রায় যে, কত বড় ধাপ্পা তাহা পাশের প্রদত্ত তালিকা হইতেই বোঝা যাইবে।

নূতন পে-কমিশনে একজন সাধারণ রেল মজুরের মাসিক আয় হইবেঃ ২৮ টাকা বেতন, ২৪ টাকা মাগ্‌গীভাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের মাগ্‌গীভাতা ৬টাকা—মোট ৫৮ টাকা।

এখন এই মজুর ভাইকে গ্রেনশপ উঠিয়া যাওয়াতে বাজার হইতে জিনিস কিনিতে হইবেঃ চাউল—৪০৷৪৫ টাকা দরে—যে চাউল আগে তাঁহারা পাইতেন ৮৷৵০ দরে। সরিষার তেল কিনিতে হইবে ৪টাকা দরে, যে তেল আগে তাঁহারা পাইতেন আট আনা সের দরে। চিনি কিনিতে হইবে ১৷০ সের—যে চিনি তাঁহারা পাইতেন—আট আনা সের ইত্যাদি।

কাজেই নূতন পে-কমিশনে রেল মজুরদের আসল মাহিনা সাবেক দিনের তুলনায় কমপক্ষে ২৫৷৩০ টাকা কাটা গিয়াছে।

উপরন্তু এই পে-কমিশনে হাজার হাজার মজুর ছাঁটাই হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে।

আর চলিয়াছে রিভারসন। শত শত ড্রাইভারকে করিয়া দেওয়া হইয়াছে ফায়ারম্যান। ফায়ারম্যানকে করা হইতেছে ক্লিনার। ঢাকায় বৃদ্ধ ড্রাইভার ১৯১৪ সাল হইতে ৩৪ বছর কাজ করিবার পর আজাদ লীগ সরকারের 'পে-কমিশনে' সান্টারে রিভারটেড হইয়াছেন। ড্রাইভার মুন্নালাল, রহমত প্রভৃতিও বহু বছর ড্রাইভারী করিয়া লিয়াকত আলীর সরকারের ইনাম পাইয়াছেন সান্টার হইয়া! ঢাকার মাষ্টার সোনালাল, শেখ মদিনা, ফজলু মিঞা প্রভৃতি ড্রাইভার হইতে হইতে হইয়াছেন ফায়ারম্যান। এইভাবে প্রতি ষ্টেশনে শত শত রেল মজুরকে লীগ সরকার রিভার্ট করিয়া মজুরি কাটিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহা ছাড়া কাজের ঘণ্টা বাড়াইয়া মজুরদের আরও বেশী শোষণ করিবারও অপচেষ্টা চলিতেছে।

লীগ সরকার এই বুলি আওড়াইতেছে যে, সরকারের টাকার অভাব। তাই রেশন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে ও 'বাড়তি' মজুর ছাঁটাই করা দরকার হইয়াছে।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই লীগ সরকার কাশ্মীরে সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধের ঘাঁটি বানাইবার জন্য বৃটিশের হুকুম মত যুদ্ধ বাধাইয়া সেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতেছে। ঠিক এই সময়েই লীগ সরকার ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমে পাকিস্তানে সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে এ বছরের বাজেটে ৪১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৬৮ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করিতেছে। ঠিক এই সময়েই লীগ সরকার 'জমিদারী উচ্ছেদের' ভাঁওতায় জমিদারদের ৪০ কোটি টাকা খেসারতও দিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

কাজেই টাকা নাই এ-কথা ডাহা মিথ্যা। আসলে লিয়াকত আলি সরকার ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ ও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদারী করিয়া সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধের জন্য রেল মজুরদের পেট কাটিতেছে। ইহাই হইল লিয়াকত আলি সরকারের আসল রূপ! এই সরকারের নিকট হইতে রেল মজুরদের আশা করার কিছুই নাই।

মজুরের শক্তির বলে অধিকার কায়েম

পূর্ব্ববঙ্গের রেল মজুর লীগ সরকারের এই শ্রেণী-চরিত্র আজ চিনিয়া ফেলিতেছে। পে-কমিশনের ধাপ্পাও তাহাদের কাছে আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে, বহু সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও বিশেষত ৯ই মার্চ্চের শিক্ষা মজুরগণকে দিয়াছে নূতন চেতনা ও নূতন শক্তি। ৯ই মার্চ্চ মজুরগণকে যে নূতন লড়াইয়ের চেতনা দিয়াছে তাহাই আজ প্রকাশ পাইতেছে—নূতন কায়দার বৈপ্লবিক লড়াই-এর ভিতর দিয়া। জুলাই মাসে ঢাকা লোকো সেডে রেল কর্ত্তৃপক্ষ কাজের সময় আধ ঘণ্টা বাড়াইতে গেলে সব মজুরগণ একযোগে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছিল যে, সাড়ে তিনটায় সেড বন্ধ না হইয়া চারটায় ছুটি হইবে। কিন্তু রেল মজুরগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সাড়ে তিনটায় ছুটি চাই। রেল মজুরগণ নিজেদের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন। তাঁহারা সাড়ে তিনটার সময়ই সংঘবদ্ধভাবে ফ্যাক্টরী হইতে বাহির হইয়া আসেন। এমপ্লয়ীজ লীগের দালাল মজুরদের বারণ করিতে আসিয়া মার খাইয়া পলায়ন করিল। রেল মজুরগণ নিজেদের শক্তির বলেই নিজেদের অধিকার কায়েম

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

কংগ্রেস সরকার ও রেলওয়ে বোর্ডের আক্রমণের বিরুদ্ধে রেলশ্রমিক

৯ই মার্চ্চের ঠিক কয়েক দিন আগে পণ্ডিত নেহরু চারিদিকে প্রচার করিয়াছেন যে, লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘটের যে ডাক দিয়াছে তাহার সহিত শ্রমিকদের দাবীদাওয়ার কোন সম্পর্ক নাই —শুধু দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য এবং ধ্বংসাত্মক কার্য্য করার জন্যই এই ধর্ম্মঘটের ডাক দেওয়া হইয়াছে। এই দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারের দোহাই দিয়া ৯ই মার্চ্চের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রেলশ্রমিকদের উপর সশস্ত্র সৈন্যদলের অবাধ কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং যদি ধর্ম্মঘটের কোনরূপ চেষ্টা কেহ করে তবে তাহাদের গ্রেপ্তার করার এবং গুলি করার আদেশও সৈন্যদলকে দেওয়া হইল।

জনসাধারণের নিকট একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, নেহরু সরকার কোনরূপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তাঁহারা বুঝেন না। একটি আইন-সঙ্গত ধর্ম্মঘটকেও নেহরু সরকার বীভৎস দমন নীতি চালাইয়া ভাঙিয়া দিলেন। কিন্তু এইখানেই রেলশ্রমিকদের বিরুদ্ধে নেহরু সরকারের অভিযানের শেষ নয়। ইহার পরেও কংগ্রেস সরকার শ্রমিকদের উপর বারে বারে আক্রমণ চালাইয়াছেন। শ্রমিকদের মনে বিক্ষোভ জমিয়া উঠিয়াছে—তাহারা আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়াছেন।

আজিকার দিনে এই সমস্ত ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করা দরকার।

মূলবেতন, মাগ্‌গীভাতা, গ্রেনশপ প্রভৃতি দাবী নিয়াই ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত তাহার একটি দাবীও পূরণ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে তিন হাজার জঙ্গী রেল শ্রমিক-কর্ম্মচারী ও ইউনিয়ন কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; সর্ব্বত্র বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে এবং ইহার পরেও শ্রমিকদের উপর নতুন নতুন আক্রমণ চলিয়াছে। কংগ্রেস সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, যাহারা রেলের পাস পাইবার অধিকারী নয় তাহারা গ্রেনশপ হইতে রেশনও পাইতে পারিবে না। অর্থাৎ স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা ছাড়া রেল-শ্রমিক কর্ম্মচারীদের আর কোন পোষ্যকেই গ্রেনশপ হইতে রেশন দেওয়া হইবে না। এইভাবে শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের পরিবারবর্গের হাজার হাজার লোককে অনাহারের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাজার হইতে চড়া দাম দিয়া রেশন কেনার সামর্থ্য তাহাদের নাই। রেলকর্তৃপক্ষ তাই শ্রমিক কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে পুরানো রেশন কার্ড দাবী করিতেছে। কিন্তু শিয়ালদহের শ্রমিকেরা একযোগে ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেজন্য সাময়িকভাবে তাহাদের কার্ড আবার তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীভাড়ার ভাতা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ভাড়ার রসিদ দাবী করিতেছে। কিন্তু বস্তি অঞ্চলে এবং অন্যান্য জায়গায়ও বাড়ীভাড়ার রসিদ পাওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষ রসিদ পাইনাই এই অজুহাত দেখাইয়া শ্রমিকেরা যে বাড়ীভাড়া বাবদ সামান্য সুবিধাটুকু পান তাহাও কাটিয়া নেবার ব্যবস্থা করিতেছে। শ্রমিক-কর্ম্মচারীরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং অবস্থা যখন দ্রুত খারাপের দিকে যাইতে আরম্ভ করিল তখন কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে এই আদেশ কার্য্যকরী করা স্থগিত রাখিয়াছে।

ভারতের সর্ব্বত্র হাজার হাজার শ্রমিককে রেল-ওয়াগনে বাসা বাঁধিয়া অভিশপ্ত জীবন কাটাইতে হয়—তাহাদের বাড়ীভাড়া বাবদ এক পয়সাও দেওয়া হয় না। সম্প্রতি ই-আই-আর কর্তৃপক্ষ "ক্ষতিপূরণে"র অদ্ভুত দোহাই দিয়া এই ওয়াগন-বাসীদের বেতন হইতে মাথাপিছু মাসে দেড় টাকা করিয়া কাটিয়া নিতেছে। শ্রমিকদের এইভাবে ঠকাইবার বিরুদ্ধে ইউনিয়ন গণ-সহির ক্যাম্পেন চালাইতেছে।

কাণপুর, টুণ্ডলা এবং যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য কেন্দ্রে দৈনিক দেড় টাকা মজুরিতে নূতন নূতন গ্যাংম্যান সংগ্রহ করা হইতেছে এবং স্থায়ী গ্যাংম্যানদের যায়গায় তাহাদের নেওয়া হইতেছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই সমস্ত অঞ্চলের গ্যাংম্যানরা প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন—সম্মেলন করিয়া তাহারা কর্তৃপক্ষের এই নূতন আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ডাক দিয়াছেন।

চলতি বাজার রেট অনুযায়ী বি-এন-আর-এ বিভিন্ন রকম মজুরি দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে গ্যাংম্যানদের মধ্যে বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে এবং সাঁতরাগাছি সেকসনে ইতিমধ্যেই গ্যাংম্যানদের ধর্ম্মঘট হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের মোগলসরাই, টুণ্ডলা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি কেন্দ্রে দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজ চালু করা হইয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধে যাহাতে কোনরূপ প্রতিবাদ না উঠিতে পারে তাহার জন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কাঁচড়াপাড়ার দৈনিক ১৫ মিনিট করিয়া কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শ্রমিকেরা ইহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান এবং এই আদেশ মানিয়া নিতে অস্বীকার করেন। ফলে এই আদেশ বাতিল করা হইয়াছে।

অণ্ডালে লোকোতে মজুর-ইাটাইর জন্য একটি তালিকা তৈরী করা হইলে শ্রমিকেরা অফিস ঘেরাও করিয়া প্রতিবাদ জানান। ফলে তৎক্ষণাৎ-ই তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে কাজে নেওয়া হয়। আসানসোলেও ছাঁটাইর অনুরূপ তালিকা তৈরী হইতেছে—শ্রমিকেরাও কর্তৃপক্ষের প্ল্যান ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

লোকো রানিং স্টাফের ন্যায় ট্রাফিক স্টাফদেরও দুইবৎসরের বকেয়া মাহিনা দিতে অস্বীকার করা হইতেছে এবং তাহাদের ১৯৪৯-এর ১লা জানুয়ারীর নূতন স্কেল অনুসারে মাহিনা দেওয়া হইবে—অন্যান্য স্টাফেরা ১৯৪৭-এর ১লা জানুয়ারীর স্কেল অনুসারে-ই মাহিনা পাইয়া থাকেন। বি-এন-আরএ ট্রাফিক স্টাফ সভা করিয়া এই নয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

সারা ভারত ব্যাপী প্রায় প্রত্যেকটি রেলকেন্দ্রেই অবস্থার উন্নতি হইতেছে এবং রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীরা ইউনিয়নকে সক্রিয় করার জন্য বন্দী এবং সাথীদের স্থান পূরণ করার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন।

শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের মধ্যে আজ বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে। গত দুই মাসে প্রত্যেক প্রদেশেই রেল-শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের সভা ও সম্মেলন হইয়াছে। কলিকাতায় যে শীঘ্রই সারা ভারত রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীদের কনভেনসন হইবে তাহার জন্য ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হইতেছে---ইতিমধ্যেই জি-আই পি, বি-বি-সি-আই, এম-এস-এম, ই-পি-আর, এস-আই-আর, ই-আই-আর, বি-এন-আর এর ডেলিগেটদের নাম আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পুলিসের কড়া নজর এবং প্রায় বে-আইনী অবস্থার মধ্যেই ৯ই মার্চ্চের পর রেলশ্রমিকেরা আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছেন; নিজেদের সংগঠনকে তাঁহারা জোড়দার করিয়া তুলিতেছেন এবং সারা ভারত ব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহাদের এই সংগ্রাম শুধু মাত্র কর্তৃপক্ষের নতুন নতুন আক্রমণের বিরুদ্ধে নয়---মূল দাবী পূরণের জন্যও তাঁহাদের এই সংগ্রামের প্রস্তুতি।

অর্দ্ধলক্ষ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সরকারী সুপারিশ!

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া সত্ত্বেও এখনো অনেক কাজ জমিয়া রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টেও এইরকম অমানুষিক খাটুনি ইঙ্গ-মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কোন সভ্য দেশেই শ্রমিকেরা এত সামান্য মজুরির জন্য এবং এরকম দুঃসহ জীবনযাত্রার মধ্যে এত কঠোর পরিশ্রম এবং এত বেশি সময় কাজ করেন না। সত্যই ইহা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয় যে, কিভাবে অর্দ্ধাহারে থাকিয়াও শ্রমিকেরা এত কঠোর পরিশ্রম করিতে পারেন।

ইউনিয়ন কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ

কমিটি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীরা তাহাদের বিরুদ্ধে এই জঘন্য আক্রমণ কখনো-ই নীরবে সহ্য করিয়া যাইবেন না। তাই তাঁহারা পথও বাতলাইয়াছেন। যাঁহারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং উন্নত জীবনযাত্রার জন্য লড়াই করেন তাঁহাদের অপসারিত করার জন্যই কমিটি বিশেষ জোর দিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপকেই বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্য্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

কংগ্রেস সরকারের আক্রমণের তাৎপর্য্য

শ্রমিকদের আরো বেশি করিয়া শোষণ করিয়া, হাজার হাজার বেকার শ্রমিককে রাস্তার ভিখারীতে পরিণত করিয়া এবং উন্নত জীবন যাত্রার জন্য মেহনতী জনগণের সংগ্রামকে ধ্বংস করিয়া কংগ্রেস সরকার তাহাদের নিজেদের সৃষ্ট আর্থিক সংকট সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। শুধু মাত্র রেলশ্রমিকদের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ক্ষেত্রে-ই ধনিক কংগ্রেসী সরকার মজুর ছাঁটাই করিয়া শ্রমিকদের আয় কমাইয়া দিয়া, মুদ্রাস্ফীতি করিয়া বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছে। সরকারী অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে, অফিসে, ডাক বিভাগে এই সরকার ব্যাপক ছাঁটাই করিতেছে। সুতাকলে, চটকলে এবং অন্যান্য শিল্পে শ্রমিকদের ছাঁটাই করিতে শ্রমিকদের আয় কমাইতে এবং ধনীদের মুনাফা রক্ষা করিতে এই সরকার ধনিকদের সাহায্য করিতেছে—সরকারের সাহায্যে ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, বিনাবিচারে শ্রমিকদের জেলে আটক করা হইতেছে এবং শ্রমিকদের সংগ্রামকে ভাঙার জন্য সশস্ত্র পুলিস পাঠানো হইতেছে।

রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য

এই আক্রমণকে রুখিবার জন্য রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে —তাহাদের সংগঠনকে জোরদার করিতে হইবে। তদন্ত কমিটির এই রিপোর্ট তাঁহাদের অগ্রাহ্য করিতে হইবে। পরিবারবর্গ লইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে আগাইয়া যাইতে তাঁহাদের অস্বীকার করিতে হইবে। কংগ্রেস সরকার ধনিক-শ্রেণীর-ই বন্ধু এবং শ্রমিকের শত্রু। সুতরাং লড়াইয়ের মধ্য দিয়া রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইবার জন্য এই সরকারকে বাধ্য করিতে হইবে।

মজিল

পুঁজিপতিদের মজলিসে সোস্যালিষ্ট দালাল অচ্যুত-অশোক-জয়প্রকাশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মালিক ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং মালিক সমিতির সভাপতি। পশ্চিম বাংলার বার্ন, কুলটি এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় পূজা বোনাস মূলদাবীর ভিত্তিতে কয়েকহাজার ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক যে লড়াই সুরু করিয়াছেন, তাহারা এই বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মর্ম্মার্থ বুঝিতে ভুল করিবেন না।

(৫) কে বসু—ভারতীয় খনি মালিক সমিতির সভাপতি।

আসানসোল, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলিতে খনি মালিকেরা ব্যাপক ভাবে শ্রমিক ছাঁটাই, রেশনকাটা সুরু করিয়াছে, খনিগুলিতে শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের নতুন জোয়ার আসিয়াছে।

(৬) স্যার মিশ্র—ই, আই রেলওয়ের ভূতপূর্ব্ব জেনারেল ম্যানেজার, রেলওয়ে বোর্ডের বর্ত্তমান অন্যতম পাণ্ডা। বিশ্বাসঘাতক জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্স ফেডারেশন গত ৯ই মার্চ্চের সারা ভারতের রেলশ্রমিকদের ধর্ম্মঘটকে বানচাল করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু রেল শ্রমিকেরা আবার নতুন করিয়া সংগ্রামের ময়দানে পা বাড়াইয়াছেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে নূতন সংগ্রামী নিখিল ভারত রেলশ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য ১৭।১৮ই কলিকাতায় সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। ঠিক তাহার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ভারতীয় রেলপথগুলির অন্যতম পাণ্ডার সঙ্গে জয়প্রকাশজীর এই সলাপরামর্শ।

(৭) শ্রী এইচ-পি বাগাড়িয়া—ভারতীয় চট এবং হেসিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং শ্রী ও, এন ঝাঝোরিয়া—কলিকাতার সুতা এবং তাঁত ব্যবসায়ীদের পাণ্ডা। যে গুজরাটি-মারোয়াড়ী বাণিয়ারা জনসাধারণের বস্ত্র এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লুটিয়া মুনাফার পাহাড় বানাইয়াছেন—এই খানাপিনার আসরে তাহারাও আসিতে ভুল করেন নাই।

(৮) বাংলার শ্রেষ্ঠ জমিদার ও জমিদার সভার সভাপতি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, শ্রীরামপুরের জমিদার প্রবর তুলসী গোস্বামী এবং আর একজন সেরা জমিদার নবাব স্যার কে, জি এম ফারুকী।

মেদিনীপুর, কাকদ্বীপ, শাকড়াইল, বাইনান, ডোমজুর, বাঁকুড়ার পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় ক্ষেতমজুর ও গরীবকৃষকরা মজুরী বৃদ্ধি, বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ ও জমির দাবীতে মৃত্যুহীন লড়াই চালাইতেছেন, কমপক্ষে ৮৫ জন মেয়ে পুরুষ এই সংগ্রামে শহীদ হইয়াছেন। তাহাদের শ্রেণী শত্রুদের সঙ্গে সোস্যালিস্ট জয়প্রকাশের এই ঘৃণ্য শলা-পরামর্শের খবরে তাহাদের রক্তে কি আগুন জলিয়া উঠিবে না?

(৯) পোর্ট কমিশনার্সের সভাপতি মিঃ এন, এম, আয়ার।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে এবং অসংখ্যবার ২২ হাজার পোর্ট শ্রমিকদের আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়াছে এই ভদ্রলোক।

(১০) কর্পোরেশনের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, সিভিল সাপ্লাইয়ের খ্যাত মিঃ এস, এন, রায় আই, সি, এস

কর্পোরেশনের যে ১০ হাজার শ্রমিক আজ কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন 'জাতীয়' টি-ইউর পাণ্ডা দেবেন সেনের সঙ্গে জয়প্রকাশজীর স্বরূপও তাহারা চিনিয়া রাখুন।

(১১) স্যার বি, এল, মিত্র—অতীতে বৃটিশ প্রভুদের এবং বর্ত্তমানে কংগ্রেস প্রভুদের অনেক সেবা করিয়াছেন। এই আইনজীবী ভদ্রলোককে পুরস্কার স্বরূপ কংগ্রেসী প্রভুরা ইহাকে পশ্চিম বাংলার গবর্নরের গদীতে বসাইয়া দিয়াছিলেন। পশ্চিম বাংলায় যে নিরাপত্তা আইনের সাহায্যে বিধান সরকার গ্রামে ও শহরে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করিয়াছে, সেই নিরাপত্তা আইনের খসড়া ইনিই তৈয়ার করিয়াছিলেন।

(১২) শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ—অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং বিড়লার কাগজগুলির প্রতিনিধি মিঃ রঙ্গস্বামী।

বিপ্লবী জনতার আন্দোলনের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে নতুন কুৎসার অভিযানে জয়প্রকাশজীর সাহায্য ইহাদের নিতান্তই দরকার।

দালাল শ্রেষ্ঠ জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে মার্কিন, ফরাসী, বিলাতী, মারোয়াড়ী গুজরাটী সমস্ত রকমের দেশী-বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী মালিকগোষ্ঠীদের এই খানাপিনার আসর বসিয়াছিল কলিকাতার একজন ধনী ব্যারিষ্টার মিঃ এ, কে, বসুর বাড়ীতে। এই ছবিখানি ফলাও করিয়া অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় গত ২৩শে আগষ্ট ছাপাও হইয়াছিল।

বলিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল যে এই খানাপিনার বৈঠকে জয়প্রকাশজী একা ছিলেন না। তাহার দুইজন সেরা সাকরেদ শ্রমিক নেতা হিন্দু মজদুর সভার সম্পাদক শ্রীঅশোক মেটা এবং শ্রীঅচ্যুত পট্টবর্দ্ধনও তাহার সাথে ছিলেন।

মেহনতী জনসাধারণ এই সব খানাপিনার কালো ইতিহাস খুব ভালই জানে। এইসব খানাপিনার বৈঠকে সংগ্রামী জনতার আন্দোলনকে পিছন হইতে ছুরি মারিবার জন্য, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য সমস্ত রকম জঘন্য চক্রান্ত চলে, বিশ্বাসঘাতক দালালদের দলিল তৈয়ার হয়।

এইসব বৈঠকের কথাই ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিলেন পশ্চিম বাংলার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার স্বয়ং। লুঠের বখরা লইয়া ঝগড়ায় অপর পক্ষের লোক দেখানো বক্তৃতাটুকু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে না পারিয়া নলিনীবাবু হঠাৎ বলিয়া ফেলেন—"সোস্যালিস্ট নেতারা দিনে মাঠে মাঠে বক্তৃতা দেন, আর রাত্রে পুঁজিপতিদেরই 'অনুগ্রহ' লোটেন।

সরকারী রেল বোর্ডের আসল স্বরূপ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জীবনধারণের খরচা শতকরা ১৪৪ ভাগ বেড়েছে, অথচ তাদের মজুরি বেড়েছে মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ, অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে শতকরা ১৪৭ ভাগ কম।

এর থেকেই বোঝা যায়, ভারত সরকার রেল শ্রমিকের দাবী সম্পর্কে এতটুকু সহানুভূতি পর্য্যন্ত দেখাতে রাজী নয়। নিজেদের মুনাফাখোরী স্বার্থে এক ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক মজুরির হার তারা শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে রেখেছে। যত বেশী সংখ্যক শ্রমিক যত কম সম্ভব মজুরিতে বেঁধে রাখাই তাদের উদ্দেশ্য, কারণ শ্রমিকদের যত কম দিয়ে পারে তাদের লাভ ততই বেশী হবে। উৎপাদনের খরচা কমিয়ে বেশী মুনাফা লোটার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই মজুরিপ্রথা চালু করেছিল। তাদের মানসপুত্র ভারতীয় ধনিকশ্রেণী সেই পুরানো প্রথাই আঁকড়ে আছে।

সরকার শ্রমিকদের শুধু অর্দ্ধাহারে রাখছে তাই নয়, তাদের খাটুনীও বাড়াচ্ছে। রেল মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় প্রকাশ, শ্রমিকরা স্বাভাবিক পরিশ্রম করে ব্রডগেজে দৈনিক ৯৮০০ মালগাড়ী বোঝাই করতে পারে। কিন্তু গত বছর জুনমাসের পর তাদের অস্বাভাবিক খাটিয়ে দৈনিক ১১২৬৭ মালগাড়ী বোঝাই করতে বাধ্য করছে। অর্থাৎ তাদের খাটুনী শতকরা ১৫ ভাগ বাড়িয়েছে। এর উপরে তাদের আবার স্পেশাল ট্রেন চালাতে হয়েছে ৩২৯খানা। একদিকে এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, অন্যদিকে পুরানো, অকেজো যন্ত্রপাতি দিয়ে (রেলমন্ত্রীর হিসেবে শতকরা ৪০খানা ইঞ্জিনেরই পেনসন নেবার বয়স পার হয়ে গেছে) আগের চেয়ে দ্রুতবেগে কাজ করতে বাধ্য করা—এর ফলে রেল দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে গেছে। গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বছরে ২৫০টা রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এইভাবে শ্রমিকদের খাটুনী বাড়ানো হচ্ছে, ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রতিদিন তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, আর তার পুরস্কার স্বরূপ গ্রেনশপ তুলে দিয়ে তাদের অর্দ্ধাহার মজুরি থেকে মাথা পিছু ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত কেটেনেওয়া হয়েছে।

এই হোল আমাদের জাতীয় রেল ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ। এসব দেখে শুনে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—রেল কাদের জন্য? রেল পরিচালনার গোটা ব্যবস্থা আজ কি উদ্দেশ্যে চালিত হচ্ছে?

আজ এদেশের রেলপথ চালিত হচ্ছে পুঁজিপতিদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, তাদের অত্যাচারী জনস্বার্থবিরোধী শাসন কায়েম রাখার জন্য! শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের উপর গুলি চালাতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সৈন্য বয়ে নিবার জন্য, ইঙ্গ-মার্কিন মনিবদের হুকুমে ভারতবর্ষকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে শক্ত করার জন্য!

ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে রেলওয়ের পরিচালনার ভার যতদিন থাকবে ততদিন জনসাধারণের সুবিধা হবার কোন আশা নাই। বরং সাধরণ যাত্রীদের দুর্দ্দশা বেড়েই চলবে, তাদের ঘাড় ভেঙ্গে পুঁজিপতিদের বিলাস ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাবে, রেলের ভাড়া ও মাশুল বাড়ীতে থাকবে, রেল শ্রমিকের জীবনযাত্রা আরও শোচনীয় হবে। যাত্রী ও শ্রমিকদের গলা কেটে বছরে প্রায় ৪০ কোটি টাকা মুনাফা লোটা সমান ভাবেই চলতে থাকবে!

তাই পুঁজিপতিদের এই প্রভুত্ব চূর্ণ করে রেল পথের কর্ত্তৃত্ব শ্রমিক ও জনসাধারণের হাতে আনতে হবে। এই লড়াইয়ে শ্রমিক ও সমস্ত জনসাধারণের স্বার্থ এক। তাদের এক সঙ্গে দাবী তুলতে হবে: বছরে ৪০ কোটি টাকা মুনাফাখোরী বন্ধ করতে হবে, ভাড়া কমিয়ে ও গাড়ী বাড়িয়ে যাত্রীদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করতে হবে, শ্রমিকদের বাঁচার মত মজুরি দিতে হবে, ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস ইত্যাদি চলবে না, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-চক্রান্তের স্বার্থে দেশের রেলপথকে ব্যবহার করা চলবে না।

এই মূল দাবী নিয়ে রেল শ্রমিকরা আজ লড়াইয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের সমর্থনে সমস্ত সাধারণ মানুষকে আজ এগিয়ে আসতে হবে। তবেই শুধু রেলওয়েকে সত্যিকার জনগণের রেলে পরিণত করা সম্ভব।

৯ই মার্চ্চের বিশ্বাসঘাতকতার পর নিঃ ভাঃ রেলওয়েমন্স ফেডারেশন

৯ই মার্চ্চের আগে শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ এবং লালঝাণ্ডা ইউনিয়নগুলির দৃঢ়তার ফলে জয়প্রকাশ-নারায়ণ এবং নিঃ ভাঃ রেলওয়েমেনস্ ফেডারেশনের (এ-আই-আর-এফ) অন্যান্য সংস্কারপন্থী নেতারা স্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ করাইতে বাধ্য করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও সোসালিস্টদের নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নগুলি নিরুৎসাহের ভাব দেখাইতে থাকে, জয়প্রকাশ এ-আই-আর-এফে'র অনুমতি ছাড়াই রেলবোর্ডের সহিত আলোচনা চালাইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস গবর্নমেণ্টের প্রবল বিরোধিতা সুরু হয়। এই সব সত্ত্বেও ৩॥ লক্ষ রেল-শ্রমিক ও কর্ম্মচারী সাধারণ ধর্ম্মঘটের পক্ষে স্পষ্ট রায় দেন। জয়প্রকাশের ইউনিয়নের সভ্যরাও সোৎসাহে ধর্ম্মঘটের পক্ষে ভোট দেন।

ইহার পর ভাঁওতা দিবার বা কায়দা করিয়া মূল প্রশ্নকে এড়াইয়া যাইবার আর কোন পথ রহিল না। আতংকিত জয়প্রকাশ কংগ্রেসী গবর্নমেণ্টের মধ্যে তাহার প্রভুদের দুয়ারে ধর্ণা দিল, ছোট খাট কোন সুবিধা আদায় করিয়া যদি নিজের মুখরক্ষা করা যায় এবং ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা যায় এই আশায়। কিন্তু প্রভুরা সব সময়ই ভৃত্যের আবেদন মানিয়া লইবে এখন কোন কথা নাই। একটি দাবীও পূরণ হইল না; বরঞ্চ রেশন কনশেসন কমাইয়া দেওয়ার ফলে রেল-শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের আয় মাসে গড়ে ২০-২৫ টাকা কমিয়া গেল, তাহা সত্ত্বেও, শ্রমিক আন্দোলনে শত্রুশ্রেণীর দালাল এই জয়প্রকাশ ও তাহার সঙ্গ-পাঙ্গরা তাহাদের প্রভুর আদেশ অনুযায়ী দানাপুরে ধর্ম্মঘটের বিরোধিতা করিল। ৩॥ লক্ষ রেল শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিল। শুধু তাই নয়, যে সব লালঝাণ্ডা ও অন্যান্য ইউনিয়ন শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়াছিল, তাহাদের এ, আই, আর, এফ হইতে বাহির করিয়া দিল।

৯ই মার্চ্চও তাহাদের এই বিশ্বাস-ঘাতকতা চলিল। পুলিসের গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করিয়া তাহারা ৩ হাজার রেল শ্রমিক, কর্ম্মচারী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ধরাইয়া দিল। ৯ই মার্চ্চের পর রেলওয়ে বোর্ড এবং সরকারী 'শ্রমিক' প্রতিষ্ঠান আই-এন-টি-ইউ সি'র প্রতি-নিধিদের লইয়া 'জয়েণ্ট এনকোয়ারী কমিটি' গঠিত হইয়াছে। এ-আই-আর-এফও সেখানে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। এই কমিটি গঠনের পর ৬ মাস কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু রেল শ্রমিক কর্ম্মচারীদের উপর আক্রমণ এখনও সমানে চলিয়াছে। তাহাদের পরিবারের অনেকের (যাহারা পাশ পাইবার অধিকারী নয়) রেশন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বাড়ী ভাড়া এলাওয়েন্স পাইতে হইলে ভাড়ার রসিদ দেখাইতে হইবে বলিয়া হুকুম হইয়াছে; বড়লাটের নামে যে নূতন সার্ভিস রুল জারি হইয়াছে তাহার ফলে যে কোন কর্ম্মচারী "নিরাপত্তাবিরোধী কার্য্যকলাপে" লিপ্ত আছে এই **সন্দেহ** হইলেই ডিপার্টমেণ্টের বড়কর্ত্তা তাহাকে বরখাস্ত করিতে পারিবে, সেজন্য কোর্টে বিচার করার প্রয়োজন হইবে না। এক্ষেত্রে "নিরাপত্তা বিরোধী কার্য্যকলাপের" অর্থ যে ইউনিয়নের জন্য যে কোন রকমের কাজ করা তাহা বলাই বাহুল্য। গবর্নমেণ্ট জানাইয়া দিয়াছে যে প্রত্যেক মন্ত্রীর দপ্তরে শতকরা ২০ ভাগ খরচ কমান হইবে, ইহার ফলে হাজার হাজার রেল কর্ম্মচারীর চাকুরী যাইবে; ইহা ছাড়াও, পে-কমিশনের রায়ের অসঙ্গতিগুলি সম্পর্কে একটি দাবীও পূরণ করা হয় নাই।

এ-আই-আর-এফ তবুও নীরব। গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু করিবার সাহস তাহাদের নাই। কলিকাতা প্রভৃতি যে সব স্থানে জয়প্রকাশনারায়ণ সাহস করিয়া রেল শ্রমিকদের মধ্যে সভা করিয়াছে, সর্ব্বত্রই তাহাকে ক্রুদ্ধ রেল শ্রমিক কর্ম্মচারীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শ্রমিকদের মনোভাব এমন কি তাহার নিজের সমর্থকদের মনেও যে কতখানি তিক্ততার সঞ্চার হইয়াছে তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে; তাই এই ঝানু বিশ্বাস-ঘাতক তাহার সেই পুরাতন খেল আবার সুরু করিয়াছে। ২৪শে জুলাই পাটনায় এক বক্তৃতায় সে বলিয়াছে যে, যে-আশায় রেল ও ডাকতার ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। "ভবিষ্যতে সে আশা পূরণ হইবে কিনা তাহাও আমরা জানি না"। এই ভণ্ড গত তিন বছর ধরিয়া প্রত্যেকটি বিশ্বাসঘাতকতার পরেই এই একই কথা বলিয়া আসিতেছে।

জয়প্রকাশের এ-আই-আর-এফের সম্পাদক গুরুস্বামী বিভিন্ন রেলের জেনা-রেল ম্যানেজার, মন্ত্রী প্রভৃতি শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের সহিত এক মঞ্চ হইতে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছে। রেল-বোর্ডের অতিবশংবদ এই লোকটি স্বভাবতই এই সব কাজে খুব গৌরব অনুভব করে। ট্রিচিনোপল্লীর এক সভায় গুরুস্বামী রেল শ্রমিকদের নিজেদের দায়ীত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এবং রেলের দক্ষতা বাড়াইবার জন্য অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করিয়াছে। পাছে রেলশ্রমিকরা ভুলেও আশা করে যে তাহাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়ত হইবে, তাই নিঃ গুরুস্বামী স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে, "ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি আশা করিও না" কারণ কংগ্রেস গবর্নমেণ্ট সমস্ত দপ্তরেই শতকরা ২০ ভাগ খরচ কমাইতেছে।

এ-আই-আর যে আজ এক ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার সংগঠনে পরিণত হইয়াছে, একথা তাহার নেতারা ভালই জানে। যে খানেই তাহারা শ্রমিকদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, অথবা সভ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে সেখানেই তাহাদের মুখের মত জবাব লইয়া ফিরিতে হইয়াছে। এই সব নেতারা একথাও জানে যে গবর্নমেণ্ট আর এই সংগঠনকে ভয় করে না, কারণ ইহাকে তাহারা গবর্নমেণ্টের হাতে হাতি-য়ারে পরিণত করিয়াছে। এই জন্যই ৯ই মার্চ্চের পর হইতে, কংগ্রেস গবর্ন-মেণ্টের নূতন আক্রমণের সম্মুখেও এ-আই-আর-এফ ও তাহার নেতারা এমন জঘন্য ভূমিকা অভিনয় করিতেছে।

অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে পূর্ব্ব বঙ্গের রেলশ্রমিক

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম মজুরদের শক্তির সামনে খান খান হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

চট্টগ্রামেও জুলাই মাসে ঠিক এমনি ভাবেই ফ্যাক্টরীর মজুরগণ কর্ত্তৃপক্ষের কাজের ঘণ্টা বাড়ানোর আদেশকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে। সেখানেও কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছিল যে, ছুটির ভেঁপু আগের সময় হইতে আধা ঘণ্টা পরে বাজিবে। কিন্তু সাধারণ মজুরগণ লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতৃত্বে সভা করিয়া সিদ্ধান্ত করে যে, তাঁহারা বেশি সময় কাজ করিবেন না। মজুরগণ নিজেদের সেই সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পায়ে মাড়াইয়া তাঁহারা আগের সময় মতই ভেঁপু বাজাইয়া কারখানা হইতে বাহির হইয়া আসেন।

পূর্ব্ববঙ্গের রেল মজুরগণ আজ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা হইতে দালাল এমপ্লয়ীজ লীগের নেতাদেরও চিনিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, লালঝাণ্ডা ইউনিয়নই একমাত্র মজুরদের জঙ্গী লড়াইয়ের সংগঠন। তাই লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের প্রতি রেল মজুরদের আকর্ষণও আগের হইতে অনেক বাড়িয়াছে। লীগ সরকার চেষ্টা করিয়াছিল দমননীতি দ্বারা লালঝাণ্ডা ইউনিয়নকে দমন করিবে। সরকারের সেই চেষ্টাও আজ ব্যর্থ হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের রেলমজুর আজ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিজেদের শক্তির জোরেই কায়েম করিতেছেন। এই শক্তিকে রোধ করিবার ক্ষমতা লীগ সরকারের নাই।

কয়েকখানা মূল গ্রন্থ—

* কমিউনিষ্ট ইশতেহার—মার্কস্ ও এঙ্গেলস্, দাম বার আনা।
* পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি—এঙ্গেলস্, দাম আড়াই টাকা।
* রাষ্ট্র ও বিপ্লব—লেনিন, দাম আড়াই টাকা।
* কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা—লেনিন, দাম আট আনা।
* গ্রামের গরীবদের প্রতি—লেনিন, দাম এক টাকা।
* ১৯০৫ সালের বিপ্লব—লেনিন, দাম দশ আনা।
* সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—দাম চার টাকা।
* অক্টোবর বিপ্লব—ষ্টালিন, দাম আট আনা।

* * * *

বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা

লজোভস্কি—দাম আট আনা

আজ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা, যখন বুর্জ্জোয়াশ্রেণী অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে, বুর্জ্জোয়া-সরকার শ্রমিকের বাঁচার লড়াইকে রাইফেলের মুখে মোকাবিলা করছে, যখন বুর্জ্জোয়ার দালাল পোষাকুত্তারা শ্রমিকের ঐক্যকে ভেঙ্গে চুরমার করতে চাইছে, সেই অবস্থায় এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

নিউ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।

খাদ্য-দাবী করায়

অন্তঃসত্ত্বা কৃষক বধূ, ৯ বছরের মেয়ে ও ৬০ বছরের বৃদ্ধা সহ ১২ জন নিহত

হাটালে গুলিচালনার প্রকৃত বিবরণ

হাটালে গুলিচালনা সম্পর্কে যে সর্ব্বশেষ খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সেখানে মোট ১২ জন নিহত হইয়াছেন। নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা কৃষক বধূ, একজন ৯ বছরের মেয়ে এবং একজন ৬০ বছরের বৃদ্ধা। নিহত সকলেই মহিলা। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এই নির্ব্বিচার নারী হত্যা সম্পর্কে একটি প্রেসনোট জারি করা পর্য্যন্ত বিধান মন্ত্রিসভা প্রয়োজন মনে করেন নাই। ঘটনার প্রকৃত বিবরণ দেওয়া তো দূরের কথা, রক্ষিতা সংবাদপত্রগুলিতে যে সামান্য বেসরকারী (স্বভাবতই সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত) সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে কৃষকরা ধান লুটের জন্য জমিদার বসন্ত বেরার বাড়ী চড়াও হওয়াতেই গুলি চালাইতে হয়। হাওড়া জেলা ক্ষেতমজুর সমিতি ঘটনার যে প্রকৃত বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহা হইতেই এই প্রচার যে কত মিথ্যা তাহা প্রমাণ হয়। প্রমাণ হয় যে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ জনতার উপর অকারণে হামলা করিয়া ১২ জন ক্ষেতমজুর ও কৃষক মহিলাকে হত্যা করা হইয়াছে।

ঘটনা সম্পর্কে হাওড়া জেলা ক্ষেতমজুর সমিতি বি-পি-টি-ইউ-সি অফিসে নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন:

এই অঞ্চলে ৩৫ টাকার কমে কোথাও ধান পাওয়া যায় না। তাই গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীরা ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যমুনাবেলিয়া গ্রামের সবচেয়ে বড় জোতদার কলিকাতার ব্যবসায়ী এবং হাওড়া কোর্টের উকিল বসন্ত বেরার বাড়ী বিনা সুদে ধান ধার চাহিবার জন্য আসে। বসন্ত বেরার গোলায় অন্ততঃ ৫।৭ শত মণ ধান মজুত আছে। তবু সে ক্ষুধার্ত্ত ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের ধান ধার দিতে অস্বীকার করে। শুধু তাই না, সমবেত জনতাকে ভয় দেখাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে কেহ ভয় পায় না, তখন বসন্ত বেরার বাড়ীর দোতলা হইতে ৯ রাউণ্ড গুলি চালান হয়।

এই ঘটনার পরই গ্রামে পুলিস আসে। কিন্তু পুলিস বসন্ত বেরা কর্ত্তৃক বে-আইনি গুলিচালনার তদন্ত করা তো দূরে থাকুক, তাহার বাড়ীতেই আশ্রয় লয়।

বসন্ত বেরার ১ শত মণ ধান লুঠ হইয়াছে এই অভিযোগে পুলিস ৯ই সেপ্টেম্বর শিয়ালডাঙ্গা গ্রামের উপর চড়াও হয়। কিন্তু বাড়ী বাড়ী তল্লাস করিয়াও কোন ধান বাহির করিতে না পারিলেও, যাইবার সময় ৩ জনকে ধরিয়া লইয়া যায়।

৯ই ভোরে ১৮ জন সশস্ত্র পুলিস, ১০০ জন কংগ্রেসী সেবাদল গুণ্ডা হাটাল গ্রামে হামলা করে। গ্রামে ঢুকিবার পথে প্রায়

(১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যাঁহারা প্রাণ হারাইয়াছেন

যশোদা—৯ বৎসরের মেয়ে, ক্ষেতমজুর।

সুধাময়ী সাঁতরা—দিনমজুরের স্ত্রী, সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা।

ভাবময়ী দাসী—ক্ষেতমজুর।

সিন্ধুময়ী দাসী—তরিতরকারী বিক্রী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।

কালোপণ্ডিতের স্ত্রী—ক্ষেতমজুর।

মন্মথ পণ্ডিতের স্ত্রী—ক্ষেতমজুর, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা।

কুশী পাত্রের স্ত্রী—স্বামী ভাগচাষী।

আরও তিনজন মহিলা এবং একটি ছেলে নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহা ছাড়া ৯ জন আহত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটজনক।

দমদম জেলে গুলিচালনার কংগ্রেসী তদন্তের নমুনা

দমদম জেলে গত ৯ই জুন রাজবন্দীদের উপর যে গুলিচালানো হইয়াছিল বিধান মন্ত্রিসভা সম্প্রতি তাহার সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই গুলিচালনার ফলে সেদিন দমদম জেলে তিনজন বন্দী নিহত হইয়াছিলেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার এই সরকারী তদন্তের কাজ দুই ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করিয়া দিয়াছেন।

ঐ দিন তিনি দমদম জেলে যাইয়া তদন্তের সাহায্যের জন্য বন্দীদের প্রতিনিধিদের ডাকেন। বন্দীরা দাবী করেন যে, তদন্তের সময় প্রেস প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হউক এবং বন্দীদের উকিল ও সাক্ষীদের সাহায্য গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হউক।

বন্দীদের এই দাবী কমিশনার সাহেবের মনঃপূত হয় নাই। সরকারী তদন্তের জন্য এত ঝামেলা সহ্য করিতে কমিশনার সাহেব মোটেই রাজী নন। তাই তিনি বন্দীদের দাবী উপেক্ষা করিয়াই তদন্ত করেন এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই তদন্ত শেষ করিয়া চলিয়া যান।

প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দীদের আবার অনশন

প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দীদের আবার অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিতে হইয়াছে। মোট ১২২ জন বন্দী অনশন ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন কৃষক বন্দীর ইতিমধ্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা দিয়াছে।

জুনমাসে প্রেসিডেন্সী ও দমদম জেলে রাজবন্দীদের উপর গুলি চালানো হইয়াছিল। ফলে চারজন বন্দী নিহত হইয়াছিলেন। বন্দীরা সেই গুলি চালানো সম্পর্কে বে-সরকারী তদন্ত দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধান মন্ত্রিসভা সেই দাবী অগ্রাহ্য করিয়া লোক দেখানো তদন্তের জন্য এই তদন্তের ভার একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে দিয়াছে। এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদে প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দীরা ১৬ই সেপ্টেম্বর ২৪ ঘণ্টার জন্য অনশন করেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া বন্দীদের আত্মীয়দের সহিত দেখা করার অধিকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই জুলুমের প্রতিবাদে বন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

সম্পাদকীয়

রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীদের নূতন জঙ্গী সংগঠন

গত ১৬ই-১৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় সারা ভারতের রেল-শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন হইয়া গেল।

৯ই মার্চ্চের ছয় মাস পর এই সম্মেলন। কংগ্রেস সরকারের অকথ্য ফাশিস্ত সন্ত্রাসবাদ এবং সোশ্যালিস্ট নেতাদের হীন বিশ্বাসঘাতকতা—এই দুইয়ে মিলিয়া ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘট বন্ধ করে; এই দুইয়ে মিলিয়া তিন হাজার রেল শ্রমিক-কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের জেলে পুরিয়া ফেলে। মজুরি-হ্রাসের বিরুদ্ধে দাবী, মজুরি বৃদ্ধির দাবী, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দাবী, কাজের সময় কমাইবার দাবী, উপযুক্ত ছুটির দাবী—রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের সমস্ত দাবীই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাহারই মাঝে রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীদের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের অনুষ্ঠান।

ইতিমধ্যে, কংগ্রেস সরকারের আক্রমণ আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। ছাঁটাই, গ্রেনশপের সম্পূর্ণ বিলোপ, মাথাপিছু কাজের চাপ-বৃদ্ধি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে চক্রান্তও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই। সেই চক্রান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই বড়লাট 'রেলের চাকুরির নিয়মকানুন' ('রেলওয়ে সার্ভিসেস রুল্‌স') জারি করিয়া দিয়াছেন। সে 'রুল' অনুযায়ী রেলের যে কোন বিভাগীয় কর্ত্তা যে কোন শ্রমিক বা কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া দিতে পারেন—তিনি শুধু বলিবেন যে, "ধ্বংসমূলক" কার্য্যকলাপের অভিযোগ আছে! সে অভিযোগ প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন বা দায়-দায়িত্ব নাই! এমনই বড়লাটের সে 'রুল'।

এই কংগ্রেস সরকার এবং সোশ্যালিস্ট নেতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রমিকরা ইতিমধ্যে বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। আবারও, স্থানীয় ও বিভাগীয় নানা দাবীতে প্রত্যেকটি রেল পথে শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে লড়াইয়ের পর

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

মশাল

প্রথম বর্ষ, ১৫ সংখ্যা] ২৫শে সেপ্টেম্বর '৪৯ : ৮ই আশ্বিন '৫৬ [তিন আনা

রেল-শ্রমিকের নূতন জঙ্গী সংগঠন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লড়াই সুরু করিয়াছেন। সর্ব্বত্র সভা ও মিছিল হইয়াছে; অল্প-সময়ের জন্য কাজ-বন্ধও হইয়াছে; —সে সম্মিলিত লড়াই চলিয়াছে আরও নানা পথে। রেল কর্তৃপক্ষ ও সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধ আবারও বাড়িয়াই চলিয়াছে, ফাটিয়া পড়িতেছে। শ্রমিকদের স্বার্থের নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক জয়প্রকাশ ও গুরু স্বামী পর্য্যন্ত চিৎকার করিতেছে যে, সরকার তাহাদের ৯ই মার্চ্চের বিশ্বাসঘাতকতার দাম দিল না, একটি দাবীও পূরণ করিল না—তাহারা এখন বিশ্বাসঘাতকতার পাপ ঢাকিবে কী দিয়া!

এমনই পরিস্থিতিতে হইল এই ঐতিহাসিক রেলশ্রমিক কর্ম্মচারী সম্মেলন। শান্তিমূলক ব্যবস্থা ও গ্রেপ্তারের আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া সারা-ভারতের তিন শত প্রতিনিধি সারা-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে এই সম্মেলনে সমবেত হন। এস-আই, জি-আই-পি, বি-বি-সি-আই, ই-আই, এস-এস-এম, ই-পি, বি-এন, ও-টি, আসাম ও অন্যান্য রেল পথ হইতে গ্যাংম্যান, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার, পয়েন্টস্‌ম্যান, ফিটার, কেরানি প্রভৃতি প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে আসিয়া তাঁহাদের কারারুদ্ধ কমরেডদের স্থান গ্রহণ করেন; নানা সমস্যায় দুই দিন ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চালাইয়া তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—সে-সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ রেল-শ্রমিক কর্ম্মচারীকে লড়াইয়ে আগাইয়া দিবে।

ঐক্য,—ঐক্য আজ রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীদের সামনে মহা-গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেই ঐক্যে পূর্ণ আস্থা ঘোষিত হইয়াছে এই সম্মেলন হইতে। সোস্যালিস্ট নেতাদের বিভেদ প্রচেষ্টা এবং এ-আই-আর-এফ'এর ধর্ম্মঘট-ভাঙ্গাস্বরূপ খুলিয়া ধরা হইয়াছে। এদিকে মুষ্টিমেয় বিশ্বাস-ঘাতক ও দালাল এবং অপরদিকে, রেলশ্রমিক ও কর্ম্মচারী সাধারণ, যাঁহারা লড়াইয়ের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, দাবী-পূরণের জন্য যাঁহারা লড়াইয়ের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন—এই দুইয়ের পথ আজ আলাদা হইয়া গিয়াছে, সম্মেলন তাহাতে স্বাগত জানাইয়াছে। শত শত, সহস্র সহস্র রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীর এই ইচ্ছারই বাস্তব পরিপূরণ ঘটিয়াছে রেলশ্রমিকদের সারা ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের কাজে। রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের ঐক্য ও উন্নত জীবনযাত্রার সংগ্রামেরই হাতিয়ার হইল এই কেন্দ্রীয় জঙ্গী সংগঠন। সরাসরি কংগ্রেসী প্রভুদের নির্দ্দেশে যে বিশ্বাসঘাতক ও বিভেদপন্থী সোস্যালিস্ট নেতারা ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘট বানচাল করিয়াছে, তাহারাই তো খাড়া করিয়া রাখিয়াছে এ-আই-আর-এফ'কে, ঐ ধর্ম্মঘট ভাঙ্গা কেন্দ্রটিকে। তাহারই বিরুদ্ধে রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারী সাধারণের এই জঙ্গী সংগঠন।

সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে—রেলওয়ে বোর্ড ও কংগ্রেস সরকারের প্রত্যেকটি আক্রমণের বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রাম সংগঠিত করিতে হইবে, মূল দাবীগুলি পূরণের জন্য—মজুরি বৃদ্ধি, মাগ গিভাতা, গ্রেন-শপের সুবিধা, ৭ ঘণ্টা রোজ ও উপযুক্ত ছুটির জন্য এবং ছাঁটাই ও কাজের চাপবৃদ্ধির বিরুদ্ধে—অবিলম্বে সারা ভারতব্যাপী ধর্ম্মঘট সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

কংগ্রেস সরকার জনগণের সমস্ত অধিকার পদদলিত করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে সম্মেলন সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে —সংগঠনের অধিকার, ধর্ম্মঘটের অধিকার এবং সমস্ত রকমের ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যাপক সংগ্রাম গড়িয়া তোলা হইবে। কংগ্রেসী জেলে আটক রেল-শ্রমিক ও কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মুক্তির জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে—রেলশ্রমিকের এই জঙ্গী সংগঠনের মৌলিক কর্ম্মপন্থারই ইহা অঙ্গ। সম্মেলন সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের শত্রুদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে অবিশ্রান্তভাবে; জনগণ হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ধ্বংস করা হইবে। যে সব শ্রমিক আজও সোস্যালিস্ট নেতা ও অন্যান্য সংস্কারবাদী বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা বিপথচালিত হইতেছেন, সেই শ্রমিকদের নিকট সরাসরি আবেদন করা হইবে। সফল সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হইল ব্যাপক ভিত্তিতে গঠিত ইউনিয়ন। এই সম্মেলন সমস্ত প্রতিনিধিকে নির্দ্দেশ দিয়াছে যে, সেই ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে।

এই সম্মেলনের বিচারে দেখা গিয়াছে, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে গণতন্ত্রসম্মত অধিকারের জন্য সংগ্রাম এবং গণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম,—বর্ত্তমান পুঁজিবাদী কংগ্রেস সরকারের অবসান ঘটাইয়া আসিবে শ্রমিক, কৃষক ও শোষিত মধ্যবিত্তের সেই সরকার।

এই সম্মেলন তাই, রেলশ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন পথের সূচনা করিল। বিপুল-সংখ্যক রেলশ্রমিক-কর্ম্মচারীর প্রতিনিধি এই নূতন কেন্দ্রীয় সংগঠন; উন্নত জীবনযাত্রা ও ঐক্যের জন্য সংগ্রামেরই প্রতিনিধি হইল এই নূতন কেন্দ্রীয় সংগঠন। শ্রমিকদের উন্নত জীবনযাত্রাই শুধু নয়,—গণতন্ত্রসম্মত অধিকার, জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি এবং জনগণের গণতন্ত্রী সরকার গঠনের জন্য সফল সংগ্রামের পথেও এই নূতন জঙ্গী সংগঠন বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি তুলিয়া ধরিয়াছে।

২৪পরগনার গ্রামে আবার গুলিবর্ষণ

খবর পাওয়া গেল যে, সন্দেশখালী এলাকার দেউলী গ্রামে সশস্ত্র পুলিসেরা ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের উপর গুলি চালাইয়াছে।

কিছুদিন আগে এই জিলার রাধা-নগরে পুলিসেরা এক কৃষক জনতার উপর গুলি চালায়। ফলে নগেন দলুই নামে একজন কৃষক নিহত হইয়াছেন। গুলি চালাইবার পর পুলিসেরা ৪০ জন ক্ষেতমজুর ও কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে পুলিসের হামলা

বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে বিধান মন্ত্রি-সভার সশস্ত্র পুলিসের হামলা চলিয়াছে। ১৫ই আগস্ট বিষ্ণুপুরের আশেপাশের গ্রামের সাত হাজার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক বিষ্ণুপুর শহরে আসিয়া কমন-ওয়েলথের গোলামীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন····১৫ই আগস্টকে তাঁহারা কমনওয়েলথবিরোধী দিবস হিসাবে পালন করেন। তাহার পর হইতে-ই গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র পুলিসের হামলা বীভৎসরূপ ধারণ করিয়াছে। ১৮ই আগস্ট বাঁধগবা গ্রামের মজুর-কৃষকদের উপর গুলি-চালনা করা হয়—একজন মেয়ে ও একজন ছেলে গুলিতে নিহত হন।

এখন-প্রতিদিন-ই ১৫০ হইতে ৩০০ সশস্ত্র পুলিস বিষ্ণুপুর অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে হানা দিতেছে। কতগুলি গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে—গ্রামবাসীরা জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিধান মন্ত্রিসভার পুলিসের দল জোতদার ও দালালদের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে ঢুকিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই প্রহার করিতেছে, মেয়েদের উপর হিটলারী দস্যুদের মতন অত্যাচার চালাইতেছে; মজুর-কৃষকদের ঘরের সামান্য জিনিসপত্রও লুটিয়া নিতেছে।

শিবরডাঙ্গা, মাগুরাসিনি, বালিবিল, আড়ুই-বিল, বরাকড়, জরকা, পরীবেড়া প্রভৃতি গ্রামের মজুর-কৃষকেরা তাঁহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া সশস্ত্র পুলিসের এই ফ্যাসিস্ট অভিযান রুখিতেছেন।

কিন্তু পুলিসেরা শুধু হামলা করিয়া-ই ক্ষান্ত থাকিতেছে না। তাহারা আবার গুলি চালাইতে সুরু করিয়াছে। জগন্নাথ-পুরে-ই তাহাদের প্রধান ক্যাম্প বসিয়াছে। এই ক্যাম্পের পুলিসেরা-ই গত ২রা সেপ্টেম্বর মজুর-কৃষকদের উপর গুলি-চালাইয়াছে। গুলিতে দুইজন মজুর-কৃষক নিহত হইয়াছেন।

মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে বাঁকুড়ার গ্রামে দুইবার গুলি চলিল—৪ জন মজুর-কৃষক নিহত হইলেন।

বিপ্লবী ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা

লজোভস্কি—দাম আট আনা

আজ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা, যখন বুর্জ্জোয়াশ্রেণী অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে, বুর্জ্জোয়া-সরকার শ্রমিকের বাঁচার লড়াইকে রাইফেলের মুখে মোকাবিলা করছে, যখন বুর্জ্জোয়ার দালাল পোষাকুত্তারা শ্রমিকের ঐক্যকে ভেঙ্গে চুরমার করতে চাইছে, সেই অবস্থায় এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

* **১৯০৫ সালের বিপ্লব** লেনিন, দাম দশ আনা।

নিউ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

টাকা, চিঠি ও রিপোর্ট পাঠানোর নাম ও ঠিকানা

মঞ্জিলের এজেন্ট ও গ্রাহকদের প্রতি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

'মঞ্জিলে'র জন্য টাকা, চিঠিপত্র ও রিপোর্ট পাঠাইবার একমাত্র নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হইল।

এজেন্টদের কাছে অনুরোধ এই সংখ্যা কাগজ পৌছামাত্র নিজেরাই হিসাব করিয়া বাকী-বকেয়া টাকা পাঠাইয়া দিবেন। বিলের জন্য অপেক্ষা করিবেন না।

সুধীর সেন

২৪ নুর মহম্মদ লেন।

কলিকাতা—৯

সারা ভারত রেলশ্রমিক কনভেনশনে প্রস্তুতি কমিটির রিপোর্ট

ধনিক সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে, সোস্যালিষ্ট নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে—

সারা ভারত রেল কনভেশনে প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তাহাতে বলা হয় যে :

এস-আই-আর লেবার ইউনিয়ন, ই-আই রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, আসাম রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ও-টি রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পূর্ব্ব পাঞ্জাব রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বি-বি-সি-আই রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়ন, জি, আই, পি রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন এবং এম-এস-এম রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা যে সব বিরাট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন তাহার মধ্যে প্রথম হইল—ভারতীয় রেল শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের একটি **নূতন কেন্দ্রীয় সংগঠন** প্রতিষ্ঠা করা; এবং ভারতীয় রেল শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন মূল দাবী আদায় ও পুঁজিবাদী সরকার এবং তাহার রেল বোর্ডের সর্ব্বাত্মক আক্রমণ রোখার জন্য এক চরম **সর্ব্ব ভারতীয় সংগ্রামের জন্য** প্রস্তুত হওয়া।

এই সব ইউনিয়নই বছরের পর বছর ধরিয়া শ্রমিকদের সংগ্রাম পরিচালিত করিতেছে। ১৯৪৬ সালের ২৭শে জুন সাধারণ ধর্ম্মঘটের জন্য সংগ্রাম হইতে সুরু করিয়া ৯ই মার্চ্চের সাধারণ ধর্ম্মঘটের ঐতিহাসিক আহ্বান পর্য্যন্ত ভারতীয় রেল শ্রমিকদের প্রতিটি সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল এই সব ইউনিয়নগুলি।

গবর্নমেণ্ট জানে যে, রেল শ্রমিকদের অগ্রণী বাহিনী এই সব ইউনিয়নগুলিকে দমন করিতে না পারিলে রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণকে কিছুতেই সফল করা যাইবে না। তাই সরকারী দমননীতির ঝড় নামিয়া আসিয়াছে এই সব ইউনিয়নের মাথার উপর। শুধু ৯ই মার্চ্চের সময়েই এই সব ইউনিয়নের অন্তত তিন হাজার কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তারা আজ হয় বন্দী নয়ত গা'ঢাকা দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সরকারী দমননীতি ছাড়াও জাতীয় টি-ইউ এবং সোস্যালিস্ট নেতাদের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিভেদ চেষ্টার বিরুদ্ধেও ইহাদের লড়িতে হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট ও রেল বোর্ড এই বিশ্বাসঘাতক বিভেদকারীদের সর্ব্বরকমে সাহায্য করিয়াছে। জঙ্গী ইউনিয়নগুলির 'স্বীকৃতি' নকচ করিয়া দালাল ইউনিয়নকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এত নির্য্যাতন ও বিভেদের পরও এই সব ইউনিয়ন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দমননীতি যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই সব ইউনিয়নের নীতির মধ্যে শ্রমিকের প্রকৃত আশা ও আকাঙ্ক্ষা রূপ পাইয়াছে।

কংগ্রেসী ধনিক সরকার প্রচার করে যে রেল শ্রমিকরা "অপেক্ষাকৃত ভাল মাহিনা পায়"। এই প্রচার যে কতবড় মিথ্যা রিপোর্টে দেখান হইয়াছে।

কোটিপতি বিড়লার কাগজ 'ইস্টার্ন ইকনমিস্টের'ই হিসাব মতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ একজন রেল শ্রমিকের গড়পড়তা বাৎসরিক আয়ছিল ৭৬৯ টাকা। আর ১৯৩৯ সালে এই আয় ছিল ৫৪১ টাকা। অর্থাৎ '৩৯ থেকে '২৮ এর মধ্যে রেল শ্রমিকের আয় বেড়েছে শতকরা মাত্র ৪৩ ভাগ অথচ এই সময়ের মধ্যে (সরকারী হিসাব মতেই) জীবনধারণের খরচ বাড়িয়াছে শতকরা ১৫০-২০০ ভাগ।

এমন কি অন্যান্য প্রধান শিল্পের শ্রমিকদের তুলনায় পর্য্যন্ত রেল শ্রমিকের আয় কম। একজন সুতাকল শ্রমিকের গড়পরতা বাৎসরিক আয় যেখানে ৯১১·৩ টাকা, একজন রেল শ্রমিকের আয় সেখানে মাত্র ৭৬৯·২ টাকা।

সাধারণ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হও

১৯৪৮ সালে রেল শ্রমিকের এই সামান্য আয়ের উপর পর্য্যন্ত নূতন আক্রমণ আসিয়াছে। শস্তা গ্রেনশপের সুবিধা কাড়িয়া লইয়া গবর্নমেণ্ট আসলে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের মজুরি ও মাহিনা কাটিয়া লইয়াছে।

এইভাবেই পুঁজিবাদের ক্রমবর্দ্ধমান সাধারণ সংকট রেল শ্রমিকদের আঘাত করিয়াছে।

এই অবস্থার বিরুদ্ধেই, বাঁচিবার মত মজুরি ও চাকুরির স্থায়ীত্ব—এই মূলদাবীর জন্য রেল শ্রমিকরা লড়িতেছে।

নূতন আক্রমণ

১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসেই রেল অনুসন্ধান কমিটি তাহার রিপোর্টে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের সুপারিশ করিয়াছেন। সোস্যালিস্ট নেতারা ও তাহাদের প্রতিনিধি গুরুস্বামী এই সুপারিশের অংশীদার।

কিন্তু সারা ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘটের ভয় যতদিন ছিল ততদিন গবর্নমেণ্ট রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সাধারণ সর্ব্বব্যাপী আক্রমণ সুরু করার সাহস পায় নাই।

নিরংকুশ দমননীতি এবং সোস্যালিস্ট নেতাদের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে ৯ই মার্চ্চের সংগ্রামকে সাময়িকভাবে দমন করিয়া এখন গবর্নমেণ্ট এনকোয়ারী কমিটির সমস্ত সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী রেল কারখানাগুলি হইতে ৩২০০০, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট হইতে ৬৫০০, গ্রেনশপ হইতে ২০০০০ এবং সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট হইতেই হাজার হাজার অস্থায়ী শ্রমিক-কর্ম্মচারী ছাঁটাই করিতে হইবে;

—গ্রেনশপ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

—ইউনিয়ন কর্ম্মীদের বরখাস্ত করা হইবে; এবং 'জব এনালিসিসে'র নামে খাটুনি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে।

গবর্নমেণ্টের এই আক্রমণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সারা ভারতের রেল শ্রমিকদের সাধারণ সংগ্রাম ছাড়া এই আক্রমণকে পরাস্ত করাব কোন উপায় নাই।

নূতন সংগঠন কেন?

গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা ইহাও প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, রেল-ফেডারেশনের (এ-আই-আর-এফ) মারফৎ কোন সংগ্রামই আজ আর সম্ভব নয়। রেল-ফেডারেশনের সোস্যালিস্ট নেতারা শুধু যে ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়াছে তাহাই নয়। এখানে আজ যে সব ইউনিয়ন উপস্থিত আছে তাহাদের রেল-ফেডারেশন হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে, কারণ এই ইউনিয়নগুলি ৯ই মার্চ্চ সাধারণ ধর্ম্মঘটের সমর্থন করিয়াছিল।

শুধু তাহাই নয়, রেল-ফেডারেশনের নেতারা আজ গবর্নমেণ্টের সৃষ্ট 'জাতীয়' রেল ফেডারেশনের নেতাদের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে গোপন আলোচনা চালাইতেছে।

সোস্যালিস্ট নেতাদের দ্বারা পরিচালিত রেল-ফেডারেশন আজ আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাসঘাতকতার হাতিয়ারে ধনিক কংগ্রেসী সরকারের সহিত সহযোগিতার হাতিয়ারে, শ্রমিকদের সমস্ত ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে। এই রেল-ফেডারেশনের মারফৎ আর কোন সংগ্রাম চালান সম্ভব নয়।

সেই জন্যই রেল শ্রমিক কর্ম্মচারীদের নতুন কেন্দ্রীয় জঙ্গী সংগঠন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্বাসঘাতকতার সুদীর্ঘ ইতিহাস

গত তিন বৎসরে রেল শ্রমিক সংগ্রামের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্ত্তে সোস্যালিস্ট নেতারা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

১৯৪৬'এর জুন মাসে সাধারণ রেল ধর্ম্মঘট সোস্যালিস্ট নেতারা, কংগ্রেসী ও লীগ নেতাদের সহিত মিলিয়া, বানচাল করিয়া দেয়।

প্রথম হইতেই শিবনাথ ব্যানার্জ্জি প্রমুখ সোস্যালিস্ট নেতারা শ্রমিকদের দাবী যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টা করে, তারপর খেদগীকর, কালাপ্পা, এম-এল-খাঁ প্রভৃতিদের সাথে হাত মিলাইয়া স্ট্রাইক ব্যালট বানচাল করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও ২॥ লক্ষ শ্রমিক ও কর্ম্মচারী বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে ধর্ম্মঘটের পক্ষে ভোট দেন। ধর্ম্মঘটের প্রস্তাবিত তারিখের কয়েকদিন আগে ফেডারেশনের এক সভায় শিবনাথ ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনে, কিন্তু শ্রমিক প্রতিনিধিরা টিটকারী দিয়া তাহাকে বসাইয়া দেয়।

আতংকিত ভারত সরকার তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া শ্রমিকদের কয়েকটা সুবিধা দিয়া ধর্ম্মঘট বানচাল করার চেষ্টা করে। সংগ্রামী ইউনিয়নগুলির পক্ষ হইতে কমরেড কল্যাণসুন্দরম প্রস্তাব আনেন যে, এই সব 'সুবিধা' প্রত্যাখ্যান করিয়া ধর্ম্মঘট সুরু করা হোক। কিন্তু সোশ্যালিস্ট ও কংগ্রেস নেতারা সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এই ভাবে রেল শ্রমিকদের প্রথম সর্ব্ব-ভারতীয় সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতা :—কেন্দ্রীয় পে-কমিশনের রিপোর্টে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মোটেই পূরণ হইল না দেখিয়া, গোরখপুর কনভেনশনে কমরেড শের মহম্মদ একদিন প্রতিবাদ ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব আনেন। সোস্যালিস্ট নেতারা সে প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করে।

গবর্নমেণ্টও বুঝিতে পারেন, ফেডারেশনের সোস্যালিস্ট নেতারা কখনও ধর্ম্মঘট হইতে দিবে না, সুতরাং তাহারা নির্ভয়ে শ্রমিকদের সমস্ত ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দেয়।

তৃতীয় বিশ্বাসঘাতকতা :—কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ভারত বিভাগ হইয়া গেল। রেল শ্রমিকদের বলা হইল কোন ডমিনিয়নে থাকিবে তাহা স্থির করিতে। আসলে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করাই ছিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। ফেডারেশনের সোস্যালিস্ট নেতারা এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে নাই। বোম্বাইয়ের ২৫০০০ রেল শ্রমিক ২৭শে জুন এই ব্যাপারে ধর্ম্মঘট করেন। সশস্ত্র পুলিস ধর্ম্মঘটীদের আক্রমণ করে কিন্তু শ্রমিকরা বীরের মত তাহার প্রতিরোধ করেন। কিন্তু জয়প্রকাশ, পিটার আলভারিজ প্রভৃতি সোস্যালিস্ট নেতারা গবর্নমেণ্টের এই বর্ব্বরতার প্রতিবাদ না করিয়া শ্রমিকদেরই নিন্দা করে। এমন কি শ্রমিকদের 'অপরাধের তদন্তের জন্য এক কমিটি পর্য্যন্ত নিয়োগ করে।

চতুর্থ বিশ্বাসঘাতকতা :—কংগ্রেস-লীগের কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট রেল শ্রমিকদের কোন দাবীই পূরণ না করায় দিল্লীতে ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিলের সভায় (৪ঠা আগস্ট '৪৭) আবার ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব আনা হয়। জয়প্রকাশ ও সোস্যালিস্ট নেতাদের বিরোধিতায় এবারও

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংগ্রামের জন্য মিলিত ফ্রন্ট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রস্তাব পাস হইতে পারে না।

পঞ্চম বিশ্বাসঘাতকতা : গবর্নমেণ্ট শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন দাবি স্বীকার তো করিলই না, উল্টা রেলবোর্ড এমন সব নূতন নির্দ্দেশ জারি করিতে লাগিল যাহাতে বহু শ্রমিক কর্ম্মচারীর গ্রেড কমিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অকর্ম্মণ্যতা, ঘুষ লওয়া প্রভৃতি কুৎসা। ফেডারেশনের সভাপতি জয়প্রকাশ এই কুৎসার প্রতিবাদ না করিয়া, ৫ই জানুয়ারী (১৯৪৮) তাহার রেল কর্ম্মচারীদের প্রতি চিঠিতে এই সমস্ত কুৎসারই পুনরাবৃত্তি করিল, লিখিল "এই সমস্ত অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয় তাহা আপনারা স্বীকার করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে।"

এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে, এই জানুয়ারী মাসেই ফেডারেশনের সভায় কমরেড জ্যোতি বসু ১৯৩১ সালের আগেকার কর্ম্মচারীদের দাবি সম্পর্কে, 'ট্রেড টেস্ট' রহিত করা সম্পর্কে যতগুলি প্রস্তাব আনেন তাহার প্রত্যেকটি জয়প্রকাশ ভোটের জোরে নাকচ করিয়া দেয়।

ষষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকতা : সোস্যালিস্ট নেতাদের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা চরম রূপ নেয় ফেডারেশনের লিলুয়া অধিবেশনে। গবর্নমেণ্ট শ্রমিকদের একটি দাবিও স্বীকার না করার ফলে সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। ঠিক সেই সময় ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে জয়প্রকাশ ফেডারেশনের মঞ্চ হইতেই প্রকাশ্যে ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করে, শ্রমিকদের বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রায় সব দাবিই মানিয়া লইয়াছে। লিলুয়ার বক্তৃতায় জয়প্রকাশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, তাহারা একটা দাবি পূরণ হইলেই অমনি আরএকটা দাবি উপস্থিত করে। সরকারী রেল বোর্ডের সদস্যরাও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই নির্লজ্জ মিথ্যা বলার সাহস পাইত কিনা সন্দেহ!

সপ্তম বিশ্বাসঘাতকতা : ৬ই নভেম্বর জয়প্রকাশের সুযোগ্য সহকারী গুরুস্বামী রেল এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টে সই করিয়া রেল শ্রমিকদের উপর সরকারী আক্রমণে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া দেয়।

সর্ব্বশেষ বিশ্বাসঘাতকতা—৯ই মার্চ্চ : গত তিন বৎসরের বিশ্বাসঘাতকতার এই সুদীর্ঘ ইতিহাস চরম রূপ নেয় যখন সোশ্যালিস্ট নেতারা প্রকাশ্যে ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে গবর্নমেণ্টকে সাহায্য করে। এই বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস এতই সুবিদিত যে, এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন করে না।

এইভাবে সোশ্যালিস্ট নেতারা রেল-ফেডারেশনকে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার সংগঠনে, গবর্নমেণ্টের দালাল সংগঠনে পরিণত করিয়াছে।

এই জন্যই নূতন সংগঠন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই নূতন সংগঠনের কাজ হইবে চরম সংগ্রামের জন্য সমস্ত সংগ্রামী শক্তিকে একত্র জমায়েৎ করা।

রেলশ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থা ও মূলদাবী

রিপোর্টে সরকারী তথ্য হইতেই দেখান হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে একজন ৪র্থ গ্রেড রেলশ্রমিকের গড়পড়তা মজুরি মাসে মাত্র ২০ টাকা বার আনা।

এই নামমাত্র মজুরির উপরও আক্রমণ আসিতেছে। গ্রেনশপ কনশেসন কাটিয়া লওয়ার প্রত্যেক রেলশ্রমিক মাসে ২০-২৫ টাকা লোকসান হইয়াছে। তাহার উপর আবার 'শ্রেণী বিভাগের নামে', ট্রেড টেস্টের নামে এবং আরও অসংখ্য অজুহাতে তাহার আয় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাগ্‌গীভাতার দিক দিয়াও রেলশ্রমিক বঞ্চিত। বোম্বাইয়ের একজন সুতাকল শ্রমিক যেখানে মাসে ৫৫ টাকা ভাতা পায় (অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় ইহাও যথেষ্ট নয়) রেলে একজন ৪র্থ গ্রেড কর্ম্মচারীর ভাতা সেখানে মাত্র ৩৫ টাকা।

জানুয়ারী মাসে রানিং স্টাফের জন্য যে নূতন স্কেল ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার ফলে তাহাদের আয় আরও কমিয়া যাইবে।

—ছাঁটাই বন্ধ এবং সমস্ত ছাঁটাই শ্রমিক-কর্ম্মচারীর পুনর্নিয়োগ।

—ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি, সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করার অধিকারের স্বীকৃতি।

এই দাবীগুলি ধনতন্ত্রবাদের মূলে আঘাত করে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে এক ব্যাপক সর্ব্বভারতীয় সংগ্রাম ছাড়া এই সব দাবী পূরণ হইতে পারে না। এ-আই-টি-ইউ-সি সমস্ত শ্রমিককে অনুরূপ দাবীর ভিত্তিতে চরম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতেছে, রেল শ্রমিকদের নূতন সংগঠনেরও কাজ হইবে রেল শ্রমিকদের এই দাবীর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা।

রেল শ্রমিকদের প্রতিরোধ

গত তিন বৎসরে সারা ভারতের প্রত্যেক রেল পথে শ্রমিকরা যে অপূর্ব্ব প্রতিরোধ সংগ্রাম করিয়াছে তাহার বিবরণ দিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে :

রেল বোর্ড পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ধর্ম্মঘটের ফলে তিন লক্ষ ১০ হাজার শ্রমদিন নষ্ট হইয়াছে।

এই সমস্ত ধর্ম্মঘট সংগ্রাম হইতেই বোঝা যায় যে, শ্রমিকরা সরকারী আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বোঝা যায় যে, শ্রমিকরা আজ কতখানি বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্যে শ্রমিকদের বুঝাইতে হইবে কেন এক সাধারণ সংগ্রাম ছাড়া আক্রমণ বন্ধ করিবার, দাবি আদায় করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

এই প্রত্যেকটি সংগ্রামের মধ্য দিয়া নূতন নূতন জঙ্গী কমিটি গড়িয়া তুলিতে হইবে, সাধারণ শ্রমিকদের নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে হইতে।

সংগ্রামের জন্য মিলিত ফ্রন্ট

আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে :

সাধারণ শ্রমিকেরা আজ জঙ্গী ইউনিয়নগুলির কর্ম্মসূচি সমর্থন করে, সোশ্যালিস্টদের সম্পর্কে তাহাদের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটিতেছে। তাহাদের অগ্রগামীরা সংগ্রামী ইউনিয়নগুলির মধ্যে আছে কিন্তু ব্যাপক শ্রমিক সাধারণ হয় কোন ইউনিয়নের মধ্যেই নাই, নয়ত এখনও সোশ্যালিস্ট নেতাদের প্রচারে বিভ্রান্ত। শ্রমিক সধারণ চরম সংগ্রামের পক্ষে, কিন্তু তাহার জন্য সংগঠিত নয়। শ্রমিকদের মধ্যেকার এই বিভ্রম, এই বিভেদ গবর্নমেণ্টকে সাহায্য করিতেছে।

এই বিভেদের অবসান করা, সংগ্রামের জন্য মিলিত ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলা, প্রত্যেক শপ ও ডিপার্টে শ্রমিকদের মিলিত ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলা—ইহাই হইল সংগ্রামী ইউনিয়নগুলির সবচেয়ে জরুরী দায়িত্ব।

পুঁজিপতিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে

সংগ্রামী ইউনিয়নের জরুরী দায়িত্ব

ইহার উপর সুরু হইয়াছে ছাঁটাই, একমাত্র জি-আই-পি'রই তিনটি কেন্দ্রে ৯ই মার্চ্চের পর ৭০০ শত ছাঁটাই হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ছাঁটাই চলিতেছে! বিপুল সংখ্যক অস্থায়ী শ্রমিক প্রতি মুহূর্ত্তে ছাঁটাইয়ের আশংকায় রহিয়াছে।

তারপর আছে 'ট্রেড টেস্ট' প্রভৃতির জুলুম, জঙ্গী ইউনিয়ন কর্ম্মীদের ছাঁটাই ইত্যাদি।

ইহার উপর আসিয়া যোগ দিতেছে এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট—সর্ব্বাত্মক আক্রমণ।

এই সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়াই এ-আই-টি-ইউ-সি রেল শ্রমিকদের জন্য নিম্নলিখিত দাবি উপস্থিত করিয়াছে :

—৪র্থ গ্রেডের জন্য সর্ব্বনিম্ন বেতন ৮০টাকা এবং ৩য় গ্রেডের জন্য ১২০টাকা। নিয়মিত মাসিক বৃদ্ধি হইয়া যথাক্রমে ১২০ টাকা ও ২০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিবে।

—১৯৪৭ সালে যেমন ছিল সেইরূপ গ্রেনশপের সুবিধা চালু রাখিতে হইবে।

—জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধির পূর্ণ পরিমাণ মাগ্‌গীভাতা।

—২ লক্ষ অস্থায়ী ও বদলী শ্রমিকের পাকা চাকুরী।

—দিনে অনধিক সাত ঘণ্টা ও সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ।

—বেতনসহ ১ মাস প্রিভিলেজ ও ২০ দিন ক্যাজুয়েল লীভ।

—রেল এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাহার।

অর্থনৈতিক সংকট যতই আরও তীব্র হইবে শ্রমিকরা ততই বুঝিতে পারিবে যে, সংগ্রাম ছাড়া বাঁচিবার কোন পথ নাই। ৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘট না হওয়ায় কতখানি ভুল হইয়াছে তাহা শ্রমিকরা বুঝিতে সুরু করিয়াছে। এখন কি সোশ্যালিস্টদের সমর্থক সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

সুতরাং আজ প্রয়োজন হইতেছে বিশ্বাসভরে রেল শ্রমিক কর্ম্মচারী সাধারণের নিকট যাওয়া ও সাধারণ সংগ্রামের জন্য তাহাদের জমায়েৎ করা।

ইহার জন্য প্রয়োজন সংস্কারবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং গবর্নমেণ্টের দমননীতির স্বরূপ শ্রমিকদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়া। শ্রমিকদের বোঝান দরকার ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি সংগ্রাম কঠিন যুদ্ধের রূপ লইবে।

আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি

সংগ্রামী ইউনিয়নগুলির কাজে যে দুর্ব্বলতা দেখা গিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া, সেগুলি দূরকরার জন্য রিপোর্টে বলা হইয়াছে—

প্রত্যেকটি ছাঁটাই, খাটুনি বৃদ্ধির প্রত্যেকটি চেষ্টা, প্রত্যেকটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। অস্থায়ী ও বদলী শ্রমিকদের স্থায়ী করার জন্য, গ্রেনশপ বন্ধ করিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক-কর্ম্মচারীকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

এইরূপ প্রত্যেকটি আংশিক সংগ্রামের সংগ্রামের ভিত্তিতে যে কাজের ঐক্য গড়িয়া উঠিবে তাহাই হইল প্রকৃত মিলিত ফ্রণ্ট। সেই সঙ্গে সংস্কারবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। এই ভাবেই প্রকৃত সংগ্রামী মিলিত ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলা যাইবে।

সেই সঙ্গে সংগ্রামী ইউনিয়নগুলিকে সত্যিকারের গণ-ইউনিয়নে পরিণত করিতে হইবে এবং এ-আই-টি-ইউ-সি'কে রেল শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে।

বিশ্বাসঘাতক নেতাদের শ্রমিক-বিরোধী, সংগ্রাম-বিরোধী পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষায় দলমত নির্ব্বিশেষে সমস্ত শ্রমিকের জঙ্গী একতা গড়িয়া তুলিবার জন্য সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসী ও অদলীয় শ্রমিক সাধারণের প্রতি আবেদন করিয়া রিপোর্ট শেষ হইয়াছে।

রেল শ্রমিক সম্মেলনের রিপোর্ট

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মঞ্জিলের নিয়মাবলী

(১) প্রতি রবিবার কাগজ বাহির হইবে। দাম তিন আনা।

(২) ১০ কপির কম এজেন্সী নাই। শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন।

(৩) গ্রাহকদের হার :—বার্ষিক ১০৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা ত্রৈমাসিক ২৷৷০ টাকা।

মঞ্জিল

❋ ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ ❋

ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ-ই পুঁজিবাদী শিবিরে মূল বিরোধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—১৯২৮ সালেই জেনারেলিসিমো স্টালিন একথা ভালোভাবে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

তৈলের প্রশ্নই ধরা যাক্। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ এবং যুদ্ধ উভয়ের জন্যই তৈলের চুড়ান্ত গুরুত্ব রহিয়াছে। পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারের প্রশ্ন ধরা যাক্। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বাঁচিয়া থাকার জন্য এবং তার বিকাশের জন্য পণ্যদ্রব্য বিক্রির বাজারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কারণ পণ্যদ্রব্য বিক্রির নির্ভরযোগ্য বাজার না থাকিলে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা অসম্ভব। বিদেশে পুঁজির রপ্তানীর বাজারের প্রশ্ন ধরা যাক। বিদেশে পুঁজি রপ্তানী করা সাম্রাজ্যবাদের একটি বিশেষ লক্ষণ। সর্ব্বশেষে পণ্যদ্রব্যের বাজারে বা কাঁচামালের বাজারে পৌঁছিবার জলপথের প্রশ্ন ধরা যাক। এই সমস্ত প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলি একটি মূল সমস্যায় আসিয়া মিশিয়াছে। সে সমস্যাটি হইল দুনিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে সংগ্রামের সমস্যা। স্ট্যালিন এই কথাই সেদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তাহার পর কুড়ি বৎসরেরও বেশি সময় পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্টালিনের এই সিদ্ধান্তগুলি বর্ত্তমান কালেও সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান সময়ে এই সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে; কারণ, প্রথমতঃ পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট আজ বাড়িয়া যাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ হিটলারের জার্ম্মানীর এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে মাত্র দুইটি মহাশক্তি রহিয়াছে; ফরাসীদেশ আজ আর মহাশক্তির পর্য্যায়ে নাই—সে দেশ আজ দ্বিতীয় স্তরের রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

যুদ্ধের দৌলতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রচুর মুনাফা লুটিয়াছে এবং ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। সারা দুনিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তবুও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে আজ প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, উপনিবেশের বড় বড় বাজার এবং কাঁচামালের জনপদগুলি রহিয়া গিয়াছে। নিজেদের এই ঘাঁটি রক্ষা করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখনো চেষ্টা করিতেছে। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই অবস্থার সঙ্গে কোনরূপ মিটমাট করিয়া চলিতে-ই রাজী নয়—তাহারা চায় দুনিয়ার উপর একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব। তাই বর্ত্তমান যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামরিক এবং আর্থিক ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাহার সমস্ত ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় অভিযান আমরা দেখিতেছি।

আমেরিকা এবং বৃটেনের শাসক গোষ্ঠীরা একযোগে আক্রমণাত্মক নীতি-ই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—তাহারা দুনিয়ার বুকে আর একটি যুদ্ধ বাঁধাইবার চেষ্টা করিতেছে; সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নয়াগণতন্ত্রের দেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য তাহারা তোড়জোর করিতেছে এবং সেজন্য সামরিক চুক্তিতে তাহারা একযোগে অংশ গ্রহণ করিতেছে; উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য তাহারা একযোগে একই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত কাজে তাহাদের মিতালী কিন্তু তাহাদের নিজেদের মধ্যকার বিরোধগুলিকে একটুও কমায় নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারার নাম দিয়া আমেরিকা অতলান্তিক উপকূলে বৃটেনের যে সমস্ত ঘাঁটি ছিল তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহার বিনিময়েই এই ঘাঁটিগুলি গ্রাস করা হইয়াছে। বৃটেনের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমেরিকা বৃটেনকে প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার বাজার হইতে হটাইয়া দিয়াছে এবং ইহার সাথে সাথে তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত বাজারে-ই যাইয়া আসর জমাইয়া বসিতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কানাডার উপর তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—কানাডায় তাহারা ৫০০ কোটি ডলারের বেশি পুঁজি খাটাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার উপরে তাহারা নিজেদের প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছে (এখানে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার রহিয়াছে—যুদ্ধের পূর্ব্বেকার অবস্থার তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ায় মার্কিন পুঁজি ও পণ্য রপ্তানী তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে অর্থাৎ মার্কিন রপ্তানী বৃটেনের রপ্তানীর দ্বিগুণ হইয়াছে) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাণপণে দ্রুতগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার দেশগুলিতে প্রবেশ করিতেছে—প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাহারা এই সমস্ত দেশগুলি হইতে হটাইয়া দিতেছে। এ কথা উল্লেখ করা আজ নিষ্প্রয়োজন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলি আর বৃটেনের হাতে নাই—সেগুলি আজ আমেরিকার হাতে।

মার্কিন মহাদেশে এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে নিজেদের ঘাঁটিগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য বৃটেন যে সমস্ত চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রত্যেকটিকেই আমেরিকা বাধা দিতেছে। বৃটেন আর্জেন্টিনার সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছিল তাহা লইয়া সম্প্রতি আমেরিকা ও বৃটেনর মধ্যে সংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমেরিকা প্রকাশ্যেই জিদ করিয়া বলিতেছে যে, এই চুক্তি বাতিল করিতে হইবে এবং সেজন্য বৃটেনকে আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিশোধ লইবার ভয়ও দেখানো হইয়াছে।

নিকট এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তৈল-ঘাঁটিগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব লইয়া মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে। ইরান, ইরাক, সৌদী আরব এবং কুওয়াইতে মোটামুটিভাবে নিকট এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশেই মার্কিন ও বৃটিশ স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়াছে। মার্কিন ও বৃটিশ তৈল কোম্পানীগুলির স্বার্থের সংঘাত এই সমস্ত দেশে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি কে দখল করিবে তাহার সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই ইহার অভিব্যক্তি হইয়াছে। সিরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদেরই প্রভাব সুদৃঢ় করা হইতেছে। ইরাক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই একটি অর্দ্ধ-উপনিবেশ। সম্প্রতি সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে তাহা ইঙ্গ-মার্কিন সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছু নয়—শুধু মাত্র একটি পাতলা পর্দ্দা দিয়া এই সংঘর্ষকে লোকচক্ষুর অড়ালে রাখা হইয়াছে।

নিকট প্রাচ্যের তৈলের জন্য সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমধ্যসাগরের প্রশ্ন আজ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভূমধ্যসাগরকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড, বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ঘাঁটি হিসাবেই দেখিয়া আসিয়াছে এবং ইহার উপর একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্বের জন্য তাহারা সংগ্রাম করিয়াছে। আজ তাহারা এই কর্ত্তৃত্ব হারাইয়াছে। রুমানিয়ার পত্রিকা "ইউনিভারসাল"-এর ভাষায় এই মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি অস্থিতেও হইতে ইতিমধ্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতাকা উড়িতে সুরু করিয়াছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইটালীতে, ইটালীর পুর্ব্বতন উপনিবেশে ঘাঁটি গাড়িয়াছে; গ্রীসে যে সমস্ত বৃটিশ ঘাঁটি ছিল তাহাও তাহারা দখল করিয়া বসিয়াছে।

শুধু মার্কিন মহাদেশ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাজার হইতেই বৃটেনকে আমেরিকা হঠাইয়া দিতেছে না। খাস ইওরোপে বৃটেনের ঘাঁটিগুলির উপরও আমেরিকা তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে—কুখ্যাত মার্শাল প্ল্যানের ব্যাপক প্রসারের মধ্য দিয়াই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। বৃটিশ জনসাধারণের নিকট এই কুখ্যাত মার্শাল প্ল্যানকে "মার্কিন দাতাদের উদার সাহায্য" হিসাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। আসলে মার্শাল প্ল্যান ইওরোপের দেশগুলিকে পদানত করার জন্যই তৈরী হইয়াছে—তাহাদের সাহায্য করার জন্য এই প্ল্যান করা হয় নাই। মার্শাল প্ল্যানের সাহায্যে আমেরিকা ইওরোপে তাহার পণ্যদ্রব্য বিক্রির সুব্যবস্থা করিয়া লইতেছে এবং ইওরোপের বাজার হইতে বৃটিশ পণ্যদ্রব্যকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। অধিকন্তু মার্শাল প্ল্যানের ভিত্তিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নয়া-গণতন্ত্রের দেশগুলির সঙ্গে বৃটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায়ও আজিকার দিনে রপ্তানী বাড়াইবার প্রশ্নই বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। একথা মনে রাখা দরকার যে, যুদ্ধের পুর্ব্বেই বৃটেনের আমদানী তাহার [রপ্তা]নী [illegible] অনেক বেশি ছি[illegible] [illegible] ব্য এবং কাঁচামাল আ[illegible] রিতে[illegible]। তবুও বৃটেন একটা উপায়ে এই আমদানী-রপ্তানীর ভারসাম্য তখন বজায় রাখিতে পারিত—বিদেশে যে পুঁজি খাঠানো হইয়াছে তাহার আয় এবং জাহাজ ব্যবসার আয় হইতেই এই ভারসাম্য বজায় রাখা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে বৃটেনের এই সুবিধাটুকুও নাই—বিদেশে তাহার যে পুঁজি খাটিত যুদ্ধের সময় তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং মার্কিন-বাণিজ্য তরীর প্রতিযোগিতার ফলে জাহাজ ব্যবসা হইতেও তাহার আয় যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। সে জন্যই বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীরা আজ তাহাদের রপ্তানীকে কমপক্ষে দ্বিগুণ করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

অন্যদিকে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও তাহাদের পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী বাড়াইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহাদের দেশের মধ্যেকার বাজার দিন দিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে; সেখানে পণ্যদ্রব্যের কাটতির সুবিধা আর নাই। যুদ্ধোত্তর যুগের প্রারম্ভ হইতেই আমেরিকা বৃটেনের বাজারের উপর চরম আঘাত হানিতে সুরু করিয়াছে এবং এজন্য যতরকম পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব তাহার প্রত্যেকটিই তাহারা করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে; আমেরিকা বৃটেনকে যে টাকা ধার দিয়াছে তাহার একটি বিশেষ শর্ত্ত হইল যে, বৃটিশ সম্রাজ্যে যে শুল্ক-প্রাচীর রহিয়াছে আমেরিকার জন্য সেই শুল্ক অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিতে হইবে। আমেরিকা এবং বৃটেনের মধ্যে বাজারের জন্য এই যে সংগ্রাম, আসন্ন সংকট তাহাকে আরো তীব্রতর করিয়া তুলিবে—এ বিষয় কোন সন্দেহ-ই নাই।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে "সহযোগিতা" কিন্তু কোনমতেই তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের বা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামের অবসান ঘটায় না। এখানে এইটুকুন উল্লেখ করা-ই যথেষ্ট যে জার্ম্মান-প্রশ্নে বৃটেনের সঙ্গে আমেরিকার সহযোগিতা ছিল, কিন্তু সে সহযোগিতা আমেরিকাকে রুঢ় অঞ্চলের উপর কর্ত্তৃত্ব দখল করিতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

১৯২৫ সালেই স্টালিন বলিয়াছিলেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরে, পুঁজিবাদী শিবিরে কোন ঐক্য নাই—সেখানে স্বার্থের সংগ্রামই চলিতেছে।

আরো একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। সামরিক চুক্তিতে বৃটেনের সঙ্গে একযোগে অংশ গ্রহণ করিয়াও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেই সুযোগে আমেরিকার উপর বৃটেনের নির্ভরশীলতাকে সুদৃঢ় করিয়া লইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক কষ্ট ইতিমধ্যেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সেই আর্থিক কষ্টকে আরো বাড়াইয়া তুলিবার জন্য এবং তাহার উপর চাপ তীব্র করার জন্য আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র কিরকম ও কি ধরনের হইবে তাহা নির্দিষ্ট

লেখক—ওয়াই ভিক্টোরভ

—প্রাভদা হইতে

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

২৫শে সেপ্টেম্বর

❋ ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ ❋

ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ-ই পুঁজিবাদী শিবিরে মূল বিরোধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—১৯২৮ সালেই জেনারেলিসিমো স্টালিন একথা ভালোভাবে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

তেলের প্রশ্নই ধরা যাক্। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ এবং যুদ্ধ উভয়ের জন্যই তেলের চূড়ান্ত গুরুত্ব রহিয়াছে। পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারের প্রশ্ন ধরা যাক্। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বাঁচিয়া থাকার জন্য এবং তার বিকাশের জন্য পণ্যদ্রব্য বিক্রির বাজারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কারণ পণ্যদ্রব্য বিক্রির নির্ভরযোগ্য বাজার না থাকিলে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা অসম্ভব। বিদেশে পুঁজির রপ্তানীর বাজারের প্রশ্ন ধরা যাক। বিদেশে পুঁজি রপ্তানী করা সাম্রাজ্যবাদের একটি বিশেষ লক্ষণ। সর্বশেষে পণ্যদ্রব্যের বাজারে বা কাঁচামালের বাজারে পৌঁছিবার জলপথের প্রশ্ন ধরা যাক। এই সমস্ত প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলি একটি মূল সমস্যায় আসিয়া মিশিয়াছে। সে সমস্যাটি হইল দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে সংগ্রামের সমস্যা। স্ট্যালিন এই কথাই সেদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তাহার পর কুড়ি বৎসরেরও বেশি সময় পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্টালিনের এই সিদ্ধান্তগুলি বর্তমান কালেও সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সময়ে এই সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে; কারণ, প্রথমতঃ পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট আজ বাড়িয়া যাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ হিটলারের জার্মানীর এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে মাত্র দুইটি মহাশক্তি রহিয়াছে; ফরাসীদেশ আজ আর মহাশক্তির পর্যায়ে নাই—সে দেশ আজ দ্বিতীয় স্তরের রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

যুদ্ধের দৌলতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রচুর মুনাফা লুটিয়াছে এবং কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। সারা দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তবুও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে আজ প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, উপনিবেশের বড় বড় বাজার এবং কাঁচামালের জনপদগুলি রহিয়া গিয়াছে। নিজেদের এই ঘাঁটি রক্ষা করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখনো চেষ্টা করিতেছে। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই অবস্থার সঙ্গে কোনরূপ মিটমাট করিয়া চলিতে-ই রাজী নয়—তাহারা চায় দুনিয়ার উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। তাই বর্তমান যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামরিক এবং আর্থিক ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাহার সমস্ত ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় অভিযান আমরা দেখিতেছি।

আমেরিকা এবং বৃটেনের শাসক গোষ্ঠীরা একযোগে আক্রমণাত্মক নীতি-ই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—তাহারা দুনিয়ার বুকে আর একটি যুদ্ধ বাঁধাইবার চেষ্টা করিতেছে; সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নয়াগণতন্ত্রের দেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য তাহারা তোড়জোর করিতেছে এবং সেজন্য সামরিক চুক্তিতে তাহারা একযোগে অংশ গ্রহণ করিতেছে; উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য তাহারা একযোগে একই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত কাজে তাহাদের মিতালী কিন্তু তাহাদের নিজেদের মধ্যকার বিরোধগুলিকে একটুও কমায় নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারার নাম দিয়া আমেরিকা অতলান্তিক উপকূলে বৃটেনের যে সমস্ত ঘাঁটি ছিল তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহার বিনিময়েই এই ঘাঁটিগুলি গ্রাস করা হইয়াছে। বৃটেনের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমেরিকা বৃটেনকে প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার বাজার হইতে হটাইয়া দিয়াছে এবং ইহার সাথে সাথে তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত বাজারে-ই যাইয়া আসর জমাইয়া বসিতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কানাডার উপর তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—কানাডায় তাহারা ৫০০ কোটি ডলারের বেশি পুঁজি খাটাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার উপরে তাহারা নিজেদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছে (এখানে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার রহিয়াছে—যুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থার তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ায় মার্কিন পুঁজি ও পণ্য রপ্তানী তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে অর্থাৎ মার্কিন রপ্তানী বৃটেনের রপ্তানীর দ্বিগুণ হইয়াছে) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাণপণে দ্রুতগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার দেশগুলিতে প্রবেশ করিতেছে—প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাহারা এই সমস্ত দেশগুলি হইতে হটাইয়া দিতেছে। এ কথা উল্লেখ করা আজ নিষ্প্রয়োজন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলি আর বৃটেনের হাতে নাই—সেগুলি আজ আমেরিকার হাতে।

মার্কিন মহাদেশে এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে নিজেদের ঘাঁটিগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য বৃটেন যে সমস্ত চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রত্যেকটিকেই আমেরিকা বাঁধা দিতেছে। বৃটেন আর্জেন্টিনার সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছিল তাহা লইয়া সম্প্রতি আমেরিকা ও বৃটেনর মধ্যে সংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমেরিকা প্রকাশ্যেই জিদ করিয়া বলিতেছে যে, এই চুক্তি বাতিল করিতে হইবে এবং সেজন্য বৃটেনকে আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিশোধ লইবার ভয়ও দেখানো হইয়াছে।

নিকট এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তৈল-ঘাঁটিগুলির উপর কর্তৃত্ব লইয়া মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে। ইরান, ইরাক, সৌদী আরব এবং কুওয়াইতে মোটামুটিভাবে নিকট এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশেই মার্কিন ও বৃটিশ স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়াছে। মার্কিন ও বৃটিশ তৈল কোম্পানীগুলির স্বার্থের সংঘাত এই সমস্ত দেশে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি কে দখল করিবে তাহার সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই ইহার অভিব্যক্তি হইয়াছে। সিরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদেরই প্রভাব সুদৃঢ় করা হইতেছে। ইরাক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই একটি অর্দ্ধ-উপনিবেশ। সম্প্রতি সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে তাহা ইঙ্গ-মার্কিন সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছু নয়—শুধু মাত্র একটি পাতলা পর্দা দিয়া এই সংঘর্ষকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হইয়াছে।

নিকট প্রাচ্যের তৈলের জন্য সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমধ্যসাগরের প্রশ্ন আজ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভূমধ্যসাগরকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড, বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ঘাঁটি হিসাবেই দেখিয়া আসিয়াছে এবং ইহার উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের জন্য তাহারা সংগ্রাম করিয়াছে। আজ তাহারা এই কর্তৃত্ব হারাইয়াছে। রুমানিয়ার পত্রিকা "ইউনিভারসাল"-এর ভাষায় এই মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি অস্থিখণ্ড হইতে ইতিমধ্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতাকা উড়িতে সুরু করিয়াছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইটালীতে, ইটালীর পূর্বতন

নী[illegible] অনেক বেশি ছিল, কারণ হাতে[illegible] ব্য এবং কাঁচামাল আমদানী হতে [illegible]। তবুও বৃটেন একটা উপায়ে এই আমদানী-রপ্তানীর ভারসাম্য তখন বজায় রাখিতে পারিত—বিদেশে যে পুঁজি খাটানো হইয়াছে তাহার আয় এবং জাহাজ ব্যবসার আয় হইতেই এই ভারসাম্য বজায় রাখা হইত। কিন্তু বর্তমানে বৃটেনের এই সুবিধাটুকুও নাই—বিদেশে তাহার যে পুঁজি খাটিত যুদ্ধের সময় তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং মার্কিন-বাণিজ্য তরীর প্রতিযোগিতার ফলে জাহাজ ব্যবসা হইতেও তাহার আয় যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। সে জন্যই বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীরা আজ তাহাদের রপ্তানীকে কমপক্ষে দ্বিগুণ করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

অন্যদিকে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও তাহাদের পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী বাড়াইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহাদের দেশের মধ্যেকার বাজার দিন দিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে; সেখানে পণ্যদ্রব্যের কাটতির সুবিধা আর নাই। যুদ্ধোত্তর যুগের প্রারম্ভ হইতেই আমেরিকা বৃটেনের বাজারের উপর চরম আঘাত হানিতে সুরু করিয়াছে এবং এজন্য যতরকম পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব তাহার প্রত্যেকটিই তাহারা করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে; আমেরিকা বৃটেনকে যে টাকা ধার দিয়াছে তাহার একটি বিশেষ শর্ত হইল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে যে শুল্ক-প্রাচীর রহিয়াছে আমেরিকার জন্য সেই শুল্ক অনেক পরি-

লেখক—ওয়াই ভিক্টোরভ

—প্রাভদা হইতে

উপনিবেশে ঘাঁটি গাড়িয়াছে; গ্রীসে যে সমস্ত বৃটিশ ঘাঁটি ছিল তাহাও তাহারা দখল করিয়া বসিয়াছে।

শুধু মার্কিন মহাদেশ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাজার হইতেই বৃটেনকে আমেরিকা হঠাইয়া দিতেছে না। খাস ইওরোপে বৃটেনের ঘাঁটিগুলির উপরও আমেরিকা তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে—কুখ্যাত মার্শাল প্ল্যানের ব্যাপক প্রসারের মধ্য দিয়াই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। বৃটিশ জনসাধারণের নিকট এই কুখ্যাত মার্শাল প্ল্যানকে "মার্কিন দাতাদের উদার সাহায্য" হিসাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। আসলে মার্শাল প্ল্যান ইওরোপের দেশগুলিকে পদানত করার জন্যই তৈরী হইয়াছে—তাহাদের সাহায্য করার জন্য এই প্ল্যান করা হয় নাই। মার্শাল প্ল্যানের সাহায্যে আমেরিকা ইওরোপে তাহার পণ্যদ্রব্য বিক্রির সুব্যবস্থা করিয়া লইতেছে এবং ইওরোপের বাজার হইতে বৃটিশ পণ্যদ্রব্যকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। অধিকন্তু মার্শাল প্ল্যানের ভিত্তিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নয়া-গণতন্ত্রের দেশগুলির সঙ্গে বৃটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায়ও আজিকার দিনে রপ্তানী বাড়াইবার প্রশ্নই বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। একথা মনে রাখা দরকার যে, যুদ্ধের পূর্বেই বৃটেনের আমদানী তাহার মাণে কমাইয়া দিতে হইবে। আমেরিকা এবং বৃটেনের মধ্যে বাজারের জন্য এই যে সংগ্রাম, আসন্ন সংকট তাহাকে আরো তীব্রতর করিয়া তুলিবে—এ বিষয় কোন সন্দেহ-ই নাই।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে "সহযোগিতা" কিন্তু কোনমতেই তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের বা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামের অবসান ঘটায় না। এখানে এইটুকুন উল্লেখ করা-ই যথেষ্ট যে জার্মান-প্রশ্নে বৃটেনের সঙ্গে আমেরিকার সহযোগিতা ছিল, কিন্তু সে সহযোগিতা আমেরিকাকে রুঢ় অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব দখল করিতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

১৯২৫ সালেই স্টালিন বলিয়াছিলেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরে, পুঁজিবাদী শিবিরে কোন ঐক্য নাই—সেখানে স্বার্থের সংগ্রামই চলিতেছে।

আরো একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। সামরিক চুক্তিতে বৃটেনের সঙ্গে একযোগে অংশ গ্রহণ করিয়াও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেই সুযোগে আমেরিকার উপর বৃটেনের নির্ভরশীলতাকে সুদৃঢ় করিয়া লইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক কষ্ট ইতিমধ্যেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সেই আর্থিক কষ্টকে আরো বাড়াইয়া তুলিবার জন্য এবং তাহার উপর চাপ তীব্র করার জন্য আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র কিরকম ও কি ধরনের হইবে তাহা নির্দিষ্ট

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

দমদমে অসুস্থ রাজবন্দীদের চিকিৎসা উপেক্ষিত

কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, দমদম জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই এলোমেলো চিকিৎসা হইতেছে অথবা চিকিৎসার অবহেলা হইতেছে। বিশেষজ্ঞ দিয়া রোগীর পরীক্ষা হইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করা হইতেছে না। ৩০ জনেরও বেশী রাজনৈতিক বন্দীর টনসিল অপারেশনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, অথচ আজ পর্য্যন্ত সেদিক দিয়া কিছুই করা হয় নাই।

দীর্ঘদিন ধরিয়া বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছেন অথচ রোগমুক্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই এমন কয়েকজন বন্দীর একটি তালিকা নীচে দেওয়া হইল ঃ

১। মুজফ্‌ফর আহমদ—মূত্রগ্রন্থী বৃদ্ধি (এন্‌লার্জ্জ প্রসট্রেট), মূত্রকৃচ্ছতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ওজন হ্রাস।

নিম্নলিখিতদের মধ্যে কয়েকজনের ফুসফুসের অথবা বুকের দোষ হইয়াছে, অনেকের ফুসফুসে যক্ষা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। তাঁহারা না পাইতেছেন উপযুক্ত চিকিৎসা, না পুষ্টিকর খাদ্য, অথচ অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থাপত্রে এতদুভয়েরই নির্দ্দেশ আছে।

২। মার্কণ্ডেয় ঝাঁ—থাইসিস্‌
৩। হিমাংশু সিংহ— ঐ
৪। অবনী বসু— ঐ
৫। জিতেন গাঙ্গুলী— ঐ
৬। ভানু বিশ্বাস— ঐ
৭। প্রদ্যোৎ মণ্ডল— ঐ
৮। গুণময় চৌধুরী—৯ই জুন তাঁহার ডান হাতে বুলেটের আঘাত লাগে, কনুই হইতে হাতের নীচের দিক পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা, হাত নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা লোপ পাইতেছে। ইহা ছাড়াও, প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় তাঁহার জ্বর আসে, ক্ষুধামান্দ্য, চোখ জ্বালা করে, বুকেও অনেকদিন যাবৎ ব্যথা অনুভব করিতেছেন।

৯। শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য—গেস্‌ট্রিক আলসার ও প্লুরাইটিস।

১০। শিবশঙ্কর মিত্র— ঐ

১১। নিরঞ্জন কোলে—যক্ষা সন্দেহ করা যাইতেছে।

১২। কুঞ্জ সেনগুপ্ত—বুকে ব্যথা, দুর্ব্বলতা, জন্‌ডিস, বুকধড়ফড় করে, ওজন কমিয়া গিয়াছে, চিরস্থায়ী আমাশয়।

১৩। জগদীশ দে—পুরানো কাসি ও বুকে ব্যথা।

১৪। শামসুল হুদা—প্লীহা বৃদ্ধি, বুকে ব্যথা, কাসি ও আমাশয় লাগিয়াই আছে, বাম হাতের কনুইয়ের গ্রন্থীতে বৎসর কাল যাবৎ বেদনা।

১৫। প্রবোধ রায়—হাঁপানী।

১৬। কানাই চট্টোপাধ্যায়—হাঁপানী ও ওজন হ্রাস।

১৭। সতীশ পাকড়াশী—বুক ধড়ফড় করে, চিরস্থায়ী আমাশয়, ফুরুনকুলোসিস, ওজন হ্রাস।

১৮। মদন শা—গত তিন মাস যাবৎ নীচের চোয়ালে মাংস বৃদ্ধি হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এ-পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কোন চিকিৎসা হয় নাই। তিনবার অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে; রোগ সারা দূরের কথা, ক্ষতস্থানে দুরারোগ্য নালী হইয়া গিয়াছে, পুঁজ পড়ে।

১৯। প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—নাক ও গলার রোগে কষ্ট পাইতেছেন—সেপ্‌টিক টনসিলাইটিস, বিশেষজ্ঞরা অপারেশনের পরামর্শ দিয়াছেন, যন্ত্রণায় কিছুই গিলিতে পারেন না, রোজ জ্বর হইতেছে।

২০। সলিল মিত্র—আমাশয় চিরদিনের সঙ্গী হইয়াছে, ক্ষুধামান্দ্য, প্লসাইটিস, টনসিলাইটিস, ধারাবাহিক কোন চিকিৎসা হয়নাই।

২১। হরেন চক্রবর্ত্তী—বুক ধড়ফড় করে, হাত কাঁপে, রক্তশূন্যতা, অর্শ, দুর্ব্বলতা, ওজন হ্রাস।

২২। শিশির গাঙ্গুলী—ক্রনিক কোলাইটিস, দৈনিক জ্বর হয়, ঘাড়ের গ্রন্থি ফুলিয়াছে, আরও নানাবিধ জটিলতা—বর্ত্তমানে চিকিৎসার জন্য শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

২৩। মেশহাউদ্দীন—বুকে ব্যথা, নানারূপ জটিলতা, সাত মাস ধরিয়া প্রত্যহ জ্বর হইতেছে।

২৪। মনি দাশগুপ্ত—তিনমাস যাবৎ জন্‌ডিস্‌।

২৫। দিলীপ ঘোষ—ক্রনিক আমাশয়

২৬। সুবোধ সেনগুপ্ত—ভগন্দর

২৭। অনিল মুখার্জ্জী—অর্শ।

২৮। রাসবিহারী ঘোষ—৯ই জুন কপালে বুলেটের আঘাত লাগে, দুর্ব্বলতা ও শক্তিহীন।

২৯। নির্ম্মল রায়—গেস্‌ট্রিক আলসার।

৩০। হীরেন সরকার—ঐ

৩১। নারায়ণ বৈদ্য—জন্‌ডিস, তিন মাস ধরিয়া ঘুসঘুসে জ্বর।

৩২। অমূল্য মজুমদার—জন্‌ডিস্‌।

৩৩। গোষ্ঠ ঘোষ—গ্যাসট্রাইটিস, ক্রনিক আমাশয়, অবসন্নতা।

৩৪। কালাচাঁদ ব্যানার্জি—গ্যাস্‌ট্রাইটিস, কোলাইটিস, সাধারণভাবে দুর্ব্বলতা, ডান পায়ের তল হাঁটুতে টিউমার আরো নানাবিধ জটিলতায় গত সাতমাস ধরিয়া ভুগিতেছেন।

৩৫। রামশঙ্কর চৌধুরী—গ্যাস্‌ট্রাইটিস।

৩৬। ষোড়শী চৌধুরী—ঐ

৩৭ জগদীশ পালিত—নাকে দোষ হইয়াছে, বুকে ব্যথা, দুর্ব্বলতা, ওজন হ্রাস।

৩৮। অনিল সিংহ—নিদ্রাহীনতা।

৩৯। বজলু মোল্লা—পায়ে পক্ষাঘাত, দুর্ব্বলতা।

৪০। পুলিন মুখার্জি—হার্টের রোগ।

৪১। অমর মুখার্জি—দুর্ব্বলতা ও শক্তিহীনতা।

৪২। দুর্গা দত্ত—ডান হাতের একটি হাড় ভাঙ্গিয়া হাত টানিয়া ধরিয়াছে ও বিকল হইয়া পড়িতেছে, অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হইলে হাতটি চিরকালের মতো বিকল হইয়া যাইবে।

৪৩। সতীশচন্দ্র ব্যানার্জি—ইতিপূর্ব্বে কালাজ্বরে ভুগিয়াছেন, বর্ত্তমানে চর্ম্মরোগে ভুগিতেছেন।

৪৪। দীনেশ ভট্টাচার্জি—ক্রমিক কোলাইটিস, ওজনহ্রাস, ফাইলেরিয়া, মুখে ঘা, নানাবিধ জটিলতা, ধারাবাহিক চিকিৎসা হইতেছে না।

৪৫। মানিক সেনগুপ্ত—বুকে ব্যথা, সন্ধ্যাবেলায় জ্বর হয়। তিনমাস ধরিয়া আমাশয়ে ভুগিতেছেন, ফুসফুসে যক্ষা হইয়াছে সন্দেহ করা যাইতেছে।

৪৬। গণেশ দাস—পায়ে একজিমা কোন চিকিৎসা হইতেছে না।

হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স-এ প্রধান কর্ম্মসচিব ঘেরাও

পুরা দুই মাসের বেতন বোনাস না দিলে ধর্ম্মঘটের সঙ্কল্প

পশ্চিম বাংলার অর্থসচিব নলিনীরঞ্জন সরকারের 'হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী'র কর্ম্মচারীরা গত ১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অফিসের প্রধান কর্ম্মসচিবকে ও ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান কুমার কার্ত্তিক মল্লিককে ঘেরাও করিয়া অন্ততঃ পুরা দুই মাসের বোনাস মঞ্জুরের জন্য বোর্ডের মিটিং ডাকাইবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, এই দাবী স্বীকৃত না হইলে কর্ম্মচারীরা ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট করিবেন।

গত বৎসর কোম্পানী দেড় মাসের বোনাস দিয়াছিল। এই বৎসর নিজেদের আর্থিক দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ম্মচারীরা আশা করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ দুইমাসের বোনাস কোম্পানীই মঞ্জুর করিবে। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে যখন কোম্পানী মাত্র একমাসের মূল বেতনকে বোনাস হিসাবে ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহাদের বিক্ষোভ ঘন হইয়া উঠিল।

কর্ম্মচারীরা প্রধান কর্ম্মসচিবকে ঘেরাও করিয়া পুরা দুই মাসের বোনাস দাবি করিতে থাকেন। এই সময় বোর্ডের সভাপতি অফিসে উপস্থিত হইলে তাঁহার কাছেই সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবি করা হয়। কুমার কার্ত্তিক মল্লিক প্রথম অবস্থায় কর্ম্মচারীদের সম্মুখীন হইতেই অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে উপস্থিত হইয়াই বলিতে বাধ্য হন যে, আগামী বুধবারই বোর্ডের সভা ডাকিয়া বোনাসের দাবি সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করা হইবে। বুধবার বোর্ডের সভায় পুরা দুই মাসের বোনাস স্বীকৃত না হইলে কর্ম্মচারীরা কলম ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। অফিসের মধ্যেই এক সভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করিয়া দিয়া নর্থ-অতলান্তিক চুক্তির সমস্ত অংশীদারদের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের উন্নত অভিযানের সুবিধা গ্রহণ করিতেছে। আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে এই সংগ্রামে সমস্ত অসুবিধাই পরিষ্কারভাবে বৃটেনের উপর গিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এই সহযোগিতাকে ঘোড়সওয়ার সঙ্গে ঘোড়ার সহযোগিতার সঙ্গে শুধু শুধুই তুলনা করা হয় নাই।

কিন্তু কিসের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সহযোগিতায় বাধ্য হইতেছে? এ প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারে। ইহার কারণ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তাহাদের ঘৃণা প্রকাশে বৃটেন এবং আমেরিকার শাসকগোষ্ঠীরা একমত। সারা দুনিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রধান দুর্গ মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাহায্য লইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ বাধ্য হইয়াছে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীরা আশা রাখে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনায় তাহাদের অংশ গ্রহণের ফলে তাহারা নিজেদের জন্য কিছুটা অংশ গ্রাস করিতে সক্ষম হইবে, এমনকি যদি তাহাদের আমেরিকার জুনিয়ার অংশীদার হিসাবে কাজ করিতে হয় তবুও তাহারা এই সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু আসলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যাহা বেশী করিয়া আশা করে তাহা হইতেছে যে, বোধ হয় তাহারা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাইয়া দিতে সফল হইবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুরাতন প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধলিপ্ত এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ তাহারা লইতে পারিবে।

যুদ্ধলিপ্সু কুখ্যাত চার্চ্চিলের অসংখ্য বক্তৃতা হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে

এই পরিকল্পনা নতুন কিছু নয়। অতীতেও এই একই উদ্দেশ্য লইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছিল—শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, তখন তাহারা জার্ম্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পরিকল্পনায় তাহারা মারাত্মক ভুল করিয়াছিল। তাহাদের বর্ত্তমান পরিকল্পনাও সেইরকম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

মঞ্জিল

শিক্ষা, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শত্রু বিধান সরকারের বিরুদ্ধে

এই বৎসর কলিকাতার প্রায় ২৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর ধর্ম্মঘট চালু থাকা কালীন কলেজগুলিতে পূজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, স্কুলগুলিও বন্ধ হইতে সুরু করিয়াছে। জমায়েতকেন্দ্রগুলি এই ভাবে সাময়িক অচল হইয়া যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাঁহাদের লড়াই চালাইয়া গিয়াছেন।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর আবার ৫০০ ছাত্র আরও তীব্র বিক্ষোভ নিয়া বিধান রায়ের বাড়ীর সামনে মিছিল করিয়া আওয়াজ তুলিয়াছেন, "বিধান সরকারের পদত্যাগ চাই"।

জবাবে কুখ্যাত সত্যেন মুখার্জ্জীর নেতৃত্বে ১০০ গুর্খা পুলিস ছুটিয়া আসিয়াছে—টিয়ার গ্যাস ও লাঠির আক্রমণে ছাত্রদের এই বিক্ষোভ ধ্বনি স্তব্ধ করার আবার চেষ্টা করিয়াছে।

কলেজ বন্ধ হওয়ার আগের দিন ২০শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবাসী কলেজের ৭,০০০ ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা দাবী তুলিয়াছেন "হোস্টেলের সিটরেণ্ট বাড়ানো চলবে না"! ২,০০০ ছাত্র জমায়েতে কংগ্রেসী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসী সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মোহমুক্ত ছাত্র সমাজের যে বিক্ষোভ সুরু হইয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত থামে নাই। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অংশের আরও ছাত্র এই সংগ্রামে যোগ দিয়াছেন। স্কটিশ, বঙ্গবাসী প্রভৃতি কলেজের হাজার হাজার ছাত্র তাঁহাদের দমনবিরোধী বিক্ষোভের সাথে সাথে শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তাহাদের দাবী পেশ করিয়াছেন এবং সে দাবী নিয়া অবিরাম ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

স্কুল ছাত্ররাও আরও বেশী আগাইয়া আসিয়াছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে প্রায় ৫,০০০ স্কুল ছাত্র "দমনবিরোধী দিবসে" ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

মেডিক্যাল ছাত্ররাও সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে সুরু করিয়াছেন, ১৯শে সেপ্টেম্বর ক্যাম্পবেল, মেডিক্যাল প্রভৃতি কলেজের ডাক্তার ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। ২০শে সেপ্টেম্বর আর্ট স্কুলের শিল্পী ছাত্ররা ফ্যাসিস্ট বিধান সরকারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার গ্রাম ও শহরের গরীব ছাত্ররাও কোলকাতার সংগ্রামরত ছাত্রদের সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন।

এই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবেন অর্দ্ধভুক্ত শিক্ষক সমাজ। স্কুল কলেজগুলি খোলার কিছুদিন পরেই এই শিক্ষক সমাজ তাহাদের পেটের দাবি নিয়া ধর্ম্মঘট সুরু করিবেন। যে অভিভাবকেরা তাহাদের অফিস আদালতে ছাঁটাই আর আয় হ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিদিন লড়াই করিতেছেন তাহারাও তাদের এই সংগ্রামী ছেলেমেয়েদের সমর্থন জানান।

আর পাশে আসিয়া দাঁড়াইবেন শ্রমিকশ্রেণী।

স্কুল কলেজগুলি খোলার সাথে সাথে এই বিক্ষোভকে আরও ব্যাপক, আরও সংগঠিত করিয়া তোলার জন্যে শপথ নিয়াছে সংগ্রামরত ছাত্ররা। সংগ্রামরত অন্যান্য মানুষের সাথে হাত মিলাইয়া এই ছাত্ররা তাঁহাদের দাবী আদায় করার জন্য অগ্রসর হইবেন।

সকলের জন্য শিক্ষার দাবী, দুর্নীতি-পরায়ণ শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের অবসান দাবী আর লাঠি ও গুলির সাহায্যে যে পাপী সরকার এই দুর্নীতির আশ্রয় দিয়াছে সেই কংগ্রেসী বিধান সরকারের অবসানের দাবী আদায় না করা পর্য্যন্ত বঞ্চিত, মোহমুক্ত ছাত্রসমাজের এ বিক্ষোভ চলিবে।

মাণিকতলা শ্যামাপদ ইনষ্টিটিউটের ২ জন শিক্ষক ২ মাস বেতন না পাইয়া ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন।

ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতিতে শিক্ষক সমাজ

আগামী ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর এই দুইদিন সারা পশ্চিম বাংলার অর্দ্ধভুক্ত শিক্ষক সমাজ সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে নিম্নতম বেতন বৃদ্ধির দাবীতে যে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন—তাহার প্রস্তুতি স্বরূপ ইতিমধ্যেই পার্কে পার্কে জনসভা হইতেছে।

"শিক্ষক সমিতি বহুবার শিক্ষকদের নিম্নতম বেতন বৃদ্ধির জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাকা নাই অজুহাতে কিছু করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

'শিক্ষকদের দাবী অতি সামান্য'.... কিন্তু গত দুই বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে সাধারণ শিক্ষক সমাজ আজ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বর্ত্তমান সরকার শিক্ষা সম্পর্কে অনুগত ভৃত্যের মত পুরাতন বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিতেছেন।

(গত পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনে ১৫০০ শিক্ষক প্রতিনিধির গৃহীত প্রস্তাব হইতে)।

২৫শে সেপ্টেম্বর

এই ছাত্র বিক্ষোভ থামিবে না

কমার্স ছাত্রদের উপর সরকারী আক্রমণের খবর পাওয়ার সাথে সাথে হাওড়ার শালকিয়ার ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। বিধান সরকারের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া সাধারণ ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে হাতে লিখিয়া ইস্তাহার ছড়াইয়াছেন।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা ভাঙ্গিয়া ৫০০ ছাত্র মিছিল বাহির করেন; ১৫০০ ছাত্র ধর্ম্মঘট করেন।

চুচুড়ায় ৫০০ ছাত্র-ছাত্রীর এক মিছিল বাহির হয়;

মুগকল্যাণ ও আন্দুল গ্রামের ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করেন।

শিক্ষা ও গণতন্ত্রের দাবীতে, সন্ত্রাসরাজের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের এ বিক্ষোভ যখন এইভাবে বিভিন্ন অংশের ছাত্রর মধ্যে আরও দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছিল, যখন এ বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার নিতে সুরু করিয়াছিল—ঠিক সেই সময়ই স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ হইয়াছে, ছাত্রদের জমায়েত কেন্দ্রগুলি সাময়িক অচল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে বিক্ষোভ সাময়িক স্তিমিত হইয়া পড়িবে। ইতিমধ্যে "তদন্ত কমিটির" ধোঁকা দিয়া আর দালাল বাহিনী লেলাইয়া দিয়া এই বিক্ষোভকে বন্ধ করার চেষ্টা চলিবে।

কিন্তু দু'বছরের কংগ্রেসী কুশাসনে মোহমুক্ত ছাত্র সমাজের যে বিক্ষোভ একবার ফাটিয়া পড়িয়াছে সে বিক্ষোভ এখন থামিবে না।

১০,০০০ গরীব ঘরের কমার্স ছাত্রেরা শিক্ষার দাবী এখনও পূরণ হয় নাই।

৫ জন ছাত্রকে প্রিজন ভ্যানে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করার যে বর্ব্বর ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার বিচার এখনও হয় নাই।

সরকার হইতে মদের জন্য ৭০ টাকা বরাদ্দ পাওয়ার পর যে পুলিস অফিসারেরা ইডেন হিন্দু হোস্টেলের নির্দ্দোষ ছাত্রদের উপর উন্মত্ত আক্রমণ চালাইয়াছে তাহাদের এখনও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় নাই।

যে "শিক্ষাসেবী" নিজের ছেলেকে পরীক্ষার নম্বর বাড়াইয়া দিয়া ৩৪ হইতে ৮০ করিয়া দেয় আর হাজার হাজার কমার্স ছাত্র পাশের নম্বর ৪০ হইতে কমাইয়া ৩৬ করিয়া দিবার ন্যায্য দাবী করিলে তাঁহাদের উপর পুলিস লেলাইয়া দেয় সেই দুর্নীতি-পরায়ণ শিক্ষাসেবীদের এখনও শাস্তি হয় নাই।

মুষ্টিমেয় এই দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের পাপকে ঢাকিবার জন্য যে সরকার সাধারণ মানুষের উপর, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রের উপর প্রতিদিন বর্ব্বর আক্রমণ চালায় সেই বিধান সরকারের এখনও অবসান হয় নাই। **তাই বিক্ষোভ থামিবে না।**

—স্কুল কলেজে বেতন বাড়াইয়া দিয়া এ সরকার হাজার হাজার গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েকে শিক্ষাজীবন হইতে বিতাড়িত করিয়াছে তাই এ বিক্ষোভ থামিবে না।

স্বাধীন ভারতে নাগরিক গড়িয়া তোলার যে স্বপ্ন শিক্ষক সমাজ দেখিতে সুরু করিয়াছিলেন, সে স্বপ্ন এই সরকার ভাঙিয়া দিয়াছে। অভাবের তাড়নায় মুর্শিদাবাদের প্রাথমিক শিক্ষক আত্মহত্যা করিয়াছে। দু'মাসের বেতন না পাইয়া উত্তর কোলকাতার দুইজন শিক্ষক অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন! তাই শিক্ষা ও গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের এই বিক্ষোভ থামিবে না।

ইঞ্জিনীয়ার আর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নকে চুরমার করিয়া দিয়া ইহারা ছাত্রদের ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছে "গরীবের ছেলেদের এত সখ কেন? তাই গরীবের ছেলেদের এই বিক্ষোভ থামিবে না।

কলকারখানার মত স্কুল-কলেজকে মুনাফার কেন্দ্রে পরিণত করিয়া যাহারা দুর্নীতিকে আশ্রয় দিয়াছে, শিক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে সেই শিক্ষার শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ থামিবে না।

ছাত্র সমাজের স্বাধীনতার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া ইহারা বৃটিশ কমনওয়েলথের সাথে দেশকে বাধিয়া দিয়াছে, ডলার সাম্রাজ্যবাদের পায়ে দেশকে বিকাইয়া দিয়াছে। সেই স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ থামিবে না।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্যামবাজার বাণী বিদ্যামন্দিরের ক্লাস সেভেনের একটি বালিকাকে বিধান সরকারের পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে!

অধ্যাপকেরাও ধর্ম্মঘটের পথে

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলা অধ্যাপক কনভেনশনে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন কলেজের প্রায় ৫০ জন অধ্যাপক প্রতিনিধি সমবেত হন। সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে, ১০ টাকা হইতে ৫০ টাকা মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধির দাবীতে তাহা আগামী ১৬ই ও ১৭ই নভেম্বর এই দুইদিন নমুনা ধর্ম্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

"যাদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়বার ভার তাদের যদি এমনভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়, তাদের যদি নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসুতটুকুও না জোটে এবং এইভাবে মুখে রক্ত তুলে প্রাণপাত করতে হয় তাহলে এই পশ্চিম বাঙ্গলার শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি?...আমরা আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দুটি মাত্র পথই দেখতে পাচ্ছি—একদিকে শিক্ষা ও শিক্ষাজীবনের উপর সরকারী আক্রমণ, অন্যদিকে ধর্ম্মঘটের মাধ্যমে সে আক্রমণের প্রতিরোধ।"

(পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক কনভেনশনের ইস্তাহার হইতে)

আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে টাকার মূল্য হ্রাস

টাকা এবং স্টার্লিং-এর ডলার মূল্য কমানো হয়েছে, এ একটা যেমন-তেমন ঘটনা নয়, অথবা এটা কেবল অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের ব্যাপারও নয়; এ ঘটনাটা ভারতের শোষিত জনসাধারণের স্বার্থ ধরে' টান মেরেছে। এই ঘটনার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে আমেরিকার যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্র, দুনিয়ার সর্বত্র আমেরিকান পুঁজিপতিদের প্রভুত্ব স্থাপনের উগ্রকামনা এবং ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের রুজি মেরে আমেরিকান মূলধনের জাঁতার তলে ভারতের ভাগ্য পিষে গুঁড়ো করবার পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল প্ল্যানের ব্যর্থতা ও দৈন্য নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই ঘটনার ভিতর দিয়ে, ইঙ্গ-আমেরিকান ঐক্যের ভিতর সাম্রাজ্যবাদী আত্মবিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে।

ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ: এতদিন এক পাউণ্ড স্টার্লিং-এর বিনিময় মূল্য ছিল ৪·০৩ ডলার। এখন তা কমিয়ে করা হল—২·৮০ ডলার। এতদিন এক টাকার বিনিময় মূল্য ছিল ৩০ সেন্ট (১০০ সেন্ট=১ ডলার); এখন তা কমিয়ে করা হল ২১ সেন্ট। অর্থাৎ, টাকা এবং স্টার্লিং, উভয়েরই ডলার মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ কমানো হল; কিন্তু টাকার সঙ্গে স্টার্লিং-এর যে হার ছিল তাতে কোন পরিবর্তন হল না—অর্থাৎ, ১ টাকার বদলে এখনও আগের মতই ১৮ পেনি পাওয়া যাবে।

গরীবের মাইনে কেটে আমেরিকার মুনাফা

ভারতবাসীর পক্ষে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য্য কী, তা বুঝতে হলে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আগে আমেরিকার বাজারে যে জিনিসের দাম ছিল ১ ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় তার দাম হত ৩৷৵০ (তিন টাকা পাঁচ আনা); **এখন সেই এক ডলারের জন্য ভারতীয় মুদ্রায় দিতে হবে ৫৲ টাকা।**

তার মানে,—আমেরিকা থেকে ভারতে যে সমস্ত পণ্য আমদানি হয়; তার দর বাড়লো, এখন প্রতি ১০০ টাকায় অন্তত ৩০ টাকা করে বেশি দিতে হবে। এ আঘাতটা সবচেয়ে বেশি পড়বে গরীবদের ওপর—কারণ, খাদ্য আমদানি হয় প্রধানত আমেরিকা থেকে। ১৯৪৮ সালে সারা ভারতের জন্য বিদেশ থেকে ২৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে আমদানি করতে হয়েছে তার চেয়েও বেশি—এ বছরের জন্য ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং প্রথম ছয় মাসে আমদানি করা হয়েছে ২৩ লক্ষ টন। এই আমদানির প্রধান অংশটা আসে আমেরিকা এবং আর্জেন্টাইন থেকে।

এই তথ্য থেকে এটা বেশ স্পষ্ট যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতের কাছ থেকে মজুতদার-মুনাফাখোরের মত অতিরিক্ত দাম আদায় করবার কায়দা হল এই টাকার ডলার মূল্য হ্রাস। আমদানি খাদ্যের জন্য যত টাকা দিতে হত, এখন তারচেয়ে শতকরা ৩০ টাকা বেশি দিতে হবে। **সুতরাং, দেশের ভেতর সমস্ত খাদ্যেরই দর বাড়বে**—কারণ বাজারে তো আর আমেরিকান মার্কা খাদ্যের আলাদা দর হয় না, দেশী এবং আমেরিকান সমস্ত গমই এক দরে বিকোবে; আর, গমের দর বাড়লে ধান-চালেরও দর বাড়বে।

প্রত্যেক শ্রমিক এবং প্রত্যেক কেরানি যে-বেতন পান, তা যদি না বাড়ানো হয় তবে খাদ্যের দর বৃদ্ধির জন্যে তাঁদের টাকায় পাঁচ আনা করে খরচ বেড়ে গেল—

অর্থাৎ, তাঁর আসল মজুরি কাটা গেল টাকায় পাঁচ আনা করে, বা ১০০৲ টাকায় ৩০৲ টাকা। নেহরু-সরকার কলমের এক খোঁচায় আমাদের দেশের মজুর এবং কেরানিদের বেতন থেকে শতকরা ৩০৲ টাকা কেটে তা আমেরিকান্ মজুতদারদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

খাদ্যে চোরাকারবারের ব্যবস্থা

নেহরু এখন সাফাই গাইছেন, এ-বছর যা খাদ্যশস্য আমদানি করবার তা হয়ে গেছে, এ-বছর আর নতুন আমদানি হবে না; সুতরাং, খাদ্যের দর বাড়বার ভয় নেই। কিন্তু, জানুয়ারি মাস পড়তে-না-পড়তেই যে দর বাড়বে তা ঠেকাবে কে? আর, জানুয়ারি মাস থেকে খাদ্যের দর টাকায় পাঁচ আনা বাড়বে, এই আশায় এখনই যে দেশী মজুতদারেরা মজুত ধরে রেখে টাকায় দশ আনা অবধি বাড়াবে, তাই বা ঠেকাবে কে? নেহরুর ধাপ্পাবাজিতে দেশের গরীব জনসাধারণ ভুলবে না—কারণ, তারা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় নেহরুর ধাপ্পা মর্মে মর্মে অনুভব করবে।

আমেরিকা থেকে ভারত যে শুধু খাদ্য আমদানি করে, তাই নয়, ওষুধপত্র, আরও অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং কারখানার যন্ত্রপাতিও আমদানি করে। এই সব জিনিসই এখন আক্রা হয়ে উঠবে, অনেক জিনিস এখনই চোরা-বাজারে অদৃশ্য হতে আরম্ভ করেছে।

নেহরু খুব পণ্ডিতী চাল চেলে আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে, খাদ্য এবং কল-কারখানার যন্ত্রপাতি আমেরিকা থেকে না এনে ইংলণ্ড বা ইংলণ্ডের মত স্টার্লিং মুদ্রার দেশ থেকে আমদানি কর। তাই যদি করতে পারবেন, তবে আর "ডলার-ঘাটতি, ডলার-ঘাটতি" বলে গত দু'বছর এত চেঁচামেচি শুনছি কেন? পণ্ডিতজী যতই চাল মারুন না কেন, প্রকৃত ব্যাপারটা যা দাঁড়ালো তা আমরা বুঝি। ইংলণ্ড থেকে আমদানি বাড়াবেন? সে গুড়ে বালি। বস্তুত, ইংলণ্ডের রপ্তানি বাজার দখল করার জন্যেই আমেরিকা এই চাল চেলেছে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি।

বৃটেনের বাজারই যাবে মার্কিন কবলে

মার্শাল প্ল্যানের ঘাঁইতে ইংলণ্ডের রপ্তানি বাণিজ্যের অতি-শোচনীয় অবস্থা। বিদেশ থেকে ইংলণ্ডের আমদানি বেড়েই চলেছে, কিন্তু তার রপ্তানি সে-পরিমাণে অনেক কম। তাই, ইংলণ্ড তার আমদানি পণ্যের দাম শোধ করতে অক্ষম। অবস্থা ক্রমে এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, আর কিছু দিনের মধ্যে ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্যের জন্যে যা-কিছু অর্থ রিজার্ভ আছে, তা শেষ হয়ে যেতে পারে। তার পরই তাকে লালবাতি জ্বালতে হবে। এই অবস্থার একটা সুরাহা করার জন্যে ইংলণ্ড বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দো-তরফা বাণিজ্য-চুক্তি করে রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমেরিকান গবর্নমেন্ট তা বরদাস্ত করতে রাজি-নয়। তাই, আমেরিকা ইংলণ্ডকে হুকুম করছে—'নানা দেশের সঙ্গে দো-তরফা চুক্তি করে তোমার রপ্তানি বাড়ানো চলবে না, ওটা বন্ধ করতে হবে। আমদানি যত খুশি বাড়াও এবং তার জন্যে আমাদের কাছ থেকে যত-খুশি

নেহরু সরকার কর্তৃক শতক

ডলার ধার নাও; কিন্তু রপ্তানি অমন ভাবে বাড়িও না। তার চেয়ে স্টার্লিং-এর ডলার মূল্য কমিয়ে দাও, তাহলে ডলারের দেশে তোমার রপ্তানি বাড়াবার সুযোগ হবে।'

ভারতের বহির্বাণিজ্য

আমদানি	রপ্তানি
১৯৪৬-৪৭—২৮৮ কোটি টাকা	২৯৮ কোটি টাকা
১৯৪৭-৪৮—৩৯৯ " "	৩৯৫ " "
১৯৪৮-৪৯—৫১৮ " "	৪১৬ " "

এই হুকুম অনুসারে এক পাউণ্ড স্টার্লিং-এর দর ৪·০৩ ডলারের স্থলে ২·৮০ ডলার করে দেওয়া হয়েছে—এখন ইংলণ্ড ১ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য ডলারের দেশে শতকরা ৩০ ভাগ কম দরে বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছে। অর্থাৎ, এখন ইংলণ্ড ডলারের দেশে শতকরা ৩০ ভাগ কম দরে মাল বেচেও আগের মত স্টার্লিং পাবে। সুতরাং, ডলার ঘাটতি মেটাবার জন্যে, অর্থাৎ, আমেরিকা থেকে আমদানী পণ্যের দাম শোধ করবার জন্যে, তাকে ডলারের দেশেই বেশি বেশি পণ্য পাঠাতে হবে। এই সুযোগে আমেরিকা এসে বৃটেনের স্টার্লিং বাজার দখল করবে।

ভারতে ডলার ফাঁস পাকা হল

নেহরু তো বলে দিলেন যে, এখন থেকে আমরা ইংলণ্ড থেকেই বেশি বেশি আমদানি করব; কিন্তু **ইংলণ্ডের উপায় নেই ভারতকে বেশি বেশি সরবরাহ করবার**—ইংলণ্ড ভারতের বাজার আমেরিকাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য। নেহরুর ধোঁকাবাজিতে আমরা ভুলবো না—এখন আসলে আমেরিকা থেকেই বেশি বেশি আমদানি করতে হবে এবং তার জন্যে দর দিতে হবে দিনের পক্ষে শতকরা ৩০৲ টাকা বেশি। অর্থাৎ, আমেরিকার কাছে আমাদের দেনা এখন বাড়বে।

এই দেনা নেহরু সরকার শোধ করবে কোত্থেকে? ভারতের আমদানির সমান সমান যদি রপ্তানি হয় তাহলে রপ্তানির দর দিয়ে আমদানি শোধ করা যায়। আর, ভারতের এই রপ্তানিটা বেশির ভাগ যদি হয় ডলারের দেশে, তবে আর ডলার ঘাটতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু, ভারতের বহির্বাণিজ্যে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেড়ে চলেছে। (তালিকা দেখুন)।

রপ্তানি যা, তার থেকে আমদানী ঢের বেশি। রপ্তানির প্রধান অংশ এখন স্টার্লিং-এর দেশে পড়ছে, কিন্তু আমদানির প্রধান অংশ ক্রমশ ডলারের দেশ থেকে বেশি আসছে। তাই, ডলারের ঘাটতি বাড়ছে বেড়ে, আমেরিকা নেহরুর কান মুচড়ে তার বকেয়া আদায় করে নেবে। এখন, টাকা এবং স্টার্লিং-এর ডলার-মূল্য কমাবার ফলে হল—গোদের ওপর বিষফোঁড়া। ডলারের জন্যে এখন টাকা দিতে হবে আগের চেয়ে বেশি, অথচ ইংলণ্ডে আমাদের যে পাওনা স্টার্লিং আছে, তারও ডলার মূল্য গেল কমে। একেই তো ইংলণ্ডের কাছ থেকে ভারতের পাওনা স্টার্লিং সবটা আদায় করতে পারলেন না, তার ওপর আবার যা পাওনা গেল তার বিনিময়ে শতকরা ৩০ ভাগ কম ডলার পাওয়া যাবে। বিদেশ থেকে আমদানি বা কী করে হবে? আর, আমেরিকার পাওনা ডলারই বা শোধ হবে কী করে? মহাসংকট ঘনিয়ে আসছে।

মার্কিন লুটের বাজার—ভারত

আমেরিকার মহাজনেরা এ-সংকটের একটা সমাধান ঠাউরেছে এবং এটলী ও নেহরুর কান মুচড়ে সেই সমাধান আদায় করে ছাড়বে। এ সমাধান হল, দু'রকম ভাবে ভারতকে ডলার দেওয়া—প্রথমত সরকারী ঋণ; দ্বিতীয়ত, শিল্পে ও ব্যাঙ্কে আমেরিকান্ পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মূলধন রপ্তানি। অর্থাৎ, আমেরিকান মূলধনের জাঁতার তলায় ভারতকে এখন পেশা হবে।

স্টার্লিং এবং টাকার ডলার মূল্য কমিয়ে এই কাজটাই আমেরিকার পক্ষে

মঞ্জিল

সহজ এবং আরও বেশী লাভজনক করা হল। প্রথমত, ভারতে ইংলণ্ডের যত মূলধন আছে তা আমেরিকা অপেক্ষাকৃত কম ডলার খরচ করে কিনে নিতে পারবে। তা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন কারখানায় এবং কোম্পানীতেও অপেক্ষাকৃত কম ডলার খরচ করে শেয়ার কেনা সহজ হবে—কারণ, এক এক টাকা এবং এক এক পাউণ্ড স্টার্লিং-এর জন্যে এখন শতকরা ৩০ ভাগ কম ডলার দিতে হবে। অর্থাৎ, ভারতে এখন আগের চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ কম ডলার খাটিয়েও আগের মত মুনাফা করা সম্ভব হবে। এতে আমেরিকান পুঁজিপতিরা সস্তা মজুর, সস্তা কাঁচামাল এবং অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তাদের রেকার মূলধন এনে এদেশে খাটাবে। ফলে ভারত হবে আমেরিকার কলোনী, উপনিবেশ।

শুধু ভারতে নয়,—বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে আমেরিকান মূলধনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার এবং বৃটিশ কলোনি বা উপনিবেশ কেড়ে নিয়ে আমেরিকান কলোনি সৃষ্টি করার ডলারী কায়দা হল এই স্টার্লিং ১ টাকার মূল্য হ্রাস।

নেহরুর ধোঁকাবাজি

নেহরু গত এক বছর ধরে খুব হাঁকডাক ছেড়ে বলছেন—আমরা মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে দেবো। মজুর এবং কেরানীদের মজুরি বাড়ানো হয় না এই অজুহাতে যে, মজুরি বাড়ালে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে। কিন্তু, আমেরিকার হুকুম তামিল করে টাকার মূল্য হ্রাসের যে-ব্যবস্থা করা হল, তার মানে গৃহস্থালির ব্যয় তাঁদের বাড়বেই, আসল মজুরি তাঁদের কাটা যাবেই।

নেহরুর ধাপ্পা

কিন্তু নেহরু এই বলে আশ্বাস দিতে চেয়েছেন যে, মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের রপ্তানি বাড়বার সুবিধা হবে। এটাও একটা বিরাট ধাপ্পা। ভারত রপ্তানি করে কাঁচমাল এবং অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতায় সস্তাদরে আমেরিকাকে কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবে। ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮-৪৯ সালে কোন্ কোন্ পণ্যের রপ্তানি কি মাত্রায় কমেছে তা দেখলেই অবস্থাটা বোঝা যাবে:—

ভারত থেকে রপ্তানি

	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৮-৪৯
মশলা—	৫৬৫,০০০ টন	৪,৫৮,০০০ টন
তামাক—	৭২০ লক্ষ পাউণ্ড	৫১০ লক্ষ পাউণ্ড
লাক্ষাদ্রব্য—	৬,৭৯,০০০ হন্দর	৪,৯১,০০০ হন্দর
ম্যাংগানীজ—	৪,৬১,০০০ টন	৩,০৬,০০০ টন
চামড়া—	২৪,০০০ টন	১৪,০০০ টন
ছোবড়ার দড়ি	১,০৬০,০০০ হন্দর	৮৬৯,০০০ হন্দর
তূলা—	১,৬২,০০০ টন	৭৬,০০০ টন
পাট—	৩০৬,০০০ টন	২,১৩,০০০ টন
পশম—	৪৩০ লক্ষ পাউণ্ড	৯০ লক্ষ পাউণ্ড

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে এই সব পণ্যের রপ্তানি বাড়াবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, কারণ ডলারের দেশে এসব পণ্য আরও অনেক ষ্টার্লিং-এর দেশ থেকে রপ্তানি হতে পারে। তাছাড়া ডলারের নিজ দেশেই কম খরচায় এসব জিনিস উৎপন্ন করার ব্যবস্থা আছে। আমেরিকার কাছে বিক্রী করে দিয়েছে।

পাকিস্তানের চাল—আসলে ইংরেজের-ই চাল

এদিকে পাকিস্তান সরকার ভারতের সংগে সংগে পাকিস্তান মুদ্রার ডলার মূল্য হ্রাস না করে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। তাদের এ চালটা হ'ল আসলে ইংরেজের একটা চাল। পাকিস্তানকে দিয়ে ভারতের সংগে টাকার বিনিময় মূল্য বদলে পাকিস্তানের বাজারে বৃটিশ মাল বেচবার বাজারটা হাতে রাখল। ইংলণ্ড জানে যে, ডলারের বাজারে আমেরিকার সংগে পাল্লা দেওয়া তার সহজ নয়, তাই পাকিস্তানকে দিয়ে পাকিস্তানী টাকার ডলার মূল্য ঠিক রেখে অর্থাৎ ষ্টার্লিং-এর মূল্য পাকিস্তানী টাকায় কমিয়ে পাকিস্তানে তার নিজের মাল বেচবার কায়দাটা সাফ করে রাখল। ইংলণ্ড দেখছে যে ভারতের বাজার আমেরিকার দখলে যখন যাবেই তখন পাকিস্তানের বাজারটা যে চাল চাল্‌ল তাতে সব দেশেরই সংকট ঘোরতর হয়ে উঠল, ইঙ্গ-আমেরিকান স্বার্থসংঘাত ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব দিল বাড়িয়ে, রাম-রাবণের যুদ্ধে এখন কপিকুল মারা যায়।

এ সংকটে আহত হবে না যে-সব দেশ

এ সংকটে আহত হবে না শুধু সেই সব দেশ যাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জালিবোটের মত বাঁধা নেই। সোভিয়েট এবং পূর্ব্ব ইওরোপের গণরাষ্ট্রগুলি মার্শাল প্ল্যান থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছে, তাদের দেশের বহির্ব্বাণিজ্য এবং মুদ্রা ষ্টার্লিং এবং ডলার রেশিওর ধার ধারে না। তাই তারা এখন স্বচ্ছন্দে তাদের নিজ নিজ দেশের স্বার্থ অনুযায়ী তাদের মুদ্রার বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হবে। ভারত এবং পাকিস্তান রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে ইঙ্গ-আমেরিকান শিবিরের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করে আমাদের দেশের জনগণের ঘাড়ে এই দুর্দ্দশা ডেকে এনেছে।

নেহরু সরকারের আত্মসমর্পণ কেন

নেহরু সরকার আমেরিকার কাছে এমন ভাবে দেশের স্বার্থ ধ্বংস করে আত্মসমর্পণ কেন করলো? কারণ টাটা এবং বিড়লার এতে কোন ক্ষতি নেই; তারা আমেরিকান পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত লাভের প্রসাদকণা পেয়েই সন্তুষ্ট হবে, যুদ্ধের বাজারে যুদ্ধের মাল মশলা বেচে তারা

রা ৯৫ জনের ভাগ্য ডলার সাম্রাজ্যবাদের পায়ে বিক্রয়

হল, মুদ্রাস্ফীতি। আমেরিকা থেকে যত ডলার ঋণ এবং মূলধন আসছে কিংবা আসবে, তার সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ এমনি যা বাড়ত এখন তার থেকেও বাড়বে শতকরা ৩০৲ টাকা বেশী। নেহরু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, উৎপাদন বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল কমিয়ে দেবেন। কিন্তু, এটা শুধু নেহরুর ধড়িবাজি। উৎপাদন বৃদ্ধির নামে তিনি যতই চেঁচাচ্ছেন ততই দেখি উৎপাদন কমে যাচ্ছে—কারণ মুনাফাখোরেরা দর বাড়াবার জন্যে উৎপাদন কমায় এবং মাল মজুত করে রাখে। আকেরিকান মূলধন নতুন উৎপাদন বাড়াবে না, পুরানো কারখানা কিনে নিয়ে শুধু তাদের মালিকানা স্থাপন করবে।

ধনতান্ত্রিক সংকট সারা দুনিয়ায় চেপে এসেছে। মূলধন থাকা সত্ত্বেও কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, বেকার সংখ্যা বাড়ে। লোকের অভাব অনটন এবং চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মাল মজুত থাকে। কারণ, মালিকের ঘরে মুনাফার পাহাড় জমেছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক হয়েছে ফতুর। তাই, আজ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়াবার কথা বালি নিঙড়ে রস বের করার সামিল।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে শ্রমিক এবং কেরানীরা যে ঠ্যায় মারা যাবে, সেটা এত নিঃসন্দেহ যে, নেহরু তাঁদের লক্ষ্য করে কোন ভরসাও দিতে সাহস করেননি।

ভারতে কার সর্ব্বনাশ

সুতরাং গরীব কৃষকদের ত আয় বাড়বে না, অথচ ব্যয় বাড়বে। কারখানাজাত পণ্যের জন্য তাদের আরও অতিরিক্ত দর দিতে হবে। কিন্তু কৃষিজাত পণ্যের জন্য তারা পাবে আরও অনেক কম দর।

এই মুদ্রামূল্য হ্রাস ভারতের ছোটখাট কারখানাগুলিকেও ভীষণভাবে আঘাত করবে। যেমন কাঁচের কারখানা। এই কারখানার কাঁচামাল সোডা এ্যাস আসে বিদেশ থেকে। এখন সোডা এ্যাস আমেরিকাও সরবরাহ করে, আবার ইংলণ্ডও সরবরাহ করে। আমেরিকান সোডা এ্যাসের দর বাড়বে বলে ইংলণ্ডও বাড়াবে। কাঁচের উৎপাদন-খরচ এবং তার ফলে দেশী কাঁচের দরও বেড়ে যাবে। টাটা-বিড়লার মত বড় বড় রুই-কাতলার এতে ক্ষতি হবে না। কারণ তাদের কারখানার কাঁচামাল এদেশেই আছে। মারা যাবে দেশের সর্ব্বসাধারণ এবং তারপর কিছুটা ছোটখাটো কয়েকরকম শিল্পের মালিকেরা।

অতএব সমস্ত দিক থেকেই ভারতের মজুর, চাষী এবং গরীব মধ্যবিত্তের সর্ব্বনাশ, কেবল আমেরিকান পুঁজিপতিদের পৌষ মাস। মিষ্টান্নের একটা গৌণ অংশ অবশ্যই ভারতীয় পুঁজিপতিরা আদায় করে নেবে—কিন্তু দেশের শতকরা ৯৫ জনের ভাগ্য নেহরু সরকার যদি রিজার্ভ রাখা যায়।

এর ফলে ভারতের সংগে পাকিস্তানের যে স্বার্থ-সংঘাত বেধে উঠল তাতেও এই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্গত গরীব জনগণই মারা যাবে। পাকিস্তান তাতে মারা যাবে কারণ পাকিস্তানের টাকা ভারতে এলেই তার বদলে বেশী ভারতীয় টাকা পাওয়া যাবে, সুতরাং পাকিস্তানের সঞ্চিত অর্থ সব ভারতীয় ইউনিয়নে চলে আসবে। তাছাড়া বৃটিশ এবং ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী পাকিস্তানে এমন সুবিধা পাবে যে, পাকিস্তানের কাপড়ের কারখানায় দেখা দেবে মহাসংকট। পাট বেচে ভারতের কাছ থেকে পাকিস্তান যে সুবিধে আশা করছে তা টিকবে না।

পাকিস্তানের এ ব্যবস্থা বেশি দিন টিকবে বলে মনে হয় না। আমেরিকার চাপে এবং নিজেদের অর্থ সংকটের ধাক্কায় পাকিস্তানকেও হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তার টাকার ডলার মূল্য কমাতে হবে। বোধ হয় পাকিস্তানের চালটা হল এই যে, পাকিস্তানী টাকার ডলার মূল্য হ্রাস করার আগে বেশী দরে কিছু পাট বেচে নিই।

বলা বাহুল্য যে, পাকিস্তানের পাট বেচে যে অতিরিক্ত মুনাফা হবে তা পাট-উৎপাদনকারী গরীব কৃষক পাবে না, পাবে পাটের মহাজন।

সংকট ঘোরতর হ'লো

মোট কথা আমেরিকান-সাম্রাজ্যবাদ তাদের পসার বাড়াবে। তারা এখন নিজেরা স্বাধীন ব্যবসা করে যা লাভ করতে পারে তার চেয়ে আমেরিকান পুঁজিপতিদের দালালী করে অনেক বেশি টাকা রোজগার করবার পথ খুঁজছে। তাতে দেশের ভাগ্যে কি হ'ল না হ'ল তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। নেহরু সরকার প্রকৃত পক্ষে টাটা-বিড়লার একটা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী। তাই নেহরু আমেরিকার হুকুম এই ভাবে তামিল করছে।

আমেরিকার এই কাণ্ড কেন?

আমেরিকা কেন এই কাণ্ডটা করল? কারণ তার ঘরে সুরু হয়েছে ধনতন্ত্রের মহাসংকট। মুনফা-খোরের জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা যায় যায়। ট্রুমানের নিজ মুখের স্বীকৃতি অনুসারেই—

আমেরিকায় এখন ২০ লক্ষ মজুর বেকার, গত জুন মাসে উৎপাদন কমেছে শতকরা ১৩ ভাগ, গত বৎসরের শরৎকালের হিসাব অনুসারে শতকরা ৩০টি আমেরিকান পরিবারের কোন সঞ্চয় নেই। টাস্ এজেন্সির বিবরণ অনুসারে আমেরিকায় এখন মোট ৫০ লক্ষ সম্পূর্ণ বেকার এবং ১২০ লক্ষ আংশিক বেকার নরনারী আছে। এই সংকটের হাত থেকে আমেরিকান ধনবাদের পরিত্রাণ নেই।

এই সংকট যাতে না হয় তার জন্যই

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

২৫শে সেপ্টেম্বর

কংগ্রেসী ভেদনীতি ব্যর্থ করিয়া কর্পোরেশন শ্রমিকের ঐক্য

২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত লইয়া সর্ব্বত্র সভা-শোভাযাত্রা ও কমিটিগঠন

কম্‌সেকম মূল বেতন ৫০৲ টাকা, ৪৫৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা ও ২০৲ টাকা ঘর ভাড়ার নিম্নতম দাবী লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ২২ হাজার শ্রমিক—ধাঙ্গর, মেথর, বাতিওয়ালা, জল কলের মজুর ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিবেন।

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে নীচু হইতে সাধারণ শ্রমিকদের জঙ্গী ঐক্য কলিকাতার পার্কে রাস্তায় জনসভা ও শোভাযাত্রায় এই সাড়া পৌঁছাইয়া দিতেছেন।

কর্পোরেশন শ্রমিকই পশ্চিম বাংলার একমাত্র শ্রমিক যাহারা 'কংগ্রেসী শাসন' ২৫ বৎসর কাল অবধি 'ভোগ' করিয়াছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বিধান সরকার আজ আই-সি-এস মিঃ-এস-এন-রায়কে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ত্তা নিয়োগ করিয়া নির্লজ্জ শোষণের বীভৎস রথ চালাইয়া যাইতেছেন। কর্পোরেশনের একজন শ্রমিক নিম্নতম বেতন পান ২০৲ টাকা—সারা কলিকাতায় এত কম বেতন আর কোথায়ও নাই।

কর্পোরেশন শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের মূল ভিত্তি হইল নীচু হইতে গড়িয়া-তোলা শ্রমিকদের জঙ্গী একতা। লালঝাণ্ডা সেই ঐক্যেরই আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রত্যেকটি বস্তিতে বস্তিতে তাই আজ সাড়া জাগিয়াছে। দাবী আদায়ের জন্য ভাই ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ চালাইতেছেন। রাত জাগিয়া মিটিং হইতেছে, স্থানীয় কমিটি গড়িয়া উঠিতেছে।

কংগ্রেস নেতা দেবেন সেন জানেন, এই নীচু হইতে ঐক্য জঙ্গী ভ্রাতৃত্বে ফাঁটল সৃষ্টি করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। তাই গত ৮ মাস পর্য্যন্ত যে দেবেন সেন, মানিক রাম প্রভৃতি কংগ্রেসী দালালেরা 'ধৈর্য্য-ধর' দিল্লী হইতে টাকা আসিবে প্রভৃতি বলিয়া শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের পথে পা বাড়াইতে বাঁধা সৃষ্টি করিতেছিলেন, আজ তাঁহারাও কসম খাইয়া বলিতেছেন, 'আমরা ত দালাল নই', 'আমরাও ধর্ম্মঘটের পক্ষে।'

শ্রমিকদের দাবী ও তাহার জন্য বিক্ষোভ এতই প্রবল যে, মুখে উহা না বলিয়া উপায় নাই। কিন্তু ধর্ম্মঘটে ভেদ সৃষ্টি করিয়া কাজে বানচাল করিবার জন্য কংগ্রেসী দেবেন সেন, মানিক রাম ধুয়া তুলিয়াছেন—'আমরা ধর্ম্মঘটের পক্ষে কিন্তু এখন ধর্ম্মঘট নয়। পূজার সময় ধর্ম্মঘট করিলে নাগরিকেরা বিরুদ্ধে যাইবেন।'

২১শে সেপ্টম্বর মনুমেণ্টের নীচে লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের আহ্বানে ৩ হাজার নরনারীর জমায়েতে কর্পোরেশন শ্রমিকরা এই ধর্ম্মঘট বিরোধী ধুয়ারই জবাব দেন। তাঁহারা বলেন—একমাস যাবৎ কর্পোরেশন শ্রমিকেরা তাঁহাদের ন্যায্য ও নিম্নতম দাবী জানাইয়া আসিতেছেন। উহা গ্রহণ না করিয়া কংগ্রেসী কর্পোরেশন মালিকরাই এই ধর্ম্মঘটের জন্য দায়ী।

জনৈক শ্রমিক প্রশ্ন করেন, কোন্ নাগরিকেরা আমাদের বিরুদ্ধতা করিবেন? আমাদের মুখের গ্রাস, বৌয়ের ইজ্জৎ ও বালবাচ্চার হাসি যাহারা কাড়িয়া নিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মঘট তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অসুখী করিবে। কিন্তু এই মিটিংএ-ই পটারী ও এলেনবারীর যে নাগরিকেরা হাজির হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পক্ষে। তাহারাই অধিকাংশ এবং তাঁহাদের আনন্দেই আমাদের আনন্দ, তাঁহাদের সমর্থনেই আমাদের জয় অনিবার্য্য।

সভার পর একটি দীর্ঘ মিছিল বাহির হয়। '২৫শে অক্টোবর ঝাড়ু-বুরুশ বন্ধ কর,' 'পানি-বাতি-জল সব কুছ বন্ধ হ্যায়' 'শনিবার হাজরা পার্কের মিটিংএ সামিল হও' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়া মিছিল বড় বড় রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ধাঙ্গরদের একটি ছবি ছাপা হইয়াছিল। সেইদিনও শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ধ্বনিই তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও আশা ছিল, কংগ্রেসনেতা দেবেন সেনের নেতৃত্বে রাখিয়া এই ধর্ম্মঘটের ডাককে হয়তো বানচাল করা যাইবে। কিন্তু আজ সেই আশা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে সাধারণ শ্রমিকদের জঙ্গী ঐক্যের এই মিছিল তাই 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাতে ছোট আকারে স্থান পায় নাই।

নিম্নতম দাবী আদায়ের জন্য ২২ হাজার কর্পোরেশন শ্রমিকের আন্দোলন দালালদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া এই ভাবে অনিবার্য্য ধর্ম্মঘট সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হইয়াছে।

বেহালায় ধাঙ্গর ধর্ম্মঘট

আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গর ও অন্যান্য শ্রমিকেরা তাহাদের দাবি নিয়া লড়াই সুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। ইতিমধ্যে গত ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতার শহরতলী বেহালা মিউনিসিপ্যালটির সমস্ত ধাঙ্গর ও মেথর স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়া দিয়াছেন।

২২শে সেপ্টেম্বর লালঝাণ্ডা নিয়া এই ধর্ম্মঘটে ২০০ ধাঙ্গর ও মেথর মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যানের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাহাদের দাবি তুলিয়াছেন।

তাহাদের দাবি, (ক) অবিলম্বে ৫৫৲ টাকা বেতন দিতে হইবে; বর্ত্তমানে তাহারা ৩৮টাকা হইতে ৪২ টাকার বেশী পান না। তাহারা দাবি তুলিয়াছেন (খ) বস্তী পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; জলের অসুবিধা দূর করিতে হইবে। ধর্ম্মঘটের আগে বার বার এ দাবি তোলা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ কোনও কর্ণপাত করে নাই।

জঙ্গী ধাঙ্গর ও মেথরদের নিয়া সংগ্রাম কমিটি গঠন করিয়া লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে তাঁহারা ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন।

মুদ্রা মূল্য হ্রাসে গরীবের আয় হ্রাস ব্যয় বৃদ্ধি

(৯ পৃষ্ঠার পর)

আমেরিকান সরকার ইওরোপে মার্শাল প্ল্যান চালু করেছিল কিন্তু মার্শাল প্ল্যান আমেরিকার সংকট কমাতে পারেনি, বরং তাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

সংকট একেবারে ফেটে পড়বে

মার্শাল প্ল্যান অনুসারে আমেরিকা অন্য দেশকে ডলার ধার দেয় এবং সেই ডলারের বদলে তাদেরকে বাধ্য করে চড়াদরে আমেরিকান কারখানার মাল কিনতে। ফলে ঐ সব দেশের আমদানী বেড়েই চলেছে, কিন্তু তাদের রপ্তানী করার জায়গা নেই। এখন তাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়ে তাদের সমস্ত বিদেশী মূলধন আমেরিকা কিনে নিতে চায়। এর ফলে ইওরোপ এবং এশিয়ায় সংকট একেবারে ফেটে পড়বে।

আমেরিকা বিশ্বজয়ে বদ্ধপরিকর

আমেরিকা যে ভাবে ইংলণ্ড, ভারত এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশকে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য করল তাতে এইটেই প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকা এখন বিশ্ব জয়ে বদ্ধপরিকর, অন্য সমস্ত দেশের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য প্রত্যেক দেশকে দিয়ে সে টোপ গেলাচ্ছে; তারাও এ টোপ গিলছে কারণ তাদের সরকার ধনিকের সরকার, জাতীয় স্বাধীনতার চেয়ে ব্যক্তিগত মুনাফার মর্য্যাদা তাদের কাছে ঢের বড়। তাই আমেরিকার পদতলে দাঁড়িয়ে তারা তাদের স্বদেশবাসীর ভাগ্য নিয়ে ব্যবসা করার দালালী খুলেছে! ভারতে কংগ্রেসী সরকার ট্রুম্যানের এমনিতর একটি দালাল। এই দালালদের নিয়ে আমেরিকান সরকার সোভিয়েট এবং ইওরোপের গণরাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করছে। যে সংকটে আজ সাম্রাজ্যবাদ হাবুডুবু খাচ্ছে তাতে এখন যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন সমাধান তাদের শাস্ত্রে নেই। কিন্তু সংকট যতই ঘোরতর হচ্ছে ততই সাম্রাজ্যবাদীদের সখের একতায় ফাটল বাড়ছে। মাৎস্যন্যায়ের মত বড় মাছ এখন ছোট মাছগুলোকে গিলে খাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী মাছের ঝাঁকে তাই মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। ছোট মাছেরাও জেলের ভয়ে বড়মাছের কাছে আত্মসমর্পণ করছে।

"মাখনের বদলে বন্দুক"

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের মত ইওরোপের দেশগুলিতেও আমদানী পণ্যের দর বাড়বে, আর সেই সংগে বাড়বে মজুরদের গৃহস্থালীর ব্যয়। এই সুযোগে ট্রুম্যান সরকার ঐ দেশগুলিকে বাধ্য করবে যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনতে, খাদ্যের চেয়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম একটু সুবিধা দরে দেওয়া হলেই তারা হাঁ করে গিলবে। আমেরিকার যুদ্ধ ষড়যন্ত্র সফল করার এটা আর এক কৌশল। অন্যান্য গবর্নমেণ্ট মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে আমেরিকা থেকে যে কোন পণ্য আমদানী করতে গিয়ে চড়াদর দিতে বাধ্য হবে। আমেরিকান গবর্নমেণ্ট তাদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে খাদ্যের চেয়ে অস্ত্রপাতি একটু সুবিধা দরে ছাড়বে। এমনি ভাবে তাদের বাধ্য করবে "মাখনের বদলে বন্দুক" কিনতে।

শ্রমজীবী জনসাধারণের অপূর্ব্ব প্রতিরোধ

কিন্তু এতো চেষ্টাতেও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের জাহাজ সংকটের উত্তাল সমুদ্রে হালে পানি পাবে না। শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবনের ওপর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের এই হামলা সৃষ্টি করছে অপূর্ব্ব প্রতিরোধ, কারণ তাদের চোখের সামনে রয়েছে সোভিয়েট এবং চীন ও ও পূর্ব্ব ইওরোপীয় গণরাষ্ট্রসমূহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংকটমুক্ত এই দেশগুলি এগিয়ে চলেছে পারস্পরিক সহযোগিতার সাহায্যে স্বাধীনতা ও সম্পদের পথে। তাই তারা সোভিয়েট ও গণরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করবে না, আপন আপন গবর্নমেণ্টের দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে অদম্য শক্তি নিয়ে লড়বে আর অপূর্ব্ব প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে তাদের ওপর যে শোষণ চেপেছে তার বিরুদ্ধে। ভারতের শ্রমজীবী জনসাধারণ এ সংগ্রামে পিছিয়ে নেই এবং আরও এগুবে দৃপ্ত পদক্ষেপে। **প্রতিরোধ চাই, নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধ।**

জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জনগণের চূড়ান্ত শক্তি সংঘাত জমে উঠেছে।

এ সংঘাতে জনগণের জয় এবং সাম্রাজ্যবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। যে ঝড় উঠেছে তা আরও জোরসে উঠুক, সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনবাদের ইমারত ভেঙ্গে চুরমার করে দিক; ঝড়ের পর নবীন সমাজের সূর্য্য কিরণে দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত হবে।

বাহির হইল

মার্কসবাদী (৫)

এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ:

* "বাংলার প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা"
* গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব —মাও-সে-তুং
* ভারতে ভাষা সমস্যা

নিউ পাবলিশার্স

৬, নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ঢাকায় অনশন-বন্দীদের সমর্থনে

মহিলা শোভাযাত্রা ও জনসভার উপর পুলিস ও গুণ্ডাদের বে-পরোয়া আক্রমণ

১১ জন মহিলা ও ৬ জন ছাত্র গ্রেপ্তার

রাজবন্দীদের ন্যায্য মর্য্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার দাবীতে গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ঢাকা জেলের রাজবন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর অনশনকারী বন্দীদের সমর্থনে ঢাকা শহরে একশত মহিলার একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। একদল গোয়েন্দা পুলিস শোভাযাত্রাটিকে অনুসরণ করিতে থাকে। শোভাযাত্রাটি একটি জনবিরল স্থানে আসিলে গোয়েন্দারা কয়েকজন মহিলার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে। কিন্তু কয়েকজন সাধারণ লোক সেখানে জমায়েত হওয়ায় গোয়েন্দারা পালাইয়া যায়।

জনসভার উপর পুলিসের আক্রমণ

ঐ দিনই বৈকালে রেল মজদুর ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা-সমিতির আহ্বানে ঢাকা করোনেশন পার্কে অনশন বন্দীদের সমর্থনে এক সভার আয়োজন হয়। শতাধিক মহিলা সহ ৫০০ শ্রোতার নিকট নারায়ণগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা নিবেদিতা নাগ বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে একজন দারোগার নেতৃত্বে একদল পুলিস, সাদা পোষাকধারী কয়েকজন গোয়েন্দা এবং কতকগুলি ভাড়াটিয়া গুণ্ডা একযোগে শ্রীযুক্তা নাগ এবং সভার অন্যান্য উদ্যোক্তাদের আক্রমণ করে। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার এই সরকারী ও বে-সরকারী ফৌজ মেয়েদের উপর লাঠি চালাইয়াই ক্ষান্ত হয় না—তাহারা বর্ব্বরের মতন মেয়েদের হাত ও জামাকাপড় ধরিয়া টানাটানি সুরু করে। দর্শকরা ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহাদেরও নির্ম্মমভাবে প্রহার করা হয়। পুলিস ও গুণ্ডাদের আক্রমণের ফলে একজন মহিলা অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহার মাথায় ও মুখে জলের ছিটা দেওয়ার অপরাধে একজন ছাত্রকে বেদম প্রহার করা হয় এবং গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীযুক্তা নিবেদিতা নাগ, ছাত্রনেত্রী সুফিয়া বেগম, শ্রীযুক্তা সুদেবী মুখার্জ্জি, নিরুপমা গুপ্তা, উমা দেবী প্রভৃতি সহ ১১ জন মহিলা এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্র নেতা আমজাদ হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা রফিকুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র রোওশন প্রভৃতি সহ ৬ জন ছাত্র, মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মহিলাদের এক মাইল পথ হাঁটাইয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং সারারাত্রি ও পরেরদিন থানা হাজতে আটক রাখিয়া শেষে ঢাকা জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জেলের মধ্যে অত্যাচার

জেলখানার মধ্যেও অনশন বন্দীদের উপর জোর করিয়া দুধ গেলাইবার নামে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হইতেছে। অনশন বন্দীদের মধ্যে যে দুইজন মহিলা রহিয়াছেন তাঁহারাও এই অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পাইতেছেন না। ৫।৬ জন সিপাহী ও দাগী কয়েদী দিয়া ছাত্রীনেত্রী নাদেরা বেগমকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার নাক দিয়া দুধ ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে।

জেলের বাহিরে ও ভিতরে নুরুল আমীন সরকারের এই ফ্যাসিস্ট নীতির প্রতিবাদ জানাইয়া রেল মজদুর ইউনিয়ন, ছাত্রফেডারেশন ও মহিলা সমিতির সম্পাদকগণ এক যুক্ত বিবৃতি বাহির করিয়াছেন।

অনশন বন্দীদের দাবী মানিয়া নিতে লীগ সরকারকে বাধ্য করার জন্য তাহারা শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা ও সকল প্রগতিশীল জনতাকে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

বিধান সরকারের জেলে

জলপাইগুড়ীতে বন্দীদের অনশন

জুন মাসে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের অনশন ভঙ্গ করার সময় বিধান-মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল দিনের পর দিন তাহা ভঙ্গ করা হইতেছে এবং বন্দীদের আবার অনশনের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। আলিপুর জেলে ইতি-মধ্যেই ১০০ জন বিচারাধীন রাজবন্দী অনশন সুরু করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ যে, জলপাইগুড়ী জেলেও ৭ জন রাজবন্দী ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে অনশন সুরু করিয়াছেন। এই জেলে ২৭শে জুলাই কেশব ও মজিবর নামক দুইজন বিচারা-ধীন রাজনৈতিক বন্দীকে কাজ না করার অজুহাত দিয়া বেদম প্রহার করা হয়। ফলে কেশবের একটি কান একেবারে নষ্ট হইয়া যায়—একটি কানে তিনি এখন একদম শুনিতে পান না। আর একজন রাজবন্দী ফাগুওড়াকে ফৌজদারী আইনে ধরিয়া আনিয়া তৃতীয়শ্রেণীতে রাখা হয়। অন্যান্য বন্দীরা ইহার প্রতি-বাদ করিলে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দীর পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তাহাকে প্রথমশ্রেণীর বন্দীর কোনরূপ সুবিধাই দেওয়া হয় না। প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে রাজবন্দীরা যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পান তাহার কিছুই তাঁহাদের দেওয়া হইতেছে না। তাই বন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা দাবী করিয়াছেন (১) রাজবন্দীদের প্রথম শ্রেণীর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে (২) ১৭শে জুলাই কেশব ও মজিবরকে প্রহার করার ব্যাপারে তদন্ত চাই এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে হইবে। (৩) ফাগুওড়াওকে প্রথম শ্রেণীর সমস্ত সুবিধা দিতে হইবে।

নুরুল-আমীন সরকারের কারাগারে বন্দী নির্য্যাতন

সিলেট জেলে ৮০ জন রাজবন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

গত ৩১শে আগস্ট হইতে সিলেটে নুরুল-আমীন সরকারের কারাগারে ৮০ জন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন। মাসখানেক পূর্ব্বে বন্দীরা সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানাইয়া এবং রাজবন্দীদের ন্যায্য মর্য্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দাবি করিয়া এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ এই দরখাস্তের কোন উত্তর না দিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া যাইতেছে।

২৮ই আগস্ট নুরুল-আমীন সরকা-রের ফৌজ সানেশ্বর গ্রামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উপর গুলি চালাইয়া ৫জনকে খুন করে এবং নারী-পুরুষ সমেত ৭০ জনকে বন্দী করিয়া লইয়া আসে। সিলেট জেলে কুষ্ঠরুগীর ঘরে সানেশ্বরের এই সমস্ত বন্দীদের আটক করিয়া রাখা হয়। তাহাদের স্নানের জন্য একফোটা জল পর্য্যন্ত দেওয়া হইতেছে না। আত্মীয় স্বজনেরা কাপড়-জামা দিতে আসিলে তাহাদের গালাগালি দিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয়। যে কয়েকজন মেয়েকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে জেলে তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় তাহাদের উপর যে মারপিট করা হয় তাহাতে তাহাদের পরণের কাপড় ছিঁড়িয়া সমস্ত শরীর রক্তাক্ত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছিল। জেলের ভিতরে অপর্ণা পালের গর্ভপাত হইয়াছে—বর্ত্তমানে তিনি মৃত্যু শয্যায়। এই অবস্থায়ও মেয়েরা আজ সেই এক কাপড়েই আছেন। আত্মীয়-স্বজনেরা জেল গেটে তাহাদের জন্য জামা-কাপড় দিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও জামা কাপড় তাহা-দের হাতে পৌঁছায় নাই।

বন্দীদের অনেককে ধান কুটিতে দেওয়া হইয়াছে।

এই সমস্ত ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের প্রতিবাদেই বন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কৃষক-কর্ম্মীদের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড

যশোর জজ আদালতে দালাল নুরুল হুদা হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ৫ জন কৃষকের বিচার এতদিন পরে শেষ হইয়াছে। জেলা জজ ১০জন কৃষককে ৫বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে—বাকী ৫জনকে মুক্তি দিয়াছে।

নুরুল হুদা নড়াইলের জমিদার-জোতদার ও লীগ সরকারের কুখ্যাত দালাল। গত বৎসর নভেম্বর মাসে চাঁদপুর গ্রামে পুলিস-বাহিনীসহ কৃষকের বাড়ীঘর লুট করিতে যাইয়া নুরুল হুদা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নুরুল আমীন সরকারের জেলে

যশোরে কমিউনিষ্ট বন্দীদের উপর লাঠি চালনা

বিলম্ব প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ যে, যশোর জেলে গত ৩১শে আগস্ট বিচারাধীন কমিউনিস্ট কর্ম্মী মোজাম সেখ বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছেন। যশোর জেলে আবদ্ধ অন্যান্য রাজবন্দীরা ও বিচারাধীন বন্দীরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মোজাম সেখের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত দাবী করিলে জেল কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহারা জেলের ওয়ার্ডার ও দালাল কয়েদীদের রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেয়।

কমিউনিস্ট বন্দীরা যখন নিজেদের ওয়ার্ডে মৃত সহকর্ম্মীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনের আয়োজন করিতেছিলেন তখন তাহাদের উপর বে-পরোয়া লাঠি চালনা করা হয়—দোতলা হইতে প্রহার করিতে করিতে তাহাদের নীচের তলায় নামানো হয় এবং একটি আলোবাতাসহীন স্যাঁত-স্যাঁতে ঘরে তাহাদের বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহার পর হইতে দিবারাত্রি তাহাদের একটি অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইতেছে। আটকবন্দী সুবোধ রায় ও বিচারাধীন বন্দী রসিক ঘোষ গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের চিকিৎসারও কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ঢাকা রেলকারখানায় সপ্তাহে ২ ঘণ্টা বেশী খাটানোর বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ

বেতন সহ ছুটির ব্যাপারে বড় সাহেব ও শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্যের প্রতিবাদে ১৪০০ শ্রমিকের দৃঢ়সংকল্প

ঢাকা রেল ওয়ার্কশপে সপ্তাহে ৪৬ ঘণ্টা কাজের বদলে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করার নির্দ্দেশ দিলে শ্রমিকেরা নিজেদের জঙ্গী একতার জোরে ডি-এম-ইর সেই হুকুম বাতিল করিয়া দিয়াছেন। রেল কারখানায় ১৪০০ শ্রমিক নিজেদের একতার এই বিপুল ও অপরাজেয় শক্তির স্বরূপ চেনামাত্র আরও বহু অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধেও রুখিয়া দাঁড়াইতে সুরু করিয়াছেন।

৩রা সেপ্টেম্বর ডি-এম-ই'র হুকুম নোটিস আকারে টানাইয়া দেওয়া হয়। নোটিসে বলা হয়, শ্রমিকদের শনিবার যে দুই ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়া হয়। শুক্রবার ১০ ঘণ্টা খাটিয়া সেই সময় পুরাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে তাঁহাদের একই বেতনে সপ্তাহে ৪৬ ঘণ্টার চলতি নিয়ম পাল্টাইয়া ৪৮ ঘণ্টা কাজের হুকুম জারি হইল।

ইতিপূর্ব্বে ডি-এম-ই শুক্রবারে নামাজের ছুটির পরিবর্ত্তে অন্যদিন আধ ঘণ্টা করিয়া মোট তিন ঘণ্টা বেশী খাটাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হয়, বর্ত্তমানে তিনি সেই চক্রান্তই ঘুরাইয়া করিতেছিলেন।

বিক্ষোভের ঝড়—লালঝাণ্ডার প্রচার

এই নোটিসের কথা জানা মাত্র রেল শ্রমিকেরা ক্রোধ ও ঘৃণায় আগুন হইয়া উঠেন। সকলেই চিন্তা করিতে থাকেন এই হুকুম একবার চাপাইয়া দিতে পারিলে ধনিক লীগ সরকার শ্রমিকদের কেনা গোলামে পরিণত করিবে। এই বিক্ষোভ ও ঘৃণার নেতৃত্বে আসিয়া দাঁড়ায় লালঝাণ্ডা। কারখানা ও কলোনীর দেওয়ালে দেওয়ালে বাংলা ও উর্দ্দু হরফে শত শত পোস্টারে এক মিনিটও বেশী কাজ না করার নির্দ্দেশ ঘোষিত হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারের আগের দিন সন্ধ্যায় লালঝাণ্ডার কর্ম্মীরা প্রচার স্কোয়াড বাহির করেন। দেখিতে না দেখিতে কলোনী ও বস্তির শত শত রেল শ্রমিক আসিয়া যোগ দেন এবং স্কোয়াড একটি মিছিলে রূপান্তরিত হয়। রাত্র প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত মিছিল শ্রমিকদের ঘরে ঘরে প্রতিরোধের বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দেন।

ডি-এম-ই ঘেরাও

শুক্রবার কারখানায় ঢুকিয়াই শ্রমিকরা ডি-এম-ইকে ঘেরাও করিয়া তাহার হুকুম পাল্টাইতে বলেন। কিন্তু বড় সাহেব সোজা কথায় নড়িতে রাজি নহেন।

টিফিনের সময় শ্রমিকদের বিশ্রামের বদলে সভা হয়। লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতারা বক্তৃতা করেন। খবর পাইয়া একদল গোয়েন্দা পুলিস সভায় আসিয়া নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য পরিকল্পনা করিতে থাকে। কিন্তু শ্রমিকদের রক্ত চক্ষু লক্ষ্য করিয়া সেই চেষ্টা হইতে তাহারা বিরত হয়।

বড় সাহেব পরাজিত

কারখানায় ঢুকিয়া শ্রমিকেরা তাঁহাদের কায়দা ঠিক করিয়া ফেলেন। তাহারা স্থির করেন যে, ঠিক ৪॥০ টার সময় সকল শ্রমিক একযোগে বাহির হইয়া আসিবেন।

অবস্থার এই চরম পরিণতি লক্ষ্য করিয়া ডি-এম-ই আর মাথা খাড়া রাখিতে পারিলেন না। বেলা ৪টার সময় তাহার স্বাক্ষরিত পুনরাদেশ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় যে, দুই ঘণ্টা কাজ বাড়াইবার আগের হুকুম অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইল।

বেলা ৪॥০টার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ১৪০০ শ্রমিক বিজয়-গর্ব্বে কারখানা হইতে বাহির হইয়া আসেন।

বেতন সহ ছুটির লড়াই

শ্রমিকদের এই আত্মশক্তির চেতনার তাঁহারা আরও নূতন নূতন সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতেছেন। ১২ই সেপ্টেম্বর সোমবার জিন্নার মৃত্যু বার্ষিকীতে সকল সরকারী অফিসের সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে অফিসও ছুটি হয়। বড় সাহেবদের বিশ্রামের এই ব্যবস্থা হইলেও শ্রমিকদের বেলা পৃথক নিয়ম; তাঁহাদের জন্য যথারীতি মেহনতের ব্যবস্থাই বহাল থাকে। এই দিন কারখানায় ঢুকিয়াই শ্রমিকেরা সকলের মত ছুটি দাবী করিয়া ডি-এম-ইকে ঘেরাও করেন। কিন্তু তিনি কিছু করিতে অক্ষমতা জানান।

কারখানায় সকল শ্রমিকদের সভা বসে এবং তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তখনই কাজ হইতে বাহির হইয়া যাইবেন। ৭॥০টায় কাজ চালু হইবার বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রমিক কারখানা ছাড়িয়া চলিয়া আসেন।

শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শুধু ছুটি নহে; বড় সাহেবদের মত বেতন সহ ছুটিই তাঁহারা আদায় করিবেন। আগামী মাসে তাঁহাদের বেতনের বিলে এই দিনের বেতন কাটিলে তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিয়াই নিজেদের দাবী আদায় করিবেন।

দ্বিতীয় বার বাস্তুহারা করার জন্য নেহরু-বিধান প্ল্যান

জমি ও কাজ অথবা বেকার ভাতার জন্য ধূমায়িত গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ

পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় ২০ লক্ষ বাস্তুহারাদের মরা-বাঁচার সমস্যার সরকারী সকল দায়িত্ব ত্যাগের প্রয়াস ও পদ্ধতিটি নিম্নোক্ত আঁকা-বাঁকা পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। নেহরুর রায় অনুযায়ী বিধান-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন—

(ক) ৩১শে অক্টোবরের পর সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি তুলিয়া দেওয়া হইবে।

(খ) ৩১শে অক্টোবরের পর সরকারের সমস্ত 'সাহায্য'দান বন্ধ হইবে এবং উহার বদলে 'পুনর্ব্বসতির' জন্যই সকল টাকা ব্যয় করা হইবে।

(গ) 'পুনর্ব্বসতি' পরিকল্পনায় এককালীন পরিবারপ্রতি ৭০ টাকা গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ 'দান' এবং ৫ শত টাকা মূলধন হিসাবে খাটাইবার জন্য 'ঋণ' দেওয়া হইবে।

(ঘ) ১২ই সেপ্টেম্বরের পর 'ঋণ' গ্রহণ সংক্রান্ত দরখাস্ত আর গ্রহণ করা হইবে না।

বাস্তুহারাদের জীবন সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সঙ্গে এই সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা যে কতখানি ধাপ্পাবাজী তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা দরকার।

৩১শে অক্টোবরের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি সাফ করা ও সাহায্য বন্ধের জন্য যে কাজগুলি ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে, সেগুলি কি?

আসানসোলে ৭টি ক্যাম্পে প্রায় ১৫ হাজার বাস্তুহারা পরিবার বাস করেন। তাঁহাদের পাট দিয়া দড়ি পাকাইতে দেওয়া হয় এবং উহার বিনিময়ে জন প্রতি দৈনিক ৩ ছটাক চাউল কিছু ডাল-তৈল মশলা ও বাজার খরচের জন্য সপ্তাহে পরিবার প্রতি আড়াই টাকা পূর্ব্বে দেওয়া হইত।

ইতিমধ্যে সাহায্য দান বন্ধের পরিকল্পনায় এই চাউল-ডাল টাকা—সবই বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু এই কাজের একমাত্র ও অনিবার্য্য ফল একই সঙ্গে প্রায় একলক্ষ মানুষ একেবারে না খাইয়া একই সঙ্গে মরিতে-পচিতে সুরু করা, তাই কিছুটা আন্দোলনেই উহা বদল করিতে হইয়াছে। এখন ডাল-তৈল-মশলা পুরা বন্ধ করিয়া ও বাজারখরচ আরও কমাইয়া 'সাহায্য' পরিকল্পনাটি ঢালিয়া সাজা হইয়াছে।

তাই সোজা পথে 'সাহায্য' একেবারে বন্ধ করা গেল না। কিন্তু সে জন্য পরিকল্পনার ত্রুটি নাই।

সরকারের সেই 'সাহায্য বন্ধ' পরিকল্পনারই অপর নাম 'পুনর্ব্বসতি'।

পুনর্ব্বসতি-পরিকল্পায় ৭০ টাকা 'দান' ও ৫ শত টাকা 'ঋণ' সমস্ত আসানসোলের ১২ হাজার পরিবারের মধ্যে খুব বেশী হইলেও ৫ শত পরিবার আজ পর্য্যন্ত পাইয়াছেন।

সরকার নির্দ্দেশিত পথে তাঁহাদের কেহ কেহ ঘর তুলিতেও গিয়াছিলেন। রোদে পুড়িয়া, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া কিন্তু তবু ৭০ টাকার মধ্যে ঘর তুলিবার মত কাঠ খড় সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বেয়াকুব বনিয়া তাঁহাদের অধিকাংশই আবার ক্যাম্পে ফিরিয়াছেন।

[১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]

'মঞ্জিল' বিক্রেতাদের উপর পুলিসের হামলা

গত কয়েকদিন আগে হাওড়া শিবপুরে কয়েকজন ছাত্র কর্ম্মী রাস্তায় দাঁড়াইয়া 'মঞ্জিল' বিক্রয় করিতেছিলেন। হঠাৎ বিরাট দুই গাড়ী পুলিস আসিয়া সমস্ত যায়গাটা ঘিরিয়া ধরিয়া 'মঞ্জিল' বিক্রেতাদের ধমক দিতে সুরু করে। একজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার বিক্রেতাদের ধমক দেয় "মঞ্জিল বে-আইনী কাগজ, 'মঞ্জিল' বিক্রয় করা চলিবে না।" বলা বাহুল্য বিক্রেতারা পুলিস বাহিনীর এই বীর বিক্রমে কোন রকম দমেন না।

পুলিস বাহিনী কিছুক্ষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া চলিয়া যায়।

গোয়েবেল্‌স্‌-এর বংশধররা এখানেও?

দক্ষিণেশ্বর জনসংঘ পাঠাগারের উপর কংগ্রেসী ও হিন্দু মহাসভাপন্থী গুণ্ডাদের এক জঘন্য আক্রমণের খবর পাওয়া গিয়াছে।

কংগ্রেসী ও হিন্দু মহাসভার গুণ্ডারা লাইব্রেরীর তালা ভাঙিয়া; লাইব্রেরী হইতে প্রায় ৫০খানি প্রগতিশীল পুস্তক ও পত্রিকা লইয়া গিয়া তাহা একান্ত গোপনে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। যে সমস্ত পুস্তক গোয়েবেল্‌স্‌-এর এতদ্দেশীয় বংশধররা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে—

(১) রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি
(২) মাই এক্সপেরিয়ান্সেস্‌ ইন সোভিয়েট রাশিয়া—ডাঃ মেঘনাথ সাহা
(৩) সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস
(৪) সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্ত
(৫) সোভিয়েট সিক্সথ অফ দি ওয়ার্ল্ড—ডাঃ হিউলেট জনসন
(৬) ল্যাণ্ড মার্কস ইন্‌ দি লাইফ অফ স্টালিন—
(৭) অগ্নিদিনের কথা—সতীশ পাকড়াশী
(৮) শারদীয়া 'স্বাধীনতা' ও পরিচয়

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক রেল শ্রমিক সম্মেলনে

৮০৲ মূল বেতন, স্থায়ী কাজ ও সস্তা গ্রেনশপ দাবি

১৫ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ময়দানে প্রকাশ্য সম্মেলন

সম্মুখ যুদ্ধে রেল শ্রমিকদের মধ্যে জয়প্রাকাশ মার্কা বিভেদনীতি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা পরাস্ত করিবার মত শক্তিশালী একটি হাতিয়ার তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে এবং সেই হাতিয়ারের জোরে রেলশ্রমিকদের সংগ্রামী ঐক্য গঠনের পথ সুগম করিবার সংকল্প লইয়া এ-আই-টি-ইউ-সি'র আহ্বানে কলিকাতায় সারা ভারতের সংগ্রামী বীর রেল নেতারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। সারা ভারতের ৩৫ হাজার মাইল রেলপথের দেড়লক্ষ সংগঠিত শ্রমিকের ৩শত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ৯ই মার্চ্চের উজ্জ্বল অভিজ্ঞতায় দীপ্ত। গত ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর মুসলিম ইনষ্টিটিউটে দুইদিনব্যাপী সম্মেলনে তাঁহারা শক্ত হাতিয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন—**অল ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন অব রেলওয়ে ওয়ার্কার্স**।

নূতন সংগ্রামী ঐক্যের প্রতীক হিসাবে সম্মেলনের ঠিক দুইদিন পূর্ব্বে জয়প্রকাশের তথাকথিত ঘাঁটি ই-আই-আর রেলের হেড অফিস ফেয়ারলি প্লেসে জেনারেল ম্যানেজার ঘেরাও হয় এবং সাধারণ কর্ম্মচারীরা জয়প্রকাশের স্ট্রাইক ভঙ্গ-কারী রেলওয়েম্যেন্স ফেডারেশনকে চ্যালেঞ্জ করেন সম্মুখ যুদ্ধে; ঠিক একই সময়ে এমনি ধরনের শ্রমিক বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছে শিয়ালদহের ইলেকট্রিক স্টোরে এবং নৈহাটির লোকোশপে। এমনি ধরণের আগুন সারা ভারত জুড়িয়ে রেল-শ্রমিকের মনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, কারণ ৯ই মার্চ্চের কোনো দাবী-দাওয়া একটাও পূর্ণ হয় নাই, এই কয়মাসে রেল-শ্রমিকের সমস্যা আরো তীব্র হইয়াছে। নূতন করিয়া ৫০ হাজার ছাঁটাইয়ের নোটিস আসিয়াছে। তাই দমননীতি ভেদ করিয়া প্রত্যেকটি রেলকেন্দ্রের শ্রমিকেরা সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন।

সারা ভারতে রেল আন্দোলনের অগ্রগামী এস-আই-আরের শ্রমিকেরা সুদূর মাদ্রাজ হইতে পাঠাইয়াছিলেন ১১ জন প্রতিনিধি, বি-বি-সি-আই শ্রমিকেরা পাঠাইয়াছিলেন ৮ জন, জি-আই-পি হইতে ১৬ জন, বি-এন আর হইতে ৩৭ জন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ই-আই-আর হইতে শ্রমিকেরা পাঠাইতে পারিয়া-ছিলেন সব চাইতে বেশীসংখ্যক প্রতি-নিধি—একশত সত্তর জন। ইষ্ট পাঞ্জাব রেলশ্রমিক পাঠাইয়াছিলেন ৮ জন, আর আসাম রেলওয়ে হইতে আসিয়াছিলেন ৯ জন। এম অ্যাণ্ড এস-এম-আর হইতে ১৪ জনের এক প্রতিনিধি দল আসিয়া-ছিলেন। অযোধ্যা-ত্রিহুত হইতে ২ জন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। এ-কে-বি-কে এবং মহিশূরের মত ছোট ছোট রেল লাইনের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে বাদ পড়েন নাই।

আর আসিয়াছিলেন পাকিস্তানের ১২ জন সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধি।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে শ্রমিকশ্রেণীর অনেক প্রিয়তম নেতা যোগ দিতে পারেন নাই—তাঁহারা হয় জেলে অথবা পুলিসের আক্রমণে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই সঙ্গে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, রেলের সেই বীর শ্রমিক নেতারা, যাঁহারা ৯ই মার্চ্চের সময় কংগ্রেসী বুলেটের সামনে বৈপ্লবিক সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে গিয়া শহীদ হইয়াছেন—আসানসোলের অ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশন মাস্টার সুমথ চক্রবর্ত্তী এবং হাওড়ার সিগনাল সপের ফিটার খালাসী গোবর্দ্ধন রায়। ইহাদের আরো বহু অখ্যাতনামা শহীদদের প্রতি সম্মানার্থে শহীদবেদীতে মালা দিয়া সম্মেলনের কাজ সুরু হয়। কলিকাতার রেলশ্রমিক নেতা রামপ্রসাদ লালঝাণ্ডা উত্তোলন করিয়া বলেন, জয়প্রকাশমার্কা শত দালাল এবং কংগ্রেসরাজের শত অত্যাচার সত্ত্বেও আমরা শেষ সংগ্রামের জন্য শহীদদের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইবে।

সভাপতির ভাষণ, প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদকের রিপোর্ট প্রভৃতি শেষ হইবার পর নূতন সংগঠনের সভাপতি হিসাবে কমরেড জ্যোতি বসুর নাম প্রস্তাব করিলে সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি হইতে থাকে। বি-বি-সি-আই রেলের প্রিয়তম নেতা কমরেড ডি-এস-বৈদ্যের নাম সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পেশ করায় সভায় আবার তুমুল হর্ষধ্বনি হইতে থাকে।

৮০ টাকা মূল বেতন, স্থায়ী চাকুরী, সস্তা গ্রেনশপ প্রভৃতি ১১ দফা মূল দাবীর উপর প্রস্তাব পাশ হইবার পর সভায় ফেডারেশন সম্পাদক গুরুস্বামীর স্বাক্ষরিত **এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়—ছাঁটাই করিয়া ৫০ হাজার শ্রমিকের গলাকাটা চলিবে না।**

সভায় তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, "পাবলিক সার্ভিস অর্ডিন্যান্সের" বিরুদ্ধে। এই অর্ডিন্যান্সে যেকোনো শ্রমিককে সামান্যতম সন্দেহবশে বরখাস্ত করার বিধান আছে এবং ইতিমধ্যেই কর্ত্তারা বরখাস্ত করার কাজ সুরু করি-য়াছেন। সংগ্রামী শ্রমিকদের বরখাস্ত করিয়া আন্দোলন ধ্বংসই এ আইনের লক্ষ্য। পূর্ব্ব পাঞ্জাব রেলের নেতা প্রেমসাগর গুপ্ত বলেন, "সারা ধনতান্ত্রিক জগতের অন্য কোনো দেশেও আজ পর্য্যন্ত এমন ফ্যাসিস্ট আইন পাশ হয় নাই।" এই আইনের বিরুদ্ধে সভা-শোভাযাত্রা করিয়া তুমুল আন্দোলন সৃষ্টির জন্য রেল-শ্রমিকদের আহ্বান করিয়া প্রস্তাব পাশ করা হয়।

সভায় বিশ্বশান্তি সম্পর্কে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রস্তাবে রেলশ্রমিকদের ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়।

আরো বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে সম্মেলন হইতে পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবী তোলা হইয়াছে।

ময়দানে ১৫ হাজারের জমায়েত

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিকালে মনুমেণ্টের তলায় ১৫ হাজার মানুষের সভায় প্রকাশ্য অধিবেশন সুরু হয়। শিয়াল-দহ, কাঁচড়াপাড়া নৈহাটির রেল, শ্রমিকেরা লালঝাণ্ডা উড়াইয়া মিছিল করিয়া আসেন। তাছাড়া আলাদা আলাদা মিছিল করিয়া আসিয়া যোগ দেন জয়া ইস্ট ইণ্ডিয়ার শ্রমিকরা, সেবাসদনের ধর্ম্ম-ঘটীগণ, হাওড়া চটকল শ্রমিক প্রভৃতি। এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্রী সঙ্ঘ, ছাত্র ফেডারেশন।

লালঝাণ্ডা উত্তোলন এবং মুহুর্মুহু ধ্বনির মধ্যে সম্মেলনের সভাপতি বি-বি-

(পরের পৃষ্ঠার দেখুন)

দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ বাস্তুহারা আন্দোলন

"পুনর্ব্বসতি" পরিকল্পনার অপর ইতি-হাস আন্দামান প্রেরণ। ঢাকঢোল পিটাইয়া সরকারী 'রক্ষিতা' পত্রিকাগুলিতে ছবি ছাপাইয়া যাঁহাদের আন্দামান পাঠানো হইয়াছিল; না খাইতে পাইয়া তাঁহারাও দেশে ফিরিয়াছেন।

"মূলধন" হিসাবে খাটাইবার জন্য ৫ শত টাকা 'ঋণ'ও একটি বিশেষ ধরনের ধাপ্পা উহার তিক্ত অভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে বহু ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন।

দালাল দল গঠনের 'মূলধন'

কোটি কোটি টাকা মূলধনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার নিজেরাই যখন প্রায় প্রত্যেকটি স্কীম হয় বাতিল করিতেছেন, নয় ক্ষতির পঙ্কে দেশকে ডুবাইতেছেন, ক্রমবর্দ্ধমান সেই ধনবাদী সংকটের যুগে ৫শত টাকা মূলধন খাটাইতে দিবার প্রকৃত অর্থ কি?

বাস্তুহারা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এই প্রকৃত অর্থটি'ই আবিষ্কার করিয়াছেন। আসলে পরিবার প্রতি এই ৫৭০৲ টাকা ব্যয়ের কথা প্রকৃত বাস্তুহারাসংগ্রামের বিরুদ্ধে দালাল নিয়োগের পরিকল্পনার ভিত্তিতেই ব্যবহৃত হইতেছে।

সরকারী নীতিতে যাঁহারা ঢাকঢোল পিটাইতে রাজী হইবেন, রিলিফ অফি-সারকে যাহারা 'সন্তুষ্ট' করিতে পারিবেন তাঁহাদের ভাগ্যেই টাকার এই শিকা ছিঁড়িতেছে।

সকলের জন্য টাকা চাই

টাকা দিবার এই রীতিনীতির বিরুদ্ধে সর্ব্বত্রই তীব্র বিক্ষোভ জমিয়া উঠিয়াছে। বাস্তুহারাদের পক্ষ হইতে দাবি করা হইতেছে, **ঐ টাকা এই মুহূর্ত্তেই সকলকে একই সঙ্গে দিতে হইবে।** রিলিফ অফিসারের খেয়ালখুসীর বদলে সকলের জন্য টাকা চাই'র আন্দোলন দুর্জ্জয় শক্তি অর্জ্জন করিতেছে।

* 'পুনর্ব্বসতি'র বড় নামে 'সাহায্য বন্ধে'র এই আসল চেহারার বিরুদ্ধে 'কাজ চাই অথবা ভাতা চাই' আন্দোলন জমাট বাঁধিতেছে লক্ষ্য করিয়াই সরকার শেষ অস্ত্রটি ছাড়িয়াছেন। ১২ই সেপ্টেম্বরের পর আর কোন 'ঋণ সংক্রান্ত দরবাস্ত' না-গ্রহণের নীতি ঘোষণা করিয়া সরকার সেই মূল গণতান্ত্রিক দাবিকেই ছোট ও দুর্ব্বল করিতে চায়।

ভিক্ষা নয় গণতান্ত্রিক অধিকার

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২৩তম বার্ষিক সম্মেলনে 'কাজ চাই অথবা ভাতা চাই' এই গণতান্ত্রিক দাবির উপর দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানাইয়াছিল। সেই গণতান্ত্রিক দাবি হইতেই বাস্তুহারাদের পৃথক করিয়া তাঁহা-দের 'সাহায্য দানে'র নামে মানুষকে ভিক্ষুক' বলিবার যে স্পর্দ্ধা সরকারী দলিল-পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, প্রকৃত বাস্তুহারা আন্দোলন ধনিক সরকারের সেই কদর্য্যতার জবাব দিবার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে।

প্রকৃত বাস্তুহারা আন্দোলন এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গেই মিশিয়া যাইতেছে। 'বসতির ব্যবস্থা না করিয়া উঠানো চলিবে না' মেহনতী মানুষের জন্য 'কাজ চাই অথবা ভাতা চাই' এবং 'কৃষকের জন্য জমি চাই' ধ্বনি লইয়া গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার এই অগ্রগতি রুখিবে কে?

২৫শে সেপ্টেম্বর

হাটালে গুলি-চালনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩।৪ শত গ্রামবাসী, বেশীর ভাগই মহিলা, নিজেদের ঘরদোর, মানইজ্জত রক্ষার জন্য ইহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ান এবং প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া ইহাদের ফিরিয়া যাইতে বলেন। গ্রামবাসীর দৃঢ়তা দেখিয়া হামলাকারীরা ফিরিয়া যাইবার ভান করে। গ্রামবাসীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যান। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হামলাকারীরা কাপুরুষের মত অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং পাগলের মত প্রায় ৭০ রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলিতে যাঁহারা নিহত ও আহত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই মহিলা। গুলিচালনার পর পুলিস ও সেবা-দল গ্রামের বাড়ী বাড়ী হামলা করে। গ্রামে দুইটি পুলিস ক্যাম্প বসান হইয়াছে।

প্রতিবাদ দিবস

হাওড়া জেলার সমস্ত গ্রামাঞ্চলে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হাটালে কৃষক মেয়েদের উপর গুলি-চালনার প্রতিবাদে "হাটাল দিবস" পালন করা হয়। ঐ দিন সন্তোষপুর, রাজাপুর, মহিষগোট, জঙ্গলপুর, বল্যাপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষেতমজুরেরা হরতাল পালন করেন।

পাটের "অভাবে"র জিগির চটকল শ্রমিকের উপর নূতন আক্রমণের চক্রান্ত

চটকল মজদুর ইউনিয়নের বিবৃতিতে সাধারণ ধর্ম্মঘটের ডাক

"ভারতের চটকল মালিক সমিতি সম্প্রতি আবার নূতন করিয়া সংবাদপত্র মারফৎ এক প্রচার অভিযান চালাইয়াছে—কাঁচা পাটের সরবরাহ নাকি কম! মালিক সমিতির মুখপাত্র ওয়াকার ও সাদারল্যাণ্ডেরা জানাইয়াছেন যে, কলের গুদামে কাঁচা পাটের মজুদ ভয়ানক কম এবং চার সপ্তাহে এক সপ্তাহ কল বন্ধ রাখিবার বর্ত্তমান ব্যবস্থাও সমস্যার সমাধান করিতে "অপারগ" হইয়াছে। অর্থাৎ, মালিকেরা আরও "ব্যাপকও কড়া ব্যবস্থা চালু করিতে চাহিতেছে।"

রটনার পিছনে নূতন আক্রমণের চক্রান্ত প্রস্তুত

চটকল মালিকদের এই রটনা বিবৃত করিয়া **বাংলার চটকল মজদুর ইউনিয়নের** সম্পাদক এই বিবৃতিতে দেখাইতেছেন যে, চটকল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এক নূতন আক্রমণের চক্রান্ত রহিয়াছে এই রটনার পিছনে।

বাংলার চটকল মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক তাঁহার বিবৃতিতে বলিতেছে—

"মুদ্রার বিনিময় হার সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চটকল মালিকদের এই প্রচার একেবারে চরমে উঠিয়াছে। ভারতের চটকল মালিক সমিতির মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ২২শে সেপ্টেম্বর ইঙ্গিতে জানাইয়াছে যে, চটকলগুলি নাকি বাধ্য হইয়া পুরা মাসের জন্য বন্ধ রাখিতে হইতে পারে; পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে আমদানি করা কাঁচা পাটের দাম যে বাড়িয়া যাইতে পারে তাহারই জন্য নাকি এই ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

"চটকল-শ্রমিকদের মজুরি ও চাকুরির বিরুদ্ধে যে নূতন তীব্র ও ব্যাপক আক্রমণের চক্রান্ত হইতেছে তাহা চাপিয়া রাখাই এই সব আতঙ্ক-রটনা ও গুজব ছড়াইবার আসল অর্থ।

দুই দস্যুদলে সংঘর্ষ—শ্রমিকের সর্ব্বনাশ

"এ-কথাই সবাই জানেন যে, ভারতের চটকল মালিক সমিতি, নিজের অতি-মুনাফার স্বার্থেই, গত ৬ মাস যাবৎ রীতিমত ভাবিয়া চিন্তিয়াই এই 'কাঁচা পাটের ঘাটতি'র গুজব ছড়াইতেছে। কাঁচা পাটের অভাব নাই, এবং ভারতের কলগুলির জন্য পাকিস্তান সরকার ৫০ লক্ষ বেল বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ভারতের চটকল-মালিক সমিতি বাজারে পাট কিনিতেছে না, দর নামানো তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহারা **নীতি** স্থির করিয়াছে যে, শতকরা ১২॥০ ভাগের বেশি তাঁত চালাইবে না এবং মোট কাজ শতকরা ২৫ ভাগ কমাইয়া দিবে।

মতলব হইল:—১) কাঁচা পাটের দর চাপ দিয়া কমানো; ২) মজুদ তৈয়ারি মাল চড়া দামে খালাস করা ৩) টাকায় দুই আনা মজুরি কমানো; ৪) ব্যাপক ছাঁটাইয়ের অবস্থা সৃষ্টি করা।

"এখন ভারতের টাকার দাম কমাইবার পর এবং পাকিস্তান সরকারের নূতন বিনিময় হার চালু হইবার পর, ভারতের রাঘববোয়াল চটকল মালিকেরা এবং পাকিস্তানের কাঁচা পাটের বড় বড় ব্যবসায়ী ও সওদাগরেরা, এই দুই নির্ব্বিচার মুনাফা-খোর দলের ভিতর দাম লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, **চটকলের শ্রমিকদেরই করিবে তাহার প্রথম শিকার।**

মজুরি হ্রাস ও ছাঁটাই সুরু

"ইতিমধ্যে, গত ২০শে সেপ্টম্বর, চটকল শিল্পের ট্রাইব্যুনালের রায়ের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে। চটকল শ্রমিকদের একেবারে অনাহারের অবস্থাও আরও নিদারুণ আক্রমণ করিবার ব্যাপারে চটকল মালিকদের পথে যে-শেষ আইনগত "অসুবিধা" ছিল, তাহাও সরানো হইয়াছে। শ্রমিকদের উপর আরও নূতন ও কঠিন আক্রমণ চালাইবারই ইহা সূচনা। একটি সাম্প্রতিক প্রেসনোটে ভারতের চটকল মালিক সমিতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছে যে, অক্টোবর মাস হইতে কাজ বন্ধের সময়ের জন্য শ্রমিকদের "খোরাকি"ও বন্ধ হইতে পারে,—অর্থাৎ, স্থায়ী শ্রমিকদের যে অর্দ্ধেক মজুরি এবং বদলিওয়ালাদের সপ্তাহে ২৲ টাকা মজুরি দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ হইতে পারে। ইহার অর্থ হইল, আগামী মাস হইতে শতকরা ২৫ ভাগ মজুরি কাটা যাইবে।

একমাত্র অস্ত্র— সাধারণ ধর্ম্মঘট

"৩ লক্ষ চটকল শ্রমিকের সামনে গভীর সংকটজনক পরিস্থিতি। এই জরুরী অবস্থায় চটকল শ্রমিকদের একমাত্র অস্ত্র হইল, সংঘবদ্ধ হইয়া সাধারণ ধর্ম্মঘটের পথে মালিকের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ চালানো। জীবনযাত্রার এই বর্ত্তমান মান রক্ষা করিতে হইলেও চটকল শ্রমিকদের আর এক মুহূর্ত্তও দেরি করিবার সময় নাই। প্রত্যেকটি মিলে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টে জঙ্গী ধর্ম্মঘট কমিটির নেতৃত্বে সমস্ত সাধারণ শ্রমিকের ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত পার্থক্য নির্ব্বিশেষে এই ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এইভাবে, নিম্নলিখিত দাবীর জন্য আপোষহীন লড়াই সুরু করিতে হইবে:

"১। কমপক্ষে ১৫০৲ টাকা মজুরি চাই; অবিলম্বে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য শতকরা ১২॥০ আনা মজুরি বৃদ্ধি করিতে হইবে;

২। কল বন্ধ থাকিবার সময়ের জন্য পুরা মজুরি দিতে হইবে;

৩। তিন মাসের মজুরি দিতে হইবে বোনাস হিসাবে;

৪। ছাঁটাই চলিবে না: কাজের চাপ বাড়ানো চলিবে না;

৫। সমস্ত বন্ধ তাঁত চালু করিতে হইবে; ছাঁটাই শ্রমিকদের আবার কাজে বহাল করিতে হইবে।

পুঁজিবাদের পতন আরও আগাইয়া আনো

"মালিকেরা আজ মুনাফার লোভে ও হিংস্রতায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—কারণ, তাহাদের সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছে। শ্রমিকদের সাহসী ও স্থায়ী প্রতিরোধ মালিকদের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিবে—মালিকদের পতনের দিন আরও আগাইয়া আনিবে। **কামারহাটির ৮০০ চটকল শ্রমিক** গত ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট করিয়া আছেন; **বজবজের ২০ হাজার শ্রমিক**ও ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, **শিবপুর** ও **বাউড়িয়ার** চটকলগুলিতে বড় বড় লড়াই চলিতেছে। কোন দ্বিধা আর থাকিলে চলিবে না—সমস্ত চটকলের শ্রমিক এখনই লড়াই সুরু করিবেন—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলার চটকল মজদুর ইউনিয়নের লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে আগাইয়া সাধারণ ধর্ম্মঘট সুরু করিতে হইবে।"

ঐতিহাসিক রেল শ্রমিক সম্মেলন

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

সি-আই-রেলের ভূতপূর্ব্ব পয়েণ্টসম্যান কমরেড ছবিনাথ মিশ্র রেল মজুর আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন, "২০ বৎসর আগে রেল শ্রমিক সম্পর্কে কেউ কিছুই জানিত না—যমুনা দাস মেহতা প্রভৃতি রেল শ্রমিকদের লইয়া খেলিতেন। দাঙ্গার পর আসিল পে-কমিশন আর আসিল জয়প্রকাশ। জয়প্রকাশ রেল শ্রমিকের দাবী-দাওয়া কিতা পর্য্যন্ত জানিতেন না। কিন্তু সোস্যালিস্ট, কংগ্রেসী এবং সমস্ত মতের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ব্যালট দাবী করিল। এই দাবীর প্রচণ্ড আলোড়ন ঠেকাইতে না পারিয়া জয়প্রকাশ নাগপুরে একদিকে ব্যালটের দাবী মানিলেন, কিন্তু অন্যদিকে তিনি এবং তাহার সাকরেদরা কুঞ্জরী কমিটির এনকোয়ারী রিপোর্টে গোপনে সহি করিয়া আসিলেন। তারপর আসিল ৯ই মার্চ্চ। বুলেটের রাজত্ব বসিল। জয়প্রকাশের বিভৎস মুখোস খসিল।

গত ১৫০ বৎসরের শোষণের ইতিহাসে যে রেল শ্রমিকের মোহনিদ্রা টুটে নাই, সামান্য কয়দিনের ধাক্কায় সেই রেল শ্রমিক জাগিল। এখন এই জাগ্রত বুভুক্ষু রেল শ্রমিক আজ সরব হইয়া বলিতেছে, "এমন গবর্ণমেণ্ট চাই যে রুটি দেবে, রুজি দেবে, কাপড় দেবে, ঘর দেবে।"

সভার পরে ৫ হাজার লোকের এক বিরাট মিছিল বাহির হয়। শোভাযাত্রা ধর্ম্মতলা ধরিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিয়া রেলের ওভারব্রীজ পার হইয়া রেল কলোনীতে ঢোকে। "৮০ টাকা মূল বেতন দিতে হবে।" "রুটি রুজি আওর মোকান মাঙ্গ রহা হ্যায় হিন্দুস্তান" "ছাঁটাই হোগা তো পিটাই হোগা" "ইয়ে সারিগোলি কী সরকার ধাক্কা এক আওর দেও" প্রভৃতি ধ্বনি রাস্তার দু'পাশের লোক কান পাতিয়া শোনে, কত বড় মিছিল তাকাইয়া দেখে অভ্যর্থনা জানায়। রেল শ্রমিকের মিছিল শুধু ধর্ম্মতলা-শিয়ালদহে যায় নাই, তাহাদের মিছিল সারা ভারতের ৩৫ হাজার মাইল জুড়িয়া নগর গ্রামকে একত্র করিয়া আগুনের শিখার মত জ্বলিয়া উঠিতে চাহিতেছে। কলিকাতা সম্মেলনে তাহারি ভিত্তি, তাহারি প্রস্তুতি, তাহারি সূচনা সুরু হইল।

শ্রমিক কর্ত্তৃক কর্ত্তা ঘেরাও

ক্লাইভ জুটমিলে মেথরদের ধর্ম্মঘটে ৪০০০ হাজার কারখানা শ্রমিকের অপূর্ব্ব সমর্থনে দাবি আদায়

মেটিয়াবুরুজের ক্লাইভ জুট মিলের ৪ হাজার শ্রমিক তাঁহাদের কারখানারই একাংশ মেথরদের ধর্ম্মঘটে জঙ্গী সমর্থন লইয়া দাঁড়ানোতে ধর্ম্মঘটী মেথরদের দাবি কোম্পানী মাথা নত করিয়া মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে।

মেথররা ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন ৫ দিনের ছুটির বেতন ও একজনের ছুটির সময় অন্যকে বেশী কাজ করিতে বাধ্য করার বদলে বেশী লোক নিয়োগের দাবি লইয়া।

মালিক এই সামান্য দাবিটুকু পর্য্যন্ত মানিতে অস্বীকার করে। ধর্ম্মঘটে সাহায্য করা দূরের কথা, মেথররা নিজেরাই ধর্ম্মঘট করিলে 'জাতীয়' টি-ইউ নেতা রাজকিশোর তাঁহাদের কাজে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের দৃঢ়তায় দালালেরা পরাজিত হয়। রাজকিশোর তখন বাহির হইতে মেথর আনিয়া মালিকদের সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু জঙ্গী মেথরদের 'উচিৎ শিক্ষায়' কেহ কাজে ঢুকিতে পারে না।

এই অবস্থার মধ্যেই কারখানার সকল শ্রমিক (৪ হাজার) মেথরদের দাবির সমর্থনে অগ্রসর হন। তাঁহারা ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। অসহায় ম্যানেজার মেথরদের দাবি মানিয়া লয়।

কারখানার এই ঘটনার পর নূতন উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রমিকরা বুঝিতেছেন, মেথরদের সমর্থনে তাঁহাদের যে ঐক্য শক্তির প্রকাশ হইল, ১২॥০ আয় বৃদ্ধির দাবিতে সেই একতাই আরও জমাট বাঁধিয়া আদায় করিতে হইবে।

মঞ্জিল

কামারহাটি চটকলে আট হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

বজবজ, চেঙ্গাইল প্রভৃতি চটকল এলাকায় ঘেরাও ও বিক্ষোভ

বোনাস, বেতন বৃদ্ধি, ও বন্দী হপ্তায় পুরা তলবের দাবিতে সাধারণ সংগ্রামের সূচনা

বাধ্যতামূলক বেকারী ও আয় হ্রাসের ফলে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে যে ব্যাপক বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল তাহা চারিদিকে ফাটিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে।

গত শনিবার ১৭ই সেপ্টেম্বর কামারহাটি চটকলে বাধ্যতামূলকভাবে বেকার শ্রমিকদের জন্য পুরা খোরাকির দাবিতে সমগ্র ৮ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া বাহির হইয়া আসেন।

শুধু কামারহাটি নয়, গত সপ্তাহে চেঙ্গাইল, বজবজ, জগদ্দল ঘুষুড়ী প্রত্যেকটি চটকল অঞ্চলেই বিক্ষোভ সুরু হইয়াছে।

রবিবার ছাইগাদা ময়দানে এক বিরাট সভায় কামারহাটির শ্রমিকেরা প্রস্তাব গ্রহণ করেন দাবি না মানা পর্য্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম্মঘট চালান হইবে।

সভায় জনৈক আণ্ডার গ্রাউণ্ড চটকল নেতা বক্তৃতা করেন। ব্যারাকপুরের ৪ গাড়ী সশস্ত্র পুলিস সভাস্থল ঘেরাও করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে; কিন্তু শ্রমিকরা পুলিস ব্যারিকেড ভেদ করিয়া মিছিল বাহির করেন ও নেতাদের পুলিসের আওতার বাহিরে লইয়া যান।

কর্ত্তৃপক্ষ সোমবার মিলে লক-আউট ঘোষণা করিয়াছেন ও পুলিস মোতায়েন করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে এবং সাহায্যে চটকল মালিকেরা নিজেদের মুনাফা বাঁচাইবার জন্য শ্রমিকদের কাজ ও মজুরীর উপর যে আক্রমণ সুরু করিয়াছেন, কামারহাটি চটকল তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

এক বৎসর যাবৎ এখানে ছাঁটাই চলিতেছে। ব্যাপক বিক্ষোভ যাহাতে দানা না বাঁধিয়া উঠে, তজ্জন্য প্রথমে শুধু বদলী শ্রমিকদের ছাঁটাই করা সুরু হয়। গত এক বৎসরে এই ভাবে প্রায় ১৫০০ শ্রমিক ছাঁটাই হয়।

মালিক ও দালালরা প্রচার করিয়াছিল, শুধু কিছু বদলীদেরই ছাঁটাই করা হইল। আর কাহারও গায়ে হাত পড়িবে না!

তাহার পর শতকরা ১২॥ ভাগ তাঁত বন্ধ করা হইল। তখন কামারহাটির শ্রমিকরাই একত্রে ধর্ম্মঘট করিয়া বাহির হইয়া আসেন, এবং মালিক ও সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

ধর্ম্মঘটে ফাটল ধরাইবার জন্য মালিক এবং দালালরা পুলিস নিয়োগ করা ছাড়াও প্রচার করে, সালতন শ্রমিকদের উপর আঘাত আসিবে না। বদলী শ্রমিকদের বসাইয়া তাহার স্থলে কিছু সালতন শ্রমিককে কাজ দিয়া এবং কিছু শ্রমিককে ছুটি দিয়া মালিকেরা বিক্ষোভ চাপা রাখার চেষ্টা করে।

তাহার পর মালিক আবার আক্রমণ করিল প্রতিমাসে এক সপ্তাহ বন্ধ ঘোষণা করিয়া। সমস্ত শ্রমিকদের মজুরী ইহাতে প্রায় শতকরা ১২॥ ভাগ কমিয়া গেল। দুর্ম্মূল্যের বাজারে প্রতি শ্রমিক মাসে প্রায় ৮।৯ টাকা করিয়া মজুরী হারাইলেন।

এদিকে সংকট বাড়িতেছে। চাল, তরী-তরকারী প্রত্যেকটি জিনিসের দর বাড়িতেছে। চটকল শ্রমিক সহের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময় মালিকেরা আবার আক্রমণ করিল। সেপ্টেম্বর মাসে কামারহাটিতে হুকুম হইল —মাসে এক হপ্তা বন্ধ তো বটেই, তাহার উপর প্রতি সপ্তাহে পালা করিয়া এক একদল সালতন চটকল শ্রমিককে বসিতে হইবে। তাঁহাদের তাঁতে অন্যান্য "উদ্বৃত্ত" সালতন শ্রমিকদের কাজ দেয়া যাইবে।

এই ভাবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ৮৬ জনকে বসাইয়া দেওয়া হয়। তাহার উপর মালিক নিয়ম করিল বসা সপ্তাহের খোরাকি পাইতে হইলে প্রত্যহ হাজিরা দিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তে মালিক-সরকারের ধীরে ধীরে আক্রমণ করার সমস্ত চক্রান্ত উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। কামারহাটির ৮ হাজার শ্রমিক আবার রুখিয়া দাঁড়াইলেন! তাঁহারা প্রথমে দাবি করিলেন—বসা মজুরেরা প্রত্যহ হাজিরা দিবে না। তাঁহাদের পুরা খোরাকি দিতে হইবে।

এক দাবিতে এক সপ্তাহ আগে তাঁহারা আধঘণ্টা কাজ বন্ধ করেন এবং ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়াপ্রতিবাদ জানান। বসা শ্রমিকেরা প্রতিবাদ স্বরূপ প্রত্যহ হাজিরা দেওয়া বন্ধ করিলেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর হপ্তার দিন বেতন লইতে গেলে কর্ত্তৃপক্ষ হাজিরা দেওয়া হয় নাই এই অজুহাতে বসা শ্রমিকদের পুরা হাজিরা (৮৬/০) না দিয়া মাত্র তিন টাকার টিকিট দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ জাগে। ম্যানেজার এবং লেবার অফিসার ঘেরাও হয়। সশস্ত্র পুলিসের সাহায্যে তাঁহারা মিল হইতে সরিয়া পড়েন। শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়া বাহির হইয়া আসেন।

যে দাবিতে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট সুরু করেন তাহা এই—হাজিরা দিব না, পুরা ৮৬/০ খোরাকি চাই। এই নিতান্ত ন্যায্য ছোটো দাবিও মালিকেরা মানিতেছে না দেখিয়াই শ্রমিকেরা রাগিয়া উঠেন। কিন্তু এই দাবি মানিলেও যে সমস্যার সমাধান হইবে না তাহা শ্রমিকেরা বুঝিতেছেন। বেকারি ও বেতন কাটার বিরুদ্ধেই তাঁহাদের আসল বিক্ষোভ।

তাই ছাইগাদা ময়দানের সভায় তাঁহারা দাবি করেন শুধু ৮৬/০ আনা খোরাকি নহে, (১) এখুনি পূজার সময় ৩ মাসের বোনাস দিতে হইবে।

(২) সমস্ত বন্ধ তাঁত খুলিতে হইবে।

(৩) মাসে অন্তত ১২॥ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৪) বন্দী হপ্তার পুরা তলব দিতে হইবে।

এই দাবিতে লক-আউটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কামারহাটি শ্রমিকেরা কংগ্রেসী পুলিসের আক্রমণ রুখিয়া আগাইয়া যাইতেছেন।

লরেন্স মিলে ঘেরাও, ধর্ম্মঘট ও ম্যানেজার প্রহৃত

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর চেঙ্গাইল লরেন্স জুট মিলের ৩০০০ শ্রমিক ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া দাবি করেন—৩ মাসের বোনাস চাই, সার্ভিস ঠিক চাই, বন্ধ তাঁত খোলা হোক।

সাহেব বোলচাল দিবার চেষ্টা করিলে শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন, দুই ঘণ্টা যাবৎ মিলের ভিতর ধর্ম্মঘট চলে।

'অন্য যায়গায় বোনাস দিলে আমরাও দিব' ইত্যাদি বলিয়া ম্যানেজার সেদিন কোন রকমে পলাইয়া বাঁচেন। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়িতেই থাকে। পরদিন বড়ো সাহেব আবার ঘেরাও হন এবং বোলচাল মারিতে গিয়া শ্রমিকদের হাতে মার খাইয়া পালান।

মিলের মধ্যেই সমস্ত বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সভায় প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে—দাবি না মানিলে ধর্ম্মঘট করা হইবে।

বজবজে মিলের পর মিলে ঘেরাও

৩ মাসের বোনাস, বন্দী হপ্তার পুরা তলব আর ১৫০ টাকা বেতনের দাবিতে বজবজের প্রত্যেকটি মিলের গেটে, বস্তীতে ও লাইনে দাবি উঠিতে থাকে।

কংগ্রেসী দালালরা ট্রাইব্যুনালের ধোঁকা দিতে আসিলে মজুরেরা তাড়া করে।

ইহার পর বিভিন্ন মিলে ঘেরাও সুরু হইয়া গিয়াছে। ৯ই সেপ্টেম্বর **বজবজ মিলে** ২,০০০ মজুর ম্যানেজারকে রাত ৮টা পর্য্যন্ত ঘেরাও করিয়া রাখেন। ম্যানেজার পরে জানাইব বলিয়া এড়াইয়া যান। কিন্তু ১৩ই সেপ্টেম্বর মজুরেরা দাবির ফয়সালা দাবী করিয়া আবার ঘেরাও করেন।

ম্যানেজার পুনরায় কোন প্রতিশ্রুতি না দিলে আজই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা সভা করিয়া ঘোষণা করেন—'ধর্ম্মঘট ছাড়া দাবি মিলিবে না। ধর্ম্মঘটের জন্য তৈয়ার হও'।

ঐ দিনই একটি দাবিতে **ক্যালিডোনিয়ান** মিলে ৩০০ শ্রমিক ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া বোনাস ও বেতন বৃদ্ধি দাবি করেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর **বিভিয়েট মিলে** ৫০০ শ্রমিক এবং **লেথিয়ান মিলে** ১৫০০ শ্রমিক ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন।

দাবি না মানিলে বজবজের সব কয়টি মিলেই এক সাধারণ ধর্ম্মঘট সুরু হইবে বলিয়া শ্রমিকেরা তৈয়ার হইয়া যাইতেছেন।

জগদ্দলে কংগ্রেসী দালাল প্রহৃত

জগদ্দলের এলায়েন্স জুট মিলে জনৈক কংগ্রেসী দালাল নিজস্ব কংগ্রেসী শ্রমিকদের হাতেই প্রহৃত হইয়াছে।

ছাঁটাই বন্ধ ও হপ্তা বৃদ্ধির দাবি করিয়া লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা প্রচার করিতে নামিলে এই সকল কংগ্রেসী সর্দ্দাররা 'বাঙালী-বেহারী' সওয়াল তুলিয়া হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের পৃথক রাখার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এখন তাহারা নিজেদের শ্রমিকদের হাতেই মার খাইতেছে।

লালঝাণ্ডা শ্রমিকেরা সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

টিটাগড়ে বিক্ষোভ

টিটাগড়ে কংগ্রেসী শ্রমিকদের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ সুরু হইয়া গিয়াছে।

কেলিসন মিলের সেলাই ঘরের শ্রমিকেরা সভা করিয়া ঘুষ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন।

এই সকল মিলে শ্রমিকদের নিকট হইতে যাহারা ঘুষ আদায় করিত তাহারা আর কেহ নয়, কংগ্রেসী ও জাতীয় টি-ইউর ভক্ত সর্দ্দাররা।

ইহাতে কংগ্রেসী সর্দ্দারদের সহিত সাধারণ শ্রমিকদের ঠোকর বাড়িয়া চলিয়াছে।

গত সপ্তাহে কামারহাটির মত এখানেও ৫৬ জন সালতন শ্রমিককে বসাইয়া দেওয়া হয়।

ইহার প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমিক রুখিয়া দাঁড়ান। তাঁত ছাড়িতে তাহারা অস্বীকার করেন। এস-ডি-ও দৌড়িয়া আসেন।

কিন্তু মিলের মধ্যে 'বলশেভিক' নেতারা শ্রমিকদের ঢুকাইয়া দেন। এস-ডি-ও নিকট তাঁহারা দাবি প্রত্যাহার করিয়া বণ্ড সহি দিবার এক প্রস্তাবে সায় দেন।

ঘুষুড়ীতে দাবি আদায়

গত সপ্তাহে ঘুষুড়ীর হনুমান জুটমিলে লিস্টিং ডিপার্টের শ্রমিকেরা ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া ছুটির দাবি আদায় করিয়াছেন।

শ্রমিকদের পাওনা ৫ দিন ছুটি চাহিলে কর্ত্তৃপক্ষ মঞ্জুর করিতেছিলেন না। পুরো এক হপ্তা ছুটি নিতে বাধ্য করিতেছিলেন এবং এক দিনের বেতন কাটিতেছিলেন।

ইহার প্রতিবাদে শ্রমিকরা ঘেরাও করেন; কর্ত্তৃপক্ষ দাবি মানিতে বাধ্য হইয়াছেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর

ভারতে-পাকিস্তানে চিন্তার উপরও মার্কিন খবরদারির ধৃষ্ট প্রচেষ্টা

"বামপন্থী" ঢং-ওয়ালা কাগজে 'মার্কিন বার্ত্তার' কুমন্ত্রণা ও সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা ছাপাইয়া "জীবনযাত্রার মার্কিন প্রণালীর" প্রচার নেহাৎ মন্দ চলিতেছে না। বিনা-পয়সায় ছবির ব্লক পর্য্যন্ত সরবরাহ করিয়া তথাকথিত "বামপন্থী" ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় ট্রুম্যানের 'মার্কিন স্বর্গের' মহিমাকীর্ত্তনের কাজও বেশ চলিয়াছে।....কিন্তু, তাহা যথেষ্ট নয়।

ঘাঁটি "মার্কিন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে" সংবাদ

তাই, মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতি ও একচেটিয়া প্রকাশকদের এক সিণ্ডিকেট আরও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করিয়াছে। মার্কিন পুঁজি, মার্কিন মালিকানা, মার্কিন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মার্কিন সাজসরঞ্জাম—একেবারে ষোল আনা মার্কিন কায়দায় "এবং মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গীতে সংবাদ পরিবেশন" করিয়া ভারত, পাকিস্তান ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের মানুষের চোখ খুলিয়া দিবার জন্য মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতি ও একচেটিয়া প্রকাশকদের এক সিণ্ডিকেট ভারতে-পাকিস্তানে সংবাদপত্র চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

কাজ সুরু হইয়াছে

ইতিমধ্যেই তাহারা পাকিস্তানের লাহোরে সর্ব্বাধিক পুরানো সংবাদপত্র 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' কিনিয়া ফেলিয়াছে; সংবাদপত্র মহলের সহায়তায় ভারতেও তাহাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি লিয়-জে মার্গোলিনের ঘাঁটি বসিয়াছে নয়াদিল্লীতে (পি-টি-আই, ৯ই সেপ্টেম্বর)।

"চিন্তানিয়ন্ত্রণের" মার্কিন প্রচেষ্টা

ইহা সূচনা মাত্র। ডলার দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ট্রুম্যান-মুখনিঃসৃত সেই "অধমের ত্রাণ" বা "অনুন্নতের সাহায্য" ব্যবস্থাও আসিবে।

কিন্তু, এখনও বাধা আছে। "লাল-জুজু"র দেশ এই "ত্রাণ" পরিকল্পনার অপব্যাখ্যা দিয়া জনগণের মন বিষাইয়া দিতেছে। ইওরোপেরও-সব দেশে মার্শাল দেব ভর করিয়াছেন, সে-সব দেশের জনগণ, কে জানে কোন পাপের ফলে, এ আশীর্ব্বাদকে শাপ ভাবিয়া ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় "কমিউনিস্ট শয়তান"দের নেতৃত্বে সমবেত হইতেছে। আর, সেই দুষ্ট প্রভাব আসিয়া পড়িতেছে এশিয়ার দেশে দেশেও।

চীন, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, বর্ম্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া—দিকে দিকে জনগণের মুক্তি-অভিযান যেদুনিয়াময় ডলারের স্বর্গরাজ্য গড়িবার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। ভারতে-পাকিস্তানেও তো জনগণ সেই পথেই পা বাড়াইতেছে। ট্রুম্যান দেখিয়াছে—ট্রুম্যান তাহার "অধম ত্রাণ" পরিকল্পনায় বুঝিয়াছে—জাতীয় নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা, পুরানো সাম্রাজ্যবাদ এবং নতুন ডলার সাম্রাজ্যবাদের উদ্যত গ্রাস, এ-সবকিছুর বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশে দেশে জনগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে—দমননীতি প্রয়োগ করুক না কেন, ডলার দেবতারা একেবারে নিজহাতে ভারত ও পাকিস্তানে জনগণের মনের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। খাঁটি "মার্কিন দৃষ্টি ভঙ্গিতে সংবাদ পরিবেশন" করিয়া ভারত ও পাকিস্তানে মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। তাহারই জন্য ষোল আনা মার্কিন মালিকানায়, ষোল আনা মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীনে ভারতে-পাকিস্তানে মার্কিন সংবাদপত্র চালাইবার ব্যবস্থা।

নিজেদের দেশে তাহারা "অ-মার্কিন কার্য্যকলাপ" সংক্রান্ত কমিটি বসাইয়া ফাশিস্ত বিরোধিতাকেও বে-আইনী করিয়া হাওআর্ড ফাস্ট প্রমুখ শ্রেষ্ঠ লেখকদের জেলে পুরিয়াছে। প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেডিও ও ছায়াচিত্র জগতে পর্য্যন্ত সামান্যতম প্রগতিশীল মানো-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। নিগ্রো পিটাইয়া মারিবার 'কু-ক্লক্স-ক্ল্যানের' টমাসকে অ-মার্কিন কমিটির নেতৃত্বে বসাইয়া চিন্তাক্ষেত্রে পুলিস জুলুম হিটলারকেও হার মানাইয়াছে। সংবাদপত্র জগতে আমেরিকার আসল শাসক মর্গ্যান, হ্যার্প, জেনারেল ইলেকট্রিক ইত্যাদি একচেটিয়া কারবারের একাধিপত্য কায়েম করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়াগ্রাসী নীতির সমর্থনে নতুন নতুন "আদর্শ" সৃষ্টি করিতেছে। এবং সেই আদর্শ "মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গী" চালু করিবার জন্যই তাহারা ভারতে-পাকিস্তানে সংবাদপত্র কিনিয়া এখানকার জনগণের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করিবার ধৃষ্টতা লইয়া আসিয়াছে।

টাইম্‌স-এর পাতায় তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলা "কাব্য-সাহিত্য" তুলিয়া ধরিয়া বাহবা জানাইতেছে।

"জীবনযাত্রার মার্কিন প্রণালী"—ও বিজ্ঞাপন

"বিপজ্জনক" মতিগতি বদলাইয়া জনগণের মনে "জীবনযাত্রার মার্কিন প্রণালী" ঢুকাইয়া দিবার জন্য মার্কিন কর্ত্তাদের কল-কৌশলের অন্ত নাই। বড় বড় বিমান কোম্পানী ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন-দাতাদের বাহারা দালাল তাহারা যখন মোটা টাকার বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে "জীবন যাত্রার মার্কিন প্রণালী"র কিছু প্রচার দাবী করে, আমাদের দেশের তথাকথিত "বামপন্থী" ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি কি নির্ব্বোধের মত তাহা অস্বীকার করিতে পারে? সে দাবী তাহারা মানিয়া নেয়। যাহারা তথাকথিত "বামপন্থী" কাগজের খবর ইঞ্চি হিসাবে কিনিয়া নগদ টাকা ফেলিয়া দেয়, অমন খদ্দেরের অনুরোধে দুটি সোভিয়েটবিরোধী কুৎসা, দুই কলম মার্কিন মহিমাকীর্ত্তন, না করিয়া পারা যায়?

আর যাহারা আমাদের ডলারের আশীর্ব্বাদে ধন্য করিবে, যাহাদের ছত্রছায়ায় ছাড়া জাতীয় বিশ্বাসঘাতক শাসনশোষণ কায়েম রাখা সম্ভব নয়, তাহারা নিজেরাই আসিয়া জনগণের মন হইতে "বিপজ্জনক" চিন্তার ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিবে, সে তো আমাদের শাসকশোষকদের মহা-আনন্দের কথা।

দেউলিয়া "আদর্শের" ধৃষ্টতা

কিন্তু, চিন্তার উপর এই পুলিসী খবরদারি, সে সুকৌশলী খাস মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীনে হইলেও, জনগণকে ধোঁকা

ষোল আনা মার্কিন সংবাদ চালু করিবার পিছনে ডলারের চক্রান্ত

ভারতে, পাকিস্তানে, সারা এশিয়ায় ষোল আনা মার্কিন সংবাদপত্র চালাইবার এই ব্যবস্থা—এ কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়। ঔপনিবেশিক ও অর্দ্ধ-ঔপনিবেশিক দুনিয়ার "অনুন্নত দেশগুলির" দুঃখে ট্রুম্যানের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে—সে অনেক দিন হইল। শুধু পশ্চিমে না তাকাইয়া, হে প্রভু ট্রুম্যান তুমি এশিয়া ও ভারতের দিকেও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাও—মার্কিন "সভ্যতার" মহা-ভক্তিমতী পূজারিণী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত করযোড়ে এ-প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—হে ডলার দেবতা, কমিউনিস্‌ম্ এখানে নাই বলিলেই চলে; জাতীয়করণের বুলিও আমরা ছাড়িয়াছি, স্থানীয় পুঁজির সহিত ডলার পুঁজির সমানাধিকার তো অবধারিত; তোমার মুনাফা তুমি ডলাররূপেই মার্কিন স্বর্গে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে;...ডলার বেদীতে বলি দিবার আর কী আছে, প্রভু?....এবার প্রসন্ন মুখ তোলো।

প্রভু মুখ তুলিয়াছেন। মার্কিন পরিচালিত 'আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক' হইতে ডলারের আশীর্ব্বাদ ঝরিতে শুরু করিয়াছে।

"বিপজ্জনক কমিউনিস্ট মতবাদের নেতৃত্বে তাহারা সমবেত হইতেছে। এই মহা বাধা অপসারণ না করিলে তো ডলারের পথ হইতে পারে না। এই "বিপজ্জনক চিন্তাধারার" বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চাই।

ডলারের শর্ত্ত—মতিগতি বদলাও!

মার্কিন মুলুকের আসল শাসকদের একজন—চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বোর্ডের চেয়ারম্যান, উইনথ্রপ অ্যালড্রিচ লণ্ডনের ব্যবসায়ীদের এক গোপন সভায় মার্কিন পুঁজি লগ্নী করিবার অন্যান্য শর্ত্তের ভিতর একটি শর্ত্ত দিয়াছে যে, দেশবাসীর "মনের অবস্থা" এমন হওয়া চাই এবং মার্কিন মুলুক সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব এমন হওয়া চাই, যাহাতে মার্কিন পুঁজি বেশ নিরাপদ বোধ করিতে পারে (ব্যাঙ্কের ও শিল্পপতি মহলে সীমাবদ্ধ বুলেটিনে ইহা প্রকাশিত হয়—টাস, নয়াদিল্লী, ৮ই আগস্ট)।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত অনুচর পাক-ভারত সরকার জনগণের এই "বিপজ্জনক" চিন্তাধারা ও বিপ্লবী প্রচেষ্টা ধ্বংস করিবার জন্য যত ফাসিস্ত

যুগপৎ দেশী-বিদেশী আক্রমণ

ভারতে-পাকিস্তানে জনগণ যখন বুর্জোআশ্রেণীর ভাবাদর্শের সমস্ত জীর্ণগলিত অংশ বর্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বিপ্লবী আদর্শ বরণ করিয়া নিতেছে, তখনই এই আদর্শক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও তাহাদের দেশী অনুচরদের আক্রমণ মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েটের ছায়াচিত্র নিষিদ্ধ আর, যৌন বিকৃতির ক্লেদাক্ত হলিউডের ছায়াচিত্রের ব্যাপক প্রচার; সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা, মানুষের মনে হতাশা সৃষ্টির কৌশল আর যুদ্ধের প্রচারে ভরা লাইফ টাইম-ফর্চুন-জাতীয় পত্রিকার অবাধ প্রচার আর, শান্তি, জনগণের গণতন্ত্র ও প্রগতির হাতিয়ার সোভিয়েট পত্র-পত্রিকার আমদানীতে বাধা—এমনই যখন ভারত সরকারের নীতি, তখন তো দেশে মার্কিন সংবাদপত্র চালু হইবেই।

এ দেশের সরকার যখন জনগণের মুখপত্র, জনগণের মনের কথায় লেখা গান ও নাটক বে-আইনী করিয়া দিতেছে, মার্কিন মুলুকের নিউইয়র্ক

নিতে পারে না। খোদ মার্কিন কর্ত্তারাই তাহা মানে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ (আসলে রুশবিরোধী) সংসদের পরিচালক জি-টি রবীন্‌সন এক মূল্যবান স্বীকৃতি দিয়াছে। সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসাই তাহার পেশা,—তাই, তাহার স্বীকৃতির দাম আছে। 'আমেরিকান ফরেন অ্যাফেয়ার্স' পত্রিকার জুলাই মাসের সংখ্যাতে সে লিখিয়াছে:

"অর্থনৈতিক বা সামরিক নয়, আজ আমাদের প্রধান দুর্ব্বলতা—আসল দুর্ব্বলতা হইল আদর্শগত। মালপত্র বা কামানের ব্যাপায় এ নয়,—ভাবাদর্শের সওয়াল। বিদেশে ইহাই আমাদের প্রধান দুর্ব্বলতা। কারণ, দেশেও আমাদের প্রধান দুর্ব্বলতা ইহাই।"

"জীবনযাত্রার মার্কিন প্রণালী" এমনই দেউলিয়া। তবু, তাহাই লইয়া তাহারা মুক্তি-সংগ্রামের ডাকে চঞ্চল জনগণের মতিগতি বদলাইবার ধৃষ্ট স্বপ্ন লইয়া আসিতেছে।

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্ত্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।

২রা অক্টোবর আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সংগ্রাম দিবস পালনের জন্য বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন কমিটির ডাক

দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের নর-নারীর কাছে আমাদের এই আবেদন!

শান্তি আজ বিপন্ন। ১৯১৪ সালের ২রা আগস্ট এবং ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মত আজ আবারও শান্তি বিপন্ন।

তখনকারই মত, আজও, নীচ, মুনাফালোলুপ, দুনিয়াব্যাপী আধিপত্যকামী মুষ্টিমেয় মানুষের জোট শান্তিপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক আলাপ-আলোচনার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং আজ তাহারা অ্যাটমবোমায় সুসজ্জিত। ভাড়াটিয়া সরকারগুলির যোগসাজসে এই জোটটি দুনিয়াব্যাপী একটি নূতন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে একটির পর একটি সামরিক জোট পাকাইতেছে।

অতলান্তিক চুক্তি সম্পাদন; পশ্চিম জার্ম্মানি ও জাপানে পরদেশ আক্রমণকারী ও খুনীদের নূতন করিয়া অস্ত্রসজ্জা দিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত; ঐ সব দেশে জনগণের নিকৃষ্ট শত্রুদের প্রতি সমর্থন; গ্রীক জনগণের বিরুদ্ধে সালদারিসের সশস্ত্র হস্তক্ষেপে অর্থের যোগান; সাম্রাজ্যবাদী লালসায় প্ররোচিত একটানা ঔপনিবেশিক যুদ্ধ—এইসব হইতে দেখা যাইতেছে যে, একটির পর একটি ইহাদের চুক্তিগুলির নামে "রক্ষামূলক" শব্দটি ধাপ্পাবাজি মাত্র; আসলে ইহারা রক্তপিপাসু দস্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

যাহারা এই একটির পর একটি সামরিক চুক্তির জাল বুনিয়া যাইতেছে আর, ক্রমাগত যুদ্ধের উস্কানি দিয়া যাইতেছে, ইহারা ইতিমধ্যেই তাহাদের দেশে দেশে জনসাধারণকে নিঃস্ব করিয়া দিতেছে; নূতন অস্ত্রসজ্জার দৌড়ে ব্যয়ের বোঝা চাপাইয়া দিতেছে জনগণের উপর।

শ্রমিকদের সামনে আজ কর্ম মজুরি, ক্রয়ক্ষমতার ঘাটতি, আর বেকারির বিভীষিকা।

কৃষক, কারিগর ও ছোট ব্যবসায়ীদের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই সবদেশলোলুপ দস্যুরা পুলিস-সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতেছে, সর্ব্বত্র জনগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছে।

উপনিবেশগুলিতে তাহারা শোষণ ও পীড়নের মাত্রা বাড়াইয়াই যাইতেছে।

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে তাহারা এমন এক যুদ্ধের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের মাঝে ঠেলিয়া দিতে চায়, যেমনটি আগে আর কখনও হয় নাই।

কিন্তু, আজ এ ১৯১৪ সালেও নয়, ১৯৩৯ সালেও নয়। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়ের ফলে শান্তির পক্ষে শক্তি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; এবং আজ এই নূতন যুদ্ধাপরাধীদের হাত স্তব্ধ করিয়া দিবার শক্তি তাহাদের আছে।

কোটি কোটি নরনারী আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন—মতামত, ধর্ম্ম, সভ্যতা বা গায়ের রং-এর ভেদাভেদ তাঁহারা মানেন নাই; সমগ্র মানবজাতির জীবন ও মুক্তি রক্ষাকল্পে তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প: তাঁহারা ইতিমধ্যেই বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের সমর্থনে সমবেত হইয়াছেন।

পাঁচটি মহাদেশের ৭২টির বেশি দেশে তাঁহারা শান্তির পক্ষে শক্তিগুলিকে সুসংহত করিয়া তুলিতেছেন।

অনেক দেশে, এবং বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে ও ইতালিতে, যুদ্ধবাদীদের ক্রমবর্দ্ধমান হিংস্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে বিক্ষুব্ধ গণ-মিছিল আর কোটি মানুষের স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিপাবপত্র।

চার প্রধান শক্তির যে সম্মেলন ডাকা হইল এবং সে সম্মেলনে যে সাফল্য হইল, তাহার জন্য, শান্তির পক্ষে এইসব শান্তির প্রচেষ্টা খুবই কার্য্যকরী হইয়াছে।

কিন্তু ইহা যথেষ্ট নয়। যুদ্ধবাদীরা যে-ভাবে শান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার অবসান করিবার জন্য শান্তির পক্ষে শক্তিগুলিকে আরও দৃঢ়, আরও ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

এইজন্যই, বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছে—

২রা অক্টোবর আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সংগ্রাম দিবস পালন করিতে হইবে।

শান্তির-পক্ষে সংগ্রাম আরও উচ্চতর পর্য্যায়ে তুলিতে হইবে; প্রচেষ্টা আরও দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে হইবে—

২রা অক্টোবর হইবে তাহারই সূচনা।

২রা অক্টোবর ঘোষণা করিতে হইবে: না! যুদ্ধ বাধাইতে দিব না।

প্রত্যেকটি দেশের নরনারীর উদ্দেশ্যে আমরা আজ ডাক দিতেছি—

* আসুন, দুনিয়াব্যাপী প্রচণ্ড আলোড়নে আমরা তুলিয়া ধরি—শান্তির সৈনিকদের শক্তি কী অপরাজেয়।

* সামরিক ব্যয়ভারের যে অসহ্য বোঝা আমাদের পিষিয়া মারিতেছে, এবং যে বোঝা প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে—আসুন, আমরা সে বোঝা বহিতে অস্বীকার করি।

* আসুন, আমরা দাবী করি—জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতি সমূহের মুক্তির বিরুদ্ধে এই হস্তক্ষেপ আর চলিবে না।

দেশে দেশে সমস্ত শ্রমিক—যাহারা শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী! যে কোন বয়সের যে কোন সামাজিক অবস্থার, যে কোন মতামত ও ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী নরনারী!—দেখুন, আজ আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন সমানই—কারণ, বোমা তো কোন বাছবিচার করে না!

আসুন আমরা ওদের বাধ্য করি: শান্তি নষ্ট করিতে দিব না!

সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা অজেয় হইয়া উঠিব।

শান্তির জন্য সংগ্রামে, জীবনের জন্য সংগ্রামে, আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

> **স্তালিন**
>
> সাম্প্রতিক যুদ্ধের সমস্ত বিভীষিকা জনগণের মনে এমন তাজা হইয়া রহিয়াছে, শান্তির পথে বিভিন্ন সামাজিক শক্তি এমনই বিরাট যে, পরদেশ আক্রমণে চাচ্চিলের শিষ্যরা সে-শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, নূতন যুদ্ধের মাঝে তাহাদের ঠেলিয়া দিতে পারিবে না।"
>
> —জোসেফ স্তালিন

> **গর্কি**
>
> কিসের জন্য এই রাঘববোয়াল শিল্পপতিরা দুনিয়াব্যাপী আরেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটাইতে চাহিতেছে? তাহারা ভাবিতেছে—উৎপাদনে অরাজকতা আর মুনাফার জন্য উন্মত্ত লালসার ফলে তাহারা আজ যে অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়িয়াছে, যুদ্ধই বুঝি তাহা হইতে রক্ষা পাইবার পথ! "একটু উপমা দিয়া বলা যায়—আবারও তাহারা মেহনতী জনগণের রক্তে স্নান করিতে চাহিতেছে; তাহাদের আশা—এই রক্ত স্নান তাহাদের জরাগ্রস্ত ক্ষয়িষ্ণু দেহে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়া দিবে।"
>
> —ম্যাক্সিম গর্কি

মাঙ্গল

প্রথম বর্ষ, ১৬ সংখ্যা] ২রা অক্টোবর ৪৯: ১৫ই আশ্বিন '৫৬ [তিন আনা

বিশ্বশান্তির সংগ্রাম শিবিরের মহান্ নেতা সোভিয়েট

কয়েকটি দেশে বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনে নূতন যুদ্ধের যে প্রস্তুতি চ'লেছে, ইউ-এন-ও তার নিন্দা ক'রছে, আনবিক বোমা ও ব্যাপক হত্যার জন্য উপযোগী অন্যান্য অস্ত্রের ব্যবহার ইউ, এন নিষেধ ক'রছে এবং ইউ, এন অভিমত জানাচ্ছে যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, চীন ফ্রান্স ও সোভিয়েট 'তাদের সংযুক্ত চেষ্টায়' নূতন যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করার জন্য ও শান্তিকে শক্তিশালী করার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করুক,—এই মর্ম্মে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব ভিশিন্স্কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউ, এন) সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাব তুলেছেন।এছাড়া সকল জাতির নিরস্ত্রীকরণের দাবিও তিনি তুলেছেন।

মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তাদের খবরের কাগজ ও দালালেরা এতদিন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার ক'রে এসেছে যে সোভিয়েট শান্তি চায় না মাকিন দেশকে তারা আক্রমণ ক'রতে চায় এবং শুধু এটম বোমা সোভিয়েট তৈরী ক'রতে পারে না ব'লেই সোভিয়েটের আক্রমণে দেরি হ'চ্ছে।

ট্রুম্যান-এটলি কোম্পানী এতদিন বৃথা জাহির করার চেষ্টা ক'রেছে যে তারাই শান্তি চায়, যুদ্ধ চায় না।

ইউ এন-এর সাধারণ অধিবেশনে মার্কিন ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-লিপ্সার স্পষ্ট অভিযোগ ট্রুম্যান-এটলি কোম্পানী কে একেবারে বেসামাল করে দিয়েছে; বিশ্বশান্তির জন্য ভিশিনস্কির আহ্বান জনগণের শান্তি-অভিযানে এক নূতন বিজয়ী অধ্যায়ের সূচনা ক'রেছে।

দেউলিয়া ট্রুম্যান-এটলির আর্ত্তনাদ

বাস্তবিক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি ও কূটনীতি মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে এই কল্পনাকে ভিত্তি ক'রে চ'লেছে যে সোভিয়েটের হাতে আনবিক শক্তি নেই। অক্টোবর বিপ্লব যেদিন সফল হ'লো, ঠিক তার পরদিনই সোভিয়েট সরকার শান্তির জন্য আইন (বা ডিক্রি) ঘোষণা ক'রলেন। তার পর থেকে বিশ্ব-শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েট বিরামহীন লড়াই চালিয়েছেন। কিন্তু মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যারা সোভিয়েট কর্ত্তৃক পরাজিত জাপানকে নিজেদের কুক্ষিগত রাখবার জন্যে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমা নিক্ষেপ ক'রে অকারণে ব্যাপকভাবে নরনারী শিশু হত্যা ক'রতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেনি, তারা নিজেদের মুনাফা বাড়াবার লোভে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দিন থেকে আর এক যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত চালিয়েছে। তারা নিরন্তর প্রচার চালিয়েছে যে সোভিয়েট আমেরিকাকে আক্রমণ ক'রতে চায় কিন্তু এটম বোমা নেই ব'লে তা পারছে না। বুলিট ছিলেন সোভিয়েট মার্কিনের রাষ্ট্রদূত। তিনি তাই ব'লেছিলেন, "রাশিয়ার যদি এটম বোমা থাকতো, তা'হলে ইতিপূর্বেই সেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিক্ষেপ ক'রতো।"

[নিউ রিপাবলিক ৭ই এপ্রিল ১৯৪৭]

প্রচার সুরু হলো, সোভিয়েটের এটম বোমা নেই মারাত্মক বীজাণু অস্ত্র আছে। ১৯৪৭ সালে ইজিপ্টে কলেরার মড়ক লেগে গেল। অমনি মার্কিন ধনকুবেরের বিবৃতি বাহির হ'লো "রাশিয়া মার্কিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে চলেছে। ইজিপ্টে কলেরার মড়কটি মনে হ'চ্ছে আর কিছুই নয়, বীজাণু দ্বারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্যে সোভিয়েটের প্রথম পরীক্ষা।"

[নিউজ ক্রনিকেল ১০ই অক্টোবর ১৯৪৭]

এ সব ঘৃণিত কুৎসাকে দু পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চ'ললো স্থায়ী শান্তির জন্য সোভিয়েটের অপ্রতিহত অভিযান। ১৯৪৭ সালের ৬ই নভেম্বর মলোটভ ঘোষণা ক'রলেন, "তোমাদের এটম বোমার গোপন রহস্য গোপন নেই।" সোভিয়েটের আণবিক শক্তি আছে; কিন্তু সোভিয়েট তাকে ব্যবহার ক'রতে চায়, যুদ্ধের জন্য নয়, শিল্পের কাজে; মানুষকে ধ্বংস করার জন্যে নয়, মানুষের সুখ ও জীবন যাত্রার মান উন্নত করার জন্য।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধলিপ্সু নরখাদকের দল তবুও প্রচার চালাতে লাগলো ওসব মলোটভের ধোকাবাজি: ১৯৫২ সালের আগে কোনক্রমেই সোভিয়েট আনবিক শক্তির রহস্য জানতে পারে না। তার আগেই এটম বোমার জোরে সোভিয়েটকে ঘায়েল ক'রতে হবে। তাই মাকিন মজুরশ্রেণী ধ্বংস হচ্ছে, ট্রুম্যানের সামরিক বাজেট ফেঁপেই চলেছে।

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাধের স্বপ্ন আজ ভেঙে গিয়েছে। সোভিয়েট এটম শক্তির অধিকারী এই সত্যকে ট্রুম্যান এটলি এতদিন অস্বীকার করে আসছিলেন। কিন্তু আজ ভিশিনস্কির বক্তৃতার অল্পক্ষণ আগেই ঐ ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ট্রুম্যান এটলি এক সাথে আর্ত্তনাদ করে উঠেছেন "খবর পাওয়া গিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ আগে সোভিয়েটে আনবিক বিস্ফোরণ হয়েছে।"

সোভিয়েটের আণবিক শক্তি আছে। তবুও সোভিয়েট শান্তি চায়। আণবিক শক্তিকে সোভিয়েট শান্তিপূর্ণ শিল্পোন্নতির কাজে লাগাচ্ছে। রাশিয়া আক্রমণ করতে চাইলেও আণবিক শক্তি নেই বলে করতে পারছে না—এই কুৎসিত মিথ্যার জাল ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র সোভিয়েট

সাম্রাজ্যবাদীরা এতদিন একটা মিথ্যার বেলুন উঁচু করে তুলেধরেছিল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। ট্রুম্যানের আর্ত্তনাদের পর বার্লিন রেডিও বলেছেন, আণবিক বোমার জন্যে মার্কিন শ্রেষ্ঠত্বের একটা মস্ত প্রচার ছিল। সেই নিছক মিথ্যা গল্পটি এতদিনে ধ্বসে পড়েছে।

[স্টেটসম্যান, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯]

কিন্তু ডলার সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়দের লজ্জা নেই। রাতারাতি সুর বদলে ফেলে তারা এখন বলতে চাইছে, মার্কিনের তুলনায় সোভিয়েট এখনও দুর্ব্বল; আণবিক শক্তিতে সোভিয়েট এখনও মার্কিনের অনেক পিছনে; তাই সোভিয়েট শান্তির কথা বলে, শান্তির জন্য বিশ্বের জনগণের নেতৃত্ব করে, সকল দেশে নিরস্ত্রীকরণ দাবি করে।

কিন্তু সত্য কথা কি? সোভিয়েট ইতিমধ্যে শান্তিপূর্ণ শিল্পপ্রসারের জন্য আণবিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন, মার্কিন বা কেউ আজো তা পারে নি। লাই-সেন্কোর অবদানের ফলে সোভিয়েট কৃষিতে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। সোভিয়েটের মধ্যে মুনাফালোভী ধনিকশ্রেণী নেই, শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্রে শ্রমিকের ধর্ম্মঘটের কোন কারণ নেই, সোভিয়েটে অর্থনৈতিক মজুরি বেড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ, দ্রব্যমূল্য কমেছে শতকরা ৫০ ভাগ-সংকটের চিহ্ন মাত্র নাই। সোভিয়েটের সাথে রয়েছে পূর্ব্ব ইউরোপের গণরাষ্ট্রগুলি; সারা দুনিয়ার মজুর ও মেহনতী জনগণ, শান্তিকামী জনসাধারণ। পক্ষান্তরে বৃটেনের কথা দূরে থাক এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আজ ২ কোটি বেকার; প্রকৃত মজুরি কমে চলছে, জীবনধারণের ব্যয় বেড়ে চলেছে। ধর্ম্মঘটের জোয়ার চলেছে মার্কিন মুলুকে। মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠছে। সুতরাং শক্তিতে সোভিয়েট অদ্বিতীয় এবিষয়ে দুনিয়ার গণতন্ত্রের শিবিরে সন্দেহ বা সংশয় নেই। আর ঠিক সেই কারণেই বিশ্বের শান্তির সদাজাগ্রত সতর্ক প্রহরী সোভিয়েট।

আণবিক শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সোভিয়েট

ভিশিনস্কির এই আবেদনের পরেও বেহায়া বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব বেভিন পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন: রাশিয়া বাধা দেবার ফলেই এটম বোমার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। সোভিয়েট যে যুদ্ধের কোন আয়োজন করছে এরকম বিন্দুমাত্র প্রমাণ বেভিন উপস্থিত করতে পারেন নি। যুদ্ধের প্রস্তুতি করার যে অভিযোগ মার্কিন ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভিশিনস্কি এনেছেন, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বেভিন বলতে পারেন নি। আনবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনের কথা তুলে বেভিন শুধু আসল ব্যাপারটিকে ঘোলাটে করে দেবার চেষ্টা করেছেন।

বেভিন বলেছেন যে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে ট্রুম্যান, এটলি ও কানাডার প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করতে তাঁরা এখনও প্রস্তুত আছেন।

এই ঘোষণা হয়েছিল একথা ঠিক; এই ঘোষণার পরই মার্কিন, বৃটেন ও সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল এবং তার পর আনবিক শক্তি কমিশন গঠিত হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন ও বৃটেন এতদিন সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে কাজ করে এসেছেন।

উপরোক্ত ঘোষণা ও তারপর মার্কিন বৃটিশ ও সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিবদের চুক্তির সময়ে মূল কথা ছিল: ইউ, এন, ও'র তত্ত্বাবধানে শুধু শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে যাতে আণবিক শক্তি ব্যবহার হয় ও আণবিক শক্তি সম্পর্কে তথ্য যাতে সকল জাতির মধ্যে আদান প্রদান হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আণবিক বোমা ও অন্যান্য ব্যাপক হত্যার উপযোগী অস্ত্রাদি ইউ, এন, ও'র পরিচালনায় সকল জাতির অস্ত্র ভাণ্ডার হতে বাদ দিতে হবে এবং তদন্ত ও অন্যান্য উপায়ে ইউ, এন, ও'র এই বিধান প্রতিপালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

ইউ-এন্ কে লুপ্ত করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে ইউ, এন্, ও গঠিত হবার আগে অনেকে লীগ অব্ নেশনস্ এর নজির দেখিয়ে বলেছিলেন যে বৃহৎ শক্তিরা একমত হয়ে কাজ না করে ভোটের সংখ্যাধিক্যে জোরে কাজ করেন, কাজেই আন্তর্জাতিক সংঘ কার্য্যকরী হতে পারেনা। ঠিক এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছিল পটসডাম চুক্তি ও জাতিসংঘের সনদের ভিতর। তার প্রধান কথা এই:—

(ক) নিরাপত্তা পরিষদই বিভিন্ন জাতির বিবাদ নিষ্পত্তির শেষকথা বলার অধিকারী। নিরাপত্তা পরিষদের বাইরে কোন সামরিক জোট বাঁধা নিষিদ্ধ হয়েছিল।

(খ) পৃথিবীর বড় রাষ্ট্রগুলি মার্কিন, বৃটেন, চীন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট মতৈক্যের (Unanimity) নীতি অনুসারে চলবে। কারণ যুদ্ধ বা শান্তি এ-প্রশ্নের জবাব তাদেরই উপর নির্ভর করে। তাই এই পাঁচ শক্তিকে 'ভিটো' ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই দুটিই ছিল ইউ, এন, ও-র মূল বনিয়াদ।

অথচ ১৯৪৬ সালের জুন মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সাথে সাথে বৃটেন ইউ, এন্-এর মূল ভিত্তি গুঁড়ো করে দেবার জন্য অগ্রসর হ'লেন। ১৯৪৬ সালের ১৩ই জুন তারিখে মার্কিনের পক্ষ থেকে বারুচ প্ল্যান উপস্থিত করা হ'লো, আনবিক শক্তি কমিশনের প্রথম বৈঠকে। এই পরিকল্পনায় প্রথম মার্কিন দাবি হ'লো: আনবিক শক্তির ব্যাপারে ভিটো ক্ষমতা বাতিল করতে হবে। দ্বিতীয় দাবি হ'লো: এটম বোমার তথ্য অন্য জাতিকে দেবার আগে মার্কিনকে "অবশ্যই

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মস্তিল

ইউরোপকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধবার মার্কিন পরিকল্পনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খোলাখুলিভাবে পরদেশ আক্রমণ ও সেখানে নিজের প্রভুত্ব বিস্তারের যে-পথে এগিয়ে চলা স্থির করেছে, তার প্রকাশ আমেরিকার আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে দেখা যায়। তারা দুনিয়ার সর্বত্র প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে; জার্মানীকে নতুন গণতান্ত্রিক ছাঁচে ঢেলে গড়া আর তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত পটস্‌ডামে হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তকে বানচাল করার চেষ্টা তারা করেছে; জাপানী প্রতিক্রিয়াশীলদের তারা রক্ষা করছে; আবার এক যুদ্ধের জন্য তারা বিপুল আয়োজন করছে; অ্যাটম বোমা জড়ো করতে তারা লেগেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে খাস আমেরিকাতে যারা মেহনৎ করে খায় সেই শ্রমিকদের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার বিলোপ করে দেবার জন্য তারা অভিযান চালাচ্ছে।

গত যুদ্ধে আমেরিকা অন্যান্য দেশের তুলনায় ভুগেছে কম, কিন্তু তবুও অধিকাংশ আমেরিকান আর একটা লড়াই এবং তার আনুষঙ্গিক ত্যাগস্বীকার ও বিধিনিষেধ সইতে চায় না। এইজন্য এক চেটিয়া পুঁজিপতিরা এবং তাদের অনুচরবৃন্দ অন্য দেশকে ভয় দেখিয়ে মার্কিন প্রভুত্বের এলাকার মধ্যে টেনে আনার যারা বিরোধী, তাদের পিবে মারার মতলবে অসাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করছে আর বিনা বাধায় তাদের ঐ বিপজ্জনক নীতি অনুসারে কাজ এগিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু মার্কিন মালিক মহল একচেটিয়া পুঁজি- পতিদের সহায়তায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এই যে জেহাদ ঘোষণা করেছে, তার অকাট্য পরিণতি হিসাবে আমেরিকার জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বার্থে আঘাত পড়ছে, আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনকে ফ্যাসিস্ট ধাঁচে ঢালা হচ্ছে আর একেবারে বর্বর ও মানবঘৃণামূলক "তত্ত্ব" ও মতের ছড়াছড়ি আরম্ভ হয়েছে। একটা নতুন যুদ্ধ, অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরদেশলিপ্সু মার্কিন মাতব্বরদের পরম আগ্রহ হল দেশের মধ্যে যারাই পরদেশে প্রভুত্ব বিস্তারের দুরাকাঙ্খার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারে তাদের কণ্ঠরোধ করা, রাজনীতি ব্যাপারে পশ্চাদপদ ও অশিক্ষিত মার্কিন জনসাধারণের মনে দেশভক্তির নামে পরদেশলিপ্সা ও যুদ্ধ কামনার বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া; আর সিনেমা, রেডিও, ধর্মযাজক ও সংবাদপত্রের প্রচার প্রভৃতি উপায়ে নানা ভাবে সোভিয়েট ও কমিউনিজমের কুৎসা রটনা করে আমেরিকার সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা! মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলেরা ক্ষমতা বিস্তারের জন্য যে বৈদেশিক নীতিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার উদ্দেশ্য হল একই সঙ্গে সর্বত্র (১) যুদ্ধকৌশলসম্পর্কিত সামরিক ব্যবস্থা, (২) অর্থনৈতিক শক্তি বিস্তার এবং (৩) মতবাদগত সংগ্রাম পরিচালনা করা।

* * *

ভবিষ্যতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমেরিকার যুদ্ধোৎপাদনব্যবস্থা যে বিরাট রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাকে যথাসম্ভব ব্যবহার করার ইচ্ছাও সংলগ্ন রয়েছে। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দেশটাকে সামরিক ভিত্তিতে সংগঠিত করার নীতি অবিচলিতভাবে অনুসরণ করছে। মার্কিন সৈন্য ও নৌ বাহিনী বাবদে প্রতি বৎসর ১১০০ কোটী ডলারেরও বেশী খরচ করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে আমেরিকার বাজেটের শতকরা ৩৫ ভাগ রণবাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় যুদ্ধের আয়োজন বাবদে এগারো গুণেরও বেশী খরচ হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, তখন পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে মার্কিন ফৌজের স্থান ছিল ১৭-তম; আজ মার্কিন ফৌজ হল তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। আমেরিকা শুধু যে অ্যাটম বোমা জড়ো করেছে তা নয়; মার্কিন যুদ্ধ ধুরন্ধরেরা সোজাসুজি বলে থাকে যে তারা বিবাক্ত জীবাণুবাহক অস্ত্রশস্ত্রেরও আয়োজন করছে।

আমেরিকার যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী, যখন শান্তি রয়েছে তখনই আমেরিকা থেকে বহুদূরে অবস্থিত অনেক জায়গায় এমন সুরক্ষিত দুর্গ ও আক্রমণকেন্দ্র প্রয়োজন, যেখান থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলির উপর হামলা করার সুবিধা থাকে। তাই আলাস্কা, জাপান, ইতালী, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, মিশর, ইরাণ, তুর্কী, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া, এবং পশ্চিম জার্মাণীতে আমেরিকা বিমান কিম্বা নৌ বাহিনীর আক্রমণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে কিম্বা করছে। আফগানিস্থানে এমন কি নেপালে পর্য্যন্ত, মার্কিন সামরিক মিশন গিয়ে হাজির হয়েছে। উত্তর মেরু অঞ্চলকেও সামরিক আক্রমণ চালাবার কাজে লাগাবার আয়োজন প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলেছে।

যুদ্ধ বেশ কিছুকাল শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেন ও আমেরিকার সামরিক মৈত্রী, এমন কি উভয়ের সম্মিলিত সেনাপতিমণ্ডলী পর্য্যন্ত এখনও বর্তমান। সকলের অস্ত্রশস্ত্র এক ধরণের হবে এই চুক্তির অজুহাতে আমেরিকা অপর দেশ এবং বিশেষতঃ ব্রিটেন ও ক্যানাডার যুদ্ধ বাহিনী এবং সামরিক পরিকল্পনার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মিলে যে বিরাট ভূখণ্ড, তার মিলিত আত্মরক্ষার ছলে আমেরিকার সামরিক শক্তি বিস্তারের যে পরিকল্পনা রয়েছে তার ফাঁদে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোকে টানা হয়েছে। মার্কিন গবর্মেণ্ট সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে যে তুর্কীর সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার কাজে সাহায্য করার ভার তারা নিয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাঙের ফৌজকে মার্কিন সমরশিক্ষকরা যুদ্ধবিদ্যা শেখাচ্ছে আর যুদ্ধের মালমশলা আমেরিকা সরবরাহ করেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ব্যাপারে মিলিটারীমহল বেশ জেঁকে বসেছে, আর তাদেরই মধ্য থেকে অনেকে বড় বড় সরকারী চাকুরী পেয়ে কিম্বা বৈদেশিক বিভাগের গদিতে বসে, অন্য দেশের উপর তম্বিতম্বা করে আমেরিকাকে লড়াইয়ের রাস্তায় ঠেলে নিয়ে চলেছে।

* * *

আমেরিকার এই যুদ্ধ পরিচালনাকে সার্থক করতে হলে অর্থনৈতিক শক্তি বিস্তার করা একটা রীতিমত জরুরী কাজ হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর ইয়োরোপের যে দেশগুলি বিপদে পড়েছে, বিশেষত মিত্রপক্ষের যে দেশগুলি সবচেয়ে বেশী ভুগেছে আর আজ কাঁচামাল, জালানি ও খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের সেই দুর্দশার সুযোগ নিতে চেষ্টা করে চশমখোর পাওনাদারদের মত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাহায্য করার বিনিময়ে বেজায় চড়া দাম চেয়ে বসেছে। আমেরিকার এক চোখ পড়ে রয়েছে আসন্ন অর্থনৈতিক সংকটের দিকে; তাই নিজের মাল বিক্রি করার একচেটিয়া বাজার আর একা পুঁজি খাটাবার মত এলাকা দখল তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করার জন্য আমেরিকা ব্যস্ত। আমেরিকার আর্থিক "সাহায্য"-এর প্রধান লক্ষ্য হল মার্কিন পুঁজিপতিদের বাঁধনে ইয়োরোপকে বেঁধে রাখা। যে দেশের আর্থিক সংকট যত প্রখর, আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা সেই দেশের উপর তত বেশী কঠোর শর্ত জোর করে চাপাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু আর্থিক আধিপত্যের একটা ফল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে রাজনৈতিক দাসত্ব স্বীকার; তাই মাল বিক্রির মতলবে একচেটিয়া বাজার বাড়াবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ইয়োরোপের নতুন গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার পক্ষে অনুকূল নতুন জায়গা দখল করতে লেগেছে। উপবাস ও ধ্বংস থেকে কোন দেশকে "ত্রান" করার সময় মার্কিন পুঁজিপতিরা তার স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটি পর্য্যন্ত অপহরণ করতে চায়। আমেরিকার "সাহায্য" পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের নীতি পরিবর্তন করবার দরকার পড়ে, ওয়াশিংটনের হুকুম তামিল করার জন্য কয়েকটি পার্টি ও কয়েকজন ব্যক্তি দেশে সর্বেসর্বা হয়ে বসে, আর তারা (ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতির মত) স্বদেশে ও বিদেশে আমেরিকার অনুকূল নীতি অনুসরণ করে চলে।

সারা দুনিয়ার উপর মার্কিন আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছা এবং আমেরিকার গণতন্ত্রবিরোধী নীতিকে সফল করতে হলে আবার মতবাদের ক্ষেত্রে একটা সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে মার্কিন পরিকল্পনার মতবাদসংক্রান্ত অংশের মূল উদ্দেশ্য হল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতন্ত্রগুলি পরদেশ আক্রমণ করতে চায় এই মিথ্যা অভিযোগ ক্রমাগত চালিয়ে জনমতকে ঠকানো, আর ঐ ভাবে প্রমাণ করা যে ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা শুধু আত্মরক্ষা করতে চাইছে এবং নতুন লড়াইয়ের আয়োজন সম্পর্কে দায়িত্ব তাদের নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি অন্যান্য দেশের অনুরাগ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের অবিচল অসম-সাহসিক সংগ্রাম সকল দেশের শ্রমিকদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিল। সোশালিস্ট রাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সোভিয়েট সমাজের নৈতিক ও রাষ্ট্রিক ঐক্যের অপরাজেয় শক্তির জীবন্ত পরিচয় তখন সারা দুনিয়া পেয়েছিল। পৃথিবীর সব দেশে যারা মেহনৎ করে, তাদের মনে সোশালিস্ট ব্যবস্থা যে গভীর ছাপ ফেলেছিল, আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা সেই ছাপকে মুছে দেবার জন্য ব্যগ্র। যারা লড়াই বাধাবার জন্য ব্যাকুল, তারা বেশ বোঝে যে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সেপাইদের লাগাবার আগে আরও অনেক দিন মতবাদের দিক থেকে তাদের বিভ্রান্ত করার নানা রকম উদ্যোগ আয়োজন দরকার হবে।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মতবাদের এই লড়াই চালাতে গিয়ে, রাজনীতি ব্যাপারে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টিরহিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যখন প্রথমেই জোর গলায় অভিযোগ আনে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে গণতন্ত্র নেই, আছে শুধু সর্বগ্রাসী একনায়কত্ব, আর আমেরিকা, ব্রিটেন, গোটা ধনতান্ত্রিক জগৎটাই হল গণতান্ত্রিক, তখন তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতাই জাহির করে ফেলে। মতবাদমূলক সংগ্রামের এই মঞ্চের উপর—সর্বগ্রাসী কমিউনিজমের মুণ্ডপাত আর বুর্জোয়াদের নকল গণতন্ত্র রক্ষার নামে—শ্রমিকশ্রেণীর যারা দুষমণ, তারা বিনা ব্যতিরেকে প্রত্যেকেই দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে আছে টাকার কুমীর পুঁজিপতির দল আর আছে দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট নেতারা, যারা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হুকুমে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যে কোন জঘন্য কুৎসা রটনায় সবচেয়ে উদ্‌গ্রীব।

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ারশতে নয়টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে কমরেড ঝ দানভ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেন, তাহার তৃতীয় পরিছেদটি এখানে দেওয়া হইল।

রিপোর্টের এই অংশে কমরেড ঝ দানভ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের বিশ্বগ্রামের পরিকল্পনায় যে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতবাদগত হাতিয়ার ব্যবহার করিতেছে সেগুলির স্বরূপ খুলিয়া ধরিয়াছেন।

আমেরিকার ইউরোপ গ্রাসের পরিকল্পনা উপলক্ষেই কমরেড ঝ দানভ এই বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছে যে শুধু ইয়োরোপে নয়, সারা দুনিয়ায় যুদ্ধবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ সুলভ সেই হাতিয়ারগুলিই ব্যবহার করিতেছে।

তাই প্রত্যেক দেশের এবং সেই সঙ্গে ভারতেরও শান্তিযোদ্ধাদের নিকট কমরেড ঝ দানভের এই রিপোর্ট মার্কিণ যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

(৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রচারের এই জুয়াচুরির মর্মকথা হল এই দাবী যে, প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে অনেকগুলো পার্টি আর বিরোধী সংখ্যালঘুদের একটা সংগঠন একান্ত প্রয়োজন। ব্রিটেনের যে 'লেবর'-ওয়ালারা সোভিয়েটের নিন্দায় কখনও পিছপাও হয় না, তারা এই সূত্র ধরেই সোভিয়েট দেশে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী আর তারই প্রতিফলন-স্বরূপ একাধিক পার্টির লড়াই আবিষ্কার করতে চায়! রাজনীতি ব্যাপারে তাদের মূর্খতার সীমা নেই। তারা বোঝার শক্তি রাখে না যে পুঁজিদার আর জমিদার আর পরস্পরবিরোধী একাধিক শ্রেণী আর তারই ফলস্বরূপ একাধিক পার্টির অস্তিত্ব বহুদিনই সোভিয়েট দেশে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। তারা চায় যে তাদের কাছে যে বুর্জোয়া পার্টিগুলো এত পেয়ারের বস্তু, সেগুলো সোভিয়েটেও থাকা দরকার! কিন্তু তাদের পরিতাপ যতই মর্মভেদী হোক্ না কেন, ইতিহাসের বিধানে বুর্জোয়া শোষকদের এই সব পার্টি এখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

'লেবর'-ওয়ালারা আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পক্ষে অন্যান্য উকীল-মোক্তারেরা সোভিয়েট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে কোন কুৎসা রটনায় সংকোচ বোধ করে না, অথচ তুর্কীতে যখন অল্পসংখ্যক ফ্যাশিস্ট সর্বেসর্বা হয়ে রক্তপাত চালায় আর জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখে, তখন তারা মনে করে যে ও রকম ঘটনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। বুর্জোয়া দেশগুলিতে যে গণতন্ত্র আছে তাও যখন রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়, তখন তারা চোখ বুজে থাকে। আমেরিকাতে বিভিন্ন জাতির উপর যে অত্যাচার চলে, সেখানে দুর্নীতি প্রচলিত আর গণতান্ত্রিক অধিকারকে যে বেমালুম বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, সে-বিষয়ে তাদের মুখে কখনও রা সরে না।

ইয়োরোপকে শিকল দিয়ে বাঁধার মতলবের সঙ্গে সঙ্গে মতবাদ নিয়ে যে "অভিযান" তারা চালায়, তার একটা হল জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিকে আক্রমণ করা আর "বিশ্বশাসন ব্যবস্থার" দোহাই দিয়ে বিভিন্ন জাতির সার্বভৌম অধিকার পরিত্যাগ করা উচিত বলে আবেদন করা। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হল, যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন জাতির সার্বভৌম অধিকারকে নির্মমভাবে দলন করছে তার অবাধ পররাজ্যলিপ্সার উপর একটা মুখোস চাপিয়ে রাখা, আমেরিকাকে বিশ্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থার মুখপাত্র বলে ঘোষণা করা এবং যারা মার্কিন ক্ষমতা-বিস্তারের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে বাতিল "স্বার্থান্ধ" জাতীয়তার অপবাদ দেওয়া। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা বিকৃত মস্তিষ্ক আর যারা নিছক শান্তিবাদী, তারা "বিশ্বশাসনব্যবস্থা"র এই রবটিকে গ্রহণ করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস থেকে যে সব জাতি তাদের নিজস্ব স্বাধীনতাকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করছে, তাদের উপর থেকে মতবাদের দিক থেকে চাপ দেবার কাজে এই কথাকে ব্যবহার করা তো হচ্ছেই। সঙ্গে সঙ্গে যে-সোভিয়েট ছোট বড় সকল জাতির সার্বভৌম অধিকার এবং প্রকৃত সাম্য স্বীকার করে নেওয়ার নীতির স্বপক্ষে

ইউরোপকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধবার মার্কিন পরিকল্পনা

অবিচলিত ও অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করেছে সেই সোভিয়েটের বিরুদ্ধেই একটা আওয়াজ তোলা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকা, ব্রিটেন ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ঘোর শত্রু, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতন্ত্রগুলি হল বিভিন্ন জাতির সাম্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চলেছে তাকে প্রতিহত করার মত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য দুর্গ।

এটা খুবই লক্ষ্য করার বিষয় যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই মতবাদমূলক চক্রান্তকে সফল করতে একজোট হয়েছে 'বুলিট্'-জাতের (বুলিট কয়েক বৎসর সোভিয়েটে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন) দালালেরা, যাদের কাজই হল গোয়েন্দাগিরি করে সামরিক ও রাজনীতিবিষয়ক গোপন তথ্য জেনে নেওয়া, আর 'গ্রীন্'এর ধরনের বিশ্বাসঘাতক ট্রেড ইউনিয়ন-নেতা আর ফরাসী সোশালিস্টরা, যাদের নেতা 'ব্লুম'-এর মত পুঁজিবাদীদের ঝানু সাফাই-গাইয়ে, আর 'শুমাখের'-এর মত জার্মান সোশাল-ডেমক্রাট, আর বেভিন্-মার্কা নেতার দল।

* * *

আজ্‌কের সংকটদিনে আমেরিকার ফেঁপে ওঠার কামনা বাস্তব প্রকাশ পেয়েছে "ট্রুমান নীতি" আর "মার্শাল পরিকল্পনাতে"। আলাদা ধরণের কথা বলা হলেও আসলে কাণ্ডটা একই, ঐ দুটো কথাতেই ইয়োরোপকে গ্রাস করার মার্কিনী মতলব প্রকাশ পাচ্ছে।

ইয়োরোপের ক্ষেত্রে "ট্রুমান্ নীতি"-র প্রধান বৈশিষ্ট্য হল :—

(১) ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য স্থাপনের জন্য মার্কিন ফৌজের পক্ষে লড়াই চালাবার মত কয়েকটা কেল্লা আর বন্দর বানানো।

(২) বল্‌কান্ অঞ্চলে নয়া গণতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্গ হিসাবে গ্রীস ও তুর্কীতে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে ধুমধাম করে সাহায্য দেওয়া (গ্রীস ও তুর্কীতে সামরিক সাহায্য দেওয়া, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, টাকা ধার দেওয়া)।

(৩) নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলির উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাওয়া; মিথ্যা অভিযোগ করা যে তারা গণতন্ত্রবিরোধী, কয়েকজন সেখানে সর্বগ্রাসী ক্ষমতা উপভোগ করে আর তারা পরদেশে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করতে চায়; নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলে আঘাত করা; তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে সর্বদা হস্তক্ষেপ করা; সেই সব দেশে যারা দেশের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু, তাদের সমর্থন করা; সেখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা দিয়ে, দেশের শিল্পোন্নতি নিবারণ করে এবং অন্যান্য উপায়ে কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে খুব আড়ম্বরে সেই দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা।

যে "ট্রুমান্ নীতি"র কাজ হল গণতন্ত্রবিরোধী সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে মার্কিন সাহায্য দেওয়া, সেটা হল সোজাসুজি পরদেশ আক্রমণ করার নীতি। মার্কিন পুঁজিবাদী মহলে যারা সব কিছু অনাচারই বরদাস্ত করতে অভ্যস্ত, তারাও এই নীতি ঘোষণার সময় খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে যারা সাধারণের মধ্যে কতকটা প্রগতিশীল, তারা ট্রুমানের ঘোষণা প্ররোচনামূলক ও সাম্রাজ্যবাদী বলে সতেজে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

"ট্রুমান নীতি"-র এই বিরূপ অভ্যর্থনা হওয়ায় "মার্শাল পরিকল্পনা" আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ হতে লাগল। একই শক্তি-বিস্তারমূলক নীতিকে সফল করার সযত্ন-প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা হল "মার্শাল পরিকল্পনা"।

এই "মার্শাল পরিকল্পনা"-র কথাগুলি অস্পষ্টভাবে ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরম যত্নে রচিত হয়েছে। আসলে এটা হল আমেরিকার কাছে ঋণের বাঁধনে বাঁধা কতগুলো রাষ্ট্র নিয়ে একটা 'ব্লক' বানানো। আর প্রথমে অর্থনৈতিক ও পরে রাষ্ট্রীক স্বাধীনতা পরিত্যাগের মূল-স্বরূপ ইয়োরোপের দেশগুলোকে আমেরিকার টাকা ধার দেওয়া! তা ছাড়া "মার্শাল পরিকল্পনা"-র মধ্যে মোক্ষম কথা হল মার্কিন পুঁজিপতিদের আধিপত্যে পশ্চিম জার্মানীর শিল্প কেন্দ্রগুলির পুনর্গঠন।

আমেরিকান নেতারা পরে যে সব কথাবার্তা চালিয়েছেন আর বিবৃতি দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে "মার্শাল পরিকল্পনা" অনুসারে যুদ্ধে যে সব দেশ আমেরিকার মিত্র ছিল ও বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও যাদের নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে, প্রথমে তাদের সাহায্য করা হবে না, বরঞ্চ সাহায্য করা হবে জার্মাণ পুঁজিপতিদের। উদ্দেশ্য হল ইয়োরোপ আর জার্মাণীর পক্ষে যে কয়লা আর লোহা দরকার তার প্রধান উৎপত্তিক্ষেত্রকে মার্কিন দখলে নিয়ে আসা, আর কয়লা ও লোহা যে সব দেশে চায় তাদের জার্মাণীর পুনর্গঠিত অর্থনৈতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল করে রাখা।

"মার্শাল পরিকল্পনা" চালু হওয়ার পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে অবশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হবে, একথা সত্য হলেও ব্রিটেনে অ্যাট্‌লির 'লেবর' গবর্ণমেণ্ট ও ফ্রান্সে রামাদিয়ের সোশালিস্ট গবর্ণমেণ্ট সেই পরিকল্পনাকে যেন অন্ধের যষ্টি বলে আঁকড়ে ধরেছে। অমরা জানি যে ১৯৪৬ সালে ব্রিটেন আমেরিকার কাছে যে ৩৭৫ কোটী ডলার ধার করেছিল, তা প্রায় সবটাই ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা আরও জানি যে এই ঋণের শর্ত এমন ছিল যে তাতে ব্রিটেন একেবারে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। টাকাকড়ি সম্পর্কে আমেরিকার মুখাপেক্ষিতার দড়ি গলায় পরেও ব্রিটিশ লেবার গবর্ণমেণ্ট আরও নতুন দেনা জোগাড়ের চেষ্টা ছাড়া নিজের জন্য অন্য কোন রাস্তা বাৎলাতে পারে নি। তাই আবার নতুন ঋণ সংগ্রহ করে অর্থনৈতিক সংকটের কবল থেকে বেরিয়ে পড়ার উপায় হিসাবে তারা "মার্শাল পরিকল্পনার" গুণগান করেছে। তা ছাড়া ব্রিটিশ রাজনীতিকের দল আরও আশা করে রয়েছে যে পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকার কাছে ঋণী অনেকগুলো দেশ মিলে যদি একটা জোট ('ব্লক') বাঁধে, তা'হলে সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা সেখানে আমেরিকার প্রধান দালাল হিসাবে কাজ করতে পারে আর দুর্বল দেশগুলির মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু লাভও করতে পারে। ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী আশা করে আছে যে "মার্শাল পরিকল্পনা" ব্যবহার করে যদি মার্কিন একচেটিয়া মালিকদের খুশী করা যায় আর তাদের প্রভুত্ব মেনে নেওয়া যায়, তাহলে অনেকগুলো দেশে, আর বিশেষ করে বল্‌কান-দানিয়ুব অঞ্চলের দেশগুলোতে ব্রিটিশের যে প্রভাব নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

মার্কিন প্রস্তাবগুলির উপর "নিরপেক্ষতা"-র একটা লোকঠকানো জৌলুস্ দেবার জন্য স্থির করা হল যে "মার্শাল পরিকল্পনা"-র অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে ফ্রান্সকেও বাগানো যাক্। ফ্রান্স অবশ্য ইতিমধ্যে তার সার্বভৌমত্ব আমেরিকার কাছে অর্ধেক বাঁধা দিয়ে রেখেছিল; ১৯৪৭ সালের মে-মাসে আমেরিকার কাছ থেকে ধার নেবার সময় দাসখৎ লিখতে হয়েছিল যে ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট থেকে কমিউনিস্টদের সরিয়ে দেওয়া হবে।

* * *

ওয়াশিংটনের নির্দেশমত ইংরেজ আর ফরাসী সরকার মার্শাল প্রস্তাব আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠাল। এই কাণ্ডটা করা হল এই জন্য যে আসলে প্রস্তাবটা সোভিয়েটবিরোধী বলে তার উপর একটা মুখোস্ চাপানো দরকার ছিল। আর তারা আগে থেকেই হিসাব করে রেখেছিল যে সোভিয়েট মার্শালের শর্তে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবে বলে সবাই যখন জানে, তখন তারা সহজে সোভিয়েট ইউনিয়নের ঘাড়ে দায়িত্ব ঠেলে দিয়ে বলতে পারবে যে সোভিয়েটই "ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করতে অস্বীকার" করেছে, আর ঐ কথা বলে যে দেশের বাস্তবিকই সাহায্য দরকার, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করা সম্ভব হবে। অপর পক্ষে, সোভিয়েট যদি মার্শাল প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় যোগ দিতে রাজী হয়ে পড়ে, তাহলে "আমেরিকার সহায়তায় ইউরোপের পুনর্গঠন" বলে যে ফাঁদ পাতা হয়েছে, পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে লোভ দেখিয়ে সেখানে ভুলিয়ে আনা সহজ হবে। ট্রুমান্ পরিকল্পনার মতলব ছিল এই সব দেশকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা, আর "মার্শাল প্ল্যানের" লক্ষ্য হল তারা অর্থনীতির দিক থেকে কতটা দৃঢ় তা পরখ্ করে দেখা, তাদের ভুগিয়ে ফাঁদে আটক্ করা আর তারপর "ডলার

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)]

সুতাকলগুলিতে বিক্ষোভের ঝড় তুলিয়া বোনাস আদায়

মালিকদের টাকা বাঁচাইবার জন্য বিধান-মন্ত্রিসভার সশস্ত্র পুলিস সমাবেশ ব্যর্থ

শ্রীরামপুর অঞ্চলে রামগুরিয়া, বেঙ্গল বেল্টিং, বঙ্গেশ্বরী, হুগলী মিল, হিন্দুস্থান বেল্টিং, সেওড়াফুলী বেল্টিং, ইণ্ডিয়া বেল্টিং, শ্রীরামপুর বেল্টিং প্রভৃতি সব কয়টি সুতাকল ও ফিতা কারখানায় ধর্ম্মঘট, ঘেরাও, বিক্ষোভ ও শেষপর্য্যন্ত শ্রমিকদের সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতিতে মালিকেরা বোনাসের দাবী আংশিকভাবে মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে।

মালিকদের প্রধান ধুয়া ছিল—'লাভ হয় না।' তাঁহারা ভয় দেখাইত—কাপড় জমিয়া গিয়াছে, মিলই বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু কোন ধোঁকাবাজীতে প্রতারিত না হইয়া শ্রমিকেরা দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়াতে শেষ পর্য্যন্ত মালিকদের মাথা নত না করা ছাড়া উপায় রহিল না।

মালিকদের পকেট বাঁচাইবার জন্য বিধান সরকার ও তাহাদের সশস্ত্র পুলিস প্রাণপণ চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে সুরু করিয়া ২১শে সেপ্টেম্বর এই ১০ দিনের মধ্যে এমন একটি দিনও যায় নাই যেদিন শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সশস্ত্র পুলিসের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মোকাবেলা করিতে হয় নাই। তবু শ্রমিকদের জঙ্গী একতাই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে।

সুতাকল শ্রমিকদের এই বোনাসের সংগ্রাম আই-এন-টি-ইউ-সি ও দালাল নেতাদের কুৎসিৎ মুখোসও বারবার খুলিয়া দিয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক সুতাকল শ্রমিকদের সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই দিনই ভোরে হঠাৎ বিধান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে এবং বৈকালে সেই আদেশ ভঙ্গ করিয়াও মিছিল নামাইবার অজুহাতে ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তাদের গ্রেপ্তার করে।

১৪৪ ধারা চলিতেই থাকে; কিন্তু তাহাসত্ত্বেও ১৮ই সেপ্টেম্বর আবার মাহেশে সভা আহ্বান করা হয়। এই সভা ভাঙ্গার জন্য ৪ লরী সশস্ত্র পুলিস পুলিস-সার্জ্জেন্টদের নেতৃত্বে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করিয়া দাঁড়ায়। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই সশস্ত্র মহড়া সম্পর্কে জনৈক সুতাকল শ্রমিক মন্তব্য করিয়া জানাইয়াছেন 'বিধান সরকারের এই পুলিসী ব্যবস্থা যুদ্ধের বিভৎস চিত্রের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।'

কিন্তু পুলিসের এই বিরাট আয়োজন ব্যর্থ করিয়াই ৫০ জন শ্রমিক প্রতিনিধি জড়ো হইয়া তাঁহাদের জঙ্গী সংকল্প স্থির করেন। প্রত্যেক কারখানার প্রত্যেক ডিপার্টের প্রতিনিধিদের এই সভা মালিকদের জানাইয়া দেন ২২শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের বোনাস ও অন্যান্য দাবীগুলি মানিয়া না নিলে সমস্ত কারখানায় সাধারণ ধর্ম্মঘট হইবে।

১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে সুরু হয় গেট-সভা, গ্রুপ-বৈঠক, আলাপ ও আলোচনা। হিন্দী ও বাংলায় ধর্ম্মঘটের এলানের ইস্তাহার ছড়াইয়া পড়ে। পোস্টারে সারা অঞ্চল ভরিয়া যায়।

কারখানার ভিতরে শ্রমিকেরা মালিক ও ম্যানেজারদের ঘেরাও করিতে থাকেন।

বেঙ্গল বেল্টিংএ মালিক ঘেরাও হইলে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য এস-ডি-ও এবং লেবার কমিশনার সশস্ত্র পুলিস লইয়া কারখানায় ঢুকিলে তাঁহারাও ঘেরাও হইয়া যায়। ৪ ঘন্টা ধরিয়া এই অবস্থা চলিবার পর মালিক এক মাসের বোনাস দিতে স্বীকৃত হইয়া সরিবার পথ পান। শ্রমিকদের ছাঁটাই করিব বলিয়া যে হম্বিতম্বি চলিতেছিল, তাহাও নাকচ হইয়া যায়।

শ্রীরামপুর বেল্টিং, ইণ্ডিয়া বেল্টিং ও রামপুরিয়া মিলেও ম্যানেজার ঘেরাও হন। অবস্থান ধর্ম্মঘটও সুরু হইয়া যায়। রামপুরিয়া মিলের ম্যানেজারকে ঘেরাও করা মাত্রই তিনি জবাবদিহি করিতে থাকেন—আমি তোমাদের বোনাস দিবার কথা আগেই বলিয়াছি।

সশস্ত্র পুলিস দিয়া যাহা আর সম্ভব করা গেল না, দালাল নেতাদের দিয়া মালিকেরা সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুখে বোনাসের দাবী স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রমিকদের যে কোন আন্দোলন ও জঙ্গী মনোভাব দেখিলেই নানা অজুহাতে মালিকদের পক্ষে চলিয়া যান।

শ্রীরামপুর সুতাকলে আই-এন-টি-ইউ-সি'র প্রধান পাণ্ডা বিষ্ণু ব্যানার্জ্জি। ১৯শে শ্রমিক প্রতিনিধিদের বৈঠকের সময় তিনি হঠাৎ মিলে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রমিকেরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আধ মাইল দূরে হটাইয়া দিয়া আসেন।

বঙ্গেশ্বরীর জনৈক দালাল ধর্ম্মঘটের পোস্টার ছেঁড়ার সময় এবং বেঙ্গল বেল্টিংএও অপর একজন দালাল শ্রমিকদের বিরোধিতা করিয়া 'উচিৎ শিক্ষা' পায়।

শ্রীরামপুর বেলটিং-এ দুইজন শ্রমিককে পিটাইয়া অজ্ঞান করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবার প্রতিবাদে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া মালিকের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হন। বিষ্ণু চ্যাটার্জ্জি সঙ্গে সঙ্গেই হাজির। তিনি আসিয়া বলিতে থাকেন; শ্রমিকরা যেন না ক্ষেপে। তিনি পুলিসের সাহায্যেই মালিককে দেখিয়া লইবেন!

শ্রমিকেরা তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন এবং নিজেরাই অগ্রসর হইয়া তখনই বোনাসের দাবি আদায় করেন এবং মালিকের 'লক-আউট' বানচাল করিয়া ফেলেন। 'লক-আউট' যত সময় ছিল, তাহার পুরা বেতনও শ্রমিকেরা আদায় করিয়াছেন।

দাবি আদায় না হইলে ২২শে সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্ম্মঘটের সাড়া এমন ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, বিধান সরকার সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা ও আয়োজনই করিয়াছিল। শত শত স্টেটগান, টমিগান, ও বন্দুকধারী পুলিস প্রত্যেকটি রাস্তা ও কারখানায় টহল দিতে থাকে।

জনৈক শ্রমিক লিখিয়াছেন:—৯ই মার্চ্চ রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যে ফ্যাসিস্ট কায়দা আরম্ভ হইয়াছিল, প্রত্যেকটি শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এখন দৈনন্দিন একই কায়দা গ্রহণ করা হইতেছে।

কিন্তু শ্রমিকদের কয়েকটি দাবি, বিশেষ করিয়া বোনাসের দাবি গৃহীত হওয়ায় ২২শে আগস্ট রাত্রি ১২টায় ইউনিয়নের কার্য্যকরী কমিটিতে সাধারণ ধর্ম্মঘটের এলান সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

'সাময়িক ভাবে প্রত্যাহৃত' এই জন্যই যে; বন্দীরা এখনো জেলে, ১৪৪ ধারা এখনো বহাল আছে এবং যে বিধান সরকার পুলিসের সাহায্যে শ্রমিকদের দাবি মাড়াইয়া দিতে চায়—তিনি এখনো গদীতে আছেন।

লালঝাণ্ডার অপরাজেয় নেতৃত্বে

বেঙ্গল বেল্‌টিং-এ ধর্ম্মঘট করিয়া ১ শত শ্রমিকের ছাঁটাই নোটিস বাতিল

'জাতীয়' টি-ইউ'র বেইমানীতে শ্রীরামপুর বেল্টিং 'লক-আউট'

মাহেশের বেঙ্গল বেল্টিং মিলে (ফিতাকল) প্রায় ১ শত শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চেষ্টা করিলে সমস্ত শ্রমিক সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান ধর্ম্মঘট করিয়া মালিকের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। দাবী না মানা পর্য্যন্ত শ্রমিকদের নিকট জব্দ হইয়া দারোয়ান সহ অফিসাররা কয়েক ঘণ্টা কারখানার বাহিরেই অবস্থান করেন। অবশেষে ম্যানেজার সমস্ত ছাঁটাই নোটিস প্রত্যাহার করিলে কাজ চালু হয়।

পশ্চিম বাংলার সুতাকলগুলিতে সর্ব্বত্রই বিধান সরকারের সাহায্যে মালিকদের ছাঁটাইনীতি পুরাদমে চলিতেছে। বেঙ্গল বেল্টিং-এও সেই নীতি চালু হইয়াছিল।

এই জয়ের পর শ্রমিকদের মধ্যে পুরা ৪ মাসের বেতন বোনাসের দাবী লইয়া আন্দোলন আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীরামপুর বেল্টিং-এ 'জাতীয় টি-ইউর বেইমানী

শ্রীরামপুর বেল্টিং-এ বোনাসের দাবী ও আন্দোলন 'জাতীয়' টি-ইউ নেতা বিষ্ণু ব্যানার্জ্জির বেইমানীতে কারখানা 'লক-আউট' এবং শ্রমিকদের উপর পুলিস ও মালিকের আক্রমণে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর ৩ জন শ্রমিক ম্যানেজার জিতেন লাহিড়ীর নিকট দরখাস্ত লইয়া উপস্থিত হইলে ক্রোধান্ধ ম্যানেজার তাঁহাদের নির্ম্মমভাবে প্রহার করেন। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাঁহাদের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ড্রেনে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

সংবাদ জানামাত্র কারখানায় অবস্থান ধর্ম্মঘট সুরু হয়। শ্রমিকেরা খুনীদের উচিৎ শাস্তি দিবার জন্যও আগাইয়া যান।

এই কারখানার ইউনিয়নটি 'জাতীয়' টি-ইউ'র অন্তর্গত। নেতা বিষ্ণু ব্যানার্জ্জি মালিকদের চামড়া বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আসেন এবং দাবী গৃহীত হউক না হউক শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট থামাইতে উপদেশ দেন। এই 'উপদেশ' অগ্রাহ্য করিলে কারখানায় পুলিস আসে এবং 'জাতীয়' নেতাদের সহযোগে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করা হয়।

এই সুযোগে মালিক 'লক-আউট' ঘোষণা করিয়াছে। শ্রমিকরাও তাঁহাদের পূজা বোনাস ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণের দাবীতে ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতে দৃঢ়সংকল্প হইতেছেন।

ত্রুটি সংশোধন

গত সংখ্যা 'মঞ্জিলে' ইণ্ডিয়া বেল্টিং-এ দুইজন শ্রমিক হত্যা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহা ঠিক নহে। শ্রীরামপুর বেল্টিং-এর উপরোক্ত ঘটনাই ভুলক্রমে ইণ্ডিয়া বেল্টিং-এর ঘটনা হিসাবে ছাপা হইয়াছিল।

হোসিয়ারী কারখানায় পূজা-বোনাস ধর্ম্মঘট

উত্তর কলিকাতায় প্রায় এক ডজন হোসিয়ারী কারখানাও অন্ততঃ এক মাসের পূজা বোনাসের দাবীতে দুই সপ্তাহ কাল-ব্যাপী ধর্ম্মঘট চলিয়াছে।

গত শনিবার হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আহ্বানে ধর্ম্মঘটীদের এক সভায় শ্রমিকেরা বলেন যে, হোসিয়ারিতে দিনরাত খাটিয়া পূজার সময় নিজের ছেলের একটি গেঞ্জীর আব্দারও যদি মিটাইতে না পারা যায়, তবে মালিকের সংসারের সাধ-আহ্লাদ মিটাইবার জন্যই শুধু তাহারা খাটিয়া মরিবে কেন?

শেষ সংবাদে প্রকাশ, হোসিয়ারী শ্রমিকদের উপর বিধান সরকারের পুলিস লাঠি চালাইয়াছে এবং ৫ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

জহর টেক্সটাইল, ক্যালকাটা টেক্সটাইল, এমপ্রেস ও এম্পায়ার কারখানায় সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মঘটের পর মালিকেরা বোনাসের দাবী মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছেন।

২রা অক্টোবর

'লক-আউটের' বিরুদ্ধে আবার এলেনবেরীর বীর শ্রমিক

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে সভা ও মিছিলে অপরাজেয় সংগ্রাম ঘোষণা

এলেনবেরী কারখানার বীর শ্রমিকরা আবার রাজপথে নামিতে সুরু করিয়াছেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর ৩ শত শ্রমিক হাজরা রোডের এলেনবেরীর অন্যতম কারখানার সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া দাবী জানান—'পূজা বোনাস দিতে হইবে' 'লক আউট তুলিয়া দিতে হইবে', 'এলেনবেরী বন্দীদের মুক্তি চাই।'

প্রতি বৎসর এলেনবেরীর ৪টি কারখানা—হাওড়া, যোধপুর, সোদপুর ও হাজরা রোড—শ্রমিকেরা একত্রে ড়াইয়েই বোনাস আদায় করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই বৎসর হাওড়া ও যোধপুর কারখানা 'লক-আউট' করিয়া রাখায় কর্ম্মরত শ্রমিকদেরও বোনাস অস্বীকৃত হইয়াছে।

মালিক ডালমিয়া-জৈন কল্পনাও করেন নাই যে, বোনাসের প্রশ্ন লইয়াও এবার মাথাব্যথা করিতে হইবে। বিধান-সরকারের সাহায্যে দুইটি কারখানা বন্ধ; অপর দুইটিতে 'জাতীয়' টি-ইউর আড্ডা। বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন ধনিক দালাল-শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী নীহারেন্দু দত্তমজুমদারকে আনিয়া শ্রমিকদের চোখের সম্মুখেই ভোজ ও আহ্লাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই সুখ স্বপ্নই ভাঙ্গিয়া গেল শ্রমিকদের আওয়াজে। হাজরা কারখানায় শ্রমিকেরা এবারও একা নয়, হাওড়া ও যোধপুরের শ্রমিকেরা তাঁহাদের সঙ্গে আছেন।

'লক-আউট' চলবে না

মালিকদের সকল সুখ স্বপ্নই এইভাবে একটির পর একটি ভাঙ্গিবে। ১৮ই সেপ্টেম্বর হাজরা পার্কে এলেনবেরীর ৩টি কারখানারই শ্রমিকেরা এক সভায় জড়ো হন। তাঁহারা 'লক-আউট' তুলিয়া নিবার দাবী জানান। সঙ্গে সঙ্গে দাবী করা হয়, 'লক-আউটে'র পিরিয়ডের পুরা বেতন দিতে হইবে।

এলেনবেরীর বীর শ্রমিক

'লক-আউটের' ফলে ১৭০০ শ্রমিক বেকার আছেন। কল ওটাইয়া মালিক টাকা বাঁচাইবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে, এলেনবেরীর শ্রমিক কোনদিনই তাহা মাথা পাতিয়া নেন নাই। এই লক-আউটের বিরুদ্ধেই গত জুন মাসে শ্রমিকদের তালা ভাঙ্গিয়া কারখানা অধিকার ও চালু করার ইতিহাস পশ্চিম বাংলার শ্রমিক সংগ্রামে গৌরবের স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

বিধান-সরকার নিরস্ত্র শ্রমিকদের অপূর্ব্ব প্রতিরোধ সেদিন সশস্ত্র ফৌজ দিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। যোধপুরের নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

এলেনবেরীর শ্রমিকদের মিছিল সেই বন্দী-নেতাদের মুক্তির দাবীতেও মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

লালঝাণ্ডার প্রতিষ্ঠা

এলেনবেরীর শ্রমিকরা তাঁহাদের সংগ্রামের পুরোভাগে এবার লালঝাণ্ডাকেই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইয়াছেন। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য াই এই স্পষ্টতা ও দৃঢ়তা আসিয়াছে। 'কারখানা ৩ দিনের মধ্যে খুলিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব' বলিয়া জনপ্রতি ১৷৷০ টাকা মোট প্রায় ১৷৷০ হাজার টাকা তুলিয়া 'জাতীয়' টি-ইউর নেতা তারক ব্যানার্জি উধাও হইয়াছেন।

এলেনবেরীর জঙ্গী শ্রমিক এখন জানেন, 'লক-আউট' তোলা, ছাঁটাই রোখা, পুরা বেতন, পূজা বোনাস ও বন্দী মুক্তির দাবী আদায়ের একই পথ—লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে নির্ভীক সংগ্রামের পথ।

আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সরকারী হামলা

তীব্র প্রতিবাদের আন্দোলনের জন্য বি-পি-টি-ইউ-সি'র আহ্বান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, গত তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে পশ্চিম বাংলা সরকার একে একে সারা ভারত ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক টি-ইউ-সির কমপক্ষে চারজন কার্য্যকরী সমিতির সদস্যকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। যাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আছেন বি-পি-টি-ইউ-সির সাধারণ সম্পাদক ও এ-আই-টি-ইউ-সির সহ-সম্পাদক কমরেড অমিয় সিংহ; বি-পি-টি-ইউ-সির কার্য্যকরী সমিতির সভ্য কমরেড জহীর; এ-আই-টি-ইউ-সির কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ও বি-পি-টি-ইউ-সির কার্য্যকরী সম্পাদক কমরেড কুঞ্জবিহারী পাঠক এবং বি-পি-টি-ইউ-সির সহকারী সম্পাদক কমরেড নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য।

উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃতি ও ২৮ বৎসরের পুরাতন ভারতের সর্ব্বপ্রধান এই কেন্দ্রীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠানটি একটি সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত গণসংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানের উক্ত নেতাদিগকে বিনা অভিযোগে এবং আদালতে বিচার না করিয়াই কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে অথচ পণ্ডিত নেহরু হইতে সুরু করিয়া কংগ্রেসের প্রত্যেকটি নেতা ও মন্ত্রী বড় গলায় জাহির করিয়া থাকেন যে, আইন-সঙ্গত কোনও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধেই হস্তক্ষেপ করার তাঁহাদের কোনরূপ অভিপ্রায় নাই; আই-এন-টি-ইউ-সির মত সরকার পৃষ্ঠপোষিত প্রতিষ্ঠান এবং এ-আই-টি-ইউ-সির মধ্যে সরকারীভাবে কোনরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ বিনা কারণে উক্ত নেতাদের গ্রেপ্তার করার ভিতর দিয়া সরকারী স্তোক বাক্যের স্বরূপ ফাঁস হইয়া পড়িয়াছে। এই গ্রেপ্তার হইতে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, সরকার প্রকৃতপক্ষে এ-আই-টি-ইউ-সি ও ইহার প্রাদেশিক শাখাগুলিকে এখন আর তাহাদের বিধিসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতে দিতে প্রস্তুত নয়। অপর পক্ষে পুঁজিপতিদের দালাল কুখ্যাত আই-এন-টি-ইউ-সি যাহাতে 'প্রতিনিধিত্বমূলক' শ্রমিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে জাহির করিতে পারে তাহার জন্য দমনমূলক আইনের সাহায্যে এ-আই-টি-ইউ-সি'কে ধ্বংস করিয়া রাস্তা সাফ করা হইতেছে। শ্রমিক সম্পর্কিত ব্যাপারে ইহাই হইল কংগ্রেসী গণতন্ত্রের নমুনা।

বিবৃতিতে আরো বলা হইয়াছে যে, উক্ত আটক নেতাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনের নজির খাড়া করা যাইবে না, রায়-মন্ত্রিসভা ইহা জানে বলিয়াই ইহাদিগকে আদালতে বিচারার্থ হাজির করার সাহস তাহাদের নাই; এই কারণেই ইহাদের স্বাধীনতা হরণের জন্য বর্ব্বর নিরাপত্তা আইন ও বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টের আশ্রয় লইতে হয়। "বি-পি-টি-ইউ-সি'র উদ্যোগে সম্প্রতি প্রাদেশিক ক্ষেতমজুর সম্মেলন ও সারা ভারত রেলশ্রমিক সম্মেলন হইয়া গেল, অল্পদিনের মধ্যে শান্তি সম্মেলনও হইবে, রায় মন্ত্রিসভা আশা করিয়াছিল যে, এই সব গ্রেপ্তারের দ্বারা বি-পি-টি-ইউ-সি'কে ভয় দেখান ও ইহার কাজে বাধা দেওয়া চলিবে, কিন্তু গবর্নমেণ্টের এই আশার মুখে ছাই পড়িয়াছে, দুটি সম্মেলনই সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ-আই-টি-ইউ-সি ও বি-পি-টি-ইউ-সি'কে দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন করার সরকারী আশাও ব্যর্থ হইতে বাধ্য, দমননীতি ও সন্ত্রাসের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা অতীতেও যায় নাই, ভবিষ্যতেও যাইবে না কারণ ইহার মূল হইল শ্রমিকশ্রেণীর অন্তরের মধ্যে, সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সস্নেহে ইহার কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়াছে, হহারই পতাকাতলে দাঁড়াইয়া আজ তাহারা সরকার ও মালিকশ্রেণীর বেতন হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি ও ছাঁটাই নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রাম করিতেছে।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া অবিলম্বে ও বিনাশর্ত্তে শ্রমিক আন্দোলনের এই নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়াছেন এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, প্রত্যেকটি কারখানা ও আফসের শ্রমিক-কর্ম্মচারী, প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক জনসংগঠনকে আহ্বান জানাইয়াছেন; সভা সমিতি মারফৎ রায়-মন্ত্রিসভার এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়া শ্রমিক নেতাদের মুক্ত করিতে সরকারকে বাধ্য করুন।

মঞ্জিল

বরিশাল ডকে বোনাসের দাবীতে ম্যানেজার ঘেরাও

বিলাতী কোম্পানীর পক্ষে দালাল শ্রমিকনেতা ফয়েজ আহমদ

বরিশালে ৬ শত ডক শ্রমিকের মধ্যে বোনাসের দাবীতে তীব্র বিক্ষোভ চলিতেছে। এই দাবীতে তাঁহারা গত কয়েকটি দিনের মধ্যে দুইবার বড় সাহেবদের ঘেরাও করেন।

বরিশালের এই ডকটি আর-এস-এন ও আই-জি-এন বিলাতী ষ্টীমার কোম্পানীর অধীনে একটি বিরাট লাভজনক একচেটিয়া ব্যবসা।

এই বিলাতী কোম্পানীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিক্ষোভেও পাকিস্তানের দালাল 'শ্রমিক নেতা' ফয়েজ আহমদ অস্থির হইয়া পড়েন। তিনি ঢাকা হইতে বরিশাল ছুটিয়া আসিয়া শ্রমিকদের এক মিটিং ডাকেন। সেখানে বোনাসের দাবীতে শ্রমিকদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মিঃ ফয়েজ আহমদ সোজাসুজি ধর্ম্মঘটবিরোধী কোন কথা বলিতে সাহস করেন না। ঘুরাইয়া জড়াইয়া বলিতে থাকেন যে, বোনাসের দাবী না মানিল অবশ্যই 'ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা হইবে।' কিন্তু সেজন্য কোন ব্যবস্থার বদলে তিনি মালিক পক্ষের সঙ্গেই কী সব কথাবার্ত্তা বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

এই মিটিং-এর পরই আবার যুক্ত বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দিন আহমদ বরিশালে আসিয়া শ্রমিকদের সভা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বোনাসের দাবী ও ধর্ম্মঘটের কথা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে শ্রমিকরা আগেই বলিয়া দিয়াদেন যে, তাঁদের ধর্ম্মঘট-সংগ্রামে যাহারা সাহায্য করিতে রাজী নহেন, এমন কাহাকেই তাঁহারা নেতা বলিয়া স্বীকার করেন না।

পূর্ব্ববঙ্গে লিয়াকত আলির সফর

নুরুল আমিন-লিয়াকত কোম্পানীর বিরুদ্ধে জনতার চার্জ্জশীট

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি ১০ই অক্টোবর পূর্ব্ববঙ্গ শফরে আসিতেছেন। কমনওয়েলথ দাসখতে স্বাক্ষর করিয়া আসার পর ইহাই তাহার প্রথম শফর।

মজুরশ্রেণী ও মেহনতী জনসাধারণের উপর পূর্ব্ববঙ্গে যে চরম আক্রমণ চলিয়াছে তাহা বন্ধ করার জন্য নয়, আরও নূতন আক্রমণের জন্য, নুরুল আমিন মন্ত্রীসভাকে অপসারণ করিয়া জনতার দাবি মিটাইবার জন্য নয়, নুরুল আমিনের গদি নিরাপদ করার জন্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারের জন্য নয়, তাহার আরও সংকোচ করার জন্য, দমননীতির নিষ্পেষণ থামাইবার জন্য নয়, ফ্যাসিস্ট বর্ব্বরতার দ্বারা জনতাকে চূর্ণ করার আরো মজবুত ব্যবস্থার জন্য, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারি ও ঔপনিবেশিক শোষণ-ব্যবস্থা আরও পাকা করার জন্য শোষিত পূর্ব্ববাংলায় লিয়াকতের এই অভিযান।

তাই পূর্ব্ববঙ্গের ধনিকশ্রেণী ইস্পাহানী, দাদা, হানিফ, সূর্য্য বোস, রণদা সাহার দল লিয়াকতের সম্বর্দ্ধনার জন্য মৃতদেহের লোভে শকুনির মত নৃত্য করিতেছে। পরিষ্কার ভাবে কিন্তু লীগ-শাসনের দুই বছর পূর্ব্ববঙ্গকে দুই ভাগ করিয়া দিয়াছে। শতকরা নব্বুইজনের পূর্ব্ববঙ্গ লিয়াকতের সম্বর্দ্ধনায় সামিল হইবে না।

লিয়াকতের খাদ্য সরবরাহের ধোকাবাজি

লিয়াকত আলি আজ যখন পূর্ব্ববঙ্গ আসিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে ঢাকায় চাউলের দর ৪৮৲ টাকা (আজাদ ২৫শে সেপ্টেম্বর), রংপুরে ৫০৲ টাকা, গাইবান্ধায় ৬০৲ টাকা, যশোহরে ৪৫৲ টাকা। খুব বেশী বাড়তি জেলা দিনাজপুর বা খুলনাতেও ৩৫৲ টাকার কমে চাউল নাই—এসব জেলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের বছরেও এত দর উঠে নাই।

লিয়াকত আলি বছরের প্রথম দিকে ধান-সীজের বেলায় গাল-ভরা আশ্বাস দিয়াছিলেন: ভয় কি, করাচী হইতে খাদ্য দিব। আজ লক্ষ লক্ষ খেতমজুর ও গরীব চাষী যখন বালবাচ্চাকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টায় ভিটা, জমি যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া ধান বা চাউল কিনিতেছে, গোটা পূর্ব্ববঙ্গের বুভুক্ষু নরনারী যখন এমনি কঠোর মূল্যে লীগ-শাসনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের ঋণ শোধ করিতেছে, তখনই যে কথা তাহাদের রুদ্ধ-কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে তাহা এই:—

লিয়াকত আলি আমাদের ধোঁকা দিয়াছে, প্রতারণা করিয়াছে। পাকিস্তানী শাসনে গোটা পূর্ব্ববঙ্গ গরীবের গোরস্তানে পরিণত হইয়াছে। সেই গোরস্তানে নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কবর ও শ্মশানের পাশে দাঁড়াইয়া ৬০ হাজার গ্রামের খেতমজুর ও গরীব চাষীরা শপথ লইতেছে—**দনিক শ্রেণীর এই বেইমানী ও ধোঁকাবাজি তাহারা ক্ষমা করিবে না: প্রতিশোধের সংকল্প ঘোষণা করিয়া তাহারা লিয়াকতকে সম্বর্দ্ধনা জানাইবে।**

মজুরশ্রেণীর দুঃমনিতে লিয়াকত আলি

লিয়াকত আলির শাসন মজুরশ্রেণীর চোখ খুলিয়া দিতেছে। সাধের পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর হইয়া বাংলা ও

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

প্রেসিডেন্সি জেলে অনশন ধর্ম্মঘটের প্রকৃত তথ্য

মহাশয়,

প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দীদের সাম্প্রতিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তাই এ-সম্পর্কে আপনার কাগজ মারফৎ দেশবাসীকে জানান কর্ত্তব্য মনে করি।

৮ই জুন জেলের মধ্যে গুলি চালনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি কর্ত্তৃপক্ষ দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে এই 'তদন্ত' করিবেন সরকারেরই একজন বড় কর্ম্মচারী। চোরকে দারোগা করিয়া চুরি ধরার প্রহসন স্বভাবতই আমরা স্বীকার করি নাই। 'তদন্ত'-কারকরা ১৬ই সেপ্টেম্বর 'তদন্ত' করিতে আসিলে আমরা সেদিন প্রতিবাদে অনশন করি এবং তাহাদের ফিরাইয়া দেই; আওয়াজ তুলি যে 'নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি চাই'।

কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের এই সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত দাবীর জবাব দেন। ১৭ই তারিখ হইতে ৭দিন শাস্তি হিসাবে আমাদের আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করা প্রভৃতি সমস্ত সুযোগ সুবিধা কাটা গেল!

২রা অক্টোবর

বাধ্য হইয়া আমাদের ঘোষণা করিতে হয় যে এই বে-আইনি আদেশ প্রত্যাহার না করা পর্য্যন্ত আমরাও প্রতিবাদে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিব। ১৭ই তারিখ হইতে আমাদের এই ধর্ম্মঘট সুরু হয়।

জেলকর্ত্তৃপক্ষ আমাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করা তো দূরে থাক, ১৮ই তারিখ আর এক আদেশ জারি করিয়া আমাদের সুবিধাগুলি আরও একমাসের জন্য কাটিয়া লইলেন। আমরাও জানাইয়া দিলাম যে আমাদের ধর্ম্মঘট চলিতে থাকিবে।

অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতাম যে, কর্ত্তৃপক্ষ বলপ্রয়োগে আমাদের পরস্পরের নিকট হইতে সরাইয়া লইবার এবং এইভাবে আমাদের মনোবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবে। আমরাও এই বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করিলাম।

জেল কর্ত্তৃপক্ষ পাগলাঘন্টি বাজাইয়া আমাদের ইয়ার্ডে জোর করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা এবং দৃঢ়তার ফলে দরজা হইতেই তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইল।

আমাদের এই বেয়াদপীর শাস্তি হিসাবে আমাদের খাদ্যভাতা ও মাসিক ভাতা একমাস ও চৌদ্দ দিনের জন্য কমাইয়া দেওয়া হইল।

কর্ত্তৃপক্ষ গায়ের জোরে আমাদের আলাদা আলাদা সেলে বন্ধ করিবেন, আমারাও কিছুতেই তাহা হইতে দিব না। ৩০ঘণ্টা এইভাবে চলিল।

অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিলেন যে গায়ের জোরে বা শাস্তির ভয়ে দমিবার পাত্র আমরা নই। ২৭শে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখিতভাবে জানাইয়া দিলেন যে আমাদের বিরুদ্ধে এ সমস্ত শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করা হইল। তখন, ২৭শে তারিখ সন্ধ্যায় আমরা অনশন ভঙ্গ করি।

জনৈক সত্যমুক্ত
বন্দী

দমদম জেলের ওয়ার্ডারের মৃত্যু

মহাশয়,

গত ২২শে সেপ্টেম্বর দমদম জেল হাঁসপাতালে ওয়ার্ডার শ্রীচিত্ত ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস সাধারণের নিকট প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করি।

মৃত্যুর দুইসপ্তাহ পূর্ব্বে চিত্তবাবু অসুস্থ হন। কিন্তু জেলকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি না করিয়া, উপরন্তু ডিউটি চাপাইয়া দেন। পরে অসুখ বাড়িয়া গেলে তাঁহাকে জেল হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

দমদম জেল-হাঁসপাতাল যে হাঁসপাতাল নামেরই অযোগ্য সেকথা সেখানকার রাজনৈতিক বন্দীরা বারবার সরকার ও দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। চিত্ত বাবুর মৃত্যু সেই কথাই আর একবার প্রমাণ করিল।

চিত্তবাবুর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভাই বারবার হাঁসপাতালের ডাক্তারদের অনুরোধ করেন যে রোগীকে বাহিরের কোন হাঁসপাতালে পাঠান হোক। তাহার জন্য খরচ দিতেও তিনি রাজি ছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সেকথা না শুনিয়া চিত্তবাবুর ভাইকেই হাঁসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দেন।

মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে চিত্তবাবুর স্ত্রী তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে কর্ত্তৃপক্ষ সে অনুমতিও দিতে অস্বীকার করেন। ফলে মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে দেখার সান্ত্বনাটুকু হইতেও চিত্তবাবুর স্ত্রী বঞ্চিত হইয়াছেন।

এইসব ঘটনার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে চিত্তবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

রায় মন্ত্রিসভা কি দয়া করিয়া (১) চিত্ত বাবুর মৃত্যু সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা (২) মৃতের আত্মীয়স্বজনের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং (৩) ভবিষ্যতে ওয়ার্ডারদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন?

সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জি,
দমদম।

টাকা, চিঠি ও রিপোর্ট পাঠানোর নাম ও ঠিকানা

মঞ্জিলের এজেন্ট ও গ্রাহকদের প্রতি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

'মঞ্জিলে'র জন্য টাকা, চিঠিপত্র ও রিপোর্ট পাঠাইবার একমাত্র নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হইল।

এজেন্টদের কাছে অনুরোধ এই সংখ্যা কাগজ পৌঁছামাত্র নিজেরাই হিসাব করিয়া বাকী-বকেয়া টাকা পাঠাইয়া দিবেন। বিলের জন্য অপেক্ষা করিবেন না।

সুধীর সেন
২৪ নুর মহম্মদ লেন।
কলিকাতা—৯

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—

'নিরপেক্ষতা,' 'আন্তর্জ্জাতিকতা,' 'শান্তিপ্রিয়' যুদ্ধ

সারা দুনিয়ার মতো ভারতের সাধারণ মানুষও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। তার জন্যেই সাম্রাজ্যবাদ বা যুদ্ধের সমর্থনে সরাসরি কোন কথা বলা আজ আর সহজ নয়। একথা এ দেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যে ভালভাবেই জানেন তা তাঁর গত ৫ই আগষ্টের বিবৃতি থেকেও বুঝতে পারা যায়।

গত দু'বছর থেকেই পণ্ডিতজী বলে আসছেন আমরা নিরপেক্ষ, আমরা বিশ্বশান্তির পক্ষে। যুদ্ধমান দুই শিবিরের কোন শিবিরেই আমরা নেই।

দুই শিবির বলতে তিনি কাকে কাকে বুঝাতে চান তা কারো অজানা নেই।

সোভিয়েট নেতৃত্বে গণতন্ত্রের এবং শান্তির যে শিবির গড়ে উঠেছে; আর মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের এবং যুদ্ধের যে শিবির দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে পণ্ডিতজীদের বাছাই করার কিছু নেই।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নিরপেক্ষ? কেন? কবে থেকে আমরা নিরপেক্ষ? যারা মালয়ে শ্রমিক ভাই গণপতিকে হত্যা করেছে তাদের সম্পর্কে কেন আমরা নিরপেক্ষ থাকবো?

নেহরুর নিরপেক্ষতা'—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা

কিন্তু সে প্রশ্ন অবান্তর। আসলে পণ্ডিতজী যাকে নিরপেক্ষতা বলে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থিত করেছেন তা নিরপেক্ষতা নয়, সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে স্থান গ্রহণ করেছেন একথা এখনো জোর গলায় প্রচার করা বিপজ্জনক; কারণ জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো হাজারো অত্যাচারের স্মৃতি এখনো মুছে যায়নি। তাই, সাধারণ মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সামনে আত্মরক্ষার ধর্ম হলো এই নিরপেক্ষতার নামাবলী।

একে নিরপেক্ষতা বলবে কে?

গত বছর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সোভিয়েট যখন প্রস্তাব আনল যে এটমবোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক, আর বৃহৎ শক্তিগুলোর সমরসজ্জা তিনভাগের একভাগ অন্তত কমান হোক, তখন নেহরুর প্রতিনিধি 'মাঝামাঝি' প্রস্তাবের নামে সোভিয়েটের সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিল। শুধু এই ব্যাপারেই নয়। জাতিসংঘের প্রত্যেকটী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সময় 'নিরপেক্ষ' নেহরুর প্রতিনিধিদের সুশিক্ষিতভাবে দেখা যায় মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের পিছনে।

একে নিরপেক্ষতা বলবে কে? বর্ম্মায় বৃটিশ মূলধনের একচেটিয়া শোষণকে বাঁচানোর জন্যে পণ্ডিতজী প্রতিদিন বার্ম্মারোডে অস্ত্র পাঠাচ্ছেন; মালয়ের রবার বাগানে বৃটিশ মূলধনের অবাধ শোষণ কায়েম রাখার জন্যে গুর্খা ফৌজ ও পাঞ্জাবী পুলিস পাঠাচ্ছেন; ভারতীয় বিমান ঘাঁটি ও বন্দর থেকে ইন্দোচীনে বিদেশী ফৌজ পাঠানো হচ্ছে। লড়াইয়ের রসদ পাঠানো হচ্ছে। কোরিয়া এবং জাপানের বুক থেকে বিদেশী মার্কিন ফৌজ অপসারণেও পণ্ডিতজীরা বিরোধিতা করছেন; একে যদি নিরপেক্ষতা বলতে হয় তবে সহযোগিতা বলবে কাকে?

কেউ যদি ভেবে থাকেন পণ্ডিতজীর নিরপেক্ষতা মানে উভয় শিবিরের সাথে সমান সহযোগিতা তাঁকেও হতাশ হতে হবে। বর্ম্মা ও ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা নিয়ে সেদিন দিল্লীতে বৈঠক বসলো; পণ্ডিতজীর আমন্ত্রণে সুদূর তুরস্ক থেকে ফিলিপাইনের মার্কিনভক্ত প্রতিনিধিরা পর্য্যন্ত সেবৈঠক উপস্থিত হলেন; শুধু আমন্ত্রিত হলেন না সোভিয়েট এসিয়ার প্রতিনিধি। বর্ম্মা ও ইন্দোনেশিয়াকে ইঙ্গ-মার্কিন-ডাচ সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিক্রি করার প্রস্তাবে সোভিয়েট এসিয়ার প্রতিনিধি কখনো সায় দিতে পারেন না—পণ্ডিতজী তা দেখেছেন জাতিসংঘে, দেখেছেন ইকাফের বৈঠকে। তাই, তাঁদের সযত্নে বৈঠক থেকে বাদ দেওয়া হলো।

সেবৈঠকে শুধু কি নিরপেক্ষতার মুখোসই খুলে পড়েছিল? সোভিয়েট ও যুক্তচীনের বিরুদ্ধে, এসিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সেদিনকার সে বৈঠকে স্থির হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ কৌশল। এবং সে আক্রমণের নেতা নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন "নিরপেক্ষ" পণ্ডিত নেহরু।

"আত্মরক্ষার" মিথ্যা ভাঁওতা

কিন্তু সাধারণ মানুষের কানে সে কথা খুলে বলার উপায় নেই। সাধারণ মানুষ পরদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে বা সোভিয়েট দেশ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণকে সমর্থন করবে না। তার জন্যেই পণ্ডিতজীকে "নিরপেক্ষতা"র মতো বুলি খুঁজতে হয়, আক্রমণের প্রস্তুতিকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি বলে চালাতে হয়। এবং আত্মরক্ষার প্রস্তুতির নামে বাজেটের বেশীর ভাগ টাকা সামরিকখাতে বরাদ্দ করতে হয়।

ভবিষ্যত আক্রমণকারী কে? নেহরুজী কার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যেক ভারতবাসীর মাথাপিছু সাড়ে ছয় টাকা আজ খরচ করছেন?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে? তা হলে পণ্ডিতজী বৃটিশ কমনওয়েলথ-এ স্থান গ্রহণ করতেন না। তা হলে বৃটিশ সম্রাটের জন্মদিনে এখানে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ানো হতো না। তা হলে ভারতীয় সৈন্যদলে, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বৃটিশ অফিসারদের এখনো মোটা বেতনে পোষা হতো না; তা হলে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ কিনে ভারতের বন্দরে রাখা হতো না। তা হলে বৃটিশভক্ত আই-সি-এস থেকে যাঁদের এখনো সরকারী শাসনযন্ত্রের সর্ব্বত্র স্থান দেওয়া হতো না। তা হলে ভারতের অর্থনৈতিক চাবিকাঠি, সমস্ত মূলশিল্প এখনো বৃটিশ মালিকদের হাতে রেখে দেওয়া হতো না।

তবে পণ্ডিতজীর আত্মরক্ষার প্রস্তুতি কি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ সম্ভাবনা লক্ষ্য করে? তা হলে মার্কিণ সামরিক মিশনকে কাশ্মীরে ডেকে আনা হলো কেন? নেপালে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি তৈরী করার সুযোগ দেওয়া হলো কেন? তা হলে ভারতীয় সামরিক অফিসাররা ট্রেনিং নেবার জন্যে আমেরিকা ও কানাডায় যাচ্ছেন কেন? তা হলে ভারতীয় গোয়েন্দা অফিসাররা মার্কিণ গোয়েন্দা বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন কেন? তা হলে ভারতের রেল, কৃষি; সংবাদপত্র, রেডিও সর্ব্বত্র যাতে ডলারের প্রভুত্ব কায়েম হয় তার জন্যে কোটি কোটি ডলার আমদানী করা হচ্ছে কেন? ডলার আমদানীর জন্যে শিল্প জাতীয়করণ স্থগিত রাখা হচ্ছে কেন? ডলারের সাহায্যে আরো বেশী যুদ্ধ শিল্প তৈরীর আয়োজন হচ্ছে কেন?

আত্মরক্ষা পর্ত্তুগীজ বা ফরাসী ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধেও নয়। তা হলে ভারতে ফরাসী এবং পর্ত্তুগীজদের ঘাঁটিগুলি আজও দাঁড়িয়ে থাকতো না। পণ্ডিতজীর পুলিস ও সৈন্যরা সযত্নে তাদের রক্ষা করতেন না। আত্মরক্ষা পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধেও নয়। তা হলে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে তারা এত সহজে কাশ্মীর বিভাগে রাজী হতো না; তা হলে পাক-বর্ম্মার সীমান্তে যুদ্ধ ঘাঁটি তৈরী করার জন্যে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এতখানি সহযোগিতা দেখা যেতো না, গবর্ণর কাটজু এ অসময়ে চট্টগ্রাম ভ্রমণে বের হতেন না।

নেহরুর আত্মরক্ষা আক্রমণের প্রস্তুতি

না, প্রস্তুতি চলেছে সোভিয়েটকে আক্রমণের জন্যে, চীন ও এসিয়ার গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে! তার জন্যেই কাশ্মীর ও কাটামুণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে মার্কিণ সমর নায়কদের বসানো হয়েছে; বৃটিশ অফিসার রিচার্ডশনকে তিব্বতে পাঠানো হয়েছে। তার জন্যেই ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী মহলে পণ্ডিতজীর ধন্যি ধন্যি সুরু হয়েছে। মার্কিণ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের জঙ্গীলাটকে সর্ব্বোচ্চ উপাধি বিতরণ করা হয়েছে।

জারশাহী খতম হবার পরদিন থেকেই সোভিয়েট ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করে আসছে। পণ্ডিতজীরা যেদিন ভারতকে তোজো-হিটলারের হাতে তুলে দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেদিনও সোভিয়েট দেশই ভারতের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে। আজও জাতিসঙ্ঘে এবং তার বাইরে সোভিয়েট দেশই ভারতের জনগণের স্বার্থরক্ষা করছে; দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তার জন্যেই ভারতের সাধারণ মানুষ এতখানি সোভিয়েট দরদী। তাকে সহজে একথা বুঝানো সম্ভব নয় সোভিয়েট আমাদের আক্রমণ করবে। তাই, আত্মরক্ষার নামেই তাকে আক্রমণের প্রস্তুতি চলেছে।

নেহরুর 'আন্তর্জ্জাতিকতা'—মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ববরণ

আজকের দুনিয়ায় সাধারণ মানুষ বিচ্ছিন্ন থাকার পক্ষপাতি নয় একথাও পণ্ডিতজীর জানা আছে। তা হলে সোভিয়েট ও গণতন্ত্রের শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে রাখবার উপায় কি? তার জন্যে পণ্ডিতজী কি কৌশল গ্রহণ করেছেন।

তিনি নিজেকে জাহির করছেন আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী হিসেবে। আন্তর্জ্জাতিকতার যুক্তিতেই তিনি বৃটিশ কমনওয়েলথএ আর হাভনার মার্কিনী ট্রেডচার্টারে যোগ দিয়েছেন; আন্তর্জ্জাতিকতার যুক্তিতেই তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় বুদ্ধচুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্যে এখন ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন। পণ্ডিতজীর আন্তর্জ্জাতিকতার অংশীদার কারা? অংশীদার দক্ষিণ আফ্রিকার মালান—যার ফ্যাসিস্ট শাসনে কালোআদমী বলেই ভারতীয়রা খুন হচ্ছে। অংশীদার অষ্ট্রেলিয়ার ইভাট—যাদের দেশ থেকে ভারতীয়রা কালোআদমী বলেই বিতাড়িত হচ্ছে।

নেহরুর আন্তর্জ্জাতিকতায় মিলানের বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কোন স্থান নিশ্চয়ই থাকতে পারে না। কারণ সেখানে আলোচিত হয়েছে শ্রমিকের বেকারী বন্ধ করার কথা, মজুরী বাড়ানোর কথা, দমননীতি ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতার কথা। নেহরুর আন্তর্জ্জাতিকতায় স্থান আছে লণ্ডন-ওয়াশিংটন-ষ্টকহলম্ সম্মেলনের। কারণ সেখানে আলোচিত হয়েছে শ্রমিকের মজুরী কাটার কথা, যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা। এবং সে আন্তর্জ্জাতিকতার ফলে এদেশের জনগণের উপরে চাপানো হয়েছে মুদ্রামূল্য হ্রাসের বোঝা, মার্কিন ধনিকদের স্বার্থে জিনিষ পত্রের দর বাড়ানো হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ।

"নিরপেক্ষ" এবং "শান্তিপ্রিয়" পণ্ডিতজীর গবর্নমেণ্ট এদেশ থেকে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠানো নিষিদ্ধ করেছেন; কিন্তু মার্কিন এ-এফ-এল-এর প্রতিনিধিরা এদেশে বসে অফিস খুলে যুদ্ধের প্রচার চালাবে, অজস্র ডলার ঢেলে শ্রমিক

মজিল

প্রতি
বিরুদ্ধে
ছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম

আন্দোলনে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জির দালাল তৈরী করবে, শ্রমিকঐক্যে ভেদ সৃষ্টি করবে, শ্রমিকদের মধ্যে যুদ্ধের প্রচার চালাবে তাতে কোন বাধা নেই। সোভিয়েট ও প্রগতি সাহিত্যের কেন্দ্রগুলিকে পণ্ডিতজী বন্ধ করে দিচ্ছেন। সোভিয়েট ফিল্মে শান্তি ও সাম্যের প্রচার বন্ধ করছেন। কিন্তু মার্কিন ফিল্ম ও মার্কিন সাহিত্যের মারফতে ধনতন্ত্রের গুণগান প্রচারের স্বাধীনতা থাকছে অক্ষুণ্ণ। পণ্ডিতজীর আন্তর্জাতিকতা ভারতকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে সোভিয়েট নয়া গণরাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে, ভারতের দুয়ার মুক্ত করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের জন্যে তাদের গোয়েন্দা ও যুদ্ধ প্রচারকদের জন্যে। পণ্ডিতজীর আন্তর্জাতিকতা এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বজয়ের পথ খুলে দিচ্ছে, ভারতকে মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করছে।

নেহরুর 'দেশ রক্ষা'—টাটা বিড়লার মুনাফা রক্ষা

কিন্তু মার্কিন মনিবদের 'একচেটিয়া' রাজত্ব তৈরী করার জন্যে পণ্ডিতজী যেমন আন্তর্জাতিকতাবাদী, আবার 'টাটা-বিড়লার' স্বার্থের খাতিরে তিনি তেমনি কট্টর জাতীয়তাবাদী। টাটা-বিড়লার করেও সেদিন মানুষকে বেঁচে থাকবার জন্যে লড়তে হয়েছে, নিজের সন্তানের হাত থেকেও অন্ন কেড়ে নিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে হয়েছে। আর লক্ষ লক্ষ মরা মানুষের হাড় বিক্রি করে মুনাফা করেছে টাটা-বিড়লা-ডালমিয়ার দল; মুনাফা করেছে ওয়াকার-স্টীল ব্রাদার্সের দল, পণ্ডিতজীর জমিদার-জোতদার বন্ধুর দল।

অবাধ মুনাফা—অবাধ শোষণ অবাধ জুলুম

যুদ্ধ যেমন অবাধ মুনাফার সুযোগ, তেমনি সুযোগ টাটা-বিড়লা-ওয়াকার সাহেবদের মুনাফা রক্ষার জন্যে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেবার। ভারত-রক্ষা আইনকে কি কেউ কখনো ভুলতে পারে? তাতে শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া থেকে শুরু করে কৃষকের ফসল, জমি ও বাড়ীঘর কেড়ে নেয়া পর্যন্ত এমন কোনো অত্যাচার নেই যা করা হয়নি।

আজও আবার সে অবস্থাই সৃষ্টি হচ্ছে কালো কানুনের সাহায্যে। বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা মার্কিন মূলধন ও টাটা-বিড়লার বুদ্ধ-ঘাঁটিকে নিরাপদ রাখছেন পশ্চিম পেতে পারে কিন্তু শুধু টাকায় তো আর যুদ্ধ হয় না। পণ্ডিতজীর সাঙ্গপাঙ্গরা আপশোষ করছেন, এদেশের নওজোয়ানেরা যুদ্ধের জন্য সৈন্যদলে নাম লিখাতে চাচ্ছে না, ট্রুম্যান ও টাটা-বিড়লার মুনাফার জন্যে জান দিতে চাচ্ছে না। সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়েও যখন তাদের টানা যাচ্ছে না তখন তারা প্রদেশে প্রদেশে শফর করে সৈন্যজীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের কথা প্রচার করছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় তারা ছাত্রদের সামনে সৈন্যজীবনের লোভনীয় ভবিষ্যত তুলে ধরছেন। দেশভক্ত ছাত্র ও যুবকদের সংগ্রহ করতে না পেরে তারা আর-এস-এস নেতাদের মুক্ত করে দিয়েছেন; এখন আর-এস-এসদেরই দলে দলে সৈন্য দলে ভর্তি করছেন।

তারাই তেলেঙ্গানার রণক্ষেত্রে, ৯ই মার্চের মতো সাধারণ ধর্মঘট রুখবার মধ্য দিয়ে তাদের বড় রকমের যুদ্ধের ট্রেণিং দিচ্ছেন। যেমন করে হিটলার একদিন ট্রেণিং দিয়েছিল তার ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে স্পেনের রণক্ষেত্রে।

কিন্তু পণ্ডিতজী সেকথা খোলাখুলি বলতে পারেন না কেন? কেন তিনি ময়দানে দাঁড়িয়ে আজ একথা বলতে সাহস করেন না যে হিটলারের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন চুরমার হলেও তার মনিব ট্রুম্যানের বিশ্বজয়ে তিনি হলেন এশিয়ায় প্রধান সাকরেদ? কেন তিনি একথা বলতে সাহস করেন ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক ভাইও দেবো না, এক পাইও দেবো না।

এ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহ্যই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রেরণা দিয়েছিল ফ্যাসিস্ট হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। কংগ্রেস নেতারা যখন হিটলার-তোজোর বিজয় কামনা করছিল একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই তখন সোভিয়েটের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। হিটলার-তোজোর পরাজয়ে দুনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা পেয়েছে, সোভিয়েট দেশের শক্তি বেড়েছে নয়া গণরাষ্ট্র তৈরী হয়েছে চীনে এবং সমগ্র পূর্ব ইয়োরোপ জুড়ে, দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ঐক্য গড়ে উঠেছে, ভিয়েৎনামের সমর্থনে কলিকাতার রাজপথে ছাত্র ও শ্রমিকের সংগ্রাম চলেছে, ইন্দোনেশিয়ার সমর্থনে লাহোরের রাজপথে লড়াই চলেছে। সংগ্রাম গৃহযুদ্ধে রূপ নিয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি বেড়েছে বলেই সাম্রাজ্যবাদী শিবির আজ এত আতংকিত। শ্রমিকের মজুরী কাটা, তাকে কথায় কথায় ছাঁটাই করা সহজ হচ্ছে না বলেই সাম্রাজ্যবাদী শিবির তার সংকটের বোঝা শ্রমিক জনতার উপর চাপাতে পারছে না। তারজন্যেই তার রাষ্ট্র আজ পুলিসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে; যুদ্ধের মধ্যে সে বাঁচবার পথ খুঁজছে। এটা তার শক্তির পরিচয় নয়—তার অন্তিম রোগের চিহ্ন।

মিলান, প্রাগ ও প্যারী সহর থেকে দুনিয়ার শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-কামীদের জানিয়ে দিয়েছে তাঁদের যুদ্ধের পরিকল্পনাকে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র প্রত্যেকটি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষই বাধা দিয়ে ব্যর্থ করবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-পাগলরা যদি সোভিয়েট দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে তবে শ্রমিকশ্রেণী সোভিয়েট লালফৌজকে সাহায্য করবে সাম্রাজ্যবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে; যেমনভাবে তারা একদিন লালফৌজকে সাহায্য করেছিল হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর-দলকে; শ্রমিক-শ্রেণী বাধা দেবে বার্মায় মুক্তিসেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পাঠাতে, মালয়ে সৈন্য পাঠাতে। : টাটা-বিড়লার শাসন ও শোষণের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম এক এবং অভিন্ন হয়ে যাবে দুনিয়ার মুক্তি যুদ্ধের সাথে, দুনিয়াকে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করার সংগ্রামের সাথে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর বেঁচে থাকার সংগ্রাম—এ আওয়াজ আতংকিত করে তুলছে পণ্ডিতজী এবং তাঁর বিধান নলিনী মন্ত্রিসভাকে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম—এ আওয়াজ আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠুক, অপরাজেয় হয়ে উঠুক কোটি কোটি নাগরিকের কণ্ঠে।

তার আড়ালে টাটা বিড়লা নেহরু সরকারের প্রস্তুতি

মুনাফা বিপন্ন হলে পণ্ডিতজী চিৎকার করে উঠেন—দেশ বিপন্ন, টাটা-বিড়লার শোষণের সামান্য বিরোধিতা করলে পণ্ডিতজীর কাছে সে হলো দেশদ্রোহী। টাটা-বিড়লার মুনাফা বিপন্ন বলেই পণ্ডিতজী মুনাফার এ নূতন সুযোগ তাদের জন্যে সৃষ্টি করছেন। অতিরিক্ত শোষণের ফলে সাধারণ শ্রমিক-কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা গিয়েছে কমে, টাটা-বিড়লার মালের বাজার হয়ে এসেছে সংকুচিত, তাদের কারখানা যাচ্ছে বন্ধ হয়ে, রপ্তানী থেকে আমদানী যাচ্ছে বেড়ে। শ্রমিক-কৃষকের অসন্তোষ পড়ছে ফেটে ফেটে। এ সংকট থেকে বাঁচবার এখন একমাত্র পথ হলো যুদ্ধ। তাই যুদ্ধের জন্যে বাজেটের অর্দ্ধেকের বেশী টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, আর বরাদ্দ থেকেও বেশী টাকা খরচ করে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ানো হচ্ছে।

যুদ্ধের মত মুনাফার ব্যবসায় আর কি আছে? সরকারী ঠিকেদারীর কথা বলা হচ্ছে না—সেখানে ঘুষ আর লুটের বাজার কতখানি খোলা, আই-সি-এস এস-কে ঘোষের মামলা তার উপর সামান্য আলোক পাত করেছে। খাদ্য ও বস্ত্রের দুর্ভিক্ষের কথাই বলা হচ্ছে—কারণ যুদ্ধের সুযোগে ৫০ লক্ষ ভাইবোনকে হত্যা করে ৬'শকোটি টাকা মুনাফা করার সে কলঙ্কময় ইতিহাস কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। গোরা সৈন্যের কাছে মা-বোনকে বিক্রি

২রা অক্টোবর

বাংলায় পুলিসী শাসন কায়েম করে। এখানে কারখানায় কারখানায় পুলিস পাহারা বসেছে, গ্রামে গ্রামে পুলিস ঘাঁটি তৈরী হয়েছে, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র দিয়ে জেলখানা ভর্তি করা হয়েছে; শতশত ডায়ার ওডায়ারের আবির্ভাব হচ্ছে কাকদ্বীপ, ডুবিরভেরী, বহুবাজার ষ্ট্রীট ও কলেজ ষ্ট্রিটে, আরো অসংখ্য গ্রাম ও সহরে।

যুদ্ধ টাটা-বিড়লা-ওয়াকারদের লাভজনক ব্যবসায় মার্কিন মনিবদের ছোট হিস্যাদার হয়ে সংকট থেকে বাঁচবার শেষ পথ। তার জন্যেই নেহরুজী হুকুম করেছেন, দেশ গঠনের খরচ কমিয়ে সেটাকা যুদ্ধের জন্যে খরচ করা হবে। তার জন্যেই আশ্রয়প্রার্থী শিশুর মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে সেটাকায় বিলাতী মদ আমদানী করা হচ্ছে সামরিক অফিসারদের জন্যে। তার জন্যেই স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বরাদ্দ কমিয়ে হাসপাতাল ও স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়ে সে টাকা পাঠানো হচ্ছে মার্কিন বোমা আর বিলাতী যুদ্ধ জাহাজ কেনবার জন্যে। রেল ও সরকারী অফিসের শ্রমিক কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে, কারখানায় কমমজুরীতে বেশী খাটুনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে প্রত্যেকের আসল মজুরী কেটে নেয়া হচ্ছে, দোকানদার-নাগরিকের ট্যাক্স বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে; কারণ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে টাকা চাই, আরো অফুরন্ত টাকা চাই।

শুধু টাকা নয়, বলির জন্য মানুষও চাই

পুলিস পল্টনের জোরে টাকা তারা না যে মার্কিনের গোলাম চিয়াং-কাইশেক যে কাজ করতে যেয়ে শ্রমিক-কৃষক জনতার হাতে মার খাচ্ছে সে-কাজে তিনি সফল হবেন মুষ্টিমেয় ধনিক, চোরাকারবারী ও জমিদার দেশীয়-ভূপতির সাহায্য নিয়ে তিনি এশিয়ার গণ-বিপ্লবকে ঠেকাতে পারবেন?

একথা প্রকাশ্য সভায় বলা যায় না। তারজন্য লণ্ডন-ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লীতে গোপন বৈঠকের প্রয়োজন হয়। দেশ-দ্রোহীতার ষড়যন্ত্রের জন্য প্রকাশ্য দিবালোক নয়, রাত্রির অন্ধকারের প্রয়োজন হয়।

যুদ্ধ-বিরোধী গণশক্তি আজ অপরাজেয়

কিন্তু শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র তার শান্তি গণতন্ত্রের সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা ঘোষণা করছে অসংখ্য জনসভা ও জনসমাবেশ থেকে। কারণ দেশের সাধারণ মানুষ, কোটি কোটি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে তার ঐক্য আছে।

টাটা-বিড়লার স্বার্থ নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের সাথে মিল আছে বলেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী আজ বিপুল জন-সমর্থন পাচ্ছে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল ১৯৩৯ এর ১লা অক্টোবর। কংগ্রেস নেতারা যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করছিল, বোম্বাই-এর একলক্ষ শ্রমিক সেদিন ধর্মঘট করে ঘোষণা করে-

মাদ্রাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বেআইনী ঘোষণা কংগ্রেস সরকারের ফ্যাসিস্ত প্রকৃতির নগ্ন প্রকাশ

বি-পি-টি-ইউ-সি'র বিবৃতিতে প্রতিরোধের আহ্বান

"সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বে-আইনী ঘোষণার ভিতর দিয়া কংগ্রেস সরকারের মুখোস ছিঁড়িয়া গিয়াছে—কংগ্রেস সরকারের আসল ফাশিস্ত চরিত্র একেবারে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই বে-আইনী ঘোষিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিই রেল, সূতাকল, বন্দর, সীমেণ্ট শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিকের প্রতিনিধি।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক বিবৃতিতে এইভাবে সরকারী আক্রমণের স্বরূপ খুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং অবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানাইয়া, ফাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে ডাক দিয়াছেন।

উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে ঃ

"১৯৪৬ সালে মধ্যকালীন সরকার গঠিত হইবার পর হইতে আজ তিন বছরের বেশী হইল, শ্রমিকশ্রেণী ও সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে কংগ্রেস সরকারের এমনই চূড়ান্ত হিংস্র দমননীতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। গোল্ডেন রক, অমলনির, কোয়েম্বাটুর, বিক্রমসিং-পুরম, ডিক্রুগড়, ইত্যাদি স্থানে শ্রমিকদের উপর **গুলি**; একেকটি ট্রেড ইউনিয়নের সমগ্র কার্য্যকরী সমিতিকে ও আরও হাজার হাজার শ্রমিককে **গ্রেপ্তার**; ট্রেডইউনিয়নের জঙ্গী সদস্যদের উপর **অত্যাচার**; সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সভার উপর **নিষেধাজ্ঞা**; বারবার ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর **হানা** ও ও অফিস **সাল** করা—

—যেমন, বোম্বাইয়ের গিরনি-কামগর ইউনিয়ন, গোল্ডেন রক, এস-আই রেলওয়ে লেবার ইউনিয়ন—এবং শ্রমিকের **মুখপত্রখানির কণ্ঠরোধ**—এই সবই হইল এই কয়েক বছর ধরিয়া এই সরকারের কার্য্যকলাপের স্বাভাবিক অঙ্গ। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৭ সালে তাহারা যে জাতীয় টি-ইউ-সি সভা করে, তাহাকে সর্ব্বশক্তি দিয়া তাহারা চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছে।

"এই সমস্ত জুলুমবাজ ব্যবস্থা ও জাতীয় টি-ইউ-এর দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কোনক্রমেই দমন করিতে না পারিয়া, তাহারা এবার ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সোজাসুজি বেআইনী করিয়া দিবার পথ ধরিয়াছে। সমস্ত দমননীতি ব্যর্থ হইয়াছে, ইহার সহিত, সরকার ও কল-কারখানা কর্তৃপক্ষ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়া জাতীয় টি-ইউ'কে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াও তাহারা সফল হয় নাই; হিটলারের লেবর ফ্রন্টেরই ছাঁচে-ঢালা পুঁজিপতিদের এই সব দালালি ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেনীকে তাহাদের দৃঢ়তা হইতে টলাইতে পারে নাই—**তাহাদের এই শোচনায় ব্যর্থতারই প্রকাশ্য স্বীকৃতি রহিয়াছে এই বে-আইনী ঘোষণার ভিতর।**

"এই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বে-আইনী করিয়া দেওয়া, এবং ইহার সহিত অন্ধ্র, তামিলনাদ, কেরলা, কর্ণাটক ও বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা; তাহার উপর কৃষকদের গণ-সংগঠন কিসানসভার উপর নিষেধাজ্ঞা, —এই সবের ভিতর দিয়া ভারত সরকারের ভাঁওতাপ্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ঃ জাতিসংঘ, আই-এল-ও প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গিয়া তাহারা দুনিয়াদি মানবিক অধিকারের প্রতি দরদী বুলি কপচায়, আর দেশে সে অধিকার তাহারা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছে।

"ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর সরকারের এই সাম্প্রতিক **আক্রমণ কিন্তু আকস্মিক নয়।** দেশের অর্থনীতিকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রথের চাকায় বাঁধিয়া দিয়া এবং পুঁজিবাদের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকটের জালে ধরা পড়িয়া বুর্জোয়ারা (নেহরু-সরকার সেই বুর্জোয়াদেরই প্রতিনিধি) শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের সর্ব্বনাশ করিয়া সংকটের সমাধান করিতে চাহিতেছে। মজুরি হ্রাস, ছাঁটাই, কাজের চাপ বৃদ্ধি, র‍্যাশনালাইজেশন, ইত্যাদির সাহায্যে শোষণ তীব্রতর করিবার জন্য পুঁজিবাদের এইসব সাবেকী বিধি ব্যবস্থাগুলিকে শিল্পপতিরা তো খোলাখুলিই চালু করিতেছে,—নেহরু-শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ সরকারী মুখপাত্রদের সাম্প্রতিক বিবৃতি ও বক্তৃতায়ও তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

তাঁহারা জানে—সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অস্তিত্ব, শ্রমিকশ্রেণীর উপর তাহাদের নূতন নূতন বোঝা চাপাইবার নানা চক্রান্তের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এদেশেও অতীতে যাহার তুলনা মেলে না, এমনই হিংস্র দমননীতি সত্ত্বেও, এইসব ইউনিয়নের নেতৃত্বে গত কয়েক বছর ধরিয়া শ্রমিকেরা দৃঢ় প্রতিরোধ ও বৃহত্তম ধর্ম্মঘট সংগ্রামগুলি চালাইয়াছেন—তাই আজ পুঁজিপতিরা এবং তাহাদের সরকার এতদূর হাত বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে।

"তাহারা যে জঘন্য পরিকল্পনা নিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হিংস্র আক্রমন চালাইবার জন্য তাহারা যে চক্রান্ত আঁটিতেছে, তাহার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য সেই পথের সবচেয়ে বড় বাধা অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা মাদ্রাজে ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে বেআইনী করিয়া দিয়াছে।

"অতএব,—সংগঠনের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে এই যে আক্রমন আসিয়াছে, ইহার প্রতিরোধ করা সমগ্র ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন ও গণতন্ত্রী আন্দোলনের অবশ্য কর্ত্তব্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাকেই রক্ষা করিবার জন্য তাহারা শ্রমিক শ্রেণীর উপর যে নূতন বোঝা চাপাইতেছে, সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেওয়াই আজ কর্ত্তব্য।

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিতেছে ও **অবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার দাবী করিতেছে** এবং সঙ্গে সঙ্গে, সমস্ত শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্দেশে ডাক দিতেছে—সর্ব্বত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করিয়া সরকারের এই ফাশিস্ত আক্রমণের নিন্দা করুন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সমস্ত শ্রমিককে আহ্বান করিতেছে—**সমস্ত শক্তি দিয়া এই আক্রমণের প্রতিরোধ করুন। সংগঠন ও বাঁচবার জন্য মৌলিক অধিকার কায়েম রাখুন।**

দায়ী কে ?

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ছাঁটাই শ্রমিক সুরেন পাল আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা বাঁচার মত বেতনবৃদ্ধির দাবিতে ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ সেই দাবি অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মঘটীদের কর্ম্মচ্যুত করিয়া শাস্তি দেন। বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ পর্য্যন্ত সুরেন পাল আত্মহত্যা করেন।

পি-এন-ব্যানার্জ্জির পদত্যাগ ছাত্রশক্তির বিপুল জয়

কংগ্রেসী ধনিক সরকারের শিক্ষা সংকোচ ও দমন-নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রাম চাই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশন ও ছাত্রীসংঘের সম্পাদকমণ্ডলী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

৯ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কমার্স ছাত্রদের উপর লাঠি ও টিয়ারগ্যাস আক্রমণের প্রতিবাদে কালকাতার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর যে বিক্ষুব্ধ ধর্ম্মঘট দিনের পর দিন চলিতে থাকে তাহার অন্যতম প্রধান দাবী ছিল "ভাইস্-চ্যান্সেলার পি, এন ব্যানার্জির পদত্যাগ চাই";

ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবীর সংগ্রামকে ভাঙ্গিবার জন্য পি, এন, ব্যানার্জ্জির পুলিস ডাকিয়া আনা এই প্রথম নহে। কংগ্রেসী রাজত্ব কায়েম হইবার পর যখনই ছাত্রসমাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতাক্রয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অথবা দমননীতির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জড়ো হইয়াছে তখনই পি, এন, ব্যানার্জ্জির নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা কংগ্রেসী পুলিস লেলাইয়া দিয়াছেন নির্ব্বিচারে লাঠি ও গুলি চালাইয়া ছাত্র জমায়েতকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য। ১৯৪৮ সালের মে মাসে মেডিকেল ছাত্রদের আন্দোলনের সময় অনশনকারী ছাত্র ছাত্রীদের উপর নির্ব্বিচারে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের ভিতরেই পুলিস আলো নিভাইয়া নিষ্ঠুরভাবে লাঠি চালায়, শত শত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। তাহার পর হইতে শুধু লাঠি নয় ভাইস্-চ্যান্সেলারের অনুমতিতেই ১৯৪৯এর জানুয়ারী মাসে খাস বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং হেয়ার স্কুলের মধ্যে বিধান মন্ত্রীসভার পুলিশ গুলি করিয়া ছাত্রদের মারিয়াছে। এই বর্ব্বরতাই পুনরাভিনয় হয় আবার ২৮ এপ্রিল মহিলা শোভাযাত্রীদের হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র শোভাযাত্রার সময়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার কর্তৃক মনোনীত ভাইস্ চ্যানেসলার পি, এন ব্যানার্জ্জী গদী দখল করিবার পরই ১৯৪৩ সালে ভিয়টনাম দিবসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশ আক্রমণ চালায়। কংগ্রেসী সরকারের দমননীতির বাহক এই অত্যাচারী পি, এন, ব্যানার্জ্জীর বিরুদ্ধে তাই বাংলার ছাত্রসমাজের এত ঘৃণা। এই ঘৃণা বিক্ষোভের আকারে ফাটিয়া পড়ে সাম্প্রতিক ছাত্র সংগ্রামের সময়। কলেজে স্কুলে সাধারণ সমাবেশে কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী দাবী তোলে এখুনি ভাইসচ্যানসলারের পদত্যাগ চাই। দিনের পর দিন পি, এন, ব্যানার্জ্জীর বাড়ীর সুমুখে পুলিশের লাঠি টিয়ারগ্যাস অগ্রাহ্য করিয়া ছাত্রছাত্রীরা দিনের পর দিন বিক্ষোভ দেখাইতে থাকে। গণতন্ত্রপ্রিয় প্রতিবেশী নাগরিকরা আওয়াজ তোলেন "পি, এন, ব্যানার্জ্জী পাড়া ছাড়িয়া যাও"। পি, এন, ব্যানার্জ্জীকে ছাত্র বিক্ষোভের ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতেতো হয়ই। প্রায় দুই সপ্তাহ ছাত্র বিক্ষোভ চলিবার পর অবশেষে পি, এন, ব্যানার্জ্জীকে ভাইস চ্যানসলারের পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বিপ্লবী

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মণ্ডল

চটকলে বিক্ষোভের জোয়ার ঃ সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতি

গত এক সপ্তাহে সমস্ত চটকল এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। অনেকগুলি বড় বড় লড়াই হইয়াছে। কোথাও বোনাসের দাবিতে, কোথাও বন্দী হপ্তার জন্য পুরা বেতনের দাবিতে আবার কোথাও বা 'ফাইন' বা অন্যান্য জুলুমের প্রতিবাদে এই সকল লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। শ্রমিকেরা কোন কোন স্থানে ম্যানেজার, লেবার অফিসার ও কর্ত্তাদের ঘেরাও করিতেছেন, কোন কোন স্থানে পুলিসের উদ্যত পিস্তল উপেক্ষা করিয়া আই-এন-টি-ইউ-সি ও অন্যান্য দালালদের ভাগাইয়া দিতেছেন। সংঘর্ষে মেয়ে শ্রমিকরাও সমানে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। এই সকল ছোটখাট সংগ্রামের মধ্য দিয়া সারা চটকল এলাকায় চটকল শ্রমিকদের মূল দাবির জন্য সাধারণ ধর্ম্মঘটের পটভূমিকা রচিত হইতে চলিয়াছে।

হাওড়া শিবপুর অঞ্চলে সমস্ত চটকলগুলিতে শ্রমিকদের মধ্যে নতুন করিয়া প্রবল আন্দোলন সুরু হইয়াছে। গত সপ্তাহে এখানে শ্রমিকেরা কয়েটি সভা ও মিছিল করিয়াছেন, একটি মিলে ম্যানেজার ঘেরাও হইয়াছে। আরও কয়েকটি মিলে বিক্ষোভ দানা বাধিয়া উঠিতেছে।

গত ১৯শে আগস্ট হাওড়া মিলের শ্রমিকেরা '১৫ই আগস্টের' একদিনের তলবের দাবীতে ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। ১৫ই আগস্ট হইতে এক হপ্তা মালিকেরা মিল বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

১৫ই আগস্ট সাধারণ ছুটির দিন ছিল। তাই শ্রমিকেরা এখন দাবী করিতেছেন যে, ঐ দিনটি বেতন সহ ছুটি দিতে হইবে। ১৫ই আগস্টের তলব আদায় করার জন্য আন্দোলন অন্যান্য মিলেও ছড়াইয়া পরিতেছে।

সুরজমল-নাগরমলের বেঙ্গল জুট মিলের কর্ত্তৃপক্ষ গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ৪৷৷০ টার ছুটিরবদলে ৫টায় ছুটি এবং টিফিন ১৷৷০টার বদলে ১১ টায় দিতেছিল। লালঝাণ্ডার কর্ম্মীদের নেতৃত্বে এখানকার শ্রমিকেরা দাবী তোলেন ঃ "নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী এক মিনিটও কাজ করিব না।" কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জঙ্গী মনোভাব দেখিয়া তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট টাইম টেবিল মানিয়া নিয়াছে।

ফুট মিলে 'মাগী কলের' মেয়ে শ্রমিকদের ।৹ আনা করিয়া পয়সা জোর করিয়া আদায় করিবার চেষ্টা হইলে মেয়ে শ্রমিকেরা রুখিয়া জবাব দেন, "জোর-জুলুম করিলে ঝাটা খাইয়া ফিরিতে হইবে।" কোম্পানা এখন মানে মানে এই নোটিস তুলিয়া নিবার ফিকার খুজিতেছে।

"বোনাস চাই" "বন্দী হপ্তার জন্য পুরা টাকা চাই" 'বকেয়া ১২৷৷০ টাকা চাই' 'বন্দীতাত চালু কর'—এই সমস্ত দাবার ভিত্তিতে রোজ মিল গেটে, বস্তীতে, ময়দানে সভা হইতেছে। শত শত মজুর এই সমস্ত সভায় জমা হইতেছেন। আই-এন-টি-ইউ-সির দালালরা এবং পুলিস—এই সমস্ত সভায় হামলা করিতে আসিয়া শ্রমকদের হাতে সমুচিত শিক্ষা পাইতেছে।

চটকল ট্রাইব্যুনালের মেয়াদ কয়দিন আগে শেষ হইয়াছে। ট্রাইব্যুনালে শ্রমিকেদের যে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, যেমন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বেতন সহ ৫ দিন ছুট, ১৫ দিনের অসস্থতার ছুট ইত্যাদি—এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এখন আর শ্রমিকদের দেওয়া হইবে না বলিয়া আই-জে-এম-এর পক্ষ হইতে একটা ঘোষণা বাহির হওয়ায় সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে বিক্ষোভের মাত্রা চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে জোর আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে, "সমস্ত চটকলে সাধারণ ধর্ম্মঘট করা ছাড়া মজুরের বাঁচার আর কোন পথ নাই!

পুলিশের হামলা

শ্রমিকদের এই জঙ্গী মেজাজ লক্ষ্য করিয়া জুটমিলের মালিকগোষ্ঠী এবং সরকার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েকদিন যাবৎ জুট মিলগুলির গেটে, শ্রমিক বস্তিগুলিতে ও চটকল মজদুর ইউনিয়ন অফিসের সম্মুখে গাড়ী গাড়ী সশস্ত্র পুলিসের দল টহল দিয়া বেড়াইতেছে।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ একটি ওয়ারলেস ভ্যানসহ কয়েক গাড়ী পুলিস গেট মিটিং করার সময় চটকল মজদুর ইউনিয়নের কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করে। সমস্ত শ্রমিকেরা রুখিয়া দাঁড়াইলে, পুলিসের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহারা শেষ পর্য্যন্ত ৩জন সাধারণ শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় নিয়া গিয়া ভীষণ মারপিট করে। তাহাদের জামিন দিতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করে।

কিন্তু পুলিসের এই দমননীতি শ্রমিকদের সংগ্রামের ইচ্ছাকে নষ্ট করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ উহাকে শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে।

জগদ্দলে মালিক ঘেরাও

গত এক সপ্তাহ ধরিয়া জগদ্দলের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতেছে। মেঘনা মিল, এবং ২নং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিলের শ্রমিকরা ফাইন ও অন্যান্য জুলুমের প্রতিবাদে লেবার অফিসার ও সাহেবদের ঘেরাও করিতেছেন। আই-এন-টি-ইউ-সির উপরে শ্রমিকদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে। সার্কাস মিলের পাশে আই-এন-টি-ইউ-সির তরফ হইতে একটা সভা ডাকা হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা মারপিট করিয়া সেই দালাল সভা ভাঙ্গিয়া দেয়।

মেঘনা মিলে তাঁতিদের যে সমস্ত ডিমা দেওয়া হয় তাহাতে মাল খুব খারাপ হয়। কিন্তু সেই খারাপ মালের জন্য ফাইন করা হয় শ্রমিকদের। তদুপরি স্পিনিং ও পাট ঘরে ক্যাজর চাপ অসম্ভব বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকরা তাই গত তিন দিন যাবৎ এই সমস্ত জুলুমের প্রতিবাদে লেবার অফিস ঘেরাও করিতেছেন।

সার্কাস মিলে গত সপ্তাহে মেয়েদের দিয়া দুজনের কাজ একজনকে দিয়া করান হইতেছে। মেয়েরা ইহার প্রতিবাদে কর্ত্তাদের ঘেরাও করেন।

২নং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিলেও খারাপ মালের অজুহাতে তাঁতিদের বসাইয়া দেওয়া হয় ও ফাইন করা হয়। শ্রমিকরা ইহার প্রতিবাদে সাহেবদের ঘেরাও করেন ও মারিতে যান। মালিকরা পুলিস ও মিলিটারী আনে। কিন্তু শ্রমিকরা বলেন যে, মাল খারাপ দিলে তাঁহারাও খারাপ করিয়া কাজ চালাইয়া যাইবেন।

এলায়েন্স এ্যাণ্ড সাউথ মিলের মালিকের তরফ হইতে নোটিস দেওয়া হইয়াছে যে, ট্রাইব্যুনালের রায়ের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই ২৪শে হইতে মিল বন্ধ করা হইবে এবং মিল বন্ধ থাকার জন্য শ্রমিকদের কিছুমাত্র মজুরী দেওয়া হইবে না। এমন কি সস্তায় রেশন দেওয়া হইবে কিনা তাহাও তাহারা এখনও ভাবিয়া দেখিতেছে। এইভাবে নোটিশ দেওয়ায় আই-এন-টি-ইউ-সির লোকেরা বেকায়দায় পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা এখন ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় লইয়াছে এবং বলিয়া বেড়াইতেছে, যে মালিকরা যদি হপ্তা কয়েক পয়সা না দেয় তাহা হইলে সস্তায় রেশন দিবে। কিন্তু শ্রমিকরা আর তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিতেছে না। সাধারণ শ্রমিকরাই উদ্যোগী হইয়া সার্কাস মিলের পাশে আহুত আই-এন-টি-ইউ-সির লোকেদের সভা মারপিট করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়।

অবশ্য চটকল শ্রমিকদের মূল দাবী লইয়া আন্দোলন এখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, কিন্তু জুলুম ও অন্যান্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সকল লড়াই মূল আন্দোলনেরই পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে হয় এবং অচিরেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন আন্দোলন মূল আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া যাইবে আশা করা যায়।

আই-এন-টি-ইউ দালাল নাজেহাল

গত ১১ই সেপ্টেম্বর এলায়েন্সে গান্ধী ময়দানে সভা করিতে গিয়া আই-এন-টি-ইউ-সির লোকেদের শ্রমিকদের হাতে যে কিরূপ নাজেহাল হইতে হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

আই-এন-টি-ইউ-সির দালালরা এই সভায় প্রফুল্ল ঘোষ, দেবেন সেন, দত্ত মজুমদার প্রভৃতি বক্তৃতা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। শ্রমিকরাও ঠিক করেন যে সভায় তাহারা আসিলে তাহাদের নিকট কৈফিয়ৎ চাওয়া হইবে।

ক্লোরাইড কারখানার শ্রমিকরাও দেবেন সেনের নিকট কৈফিয়ৎ দাবী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া সভায় আসেন। গত চারি মাস যাবৎ তাঁহাদের কারখানায় লক আউট চলিতেছে। অথচ দেবেন সেন প্রতিদিনই এই সকল ভুখা শ্রমিককে গরম গরম কথা বলিয়া ভাঁওতা দিয়া আসিতেছিলেন যে লকআউট প্রত্যাহার করা না হইলে সাধারণ ধর্ম্মঘট করা হইবে। কংগ্রেসী শ্রমিকও অনেক ছিল।

কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা আসিবার আগেই সভা আরম্ভ করা হয় এবং আই-

পরের পৃষ্ঠা দেখুন

দাবী আদায়ের জন্য মালিক ঘেরাও ঃ দালাল ও সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে মোকাবিলা

সাধারণ ধর্ম্মঘটের পথই দাবী আদায়ের পথ

বজবজে চটকল শ্রমিক সম্মেলনের প্রস্তাব

বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের (লালঝাণ্ডা) উদ্যোগে গত ২০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বজবজ হপ্তাবাজারে বজবজ কেন্দ্রের সমস্ত চটকল শ্রমিকদের বাৎসরিক সম্মেলন প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বজবজ জুট মিল, ক্যালিডোনিয়ান চিভিয়েট, লোথিয়ান, আলনিয়ান ও ওরিয়েন্ট মিলগুলি হইতে প্রায় সহস্রাধিক শ্রমিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে শ্রমিকদের মূল দাবি সমূহ উপস্থিত করা হয়। প্রস্তাবে চটকল শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম বেতন হিসাবে ১৫৲, বৎসরে তিন মাসের বোনাস, বন্ধ হপ্তার পুরা বেতন, সমস্ত বন্ধ তাঁত এখনই খুলিয়া ছাঁটাই মজুরকে কাজ দেওয়া, চাকুরির স্থায়িত্ব, বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থতার জন্য পেনশন, মহিলা শ্রমিকদের জন্য পুরা বেতনে প্রসবের দেড় মাস আগে এবং দেড় মাস পরে ছুট প্রভৃতি দাবী জানান হয়। প্রস্তাব

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

চটকল শ্রমিক সম্মেলনের মীমাংসা প্রস্তাব

(১১ পৃষ্ঠার পর)

উত্থাপক প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন যে, গত ৯০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, আপোষ-মীমাংসা ট্রাইব্যুনাল প্রভৃতির মারফৎ চটকল শ্রমিকদের দাবী আদায় সম্ভব নয়। দাবী আদায়ের একমাত্র পথ লড়াইর পথ—হরতালের পথ। প্রস্তাবে কংগ্রেসী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক নেতাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৯৩৫ সালের সাম্রাজ্যবাদী আইন সাধারণ নির্ব্বাচনের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া দাবী করা হয় নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে, সমস্ত শ্রমিক, কৃষক বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে, সমস্ত দমননীতিমূলক অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই সমস্ত দাবী না মানিয়া নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইলে তাহা মাত্র প্রহসন হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণ তাহাদের 'নিজস্ব কায়দায়' ভোটের অধিকার ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবি আদায় করিবে।

সম্মেলনকে বানচাল করিবার জন্য স্থানীয় আই-এন-টি-ইউ-সি বিভিন্ন মিলের ম্যানেজার ও ওয়ার্কস কমিটির সভ্যদের চেষ্টার বিরাম ছিল না। কোম্পানীর সাহেবেরা প্রথমে মিল গেটে পুলিস ও মিলিটারী মোতায়েন করিয়া শ্রমিকদের ভয় দেখায়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখন সম্মেলন বন্ধ করা গেল না তখন পুলিস সম্মেলনের শেষে উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিকরা সম্মেলনের শেষে উদ্যোক্তাদের লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইলে পুলিসের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়।

বি, পি, টী, ইউ, সির সম্পাদক নির্ব্বাচিত

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের এক বর্দ্ধিত সভায় বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের নেতা কমরেড রহিমকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বি-পি-টি-ইউ-সির কার্য্যকরী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

সরকারী কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করিয়া বাঘ মার্কা বাস শ্রমিকদের অগ্রিম বেতন আদায়

কোলকাতার বাঘমার্কা সরকারী বাসের ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর শ্রমিকেরা গত ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার পূজার জন্য অগ্রিম বেতনের দাবীতে কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রথমে বেতন দিতে সরাসরি অস্বীকার করেন, কিন্তু শ্রমিকের দৃঢ়তা দেখিয়া সোমবার দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রমিকেরা ইহাতে রাজী হন না এবং শেষ পর্য্যন্ত রবিবার বন্ধের দিন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া বেতন পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন!

যশোহরে ক্ষেতমজুরদের ধর্ম্মঘট

আড়াই টাকা হারে মজুরি আদায়

যশোহর জেলার ঝিকরগাছা থানায় স্থানীয় জমিদার ও ধনী কৃষকেরা ক্ষেত মজুরদের উপর চূড়ান্ত জুলুম চালাইতেছে। চাউলের দর এখন ৩৫৲ টাকা ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। জোতদার ধনী কৃষকেরা এখন মজুত ধান ২২৲ টাকা হইতে ২৮৲ টাকা দরে বেচিতেছে আর অপর দিকে মাত্র ৸০ আনা বা কোথাও কোথাও ১৲ এক টাকা দৈনিক মজুরিতে এই মরশুমের সময়েও ক্ষেতমজুরদের খাটাইতেছে।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় ক্ষেত মজুরদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। বোয়ালী গ্রামের ক্ষেতমজুরগণ প্রথমে নিজেদের কমিটি গঠন করেন এবং স্থির করেন যে, তাঁহারা আর বাঁচার মতো মজুরি না পাইলে কাজ করিবেন না। তাঁহারা ধর্ম্মঘট করেন। জোতদার ও ধনী কৃষকেরা বাধ্য হইয়া দৈনিক ২৷৷০ টাকা মজুরির হার মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বোয়ালি গ্রামের ক্ষেতমজুরদের এই সাফল্যের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পাশের ৫টি গ্রামের ক্ষেতমজুরগণও নিজেদের কমিটি করিয়া ২৷৷ টাকা হারে মজুরি আদায় করিয়াছেন। সমগ্র এলেকায় ক্ষেতমজুরদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার আসিয়াছে।

বিক্ষুব্ধ চটকল এলাকা

(১১ পৃষ্ঠার পর)

এন-টি-ইউ-সির পাণ্ডা দালাল বিনয় মজুমদার বক্তৃতা দিতে উঠিলে মজুররা তাহাকে প্রশ্নর পর প্রশ্ন করিয়া একেবারে নাজেহাল করিয়া দেন। 'কে তোমাকে নেতা করিয়াছে? কমিটি কাদের কথা হয়েছে? তোমরা মালিকের টাকা খাও আর আমাদের ধোঁকা দিয়া চাঁদা লইয়া হজম কর। তোমাদের চাইনা—আমরা নিজেরাই লড়িব' ইত্যাদি আওয়াজ উঠিতে থাকে।

এদিকে ক্লোরাইড শ্রমিকরাও কৈফিয়ৎ দাবী করিতে থাকেন, দত্ত মজুমদার দেবেন সেন কোথায়? তাদের ডাক।'

দালাল বিনয় মজুমদার শ্রমিকদের প্রশ্ন এড়াইয়া দারোগার ভাষায় বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিলে, শ্রমিকরা তাহাকে ধরিয়া চপেটাঘাত করে। বিনয় মজুমদার সভা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। দারোগা পিস্তল তুলিয়া আস্ফালন করিতে থাকে বটে, কিন্তু শ্রমিকদের মারমুখী মনোভাব দেখিয়া আর বেশী অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না।

ইতিমধ্যে দেবেন সেন, দত্ত মজুমদার প্রভৃতি মোটরযোগে আসিয়া পোস্ট অফিসের নিকটে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সভার খবর পাইয়া তাঁহারাও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাই সঙ্গত মনে করেন।

গান্ধী ময়দানে যখন সভা চলিতেছিল ঠিক সেই সময় গোলঘরে সাফাৎউল্লা লতাফৎ হুসেন, বৃদ্ধ মহাশয় প্রভৃতি দালালরা আর একটি সভা করিতেছিল। শ্রমিকরা আই-এন-টি-ইউ-সির দালালদের সভাও ভাঙ্গিয়া দেন।

শ্রেণী-সংগ্রাম আজ অত্যন্ত তীব্র ও রক্তাক্ত পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে। শোষিতশ্রেণী প্রতিদিন শাসকের রাইফেল, বেয়নেটের আক্রমণের সামনে একটি পাথরের মত খাড়া দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করছে, এই আক্রমণ

মার্কসবাদী (৫) প্রকাশ। মতবাদের লড়াইয়ে

শাসকশ্রেণীর মতবাদ, নিপীড়িত সংগ্রামী মানুষের মতবাদ, মার্কসবাদী মতবাদের সামনে, বিক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত ও পরাজিত হচ্ছে। মার্কসীয় মতবাদ সমৃদ্ধ হয়, আলোচনা, সমালোচনার মধ্য দিয়ে। "মার্কসবাদী" এইভাবে মার্কসীয় মতবাদকে সমৃদ্ধ করে, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর হাতে একখানা সবল, শাণিত অস্ত্র হচ্ছে। এই সংখ্যায় আছে:

কমরেড ডিমিট্রভ; ভারতে ভাষা সমস্যা; একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবাদাসী মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ; যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল; যুদ্ধোত্তর আমলে আমেরিকার অর্থনৈতিক বিকাশের সংকটময় স্বরূপ; গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব; মাও-সে-তুং; বাংলার প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা; রবীন্দ্র গুপ্ত; নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৩তম অধিবেশন।

দাম—১৷০ আনা।

নিউ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

নার্সদের দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবী আদায়

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের শ্রমিকরা সাম্প্রতিক ধর্ম্মঘট সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি হাসপাতালের শ্রমিকদের মধ্যেই ট্রাইব্যুনাল এবং অপোষ নয়, সেবাসদনের মত লড়াই করিয়া মাঙ আদায় করিতে হইবে এই মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে। ডাফরিনের নার্সরা সপ্তাহে একদিনও ছুটি পান না। কিন্তু সেবাসদনের শ্রমিকদের ফেডাইয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা নিজেরাই বিপ্লবী কায়দায় ছুটি আদায় করিয়াছেন।

নার্সরা সকলে মিলিয়া নতুন টাইম টেবিল চালু করিয়াছেন—প্রত্যেক নার্স সকলের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি পাইতেছেন। কর্তৃপক্ষ নার্সদের দিজেদের তৈয়ারী এই টাইম টেবিলে হাত দিতে সাহস পাইতেছে না। নার্সরা এখন দাবী তুলিয়াছেন, যে জন প্রতি নার্সের জন্য ৮ খানার বেশী বেড রাখা চলিবে না। ডাফরিনের শ্রমিকেরাও ৮ ঘণ্টা কাজের দাবী আদায় করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

লোহাকারখানায় লক-আউট নওজোয়ান শ্রমিকদের প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর চেৎলার পুরুষোত্তম রামজী নামে একটি ছোট লোহাকারখানার মালিক "লোহা নাই" অজুহাতে কারখানা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য লক-আউট ঘোষণা করিয়াছে। ইহার ফলে ১৫০ জন শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিকেরা প্রস্তুত হইতেছেন। কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকই অল্প বয়সী এবং লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে নবগঠিত মজদুর নওজোয়ান লীগ এই নওজোয়ান মজদুরদের মধ্যে আন্দোলন করিতেছেন।

নিজে পড়ুন ও অন্যকে পড়ান

সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বর্ম্মার গণঅভ্যুত্থান—

দাম—দশ পয়সা।

মানবতার শত্রু মার্কিন ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার প্রগতিশীল জনতার বিরুদ্ধে তৃতীয় মহাযুদ্ধের চক্রান্ত করছে; ভারতবর্ষের নেহরু সরকার ও পাকিস্তানের লিয়াকত সরকার, দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায়, এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রের দালালের অভিনয় করছে। সাম্রাজ্যবাদের দালাল বর্ম্মার থাকিন-ন্যু সরকার, বর্ম্মার বিপ্লবী জনতার আঘাতে খতম হতে চলেছে, নেহরু ও লিয়াকত সরকার ফৌজ, পাঠিয়ে সেই বিপ্লবী গণজাগরণকে রাইফেলের মুখে স্তব্ধ করে দিতে চায়, ভারত ও পাকিস্তান সরকারের এই দালালী চক্রান্তের স্বরূপ এই পুস্তিকাখানিতে অত্যন্ত নগ্নভাবে খুলে ধরা হয়েছে। বর্ম্মার বিপ্লবী জনতা এই ষড়যন্ত্রকে গুড়ো করে দেবে।

মঞ্জিল

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সাহায্যের" শিকলে তাদের বেঁধে রাখা।

সুতরাং মার্শাল প্ল্যানের কল্যাণে আমেরিকার মতলব হাঁসিল করার পক্ষে একটা খুব জরুরী কাজ বেশ চুকবে, অর্থাৎ নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ আবার জেঁকে বস্‌বে, আর তারা বাধ্য হয়ে অর্থনীতি ও রাজনীতি ব্যাপারে সোভিয়েটের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য বর্জ্জন করবে।

সোভিয়েটের প্রতিনিধিরা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারের সঙ্গে প্যারিসে একত্র বসে মার্শালের প্রস্তাবগুলো নিয়ে কথাবার্ত্তা চালাতে রাজী হয়ে আলোচনার সময় হাটে হাঁড়ি ভেঙে বুঝিয়ে দিলেন যে গোটা ইয়োরোপের জন্য একটা কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করা ভুল আর দেখিয়ে দিলেন যে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের উদ্যোগে একটা নতুন ইয়োরোপ-জোড়া সংগঠন খাড়া করতে গেলে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আর তাদের সার্ব্বভৌমত্ব খর্ব্ব করার বিপদ দেখা দেবে। তাঁরা দেখালেন যে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে সাধারণত যে সমস্ত নীতি প্রচলিত "মার্শাল পরিকল্পনা" সেই সব নীতিকে খণ্ডন করে। তাঁরা দেখালেন যে ইয়োরোপের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে অনেকগুলো দেশকে মার্কিন পুঁজিবাদী স্বার্থের বশ্যতা গ্রহণে বাধ্য করার বিপদ "মার্শাল পরিকল্পনা" আনবে। আরও দেখালেন যে মিত্রদেশগুলিকে সাহায্য করার পূর্ব্বেই জার্ম্মানীর একচেটিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকেই সাহায্য করার মতলব "মার্শাল পরিকল্পনাতে" রয়েছে, আর ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠিত করে ইয়োরোপে একটা বিশেষ ভূমিকায় নামাবার উদ্দেশ্যও যে আছে তা বেশ পরিষ্কারই বোঝা যায়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ব্রিটিশ আর ফরাসী সহচরদের সঙ্গে মিলে নিজেদের মতলবের উপর যে মুখোস্ পরিয়েছিল, স্পষ্ট কথা বলে সোভিয়েট যেন সেই মুখোস্ ছিঁড়ে দিল।

নিখিল ইয়োরোপীয় সম্মেলন বিরাট ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। ইয়োরোপের ন'টা রাষ্ট্র সেখানে যোগ দিতে অস্বীকার করল। বাদ বাকী যে সব দেশ "মার্শাল পরিকল্পনা" নিয়ে আলোচনা এবং তদনুযায়ী বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টায় নামতে রাজী হল, সেই সব দেশেও বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। তার বিশেষ কারণ এই যে মার্শাল প্ল্যান-মাফিক যা মিলবে সেটা যে আসল সাহায্য থেকে অনেক তফাৎ, সোভিয়েটের এই অনুমান শীঘ্রই নির্ভুল বলে প্রমাণ হল। দেখা গেল যে সাধারণত, মার্শালের কথামত কাজ করতে মার্কিন গবর্ণমেণ্ট একেবারেই তাড়াহুড়ো করতে চায় না। আমেরিকান কংগ্রেসের নেতারা স্বীকার করলেন যে ১৯৪৮ সালের আগে ইয়োরোপের দেশগুলিকে নতুন ধার দেওয়ার কথা কংগ্রেসে বিবেচনাই করা হবে না।

এভাবে বেশ পরিষ্কার দেখা গেল যে "মার্শাল পরিকল্পনা" অনুসারে কাজ করা সম্পর্কে প্যারিসে একটা খসড়া মেনে

ইউরোপকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধবার মার্কিন পরিকল্পনা

নিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলি মার্কিন ধাপ্পাবাজীর কাছে নিজেরাই ঠকে গিয়েছে।

* * *

কিন্তু এত ব্যাপার ঘটলেও আমেরিকাকে পালের গোদা করে পশ্চিম ইয়োরোপে একটা জোট ('ব্লক') বাঁধার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত যে সব দেশ ইতিমধ্যেই আমেরিকার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, সেই সব দেশেও মার্কিন-মার্কা পশ্চিম ইয়োরোপীয় 'ব্লক' নিয়ে গুরুতর বিরোধ রয়েছে, তা লক্ষ্য করা উচিত। ইয়োরোপে গণতন্ত্র আর কমিউনিজমের পথ রোধ করতে পারে এমন শক্তিসম্পন্ন জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখে ব্রিটেন কিম্বা ফ্রান্স বিশেষ প্রলুব্ধ হতে পারছে না। এক্ষেত্রে আমরা ইঙ্গ-ফরাসী মার্কিন 'ব্লকের' ভিতর একটা প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পাই। আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আর সাধারণভাবে সারা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলেরা ইউরোপে নয়া গণতন্ত্রগুলি এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকার দুর্গ হিসাবে ফ্রাঙ্কো এবং গ্রীক ফ্যাশিস্টদের উপর যে বিশেষ ভরসা রাখতে পারছে না, তা তো এখন স্পষ্ট। তারা তাই প্রধানত আশা করছে যে পুঁজিবাদী জার্ম্মানীকে আবার খাড়া করতে পারলে ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের একটা বড় রকমের আশ্বাস মিলবে। ব্রিটিশ লেবর-ওয়ালা কিম্বা ফরাসী সোশ্যালিস্টদের খুশী করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা যতই লেগে থাকুক না কেন, মনে মনে তাদের বিশ্বাস করে না, বরং ভাবে যে তারা "আধা- কমিউনিস্ট" তাদের উপর যথেষ্ট ভরসা রাখা চলে না।

এই জন্যই আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মানী-সম্পর্কিত সমস্যা এবং বিশেষত সোভিয়েটবিরোধী অভিযানে সম্ভাব্য যুদ্ধশিল্পকেন্দ্র হিসাবে 'রুঢ়' অঞ্চল সম্পর্কিত সমস্যা একটা বিরাট স্থান নিয়ে আছে, এবং আমেরিকা, ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে ঝগড়ার একটা মস্ত কারণ হয়ে রয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের রাক্ষুসে ক্ষুধা দেখে ব্রিটেন ও ফ্রান্সেও রীতিমত উদ্বেগের সঞ্চার একেবারে অনিবার্য্য। আমেরিকা রেখে-ঢেকে কথা বলার চেষ্টা না করে জানিয়ে দিয়েছে যে ব্রিটিশের হাত থেকে 'রুঢ়' অঞ্চলটি কেড়ে নেওয়া তার মতলব। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আরও দাবী করছে যে ব্রিটেন, ফ্রান্স আর আমেরিকা জার্ম্মানীর যে সব এলাকা দখল করে আছে সেগুলো একাকার করে ফেলা হোক্ এবং সোজাসুজি আমেরিকার আধিপত্যে পশ্চিম জার্ম্মানীকে আলাদা করার ব্যবস্থা পাকা করা হোক। আমেরিকা জোর করে বলছে যে 'রুঢ়ে' ইস্পাতের উৎপাদন বাড়াতেই হবে আর ধনিক কারবারগুলোর উপর সর্বেসর্বা হয়ে থাকবে আমেরিকা। ইয়োরোপের পুনর্গঠন উদ্দেশ্যে ঋণদানের যে প্রতিশ্রুতি মার্শাল দিয়েছেন, ওয়াশিংটনে তার ব্যাখ্যা হল এই যে সবার আগে জার্ম্মান পুঁজিপতিদেরই সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ নীতিরই হাতিয়ার হিসাবে চার্চ্চিল ইয়োরোপের যুক্তরাষ্ট্র নাম দিয়ে যে পরিকল্পনা প্রচার করেন, তা থেকে আমেরিকা যে আলাদা ধরনের "পশ্চিম ইয়োরোপীয় ব্লক" গড়তে চেষ্টা করছে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল আমেরিকারই একটা রাজ্য গড়ে তোলা, যার মধ্যে খাস ব্রিটেন-সমেত সার্ব্বভৌম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আমেরিকারই অন্তর্ভুক্ত "৪৯-তম রাষ্ট্র"—এর শামিল হয়ে থাকবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে ব্যবহারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ক্রমেই আরও উদ্ধত, আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। পশ্চিম জার্ম্মানীতে শিল্পোৎপাদনের মাত্রা সম্পর্কে দ্বিশক্তি ও ত্রিশক্তি আলোচনা (ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স) যখন হয়, তখন দেখা গেল যে কেবল পটস্‌ডাম সিদ্ধান্তকেই বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া নয়, আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় যারা অংশীদারী করবে তাদের জরুরী স্বার্থ সম্পর্কে আমেরিকার সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যও প্রমাণ হল। আমেরিকা হুকুম দেয়, মুখ বুজে ব্রিটেনকে এবং বিশেষত ফ্রান্সকে, সেই হুকুম কান পেতে শুনে তামিল করতে হয়। লণ্ডন ও প্যারিসে মার্কিন কূটনীতিবিশারদদের ব্যবহার দেখে গ্রীসে তাদের কার্য্যকলাপের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে যায়। গ্রীসে আমেরিকার প্রতিনিধিরা সাধারণ ভব্যতার নিয়মকানুন মেনে চলা দরকার নেই মনে করে খুশীমত গ্রীক মন্ত্রীদের গদিতে বসায় আর বরখাস্ত করে, আর এমন হাবভাব দেখায় যে তারাই দেশটাকে জয় করেছে। আমেরিকার নতুন পরিকল্পনা হল 'ডজ্ প্ল্যানের' ['ডজ' প্ল্যান্ অনুসারে ১৯২৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্ম্মানীকে সাহায্য করার ব্যবস্থা হয়েছিল] নতুন সংস্করণ : ইয়োরোপের জনগণের মূল স্বার্থেই এঁতে আঘাত পড়বে; আমেরিকার দাসত্বশৃঙ্খল পরিয়ে পরিয়ে ইয়োরোপকে তাঁবেদার বানাবার পরিকল্পনাই এটা হয়েছে।

* * *

"মার্শাল পরিকল্পনা" ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলির শিল্পোন্নতির অন্তরায় হয়ে তাদের সত্তা ও স্বাধীনতার মূলেই আঘাত হান্‌ছে। যখন 'ডজ্ প্ল্যানের' বিরোধী শক্তিসমূহ আজকের তুলনায় অনেক দুর্ব্বল ছিল তখনই ইয়োরোপকে সেই পরিকল্পনার ধাঁচে গড়ার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তো আজ যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বাদ দিলেও এখন শক্তি আছে যা যথেষ্ট ইচ্ছা ও মনোবল থাক্‌লে ইয়োরোপকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধবার এই পরিকল্পনাকে নিষ্ফল করে দিতে পারে। আজ শুধু দরকার ইয়োরোপের জনগণের তরফ থেকে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তুতি। আর সোভিয়েট সম্পর্কে বলা চলে যে মার্শাল প্ল্যানকে ভণ্ডুল করার জন্য সোভিয়েট সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরে যে সব দেশ রয়েছে, তারা "মার্শাল প্ল্যান" সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছিল, আগাগোড়া ঘটনার মধ্য দিয়ে তার সম্পূর্ণ নির্ভুলতা প্রমাণ হয়েছে। "মার্শাল প্ল্যান" সম্পর্কে গণতান্ত্রিক দেশগুলি প্রমাণ করেছে যে অমিত শক্তি নিয়ে তারা ইয়োরোপের সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্বকে বাঁচিয়ে রাখছে, আর ঠিক তারা যেমন "ডলার-মার্কা" কূটনীতি"-র চাল আর ভণ্ডামির চোটে ঠকতে রাজী হয় নি, তেমনই তারা ভয় দেখানো আর চোখ রাঙানোর সাম্‌নে মাথা নোয়াতে রাজী নয়।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ধারাকে দ্রুত সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে এবং বিশেষত আমেরিকা থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কখনও আপত্তি জানায় নি। তবে সোভিয়েট সর্ব্বদাই জানিয়েছে যে ঋণের শর্ত যেন বেজায় কড়া না হয় আর কিছুতেই যেন অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে দেনদার দেশ পাওনাদার দেশের তাঁবেদার বনে না যায়। রাজনীতির দিক থেকে এই মত পোষণ করে বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্ব্বদাই প্রচার করেছে যে কোন দেশের অর্থব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার কাজে বিদেশ থেকে টাকা ধার করে আনাকে কিছুতেই প্রধান উপায় হতে দেওয়া ঠিক নয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রধান ও প্রথম শর্ত হল এই যে নিজস্ব আভ্যন্তরীন শক্তি ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং নিজস্ব শিল্পব্যবস্থা সৃষ্টি করতেই হবে। কেবল এই উপায়েই বিদেশী মূলধনের জাল থেকে একটা দেশের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, কারণ দেখা যায় যে বিদেশী পুঁজিপতিরা ক্রমাগত অনধিকার প্রবেশ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রথমে টাকা ধার দিয়ে তারপর সেই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে। "মার্শাল প্ল্যান" হল অবিকল ঐ বস্তু; ইয়োরোপের দেশগুলির শিল্পোন্নতি ক্ষুণ্ণ করে তাদের স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করে তোলা এর উদ্দেশ্য।

প্রত্যেকের সমান অধিকার এবং পরস্পরের সার্ব্বভৌমত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভিত্তিতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতিগত সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে, সোভিয়েটের এই যে মত, তার কোনও নড়চড় নেই। সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকার আছে আর একটা চুক্তি হলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা নিশ্চয়ই যেন ঘটে, এই নীতির উপর সোভিয়েটের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং বিশেষত বিদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ নির্ভর করছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যখন কোন দেশ সন্ধি করে, তখন সেই চুক্তিতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা ঘটে আর কোন পক্ষেরই স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্বের পরিপন্থী কোন

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতি
বিরুদ্ধে
লছেন।

নুরুল আমিন-লিয়াকত কোম্পানীর বিরুদ্ধে জনতার চার্জ্জশীট

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ৬৫ হাজার রেলমজুর পূর্ব্ব-বাংলার রেল চালাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু গত দুই বছর ধরিয়া লিয়াকত সরকারের অবিরাম আক্রমণ রেলমজুরের জীবনকে জাহান্নমে পরিণত করিয়াছে। প্রায় দশ হাজার মজুর ছাঁটাই হইয়াছে! কত হাজার হাজার রিভার্ট হইয়াছেন, তাহার হিসাব নাই, গ্রেনশপ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেখানে ওয়াগনে বাসের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ওয়াগন কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে; অন্যত্র মজুরি হইতে বাড়ীভাড়া বাবদ বেতনের এক অংশ কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতেও শেষ হয় নাইঃ এখন আবার খাটুনির ঘণ্টা বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে!

লিয়াকত আলির দালালেরা বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এই সবের জন্য দায়ী রেলবোর্ড, লিয়াকত আলি বা তাহার সরকার নয়। কিন্তু মজুর আজ আর বোকা নাই। প্রত্যেকটি মজুর জানে লিয়াকত আলিই ১৯৪৬ সালে এই পে-কমিশনের শয়তানি নিজের হাতে তৈয়ার করিয়াছিল। প্রত্যেকটি মজুর জনের, রেল বোর্ড লিয়াকত আলির হাতের পুতুল। খাওয়া, শোওয়া, কাপড় কেনা, ছেলে মেয়ের চিকিৎসা, সকল সময়ে মজুরের মনে আসে লিয়াকত আলির শাসনের কথা। **রেল মজুর মরিতেছে, আর ডাক-তার ও রেল হইতে লিয়াকত-সরকারের এ বছর, এক কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মুনাফা হইতেছে!**

পূর্ব্বঙ্গের স্বতাকল মালিক সূর্য্য বোস এখন নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার বিশ্বস্ত দালাল। লিয়াকত আলি এই সেদিন সূর্য্য বোসকে ইহার ইনাম দিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম উপদেষ্টা কমিটিতে সূর্য্য বোসের স্থান হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে আজ স্বতাকল মালিকের খুসীমত মিল বন্ধ হইতেছে, মজুর ছাঁটাই হইতেছে, ২০৲ টাকা ২৫৲ টাকা মাস মাহিনায় মজুরদের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটানো হইতেছে।

জাহাজী মজুর, চা বাগান ও অন্য মজুরদের জবাই চলিয়াছে। **তাই লিয়াকত আলির সামনে প্রত্যেকটি শ্রমিক প্রতিহিংসার দুর্জ্জয় শপথ ঘোষণা করিবে।**

জমি হইতে চাষীর উচ্ছেদ

পাকিস্তানের এই মজুরশ্রেণী, পাকিস্তানের সাধারণ পুলিস পল্টন—ইহাদের সকলেরই উদ্ভব অতি গরীব চাষীদের ঘরে। সাড়ে চার বছর আগে নির্ব্বাচনের সময়ে লীগ নেতারা হলফ করিয়াছিলেন, তাহারা গদি পাইয়াই বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করিয়া দিবেন, খোদ চাষীকে তাহার চাষের জমির মালিক করিয়া দিবেন। পাকিস্তানী শাসনের দুই বছরের মধ্যে নুরুল আমিন বা লিয়াকত এদিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বরঞ্চ জমিদারি উচ্ছেদের ভাঁওতার আড়ালে কৃষক-উচ্ছেদের এক বিল পূর্ব্ববঙ্গ আইন সভায় গত বছর পেশ হইয়াছিল। তারপর জমিদার-ধনী কৃষকদের লইয়া গঠিত এক স্পেশ্যাল কমিটির হাতে বিলটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিশেষ কমিটি সম্প্রতি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেনঃ ভাগচাষী, টংকচাগী, ইহাদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা, পাকা করিয়া, গরীব চাষীদের খাজনা কমাইবার বদলে খাজনা বাড়াইবার বিধান করিয়া, চাষীর বকেয়া দেনা মকুব করার বদলে জমিদারের বকেয়া দেনা মকুবের ব্যবস্থা করিয়া পরগাছা জমিদারদের ৩০কোটি টাকা খেসারত দিবার সুপারিশ করিয়া এই বিশেষ কমিটি ৪৯ বৎসরে জমিদারি উচ্ছেদের সুপারিশ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে খোদ চাষীর জমি হইতে উচ্ছেদ পুরাদমে চলার ব্যবস্থা কায়েম রাখিয়াছেন।

চাষীশ্রেণীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার এত জঘন্য নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

মজুরশ্রেণীর স্পষ্ট জানা আছে, গত নির্ব্বাচনের পর এই সাড়ে চারি বছরে কত লক্ষ লক্ষ পরিবার সংসার খরচ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে জমি বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন, ক্ষেতমজুরে পরিণত হইয়াছেন। জমি ও মুনাফা শহরের ও গ্রামের ধনিক-শ্রেণীর হাতে জমা করিবার ব্যবস্থাই লীগ সরকার করিতেছে। তাহারই জন্য নুরুল আমিন সরকার সেদিন কর্ডনের শেষ বাধাটুকুও তুলিয়া দিয়াছে। মজুর, চাষী, মেহনতী জনসাধারণ প্রতিমুহূর্ত্তে তাহা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছেন। **পূর্ব্ববঙ্গের ৬০ হাজার গ্রামে ধনীরা নির্ম্মম যুদ্ধ চালাইতেছে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষীর বিরুদ্ধে। তাহার বিরুদ্ধে কোটি কোটি চাষা সংকল্প লইতেছেঃ চাষীর হাতে জমি চাইঃ তাহারা নিজের হাতে বিনা খেসারতে জমিদারি খতম করিবে।**

শিক্ষা সংকোচে লীগ সরকার

মজুর চাষীর ছেলেমেয়ে যাহাতে লেখাপড়া শিখিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও লীগ সরকার আট-ঘাট বাঁধিয়া করিতেছেন। সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বেলুচিস্তান, পূর্ব্ববঙ্গ—কোথাও গ্রামের জনসাধারণের মাতৃভাষা উর্দ্দু নয়। কাজেই পাকিস্তানী জাতীয় ভাষার নামে উর্দ্দুকে চালাইবার জন্য লিয়াকত আলির চেষ্টার অন্ত নাই। সাধারণ চাষী মজুরের ছেলে ইহার ফলে একশত বৎসরের মধ্যেও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না, এই ভরসাতেই বাঙ্গালী, পাঠান, পাঞ্জাবী, সিন্ধী—এই সকল জাতির অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিবার জন্য লিয়াকত আলি এই ষড়যন্ত্র করিতেছে।

মধ্যবিত্তের জন্য যেটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহাও সংকুচিত হইতেছে। ইউনিভারসিটির জন্য টাকা কোথায়? মজুর-কৃষক নিধনের জন্য পুলিস-মিলিটারীর পাছেই তো সব টাকা ব্যয় হয়! কাশ্মীরের যুদ্ধের জন্য সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধ সম্ভার প্রস্তুতির জন্যই তো বাজেটের শতকরা ৬৮ ভাগ ব্যয় হয়! **তাই শিক্ষা সঙ্কুচিত হইতেছে, তমদ্দুনের নামে লীগ নেতাদের রাজনৈতিক চালবাজী চলিতেছে।**

গণতান্ত্রিক অধিকার বিলুপ্ত

লিয়াকত-নুরুল আমিনের শাসনে গোটা পূর্ব্ববঙ্গ আজ এক প্রকাণ্ড কয়েদখানায় পরিণত হইয়াছে। শুধু পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় ১০০ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষী নর-নারীর রক্তে মাটি লাল হইয়া গিয়াছে—গত এক বছরের মধ্যে। মজুর চাষীর রক্ত ধারায় নুরুল আমিন ও তাহার মন্ত্রিসভার হাত পা সারা দেহ কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। গরীবের খবরের কাগজ বাহির করার উপায় নাই; মজুর চাষীর সভা, মিছিল করার অধিকার বিলুপ্ত। বন্দীদের উপর পাশবিক অত্যাচার; প্রত্যেকটি সাচ্চা মানুষ উপলব্ধি করিতেছে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার মরণ বাড় হইয়াছে! এই মুহূর্ত্তে পূর্ব্ব বঙ্গের জেলে ১২৫ জন রাজনৈতিক বন্দী অনশন ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন।লিয়াকত আলি আসিতেছে রক্তের বন্যায় ইহাদের ন্যায্য দাবি ডুবাইয়া দিতে।

লিয়াকত আলির বিরুদ্ধে জনগণের ইহাই ন্যূনতম অভিযোগ পত্র—চার্জ্জশীট। সফরকালে জনতার বিক্ষোভ লিয়াকত আলির নিকট এই চার্জ্জশীট পৌঁছাইয়া দিবে।

নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে, ধনিকরাজের বিরুদ্ধে গোটা পূর্ব্ববঙ্গে আজ গণ-বিক্ষোভের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই বিক্ষোভ নিভাইবার জন্য একদিকে চলিয়াছে শফর ও ধোকাবাজি, অপর দিকে চলিয়াছে পাশবিক দমননীতি। **নুরুল-আমিন ও লিয়াকত আলি আজ লাঠি, বন্দুক ও জেলখানার জোরে শাসন চালাইতেছে।** কিন্তু লাঠির প্রত্যেকটি আঘাত, বন্দুকের প্রত্যেকটি গুলি, জনতার উপর প্রতিটি অত্যাচার লীগ নেতাদের মৃত্যুবান ভৈয়ার করিতেছে। মজুর চাষী নুরুল আমিন সরকারের প্রতিটি অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতেছে, চূড়ান্ত প্রতিরোধের জন্য তৈয়ার হইতেছে আর ইতিমধ্যে প্রত্যেক সুযোগে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জনতার যে অপরিসীম ঘৃণা তাহার প্রকাশ করিতেছে। টাঙ্গাইলের উপনির্ব্বাচন তাহারই একটি নিদর্শন। প্রত্যেক জেলার জেলাবোর্ড ও অন্যান্য নির্ব্বাচনে তাহারই প্রমাণ মিলিতেছে। নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার মধ্যে ও লীগ পার্টির মধ্যে যে ফাটল তাহাও উহাই প্রমাণ করে।

করাচীর অনেক কর্ত্তা আসিয়াও এই ফাটল বন্ধ করিতে পারেন নাই; ডাঃ মালেককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সরাইয়াও অবস্থার উন্নতি হয় নাই। তাই খোদ বড় কর্ত্তা লিয়াকত আলি আসিতেছেন। গণ-বিক্ষোভের আগুন হইতে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করার জন্য মজুরশ্রেণীর বিরুদ্ধে নূতন ধোঁকা ও আক্রমণ চালাইবার জন্য লিয়াকত আসিতেছেন।

কিন্তু মজুরশ্রেণী লিয়াকতের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিবে। জনতা নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে রায় প্রকাশ করিয়াছে; লিয়কত আলি সরকারের স্বরূপ তাহারা চিনিয়াছে। লিয়াকত জনতার সম্বর্দ্ধনা পাইবেন না। নুরুল আমিনকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

মজিল

ইউরোপকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধবার মার্কিন পরিকল্পনা

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

শর্ত তাতে থাকে না। সম্প্রতি আমেরিকা অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের সঙ্গে যে অসঙ্গত ও অসাম্যমূলক চুক্তি করেছে ও করছে, তার পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সন্ধিব্যাপারে যে মূলগত নীতি অনুসরণ করে তার শ্রেষ্ঠত্ব জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে। সোভিয়েটের বিদেশী বাণিজ্যনীতি এমন যে তাতে অসাম্যমূলক চুক্তির স্থান নেই। আরও বলা চলে যে সোভিয়েটের সঙ্গে যে সব দেশ অর্থনৈতিক যোগাযোগ চায় তাদের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্কে দেখে বোঝা যায় যে কোন নীতি অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হওয়া সঙ্গত।

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী বুলগেরিয়া ও ফিন্‌লণ্ডের সঙ্গে যে সব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, সেগুলোর কথা মনে করলেই একথার যথার্থ্য প্রমাণ হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পাবার রাস্তা কি, তা সোভিয়েট এই ভাবে স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। সোভিয়েটের সঙ্গে যে চুক্তি প্রায় স্থির হয়ে আসছিল বাইরের চাপে সেই চুক্তিকে লেবর গবর্নমেণ্ট পণ্ড না করলে আজ ব্রিটেনের সঙ্গে ও অনুরূপ একটী চুক্তি গৃহীত হত।

ইয়োরোপের দেশগুলিকে অর্থনৈতিক নিগড়ে বাঁধার মার্কিন মতলব জাহির করে দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়াগণতন্ত্র গুলির বৈদেশিক নীতিপরিচালকেরা বাস্তবিকই একটা উপকার করেছেন।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে খাস আমেরিকাতেই অর্থনৈতিক সংকটের আশঙ্কা রয়েছে। মার্শালের সরকারী বদান্যতার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। ইয়োরোপের দেশগুলো আমেরিকার কাছে ধার না নিলে সেখানে আমেরিকান মালের চাহিদা কমে যাবে আর ফলে আমেরিকার আসন্ন অর্থসংকট আরও দ্রুত এসে হাজির হবে এবং আরও কঠোর হবে। তাই ইয়োরোপের দেশগুলি যদি ঋণের বিনিময়ে আমেরিকার দাসত্ব স্বীকার করে নেওয়া যে শর্তগুলির বিশেষত্ব, সেই শর্তগুলি প্রত্যাখ্যান করতে তৈয়ার থাকে ও প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখাতে পারে, তাহলে খোদ আমেরিকাকেই বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি পিছু হটতে হবে।

বিশ্বশান্তির সংগ্রাম শিবিরের মহান্ নেতা সোভিয়েট

দুই পৃষ্ঠার পর

নিজের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দেখে বাচাই ক'রে নিতে হবে"। মার্কিনের তৃতীয় দাবি হলো: একটি এটমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অথরিটি গ'ড়তে হবে, এটি ইউ, এন, ও-র অধীনে থাকবে সেকথাও পর্য্যন্ত বলা হ'লো না। মার্কিন বৃটেন ও কানাডা এই বারুচ প্ল্যান সমর্থন ক'রলেন। অর্থাৎ তাঁরা ১৯৪৫ সালের নভেম্বরের ঘোষণাটিকে এই বারুচ প্ল্যানের দ্বারা বাতিল ক'রে দিলেন। **এই, বারুচ প্ল্যানের সোজা অর্থ হলো ইউ, এন ও-র কবর রচনা এবং দুনিয়ার সকল জাতির স্বাধানতা ও সার্ব্বভৌমত্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পায়ে বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করা।** বেভিন আজও এই বারুচ প্ল্যানকে আকড়ে রয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন: সোভিয়েট স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জ্জন দিতে চায় না। তবে কেমন ক'রে আনবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ হবে!

অধ্যাপক পি, এম্, এস ব্ল্যাকেট বৃটিশ আনবিক শক্তি কমিটিরই একজন সদস্য। বারুচ প্ল্যান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বারুচ প্ল্যান যদি গৃহীত হ'তো তাহ'লে এমন একটা অবস্থা হ'তো যে অধিকাংশের ভোটে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া খুবই সম্ভব হ'তো।" সোভিয়েট রাশিয়া সেই জন্যই বারুচ প্ল্যান গ্রহণ ক'রতে পারেননি। অথচ ট্রুম্যান বেভিন আজও সেই ষড়যন্ত্র হাসিল করার চেষ্টা ছাড়েন নি।

তাহলে আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কেমন করে হবে এ প্রশ্নের জবাব গ্রোমিকো দিয়েছিলেন ১৯৪৫ সালের ১৯শে জুন তারিখে; তারপর ১৯৪৭ সালের ১১ই জুন তারিখের সোভিয়েট প্রস্তাবে আর একবার এর জবাব দেওয়া হয়েছিল। ইউ, এন ও-র তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে কেমন করে আনবিক শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ করা যায় সোভিয়েট তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধলিপ্সুরা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট আজ নিজের কাজের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তির ব্যবহারের উপর দুনিয়ার জনগণকে দেখিয়ে দিয়েছেন, কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন না করে, কোন দেশের স্বাধীনতা বা সার্ব্বভৌমত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে, ইউ-এন-র অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্বকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে। আর ঠিক সেই সময়ে মার্শাল প্ল্যানের মারফত মার্কিন প্রতি দেশের সার্ব্বভৌমত্ব লুপ্ত করছে; ঠিক সেই সময়ে তারা ইউ-এন-ওর বাইরে আটলাণ্টিক প্যাক্ট, ওয়েস্ট ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন প্যাসিফিক ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

যুগোস্লাভিয়ার টিটোচক্র ও সোভিয়েট:

মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ যুগোস্লাভিয়াকে উপলক্ষ করে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিষাক্ত কুৎসা প্রচার ক'রছে। প্রচার করা হ'চ্ছে যে সোভিয়েট যুগোস্লাভিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ক'রেছে এবং যুগোস্লাভিয়া আক্রমণের তোড়জোড় ক'রছে। শান্তির আবেদনের সাথে এই আচরণের কোন সঙ্গতি নেই এই কথা বুঝাবার জন্যে জোর প্রচার চ'লেছে।

ফ্যাসিস্ট দালাল টিটো কারদেলির দল যুগোস্লাভিয়ার জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রছে, যুগোস্লাভ জাতিসমূহ ও সোভিয়েটের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ককে ধ্বংস করার জন্য সর্ব্বরকমে ষড়যন্ত্র ক'রছে। যুগোস্লাভ জাতিসমূহ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোভিয়েটের লালফৌজের সহায়তায় হিটলারের কবল হ'তে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু টিটোচক্র আজ ২কোটি ডলার মার্কিনের কাছ থেকে ঋণ পেয়েছে; এই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। টিটো-কারদেলি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগোস্লাভিয়াকে সরিয়ে এনে সেখানে নয় ফ্যাসিস্ট রাজ কায়েম' করেছে; শুধু তাই নয়, যুগোস্লাভিয়ায় যে সকল সোভিয়েট নাগরিক আছেন তাদের উপর জেল থেকে সুরু ক'রে অকথ্য জুলুম ও নির্য্যাতন চালাচ্ছে। মহাযুদ্ধের সময়ে ফিনল্যাণ্ডের মত টিটো ষড়যন্ত্রে যুগোস্লাভিয়া আজ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধশিবির হয়েছে। ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করার জন্যে সোভিয়েট ৭০ লক্ষ জীবন বলি দিয়াছে। ফ্যাসিজম যাতে আর মাথা তুলতে না পারে তারই জন্য ইউ, এন ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দুনিয়ার সমগ্র জনগণ ফ্যাসিজমকে মাথা চাড়া দিতে দেখলে তাকে ধ্বংস করতে চায়। এ অবস্থায় যুগোস্লাভিয়ার ফ্যাসিস্ট চক্রের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ ক'রলেও সোভিয়েটের পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত হ'তো। কিন্তু সোভিয়েট তা করে নি। সোভিয়েট শুধু ঘোষণা করেছে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ও সোভিয়েটের জন সাধারণ টিটোচক্রকে শত্রু ব'লে মনে করে। টিটো-চক্র আজ আন্তর্জ্জাতিক বিধানের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করছে, মার্কিন সামাজ্যবাদের হুকুমে; দুনিয়ার শান্তির বিরুদ্ধে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে, পূর্ব-ইউরোপের গণরাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ট্রুম্যান-এট্টাল কোম্পানীর আজ ঘৃণিত টিটো-চক্রকে নিয়োজিত করে'ছে। আর তারপরও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কুৎসা চালাচ্ছে।

শান্তির সংগ্রামে অগ্রগতি

শান্তির জন্য সংগ্রাম জোরে এগিয়ে চলেছে। এই সেদিন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ৬০ কোটি নর-নারীর ১৭৮৪ জন প্রতিনিধি প্যারীতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সমবেত হ'য়ে যুদ্ধলিপ্সুদের মাথায় মোক্ষম আঘাত করেছেন। তারপর গত ২৫-২৭শে আগস্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তি সম্মেলন হয়ে গিয়েছে। এক সহস্রের বেশী প্রতিনিধি সোভিয়েটের সমস্ত অঞ্চল থেকে সমবেত হয়েছিলেন এই সম্মেলনে। সোভিয়েটের সমগ্র জনগণ শান্তির জন্য সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ তা প্রমাণিত হয় একটি ঘটনায়। শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধিরা মহান নেতা ও প্রিয় কমরেড স্টালিনের কাছে একটি অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে তাঁরা বলেছিলেন **"তোমার নাম শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামের পতাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। .... আমরা শান্তির পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছি।"**

ডলার সাম্রাজ্যবাদ সারা দুনিয়ায় তাদের উপনিবেশ ও সামরিক ঘাঁটি তৈরী ক'রে চলছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপনিবেশগুলিতে যে অপূর্ব্ব স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার উঠেছিল, তাকে ধ্বংস করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ তাদের অস্ত্র সম্ভার ও সৈন্য পাঠাচ্ছে; বর্ম্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ইন্দোচীন দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত দেশগুলিতে আজ সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ চালাচ্ছে। আর ঠিক সেই সময়ে সোভিয়েট ঘোষণা ক'রেছে শান্তির নীতি-প্রত্যেক উপনিবেশে স্বাধীনতা ও গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতি। ভারতীয় ইউনিয়ন, পাকিস্তান, মালয়, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন—দুনিয়ার প্রতি দেশে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোভিয়েট তার প্রতিবাদ তুলেছেন। যুদ্ধ চাই না ব'লে সাম্রাজ্যবাদ যে যুদ্ধ চালাচ্ছে সেকথা প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। এমন কি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েট। **উপনিবেশের স্বাধীনতা আর বিশ্বের শান্তির জন্য সংগ্রামকে সোভিয়েট আলাদা ক'রে দেখেনি।**

শান্তি শিবিরের নেতা সোভিয়েট

ঠিক এই সময়ে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের নেহরু ও লিয়াকতের সরকার আজ নিরপেক্ষতার নামে যুদ্ধের শিবিরে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে যোগ দিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশের মজুর শ্রেণী ও শোষিত জনগণের জীবনের উপর দিয়ে গিয়েছে দুর্ভিক্ষ মহামারি, মূল্যবৃদ্ধি। কোটি কোটি মা বোন, পল্লী আজ যুদ্ধকে অভিসম্পাত করছে, ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের কোটি কোটি মজুর, চাষী সাধারণ মানুষ আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্রতম ঘৃণা ঘোষণা করছে। আর ঠিক সেই সময়ে খিড়কির দরজা দিয়ে নেহরু-লিয়াকত এদেশে যুদ্ধকে ডেকে আনছেন। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কাশ্মীরে ডেকে আনা হয়েছে; এদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

২রা অক্টোবর

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুর্নীতি পরায়ণ ধনিক স্বার্থবাদীদের দূর কর

(দশম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র আন্দোলনের ইহা এক বিরাট জয়। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগ্রামের শক্তি যে কত দুর্ব্বার, সরকারের লাঠি, গুলি ও জেল তাহার দাবিকে স্তব্ধ করিতে পারে না—পি, এন, ব্যনার্জ্জীকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়া বাংলার বিপ্লবী ছাত্রসমাজ আর একবার তাহাই প্রমাণ করিলেন।

ধনিকশ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থে পরিচালিত শিক্ষানীতির বাহক বিশ্ববিদ্যালয়কে ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি মুখার্জ্জি-ব্যানার্জ্জী কুল একেবারে নিজেদের জমিদারীতে পরিণত করিয়াছেন তাহা বাংলাদেশের গণতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই জানেন। এই বছরেই আই-এস-সি পরীক্ষায় মেহনতকারী জনসাধারণের সন্তান গরীব ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৭০ জনকে ফেল করান হইয়াছে। আর পর্দ্দার আড়ালে ভাইস্ চ্যান্সেলারের নিজের ছেলে, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে জাল জুয়াচুরি করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা নূতন নয়। গরীবের ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের অসংখ্য ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার একটি হঠাৎ বেফাঁস হইয়াছে মাত্র।

কংগ্রেসী সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা সংকোচননীতি যতদিন চালু থাকিবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও কর্ত্তৃত্ব যতদিন কায়েমীস্বার্থ-বাদী ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের হাতে থাকিবে-ততদিন এই জঘন্য জাল-জুয়াচুরি, আত্মীয়তোষণ এবং দুর্নীতি বজায় রহিবে। তাই আমাদের গণতান্ত্রিক শিক্ষা সংগ্রামকে আরো তীব্রতর করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব হইতে সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের রদ করিয়া দিতে হইবে। শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনসাধারণের সন্তানদের গণতান্ত্রিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও কর্ত্তৃত্ব ট্রেড ইউনিয়ন ও শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের হাতে আনিতে হইবে। নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ বুঝিয়াছেন যে গণতান্ত্রিক শিক্ষার সংগ্রাম আজ কংগ্রেসী সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি ও দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়। যেখানেই ছাত্র সাধারণ এমন কি শিক্ষার সামান্য দাবী তোলেন অমনি বিধান মন্ত্রী সভার সশস্ত্র ফৌজ ছাত্রদের উপর ঝাপাইয়া পড়ে।

তাই কলিকাতার সাম্প্রতিক ছাত্র সংগ্রামের সময় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আওয়াজ তুলিয়াছে—"বিধান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই"।

ছুটির পর আবার কমার্স, প্রেসিডেন্সি ও হোস্টেলের ছাত্রদের দাবীআদায়ের সংগ্রামকে আরো ব্যাপক, আরো তীব্রতর করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হইতে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কর্ত্তৃত্ব এবং বিধান মন্ত্রিসভাকে অপসারণের তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে বাংলার ছাত্রছাত্রী সমাজ বিপুল বেগে অগ্রসর হইবে—এ দৃঢ়বিশ্বাস ছাত্র-ফেডারেশন ও ছাত্রীসংঘের আছে।

১৫

২৫শে সেপ্টেম্বর বাঁচার দাবিতে ৫ হাজার কর্পোরেশন শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার জন্য বিধান সরকারের পুলিসের লরীতে 'জাতীয়' টি-ইউ'র নেতৃবৃন্দ

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ব্যাপক ধর্ম্মঘটের ভিত্তি তৈয়ার

বিধান সরকারের সশস্ত্র পুলিস বাহিনী, কলিকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতি পরায়ন কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় টি ইউর বেইমান নেতা—এই ত্রিচক্রের হিংস্র আক্রমণের মুখে রুখিয়া দাঁড়াইয়া গত ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের ৫,০০০ আশুয়ান মজুর লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ধর্ম্মঘট করিয়া দর বাঁচিবার পথ দেখাইয়াছেন।

কংগ্রেসী শাসনে যেভাবে জিনিষ-পত্রের দাম অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিতেছে তাহার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কর্পোরেশন ওয়ার্কাস ইউনিয়ন শ্রমিকদের এলান্ দেয়।

দাবি জানানো হয়:—

(১) অবিলম্বে ১০৫ টাকা বেতন চাই

২। বর্দ্ধিত হারে মাসিক ১০ টাকা ভাতা এবং সেই হিসাবে গত ৮মাসের বকেয়া ৮০টাকা ভাতা চাই।

৩। রবিবারে ছুটি নইলে ডবল বেতন

৪। বন্দী শ্রমিক নেতাদের মুক্তি ও ছাঁটাই ভাইদের পুনর্বহাল।

২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে হরতাল সুরু করার সিদ্ধান্ত হয়।

বাঁচিবার দাবী নিয়া লালঝাণ্ডার এই হরতালের ডাকে কর্পোরেশনের বিক্ষুব্ধ শ্রমিক—ধাঙ্গর, মেথর, বাতিওয়ালা জলকল শ্রমিক সবার মাঝে সাড়া পরিয়া যায়।

বস্তীতে বস্তীতে আলোচনা চলিতে থাকে মিছিলে মিছিলে আওয়াজ উঠিতে থাকে; 'দাবী না মানিলে ঝাড়ু বুরুস জলবাতি বন্ধ।'

বিক্ষুব্ধ, অত্যাচারিত শ্রমিকের কাছে লালঝাণ্ডার এই সংগ্রামের আহ্বানের শক্তি বুঝিতে পারিয়া জাতীয় টি-ইউর দালাল বাহিনী আতঙ্কিত হইয়া উঠে। যে বেইমানেরা কর্তৃপক্ষের কাছে বলিয়া বেড়ায় 'মজুরেরা তো ছাতু খায় তাদের মাহিনা বাড়িয়ে কি হবে' 'মজুরের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড দিয়ে কি হবে—মৃত্যুর পর তাদের বৌ আবার বিয়ে করে'। তারাই এবার সরাসরি ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচার না করিয়া বলিতে সুরু করে যে—তাহারাও ধর্ম্মঘট করিবে, তবে এখন নয়, আরও কিছুদিন পরে। শ্রমিকদের আরও ধোঁকায় ফেলিবার জন্য ইহারা অক্টোবর মাসে একটা দিন ধার্য্যও করিয়া দিয়াছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর তার শক্তি নিয়া আগাইয়া আসিলে এই বিভীষণেরা তাহাদের মুখোস খুলিয়া ফেলে; তাহাদের নখদন্ত নিয়া বাহির হইয়া আসে!

"আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন" দালাল দেবেন সেনের চ্যালাচামুণ্ডারা বস্তীতে বস্তীতে "হিন্দুস্থানী প্রধান ধাঙ্গড় ও মেথরদের কাছে প্রচার চালায় যে, পূজার মধ্যে ধর্ম্মঘট হইলে বাঙ্গালী বাবুরা 'খিলাক' চলিয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের দুর্নীতি পরায়ণ মালিকের শ্রমিকদের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করে ধর্ম্মঘটকে বে-আইনী বলিয়া পূজার জন্য ২৫ তারিখ ধার্য্য বেতনের দিনে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হইবে না বলিয়া জানায়।

আর ২৫শে সেপ্টেম্বর ভোরবেলা এই দুর্নীতি ও অত্যাচারের রক্ষাকর্ত্তা কংগ্রেসী সরকারের সশস্ত্র পুলিস বাহিনী রাইফেল ও বন্দুক উঁচু করিয়া শ্রমিকদের বস্তী ঘেরাও করিয়া ফেলে। ইতিপূর্ব্বে শ্রমিক নেতা শিশির দত্ত, দিল্লু ও প্রভাত বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিস বাহিনীর গাড়ীতে চড়িয়া আসে দালাল বাহিনীর নেতারা।

এই হিংস্র আক্রমণের মুখে ধর্ম্মঘট সুরু করেন দক্ষিণ কলিকাতার ধাঙ্গরেরা। বিধান সরকারের সশস্ত্র পুলিস বাহিনী আসিয়া তাহাদের বস্তী হইতে বাহির করিয়া দেয়—তবু তাহারা ধর্ম্মঘটে দৃঢ় থাকেন।

গোখানা অঞ্চলের ময়লা তোলার গাড়ী যে মজুরেরা বাহির করিয়াছিলেন হরতালের কথা বলার সাথে সাথে তাহারা গাড়ী ফিরাইয়া নেন।

উত্তর কলিকাতার যে অঞ্চলে পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেসী ইউনিয়নের এখনও প্রভাব আছে সেই এলাকার মজুরেরাও কাজে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করেন, পুলিস ও দালালের তাড়নায় তারা অবশেষে কাজে যোগ দেন।

মধ্য কলিকাতার চুনাগলির শ্রমিকেরা ৮টা পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ রাখে।

জাতীয় টি, ইউর ঘৃণ্য দালালী ও কংগ্রেসী সরকারের ও মালিকের এই হিংস্র আক্রমণের মুখেও ২৫শে সেপ্টেম্বর লালঝাণ্ডার ডাকে মোট ৫,০০০ কর্পোরেশন শ্রমিক ধর্ম্মঘট করেন।

সেদিন যে সাধারণ শ্রমিকেরা এই বাঁচার লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন নাই তাহাদের কেহ সরকারের হিংস্র চেহারায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেহ দালাল বাহিনীর অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ৫,০০০ আশুয়ান শ্রমিক সমস্ত আক্রমণের মুখে রুখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের ভরসা জোগাইয়াছেন।

এই জঙ্গী শ্রমিকেরা জায়গায় জায়গায় দালালদের শায়েস্তা করিয়াছেন। কুখ্যাত দালাল শ্যামলাল হাসপাতালে ঠাঁই নিয়াছে। মোটর ভেইকেলের ময়লা ফেলার গাড়ী নিয়া কিছু কিছু দালাল বাহির হইলে একটি গাড়ীতে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

২৫শে সেপ্টেম্বর ৫,০০০ জঙ্গী শ্রমিকের এই ধর্ম্মঘটের ফলে সাধারণ শ্রমিকদের মোহ ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছে। তাহারা কংগ্রেস সরকার ও দালাল বাহিনীর হিংস্র চেহারা দেখিতে পাইয়াছেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর যে মোটর ভাইকেলের মজুরদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গা দলে পরিণত করার চেষ্টা চলিয়াছিল সেই শ্রমিকরাই পরের দিন "বেতন হরতাল" করেন। পুরা মাস কাজ করা সত্ত্বেও তাদের ৩৬ টাকার জায়গায় ৩০ টাকা দেওয়া হইলে এই ধর্ম্মঘট হয়। শান্তি সেন ও অন্যান্য দালালদের এই মোহমুক্ত শ্রমিকেরা পরিষ্কার মুখের উপর বলিয়া দিয়াছেন "এই জন্যই কি তোমরা আমাদের ধর্ম্মঘট কোরতে বারণ কোরেছিলে?" পুরা দিন বেতন হরতাল করিয়া তাহারা তাহাদের দাবী আদায় করিয়া নিয়াছেন।

এইভাবে লালঝাণ্ডার সংগ্রামের ডাকে আশুয়ান ৫,০০০ শ্রমিক পশ্চাদপদ শ্রমিকদের শক্তি দিয়াছেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর সারাদিন সমস্ত আক্রমণের মুখে রুখিয়া দাঁড়াইয়া বিকালে ওয়ার্কস ইউনিয়নের আহ্বানে প্রায় ৩,০০০ ধাঙ্গর, মেথর ও অন্যান্য শ্রমিক সমবেত হন। তাহারা ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখিতে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ২৫শে সেপ্টেম্বরের জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা নিয়া এই শ্রমিকেরা সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িবেন। কংগ্রেসী দালালদের নখদন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়া কংগ্রেস প্রভাবাধীন শ্রমিকদের বাঁচার লড়াইয়ে তাহারা টানিয়া আনিবেন। অক্টোবর মাসে তাহারা লড়াইয়ের জন্য আবার সামিল হইবেন।

বাঁচিবার শপথ নিয়া-এই শ্রমিকেরা কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ বাহিনী ও বেসরকারী দালাল বাহিনীর সমস্ত আক্রমণের মুখে দুর্জয় ঐক্য গড়িয়া তুলিবেন। ২৫ সেপ্টেম্বরের অভিজ্ঞতা নিয়া কলিকাতার ২২০০০ ধাঙ্গর, মেথর, বাতিওয়ালা, জলকলের মজুর বাঁচিবার লড়াইএ সামিল হইবেন।

কর্পোরেশন শ্রমিকদের বাঁচার দাবী নিয়া বৃহত্তর সংগ্রাম সুরু করার জন্য আগামী ৫ই অক্টোবর ময়দানে বিকাল ৫টায় সভা।

বিশ্বশান্তির সংগ্রাম শিবিরের মহান্ নেতা সোভিয়েট

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

সামরিক ঘাঁটি দেবার ব্যবস্থা চলেছে। বর্ম্মার নেহরু লিয়াকতের নেতৃত্বে সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। নেহরু-লিয়াকত এদেশের চল্লিশ কোটী নরনারীকে নাগপাশে বেঁধে কামান ও বোমার অসহায় খোরাক করতে চলেছে।

এর বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছে জনতার বিক্ষোভের দাবানল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণরাষ্ট্র কায়েম করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথ আজ গণতান্ত্রিক জনতা গ্রহণ করেছে। সোভিয়েটের প্রতি ভালবাসা ও তার নেতৃত্বে আস্থা এদেশের জনগণের মধ্যে আজ যত ব্যাপক ও প্রবল হয়েছে, তেমন আর কোন দিন ছিল না।

এদেশের মজুর ও মেহনতী জনগণ শপথ নিচ্ছে: যুদ্ধকে তারা রুখবে, শান্তির জন্য সংগ্রামে তারা জয়ী হবে। নেহরু-লিয়াকত যদি এদেশকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধকে ডেকে আনে নেহরু লিয়াকত যদি কোটী মাতা ও বধূর পুত্র ও পতিকে হত্যার জঘন্য চক্রান্ত করে, তখন **সেই সর্ব্বনাশা যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েটের পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত হবে এদেশে তার লালফৌজ পাঠিয়ে দেওয়া। এদেশের ও মেহনতী জনগণ তাদের অভ্যর্থনা করে ডেকে আনবে, তাদের কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে দেবে। শান্তির সংগ্রামে জনগণ জয়ী হবে-ই।**

বিপ্লবী ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা

লজোভস্কি—দাম আট আনা

আজ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা, যখন বুর্জ্জোয়াশ্রেণী অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে, বুর্জ্জোয়া-সরকার শ্রমিকের বাঁচার লড়াইকে রাইফেলের মুখে মোকাবিলা করছে, যখন বুর্জ্জোয়ার দালাল পোষাকুত্তারা শ্রমিকের ঐক্যকে ভেঙ্গে চুরমার করতে চাইছে, সেই অবস্থায় এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

* **১৯০৫ সালের বিপ্লব** লেনিন, দাম দশ আনা।

নিউ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সম্পাদক—অমল ঘোষ কর্তৃক ১৩-সি, সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক ১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীবঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত।